আনওয়ারুল মিশকাত শরহে

মিশকাতুল মাসাবীহ

আরবি-বাংলা

৩

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা আব্দুস সালাম
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ [তৃতীয় খণ্ড]

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুফতি আব্দুস সালাম

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমূদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৫৭৫.০০ [পাঁচশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র]

সূচিপত্র

ইমাম নববী (র.) বলেন, جَنَازَةٌ শব্দটি جِيْمٌ হরফ যের ও যবর দিয়ে উভয়ভাবে রয়েছে। তবে যের দ্বারাই বিশুদ্ধ। কেউ বলেছেন, যের দিয়ে جِنَازَةٌ অর্থ হচ্ছে– লাশ বা মৃত ব্যক্তি। আর যবর দিয়ে جَنَازَةٌ অর্থ হচ্ছে– ঐ খাট যার উপর লাশ রাখা হয়। কেউ এর বিপরীত বলেছেন। –[মেরকাত] কেউ বলেছেন, جَنَازَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– লাশ, খাটসহ যারা জানাজাকে বিদায় জানায় তাদের এ জামাত। –[আল–মু'জামুল ওয়াসীত]

সর্বাবস্থায় এর বহুবচন হচ্ছে جَنَائِزُ যবর দিয়ে। শব্দটির এসেছে جَنَزَ থেকে, যার অর্থ হলো– ঢেকে দেওয়া। আর جَنَزَ الْمَيِّتَ অর্থ হচ্ছে– লাশ খাটে রেখেছে।

তবে এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– রোগ ও মৃত্যু সম্পর্কে রোগীর করণীয় এবং সেক্ষেত্রে রোগীর আত্মীয়স্বজনসহ অন্যান্য মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেমন– অসুস্থতার উপর ধৈর্য ধরা, কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু কামনা না করা, সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশাবাদী থাকা, রোগকে ক্ষমার একটি অসিলা মনে করা এবং ক্ষমা চাওয়া। এছাড়া এমন কোনো শব্দ ব্যবহার না করা যার দরুন মসিবত এসে চেপে বসে। রোগের কারণে আল্লাহর শানে অসন্তুষ্টিসূচক কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

আর রোগীর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের দায়িত্ব হচ্ছে তার খোঁজখবর নেওয়া, তাকে দেখতে যাওয়া, সাধ্যানুযায়ী তার সেবাযত্ন করা। রোগ-বালাইয়ের ব্যাপারে এমন সব কথা বলা যার দ্বারা রোগী ভরসা পায়, নিরাশ না হয়। মৃত্যুকালে কালেমা তাইয়েবার তালকীনের মাধ্যমে ঈমানের সাথে মৃত্যুর ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা। আজেবাজে কথা বলা থেকে নিজে বিরত থাকা এবং অপরকেও বিরত রাখা।

পাড়া-প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়-স্বজনের উপর আরো গুরুদায়িত্ব হচ্ছে, মৃত্যুর পর তাকে গোসল করানো, জানাজার নামাজের ব্যবস্থা করা, দাফন-কাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের সহযোগিতা করা ইত্যাদি বিষয়াদি দিয়ে এ অধ্যায়ের বিভিন্ন বাবে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কবরের অবস্থা, রূহ ও শরীরের অবস্থা, নেককার হলে তার সঙ্গে কেমন আচরণ প্রদর্শিত হবে, বদকার হলে কেমন আচরণ প্রদর্শিত হবে? এসব বিষয়ের হাদীস এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَثَوَابِ الْمَرَضِ

পরিচ্ছেদ : অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ও অসুস্থতার ছওয়াব

عِيَادَةٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। عَادَ الْعَلِيْلَ عَوْدًا وَعِيَادَةً অর্থ হচ্ছে- রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। অর্থাৎ রোগীকে দেখতে যাওয়া। আর عَادَ الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ অর্থ হচ্ছে- ডাক্তার রোগীকে দেখেছে এবং তার চিকিৎসা করেছে। এখানে عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীকে দেখতে যাওয়া, তার খবরাখবর নেওয়া এবং সাধ্যমাফিক তার সেবা-শুশ্রূষা করা। একজন রোগীর সেবা করা কতটুকু ফজিলতপূর্ণ এবং এটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সে সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রোগ-বালাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একজন মু'মিনের মাকাম কতটুকু বুলন্দ করেন এবং তার গুনাহ মুছে দেন সে সম্পর্কীয় হাদীস এ বাবে রয়েছে। উল্লেখ্য, যে রোগীকে দেখাশুনা ও সেবা করার মতো লোক আছে তাকে দেখতে যাওয়া, তার সেবা-শুশ্রূষা করা সুন্নত ও উত্তম। পক্ষান্তরে যাকে দেখাশুনা করার মতো কেউ নেই, সে রোগীর সেবা-যত্ন করা অপর মুসলমানের উপর ওয়াজিব। -[আ'যমী]

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٤٣٧ اَبِيْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, অসুস্থ ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ক্ষুধার্ত ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে নিরুপায় এবং ক্ষুধায় মারা যাওয়ার অবস্থা হয় তাহলে সামর্থ্যবান ব্যক্তি তাকে খানা খাওয়ানো কর্তব্য। কারণ রোগীর সেবার কথা এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত اَلْعَانِيْ দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে- ১. কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলমান। ২. গোলাম। উল্লেখ্য, এসবগুলো হুকুমই فَرْضُ كِفَايَةٍ হিসেবে। কেউ আদায় করে দিলে অন্যদের থেকেও আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় সবাই গুনাহগার হবে। -[মেরকাত] তবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থা হলে তাকে খাওয়ানো সুন্নত। আর اَلْعَانِيْ শব্দ দ্বারা গোলাম উদ্দেশ্য হলে সেক্ষেত্রে এ হুকুমটি ওয়াজিব হুকুম নয়। পক্ষান্তরে যে কোনো মুসলমান শত্রুর হাতে বন্দী থাকলে তাকে মুক্ত রাখার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা অন্যদের উপর ফরজ।

وَعَنْ ١٤٣٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [এক] মুসলমানের উপর [অপর] মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে- সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, জানাজার নামাজে শরিক হওয়া, দাওয়াত গ্রহণ করা এবং হাঁচির উত্তর দেওয়া। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের প্রাপ্য পাঁচটি হকের উল্লেখ করা হয়েছে। এ পাঁচটি হকের প্রতিটি হকই ফরজে কেফায়া পর্যায়ের। −[মেরকাত] তবে দাওয়াত কবুল করার বিষয়টি ভিন্ন। সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু সালাম দেওয়া সুন্নত। এটি এমন একটি সুন্নত যা ফরজের চেয়ে উত্তম। কেননা এর মাঝে বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ রয়েছে এবং এটি অপর একটি ওয়াজিব আদায়ের কারণ হয়। −[মেরকাত]

প্রতিবেশী অসুস্থ ব্যক্তি যদি কাফেরও হয় তবু তাকে দেখতে যাওয়া এবং তার খবরাখবর নেওয়া জরুরি। −[আ'যমী]

আর জানাজায় শরিক হওয়ার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি যদি বিদ'আতি হয় তাহলে তার জানাজার নামাজে শরিক হওয়া থেকে বিরত থাকবে। −[মেরকাত]

এছাড়া যে কোনো জানাজায় তার দাফন পর্যন্ত সঙ্গ দেওয়া মুস্তাহাব।

اِجَابَةُ الدَّعْوَةِ-এর দুটি অর্থ হতে পারে। যথা− ১. কাউকে সাহায্য করার জন্য তার ডাকে সাড়া দেওয়া। ২. কারো দাওয়াত কবুল করা। দ্বিতীয় অর্থে এটি তখনই ওয়াজিব হবে যখন দাওয়াত গ্রহণ করলে কোনো প্রকার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকবে। −[মেরকাত]

এমনিভাবে মেজবানের কামাই-রোজগার যদি হালাল হয় তখন দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব, অন্যথায় নয়। বিশেষত হারাম হওয়া নিশ্চিত হলে দাওয়াতে না যাওয়া ওয়াজিব।

تَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ : تَشْمِيْت শব্দের অর্থ হচ্ছে− কারো জন্য খায়ের ও বরকতের দোয়া করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার দোয়া করা। কেউ বলেছেন− এর অর্থ হচ্ছে− اَبْعَدَكَ اللّٰهُ عَنِ الشَّمَاتَةِ بِكَ অর্থাৎ 'তোমার কারণে কোনো অমঙ্গল থেকে আল্লাহ তোমাকে দূরে রাখুক।' اَلْعَاطِسُ অর্থ হচ্ছে− যে হাঁচি দেয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে হাঁচি দেয় সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা। হাঁচির জবাবের ক্ষেত্রে ভালো-খারাপ সকল মুসলমান বরাবর। তবে নেককারদের হাঁচির জবাব হাসিমুখে দেবে। পক্ষান্তরে বদকারের হাঁচির জবাব সেভাবে দেবে না। −[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٣٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪৩৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [এক] মুসলমানের উপর [অপর] মুসলমানের উপর ছয়টি হক। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সেগুলো কি? রাসূল ﷺ বললেন, যখন তুমি তার সাক্ষাৎ পাবে তখন তাকে সালাম দাও, সে তোমাকে দাওয়াত করলে তার দাওয়াত কবুল কর, সে যখন তোমার কাছে মঙ্গল কামনা করবে তখন তুমি তার মঙ্গল সাধন কর, সে যদি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তাহলে তুমি তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বল, সে অসুস্থ হলে তাকে দেখেতে যাও, আর সে মারা গেলে তার জানাজার নামাজে শরিক হও। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اِسْتَنْصَحَكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নসিহত বা উপদেশ চাওয়া। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো বিষয়ে পরামর্শ চায় তাহলে তার জন্য ভালো হয় এমন পরামর্শ তাকে দেওয়া উচিত। রাগেব (র.) বলেন, اَلنُّصْحُ تَحَرِّيْ فِعْلٍ اَوْ قَوْلٍ فِيْهِ اِصْلَاحُ صَاحِبِهِ −[মেরকাত] এমনিতেই উপদেশ দেওয়া সুন্নত। কিন্তু কেউ পরামর্শ চাইলে তাকে সৎ পরামর্শ দেওয়া ওয়াজিব।

হাঁচির পর আল্লাহর প্রশংসা করার হেকমত হচ্ছে, হাঁচি যদি সর্দি জাতীয় কোনো অসুস্থতার কারণে না হয় তাহলে তা শরীরের হালকাবোধ থেকে সৃষ্টি হয়, কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত। এরই বিপরীত হচ্ছে اَلتَّثَاؤُبُ বা হাই তোলা। কেননা তা আলস্যবোধ ও শরীর ভারি হয়ে যাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। এ কারণেই রাসূল ﷺ বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে ভালোবাসেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।' –[মেরকাত]
আলোচ্য হাদীসে ছয়টি হকের কথা বলা হয়েছে। এর আগের হাদীসে পাঁচটি হকের কথা রয়েছে। আবার কোনো হাদীসে সাতটি হকের কথাও রয়েছে। এর দ্বারা মূলত এগুলোর মাঝে হককে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং বলা উদ্দেশ্য এগুলোও হকের অন্তর্ভুক্ত। –[আ'যমী]

وَعَنْ ١٤٤ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمِيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَاِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِي الْاٰخِرَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৪০. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। রোগীর খোঁজখবর নেওয়া, জানাজায় শরিক হওয়া, হাঁচির জবাব দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করা, কসমদাতার কসম পূরণ করা এবং অত্যাচারিতকে সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। আর সোনার আংটি, রেশম, ইস্তাবরাক [মোটা রেশমের পোশাক], দীবাজ [পাতলা রেশমের পোশাক], লাল গালিচা, কাসসী কাপড় ও রূপার পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রূপার পাত্রে পান করতে। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তাতে পান করবে সে আখেরাতে তাতে পান করতে পারবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اِبْرَارُ الْمُقْسِمِ-এর মাঝে اِبْرَارٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– পূরণ করা বা পূরণ করতে সাহায্য করা। اَلْمُقْسِمُ অর্থ হচ্ছে– সে ব্যক্তি কসম খেয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতে কোনো একটি কাজ করার ব্যাপারে কসম করে এবং সে কাজটি কোনো গুনাহের কাজ না হয়, এমন ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি তার কসম পূর্ণ করতে গেলে যদি সে তোমার কোনো সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয় এবং তুমি ইচ্ছা করলে তাকে তার কসম পূর্ণ করতে সাহায্য করতে পার, তাহলে তুমি তাকে সাহায্য কর, যাতে ঐ ব্যক্তি তার কসম ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী না হয়। –[মেরকাত]
কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে কেউ যদি আল্লাহর কসম করে তোমার কাছে কিছু চায় তাহলে তুমি তার সে কামনা পূর্ণ কর, যাতে তার কসম ভঙ্গ না হয়।

نَصْرُ الْمَظْلُوْمِ অর্থাৎ অত্যাচারিতকে কথার দ্বারাও হাতে পারে, কাজের দ্বারাও হতে পারে, খোদ সে তার প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করা থেকে বিরত থেকেও সাহায্য করতে পারে।

حَرِيْرٌ، اِسْتَبْرَقٌ، دِيْبَاجٌ : এসবগুলোই মূলত রেশম যা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। حَرِيْرٌ হচ্ছে যে কোনো রেশমি কাপড় যার মধ্যে রেশমি সুতার অংশ বেশি। اِسْتَبْرَقٌ হচ্ছে মোটা রেশমি সুতার কাপড়। دِيْبَاجٌ হচ্ছে পাতলা রেশমি সুতার কাপড়। এখানে মূলত রেশমি কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করার জন্যে এর বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْمِيْثَرَةُ الْحَمْرَاءُ হচ্ছে লাল গদি বা লাল গালিচা। اَلْمِيْثَرَةُ হচ্ছে ঘোড়ার পিঠে বিছানো জিনপোষ যার উপর আরোহী বসে। এটি হারাম হওয়ার দুটি কারণ রয়েছে– ১. অনারব দেশে এ ধরনের গদি রেশমের সুতা দিয়ে তৈরি হতো, তাই হাদীসে ঐ বিশেষ প্রকারটির ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। ২. লাল রঙ পুরুষের জন্য মাকরূহ, তাই এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। –[মেরকাত]

اَلْمِيْثَرَةُ শব্দটি اَلْوِثَارُ থেকে মীম হরফে যের দিয়ে مِفْعَلَةٌ-এর ওযনে। বলা হয় وَثُرَ وَثَارَة فَهُوَ وَثِيْرٌ অর্থাৎ কোমল ও নরম। শব্দটির মূলরূপ ছিল مُوْثَرَةٌ ; মীমে যের থাকার কারণে وَاوْ হরফকে يَا দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। –[নেহায়া]

اَلْقَسِّيِّ শব্দটি قَا হরফে যবর এবং سِيْن ও يَا হরফদ্বয়ে তাশদীদ দিয়ে। এটি একপ্রকার কাতান শাড়ি যার মাঝে রেশমি সুতার মিশ্রণ রয়েছে। এ কাপড়গুলো মিসর থেকে আমদানি করা হতো। উপকূলীয় এলাকার কাসস নামক এক জায়গায় নামে এর নাম। কেউ বলেছেন, اَلْقَسُّ শব্দটি اَلْقَزُّ থেকে এসেছে, যা নিম্নমানের রেশম। زَاءْ হরফকে سِيْن দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ইবনে মালেক (র.) বলেন, এ প্রকার কাপড় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হয়তো এর মাঝে রেশমি সুতার অংশ বেশি হওয়া, অথবা তা লাল রঙের হওয়া।

وَعَنْ ١٤٤١ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪৪১. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমান যখন তার অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায় তখন সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের ফল বাগানে বিচরণ করতে থাকে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خُرْفَةٌ শব্দের অর্থ– বাগান, অথবা বাগানের ফল আহরণ করা। আবার বাগান থেকে আহরিত ফলকেও خُرْفَةٌ বলা হয়। –[নেহায়া]

وَعَنْ ١٤٤٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اِسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ

১৪৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষকে ডেকে বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম তখন তুমি আমাকে দেখতে আসনি। মানুষ বলবে, হে আমার রব! আপনি রাব্বুল আলামীন আমি কিভাবে আপনার সেবা করব? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে পারনি যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ তখন তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি কি জানতে না যে যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে তাহলে সেখানে আমার দেখা পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খানা চেয়েছিলাম তখন তুমি আমাকে খানা দাওনি। মানুষ বলবে, হে আমার রব! আপনি রাব্বুল আলামীন আমি কিভাবে আপনাকে খানা খাওয়াব? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে পারনি যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খানা চেয়েছিল, তখন তুমি তাকে খানা দাওনি? তুমি কি জান না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে, তাহলে সে খানার বদলা

عِنْدِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا اَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তুমি আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম তখন তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। মানুষ বলবে, হে আমার রব! আপনি রাব্বুল আলামীন আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করাব? আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, তখন তুমি তাকে পানি পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে তাহলে তার বদলা আমার কাছে পেতে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মানুষকে সম্বোধন করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নগুলো কয়েকভাবেই হতে পারে। হয়তো আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের জবানে একথাগুলো বলবেন, অথবা কোনো মাধ্যম ছাড়া ব্যাপকভিত্তিক ওহীর মাধ্যমে বলবেন, অথবা মানুষের মনের মাঝে এ কথাটি ঢেলে দেবেন, অথবা অবস্থার প্রেক্ষিতেই মানুষ এ কথা অনুভব করবে যে, আল্লাহর ওলীদের এ সেবাগুলো না করার কারণেই তারা আজ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। −[মেরকাত]

এ হাদীসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার রোগ, পিপাসা ও ক্ষুধাকে নিজের রোগ, পিপাসা ও ক্ষুধা বলে উল্লেখ করে তাঁর প্রিয় বান্দার মর্যাদাকে বুলন্দ করতে চেয়েছেন। এ হাদীসের মাঝে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে উল্লেখ করে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যারা বিনয়, নম্র ও ভগ্ন হৃদয়ের অধিকারী হয়েছেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গেই রয়েছেন।

وَعَنْ ١٤٤٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اَعْرَابِىٍّ يَعُوْدُهُ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ كَلَّا بَلْ حُمّٰى تَفُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৪৪৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার এক গ্রাম্য বেদুইনকে দেখতে তার ঘরে গেলেন। আর তিনি যখন কোনো রাগীকে দেখতে যেতেন তখন বলতেন− لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ 'ভয় নেই ভালো হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ এটা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে।' এ হিসেবে তিনি তাকেও বললেন− لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ 'ভয় নেই, আল্লাহ চাহেন তো এ রোগ তোমাকে পবিত্র করার কারণ হবে।' বেদুইন লোকটি বলল, কখনো নয়; বরং এটা এমন জ্বর যা একজন অতি বৃদ্ধ লোকের গায়ে টগবগ করে ফুটছে এবং তা তাকে কবরে নিয়েই ছাড়বে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ তবে তাই হবে। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রাসূল ﷺ দোয়া করার পর লোকটি বলে উঠল كَلَّا [কখনো নয়] অর্থাৎ তুমি একথা বলো না। এখানে তার এ কথাটি কুফরি কথা হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে আবার কুফরি না হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ যে রোগকে গুনাহ মাফ হওয়ার একটি অসিলা বলেছেন তা যদি সে বুঝেশুনে অস্বীকার করে থাকে তাহলে নবীর কথা অস্বীকার করার কারণে তা কুফরি হবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে না বলে শুধুমাত্র নৈরাশ্যের ভাবের কারণে করে থাকে তাহলে তা কুফরি নয়। লোকটি গ্রাম্য বেদুইন হওয়া এ দ্বিতীয় সম্ভবনাকেই সমর্থন করে। −[মেরকাতের আলোকে]

تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ অর্থ হচ্ছে− তাকে কবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবে। অর্থাৎ মৃত্যুর মাধ্যমে সে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَعَنْ ١٤٤٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اشْتَكٰى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৪৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্য হতে কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গায়ে নিজের হাত বুলিয়ে দিতেন। এরপর বলতেন- أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا 'হে মানুষের প্রভু! তুমি আরোগ্য দান কর, তুমিই সুস্থতা দানকারী, তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোনো আরোগ্য নেই। এমন সুস্থতা দান কর যা কোনো রোগকে বাকি রাখে না।'

-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ হাদীসের এ অংশের মাঝে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অসুখের ক্ষেত্রে যেসব ঔষধ ও চিকিৎসা নেওয়া হয় তা কখনো উপকার পৌঁছাতে পারে না যতক্ষণ না তা তাকদীরের ফয়সালার অনুরূপ হবে।

شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا : এর দ্বারা রোগ সমূলে উৎপাটনের জন্যে দোয়া করা হয়েছে। কেননা কখনো এমন হয় যে, একটি রোগ শেষ হয়ে অপর আরেকটি রোগ শুরু হয়। আবার কখনো একই রোগ পুনরায় শুরু হয়। এজন্যে এভাবে দোয়া শিখানো হয়।

وَعَنْهَا ١٤٤٥ قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكٰى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৪৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ব্যথিত তার শরীরের কোনো অঙ্গে ব্যথা অনুভব করত অথবা শরীরের কোনো স্থানে ফোড়া দেখা দিত বা জখম হতো তখন নবী করীম ﷺ আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে বলতেন- بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا 'আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের কারো থুথু মিশিয়ে, যাতে আমাদের রবের আদেশে আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায়।' -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসের শব্দ থেকে বুঝা যায় নবী করীম ﷺ মাটির সঙ্গে নিজের থুথু মিশাতেন। তিনি হাতের তর্জনীতে থুথু নিয়ে তা মাটির সঙ্গে মিশাতেন। এরপর ব্যথার জায়গায় মাটি মাখা আঙ্গুল বুলাতেন এবং এ শব্দগুলো উচ্চারণ করতেন।

মাটি ও মানুষের থুথুর মাঝে আরোগ্য রয়েছে এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, আমি চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু আলোচনায় দেখেছি পরিশুদ্ধ ও মেজাজ পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে থুথুর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। আর মূল স্বভাব সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে মাটির বিশেষ উপকারিতা রয়েছে। এমনিভাবে অসুস্থতার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব রয়েছে। -[মেরকাত]

ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের বৈধতা প্রমাণ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, ঝাড়ফুঁকের মাঝে যদি হারাম কোনো বিষয় না থাকে যেমন- যাদু, কুফরি কথা বা এমন কোনো কথা যা বুঝা যায় না এবং তা শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে হয় তাহলে তা বৈধ।

وَعَنْهَا ١٤٤٦ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ .

১৪৪৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন অসুস্থ হতেন তখন 'মুআওয়াযাত' সূরাসমূহ পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিতেন এবং শরীরের উপর নিজের হাত বুলাতেন। এরপর যখন তিনি তাঁর সে অসুস্থতায় পড়লেন যে অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তখন আমি সে 'মুআওয়াযাত' সূরাসমূহ পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ দিতাম যেগুলো পড়ে তিনি ফুঁ দিতেন এবং নবী করীম ﷺ -এর হাত দ্বারাই তাঁর গা মুছে দিতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তাঁর পরিবারস্থ কেউ অসুস্থ হলে 'মুআওয়াযাত' পড়ে তার শরীরে ফুঁ দিতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلْمُعَوِّذَاتُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ফালাক' ও 'নাস' এ সূরা দুটি। এরকমভাবে প্রত্যেক ঐ আয়াতও এর অন্তর্ভুক্ত যা এ দুই সূরার আয়াতের মতো। দুটি সূরার ক্ষেত্রে اَلْمُعَوِّذَاتُ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। প্রথমত মাজাযী তথা রূপকভাবে দুয়ের জন্য বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর যাদের মতে বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা দুই তাদের মতে এখানে কোনো আপত্তি নেই। আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, এ বহুবচন সূরার আয়াত সংখ্যা হিসেবে হতে পারে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এর মাঝে সূরা ইখলাসও রয়েছে। কিন্তু تَغْلِيْبًا সবগুলোকে اَلْمُعَوِّذَاتُ বলে দেওয়া হয়েছে। –[মেরকাত]

نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সহীহ বুখারীতে বর্ণনা রয়েছে, মা'মার (র.) যুহরী (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছেন كَيْفَ يَنْفُثُ 'কিভাবে ফুঁ দিতেন'? তিনি উত্তরে বলেছেন, প্রথমে উভয় হাতে ফুঁ দিতেন। এরপর উভয় হাত দিয়ে চেহারা ও শরীর মুছতেন। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٤٧ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ (رض) أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِي . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪৪৭. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি তাঁর শরীরের একটি ব্যথার কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভব কর সেখানে হাত রাখ অতঃপর তিনবার বিসমিল্লাহ বল এবং সাতবার এ দোয়াটি পড়– اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ 'আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ ও ক্ষমতার সাহায্যে আমি যা অনুভব করছি এবং যার আশঙ্কা করছি তার ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাচ্ছি।' হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি তাই করলাম। ফলে আমি আমার শরীরের যে সমস্যা অনুভব করতাম আল্লাহ তা দূর করে দিয়েছেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٤٤٨ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ جِبْرَئِيْلَ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪৪৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, 'আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন সব বিষয় থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয়। প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা প্রত্যেক বিদ্বেষী চোখের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।' –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٤٤٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ وَيَقُوْلُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحَاقَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِىْ أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ بِهِمَا عَلٰى لَفْظِ التَّثْنِيَةِ .

১৪৪৯. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনের জন্যে এভাবে সংরক্ষণের দোয়া পড়তেন– 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের সাহায্যে সংরক্ষণ করছি প্রত্যেক শয়তান থেকে, প্রত্যেক বিষাক্ত কীট থেকে ও প্রত্যেক ক্ষতিকর চোখ থেকে।' আর তিনি বলতেন, তোমাদের পিতা [ইবরাহীম] ইসমাঈল ও ইসহাককে এ শব্দগুলো দ্বারা সংরক্ষণ করতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ : ইমাম তুরপুশতী (র.) বলেন, আরবি ভাষায় বাক্যের প্রতিটি অংশকে كَلِمَةٌ বলা হয়। এরকমভাবে দীর্ঘ শব্দমালা এবং অর্থ ও বিষয়বস্তুর সমষ্টিকেও كَلِمَةٌ বলা হয়। এ কারণে كَلِمَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা ও তাঁর আসমানি কিতাবসমূহ। এসব শব্দ দ্বারা পানাহ চাওয়ার কারণ হচ্ছে, এগুলো ত্রুটিমুক্ত শব্দ।

هَامَّةٌ : শব্দটি তাশদীদযুক্ত مِيْم দ্বারা। هَامَّةٌ বলা হয় প্রত্যেক এমন বিষাক্ত প্রাণীকে, যারা ছোবল দিয়ে মেরে ফেলে। এর বহুবচন হচ্ছে اَلْهَوَامُّ। আর যেসব প্রাণীর বিষ আছে কিন্তু মেরে ফেলে না তাকে বলা হয় اَلسَّامَّةُ যেমন– বিচ্ছু ও ভিমরুল। এছাড়াও সবধরনের কীট ও পোকামাকড়কেও هَامَّةٌ বলা হয়।

لَامَّةٌ : শব্দটি তাশদীদযুক্ত مِيْم দ্বারা। এর অর্থ হচ্ছে– যা সবধরনের ক্ষতিকারক বিষয়কে নিজের মধ্যে রাখে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, اَلْعَيْنُ اللَّامَّةُ বলা হয় যে চোখ কারো প্রতি প্রভাব ফেলে। আর اَللَّمَمُ হচ্ছে পাগলামির একটা প্রকার।

وَعَنْ ١٤٥٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪৫০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যার ব্যাপারে কোনো কল্যাণের ফয়সালা করেন তাকে মসিবতে নিপতিত করেন।

وَعَنْ ١٤٥١ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখনই কোনো রোগ, কোনো চিন্তা বা পেরেশানি কোনো কষ্ট বা দুঃখ কোনো মুসলমানকে আক্রান্ত করে এমনকি তার গায়ে যদি একটি কাঁটাও ফুটে তখনই আল্লাহ তা'আলা এর অসিলায় তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : نَصَبٌ হচ্ছে আঘাত জনিত কারণে শরীরে যে জখমের সৃষ্টি হয় তা। وَصَبٌ হচ্ছে শরীরের স্থায়ী অসুস্থতা। অর্থাৎ অসুস্থতার কারণের কষ্ট অনুভূত হয় তা। هَمٌّ হচ্ছে যা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে দেয় অর্থাৎ যার প্রভাব তার চেহারায় দেখা দেয়। حُزْنٌ হচ্ছে যার দ্বারা অন্তরে শুষ্কতার সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় هَمٌّ হলো حُزْنٌ-এর চেয়ে খাস। اَذًى হচ্ছে প্রত্যেক ঐ অবস্থা যা মনঃপূত নয়। এ হিসেবে এটি অন্যসব শব্দ থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। আর اذى শব্দের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় এটি সেসব কষ্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা মানুষ অন্যের কাছ থেকে পায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا অনুরূপ হাদীসে রয়েছে- كُلُّ مُؤْذٍ فِى النَّارِ আর غَمٌّ হচ্ছে ঐ حُزْنٌ বা দুঃখ যা ব্যক্তিকে বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি নিয়ে উপনীত করে।

সুতরাং حُزْنٌ ও هَمٌّ হচ্ছে প্রিয় কোনো বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে মনে যে কষ্ট অনুভূত হয়। তবে غَمٌّ হচ্ছে এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিনটি। আর حُزْنٌ শব্দটি অতীতের কষ্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হযরত ওকী' (র.) বলেন, هَمٌّ-এর কারণে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি এ হাদীস ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

اَلشَّوْكَةُ। দ্বারা এখানে একবার কাঁটা ফোটা উদ্দেশ্য অর্থাৎ একটি কাঁটা ফোটা উদ্দেশ্য নয়। যদি একবার কাঁটা ফোটা উদ্দেশ্য না হয়ে একটি কাঁটা ফোটা উদ্দেশ্য হতো তাহলে يُشَاكُهَا না বলে يُشَاكُ بِهَا বলা হতো। -[মেরকাত]

এ হাদীস দ্বারা এর আগের হাদীসের বক্তব্যটি আরো সুসাব্যস্ত হয় যে, যে কোনো মসিবতই আল্লাহর ক্রোধের নিদর্শন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে পাক-সাফ করার জন্যে বিভিন্ন রকমের কষ্ট ভোগ করান এবং তার মাধ্যমে সে তাদের গুনাহ মাফ করে দেন। আর তা অর্জিত হয় রোগে-শোকে ধৈর্যধারণ করলে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে।

وَعَنْ ١٤٥٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدَىَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَجَلْ اِنِّىْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذٰلِكَ لِاَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ فَقَالَ

১৪৫২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি আমার হাত দিয়ে তাঁর শরীর স্পর্শ করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি তো প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছেন! নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের দুজন যে পরিমাণ জ্বর ভোগ কর আমি সে পরিমাণ ভুগছি। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি বললাম, তাহলে কি এর ফলে আপনার জন্যে দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। তিনি বললেন,

أَجَلْ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হ্যাঁ অবশ্যই। এরপর বললেন, যে কোনো মুসলমান রোগ বা অন্য কোনো কষ্ট ভোগ করবে আল্লাহ তা'আলা সে কষ্টের বদলায় তার গুনাহগুলো ঝেড়ে দেবেন, যেমনিভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে ফেলে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মতের দুজন মানুষ জ্বরে ভুগলে উভয়ের কষ্টের সমষ্টি যা হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একাই সে কষ্ট অনুভব করতেন। আর তা এজন্যে যে, এর দ্বারা তিনি দ্বিগুণ ছওয়াবের ভাগী হন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– إِنَّا كَذٰلِكَ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْوَجَعُ لِيُضَاعَفَ لَنَا الْأَجْرُ অর্থাৎ 'আমাদের [নবীদের জামাতের] বিষয়টি এমনই যে, আমাদের কষ্ট দিগুণ হয় আমাদেরকে দ্বিগুণ বদলা দেওয়ার জন্য।' –[মেরকাত]

এ ধরনের আরো বর্ণনাও রয়েছে, সেগুলোর আলোকে একথা সাব্যস্ত হয় যে, নবী ও ওলীগণের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অসুখ-বিসুখ বেশি দিয়ে তাঁদেরকে পরীক্ষা করা হয়।

وَعَنْ ١٤٥٣ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا الْوَجَعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৫৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন কাউকে দেখিনি যে, রাসূল ﷺ -এর চাইতে বেশি কষ্ট ভোগ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهَا ١٤٥٤ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪৫৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার বুক ও চিবুকের মাঝে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন, যার ফলে নবী করীম ﷺ -এর পর কারো মৃত্যুযন্ত্রণা দেখলে সেটাকে আমি খারাপ মনে করি না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকালের সময় তার বুকের উপর হেলান দিয়ে কাঁধে মাথা রেখে শুয়েছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রা.) এত নিকট থেকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুকষ্ট অবলোকন করেছেন।

فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমি মনে করতাম মানুষ মারা যাওয়ার সময় যে কঠিন কষ্ট ভোগ করে তা তার গুনাহের কারণে হয়। কিন্তু যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর মৃত্যুকালে তাঁর এত কষ্ট দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম, মৃত্যুকালের এ কঠিন কষ্ট খারাপ পরিণামের আলামত নয়; বরং তা হচ্ছে তাদের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্যে। আর সহজ মৃত্যু হওয়াটা সম্মানিত হওয়ার কোনো আলামত নয়। যদি তাই হতো তাহলে রাসূল ﷺ -ই এর জন্যে বেশি উপযুক্ত ছিলেন। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٥٥ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَفِيئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا اُخْرٰى حَتّٰى يَاْتِيَ اَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْاَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِىْ لَا يُصِيْبُهَا شَىْءٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اِنْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৫৫. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে ঐ নরম ঘাসের ন্যায় যাকে বাতাস একবার কাত করে ফেলে আবার সোজা করে দেয়, আর এভাবে তার মৃত্যু এসে যায়। আর মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে শক্তভাবে দাঁড়ানো সে পিপল গাছের মতো, যে কোনো বিপদের মুখোপেক্ষী হয় না যতক্ষণ না সে একবারে মূলোৎপাঠিত হয়ে পড়ে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَفِيْئُهَا الرِّيَاحُ : فَيْأٌ তাশদীদযুক্ত يَا দ্বারা। অর্থাৎ ডানে বামে কাত করে ফেলে। অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস এলে তা উত্তর দিকে কাত হয়ে যায়, আবার উত্তর দিকে থেকে বাতাস এলে তা দক্ষিণ দিকে কাত হয়ে যায়। কেউ বলেছেন, শব্দটি এসেছে فَيَأَتِ الشَّجَرَةُ থেকে, যখন গাছ ছায়া ফেলে, তখন একথা বলা হয়। অর্থাৎ বাতাস তাকে একদিকে কাত করলে সেখানে তার ছায়া পড়ে। শব্দটি এমনই যেমন কুরআনে কারীমে এসেছে– يَتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ অর্থাৎ একজন মু'মিন এ অসহায় কোমল তৃণের ন্যায় ভয়, ক্ষুধা ও অসুস্থতা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কষ্ট ভুগতে থাকে, আর এভাবেই একদিন সে মরে যায়।

اَلْخَامَةُ : অর্থ হচ্ছে– কচি ডাল। অথবা নতুন উদ্গাত কচি ঘাস, যা এখনো শক্ত হয়নি। الارزة। শব্দটি হামযায় যবর ও راء -এ জযম দিয়ে। কেউ বলেছেন, رَاء -এ যবর দিয়েও সহীহ আছে। এটি সানুবার গাছের মতো একটি গাছ। তবে হাদীসের ভাষ্যকারদের অধিকাংশ বলেছেন, رَاء-এ জযম দিয়ে অর্থ– সানুবার গাছ, আর সানুবার হচ্ছে তার ফল। কেউ বলেছেন, যবর দিয়ে হলে গাছ, আর জযম দিয়ে হলে এটি ফল। –[মেরকাত]

اَلْمُجْذِيَةُ : শব্দটি مِيْم -এ পেশ جِيْم সাকিন, ذَالْ -এ যের এবং শেষে তাশদীদমুক্ত يَا দ্বারা অর্থ– মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

اِنْجِعَافُ : অর্থ হচ্ছে– সমূলে উৎপাটিত হওয়া।

وَعَنْ ١٤٥٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيْحُ تُمِيْلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْاَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتّٰى تُسْتَحْصَدُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনের উদাহরণ হচ্ছে ঘাসের মতো যাকে বাতাস এদিক-ওদিক দোলাতে থাকে। আর মু'মিনের উপর সব সময় মসিবত আসতে থাকে। পক্ষান্তরে কাফেরের উদাহরণ হচ্ছে পিপল গাছের মতো যা হেলে-দোলে না; বরং একেবারে কেটে ফেলা হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٤٥٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ مَا لَكِ تُزَفْزِفِيْنَ قَالَتِ الْحُمّٰى لَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا فَقَالَ لَا تَسُبِّى الْحُمّٰى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪৫৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সায়েবের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? কাঁপছ কেন? সে বলল, জ্বর, আল্লাহ তার অমঙ্গল করুক। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি জ্বরকে গালি দিয়ো না। কেননা জ্বর আদম সন্তানের গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে যেমনভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : تُزَفْزِفِيْنَ শব্দটি দুটি زَاءٌ হরফ দ্বারা। এটি مَعْرُوْف হতে পারে আবার مَجْهُوْل -ও হতে পারে। কেননা শব্দটি لَازِمْ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, مُتَعَدِّىْ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো সহীহ কপিতে زَاءٌ -এর পরিবর্তে দুটি নোকতাবিহীন رَاءٌ দ্বারা শব্দটি রয়েছে এবং তা مَعْرُوْف -এর সীগাহ দ্বারা। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, رَفْرَفَ الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ বলা হয় যখন পাখি কোনো কিছুর উপর পড়তে গিয়ে ডানা ফেলে। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কি হলো, তুমি কাঁপছ কেন?

শব্দটি زَاءٌ দ্বারা বর্ণিত আছে اَلزَّفْزَفَةُ থেকে যার অর্থ− ঠাণ্ডার কারণে কাঁপা। উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার এ অস্বাভাবিক কম্পনের কারণ কি? −[মেরকাত]

كِيْرٌ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, كِيْرُ الْحَدَّادِ হচ্ছে কামারের মাটির তৈরি আগুনের ভাটি বা চুল্লি। কেউ বলেছেন, كِيْر হচ্ছে চামড়া বা মোটা কাপড়ের তৈরি ঐ হাপর যার দ্বারা আগুনে বাতাস দেওয়া হয়।

خَبَثٌ : যবর দিয়ে অর্থ− ময়লা। আর লোহার ময়লা হচ্ছে মরিচা।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) 'কাশফুল গুম্মা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাসান বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এক রাতের জ্বরের দ্বারা মু'মিনের সকল গুনাহ মুছে দেন। ইবনুল মুবারক (র.) বলেন, এটি একটি চমৎকার হাদীস। হযরত আবুদ দারদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এক রাতের জ্বর এক বছরের গুনাহের কাফফারা। হযরত আবূ উমাম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের একটি হাপর, আর এ জ্বর মু'মিনের জন্যে দোজখের নির্ধারিত অংশ। −[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٥٨ أَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهٗ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৪৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা যখন অসুস্থ হয় বা সফর করে তখন সে সুস্থ ও বাড়িতে থাকা অবস্থায় যেসব আমল করত সেসব আমলের সমপরিমাণ ছওয়াব তার জন্যে লেখা হয়। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি সক্ষম থাকা অবস্থায় যেসব নফল আমল করত, অক্ষম হওয়ার পর যদি সে আমলগুলো করতে না পারে তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলা সে আমলগুলো করলে যে পরিমাণ ছওয়াব হতো সে পরিমাণ ছওয়াব তাকে দিয়ে দেন। জামাতে নামাজ না পড়লে জামাতের ছওয়াব পাবে কিনা? এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর সঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, ছওয়াব পাবে না। কিন্তু এ হাদীস তাঁর বিপক্ষে দলিল, এমনিভাবে নিম্নোক্ত হাদীসটিও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর উক্ত মতের বিপক্ষে। যারা সফরের খরচ বহন করতে না পারার কারণে মদিনায় রয়ে গেছেন তাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ জানিয়েছেন, তাদের জন্য যুদ্ধ এবং রাসূলের সঙ্গে সফর করার ছওয়াব লেখা হবে। −[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٥٩ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৫৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মহামারীতে মারা যাওয়া শাহাদাতের মৃত্যুর মতো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلطَّاعُوْنُ -এর ব্যাখ্যা : طَاعُوْن বা মহামারীতে মারা গেলে হুকমী শাহাদাত হয়। طَاعُوْن হচ্ছে এক ধরনের ফোড়া, যা গরমের কারণে বগলের নিচে, আঙ্গুলের চিপায় এবং পুরো শরীরে হয়। এর ফলে তার চতুর্দিক কালো হয়ে যায়। কখনো সবুজ আবার কখনো লাল হয়ে যায়। কেউ কেউ وَبَاءٌ বা মহামারীকেই طَاعُوْن বলেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে طَاعُوْن হলো, যা মানুষের মাঝে ব্যাপক হয়ে যায় এবং তা একই রোগ হয়। ইবনে মালেক (র.) এটাই বলেছেন। আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, طَاعُوْن হচ্ছে ব্যাপক অসুখ এবং وَبَاءٌ হচ্ছে যার দ্বারা আবহাওয়া দূষিত হয়ে যায়, ফলে মানুষের শরীর দেমাগ সব আক্রান্ত হয়ে যায়। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত طَعْن [হামলা] ও طَاعُوْن [মহামারী] -তে শেষ হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! طَعْن বিষয়টি তো আমরা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু طَاعُوْن কি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে তোমাদের শত্রু জিন জাতির হামলা। এ রোগে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেকের জন্য রয়েছে শহীদ হওয়ার ছওয়াব।

وَعَنْ ١٤٦٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ প্রকারের লোক শহীদ– ১. যে মহামারীতে মারা গেছে ২. যে চোখের অসুখে মারা গেছে ৩. যে পানিতে ডুবে মারা গেছে ৪. যে দেয়াল চাপায় মারা গেছে এবং ৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে মারা গেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য, বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত পাঁচটি সহ আরো প্রায় অর্ধশত বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর কারণে একজন মু'মিন শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। তবে সর্বাবস্থায় এরা হচ্ছেন হুকমী শহীদ। অর্থাৎ এঁরা সবাই শহীদের মর্যাদা পাবেন, কিন্তু জিহাদ করে যে মু'মিন শত্রুর আক্রমণে শাহাদাত লাভ করবে, সেই শহীদের অন্যান্য হুকুম এসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

وَعَنْ ١٤٦١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاِنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهٖ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৪৬১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, মহামারী হচ্ছে একটি আজাব, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে আক্রান্ত করেন। তবে আল্লাহ তা'আলা এ মহামারীকে মু'মিনের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়েছেন। ফলে যে ব্যক্তিই এ মহামারীর শিকার হবে অতঃপর ছওয়াবের আশায় ধৈর্যের সাথে নিজের এলাকায় অবস্থান করবে এবং সে এ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তার বাইরে কোনো কিছুই তাকে পাবে না, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য শহীদের বরাবর ছওয়াব রয়েছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে [যা অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়], মহামারীপীড়িত অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিষেধ। কেননা এর দ্বারা আল্লাহর ফয়সালার প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং তাকদীরকে অস্বীকার করার মতো হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কেউ যদি ধৈর্যের সঙ্গে ছওয়াবের আশায় সে এলাকাতেই অবস্থান করে তাহলে আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাসের কারণে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। তবে মহামারীমুক্ত এলাকা থেকে বিনা প্রয়োজনে মহামারীপীড়িত এলাকায় এসে অবস্থান করার মাঝে কোনো ছওয়াব নেই; বরং অন্য হাদীসে তা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ عَنِ الْاَسَدِ যেমন পরবর্তী হাদীসেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।

وَعَنْ ١٤٦٢ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعُوْنُ رِجْزٌ اُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৬২. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহামারী হচ্ছে একটি আজাব যা বনী ইসরাঈলের একটি দলের উপর এসেছিল। অথবা [বলেছেন,] তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর এসেছিল। অতএব তোমরা যদি কোনো এলাকায় এ মহামারী ছড়িয়ে পড়ার খবর পাও তাহলে তোমরা সেখানে যেয়ো না। আর যদি তা এমন এলাকায় দেখা দেয় যেখানে তোমরা আছ, তাহলে তোমরা সেখান থেকে ভেগে যেয়ো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মহামারী সাধারণত আবহাওয়া দূষিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। আর কোনো স্থানের আবহাওয়া দূষিত হওয়াটাও আল্লাহর শাস্তি। অতএব বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তথায় যাবে না; কিন্তু সেখানে থাকলে অন্য কোথাও পালিয়ে যাবে না। কেননা এর দ্বারা তাকদীর থেকে বাঁচা যায় না। অথচ মানুষের মনোবল নষ্ট হয়ে যায় এবং রোগীদের সেবা-যত্নে বিঘ্ন ঘটে। –[আ'যমী]

وَعَنْ ١٤٦٣ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اِذَا ابْتُلِيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৪৬৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, আমি যখন আমার কোনো বান্দাকে তার প্রিয় দুটি বস্তু দ্বারা বিপদগ্রস্ত করি এবং সে তার উপর সবর করে তখন সে বস্তু দুটির বদলায় আমি তাকে জান্নাত দান করি। প্রিয় বস্তু দুটি দ্বারা তিনি দুই চোখকে উদ্দেশ্য করেছেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِحَبِيْبَتَيْهِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দু-চোখের দৃষ্টিশক্তি। দুই চোখকে দুই প্রিয় বস্তু বলে নামকরণের কারণ হলো, মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্য থেকে চোখ সবচেয়ে প্রিয়। যদিও বিশুদ্ধ মতানুসারে দৃষ্টিশক্তির চেয়ে শ্রবণশক্তিই বেশি উত্তম। কেননা শ্রবণশক্তির ব্যবহার অধিকাংশ সময় আখিরাতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা শ্রবণশক্তি দ্বারা কুরআন-হাদীস ও সকল প্রকার ইল্ম অনুধাবন করা হয়। পক্ষান্তরে চোখের ব্যবহার হয় দুনিয়াবি ক্ষেত্রে।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, এক চোখ হারানোর বদলা হচ্ছে জান্নাত। আর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এর চেয়েও ব্যাপক। যাদের দু-চোখ চলে যায় তারা যেন পূর্বযুগের মহামনীষী, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের আদর্শ গ্রহণ করে, যারা তাদের দু-চোখ হারিয়েছিলেন। সে মসিবতের উপর তারা সবর করেছিলেন, মেনে নিয়েছিলেন, বরং তাঁরা বিষয়টিকে একটি নিয়ামত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর সে কারণেই হিবরুল উম্মাহ ও কুরআনের মুখপাত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যখন তাঁর দুটি চোখ হারিয়ে ফেলেছিলেন তখন নিম্নোক্ত কাব্য পঙক্তিটি আবৃত্তি করেন–

اَنْ يَذْهَبَ اللّٰهُ مِنْ عَيْنَيْ نُوْرَهُمَا * فَفِيْ لِسَانِيْ وَقَلْبِيْ لِلْهُدٰى نُوْرٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ যদি আমার চোখের জ্যোতি নিয়ে থাকেন তো আমার মুখে ও অন্তরে হেদায়েতের জ্যোতি বিদ্যমান রয়েছে।'

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٦٤ - عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১৪৬৪. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কোনো মুসলমান সকাল বেলায় কোনো মুসলমান রোগীকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দোয়া করে। আর যদি সে তাকে সন্ধ্যায় দেখতে যায় তাহলে সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে। আর বেহেশতে তার জন্য একটি বাগান বরাদ্দ হয়। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

١٤٦٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِيْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১৪৬৫. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুই চোখে ব্যথা ছিল, সেজন্য নবী করীম ﷺ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, অসুস্থতা যদি আশঙ্কাজনক নাও হয় এবং তা সাধারণ পর্যায়ের হয়, তবে রোগীকে দেখতে যাওয়া মুস্তাহাব। এ দেখা রোগী দেখার আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার বদলে ছওয়াবও পাওয়া যাবে। কোনো কোনো হানাফী আলেম থেকে বর্ণিত আছে– চোখের ব্যথা, দাঁতের ব্যথা বা মাথা ব্যথা ইত্যাদি রোগের কারণে দেখতে যাওয়াটা সুন্নত পরিপন্থি। কিন্তু আলোচ্য হাদীসটি তাদের এ মতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাহলে তারা কিভাবে এটাকে সুন্নত বিরোধী বলতে পারে। –[মেরকাত]

١٤٦٦ - وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِّيْنَ خَرِيْفًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৪৬৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করবে এবং ছওয়াবের আশায় কোনো মুসলমান রোগীকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম থেকে ষাট বছরের দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাসআলা : আলোচ্য হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, রোগী দেখতে যাওয়ার আগে অজু করে নেওয়া সুন্নত এবং অজু করে যাওয়া অধিক ছওয়াবের কারণ। কেননা রোগী দেখতে যাওয়া একটি ইবাদত। আর যে কোনো ইবাদত অজুর সঙ্গে হওয়াই উত্তম। শাফেয়ী ওলামায়ে কেরাম বলেন, রোগী দেখার জন্য অজু করা সুন্নত নয়। কিন্তু হাদীসটি তাদের বিপক্ষে দলিল। ইবনে হাজার (র.) এমনটিই বলেছেন। -[মেরকাত]

خَرِيْف : শব্দটি মূলত একটি মৌসুমের নাম। কিন্তু এ শব্দ বলে বছরকে বুঝানো হতো। কেননা আরবের লোকেরা এ মৌসুমে তাদের ফসল ও ফল কাটত, যার ফলে এর দ্বারা বছর গণনা হতো। পরে হযরত ওমর (রা.) হিজরি সনের প্রবর্তন করলে এর বিলুপ্তি ঘটে। -[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٦٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا فَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ اِلَّا شُفِيَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ قَدْ حَضَرَ اَجَلُهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৪৬৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি অপর মুসলমান রোগীকে দেখতে গিয়ে এ দোয়াটি সাতবার পড়ে- أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ 'আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যিনি মহান আরশের রব, তিনি যেন তোমাকে সুস্থতা দান করেন।' তাহলে তার সুস্থতা লাভ হবে; যদি তার মৃত্যু এসে হাজির না হয়। -[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

وَعَنْ ١٤٦٨ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمّٰى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِّهَا اَنْ يَقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا يُعْرَفُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ وَهُوَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ .

১৪৬৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাদেরকে জ্বর ও অন্যান্য ব্যথার জন্যে নিম্নোক্ত দোয়াটি শিখাতেন, যেন তারা সে দোয়া বলে- بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ 'মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি, সকল রক্তপূর্ণ শিরার অনিষ্ট থেকে এবং দোজখের উত্তাপের অপকার থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই।' -[তিরমিযী।] তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি 'গরীব'। ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল (র.) ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি জানা যায়নি। আর হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাকে দুর্বল মনে করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : نَعَّارٌ অর্থ হচ্ছে- যা টগবগ করে। যেমন যখন রক্ত সবেগে বের হয়, তখন বলা হয়- نَعَرَ الْعِرْقُ بِنَعْرٍ। এ রক্ত থেকে পানাহ চাওয়ার কারণ হচ্ছে, রক্ত যখন এভাবে ফুলে উঠে তখন অবস্থা আর স্বাভাবিক থাকে না। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, نَعَرَ الْعِرْقُ بِالدَّمِ বলা হয় যখন তা ফুলে উঠে, এমনিভাবে যখন তা সশব্দে বের হয়। -[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٦٩ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اشْتَكٰى مِنْكُمْ شَيْئًا اَوْ اِشْتَكَاهُ اَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ اِغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ فَيَبْرَأُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৪৬৯. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোনো ব্যথা অনুভব করে বা তার কোনো মুসলমান ভাই তার কাছে ব্যথার কথা বলে, তাহলে সে যেন এ দোয়াটি পড়ে– رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ اِغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ. 'আমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানে আছেন। তোমার নাম পবিত্র। তোমার আদেশ আকাশ ও জমিনে প্রযোজ্য। যেমনিভাবে আসমানে তোমার রহমত পরিব্যাপ্ত তেমনিভাবে জমিনেও তুমি তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও। তুমি আমাদের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। তুমি ভালো মানুষের রব। তুমি তোমার রহমতের ভাণ্ডার থেকে বিশেষ রহমত নাজিল কর এবং এ ব্যথার প্রতি তোমার আরোগ্যসমূহ থেকে বিশেষ আরোগ্য দান কর।' এর দ্বারা সে রোগ দূর হয়ে যাবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : تَقَدَّسَ اِسْمُكَ অর্থাৎ তোমার নাম এমন সব বিষয় থেকে পবিত্র যা তোমার উপযুক্ত নয়। যখন নাম পবিত্র তখন তাঁর সত্তাতো অবশ্যই পবিত্র হবে।

اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, একথাটি এমন যেমনটি আল্লাহ তা'আলার বাণীতেও রয়েছে– وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا অর্থাৎ আসমানগুলোতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যেমন– ফেরেশতা, আলোকপ্রদ নক্ষত্ররাজি, এগুলোর প্রতি তাঁর আদেশ পাঠিয়েছেন। এরকমভাবে জমিনবাসীর উপরও। এসব হচ্ছে اَمْرُكَ দ্বারা উদ্দেশ্য।

كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ : مَا শব্দটি كَافَّةٌ যা বাক্যের উপর كَاف ব্যবহারের জন্য এসেছে। 'ফায়েক' গ্রন্থে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসমান-জমিন সর্বত্রই রয়েছে। কিন্তু রহমতের বিষয়টি এমন যা আসমানের জন্যই শোভনীয়, জমিনের জন্য নয়। কেননা আসমান হচ্ছে নিষ্পাপ-পবিত্র সত্তাসমূহের স্থান। ইবনে মালেক (র.) বলেন, এ কারণেই পরবর্তী বাক্যের শুরুতে فَاءُ جَزَائِيَّةٌ ব্যবহার করা হয়েছে। এর উহ্যরূপ এরকম যে, বিষয়টি যখন এমনই তখন আপনি জমিনেও আপনার রহমত অবতীর্ণ করুন। আর আমাদের বড়-ছোট, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

وَعَنْ ١٤٧٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا اَوْ يَمْشِىْ لَكَ اِلٰى جَنَازَةٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد)

১৪৭০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো রোগীকে দেখতে আসবে তখন সে যেন এ দোয়াটি পড়ে– اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا اَوْ يَمْشِىْ لَكَ اِلٰى جَنَازَةٍ 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে সুস্থতা দান কর, যাতে সে তোমার সন্তুষ্টির জন্য শত্রুর উপর আঘাত করতে পারে, অথবা তোমার সন্তুষ্টির জন্য জানাজার নামাজে শরিক হতে পারে।' –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে রোগীর জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে শত্রুকে আক্রমণ করা, অপরটি হচ্ছে জানাজার পিছনে চলা। এ দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার গূঢ় রহস্য হচ্ছে, প্রথমটি হলো আল্লাহর শত্রুর উপর আল্লাহর নির্দেশকে অবধারিত করা, আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর বন্ধুদের কাছে আল্লাহর অশেষ রহমতকে পৌঁছে দেওয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর বন্ধু ও শত্রু এ দুটি বিপরীত পক্ষকে তাদের উপযুক্ত প্রাপ্যের কথা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٧١ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمَيَّةَ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ وَعَنْ قَوْلِهِ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ فَقَالَتْ مَا سَأَلَنِىْ عَنْهَا اَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هٰذِهِ مُعَاتَبَةُ اللّٰهِ الْعَبْدَ بِمَا يُصِيْبُهُ مِنَ الْحُمّٰى وَالنَّكْبَةِ حَتّٰى الْبِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِىْ يَدِ قَمِيْصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتّٰى اَنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْاَحْمَرُ مِنَ الْكِيْرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৪৭১. অনুবাদ : হযরত আলী ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত উমাইয়্যা (র.) বলেছেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা.) -কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী– اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ 'তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন' এবং আল্লাহর বাণী– وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ 'যে খারাপ কাজ করবে তাকে তার বদলা দেওয়া হবে। এ দুটি বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করার পর থেকে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি। রাসূল ﷺ বলেছেন, এ দুই আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, বান্দা জ্বর ও আঘাত ইত্যাদির দ্বারা যে কষ্টে ভোগে সে শাস্তি। এমনকি বান্দা তার জামার পকেটে যে মাল রাখে, অতঃপর সে তা হারিয়ে ফেলে, যার ফলে সে অস্থির হয়ে যায়। এসবও তার সে শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বান্দা তার গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে বের হয়ে আসে যেমন লাল স্বর্ণের টুকরা হাপরের আগুন থেকে বের হয়ে আসে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : مُعَاتَبَةُ اللّٰهِ الْعَبْدَ -এর অর্থ হচ্ছে, বান্দা যেসব গুনাহ ও অপরাধ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর ধরাধরি হওয়া। মূলত عِتَابٌ বলা হয় দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু একে অপরকে কোনো অসদাচরণের কারণে তার প্রতি রাগ ও গোস্বা প্রকাশ করা, যদি বন্ধুর মনে বন্ধুর ভালোবাসা বহাল থাকে।

بِمَا يُصِيْبُهُ مِنَ الْحُمّٰى : বলে একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, আয়াতে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার এ অর্থ নয় যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের সকল গুনাহের জন্য কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে গুনাহের কারণে দুনিয়াতে তাদের ক্ষুধা, পিপাসা, অসুস্থতা, দুঃখ-ব্যথা ইত্যাদি দ্বারা গুনাহ থেকে পরিষ্কার করে পবিত্র অবস্থায় দুনিয়া থেকে তুলে নেবেন। এটাই তাদের শাস্তি। -[মেরকাত]

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বিষয়টি হচ্ছে, আয়াতে উল্লিখিত শাস্তি দ্বারা হযরত আয়েশা (রা.) বুঝিয়েছেন, আখিরাতের শাস্তি। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এটা আখিরাতের শাস্তি নয়; বরং দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের শাস্তি যা আল্লাহর রহমতেরই প্রকাশ।

وَعَنْ ١٤٧٢ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يُصِيْبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اَوْ دُوْنَهَا اِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُو اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَكْثَرُ وَقَرَأَ وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৪৭২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা যে কষ্ট ভোগ করে চাই সে কষ্ট আরো কঠিন বা আরো হালকা হোক তা কোনো গুনাহের কারণে হয়। আর আল্লাহ যা ক্ষমা করেছেন তা এর চেয়ে বেশি। এরপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন- وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ 'তোমাদের প্রতি যে বিপদ পৌঁছে তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন, আর আল্লাহ অনেক পরিমাণে ক্ষমা করে দেন।' -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের মধ্যে আয়াতের উল্লেখসহ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, একজন মু'মিন দুনিয়াতে মানসিক বা শারীরিক যত ধরনের কষ্ট ভোগ করে থাকে তা তার গুনাহের কারণে হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা তার গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু তার সকল গুনাহের কারণে আল্লাহ শাস্তি দেন বা দুনিয়াতে কষ্ট দেন- বিষয়টি এমনও নয়; বরং কৃত গুনাহের অনেকগুলোই ক্ষমা করে দেন। অল্প কিছুর শাস্তি দুনিয়াতে দিয়েছেন। ফলে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

وَعَنْ ١٤٧٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا كَانَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ اُكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ اِذَا كَانَ طَلِيْقًا حَتّٰى اُطْلِقَهُ اَوْ اَكْفِتَهُ اِلَيَّ .

১৪৭৩. **অনুবাদ** : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা যখন ইবাদতের বিষয়ে কোনো ভালো পদ্ধতির উপর থাকে এরপর সে অসুস্থ হয়ে যায়, তখন তার দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে বলা হয়, সে রোগমুক্ত থাকাবস্থায় যেসব আমল করত সে পরিমাণ আমল তার জন্য লিপিবদ্ধ কর, যতক্ষণ না আমি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দেই, অথবা আমি তাকে আমার কাছে ডেকে আনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : أُطْلِقَهُ : অর্থাৎ যতক্ষণ না আমি তার অসুস্থতার বন্ধন খুলে দেই। অর্থাৎ সুস্থ করে দেই।

اَكْفِتَهُ : অর্থ– কব্জা করে নেই, গ্রহণ করে নেই।

'নেহায়া' গ্রন্থে রয়েছে, আমি তাকে কবরের দিকে টেনে নিয়ে আসব। এ অর্থেই জমিনকে كِفَاتٌ বলা হয়।

কেউ বলেছেন, اَلْكَفْتُ অর্থ হচ্ছে– মিলানো ও একত্র করা। এখানে ব্যাপক অর্থে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ١٤٧٤ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ابْتَلَى الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِىْ جَسَدِهٖ، قِيْلَ لِلْمَلَكِ اَكْتُبْ لَهٗ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ فَاِنْ شَفَاهُ غَسَّلَهٗ وَطَهَّرَهٗ، وَاِنْ قَبَضَهٗ غَفَرَ لَهٗ وَرَحِمَهٗ. (رَوَاهُمَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

১৪৭৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমান যখন কোনো শারীরিক মসিবতে আক্রান্ত হয়, তখন ফেরেশতাকে বলা হয়, সে যেসব নেককাজ করত সেগুলো তার জন্য লিখতে থাক। এরপর আল্লাহ যদি তাকে সুস্থতা দান করেন তাহলে তাকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে দেন, আর যদি তাকে মৃত্যু দিয়ে উঠিয়ে নেন তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি দয়া করেন।

وَعَنْ ١٤٧٥ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِىْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ)

১৪৭৫. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আতীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত আরো সাত প্রকার শহীদ রয়েছে– ১. মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ ২. ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ ৩. যাতুলু জানব [বগলের নিচের গরমের ফোড়া] রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ ৪. পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ ৫. আগুনে পুড়ে যাওয়া ব্যক্তি শহীদ ৬. চাপা পড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ এবং ৭. স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবকালে মারা গেলে শহীদ।

–[মালেক, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٤٧٦ سَعْدٍ (رض) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلٰى حَسْبِ دِيْنِهٖ فَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ صُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاءُهٗ وَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهٖ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذٰلِكَ حَتّٰى يَمْشِىْ عَلٰى اَرْضٍ مَا لَهٗ ذَنْبٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

১৪৭৬. অনুবাদ : হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি মসিবতে ভোগে? তিনি বলেছেন, আম্বিয়া কেরাম, তাঁদের পর যারা সর্বোত্তম এবং তাঁদের পর যারা সর্বোত্তম মানুষ। মানুষ তার দীনদারির অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দীনের বিষয়ে বজ্রকঠিন হয় তাহলে তার মসিবতও কঠিন হয়। আর যদি সে তার দীনের বিষয়ে শিথিল হয় তাহলে তার বিপদ সহজ করে দেওয়া হয়। সে এভাবেই বিপদগ্রস্ত হতে থাকে যে, এক সময় সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে অথচ তার কোনো গুনাহ নেই। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আম্বিয়ায়ে কেরাম সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হন। এর কারণ হচ্ছে, তারা এসব মসিবত থেকে স্বাদ গ্রহণ করেন, যেমনিভাবে অন্যরা নিয়ামত পেয়ে স্বাদ গ্রহণ করে। এ ছাড়া তাঁরা যদি এভাবে বিপদগ্রস্ত না হতেন তাহলে তাঁদের ব্যাপারে এ ধারণা হতো যে, তাঁরা মা'বূদ। আর তাঁরা মসিবতের মুখোমুখি হওয়ার কারণে উম্মতের জন্য মসিবতে ধৈর্য ধরাটা সহজ হয়ে যায়। -[মেরকাত]

ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ : ইবনে মালেক (র.) বলেন, সবচেয়ে সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভ করবে, তার বিপদাপদ তত বেশি হবে, যাতে তার অধিক ছওয়াব অর্জিত হয়।

وَاِنْ كَانَ فِىْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ : এ সম্পর্কে ইবনে মালেক (র.) বলেন, দুর্বল মুসলমানদেরকে মসিবত কম দেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে তার ছওয়াব কম হয়। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তার প্রতি দয়া করেই তাকে কষ্ট কম দেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। দুর্বল ঈমানদারের ব্যাপারে যদি এ শিথিলতা না করা হয় তাহলে কঠিন মসিবতে পড়ে সে কাফের হয়ে যাওয়ারও সম্ভবনা আছে। -[মেরকাত]

তবে তার ছওয়াব যে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির চাইতে কম এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

وَعَنْ ١٤٧٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا اَغْبُطُ اَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِىْ رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

১৪৭৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর মৃত্যুর যে কষ্ট আমি দেখেছি, এরপর কারো সহজ মৃত্যুতে আমি ঈর্ষা করি না। -[তিরমিযী ও নাসায়ী]

وَعَنْهَا ١٤٧٨ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يَدْخِلُ يَدَهُ فِى الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৪৭৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে আমি মৃত্যুকালে দেখেছি, তাঁর পাশে পানি ভর্তি একটি বাটি ছিল। তিনি সে বাটিতে তাঁর হাত ডুবাতেন এবং স্বীয় চেহারা মুছতেন, এরপর বলতেন- اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ অথবা سَكَرَاتِ الْمَوْتِ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মৃত্যুর কষ্টের ক্ষেত্রে সাহায্য কর।' -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : চেহারা পানি দিয়ে মোছার একটি কারণ হতে পারে মৃত্যুর উত্তাপকে ঠাণ্ডা করা। আরেকটি কারণ হতে পারে মৃত্যুর কষ্টে যে বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায় তা দূর করা। অথবা এর দ্বারা তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাতের আগে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে চেয়েছেন। অথবা এর দ্বারা নিজের অক্ষমতা ও নিঃসঙ্গতা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। -[মেরকাত]

মৃত্যুর যন্ত্রণার ব্যাপারে সাহায্য চাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কষ্ট দূর করে দেওয়ার প্রার্থনা করা। مُنْكَرَاتُ الْمَوْتِ অর্থ হচ্ছে- মৃত্যুকালের অযাচিত কষ্ট। سَكَرَاتُ الْمَوْتِ -এরও একই অর্থ। অর্থাৎ মৃত্যুর কঠিন অবস্থাগুলো। শব্দটি سَكْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে- মৃত্যুর কষ্ট।

وَعَنْ ١٤٧٩ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِيَهِ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৪৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দার ব্যাপারে মঙ্গলের ফয়সালা করেন তখন তাকে আগেভাগেই দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দেন। আর যদি আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার ব্যাপারে অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন তখন তার গুনাহের শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে তার পূর্ণ শাস্তি দেবেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে, গুনাহের পর গুনাহ করে যাওয়ার পরও যদি কেউ উন্নতি করতেই থাকে এবং আল্লাহ তাকে কোনোভাবেই না ধরেন, তাহলে এটা ভালো কিছুর লক্ষণ নয়; বরং অক্ষরে অক্ষরে এর শাস্তি তাকে আখিরাতে পেতে হবে। তবে কাউকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিলে তা ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রেও একজন গুনাহগার বুক ফুলিয়ে চলার কোনো সুযোগ নেই।

وَعَنْهُ ١٤٨٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৪৮০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বড় বিনিময় হয় বড় মসিবতের দ্বারা। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে বিপদে পতিত করেন। অতঃপর যে এর উপর সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য অসন্তুষ্টি রয়েছে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** জেনে রাখা দরকার যে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি মনের দুটি অবস্থা, যা অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে কেউ কেউ ব্যথার কারণে বা অসুখের প্রবলতার কারণে মৃদু কান্নাকাটি করে, কিন্তু তার মন সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ থাকে এবং সব বিষয়কে সে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দেয়। সুতরাং তার এতটুকু আহাজারী অসন্তুষ্টির প্রমাণ হবে না। কেউ বলেছেন, এ হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বালামুসিবত নেমে আসাটা ভালোবাসার একটি আলামত। অতএব যে তা মেনে নেবে সে আল্লাহ তা'আলার হাকীকী বন্ধু হয়ে যাবে, আর যে মেনে নেবে না সে আল্লাহ তা'লার গোস্বায় নিপতিত হবে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার সন্তুষ্টির আগে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। আর এমনটি সম্ভব নয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির আগে বান্দার সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।' আর এটাও সম্ভব নয় যে, আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে কিন্তু বান্দার সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

وَعَنْ ١٤٨١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَ وَلَدِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ رَوٰى مَالِكٌ نَحْوَهٗ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

১৪৮১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন নর-নারীর উপর বিপদ সর্বাবস্থায় লেগেই থাকে। তার নিজের বেলায়, তার মাল-সম্পত্তির মাঝে এবং তার সন্তানসন্ততির মাঝে, এভাবে সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যখন তার কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।

–[তিরমিযী। ইমাম মালেক (র.)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।]

وَعَنْ ١٤٨٢ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهٖ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهٖ اَوْ فِىْ مَالِهٖ اَوْ فِىْ وَلَدِهٖ ثُمَّ صَبَّرَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِىْ سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১৪৮২. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে খালেদ সুলামী তাঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, বান্দার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি মর্যাদা ও সম্মান পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে যায়, যে মর্যাদায় বান্দা তার আমল দ্বারা পৌছতে পারে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার শরীর অথবা তার মালসম্পদ অথবা তার সন্তানসন্ততির দ্বারা বিপদে ফেলেন। অতঃপর তাকে সে বিপদে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে ঐ মর্যাদায় পৌছান যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগেই তার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।

–[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهٖ অর্থাৎ সে এমন আমল করতে অক্ষম যে আমল তাকে তার জন্য নির্ধারিত মাকামে পৌছাবে। হাদীসের এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, নেক আমল করার দ্বারা মু'মিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কেউ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করাটা আল্লাহর অনুগ্রহে হয়। আর বান্দার ঈমান ও চিরস্থায়ী বাসিন্দা হওয়াটা তার নিয়তের দ্বারা হয়।

وَعَنْ ١٤٨٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِخِّيْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَثَلُ ابْنِ اٰدَمَ وَاِلٰى جَنْبِهٖ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً اِنْ اَخْطَاتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِى الْهَرَمِ حَتّٰى يَمُوْتَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৪৮৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তানের উদাহরণ হচ্ছে যেন তার পাশে নিরানব্বইটি বিপদ বা মৃত্যু প্রস্তুত রয়েছে। সেগুলোর সবগুলো যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে সে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : مُثِّلَ শব্দটির উচ্চারণ দু-ধরনের হতে পারে। প্রথমত مِيْم হরফে পেশ দিয়ে ثَاء হরফকে তাশদীদযুক্ত করে যের দিয়ে মাজহুলের সীগাহ হিসেবে مُثِّلَ । কেউ বলেছেন, শব্দটি ثَاء ও مِيْم উভয় হরফে যবর দিয়ে مَثَل উদাহরণ অর্থে। তখন এটি হবে মুবতাদা।

اَلْمَنَايَا : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, শব্দটি مَنِيَّةٌ-এর বহুবচন, যার অর্থ– মৃত্যু। মৃত্যুকে مَنِيَّةٌ বলা হয়, তা নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে। এছাড়াও যে কোনো বিপদ ও বালামুসিবতকে مَنِيَّةٌ বলা হয়। কেননা এগুলো হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বাভাস। –[মেরকাত]

এসব বলামুসিবতের কোনো কষ্টও যদি তাকে না পায়, মৃত্যু কিন্তু তাকে পাবেই যা সকল মসিবতের কেন্দ্রবিন্দু।

وَعَنْ ١٤٨٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِيْنَ يُعْطٰى اَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِى الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৪৮৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সুস্থ ব্যক্তিরা যখন কিয়ামতের দিন দেখবে বিপদগ্রস্ত ও অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে ছওয়াব দেওয়া হচ্ছে তখন তারা কামনা করবে, আহ যদি দুনিয়াতে তাদের চামড়াগুলো কেঁচি দিয়ে কাটা হতো! –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : يَوَدُّ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, اَلْوُدُّ শব্দটি ভালোবাসার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আবার কোনো জিনিস নিজের হয়ে যাওয়ার কামনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য হাদীসে يَوَدُّ শব্দটি تَمَنّٰى বা কামনার অর্থে এসেছে। অর্থাৎ আক্ষেপ করে তারা কামনা করবে, যদি দুনিয়াতে আমাদের বিপদ হতো তাহলে আমরাও তাদের মতো এত এত ছওয়াব পেতাম।

وَعَنْ ١٤٨٥ عَامِرِ الرَّامِ (رض) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ عَافَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهٖ وَمَوْعِظَةً لَهٗ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَاِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَا مَرِضَ ثُمَّ اُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهٗ اَهْلُهٗ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلِمَ اَرْسَلُوْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْاَسْقَامُ وَاللّٰهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৪৮৫. অনুবাদ : হযরত আমের রাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি যখন রোগে আক্রান্ত হয়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান করেন, তখন তা তার অতীত গুনাহের জন্য কাফফারা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাস্বরূপ হয়। আর কোনো মুনাফিক ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়, অতঃপর সে সুস্থতা লাভ করে তখন তার অবস্থা হয় একটি উটের মতো যাকে তার মালিক বেঁধেছে এরপর আবার ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না তারা তাকে কেন বাঁধল, আবার কেনই বা ছেড়ে দিল। একথা শুনে এক লোক বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! রোগ-বালাই আবার কি? আল্লাহর কসম! আমি তো কখনো অসুস্থ হইনি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি আমাদের এখান থেকে উঠ যাও, তুমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নও। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَامِرُ الرَّامِ : اَلرَّام শব্দটি মূলত اَلرَّامِيْ ছিল, সহজকরণের জন্য يَاء ফেলে দেওয়া হয়েছে। اَلرَّام এ সহাবীর উপাধি ছিল, কারণ তিনি ভালো তীর মারতে পারতেন। –[মেরকাত]

আলোচ্য হাদীসে রোগ-বালাইকে অতীত গুনাহের জন্য কাফফারা বলার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য সতর্ককারীও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে যখন বুঝতে পারবে গুনাহের কারণেই এসব রোগ-বালাই এসে থাকে, সুতরাং সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

قُمْ عَنَّا : দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি এখান থেকে পলায়ন কর। কারণ তুমি আমাদের এ জামাতের সঙ্গে বসার উপযুক্ত নও। এ হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ লোকের প্রসঙ্গে বলেছেন– مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هٰذَا لَوْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ بِهِ خَيْرًا لَطَهَّرَ بِهِ جَسَدَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামি লোককে দেখতে চায় সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে। আল্লাহ যদি এ লোকের ব্যাপারে মঙ্গলের ইচ্ছা করতেন তাহলে রোগ-বালাই দিয়ে তার শরীর পবিত্র করে দিতেন। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٨٦ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِىْ اَجَلِهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيَطِيْبُ بِنَفْسِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ . وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৪৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোনো রোগীকে দেখতে তার ঘরে ঢুকবে তখন তাকে তার জীবন সম্পর্কে সান্ত্বনা দেবে, যদিও এ সান্ত্বনা তার জন্য নির্ধারিত কোনো কিছু পাল্টে দেবে না, কিন্তু এতে সে মনে স্বস্তি পাবে।

–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ١٤٨٧ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِىْ قَبْرِهِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৪৮৭. অনুবাদ : হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাকে তার পেটের ব্যথা হত্যা করেছে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে না। –[আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٤٨٨ اَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدِمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلَى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৪৮৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদি যুবক নবী করীম ﷺ -এর খেদমত করত। একদিন সে অসুস্থ হয়ে গেল, তখন নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার পাশে বসলেন এবং তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার পিতার দিকে তাকাল, আর তার পিতা তখন তার পাশেই ছিল। তার পিতা তাকে বলল, তুমি আবুল কাসেমের কথা গ্রহণ কর। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর নবী করীম ﷺ একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেছেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ 'সকল প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি তাকে আগুন থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।' –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইহুদি খাদেমের নাম ছিল আব্দুল কুদ্দূস। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো জিম্মি ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। 'খাযানা' গ্রন্থে রয়েছে, কোনো ইহুদি রোগীকে দেখতে যাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আগুনপূজারী ও ফাসেক ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে এতে কোনো সমস্যা নেই।

এ হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, রোগী দেখতে গেলে তার মাথার কাছে বসা হচ্ছে আদব ও উত্তম।

١٤٨٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادٰى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৪৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে যায় তাকে লক্ষ্য করে আসমান থেকে এক ফেরেশতা ডেকে বলে, ধন্য হয়েছ তুমি এবং ধন্য হয়েছে তোমার এ পথ চলা। তুমি জান্নাতে একটি ঘর বরাদ্দ করে নিলে। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসে مَنْزِلًا শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে مَنْزِلَةٌ অর্থাৎ মাকাম ও মর্যাদা। আর خَبَرٌ -এর শব্দগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দোয়া। অর্থাৎ তোমার এমন হোক।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, طَابَ مَمْشَاكَ দ্বারা আখিরাতের পথে চলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ খারাপ চরিত্র দূর করে প্রশংসনীয় চরিত্র গ্রহণ করে সজ্জিত হওয়ার জন্য দোয়া করা হয়েছে।

١٤٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ وَجْعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪৯০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে অসুস্থতায় ইন্তেকাল করেছিলেন, সে অসুখের সময় হযরত আলী (রা.) নবী করীম ﷺ কাছ থেকে বের হয়ে আসলে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থা কেমন হয়েছে? তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, ভালোই হয়ে গেছেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আলী (রা.) বলেছেন- أَصْبَحَ بَارِئًا 'তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন।' কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভালো হওয়ার কাছাকাছি হয়ে গেছেন, অথবা ভালো হয়ে যাবেন। এ ভালো আশাটুকু তিনি ধারণা করেছেন, অথবা অসুস্থ ব্যক্তি সাধারণত যেভাবে দীনি বিষয়ে বেখবর হয়ে যায় রাসূলে কারীম ﷺ এমন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। -[মেরকাত]

রোগী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সাধারণত এমন উত্তর দেওয়াই উচিত। তবে যদি কারো নিকট বাস্তব অবস্থা বলা জরুরি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। -[আ'যমী]

وَعَنْ ١٤٩١ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلَا اُرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ فَقَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لَا اَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪৯১. অনুবাদ : হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতি মহিলা দেখাব? আমি বললাম, অবশ্যই! তিনি বললেন, এ কালো মেয়েলোকটি। সে একবার নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে উলঙ্গ হয়ে যাই। অতএব আপনি একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। রাসূল ﷺ বললেন, যদি তুমি চাও ধৈর্য ধর, এর বদলায় তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে, আর যদি চাও আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেন। মেয়েলোকটি বলল, আমি ধৈর্য ধরব। এরপর আবার বলল, আমিতো উলঙ্গ হয়ে যাই, তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমি উলঙ্গ না হই। তখন রাসূল ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, কোনো কোনো বর্ণনা মতে ঐ মেয়েলোকটি হলেন সুয়াইরা (صُعَيْرَة), কোনো বর্ণনায় এসেছে শুক্বাইরা (شُقَيْرَةَ), কোনো বর্ণনায় এসেছে শুকাইরা (شُكَيْرَةَ)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মাশতায়ে খাদীজা (مَاشِطَةُ خَدِيْجَةَ)।

اِنِّىْ اُصْرَعُ : এখানে اُصْرَعُ শব্দটি مَجْهُوْل-এর সীগাহ। আল্লামা আবহারী (র.) বলেন, اَلصَّرْعُ হচ্ছে এমন একটি রোগ যা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে ক্রিয়াশীল থাকতে বাধা দেয়, তবে বাধাটা অসম্পূর্ণ হয়। এর কারণ হচ্ছে, কিছু জমাট ও ভারী হাওয়া যা ব্রেইনের বিভিন্ন গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। অথবা লাগাতার জ্বর যা কোনো অঙ্গের মাধ্যমে দেমাগে পৌঁছে যায়, ফলে এ রোগ দেখা দেয়। এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো খিঁচে আসে, ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বরং পড়ে যায়। অধিকাংশ ডাক্তারগণ এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে। −[মেরকাত]

এ হাদীস থেকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, রোগের চিকিৎসা না করে তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থেকে বালামুসিবতের উপর ধৈর্য ধরে থাকা জায়েজ আছে; বরং এদিকটাই স্পষ্ট যে, সুস্থ থাকার চেয়ে অসুস্থতার সঙ্গে থাকাটাই উত্তম। তবে বিশেষ কিছু লোকের ক্ষেত্রে সুস্থ থাকাটাই উত্তম যখন তার সুস্থতা দ্বারা সাধারণ মুসলমান উপকৃত হবে। −[মেরকাত]

উল্লেখ্য অন্যান্য হাদীস দ্বারা রোগের চিকিৎসা করা সুন্নত এবং শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত বিষয় হিসেবে প্রমাণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন− تَدَاوَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ الْهَرَمِ অর্থাৎ 'তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর, কেননা আল্লাহ তা'আলা যে অসুখই দিয়েছেন তার জন্য ঔষধও দিয়েছেন, শুধুমাত্র বার্ধক্য রোগ ব্যতীত।' এছাড়া চিকিৎসা তাওয়াক্কুল পরিপন্থি কোনো বিষয় নয়। কেননা এর দ্বারা স্রষ্টার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে উপকার গ্রহণ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রাসূলে কারীম ﷺ চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, অথচ তিনি হচ্ছেন তাওয়াক্কুলকারী জামাতের সরদার।

এরপরও বলা যায়, আল্লাহর উপর ভরসার কারণে চিকিৎসা গ্রহণ না করার মাঝে এক ধরনের ফজিলতের বিষয় রয়েছে। যেমনিভাবে হযরত আবূ বকর (রা.) এমনটি করেছিলেন।

وَعَنْ ١٤٩٢ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ هَنِيْئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلْ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْحَكَ مَا يُدْرِيْكَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ فَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً)

১৪৯২. অনুবাদ : হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক ব্যক্তি মারা গেলে এক লোক বলে উঠল- সে বড় খোশ কিসমত, কোনো রোগে ভোগা ছাড়াই সে মারা গেল। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আহা! তুমি কি জান? যদি আল্লাহ তাকে কোনো রোগে আক্রান্ত করতেন তাহলে তার দ্বারা তার গুনাহগুলো মাফ করে দিতেন।

-[ইমাম মালেক (র.) এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ١٤٩٣ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيِّ (رضـ) اَنَّهُمَا دَخَلَا عَلٰى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُوْدَانِهِ فَقَالَا لَهُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ قَالَ اَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ قَالَ شَدَّادٌ اَبْشِرْ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اِذَا اَنَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِيْ عَلٰى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَاِنَّهُ يَقُوْمُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهُ فَاَجْرُوْا لَهُ مَا كُنْتُمْ تَجْرُوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৪৯৩. অনুবাদ : হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস ও সুনাবেহী (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা দুজন এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্যে তার ঘরে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন বোধ করছেন? রোগী বললেন, আল্লাহর নিয়ামতের সঙ্গে আছি। হযরত শাদ্দাদ (রা.) বলেন, আপনি গুনাহসমূহের ক্ষমা এবং অপরাধসমূহ মার্জনার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমি আমার কোনো মু'মিন বান্দাকে রোগে পতিত করি, অতঃপর আমি তাকে রোগাক্রান্ত করার কারণে সে প্রশংসা করে, ফলে সে যখন তার রোগশয্যা থেকে উঠে তখন সে তার গুনাহসমূহ থেকে ঐ দিনের মতো পাক-সাফ হয়ে উঠে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে বন্দী করেছি এবং তাকে রোগাক্রান্ত করেছি, অতএব তোমরা তার সুস্থতার সময় তার যা লিখতে তাই লিখতে থাক। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا : আযহারী (র.) বলেন, এ হাদীসের বাহ্যিক দিক থেকে বুঝা যায়, রোগী যখন তার রোগের জন্যে শুকরিয়া আদায় করে তখন তার সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ ক্ষমাকে সগীরা গুনাহের সঙ্গে খাস করেছেন রাসূলে কারীম ﷺ -এর অন্য আরেকটি হাদীসের ভিত্তিতে। সেই হাদীসে রয়েছে- كَفَّارَةٌ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ অর্থাৎ 'কাফফারা হবে যখন সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।' অতএব মুতলাক হাদীসগুলোকে কয়েদযুক্ত হাদীসের আলোকেই ব্যাখ্যা করা হবে। -[মেরকাত]

وَعَنْ ١٤٩٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللّٰهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৪৯৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দার গুনাহ যখন বেশি হয়ে যায় এবং সেগুলোকে মুছে দেওয়ার মতো কোনো আমল তার কাছে না থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মুছে দেওয়ার জন্য তাকে চিন্তার বিপদে ফেলে দেন। অর্থাৎ চিন্তার বিভিন্ন কারণ স্পষ্ট করে দেন। −[আহমদ]

وَعَنْ ١٤٩٥ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ الرَّحْمَةَ حَتّٰى يَجْلِسَ فَاِذَا جَلَسَ اِغْتَمَسَ فِيْهَا . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ)

১৪৯৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যায় সে বরাবর রহমতের সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে। আর যখন রোগীর কাছে গিয়ে বসে তখন যেন সে রহমতের সাগরে ডুব দিল। −[মালেক ও আহমদ]

وَعَنْ ١٤٩٦ ثَوْبَانَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَصَابَ اَحَدَكُمُ الْحُمّٰى فَاِنَّ الْحُمّٰى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ فِىْ نَهْرٍ جَارٍ وَلْيَسْتَقْبِلْ جَرْيَتَهُ فَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلْيَغْمِسْ فِيْهِ ثَلٰثَ غَمَسَاتٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِىْ ثَلَاثٍ فَخَمْسٌ فَاِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِىْ خَمْسٍ فَسَبْعٌ فَاِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِىْ سَبْعٍ فَتِسْعٌ فَاِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِاِذْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৪৯৬. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো জ্বর হয়, তাহলে জেনে রেখ এটা আগুনের একটা অংশ, সুতরাং তা যেন পানি দ্বারা নিভানো হয়। সে যেন ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়ার আগে প্রবহমান নদীতে গিয়ে পড়ে এবং যেদিক থেকে স্রোত আসে সেদিকে মুখ করে এবং এ দোয়া পড়ে− بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُوْلَكَ 'হে আল্লাহ! তোমার নামে বলছি বান্দাকে আরোগ্য দান কর এবং তোমার রাসূলকে সত্যবাদী প্রমাণ কর।' এরপর সে পানিতে তিনদিন পর্যন্ত তিনটি করে ডুব দেবে। তিনদিনে যদি জ্বর না সারে তাহলে পাঁচদিন, যদি পাঁচদিনে না সারে তাহলে সাতদিন, যদি সাতদিনে না সারে তাহলে নয়দিন। কেননা আশা করি আল্লাহর রহমত নয়দিনকে অতিক্রম করবে না।

−[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তাহলে রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত জ্বরের এ চিকিৎসা বিশেষ কোনো প্রকারের জন্যে হবে, যা বিশেষ সময়ে বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। সব জায়গায় সব ধরনের জ্বর ও সকল ব্যক্তির জন্যে নয়। আমার এক আত্মীয়কে দেখেছি, প্রবল জ্বরে সে পেট ভরে কাঁঠাল খেলে তার জ্বর ভালো হয়ে যেত। ব্যক্তিবিশেষে সময়ের ব্যবধানে এসব ব্যাপারে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে যেতে পারে। -[আ'যমী]

وَعَنْ ١٤٩٧ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ ذُكِرَتِ الْحُمّٰى عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِى الذُّنُوْبَ كَمَا تَنْفِى النَّارُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৪৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে জ্বর বিষয়ে আলোচনা করা হলো, তখন এক ব্যক্তি জ্বরকে গালি দিল। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ বললেন, জ্বরকে গালি দিয়ো না। কেননা তা গুনাহসমূহকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেভাবে আগুন লোহার সমস্ত মরিচা দূর করে দেয়। -[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْهُ ١٤٩٨ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ مَرِيْضًا فَقَالَ اَبْشِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ هِىَ نَارِىْ اُسَلِّطُهَا عَلٰى عَبْدِىَ الْمُؤْمِنِ فِى الدُّنْيَا لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৪৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রোগীকে দেখতে গিয়ে বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, জ্বর হচ্ছে আমার আগুন, দুনিয়াতে আমি তা আমার মু'মিন বান্দার উপর পাঠাই, যাতে কিয়ামতের দিন তা তার দোজখের আগুনের বদলা হয়ে যায়।

-[আহমাদ ও ইবনে মাজাহ। ইমাম বায়হাকী (র.) এ হাদীসটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে نَارٌ [আগুন] শব্দটিকে আল্লাহ তা'আলা নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে نَارِىْ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আগুন আসলে শাস্তি হিসেবে নয়, বরং তা তাঁর দয়া ও স্নেহেরই বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সেই জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে عَبْدِىْ 'আমার বান্দা' বলেছেন এবং তাকে মু'মিন গুণে গুণান্বিত করেছেন।

حَظَّهُ مِنَ النَّارِ : এর একটি অর্থ হতে পারে– সে যেসব গুনাহ করেছে সেসব গুনাহের যে নির্ধারিত শাস্তি রাখা হয়েছে তা। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে, প্রত্যেক বান্দার জন্য জাহান্নামের যে অংশটুকু বরাদ্দ করা হয়েছে তা। যা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে বিবৃত হয়েছে– وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ 'তোমরা প্রত্যেকেই তাতে অবতরণ করবে।'

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রথম ব্যাখ্যাটিই স্পষ্ট। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই বেশি স্পষ্ট। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সমর্থিত হয় আল্লাহ তা'আলার আয়াত وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا -এর যে তাফসীর হযরত মুজাহিদ (র.) করেছেন তার দ্বারা। তিনি বলেন, اَلْحُمّٰى فِى الدُّنْيَا حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْوُرُوْدِ فِى الْاٰخِرَةِ 'আখিরাতে জাহান্নামে পতিত হওয়ার বিষয়টি মু'মিনের ক্ষেত্রে দুনিয়াতে তার জ্বর হওয়ার দ্বারা হয়ে থাকে।' তবে একথা সর্বজন বিদিত যে, গুনাহ বেশি হওয়ার কারণে বা গুনাহ কবীরা হওয়ার কারণে সে গুনাহগুলো জ্বরের কারণে ক্ষমা হবে না। সেগুলোর কারণে একজন মু'মিনকেও দোজখে যেতে হতে পারে।

وَعَنْ ١٤٩٩ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا اُخْرِجُ اَحَدًا مِنَ الدُّنْيَا اُرِيْدُ اَغْفِرُ لَهٗ حَتّٰى اَسْتَوْفِىَ كُلَّ خَطِيْئَةٍ فِىْ عُنُقِهٖ بِسُقْمٍ فِىْ بَدَنِهٖ وَاِقْتَارٍ فِىْ رِزْقِهٖ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

১৪৯৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পরওয়ারদেগার সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, আমার মহিমা ও প্রতাপের কসম! আমি দুনিয়া থেকে কাউকে বের করে নেব না যাকে আমি ক্ষমা করার ইচ্ছা রাখি, যতক্ষণ না আমি তার গর্দান থেকে তার সবগুলো গুনাহ্ তার শরীরের প্রত্যেকটি রোগ অথবা রিজিকের স্বল্পতা দ্বারা বিনিময় করে নেই। –[রাযীন]

وَعَنْ ١٥٠٠ شَقِيْقٍ قَالَ مَرِضَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) فَعُدْنَاهُ فَجَعَلَ يَبْكِىْ فَعُوْتِبَ فَقَالَ اِنِّىْ لَا اَبْكِىْ لِاَجْلِ الْمَرَضِ لِاَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَرَضُ كَفَّارَةٌ وَاِنَّمَا اَبْكِىْ اَنَّهٗ اَصَابَنِىْ عَلٰى حَالِ فَتْرَةٍ وَلَمْ يُصِبْنِىْ فِىْ حَالِ اجْتِهَادٍ لِاَنَّهٗ يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْاَجْرِ اِذَا مَرِضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهٗ قَبْلَ اَنْ يَمْرَضَ فَمَنَعَهٗ مِنْهُ الْمَرَضُ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

১৫০০. অনুবাদ : হযরত শাকীক (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি কাঁদতে লাগলেন। কান্নার কারণে কেউ তাঁকে ভর্ৎসনা করল। তখন তিনি বললেন, আমি আমার অসুস্থতার কারণে কাঁদছি না। কেননা আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, রোগ হলো গুনাহের কাফফারা। আমি বরং এজন্য কাঁদছি– এ রোগ আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ধরেছে, আমার শক্তির যুগে ধরেনি। কেননা বান্দা যখন রোগাক্রান্ত হয় তার জন্যে সেই ছওয়াব লেখা হয় যা তার রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে তার জন্যে লেখা হতো এবং এখন রোগে তাকে সে আমল থেকে বাধা দিয়েছে। –[রযীন]

وَعَنْ ١٥٠١ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَعُوْدُ مَرِيْضًا اِلَّا بَعْدَ ثَلٰثٍ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৫০১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তিনদিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগে কাউকে দেখতে যেতেন না। –[ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে তা বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** ইমাম আবূ হাতেম রাযী (র.) হাদীসটিকে মাওযূ' বা বাতিল বলেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী মাসলামা ইবনে আলী মাসরুক যিনি সর্বজন বর্জিত। সুতরাং রোগের প্রথম অবস্থায়ও রোগীকে দেখতে যাওয়া যায়; বরং কলেরা রোগীতো তিনদিন টিকেও না। –[আ'যমী]

وَعَنْ ١٥٠٢ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ يَدْعُوْ لَكَ فَاِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৫০২. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যখন কোনো রোগীকে দেখতে যাবে তুমি তাকে তোমার জন্যে দোয়া করতে বল। কেননা তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রোগীর কাছে দোয়া চাইতে বলা এবং তার দোয়ার এত মর্যাদার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, রোগী তার রোগের কারণে গুনাহমুক্ত হয়ে গেছে, ফলে নিষ্পাপ ব্যক্তির দোয়া আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হতে কোনো বাধা নেই।

আর রোগীর দোয়াকে ফেরেশতার দোয়ার সঙ্গে তুলনা করে রোগীকে ফেরেশতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। হয়তো সে গুনাহমুক্ত হওয়ার কারণে, অথবা সার্বক্ষণিক দোয়া ও জিকিরের সঙ্গে থাকার কারণে, অথবা সে সর্বদা আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থী হয়ে থাকার কারণে। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٠٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيْفُ الْجُلُوْسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبِ فِى الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ قُوْمُوْا عَنِّىْ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

১৫০৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোগী দেখার সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, রোগীর পাশে অল্পক্ষণ বসা এবং সেখানে শোরগোল না করা। এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখন লোকদের শোরগোল ও মতভেদ বেশি হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, আমার কাছ থেকে উঠে যাও। –[রযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قِلَّةُ الصَّخَبِ : صَخَبٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– আওয়াজ বড় করা। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, ঝগড়া-বিতর্কে মেতে উঠা এমনিতেই নিষিদ্ধ, বিশেষত তা যখন কোনো রোগীর কাছে হবে। সুতরাং এখানে قِلَّةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– একদম না করা।

لَغَطٌ : শব্দের অর্থ হচ্ছে– এমন আওয়াজ ও শোরগোল যার কোনো অর্থ বোঝা যায় না। –[নেহায়া]

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের সময়ের। –[মেরকাত]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ যখন মৃত্যুর দুয়ারে হাজির, তখন ঘরে অনেক লোক ছিল যাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-ও ছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– هَلُمُّوْا اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ অর্থাৎ 'তোমরা এস, আমি তোমাদেরকে একটি লেখা লিখে দেব, এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।' তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, এক বর্ণনায় আছে– উপস্থিতদের কেউ বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতার কষ্ট খুবই প্রবল। তোমাদের কাছে তো কুরআন রয়েছেই, আল্লাহর কিতাবই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। এরপর লোকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হলো এবং তারা তর্কে জড়িয়ে পড়ল। কেউ বলল, রাসূলে কারীম ﷺ -কে কাগজ কলম এনে দাও, তিনি তোমাদের জন্য লিখে দেবেন। আবার কেউ বলল এর বিপরীত। এভাবে তারা যখন খুব বেশি শোরগোল করতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– قُوْمُوْا عَنِّىْ 'তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও।'

বিষয়টি যেন এমন হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ যখন লিখে দিতে চাইলেন কিন্তু সে বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়ে গেল। তখন তিনি না লেখাকেই মঙ্গলজনক মনে করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি আর তা লেখেননি। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ যদি একটা কিছু লিখে দেবেন বলে সংকল্প করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে সামান্য বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই, চাই সে ওমর হোক বা অন্য কেউ হোক। এছাড়া তিনি এ ঘটনার পর প্রায় তিন দিনের মতো বেঁচে ছিলেন। তাঁর সামনে হযরত হযরত ওমরও ছিল না অন্য কেউও ছিল না; বরং আহলে বাইতের লোকেরাই ছিলেন, যেমন– হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.)। যদি রাসূলে কারীম ﷺ খেলাফত সম্পর্কে কোনো কিছু লিখে দেওয়াকেই মঙ্গলজনক মনে করতেন, তাহলে এ সময়ে তা লিখে দিতেন। অতএব এ ঘটনাকে কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে প্রোপাগাণ্ডা ছাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। অন্যত্র এ বিষয়টির আরো বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٠٤ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِيَادَةُ فُوَاقُ نَاقَةٍ وَفِىْ رِوَايَةِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا اَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৫০৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রোগীকে দেখা হচ্ছে স্বল্পক্ষণ। আর হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.)-এর মুরসাল বর্ণনায় এসেছে, রোগী দেখার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া। –[ইমাম বায়হাকী (র.) তা শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فُوَاقٌ : শব্দটি فَاءٌ হরফে পেশ দিয়ে বা যবর দিয়ে। উট বা গাভীর দুধ দোহনের সময় কিছুক্ষণ দোহন করে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার দোহন করা হয়– ঐ বিরতির অংশটুকুকে فُوَاقٌ বলা হয় । সে বিরতিতে গরুর বাচ্চা দিয়ে দুধ জমা করা হয়। আর সে সময়টুকু খুবই সামান্য।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, রোগীকে দেখতে আসা ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কাজটি করবে তা হচ্ছে তাড়াহুড়া করে ফিরে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে কোনো আলেম বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত সারী আসসাকাতী (র.) -কে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমরা তাঁর কাছে দীর্ঘক্ষণ বসাছিলাম। তাঁর ছিল পেটে ব্যথা। এরপর আমরা তাঁকে বললাম, আমাদের জন্য দোয়া করুন তাহলে আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারি। তখন তিনি দোয়া করলেন– اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُمْ كَيْفَ يَعُوْدُوْنَ الْمَرْضٰى। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ কিভাবে ইয়াদত [রোগী পরিদর্শন] করতে হয় তাদেরকে তা শিখিয়ে দাও।'

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, এক লোক রোগী দেখতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে রোগী বলল, ঘরে মানুষ খুব বেশি আসার কারণে আমরা কষ্ট অনুভব করি। তখন লোকটি বলল, আমি গিয়ে কি দরজাটা বন্ধ করে দেব? রোগী বলল, জি, তবে বাহির থেকে।

এভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে বলা ব্যতীত কেউ কেউ সরাসরিও এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেমন এক ভারি অলস ব্যক্তি এক রোগীকে দেখতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসেছিল। এরপর সে রোগীকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন ধরনের কষ্ট অনুভব করছেন? রোগী বলল, আমার কাছে তোমার বসে থাকাটা।

হাদীস ও এসব ঘটনার প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই যে, কেউ রোগীকে দেখতে গেলে তার কাছে বেশিক্ষণ দেরি করবে না। কারণ যারা দেখতে যায় তারা সাধারণত একটু দৃঢ় সম্পর্কের লোক হয়, যাদের সামনে রোগী স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করতে পারে না। তাছাড়া রোগীর মন-মেজাজ থাকে খুবই দুর্বল, যার কারণে অযাচিত কিছু সে সহ্য করতে পারে না। তবে এ ক্ষেত্রে যার উপস্থিতি রোগীর জন্যে উপযোগী বা তার জন্য স্বস্তিদায়ক এবং বিষয়টি স্পষ্ট হয় সেক্ষেত্রে বেশিক্ষণ থাকতে সমস্যা নেই। –[মেরকাত]

একাধিক রোগীর ব্যাপারে আমার এ অভিজ্ঞতা আছে যে, সে আমাকে বলেছে, আপনি আমার কাছে বেশিক্ষণ থাকলে ভালো লাগে, তাই যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। একথাও তারা স্পষ্ট বলেছে যে, অনেকে মুসাফাহা ও খবরাখবর নেওয়ার পর কেন বসে থাকে বুঝি না। এতে খুব কষ্ট হয়। –[অনুবাদক]

وَعَنْ ١٥٠٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِي قَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৫০৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ এক রোগীকে দেখতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পছন্দ কর? সে বলল, আমি গমের রুটি চাই। নবী করীম ﷺ বললেন, যার কাছে গমের রুটি আছে সে যেন তার এ ভাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এরপর নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কোনো অসুস্থ ব্যক্তি কোনো কিছু খেতে চাইলে তাকে তা খাওয়াবে। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রোগের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন খানাই খাওয়ানোর কথা এ হাদীসে বলা হয়েছে। অথবা যে ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন সে যা চায় তাই তাকে খাওয়াতে বলা হয়েছে। অথবা যার তাওয়াক্কুল পূর্ণভাবে আছে তাকে যে কোনো খাবার দিতে সমস্যা নেই কখনো কখনো এমনও দেখা গেছে যে, রোগী যা খেতে চায় তাকে তা খাওয়ানোর দ্বারা সে সুস্থ হয়ে যায়। –[আ'যমী]

তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, রোগের কারণে সাধারণত রোগীর রুচি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে কিছু খেতে চায় না। তাই অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো, সে লক্ষ্য রাখবে রোগী কোন জিনিসটা খেতে চায়। কোন খাদ্য সে খেতে পারবে বলে মনে করে। সে বস্তু যোগাড় করা যদি কষ্টকর বা ব্যয়বহুলও হয় তবু রোগীর খাতিরে তা তাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত এবং এ বিষয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখা উচিত। –[অনুবাদক]

وَعَنْ ١٥٠٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلٰى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫০৬. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনার এক লোক মারা গেল যে মদিনাতেই জন্মগ্রহণ করেছিল। নবী করীম ﷺ তার জানাজার নামাজ পড়ালেন। অতঃপর বললেন, লোকটি যদি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও মারা যেত! সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তা কেন? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি যখন নিজের জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোথাও মারা যায়, তখন তার জন্যে জান্নাতে তার জন্মস্থান থেকে তার জীবনের শেষ পদক্ষেপ পর্যন্ত মাপা হয়। –[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে 'শেষ পদক্ষেপ পর্যন্ত মাপা হয়' -এর অর্থ হচ্ছে, ঐ পরিমাণ দূরত্বের ছওয়াব তাকে দেওয়া হবে। সুতরাং যে যতদূর গিয়ে মারা যাবে তাকে ততবেশি ছওয়াব দেওয়া হবে। অথবা ঐ পরিমাণ জায়গা তাকে জান্নাতে দেওয়া হবে। –[আ'যমী]

এর দ্বারা এও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, যে ব্যক্তি ভিনদেশে অসহায় অবস্থায় মারা যায়, তার এ অসহায়ত্বের কারণে তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। তার কবর থেকে তার বাড়ি পর্যন্ত এবং জান্নাত পর্যন্ত পথ খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার একাকিত্ব দূর হয়ে যায়। –[মেরকাতের আলোকে]

وَعَنْ ١٥٠٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৫০৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সফরের মৃত্যু শাহাদাত। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٥٠٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ مَرِيْضًا مَاتَ شَهِيْدًا اَوْ وُقِىَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِىَ وَرِيْحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৫০৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে অসুস্থ হয়ে মারা গেছে সে যেন শহীদ হিসেবে মারা গেছে । অথবা [বলেছেন,] তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাকে বেহেশতের রিজিক দেওয়া হবে।

-[ইবনে মাজাহ, ইমাম বায়হাকী (র.) তা শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীসে বলা হয়েছে 'রুগ্ণ অবস্থায় মারা গেছে' মূলত এখানে مَرِيْض শব্দ উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ অসুস্থ। কিন্তু সুনানে ইবনে মাজার বিশুদ্ধ কপিতে مُرَابِط শব্দ রয়েছে, যার অর্থ মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষাকারী বা পাহারাদার। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত রেখে মারা গেছে সে শহীদ হয়ে মারা গেছে। -[আ'যমী]

এ হাদীসের সনদ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে মোল্লা আলী কারী (র.)-এর মেরকাত কিতাবে।

وَعَنْ ١٥٠٩ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلٰى فُرُشِهِمْ اِلٰى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِى الَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُوْنِ فَيَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ اِخْوَانُنَا قُتِلُوْا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُوْلُ الْمُتَوَفَّوْنَ اِخْوَانُنَا مَاتُوْا عَلٰى فُرُشِهِمْ كَمَا مِتْنَا فَيَقُوْلُ رَبُّنَا اُنْظُرُوْا اِلٰى جِرَاحَتِهِمْ فَاِنْ اَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُوْلِيْنَ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَ مَعَهُمْ فَاِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ اَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ)

১৫০৯. অনুবাদ : হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যুদ্ধে শহীদগণ ও ঘরে বিছানায় মৃত ব্যক্তিগণ মহামারীতে মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের পরওয়ারদেগারের নিকট দাবি পেশ করবে। শহীদগণ বলবে, এরা আমাদের ভাই। ওরা ঐ ভাবেই নিহত হয়েছে যেভাবে আমরা নিহত হয়েছি। আর সাধারণ মৃত ব্যক্তিরা বলবে, এরা আমাদের ভাই। এরা তাদের বিছানায় উপর মারা গেছে যেভাবে আমরা মারা গেছি। তখন আমাদের প্রতিপালক বলবেন, তোমরা এদের ঘা ও ক্ষতগুলো দেখ। যদি তাদের ক্ষতগুলো শহীদদের ক্ষতের মতো হয় তাহলে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা তাদের সঙ্গে থাকবে। পরে দেখা যাবে যে, তাদের ক্ষতগুলো শহীদদের ঘা ও ক্ষতের মতো। -[আহমদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٥١٠ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُوْنِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فِيْهِ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৫১০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহামারী থেকে পলায়নকারী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নকারীর মতো। আর তার উপর সবরকারী ব্যক্তির জন্যে শহীদদের ছওয়াব রয়েছে। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মহামারীপীড়িত এলাকা থেকে ভেগে যাওয়াকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেগে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেউ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ভেগে যাওয়ার দ্বারা তার শাহাদাতের মর্যাদা বাতিল হয়ে গেল। এ অর্থ নয় যে, এটা কোনো কবীরা গুনাহ। কিন্তু আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে কবীরা গুনাহ হওয়া হিসেবেই তুলনা করা হয়েছে।

اَلزَّحْفُ : হচ্ছে বিশাল লশকর, বাহিনী। মানুষের অধিক্যের কারণে যেন তা হামাগুড়ি দিয়ে চলছে বা শিশু যেভাবে নিতম্বের উপর ধীরে ধীরে চলে সেভাবে চলছে। মাসদারের দ্বারাই এর নাম রাখা হয়েছে। -[মেরকাত]

بَابُ تَمَنِّى الْمَوْتِ وَذِكْرِهِ

পরিচ্ছেদ : মৃত্যু কামনা ও তার স্মরন

এ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু দুটি– ১. মৃত্যু কামনা করা ও ২. মৃত্যুকে স্মরণ করা।

মৃত্যু কামনা দুই কারণে হতে পারে–

১. হয়তো কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত দুনিয়াত্যাগী ও আল্লাহর সাক্ষাতের অভিলাষী হলে সে মৃত্যুকে কামনা করে। তবে এর সংখ্যা নিতান্তই কম। বরং এভাবে বলা যায় যে, মৃত্যুকে কেউ কামনা করে এমন নয়, বরং বেঁচে থাকার প্রতি তাদের বিশেষ কোনো লোভ থাকে না এবং মরে যাওয়াকে তারা তাদের জন্যে ক্ষতির কিছু মনে করে না; বরং লাভের মনে করে।

২. আরেক ধরনের লোক মৃত্যুকে কামনা করে কোনো শারীরিক বা মানসিক কষ্টের চাপে। এ কামনা সাধারণত খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। পরক্ষণেই সে বুঝতে পারে তার এ কামনা ভুল। শরিয়তের দৃষ্টিতে এসব কারণে মৃত্যুকে কামনা করা নিষেধ। আর প্রথম কারণেও শরিয়তে মৃত্যু কামনা করতে উৎসাহিত করেনি। এ বিষয়ের হাদীসই এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ পরিচ্ছেদের আরেকটি বিষয় হচ্ছে মৃত্যুকে স্মরণ করা অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করার কি কি ফজিলত ও ফায়দা রয়েছে সে সম্পর্কিত হাদীস এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১৫১১ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَسْتَعْتِبَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৫১১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা হয়তো সে নেককার হবে ফলে সে আরো বেশি নেকি কামাই করবে। আবার সে বদকার হবে ফলে সে হয়তো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا يَتَمَنّٰى : শব্দটি খবরের সীগাহ দ্বারা হলেও এর অর্থ হচ্ছে– নিষেধ। অর্থাৎ কেউ যেন এমন কামনা না করে। আর نَفْىٌ -এর সীগাহ ব্যবহার করে এর দ্বারা نَهْىٌ উদ্দেশ্য নেওয়ার মাঝে একটা শক্তি রয়েছে। আর তা এভাবে যে, একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার মাঝে এ দোষটি থাকবে না এবং কখনো তার মাঝে এটা পাওয়া যাবে না। অথবা এ হিসেবে যে, যখন মৃত্যুর কামনা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তখন মু'মিনই তা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। ফলে তার এ অবস্থাকে نَفْىٌ অর্থাৎ খবরের শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেছেন, এ শব্দটিকে খবর হিসেবে তার আপন অর্থে নেওয়াটাই বেশি উত্তম। তাদের একথা সহীহ নয়। কেননা এর দ্বারা অতীতের কোনো খবর দিচ্ছেন বলে সন্দেহ হবে। কারণ মৃত্যুর কামনা করেছে, করেনি এমন অনেক পাওয়া যায়। তাছাড়া এ শব্দটিকে যদি শুধুমাত্র খবরের অর্থে নেওয়া হয় তাহলে ওলামায়ে কেরাম যে মৃত্যুর কামনাকে মাকরূহ বলেন এবং সেক্ষেত্রে এ হাদীস দিয়ে দলিল দেন, তাদের এ দলিল দেওয়া সহীহ হবে না।

اِمَّا مُحْسِنًا الخ : দ্বারা বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করছে সে যদি নেককার হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে সে যতবেশি বেঁচে থাকবে ততবেশি নেক আমল করে নেকির পাল্লা ভারী করবে। যেমন অন্য এক হাদীসে এসেছে– طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ অর্থাৎ 'সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যার হায়াত দীর্ঘ হয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে।' অন্য আরেক হাদীসে রয়েছে– خِيَارُكُمْ اَطْوَلُكُمْ اَعْمَارًا وَاَحْسَنُكُمْ اَعْمَالًا অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম ব্যক্তি, যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত এবং আমলের দিক থেকে উত্তম।'

আর যদি সে ব্যক্তি গুনাহগার হয়ে থাকে তাহলে তার বেঁচে থাকাটা তার তওবার অসিলা হতে পারে। অর্থাৎ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইবে তওবার মাধ্যমে। রাজী (র.) বলেন, اَلْاِسْتِعْتَابُ অর্থ হচ্ছে عَتَبٌ চাওয়া। عَتَبٌ অর্থ হচ্ছে– সন্তুষ্ট করাতে চাওয়া। কেউ বলেছেন, اِسْتِعْتَابٌ অর্থ হচ্ছে– اِرْضَاءٌ

وَعَنْهُ ١٥١٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهٗ اَنَّهٗ اِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ اَمَلُهٗ وَاِنَّهٗ لَا يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهٗ اِلَّا خَيْرًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫১২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং তার আসার আগে তাকে ডেকে না আনে। কেননা সে যখন মারা যাবে তখন তার আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাবে। আর মু'মিনের হায়াত তো শুধুমাত্র তার কল্যাণকেই বৃদ্ধি করে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٥١٣ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهٗ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫১৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো কষ্টের কারণে মৃত্যুকে কামনা না করে। অগত্যা যদি তাকে কিছু করতেই হয় তাহলে যেন সে একথা বলে, হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত আমার জন্যে কল্যাণকর ততদিন পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখ। আর মৃত্যু যখন আমার জন্যে কল্যাণকর হবে তখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا الخ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিস্থিতির শিকার হয়ে কেউ যেদি মৃত্যু কামনা করতে চায়-ই, তাহলেও সে সরাসরি মৃত্যুকে কামনা না করে বিষয়টিকে আল্লাহর সোপর্দ করে দেবে। কেননা সে জানে না মৃত্যুটাই তার জন্যে শ্রেষ্ঠ নাকি জীবিত থাকা তার জন্যে শ্রেয়।

مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ : উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহই একথা ভালো জানেন যে, আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে গুনাহের চেয়ে নেককাজই আমি বেশি করতে পারব। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এ পৃথিবী ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। আমি কোনো প্রকার ফিতনায় জড়িয়ে পড়ব না। সেক্ষেত্রে আমার জন্যে বেঁচে থাকাটাই কল্যাণকর। অতএব যদি এমন হয় তাহলে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। আর যদি সবকিছু এর বিপরীত হয় তাহলে আমাকে মৃত্যু দান কর। তাহলে এ ক্ষেত্রে মৃত্যু কামনা করা হয়নি; বরং মঙ্গল কামনা করা হয়েছে এবং তা যেভাবে হাসিল হতে পারে সে বিষয়টিকে আল্লাহর সোপর্দ করা হয়েছে। –[মেরকাতের আলোকে]

وَعَنْ ١٥١٤ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَوْ بَعْضُ اَزْوَاجِهِ اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ فَاَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَعُقُوْبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللّٰهِ .

১৫১৪. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করাকে ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) অথবা রাসূলে কারীম ﷺ -এর অপর কোনো স্ত্রী বললেন, আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। রাসূল ﷺ বললেন, এটা অপছন্দ নয়; বরং ব্যাপার হচ্ছে, মু'মিন বান্দার সামনে যখন মৃত্যু এসে হাজির হয় তখন তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সম্মান দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। ফলে তার সামনে তখন যা থাকে তার চেয়ে আর কোনো বস্তুই বেশি প্রিয় হয় না। যার দরুন সে আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালোবাসে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালোবাসেন। এরই বিপরীত বদকারের সামনে যখন মৃত্যু এসে হাজির হয় তখন তাকে আল্লাহর আজাব ও শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। ফলে তার সামনে যা আছে তার চেয়ে অপছন্দনীয় আর কিছু হয় না। ফলে সে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, মৃত্যু আল্লাহর সাক্ষাতের আগে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আল্লামা তীবী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এখানে আল্লাহর সাক্ষাৎ দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নয়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুকে অপছন্দ করে। তবে যারা দুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে এবং দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষ রাখে তারা আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ করে। আর যারা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তারা আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে। কেননা সে সেখানে পৌঁছে মৃত্যুর মাধ্যমে, আল্লাহর সাক্ষাতের মাধ্যমে নয়। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মৃত্যু ও আল্লাহর সাক্ষাৎ দুটি আলাদা বিষয়। তবে মৃত্যুটা মূল উদ্দেশ্যের মাঝে বাঁধা। তাই এ মৃত্যুর বিষয়টি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে নিতে হবে এবং তার কষ্টগুলো সহ্য করে নেবে, যাতে এর পরপরই আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। −[মেরকাত]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা সকল মানুষইতো মৃত্যুকে অপছন্দ করি, তাহলে কি এর এ অর্থ দাঁড়ায় যে, আমরা আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ করি না? তখন রাসূলে কারীম ﷺ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, এ অপছন্দ সে অপছন্দ নয়। কেননা আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করার কারণে মৃত্যুকে যে অপছন্দ করা হয় একজন মু'মিন সে কারণে মৃত্যুকে অপছন্দ করে না। −[মেরকাত]

মাযমী (র.) 'মৃত্যু আল্লাহর সাক্ষাতের পূর্বে' -এর ব্যাখ্যা করেছেন, মৃত্যু আল্লাহর সাক্ষাতের মাধ্যম। মৃত্যু না হলে আল্লাহর সাক্ষাৎ মিলবে না।

وَعَنْ ١٥١٥ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضـ) اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ اَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا اِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করতেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তিনি বললেন, এ নিজে শান্তি লাভ করেছে, অথবা তার থেকে অন্যরা শান্তি লাভ করেছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, শান্তি লাভকারী কে? আর যার থেকে অন্যরা শান্তি লাভ করেছে সে কে? তিনি বললেন, মু'মিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখকষ্ট থেকে আল্লাহর রহমতের কোলে শান্তি লাভ করে। আর ফাসেক বান্দা থেকে আল্লাহর বান্দারা, শহর-বন্দর, গাছপালা ও পশু-পাখিরা শান্তি লাভ করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, ফাসেক বান্দার মৃত্যুতে শহর-বন্দর ও গাছপালা শান্তি লাভ করার কারণ হচ্ছে, এ অপরাধী বান্দা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং সে বৃষ্টি দ্বারা জমিনের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করেন। যে জমিন ঐ ফাসেকের উপস্থিতির কারণে তার কুফলে শুকিয়ে গিয়েছিল। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, মানব সন্তানের গুনাহের কারণে চাতক পাখি দুর্বল হয়ে মারা যায়। অন্য আরেক হাদীসে রয়েছে, মানুষের গুনাহের কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, ফলে প্রাণীকুল গুনাহগারদের অভিশাপ দিতে থাকে। এ কারণে ফাসেক লোক মারা গেলে তার দ্বারা সৃষ্টিকুল শান্তি লাভ করে।

وَعَنْ ١٥١٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِىْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيٰوتِكَ لِمَوْتِكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৫১৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাঁধ ধরে বললেন, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন সকালের আশা করো না, আর যখন সকালে উপনীত হবে তখন আর সন্ধ্যার আশা করো না। তুমি অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ কর এবং মৃত্যুর আগে জীবনের সুযোগ গ্রহণ কর। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : عَابِرُ سَبِيْلٍ ও غَرِيْبٌ এ দুই শব্দের মাঝে পার্থক্য হলো, غَرِيْبٌ বলা হয় যে নিজের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করছে, সেখানে সে অপরিচিত এবং অস্থায়ী। আর عَابِرُ سَبِيْلٍ হচ্ছে যে পথ চলছে, অর্থাৎ স্থায়ীভাবে সে কোথাও অবস্থান করে না; বরং সে হাঁটছে ও চলছে। -[মেরকাত]

হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, তুমি পৃথিবীর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে গ্রহণ কর কিন্তু তার সঙ্গে সখকে জুড়ে দিয়ো না। যেমনিভাবে মুসাফির তার বিভিন্ন প্রয়োজনে কোথাও বসে, কোথাও ঘুমায়। কিন্তু সে জানে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে উঠে চলে যেতে হবে। ফলে ঐ বিশ্রামাগার ও সরাইখানাকে সে নিজের আবাসন মনে করতে পারে না। তাই মানুষও যেন এ পৃথিবীকে তার স্থায়ী আবাসন মনে না করে। বিষয়টিকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্যে দুনিয়াবাসীকে পথিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তার বসার ও বিশ্রামের সময়টুকুও নেই।

وَعَنْ ١٥١٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ يَقُوْلُ لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫১৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ইন্তেকালের তিনদিন আগে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করার আগে মরে না যায়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন এ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করে। আর সে অবস্থা হচ্ছে, সর্বদা আল্লাহর ব্যাপারে এ ধারণা করা যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং যদিও বাহ্যিকভাবে দেখা যায় এ হাদীসে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিকভাবে ঐ অবস্থা থেকে নিষেধ করা হচ্ছে যে অবস্থায় মানুষ খারাপ আমলের কারণে হতাশ ও নিরাশ হয়ে যায়। যেন এমন না হয় যে, সে আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা করে আছে আর সে মুহূর্তে তার মৃত্যু এসে গেছে।

প্রকারান্তরে এ হাদীসে নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যা মানুষের মাঝে সুধারণা সৃষ্টি করে। এ ছাড়া হাদীসে ক্ষমার আশাবাদী করার প্রতি এবং আশা বাস্তব রূপ ধারণা করবে- এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যেমন অন্য এক হাদীসে রয়েছে- اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ فَلَا يَظُنَّ بِيْ اِلَّا خَيْرًا আরেক বর্ণনায় এসেছে- فَلْيَظُنَّ بِيْ مَا شَاءَ

ইমাম নববী (র.) বলেন, ভয় ও আশা এ দুটি বিষয়ের বহু সহীহ হাদীস আমি যাচাই করে যা পেয়েছি তা হচ্ছে 'আশা'র হাদীস 'ভয়' -এর হাদীসের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। মোল্লা আলী কারী (রা.) বলেন, رَجَاءٌ ও আশা বিষয়ে যদি শুধুমাত্র এ হাদীসটি থাকত سَبَقَتْ اَوْ غَلَبَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰى غَضَبِيْ আর কোনো হাদীস নাও থাকত তবু আশার দিকটি প্রাধান্য পাওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে এ হাদীসটিই যথেষ্ট ছিল। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 'আমার রহমত সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে' আয়াতটিও এ বিষয়কে সমর্থন করে।

আল্লামা তীবী (র.) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, তোমরা এখন তোমাদের আমল শুধরে নাও, যাতে মৃত্যুকালে আল্লাহর প্রতি তোমাদের সুধারণা থাকে। কেননা মৃত্যুর আগে যার আমল মন্দ হয়, মৃত্যুকালে আল্লাহর প্রতি তার ধারণা খারাপ হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥١٨ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتُمْ اَنْبَأْتُكُمْ مَا اَوَّلُ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَا اَوَّلُ مَا يَقُوْلُوْنَ لَهٗ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ اَحْبَبْتُمْ لِقَائِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ يَا رَبَّنَا فَيَقُوْلُ لِمَ فَيَقُوْلُوْنَ رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ فَيَقُوْلُ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِىْ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ)

১৫১৮. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ মু'মিনদেরকে কি বলবেন এবং মু'মিনরা আল্লাহকে কি বলবে? আমরা বললাম, জী, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ মু'মিনদেরকে বলবেন, তোমরা কি আমার সাক্ষাৎ কামনা করেছিলে? তারা বলবে, জী হ্যাঁ, হে আমাদের প্রতিপালক! আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, কেন? তারা বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মার্জনার আশা করেছি। আল্লাহ বলবেন, তোমাদের জন্যে আমার ক্ষমা অবধারিত হয়ে গেল। −[শরহুস সুন্নাহ ও আবূ নু'আইম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এর দ্বারা গুনাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি; বরং শয়তানের প্রলোভনে গুনাহ করে থাকলে আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ না হলে তওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখা উচিত। −[আ'যমী] আর আল্লাহ ক্ষমা করেও দেবেন।

وَعَنْ ١٥١٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সকল সুখ-স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর। −[তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَاذِمٌ : শব্দটি নোকতাবিশিষ্ট ذال দ্বারা। অর্থ হচ্ছে− قَاطِعٌ বা বিনষ্টকারী। কেউ বলেছেন, শব্দটি নোকতাবিহীন دَالْ দ্বারা هَادِمْ যার অর্থ− যে ভেঙ্গে দেয় বা ধ্বংসকারী। ভাষ্যকার আল্লামা তীবী (র.) ذَالْ -এর উচ্চারণকেই সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন, ইহজাগতিক স্বাদ-বিলাস ও ক্ষণস্থায়ী মনস্কামনার উপস্থিতি ও হারিয়ে যাওয়াকে একটি সুউচ্চ প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা কঠিন হামলায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় বিভোর তাকে এ কল্পনার প্রাসাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে আদেশ করা হয়েছে, যাতে সে এ পৃথিবীর মোহে বিমোহিত হয়ে না থাকে এবং আখিরাতের যে দায়িত্ব তার উপর অত্যাবশ্যকীয় তা নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

যাইনুল আবেদীন (র.) সুন্দর আবৃত্তি করেছিলেন– فَيَا عَامِرَ الدُّنْيَا وَيَا سَاعِيًا لَهَا * وَيَا اٰمِنًا مِنْ اَنْ تَدُوْرَ الدَّوَائِرُ
اَتَدْرِيْ بِمَاذَا لَوْ غَفَلْتَ تُخَاطِرُ * فَلَا ذَاكَ مَوْفُوْرٌ وَلَا ذَاكَ عَامِرٌ

কিন্তু আসনাবী (র.) বলেছেন, اَلْهَاذِمُ শব্দটি নোকতাবিশিষ্ট ذَالْ দ্বারা অর্থ– قَاطِعٌ যেমনটা জাওহারী বলেছেন। আর এখানে এটাই উদ্দেশ্য। সুহাইলী (র.) 'আররাওযুল উনুফ' গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বর্ণটি دَالْ দ্বারা। শায়খ জামারী (র.) ذَالْ -এর বর্ণনাটিকেই সহীহ বলেছেন। অপর বর্ণনাকে তিনি ভুল বলেছেন। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٢٠ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِاَصْحَابِهِ اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوْا اِنَّا نَسْتَحْيِيْ مِنَ اللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ مَنِ اسْتَحْيٰى مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعٰى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيٰى مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৫২০. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ একদিন তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা করার মতো লজ্জা কর। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি। তিনি বললেন, এ লজ্জা নয়; বরং যে ব্যক্তি আল্লাহকে লজ্জা করে সে যেন তার মাথাকে হেফাজত করে এবং মাথা যা কিছু সংরক্ষণ করেছে তাকে। সে যেন তার পেটকে হেফাজত করে এবং পেট যা ধারণ করে তাকে। আর সে যেন মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যুর পর মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে স্মরণ করে। যে আখিরাতকে চায় সে দুনিয়ার সাজসজ্জা পরিহার করে। যে এসব করল সে-ই আল্লাহকে লজ্জা করার মতো লজ্জা করল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ : দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র তাকে ব্যবহার না করা। যেমন– মূর্তিকে সেজদা না করা, কারো সামনে মাথা না ঝুঁকানো, লোক দেখানোর জন্যে নামাজ না পড়া, গায়রুল্লাহর সামনে নত না থাকা এবং আল্লাহর সামনে অহংকার না করা।

وَمَا وَعٰى : দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাথার মধ্যে যা কিছু রয়েছে যেমন– জবান, চোখ, কান ইত্যাদি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার জায়েজ নেই সেখানে ব্যবহার করা থেকে এগুলোকে হেফাজত করা।

لِيَحْفَظِ الْبَطْنَ : দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পেটকে হারাম খাদ্য থেকে হেফাজত করে রাখা। এমনিভাবে সন্দেহযুক্ত সবধরনের খানা পরিহার করা।

وَمَا حَوٰى : দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেগুলো পেটের সঙ্গে যুক্ত। যেমন– লজ্জাস্থান, দুই পা, দুই হাত, অন্তর ইত্যাদি। এগুলো সংরক্ষণের পদ্ধতি হচ্ছে, এগুলোকে গুনাহের কাজে ব্যবহার না করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করার দ্বারা ঐ লজ্জা উদ্দেশ্য নয়, যা তোমরা ধারণা করছ; বরং যথাযথ লজ্জা হচ্ছে, ব্যক্তি তার সত্তাকে তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ সকল অপরাধ থেকে সংরক্ষণ করে রাখবে।

اَلْبِلٰى : বলা হয় যখন কোনো বস্তু পুরাতন হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ সে যে কবরে গিয়ে পুরাতন হাড্ডিতে রূপান্তির হবে সে অবস্থা স্মরণ করা চাই।

ইমাম নববী (র.) সলফে সালেহীনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এ হাদীসটি বারবার আলোচনায় রাখা মুস্তাহাব। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٢١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৫২১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত্যু হচ্ছে মু'মিনের জন্যে হাদিয়া। –[ইমাম বায়হাকী (র.) এ হাদীসটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : মৃত্যুই যেহেতু মানুষকে আল্লাহর সাক্ষাতের চিরস্থায়ী সুখের দিকে পৌছে দেয়, সুতরাং মৃত্যু হলো মু'মিনের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম তোহফা ও উপহার। –[আ'যমী]

وَعَنْ ١٥٢٢ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫২২. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি মারা যায় কপালের ঘামের সঙ্গে।

–[তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হাদীসের অর্থ হচ্ছে, মু'মিন ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন তার কপাল ঘেমে যায়। এর কারণ ব্যাখ্য করতে গিয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, মৃত্যুকালে অধিক কষ্টের কারণে কপাল ঘেমে যায়। কেউ বলেছেন, উত্তম মৃত্যুর আলামত হিসেবে কপালে ঘাম দেখা দেয়। ইবনুল মালেক (র.) বলেন, মু'মিনের মৃত্যুর কষ্ট বেশি হওয়ার কারণে তার কপাল ঘেমে যায়। কেননা সে কষ্টের মাধ্যমে তার গুনাহ মুছে দেওয়া হয় এবং তার মর্যাদা বাড়ানো হয়। এর আরেকটি ব্যাখ্যা কেউ এভাবে করেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মু'মিন ব্যক্তি হালাল রোজগার করতে গিয়ে বহু কষ্ট ভোগ করে। এমনিভাবে নামাজ-রোজার মাধ্যমে সে নিজেকে সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। আর এভাবেই তার মৃত্যু এসে যায়। হাদীসে তার এ অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٢٣ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ اَخْذَةُ الْاَسَفِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَرَزِيْنٌ فِيْ كِتَابِهِ اَخْذَةُ الْاَسَفِ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ ـ

১৫২৩. অনুবাদ : হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে খালেদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আকস্মিক মৃত্যু গজবের ধরা।

–[আবূ দাঊদ, বায়হাকী ও রাযীন।]

বায়হাকী ও রাযীনের বর্ণনায় অতিরিক্ত এ অংশটুকু রয়েছে। গজবের ধরা কাফেরের জন্যে এবং রহমত মু'মিনের জন্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاَسَفُ : শব্দটি سِيْن হরফে যবর দিয়ে। আবার যের দিয়েও বর্ণিত আছে। 'আল কামূস' অভিধান গ্রন্থে রয়েছে, اَلْاَسَفُ অর্থ হচ্ছে– اَشَدُّ الْحُزْنِ। আর كَتْف -এর ওযনে এর অর্থ হচ্ছে– গজব ও গোস্বা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

وَعَنْ ١٥٢٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُو اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ عَبْدٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৫২৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক যুবকের ঘরে ঢুকলেন তখন সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কেমন অনুভব করছ? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী আর আমি আমার গুনাহের বিষয়ে ভয় পাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন ক্ষেত্রে যে বান্দার অন্তরেই এ দুটি বিষয় একত্র হবে তাকেই আল্লাহ তা'আলা ঐ বস্তু দান করবেন যা সে আশা করে। আর যাকে সে ভয় পায় তা থেকে তাকে নিরাপদে রাখবেন।

–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥٢٥ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَاِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيْدٌ وَاِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ اَنْ يَطُوْلَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْاِنَابَةَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৫২৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। কেননা মৃত্যুর উপস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এছাড়া বান্দার বয়স দীর্ঘ হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবার তৌফিক দেওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِنَابَةُ : অর্থ– আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হওয়া, শুরু থেকেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, অথবা শেষে তওবা করে ফিরে আসা।

اَلْمُطَّلَعُ : বলা হয় ঐ উঁচু জায়গাকে, যেখান থেকে সবকিছু দেখা যায়। যেমন বলা হয়– مُطَّلَعُ هٰذَا الْجَبَلِ مِنْ مَوْضَعِ كَذَا অর্থাৎ 'অমুক স্থানটি হচ্ছে এ পাহাড়ে আসা ও চড়ার পথ।' এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তি মৃত্যুর যেসব ভয়াবহ ও কঠিন অবস্থা অবলোকন করে তা।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এখানে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করার কারণ হিসেবে প্রথমত উল্লেখ করা হয়েছে মৃত্যুর কঠিন অবস্থাকে। কেননা সে মৃত্যু কামনাই করেছিল ধৈর্যের স্বল্পতার কারণে এবং সে যখন তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি সামনে দেখতে পাবে তখন তার এ অধৈর্য আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে, ফলে সে আরো বেশি গোস্বায় নিপতিত হবে।

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দীর্ঘ বয়সের অধিকারী হয়ে সে ভাগ্যবান হওয়া। কেননা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন করার জন্যে। এক্ষেত্রে তার মূলধন হচ্ছে তার বয়স। আর তুমি কি কখনো দেখেছ কোনো ব্যবসায়ী তার মূলধনকে নষ্ট করেছে। যদি সে নষ্ট করে তাহলে কিভাবে সে লাভবান হবে? –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٢٦ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ جَلَسْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَّرَنَا وَرَقَّقَنَا فَبَكٰى سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فَاَكْثَرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ يَا لَيْتَنِىْ مِتُّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا سَعْدُ اَعِنْدِىْ تَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ اِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمْرُكَ وَ حَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৫২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে নসিহত করলেন এবং আমাদের অন্তরকে বিগলিত করে দিলেন। এতে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) খুব কাঁদলেন। এক পর্যায়ে বললেন, হায় যদি মরে যেতাম! তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে সা'দ! তুমি আমার সামনে মৃত্যু কামনা করছ? রাসূল ﷺ একথা তিনবার পুনঃপুন বলেছেন। এরপর বললেন, সা'দ! তুমি যদি জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি হয়ে থাক, তাহলে তোমার হায়াত যত দীর্ঘ হবে এবং তোমার আমল যত সুন্দর হবে ততই তোমার জন্যে ভালো হবে। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রাসূলের সাহচর্য লাভ করা এবং তাঁর চেহারা মোবারক দেখার সৌভাগ্য অর্জন করার চেয়ে উত্তম আমল আর কী হতে পারে! এজন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, তুমি আমার সামনে থেকেও মৃত্যু কামনা করছ। -[আ'যমী]

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন, এরপরও রাসূল ﷺ তাঁকে কিভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে, যদি তুমি জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি হয়ে থাক? এর জবাব হচ্ছে, এখানে প্রশ্নটি করা হয়েছে কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে, সন্দেহ হিসেবে নয়। অর্থাৎ তুমি কিভাবে মৃত্যু কামনা কর আমার সামনে, অথচ আমি তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছি? অর্থাৎ তুমি যেহেতু জান্নাতবাসী তাই তুমি মৃত্যু কামনা করো না; বরং তোমার বয়স যত দীর্ঘ হবে তোমার মর্যাদা তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার এ আয়াতটিতেও এমনটি বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ এক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনাও আছে যে, এসব সুসংবাদ ঐ অবস্থায় বহাল থাকার সঙ্গে শর্তযুক্ত যে অবস্থা সুসংবাদ দেওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল। এ কারণে খারাপ পরিসমাপ্তি, কবরের শাস্তি ও কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার আশঙ্কা তাঁদের থেকে দূর করা হয়নি। ফলে এসব বিষয়ে তারা সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন।

আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়ার আগে এ ঘটনাটি ঘটেছিল। -[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٢٧ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ (رح) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَتَمَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَمْلِكُ دِرْهَمًا وَاِنَّ فِىْ جَانِبِ بَيْتِىَ الْاٰنَ لَاَرْبَعِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ثُمَّ اُتِىَ بِكَفَنِهٖ فَلَمَّا رَاٰهُ بَكٰى وَقَالَ لٰكِنْ حَمْزَةُ لَمْ يُوْجَدْ لَهٗ كَفَنٌ اِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ اِذَا جُعِلَتْ عَلٰى رَأْسِهٖ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ وَاِذَا جُعِلَتْ عَلٰى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى مُدَّتْ عَلٰى رَأْسِهٖ وَجُعِلَ عَلٰى قَدَمَيْهِ الْاِذْخَرُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ) اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ اُتِىَ بِكَفَنِهٖ اِلٰى اٰخِرِهٖ.

১৫২৭. অনুবাদ : হযরত হারেছা ইবনে মুযাররিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাববাব (রা.)-এর ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম তাঁর শরীরের সাত জায়গায় আগুনের দাগ দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একথা বলতে না শুনতাম যে, 'তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে' তাহলে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। আমি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তখন আমি একটি রূপার মুদ্রারও মালিক ছিলাম না; আর এখন আমার ঘরের কোণায় চল্লিশ হাজার রূপার মুদ্রা পড়ে আছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর কাফনের কাপড় নিয়ে আসা হলো। কাফনের কাপড় দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, কিন্তু হামযার জন্যে কাফন পাওয়া যায়নি। একটি মাত্র [পুরাতন] সাদা-কালো ডোরাকাটা চাদর ছিল, তা দিয়ে যখন মাথা ঢাকা হতো পা খুলে যেত, আর যখন পা ঢাকা হতো মাথা খুলে যেত। তখন চাদরটি তার মাথার দিকে টেনে দেওয়া হলো এবং পায়ের উপর ইযখির পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ : একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সহ অন্যান্যদের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। مُضَرِّبٌ শব্দের উচ্চারণের ব্যাপারে মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এটি تَضْرِيْبٌ বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার থেকে اِسْمُ مَفْعُوْل-এর শব্দ। অর্থাৎ ر হরফে যবর দিয়ে مُضَرَّبٌ। –[মেরকাত]

কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, শব্দটি ر হরফে যের দিয়ে مُضَرِّبٌ 'মুযাররিব'। –[তাকরীব]

خَبَّابٌ : [প্রথম باء হরফটি তাশদীদযুক্ত] ইবনে اَرَتٌ 'আরত' [تاء হরফটি তাশদীদমুক্ত] তামিমী। জাহিলি যুগে তাঁকে বন্দি করা হয় এবং মক্কায় বিক্রি করা হয়। নবুয়তের ষষ্ঠ বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, ফলে তাঁকে বহু রকমের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বদর যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে তিনি শরিক ছিলেন। তিনি ৩৭৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, যখন হযরত আলী (রা.) সিফফীন থেকে ফিরছিলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– رَحِمَ اللّٰهُ خَبَّابًا . اَسْلَمَ رَاغِبًا . وَهَاجَرَ طَائِعًا . وَعَاشَ مُجَاهِدًا . وَابْتُلِىَ فِىْ جِسْمِهٖ اَحْوَالًا لَنْ يُضَيِّعَ اللّٰهُ اَجْرَهٗ

اِكْتَوٰى : অর্থ হচ্ছে– كَىٌّ লাগানো অর্থাৎ লোহা গরম করে দাগানো। এটি বিভিন্ন রোগের জন্যে একটি প্রসিদ্ধ চিকিৎসা। –[মেরকাত]

তবে হযরত খাববাবের গায়ে দাগানোর যে দাগ রয়েছে তা চিকিৎসার কারণে হওয়া নিশ্চিত নয়। তাঁর গায়ে দাগ ছিল ইসলাম গ্রহণ করার কারণে শাস্তিস্বরূপ তাঁর মালিকগোষ্ঠী লোহার গরম শলা দিয়ে দাগানোর দাগ।

তবে লোহা দাগানোর চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো কোনো হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং এ চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং কোনো কোনো সাহাবীর এ চিকিৎসা গ্রহণ করাকেও সমর্থন করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ কারণে যেসব হাদীসে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে মুহাদ্দিসীনে কেরাম সেগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

مَلْحَاءُ : ঐ চাদর, যা সাদা-কালো সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ ডোরাকাটা চাদর।

اَلْاِذْخَرُ : একপ্রকার সুগন্ধিযুক্ত পাতা যার দ্বারা ঘরের ছানি দেওয়া হয়।

কাফনের কাপড় সামনে নিয়ে আসার পর তিনি এ কারণে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর অর্থ-সামর্থ্য থাকার কারণে এত উন্নত মানের কাপড় তিনি কাফনের জন্যে প্রস্তুত করে রাখতে পেরেছেন। অথচ একই সারির অথবা তাঁর চেয়ে উত্তম ব্যক্তি শহীদদের সরদার হযরত হামযা (রা.) এতটুকু পরিমাণ কাপড়ের অধিকারী হননি যার দ্বারা তাঁর মাথা ও পা একসঙ্গে ঢাকা যায়।

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ
পরিচ্ছেদ : মুমূর্ষু রোগীর পাশে যা বলতে হয়

রোগীর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উপস্থিত লোকেরা যখন অনুমান করতে পারবে যে, এ রোগীর মৃত্যু অত্যাসন্ন তখন এ রোগীর ব্যাপারে উপস্থিত লোকদের কিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে। এ পরিচ্ছেদের বিভিন্ন হাদীসে সে দায়িত্বগুলোর কথাই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কিছু কিছু এমন আলামত রয়েছে যেগুলো পরিলক্ষিত হলে মনে করা হয় যে, রোগীর মৃত্যু আসন্ন, যেমন– পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাওয়া, নাক একদিকে হেলে যাওয়া, কান ও চোখের মাঝামাঝি আটকপালের জোড়া খুলে যাওয়া, অণ্ডকোষ ঢিলা হয়ে যাওয়া, একমুখো নিঃশ্বাস চালু হয়ে যাওয়া এমনিভাবে শিরার গতি অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। অন্যান্য বহু আলামত রয়েছে যেগুলো দেখলে রোগী মৃত্যু মুখে পতিত বলে ধারণা করা যায়। এ সকল অবস্থায় তার জন্যে যা করণীয়, তা-ই এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥٢٨ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দাও। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিদের সামনে তোমরা তাওহীদের কালেমা এমনভাবে উচ্চারণ করে পড় যাতে সে শুনতে পারে। তবে তাকে পড়তে আদেশ করো না।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে مَا يَؤُوْلُ হিসেবে রূপক অর্থে। অর্থাৎ সে অচিরেই মৃত লাশে পরিণত হবে। তদ্রূপ রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীস– اِقْرَؤُوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ يٰسٓ এটিকেও এ অর্থেই নেওয়া হবে। কেউ বলেছেন, সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতের বিষয়টি মৃত্যুর পরেও হতে পারে।

যাইনুল আরব বলেন, কালেমার তালকীনের বিষয়টি দাফনের পরেও প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা তালকীনের বিষয়টি মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তির তুলনায় লাশের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। কারণ মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শব্দটিকে রূপক অর্থে নিতে হয় অথচ দাফনকৃত লাশের ক্ষেত্রে তা করতে হয় না।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তালকীনের বর্তমান প্রচলিত যে পদ্ধতিটির দিকে যাইনুল আরব ইঙ্গিত করেছেন তা সলফে সালেহীনের যুগে ছিল না। এটি একটি নতুন পদ্ধতি। তাই রাসূল ﷺ -এর হাদীসকে এ অর্থে নেওয়া যায় না।

এছাড়া تَلْقِيْن শব্দকে তার আভিধানিক অর্থে নিলে তা মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হাকীকত, আর মৃত লাশের ক্ষেত্রে রূপক। আর প্রথম অর্থে অর্থাৎ মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তালকীন হলে সে তা শুনতে পাবে, এর দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে এবং সেও কালেমাটি উচ্চারণ করতে পারবে। ফলে সে এ হাদীসের সুসংবাদের অংশীদার হবে– مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ। আর এটাই এখানে উদ্দেশ্য। এ তালকীনের ব্যাপারে জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হচ্ছে, তালকীন করা মুস্তাহাব। কিন্তু হাদীসের বাহ্যিক অর্থের দাবি হচ্ছে ওয়াজিব হওয়া। একটি জামাত এর পক্ষেই রায় দিয়েছেন; বরং কোনো কোনো মালেকী ইমাম বলেছেন, বিষয়টি সবার ঐকমত্যে ওয়াজিব। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٢٩ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫২৯. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোনো রোগী বা মৃত ব্যক্তির কাছে যাবে তখন ভালো কথা বলবে। কেননা সে সময় তোমরা যা বল তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** ভালোকথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রোগীর নিরাময় ও তোমাদের নিজেদের জন্যে কল্যাণের দোয়া করবে। মৃত ব্যক্তির কাছে গেলে তার গুনাহ ও তোমাদের গুনাহ মাফের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। -[আ'যমী] যাতে ফেরেশতার আমীন দ্বারা তোমাদের দোয়া কবুল হয়ে যায়।

وَعَنْهَا ١٥٣٠ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ اَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اِنِّيْ قُلْتُهَا فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৩০. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমানকেই কোনো বিপদে আক্রমণ করার পর সে যদি ঐ কথাই বলে যা বলতে আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশ করেছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দান করবেন। অর্থাৎ এ কথাটি- اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا 'আমরা আল্লাহর জন্যে এবং তাঁরই দিকে আমরা ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমাকে আমার এ বিপদের প্রতিফল দান কর এবং তার চেয়ে উত্তম বিনিময় আমাকে দান কর।'

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আবূ সালামা [উম্মে সালামার স্বামী] যখন মারা গেলেন তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, কোনো মুসলমান কি এমন আছে যে আবূ সালামার চেয়ে উত্তম? কারণ আবূ সালামার পরিবারই সেসব ঘরের মধ্যে প্রথম ঘর যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হিজরত করে এসেছিল। এরপরও আমি দোয়াটি পড়লাম! আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আবূ সালামার পরিববর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দান করেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আবূ সালামা হচ্ছেন হযরত উম্মে সালামার স্বামী, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল আসাদ আল মাখযূমী। বিশুদ্ধ মতানুসারে চতুর্থ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে যে আহত হয়েছিলেন, সে জখমের কারণেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম সারির মুসলমানদের একজন। ইসলামের প্রথম দশজন মুসলমানের পর তিনি ছিলেন এগারোতম মুসলমান। -[মেরকাত]

রসূল ﷺ বলেছেন- اِلَّا اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا 'আল্লাহ তার জন্যে এর চেয়ে উত্তমের ব্যবস্থা করে দেবেন।' এর উপর হযরত উম্মে সালামা (রা.) খুব আশ্চর্যবোধ করেছিলেন। কারণ তাঁর ধারণামতে আবূ সালামার মতো আর কোনো মানুষ

নেই। তাহলে তার চেয়ে উত্তম বদলা কোত্থেকে আসবে? আবূ সালামার ব্যাপারে তাঁর এ ধারণার কারণ হচ্ছে, আবূ সালামার মতো ভদ্র ও ভালো মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে আর কেউ ছিল না। আর তাঁর পরিবারই সর্বপ্রথম পরিবার, যারা পুরো পরিবার নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হিজরত করে এসেছেন। আবূ নুয়াইম (র.) বলেন, তিনি সবার আগে মদিনায় হিজরত করে এসেছেন। মাগাযী প্রণেতাগণ বলেছেন, তিনি হাবশায় হিজরত করেছেন এরপর মদিনায় হিজরত করেছেন। এছাড়া আবূ সালামা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দুধভাই ও ফুফাতো ভাই ছিলেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, এত মর্যাদাবান ব্যক্তির বদলা যে হতে পারে এমন সন্দেহ আমার মনে থাকা সত্ত্বেও আমি দোয়াটি পড়েছি। আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুল করেছেন। আবূ সালামার পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দান করেছেন। আর নিঃসন্দেহে এ বদলা আমার জন্যে আমার স্বামী আবূ সালামার চাইতে উত্তম ছিল। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের এ বাণীকে সত্য করিয়ে দেখিয়েছিলেন। আবূ সালামার পরিবর্তে রাসূলে কারীম ﷺ -কে আমি স্বামী হিসেবে পেয়েছি।

وَعَنْهَا ١٥٣١ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৩১. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ সালামার ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন আবূ সালামার চোখ বিস্ফারিত ছিল। রাসূল ﷺ তার চোখ বুজিয়ে দিলেন, অতঃপর বললেন, যখন রূহ কবজ করা হয় তখন চোখ তার অনুসরণ করে। তখন আবূ সালামার পরিবারে কেউ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কান্না শুনে তিনি বললেন. তোমরা মঙ্গলের দোয়া ব্যতীত নিজেদের উপর আর কিছু ডেকে এনো না। কেননা তোমরা যা বলবে, ফেরেশতারা তার উপর আমীন বলবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামাকে ক্ষমা করে দাও, হেদায়েতপ্রাপ্তদের মাঝে তার মর্যাদাকে বুলন্দ করে দাও, তার রেখে যাওয়া লোকদের ব্যাপারে তুমি প্রতিনিধি হয়ে যাও। হে জগতের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও, তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং সে কবরে তার জন্যে আলোর ব্যবস্থা করে দাও। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَخْلُفْهُ : শব্দটি বাবে نَصَرَ থেকে। অর্থ- কারো স্থলাভিষিক্ত হওয়া। অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করা। اَخْلُفْهُ -এর অর্থ হচ্ছে- كُنْ خَلَفًا اَوْ خَلِيْفَةً لَهُ

عَقِبٌ : শব্দটি قَافْ হরফে যের দিয়ে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অর্থাৎ তার সন্তানসন্ততির ব্যাপারে। বাহ্যত অর্থ হচ্ছে- যারা তার পরে রয়েছে, চাই তারা সন্তান হোক বা অন্য কেউ হোক।

اَلْغَابِرِيْنَ : শব্দের অর্থ হচ্ছে- পৃথিবীতে অবশিষ্ট জীবিত মানুষের।

وَعَنْ ١٥٣٢ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ سُجِّىَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৩২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করেছেন তখন তাঁকে একটি ইয়ামেনী চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حِبَرَةٌ : শব্দটি عِنَبَةٌ -এর ওযনে। এটি ইযাফতের জন্যেও হতে পারে, ইযাফত ছাড়াও হতে পারে। জাওহারী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে ইয়ামেনী চাদর। আর অন্যরা বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে ডোরাকাটা চাদর।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٥٣٣ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرَ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

১৫৩৩. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যার জীবনের শেষ কথা হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : এখানে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এর অপর অংশ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ সহ। কেননা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এটি হচ্ছে ঈমানের কালেমার নামের মতো। যেমন রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এটি বাহ্যিক অবস্থা হিসেবে ঈমানের শিরোনাম। তাই এতটুকুর উপর ক্ষান্ত করাই ঠিক আছে। যদিও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তবিকভাবে রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনাকেও এর সঙ্গে সংযুক্ত করা।

এর মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করার দ্বারা বিশেষভাবে প্রবেশ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করে প্রবেশ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, প্রথমটিই বেশি প্রতিভাত হয়। কেননা এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হবে, যে শেষ মুহূর্তে কালেমা পাঠ করবে। নচেৎ শাস্তি ভোগ করার পর তো সকল মু'মিনই বেহেশতে প্রবেশ করবে। –[মেরকাত]

আল্লামা তীবী (র.) এ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইহুদি-খ্রিস্টানরাও এ কালেমা পড়ে থাকে এবং উচ্চারণ করে অতএব এর সঙ্গে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এ অংশ সংযুক্ত করা জরুরি। এর জবাবে আমি বলব, এ অংশটি এখানে রয়েছে এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর জবান থেকে বের হয়েছে।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ জবাবটি স্পষ্ট হয়নি। জবাবটি এভাবে হলে সুন্দর হয় যে, যে ব্যক্তি নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে তার জন্য এ অংশটি উচ্চারণ করা জরুরি। পক্ষান্তরে যে মু'মিনের অন্তর সাইয়েদুল আম্বিয়ার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং তাঁর নবুয়তের স্বীকৃতি তার অন্তরে ভরপুর তার জীবনের শেষ কথা তাওহীদের কালিমা– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলাই যথেষ্ট। যার মাঝে নবুয়ত ও পুনরুত্থান ইত্যাদি সব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। –[মেরকাত]

١٥٣٤ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأُوْا سُوْرَةَ يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫৩৪. অনুবাদ : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের পাশে সূরা ইয়াসীন পড়। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসে মৃত ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যাদের মৃত্যু একেবারে সন্নিকটে। সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতের পেছনে সম্ভাব্য হেকমত হচ্ছে, মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তি যেন সূরা ইয়াসীনের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর জিকির এবং কিয়ামত ও পুনরুত্থানের বিষয়টি শুনে মনে মনে তা জপতে পারে। আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন, এ হাদীসে মৃত ব্যক্তি দ্বারা মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তি উদ্দেশ্য হতে পারে। যার ফলে সে ব্যক্তি যেন মৃতদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথবা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য হতে পারে যার মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু সে এখনো ঘরে বা অন্য কোথাও রয়েছে। এখনো তাকে দাফন করা হয়নি।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করার রহস্য কি– তা আল্লাহই ভালো জানেন। সূরাটি আগাগোড়া দীনের মৌলিক নীতি ও গ্রহণযোগ্য মাসআলা-মাসায়েলে পরিপূর্ণ, যেগুলো ওলামায়ে কেরাম তাদের বিভিন্ন আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। আর সে বিষয়গুলো হচ্ছে, নবুয়ত, দাওয়াতের পদ্ধতি, বিভিন্ন জাতির অবস্থা, তাকদীর সাব্যস্তকরণ, মানুষের সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, তাওহীদ সাব্যস্তকরণ, আল্লাহর প্রতিপক্ষ ও সমকক্ষ না থাকাকে প্রমাণ করা, কিয়ামতের আলামতসমূহ, পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দান, হাশরের বিভিন্ন পরিস্থিতি হিসাব-নিকাশ, বদলা দেওয়া ও মূল ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। অতএব মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তির সামনে এ সূরাই তেলাওয়াত করা বেশি উপযুক্ত। –[মেরকাত] যাতে মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির নিকট এ সূরা পাঠ করা হলে তার অন্তর ঈমানের বলে বলীয়ান হয় এবং মৃত্যু তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়।

وَعَنْ ١٥٣٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ عُثْمٰنَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِىْ حَتّٰى سَالَ دُمُوْعُ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى وَجْهِ عُثْمَانَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫৩৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওসমান ইবনে মাযঊনকে মৃত অবস্থায় চুমা দিয়েছেন এবং তিনি এমনভাবে কাঁদছিলেন যে, নবী করীম ﷺ -এর চোখের পানি ওসমানের চেহারার উপর গড়িয়ে পড়েছে। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রা.) : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুধভাই ছিলেন। দুবার হিজরত করেছেন। বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। জাহিলি যুগেই তিনি নিজের জন্যে মদ হারাম করে দিয়েছিলেন। হিজরতের ত্রিশ মাস পর শা'বান মাসে মদিনা শরীফে মুহাজিরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেছেন।

ইবনুল মালিক (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, কোনো মুসলমান মারা যাওয়ার পর তাকে চুম্বন করা এবং তার জন্য ক্রন্দন করা জায়েজ।

وَعَنْهَا ١٥٣٦ قَالَتْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫৩৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) নবী করীম ﷺ -কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনায় ইমাম বুখারী (র.) তাঁর 'সহীহ বুখারী'তে উল্লেখ করেছেন। যার ইবারত হচ্ছে এই– اِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّ ﷺ بَعْدَ مَا مَاتَ সুতরাং এ হাদীসটি প্রথম অনুচ্ছেদে আসাই বেশি উপযুক্ত ছিল।

وَعَنْ ١٥٣٧ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ (رض) أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اِنِّيْ لَا اَرٰى طَلْحَةَ اِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَاٰذِنُوْنِيْ بِهِ وَعَجِّلُوْا فَاِنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ اَهْلِهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৫৩৭. অনুবাদ : হযরত হুসাইন ইবনে ওয়াহওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তালহা ইবনুল বারা অসুস্থ হলে নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে আসলেন এবং বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, তালহার মৃত্যু অত্যাসন্ন। অতএব তোমরা আমাকে সংবাদ দিও [মারা গেলে] এবং তাড়াতাড়ি কর [দাফন কাফনের বিষয়ে]। কেননা, কোনো মুসলমানের লাশ তার পরিবারের লোকজনের মাঝে আটকে রাখা উচিত নয়।
–[আবূ দাঊদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥٣٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِلْاَحْيَاءِ قَالَ اَجْوَدُ وَاَجْوَدُ ـ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ)

১৫৩৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিদেরকে একথাগুলো তালকীন করে দাও– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। যিনি বড় সহিষ্ণু ও মহানুভব। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি মহান আরশের পরওয়াদেগার। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক প্রভু।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এ বিষয়টি জীবিতদের জন্যে কেমন? তিনি বললেন, খুব উত্তম, খুব উত্তম। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٥٣٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوْا اخْرُجِىْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اُخْرُجِىْ حَمِيْدَةً وَاَبْشِرِىْ بِرُوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ فُلَانٌ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اُدْخُلِىْ حَمِيْدَةً وَاَبْشِرِىْ بِرُوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَلَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَنْتَهِىَ اِلَى السَّمَاءِ الَّتِىْ فِيْهَا اللّٰهُ فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ قَالَ اُخْرُجِىْ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اُخْرُجِىْ ذَمِيْمَةً وَاَبْشِرِىْ بِحَمِيْمٍ وَغَسَّاقٍ وَاٰخَرَ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٍ فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا فَيُقَالُ فُلَانٌ فَيُقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيْثَةِ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ اِرْجِعِىْ ذَمِيْمَةً فَاِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৫৩৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরয়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত্যু আসন্ন মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে ফেরেশতাগণ এসে উপস্থিত হয়। যদি মুমূর্ষু ব্যক্তি নেককার হয় তাহলে ফেরেশতারা তাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে পবিত্র আত্মা! যে পবিত্র এক দেহে ছিলে! বের হয়ে এস। বের হয়ে এস প্রশংসনীয়ভাবে এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সুখ-শান্তি ও সুখাদ্যের ও রোষ-ক্রোধহীন প্রভুর। এভাবে তা বলা হতে থাকবে সে রূহ বের হয়ে আসা পর্যন্ত। এরপর তাকে আসমানের দিকে তুলে নেওয়া হয় এবং তার জন্যে আকাশ খুলে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয় এ কে? ফেরেশতারা বলেন, এ অমুক। তখন বলা হয়, মারহাবা হে পবিত্র প্রাণ! যা পবিত্র দেহে ছিল। প্রশংসনীয়ভাবে প্রবেশ কর। সুসংবাদ গ্রহণ কর সুখ, শান্তি, সুখাদ্যের ও রোষ-ক্রোধহীন রবের। এভাবে যে আসমানে আল্লাহ রয়েছেন, সে আসমানে পৌঁছা পর্যন্ত বলা হতে থাকে।

আর যদি লোকটি বদকার ও খারাপ হয় তাহলে ফেরেশতা বলে, হে নোংরা প্রাণ! বের হয়ে এস, যা নোংরা শরীরে ছিলে। তুমি তিরস্কৃত অবস্থায় বের হয়ে এস। তুমি গরম পানি, দুর্গন্ধযুক্ত পানি ও এরকম আরো অন্যান্য বস্তুর সুসংবাদ গ্রহণ কর। সে বের হয়ে আসা পর্যন্ত এভাবে বলা হতে থাকে। এরপর তাকে আসমানে তুলে নেওয়া হয় এবং তার জন্যে আসমান খুলে দিতে বলা হয়। তখন জিজ্ঞেস করা হয় এ কে? বলা হয়, অমুক। তখন জবাব আসে এ নোংরা প্রাণের জন্যে কোনো মারহাবা নেই, যে নোংরা দেহে অবস্থান করেছিল। তুমি তিরস্কৃত অবস্থায় ফিরে যাও, কেননা তোমার জন্যে আকাশের কোনো দরজাই খোলা হবে না। এরপর তাকে আকাশ থেকে নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর সে কবরে গিয়ে অবস্থান করে। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীস থেকে একথা সাব্যস্ত হয় যে, মু'মিনদের রূহসমূহ আকাশজগতে আরশের নিচে বিচরণ করতে থাকবে। জান্নাতের যেখানে সেখানে উড়াউড়ি করবে। শরীরের সঙ্গেও তার সম্পূর্ণ সম্পর্ক থাকবে। ফলে কবরে সে কুরআন পাঠ করবে, নামাজ পড়বে এবং বিভিন্ন নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। নববধূর মতো সে ঘুমাবে এবং জান্নাতের দৃশ্যাবলি অবলোকন করবে। আর বদকার লোকদের রূহ সর্বনিম্ন স্তরে বন্দি হয়ে থাকবে। লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে থাকবে।

আ'যমী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ফেরেশতা উপস্থিত হন দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত দু-রকমের ফেরেশতা উপস্থিত হন, রহমতের ফেরেশতা ও আজাবের ফেরেশতা। 'যে আসমানে আল্লাহ রয়েছেন' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সে আকাশে তার জন্যে আল্লাহর বিশেষ রহমতের ব্যবস্থা রয়েছে। 'দুর্গন্ধযুক্ত পানি' -এর জন্যে غَسَّاقٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আরেকটি অর্থ হচ্ছে দোজখিদের শরীর থেকে গলিত পুঁজ ও পানি। -[আ'যমী]

وَعَنْهُ ١٥٤٠ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ قَالَ وَيَقُوْلُ اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْاَرْضِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلٰى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَهُ فَيُنْطَلَقُ بِهِ اِلٰى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ انْطَلِقُوْا بِهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاَجَلِ قَالَ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَيَقُوْلُ اَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْاَرْضِ فَيُقَالُ انْطَلِقُوْا بِهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاَجَلِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلٰى اَنْفِهِ هٰكَذَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনের রূহ যখন বের হয় তখন দুজন ফেরেশতা তাকে লুফে নেন এবং তাকে উপরে উঠিয়ে নেন। [পরবর্তী রাবী] হাম্মাদ (র.) বলেন, অতঃপর তিনি তার সুগন্ধির কথা উল্লেখ করেছেন এবং মেশকের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর বলেছেন, আসমানবাসীরা বলে, পবিত্র রূহ জমীন থেকে এসেছে। তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক এবং সে শরীরের প্রতি রহমত বর্ষিত হোক যাকে তুমি আবাদ রেখেছিলে। অতঃপর তাকে তার পরওয়ারদেগারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন আল্লাহ বলেন, তাকে তার শেষ সময় অবধির জন্য নিয়ে যাও।

রাসূল ﷺ বলেন, আর কাফেরের রূহ যখন বের হয় হাম্মাদ (র.) বলেন, রাসূল ﷺ তার দুর্গন্ধের কথা এবং তার প্রতি আল্লাহর লানতের কথা উল্লেখ করে বলেন- আকাশবাসীরা বলে, নোংরা রূহ জমিন থেকে এসেছে। আর বলা হয়, তাকে কিয়ামত অবধির জন্যে নিয়ে যাও। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, এ কথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গায়ে রাখা চাদরটি এভাবে নাকের উপর টেনে নিলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَبْطَةٌ : فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَيْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلٰى اَنْفِهِ هٰكَذَا রাবতাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে– চাদর। এখানে উদ্দেশ্য হলো তার এক কোনা। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, যেন কাপড়ের মাধ্যমে কাফেরের সে দুর্গন্ধময় রূহটি রাসূলে কারীম ﷺ -কে দেখানো হয়েছে এবং তার রূহের সে দুর্গন্ধটাও তাঁর নাকে অনুভব হয়েছে পরে তিনি চাদরের কোনা দিয়ে নাক চেপে ধরেছেন।

هٰكَذَا : আমি যেভাবে করছি এভাবে। অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর গায়ের চাদরটি ঐ বিশেষ পদ্ধতিতে নিজের নাকের উপর চেপে ধরেছেন যেভাবে রাসূল ﷺ ধরেছিলেন।

ইবনে হাজার মক্কী (র.) বলেন, সম্ভবত বিষয়টি উদাহরণ হিসেবেও হতে পারে। অর্থাৎ রূহের মাঝে এমন নোংরামি ও দুর্গন্ধ হবে যে, তা যদি তোমাদের কারো সামনে প্রকাশ পায় তাহলে তা থেকে তোমরা এভাবে নাক ঢেকে নেবে। –[মেরকাত]

وَعَنْهُ ١٥٤١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ الْمُؤْمِنُ اَتَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُوْلُوْنَ اخْرُجِىْ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ فَتَخْرُجُ كَاَطْيَبِ رِيْحِ الْمِسْكِ حَتّٰى اَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتّٰى يَاْتُوْا بِهٖ اَبْوَابَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَطْيَبَ هٰذِهِ الرِّيْحَ الَّتِىْ جَاءَتْكُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ بِهٖ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمْ اَشَدُّ فَرَحًا بِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ بِغَائِبِهٖ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْاَلُوْنَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُوْلُوْنَ دَعُوْهُ فَاِنَّهٗ كَانَ فِىْ غَمِّ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ قَدْ مَاتَ اَمَا اَتَاكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ قَدْ ذُهِبَ بِهٖ اِلٰى اُمِّهِ الْهَاوِيَةِ

১৫৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু আসন্ন হয় তখন রহমতের ফেরেশতাগণ সাদা রেশমি রুমাল নিয়ে হাজির হন এবং তাঁরা বলেন, তুমি সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত অবস্থায় বেরিয়ে এস। আল্লাহ প্রদত্ত সুখ-শান্তি, আল্লাহর রিজিক এবং রোষ-ক্রোধহীন পরওয়ারদেগারের দিকে। তখন রূহ মেশকের সুগন্ধির চেয়েও আরো উত্তম সুঘ্রাণসহ বেরিয়ে আসেন। আর ফেরেশতাগণ একে অপরের হাত থেকে তাকে নিতে থাকেন। এভাবে তারা তাকে আকাশের দরজাসমূহের সামনে নিয়ে আসেন। অতঃপর ফেরেশতাগণ বলেন, জমিনের দিক থেকে কত উত্তম সুগন্ধি তোমাদের কাছে এসেছে। এরপর ফেরেশতাগণ তাকে নিয়ে মু'মিনদের রূহসমূহের কাছে চলে আসেন। তখন তোমাদের কারো দূরদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়ের আগমনের কারণে যতটা আনন্দিত হও, মু'মিনগণ তাকে পেয়ে এর চেয়েও বেশি আনন্দিত হয়। মু'মিনগণ তাকে জিজ্ঞেস করেন, অমুকের কি খবর? অমুকের কি হয়েছে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। সে দুনিয়ার কষ্টে আবদ্ধ ছিল। নবাগত উত্তরে বলবে, সে তো মারা গেছে। সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন তারা বলবে, নিশ্চয় তাকে তার মা বা ঠিকানা হাবিয়া দোজখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

وَانَّ الْكَافِرَ اِذَا اُحْتُضِرَ اَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمَسْحٍ فَيَقُوْلُوْنَ اُخْرُجِيْ سَاخِطَةً مَسْخُوْطًا عَلَيْكَ اِلٰى عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَاَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ حَتّٰى يَأْتُوْنَ بِهٖ اِلٰى بَابِ الْاَرْضِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَنْتَنَ هٰذَا الرِّيْحُ حَتّٰى يَأْتُوْنَ بِهٖ اَرْوَاحَ الْكُفَّارِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

আর কাফেরের মৃত্যু যখন আসন্ন হয় তখন তার কাছে আজাবের ফেরেশতাগণ শক্ত চট নিয়ে আসেন এবং বলেন, তুমি অসন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্টিপ্রাপ্ত অবস্থায় আল্লাহর আজাবের দিকে বেরিয়ে এস! তখন সে সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত মরা লাশের দুর্গন্ধসহ বেরিয়ে আসে। এরপর ফেরেশতাগণ তাকে জমিনের দরজায় নিয়ে যায়। তখন তারা বলে, এটা কি খারাপ দুর্গন্ধ। এরপর ফেরেশতাগণ তাকে কাফেরদের রূহসমূহের কাছে নিয়ে যান। –[আহমদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَرِيْرَةٌ بَيْضَاءُ : শুভ্র রেশমি কাপড়। সম্ভবত সে কাপড়ে মু'মিনদের রূহকে মুড়ে নেওয়া হবে এবং আকাশে তুলে নেওয়া হবে। দুনিয়ার কাফনও সেভাবে তার বাহ্যিক শরীরের সঙ্গে থাকবে যা সাদা রঙের হয়ে থাকে।

لِيُنَاوِلَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا : তারা তাকে হাতে হাতে নিয়ে নেবেন। অর্থাৎ তার এমন সৌন্দর্য সুঘ্রাণের ফলে ফেরেশতাদের প্রত্যেকে তাকে হাতে নিতে চাইবেন, ফলে একজনের হাত থেকে আরেকজন নেবেন, আর এভাবে সে মু'মিন বান্দা আকাশের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে। এর দ্বারা তার সম্মানই প্রকাশ পাবে। এমন নয় যে, ফেরেশতাগণ ক্লান্ত হয়ে একে অপরের হাতে দিয়ে দেবেন।

فَيَقُوْلُوْنَ دَعُوْهُ : ফেরেশতাগণ বলবেন, তাকে তোমরা ছাড় বিশ্রাম করতে দাও। এখানে এ সম্ভাবনাও আছে যে, মু'মিনদের রূহগুলো যখন তাকে এর কথা ওর কথা জিজ্ঞেস করে, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে বাধা দেয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, একজন জিজ্ঞেস করলে অন্যরা তাকে এতবেশি জিজ্ঞেস করতে বাধা দেয়।

اُمُّهُ الْهَاوِيَةُ : হাবিয়া দোজখকে তার মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্রূপাত্মকভাবে বলা হলো যে, মা যেমন সকলের সর্বশেষ ঠিকানা, তেমনিভাবে বদকার ব্যক্তিদের জন্যে হাবিয়া দোজখই হচ্ছে সর্বশেষ ঠিকানা। কোনো বর্ণনায় এখানে এ অতিরিক্ত অংশটুকুও রয়েছে– فَبِئْسَتِ الْاُمُّ وَبِئْسَتِ الْمُرَبِّيَةُ অর্থাৎ 'কতইনা নিকৃষ্ট সে মা আর কতইনা নিকৃষ্ট সে প্রতিপালনকারিণী।'

حَتّٰى يَأْتُوْنَ بِهٖ اِلٰى بَابِ الْاَرْضِ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– بَابُ سَمَاءِ الْاَرْضِ অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশের দরজা। তথা প্রথম আসমানের দরজা। এ ব্যাখ্যাকে এর আগের হাদীসটি সমর্থন করে। সে হাদীসে রয়েছে– ثُمَّ عُرِجَ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ তবে এখানে দরজা দ্বারা জমিনের দরজাও উদ্দেশ্য হতে পারে। যার ফলে জমিনের দরজাগুলোতে বাধাপ্রাপ্ত হতে হতে সে সর্ব নিম্নস্তরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। আর কাফেরদের রূহের জায়গাও সেখানেই যাকে 'সিজ্জীন' বলা হয়।

وَعَنْ ١٥٤٢ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِنَا الطَّيْرَ وَفِيْ يَدِهٖ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهٖ فِى الْاَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِيْ اِنْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ اِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ اَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوْطُ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيْئُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اُخْرُجِيْ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِيْ يَدِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَأْخُذُوْهَا فَيَجْعَلُوْهَا فِيْ ذٰلِكَ الْكَفَنِ وَفِيْ ذٰلِكَ الْحَنُوْطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَاَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ يَعْنِيْ بِهَا عَلٰى مَلَأٍ مِنَ

১৫৪২. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে এক আনসারী লোকের জানাজায় বেরিয়েছি। আমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছলাম, কিন্তু তখনও কবর খোঁড়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে গেলেন এবং আমরাও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে এমনভাবে বসে গেলাম যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আসে। তখন তাঁর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যা দিয়ে তিনি মাটিতে দাগ কাটছিলেন। এরপর তিনি মাথা তুললেন এবং বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে পানাহ চাও। কথাটি তিনি দুবার বা তিনবার বললেন। এরপর বললেন, মু'মিন বান্দা যখন দুনিয়াকে বিদায় দিয়ে আখিরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসমান থেকে তার কাছে আসেন, যাঁদের চেহারা সূর্যের মতো। তাঁদের সঙ্গে বেহেশতের কাফনসমূহের একটি কাফন থাকে। বেহেশতের সুগন্ধিগুলোর একটি তাঁদের সঙ্গে থাকে। তারা সে ব্যক্তি থেকে দৃষ্টির দূরত্ব পরিমাণ দূরে অবস্থান করেন। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা [হযরত আযরাঈল (আ.)] আসেন। তিনি তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন, হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে! রাসূল ﷺ বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে যেমনিভাবে মশক থেকে পানি বের হয়ে আসে। তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যেও ঐ ফেরেশতাগণ তাকে মৃত্যুর ফেরেশতার হাতে থাকতে দেন না; বরং তাঁরা নিজেরাই তাকে গ্রহণ করেন এবং তাকে ঐ কাফনের কাপড় ও ঐ সুগন্ধির মাঝে রাখেন। ফলে তার থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাপ্ত সকল সুগন্ধির চেয়ে উত্তম মেশকের সুগন্ধ বের হতে থাকে।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন, আর যখনই তারা ফেরেশতাদের মধ্যে কোনো ফেরেশতাদলের

الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هٰذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهٰى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرٰى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللّٰهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عَمَلُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ أَحْسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ

নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, এ পবিত্র রূহ কার? তখন মানুষ দুনিয়াতে যেসব উপাধি দ্বারা ভূষিত করত সেসবের সর্বোত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে ফেরেশতাগণ বলেন, এ হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুকের রূহ। এভাবে তাঁরা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান। অতঃপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে বলেন, অমনি তাঁদের জন্যে দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তার পরবর্তী আসমান পর্যন্ত বিদায় সম্ভাষণ জানান। এভাবে তাকে নিয়ে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছানো হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা তোমরা ইল্লিয়্যীনে লিখ এবং তাকে জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর জমিন থেকে তাদেরকে আবার বের করে আনব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সুতরাং তার রূহ আবার তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর করে, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি? তখন সে বলে, আমার দীন হলো ইসলাম। তাঁরা আবার তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটি প্রেরিত হয়েছেন তিনি কে? সে উত্তরে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। তাঁরা তাকে আবারো জিজ্ঞেস করেন, তুমি এসব কিভাবে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার উপর ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমানের দিকে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্যে একটি বেহেশতী বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে একটি বেহেশতী পোশাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্যে বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

রাসূল ﷺ বলেন, তখন তার দিকে বেহেশতের সুখ-শান্তি ও বেহেশতের সুঘ্রাণ আসতে থাকে এবং তার জন্যে তার কবরকে তার দৃষ্টিসীমার দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ

فَيَقُوْلُ اَبْشِرْ بِالَّذِىْ يَسُرُّكَ هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِىْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهٗ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالْخَيْرِ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُوْلُ رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ حَتّٰى اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ قَالَ وَاِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ اِذَا كَانَ فِىْ اِنْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ اِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُوْدُ الْوُجُوْهِ مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِئُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اُخْرُجِىْ اِلٰى سَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ قَالَ فَتَفَرَّقُ فِىْ جَسَدِهٖ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّوْدُ مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ فَيَأْخُذُهَا فَاِذَا اَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِىْ يَدِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتّٰى يَجْعَلُوْهَا فِىْ تِلْكَ الْمُسُوْحِ وَتَخْرُجُ مِنْهَا كَاَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلٰى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا قَالُوْا مَا هٰذَا الرُّوْحُ الْخَبِيْثُ فَيَقُوْلُوْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِاَقْبَحِ اَسْمَائِهِ الَّتِىْ كَانَ يُسَمّٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهِىَ بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

বলেন, অতঃপর তার নিকট একজন সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ হচ্ছে ঐ দিন যেদিনের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছিল। তখন সে ঐ লোককে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার চেহারাতো এমন চেহারা যা কল্যাণ বয়ে আনে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম কর! হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে যেতে পারি।

রাসূল ﷺ বলেন, আর কাফের বান্দা যখন পৃথিবী ছেড়ে আখিরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন আকাশ থেকে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা তার কাছে অবতীর্ণ হন, যাদের সঙ্গে শক্ত চট থাকে। তাঁরা ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির দূরত্ব পরিমাণ দূরে অবস্থান করেন। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছে আসেন এবং তার মাথার কাছে বসেন। এরপর বলেন, হে নিকৃষ্ট আত্মা, আল্লাহর রোষের দিকে বের হয়ে এস। রাসূল ﷺ বলেন, এ সময় রূহ ভয়ে তার দেহের এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে টেনে বের করে আনে, যেমন লোহার গরম শিক ভেজা পশম থেকে টেনে বের করা হয়।

মালাকুল মাউত তাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু গ্রহণ করার পর মুহূর্তের জন্যে নিজের হাতে রাখে না; বরং অপেক্ষমাণ ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সে চটে জড়িয়ে নেন। তখন তার থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে যা পৃথিবীর সকল গলিত লাশের দুর্গন্ধের চেয়েও আরো বেশি দুর্গন্ধ। তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন। তাকে নিয়ে তাঁরা যখনই ফেরেশতাদের কোনো দলের কাছে পৌঁছেন, তখন তারা জিজ্ঞেস করেন, এ নিকৃষ্ট রূহটি কার? তখন দুনিয়াতে লোকেরা তাকে যেসব উপাধিতে ভূষিত করত সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপটি দিয়ে ভূষিত করে ফেরেশতাগণ বলবেন, এ হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুক। এভাবে তাকে প্রথম আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্যে আকাশের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়, কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না।

فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِىْ سِجِّيْنٍ فِى الْاَرْضِ السُّفْلٰى فَتُطْرَحُ رُوْحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِىْ جَسَدِهٖ وَيَاْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لاَ اَدْرِىْ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوْهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا اِلَى النَّارِ فَيَاْتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلاَعُهُ وَيَاْتِيْهِ رَجُلٌ قَبِيْحُ الْوَجْهِ قَبِيْحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ اَبْشِرْ بِالَّذِىْ يَسُوْءُكَ هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِىْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ مَنْ اَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالشَّرِّ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لاَ تُقِمِ السَّاعَةَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করেন– لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ 'তাদের জন্যে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।'

তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাঁর ঠিকানা সিজ্জীনে লিখ, জমিনের সর্বনিম্নস্তরে। ফলে তার রূহকে জমিনের উপর খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন– وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ 'যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়েছে, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে। অথবা ঝঞ্জাবায়ু তাকে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত করেছে।'

এরপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরওয়ারদেগার কে? সে বলে হায়! হায়! আমি তো জানি না। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন-ধর্ম কি? সে বলে, হায়! হায়! আমি তো জানি না। এরপর জিজ্ঞেস করেন, এ লোকটি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? সে বলে, হায়! হায়! আমি জানি না। এ সময় আকাশের দিক থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলে যে, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্যে দোজখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোজখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার দিকে দোজখের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবরটি তার জন্যে এত সংকুচিত হয়ে যায় যে, তার এক দিকের পাঁজরের হাড্ডি অপর দিকে ঢুকে যায়।

এ সময় তার নিকট একজন অতি কুৎসিত বিভৎস চেহারাবিশিষ্ট নোংরা অতি দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, তোমার অপছন্দনীয় বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ দিনটি সম্পর্কে দুনিয়াতে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করা হতো। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তোমার চেহারাটি এমন চেহারা যা খারাপ কিছু বয়ে আনে। তখন সে বলে, আমি

وَفِىْ رِوَايَةٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ إِذَا خَرَجَ رُوْحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِى السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَابٍ اِلَّا وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ اَنْ يُعْرَجَ بِرُوْحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ يَعْنِى الْكَافِرَ مَعَ الْعُرُوْقِ فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِى السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَابٍ اِلَّا وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ اَنْ لَا يُعْرَجَ رُوْحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

তোমার বদ আমল। তখন সে বলে, হে আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম করো না। অপর এক বর্ণনায়ও এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তবে সে বর্ণনায় এ অতিরিক্ত অংশটুকুও রয়েছে যে, যখন মু'মিন বান্দার রূহ বের হয়, তখন আকাশ ও জমিনের মধ্যস্থলে অবস্থিত ফেরেশতাগণ এবং আকাশের ফেরেশতাগণ সকলে তার জন্যে রহমতের দোয়া করতে থাকে এবং তার জন্যে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আর প্রত্যেক দরজায় দ্বাররক্ষক ফেরেশতাই আল্লাহর নিকট এ দোয়া করতে থাকেন যে, তার রূহ যেন ঐ ফেরেশতার দরজা দিয়ে উঠানো হয়।

পক্ষান্তরে বদকারের রূহ তার রগসহ টেনে বের করা হয়। আসমান-জমিনের মধ্যস্থলের ফেরেশতাগণ ও আসমানের ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ করতে থাকে এবং তার জন্যে আকাশের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর প্রত্যেক দরজার দ্বাররক্ষক ফেরেশতাই আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকেন যে, ঐ কাফেরের রূহ যেন তার দরজা দিয়ে না উঠানো হয়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَاَنَّ عَلٰى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرَ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা মাথা ঝুঁকিয়ে ডানে বামে না তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেন প্রত্যেকের মাথায় একটি করে পাখি বসে আছে আর তারা তাকে শিকার করতে চাচ্ছে এমনভাবে নিশ্চল হয়ে বসে আছে, নড়াচড়া করে না। রাসূল ﷺ -এর সাহাবীদের প্রতিচ্ছবি এমনই ছিল, অর্থাৎ তাঁরা চুপচাপ থাকেন, কথা বলেন না। আর পাখি শুধু নিশ্চুপ নিশ্চল বস্তুর উপরই বসে। আল্লামা জাওহারী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূল ﷺ -এর ভয়ে যখন তাঁরা চুপচাপ বসে থাকেন, তখন এমন মনে হয় যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। এ প্রবাদটির মূল হচ্ছে, কাক যখন উটের মাথায় বসে এবং চামড়ার পোকাগুলো খায় তখন উট তার মাথা আর নাড়ে না, যাতে কাক উড়ে চলে না যায়।

فِىْ يَدِهٖ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهٖ فِى الْاَرْضِ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ অবস্থাটি হচ্ছে একজন চিন্তিত ব্যক্তির অবস্থা। কেউ যখন একটি বিষয় নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে তখন সে তার হাতের কঞ্চি দিয়ে অন্যমনস্কভাবে জমিনে দাগ কাটতে থাকে।

تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ : এর অর্থ হচ্ছে, মশক থেকে যেমন পানির ফোঁটা খুব সহজে নির্গত হয়ে আসে, মু'মিন বান্দার রূহও এভাবে সহজে বের হয়ে চলে আসে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে– وَاِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ غَيْرَ ذٰلِكَ 'যদিও তোমরা বাহ্যিকভাবে এর বিপরীতটা দেখ।' এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে, আগে যে হাদীসসমূহে বিবৃত হয়েছে মরণকালে মু'মিন বান্দারই বেশি কষ্ট হয়, যেমন রাসূলে কারীম ﷺ -এরও কষ্ট হয়েছে। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে মু'মিন বান্দার প্রাণ এভাবে সহজে বের হয়ে যায়, তাহলে এ বৈপরীত্যের সমাধান কি?

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এর মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা শারীরিকভাবে কষ্ট পাওয়া একটি বিষয় আর রূহ সহজে বের হয়ে যাওয়া আরেকটি বিষয়। বরং কখনো এমন হয় যে, শারীরিক অধিক কষ্টের ফলে রূহ বের হওয়া সহজ হয়ে যায়। –[মেরকাত]

অর্থাৎ মরণকালে যে শারীরিক কষ্ট আমরা দেখতে পাই, তা একজন মু'মিন বান্দার ইহজীবনের বহুবিদ কষ্টের মধ্যে একটি কষ্ট, যা তার রূহ বের হওয়াকে সহজ করে দেয়।

اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِىْ فِىْ عِلِّيِّيْنَ : অর্থাৎ আমার বান্দার আমল তার নামের সঙ্গে লিখে রাখ عِلِّيِّيْنَ -এর মাঝে তথা মু'মিন ও একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্তদের তালিকায়। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, মু'মিনদের রূহসমূহ অবস্থান করে عِلِّيِّيْنَ নামক স্থানে, আর কাফেরদের রূহগুলো অবস্থান করে سِجِّيْن নামক স্থানে। আর প্রতিটি রূহের সঙ্গে তার শরীরের একটা অদৃশ্য সম্পর্ক থাকবে যা ইহকালীন সম্পর্কের মতো নয়; বরং তার তুলনা করা যায় অনেকটা ঘুমন্ত ব্যক্তির সঙ্গে। যদিও ঘুমন্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার রূহের সম্পর্ক যতটুকু মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার রূহের সম্পর্ক আরো গাঢ় হবে।

এ ব্যাখ্যার দ্বারাই পরস্পর বিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব। অর্থাৎ কোনো বর্ণনায় এসেছে, রূহগুলো عِلِّيِّيْنَ অথবা سِجِّيْن -এ অবস্থান করবে। আর কোনো বর্ণনায় রয়েছে, সেগুলো কবরের আঙ্গিনায় বিচরণ করবে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এরপরও রূহের জন্যে এদিক-সেদিক যাওয়ার অধিকার থাকবে। তিনি আরো বলেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন এক কবর থেকে অন্য কবরে স্থানান্তরিত করা হয় বা মৃত ব্যক্তির শরীর যদি ছিনভিন্নও হয়ে যায় তখনও দেহের সঙ্গে রূহের সম্পর্ক বহাল থাকে।

اَقِمِ السَّاعَةَ حَتّٰى اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ : এখানে 'আমার পরিবার ও আমার সম্পদ' দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। ফকীহ আবুল লায়ছ (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাত। পরিবার বলে হুর-গেলমান উদ্দেশ্য আর মাল দ্বারা বেহেশতের নাজ-নিয়ামত উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লামা তীবী (র.) বলেন, সম্ভবত এর দ্বারা সে পুনরায় জীবিত হওয়াকে কামনা করবে, যাতে সে দুনিয়াতে ফিরে এসে আরো বেশি নেক আমল করতে পারে, আল্লাহর রাস্তায় আরো বেশি খরচ করতে পারে এবং ছওয়াব বাড়িয়ে আরো উঁচু মর্যাদা হাসিল করতে পারে।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, اَقِمِ السَّاعَةَ বাক্যটি থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া বোধগম্য নয়।

اَلْمُسُوْحُ : এটি اَلْمِسْحُ শব্দের বহুবচন। অর্থ– মোটা কাপড়, খসখসে কাপড় বা মোটা চট।

اَلسَّفُّوْدُ : হচ্ছে লোহার শলা যার মধ্যে গোশত গেঁথে কাবাব তেরি করা হয়। শব্দটি একবচন, বহুবচন হচ্ছে– سَفَافِيْدُ

حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ : وَلَجَ يَلِجُ অর্থ হচ্ছে– প্রবেশ করা। سَمِّ الْخِيَاطِ হচ্ছে সুইয়ের মাথার ছিদ্র। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রবেশের পথ সংকীর্ণ বুঝানোর জন্য سَمُّ الْاِبْرَةِ উপমাটি বলা হয়ে থাকে। আর جَمَلْ উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বড় গুনাহের জন্যে। মোটকথা তাদের জান্নাতে প্রবেশ করার বিষয়টিকে একটি অসম্ভব বিষয়ের সঙ্গে লটকে দেওয়া হয়েছে। আর তা এ কারণে যে, তাদের এ মহাগুনাহ আপন অবস্থায় থেকে এ সংকীর্ণ পথ যদি তার আপন অবস্থায় থাকে তাহলে যৌক্তিক দিক থেকে সে পথে প্রবেশ করাটা অসম্ভব বিষয়। –[মেরকাত]

حَتّٰى تَخْتَلِفَ فِيْهِ اَضْلَاعُهُ : অর্থাৎ তার উভয় পাঁজরের হাড্ডিগুলো একদিক থেকে অপরদিকে চলে যাবে। এটাতো হচ্ছে কাফেরদের অবস্থা। আর মু'মিনদের ক্ষেত্রে বা কতিপয় আকাবিরে উম্মতের ক্ষেত্রেও যে এমনটি ঘটেছে, তা হচ্ছে ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরা। যেমন মা তার সন্তানকে জড়িয়ে ধরে। –[মেরকাত]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ (র.) 'সুনানে', হাকেম (র.) 'মুসতাদরাকে', ইবনে আবী শায়বা 'মুসান্নাফে', বায়হাকী (র.) 'কিতাবু আমালিল কবরে', তায়ালেসী (র.) ও আবদ ইবনে হুমায়েদ তাঁদের 'মুসনাদে', হান্নাদ ইবনুস সারি 'যুহদে', ইবনে আবী হাকাম ও ইবনে জারীর সহ অন্যান্যরা সহীহ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٤٣ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ اَتَتْهُ اُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَقَالَتْ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنْ لَقِيْتَ فُلَانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّى السَّلَامَ فَقَالَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ يَا اُمَّ بِشْرٍ نَحْنُ اَشْغَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلٰى قَالَتْ فَهُوَ ذَاكَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

১৫৪৩. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হযরত কা'ব (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন কা'বের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন উম্মে বিশর বিনতে আল বারা ইবনে মা'রূর তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! তুমি যদি অমুক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাও তাহলে তাকে আমার সালাম বলবে। হযরত কা'ব বললেন, উম্মে বিশর! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। আমরা তোমার এ কাজের চেয়েও বেশি ব্যস্ত থাকব। তখন উম্মে বিশর বললেন, আবূ আবদুর রহমান! তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুননি যে, মু'মিনদের রূহগুলো সবুজ পাখির মতো হবে আর সেগুলো জান্নাতের গাছে গাছে বেড়াবে। কা'ব বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। তখন উম্মে বিশর বললেন, আমিতো সে কথাই বলছি। –[ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنْ لَقِيْتَ فُلَانًا : অর্থাৎ অমুকের রূহের সঙ্গে যদি তোমার রূহের সাক্ষাৎ হয়। বাহ্যিকভাবে এটাই বুঝা যায় যে, তিনি অমুক দ্বারা তার পিতা বারার কথা বলতে চেয়েছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, কিন্তু পরে আমি এমন একটি বর্ণনা পেলাম যার দ্বারা বুঝা যায় তার উদ্দেশ্য ছিল তার ছেলে বিশর। ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, বিশর যখন মারা গেছে তখন তার মা মনে খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! বনু সালামার লোকেরা এভাবে মারা যেতেই থাকবে। মৃত লোকগুলো কি একে অপরকে চিনতে পারবে? তাহলে আমি বিশরের কাছে সালাম পাঠাব। রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ! আমার সত্তা যার হাতে তাঁর কসম! তারা একে অপরকে চিনতে পারবে যেভাবে গাছের মাথায় পাখিগুলো একে অপরকে চিনতে পারে।

এরপর থেকে যখনই বুন সালামার কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হতো উম্মে বিশর তার কাছে আসতেন। এসে বলতেন, হে অমুক! আলাইকাস সালাম। তখন সে জবাবে বলত ওয়া আলাইকি। এরপর উম্মে বিশর বলতেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে বিশরকে সালাম দিয়ো।

এক হাদীসে এসেছে, মু'মিনদের রূহগুলো একপ্রকার সবুজ পাখির পেটে অবস্থান করবে। এভাবে জান্নাতে বিচরণ করবে। তাঁর ফলফলাদি খাবে, পানি পান করবে এবং আরশের নিচে ঝাড়বাতির নিচে ঝুলে থাকবে।

কুরতুবী (র.) বলেন, কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সকল মু'মিনদের সকল রূহ জান্নাতে অবস্থান করবে। অর্থাৎ এ বিষয়টা শুধুমাত্র শহীদদের জন্যে খাস নয়। এ কারণে সে জান্নাতকে 'জান্নাতুল মাওয়া' নাম দেওয়া হয়েছে। কেননা রূহগুলো সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর ঐ জান্নাতটি হচ্ছে আরশের নিচে। সেখানে রূহগুলো নিয়ামত ভোগ করে।

وَعَنْ ١٥٤٤ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَعَلَّقُ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يُرْجِعَهُ اللّٰهُ فِىْ جَسَدِهٖ يَوْمَ يَبْعَثُهُ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

১৫৪৪. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনদের রূহসমূহ পাখি হয়ে যাবে এবং জান্নাতের গাছের ফল খাবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সেগুলোকে তাদের শরীরে ফিরিয়ে দেবেন। -[মালেক ও নাসায়ী, আর বায়হাকী কিতাবুল বা'ছে য়ান্নুশূর]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এখানে বলা হয়েছে, মু'মিনদের রূহ পাখি হবে। উপরের হাদীসে বলা হয়েছে পাখির মধ্যে হবে। মুসলিম ও তাবারানীর হাদীসে রয়েছে, শহীদগণের রূহ পাখির ঝোলায় থাকবে। এ সকল বর্ণনারই অর্থ হচ্ছে, পাখির মতো উড়ে উড়ে বেহেশতের বাগানের ফল খাবে, অথবা রূহ পাখিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে বেহেশতের ফল খাবে, অথবা পাখি হয়েই বেহেশতের ফল খাবে।

এখানে মনে রাখতে হবে, মু'মিনদের রূহ পাখিরূপে হলেও হিন্দুদের পুনর্জন্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা পুনর্জন্ম মতে, রূহ অপর যোনিতে হয়ে কর্মফল ভোগের জন্যে দুনিয়াতে ফিরে আসে, আর মু'মিনদের রূহ দুনিয়ায় আসে না। -[আ'যমী]

وَعَنْ ١٥٤٥ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (رحـ) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَمُوْتُ فَقُلْتُ اِقْرَأْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّلَامَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৫৪৫. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। তখন তিনি মৃত্যু মুখে পতিত। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম বলবেন। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মৃত্যুর পর রূহের স্থান : আ'যমী (র.) বলেন, ১৫৪৩ ও ১৫৪৪ নং হাদীসে বলা হয়েছে, মু'মিনদের রূহ বেহেশতে থাকবে। মুসলিম ও তাবারানীর হাদীসে রয়েছে, শহীদগণের রূহ বেহেশতে থাকবে। এর মীমাংসা করতে গিয়ে ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, সাধারণ মু'মিনদের রূহও বেহেশতেই থাকবে, তবে শহীদগণের রূহ সেখানে বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে এবং বেহেশতের তারকা হিসেবে থাকবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িমের 'কিতাবুর রূহ' -এ অপরাপর বর্ণনা অনুসারে বলা হয়েছে, গুনাহগার মু'মিনদের রূহ বেহেশতে থাকবে না। তাদের কারো রূহ কিয়ামত পর্যন্ত কবরে আবদ্ধ থাকবে, কারো রূহ রক্তের নদীতে সাঁতার কাটবে, আর কারো রূহ অর্থাৎ মুনাফেকদের রূহ আগুনের উনুনে থাকবে।

মোটকথা, যারা দুনিয়াতে থেকেই ঊর্ধ্ব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে, তাদের রূহ ঊর্ধ্ব জগতে যাবে। আর যারা দুনিয়ার ভালোবাসায় হাবুডুবু খেয়েছে, তাদের রূহ দুনিয়াতেই আবদ্ধ থাকবে। আর যারা যত নোংরা পথে চলেছে তাদের রূহ তত নোংরা স্থানে অবস্থান করবে। তাবেয়ীনদের অনেকের মতে, মৃত্যুর পর মু'মিনদের রূহ ইল্লিয়্যীনে আর কাফের-ফাজেরদের রূহ সিজ্জীনে থাকবে। অপর কয়েক হাদীসেও এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইল্লিয়্যীন হচ্ছে সপ্তম আকাশে আর সিজ্জীন হচ্ছে জমিনের সর্বনিম্নস্তরে।

আসলে এ সকল হাদীসের পরস্পরে কোনো বিরোধ নেই। কারণ মু'মিনদের রূহকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইল্লিয়্যীনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার নাম ও আমলের ফিরিস্তি তৈরি করার পর মুনকার ও নাকীরের সওয়ালের জন্যে কবরে পাঠানো হয়। অতঃপর গুনাহগারদের রূহ জমিনে আবদ্ধ থাকে, আর নেককারদের রূহ ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে এবং বেহেশতের নিয়ামত ভোগ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক মতানুসারে ইল্লিয়্যীন বেহেশতেরই নাম। এতদসত্ত্বেও রূহ কবরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। দেহবিহীন রূহের জন্যে এ বিষয়টি মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কারণ তখন রূহের শক্তি কল্পনাতীতভাবে বেড়ে যায় এবং চোখের পলকে ইল্লিয়্যীন থেকে কবরে আসতে পারে। জীবিতদের স্বপ্নে আমরা এর সামান্য নমুনা দেখতে পাই। -[আ'যমী]

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِيْنِهِ

পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন দান

কোনো মুসলমান মারা গেলে তাকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো ও দাফন করা ইত্যাদি অন্যান্য জীবিত মুসলমানদের উপর ফরজ। তবে এ ফরজটি ফরজে কেফায়া। কেউ না কেউ গোসল দিয়ে দিলে অন্যরা এ ওয়াজিব দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির গোসলের ক্ষেত্রে জীবিতদের গোসলের থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম বিষয় আছে। তাদেরকে কুলি করানো ও নাকে পানি দেওয়ার পদ্ধতি নেই।

পুরুষের কাফনের কাপড় তিনটি– ১. কামিজ– যা গলা থেকে পা পর্যন্ত, ২. ইজার– যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং ৩. লেফাফা: যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত তবে দুই দিকে এক বিঘত পরিমাণ অতিরিক্ত অংশসহ। মেয়েদের বেলায় এ তিনটি কাপড়ের সঙ্গে আরো দুটি কাপড় সংযুক্ত করাও সুন্নত– ১. সিনাবন্ধ ও ২. খিমার। প্রথমটি বুক থেকে পেট পর্যন্ত, আর দ্বিতীয়টি মাথার উপর দেওয়া হয় যা দুই দিকে কিছুটা লম্বা হবে।

কাফন পরানোর পদ্ধতি হচ্ছে, মাটির মধ্যে প্রথমত লেফাফা বিছাবে, এরপর ইজার, এরপর মৃত ব্যক্তিকে কামিজ পরিয়ে তার উপর শোয়াবে। মেয়েদেরকে কামিজ পরানোর পর সিনাবন্ধ ও খিমার পরাবে। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এ পদ্ধতিগুলো সংগৃহীত, যেসব হাদীস বিভিন্নভাবে এ বাবে বর্ণিত হয়েছে।

এ ছাড়া মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার আদব-কায়দা, গোসল দেওয়ার উপকারিতাসমূহ এবং কাফনের সকল ব্যবহার্য সামগ্রী ও কাফনের কাপড়ের গুণাগুণ ইত্যাদি সম্পর্কে এ বাবের বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥٤٦ اُمِّ عَطِيَّةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَقَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلٰثَةَ قُرُوْنٍ فَاَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৪৬. অনুবাদ : হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে পৌঁছলেন, তখন আমরা তাঁর মেয়েকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি এসে বললেন, তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার বা তার চেয়ে বেশিবার গোসল দাও যদি তোমরা তার প্রয়োজন আছে বলে মনে কর। গোসল দেবে বরই পাতার গরম পানি দিয়ে। আর শেষবারে কাফুর দেবে। অথবা তিনি বলেছেন, কিছু পরিমাণ কাফুর দেবে। তোমরা যখন গোসল দেওয়া থেকে অবসর হবে তখন আমাকে খবর দিয়ো। অতঃপর আমরা যখন গোসল দিয়ে সারলাম তখন তাঁকে খবর দিলাম। রাসূল ﷺ এসে একটি তহবন্দ আমাদের দিকে ছুড়ে দিলেন এবং বললেন, এটি তাকে পড়িয়ে দাও।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা তাকে বেজোর গোসল দাও– তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার। ডানদিক থেকে গোসল দেওয়া শুরু করবে এবং অজুর জায়গাগুলো থেকে শুরু করবে। উম্মে আতিয়্যা বলেন, আমরা তার চুলগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করলাম এবং পেছন দিকে ছেড়ে দিলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أُمُّ عَطِيَّةَ : তিনি হচ্ছেন نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ 'নুসাইবাহ বিনতে কা'ব'। কেউ বলেছেন, বিনতে হারিছ আল আনসারিয়্যাহ। নবী করীম ﷺ -এর হাতে বায়'আত হওয়ার পর থেকে তিনি অসুস্থদের সেবা এবং আহতদের চিকিৎসায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

تَغْسِلُ ابْنَتَهُ : কেউ বলেন, এ মেয়ে হচ্ছে আবুল আস ইবনে রাবীর স্ত্রী যয়নাব। তিনি অষ্টম হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। কেউ বলেছেন, হযরত ওসমান (রা.) -এর স্ত্রী উম্মে কুলসুম। তিনি হিজরতের নবম বর্ষে ইন্তেকাল করেছেন।

إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ : অর্থাৎ সাতবার ধোয়ার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, তা অবস্থার প্রেক্ষিতে হবে। অর্থাৎ পাঁচবার ধোয়ার পর যদি আরো ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে তাহলে সাতবার ধুবে। শুধু মন চাইলে করবে না।

بِمَاءٍ وَسِدْرٍ : এ অংশটি مُتَعَلِّقٌ হয়েছে اِغْسِلْنَهَا -এর সঙ্গে। কাজী (র.) বলেন, এর দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় না যে প্রত্যেকবার বরই পাতার গরম পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে; বরং শুধুমাত্র প্রথমবার তা দিয়ে গোসল দেওয়া মুস্তাহাব, যাতে ময়লা দূর হয়ে যায়, দ্রুত পচে যাওয়া থেকে সংরক্ষণ করে এবং পোকামাকড়কে বিরত রাখে।

ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে যে বিষয়টি প্রতিভাত হয় তা হচ্ছে অধিক পরিমাণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মূল পবিত্রতা নয়। কেননা মূল পবিত্রতার জন্যে শুধু পানিই যথেষ্ট। পানি গরম করার বিষয়টিও নিঃসন্দেহে এজন্যেই কাম্য। তাই এটি শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য ও কাম্য। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উতরাবে না।

ইবনে সীরীন (র.) উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে মৃত ব্যক্তি গোসলের নিয়মকানুন শিখে নিয়েছিলেন। সুনানে আবূ দাঊদের বর্ণনায় আছে, প্রথম দুবার বড়ই পাতার গরম পানি দিয়ে ধুবে, তৃতীয়বার পানি ও কাফুর দিয়ে ধুবে।

اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ : এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বোধন করেছেন যে, মহিলারা গোসল দিচ্ছিলেন তাদেরকে। هَا যমীর ফিরেছে بِنْتُ -এর দিকে এবং اِيَّاهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে حَقْو অর্থাৎ লুঙ্গি। শব্দটির অর্থ– লুঙ্গিটি তার গায়ে জড়িয়ে দাও। شِعَارٌ বলা হয় ঐ পোশাককে যা শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা এ লুঙ্গিটি তার কাফনের নিচে এমনভাবে দাও যেন তা তার চামড়ার সঙ্গে লেগে থাকে। এর দ্বারা বরকত পৌঁছানো উদ্দেশ্য। –[মেরকাত]

وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا : অজুর স্থানগুলো আগে ধুবে। অর্থাৎ অজুতে যে অঙ্গগুলো ধোয়া ওয়াজিব সেগুলো। তবে কুলি করাবে না ও নাকে পানি দেবে না। ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের মতে, মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে, যারা গোসল করায় তারা আঙ্গুলে কাপড় জড়িয়ে মৃত ব্যক্তির দাঁত, ঠোঁট, মুখের ভেতর ও নাকের ছিদ্র ইত্যাদি মুছে দেবে। মাথা মাসাহ করে দেবে। আর চেহারা থেকে ধোয়া শুরু করবে। –[মেরকাত]

ثَلٰثَةَ قُرُوْنٍ : আ'যমী (র.) বলেন, হানাফী ওলামায়ে কেরাম অন্য হাদীস মতে চুল দুই ভাগ করে বুকের উপর ছড়িয়ে দিতে বলেন।

وَعَنْ ١٥٤٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৪৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি ইয়েমেনী সাহুলী সাদা সুতি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল, যাতে কামিজ ও পাগড়ি ছিল না।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَحُوْلِيَّةٍ : ঐ কাপড় যা 'সাহুল' নামক স্থানে তৈরি হয়। সাহুল হচ্ছে ইয়েমেনের একটি এলাকার নাম।

كُرْسُفٍ : অর্থ হচ্ছে কঠিন সুতা। অর্থাৎ সুতি কাপড়।

لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ : 'মাওয়াহেব' গ্রন্থের মুসান্নিফ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাফনে কামিজ ছিল না। কেউ বলেছেন, কামিজ ও পাগড়ি ব্যতীত আরো তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে কাফনের

মাঝে কামিজ ও পাগড়ি মুস্তাহাব কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের পরস্পর মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে মুস্তাহাব হচ্ছে তিনটি লেফাফা, যার মধ্যে কোনো কামিজ ও পাগড়ি নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কাফনের কাপড় হচ্ছে তিনটি– ইজার, কামিজ ও লেফাফা। –[মেরকাত]

হানাফী মাযহাবে মূলত দু-ধরনের হাদীসের উপরই আমল করা হয়েছে। কোনো হাদীসে ইজার ও কামিজের উল্লেখ এসেছে, আর কোনো হাদীসে তিনটি কাপড়ের উল্লেখ এসেছে। হানাফী মাযহাবে এ তিনটি কাপড়কে এভাবে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে– ইজার, কামিজ ও লেফাফা। وَفِيْهِ بَحْثٌ طَوِيْلٌ

وَعَنْ ١٥٤٨ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৪৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার মুসলমান ভাইকে কাফন দেবে, তখন সে যেন তাকে উত্তমরূপে কাফন দেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আ'যমী (র.) বলেন, উত্তম দ্বারা এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণ কাফনকেই বুঝানো হয়েছে। শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে রয়েছে, সে যেন তার ভাইয়ের জন্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, পরিপূর্ণ ও সাদা কাপড় নির্বাচন করে। এর দ্বারা অপব্যয়ে অভ্যস্ত লোকেরা যে গর্ব, অহংকার ও লোক দেখানোর জন্যে দামি কাপড় ব্যবহার করে তা উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা শরিয়তে মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٤٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُلَبِّيًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ خَبَّابٍ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِىْ بَابِ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

১৫৪৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি [হজের সফরে] নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে ছিল। তার উষ্ট্রীটি তাকে ফেলে দিল এবং তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল। তখন লোকটি ইহরাম অবস্থায় ছিল। লোকটি মরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে বরই পাতার [গরম] পানি দিয়ে গোসল দাও এবং তার কাপড় দুটির মাঝেই তাকে কাফন দাও। তার গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ো না। তার মাথা ঢেকে দিয়ো না। কেননা সে কিয়ামতের দিন 'লাব্বাইক' বলতে বলতে পুনরুত্থিত হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীস অনুসারে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) মুহরিমকে তার ইহরামের দুই কাপড়েই অর্থাৎ একটি ইজার ও একটি চাদরেই দাফন করতে বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, মুহরিম ব্যক্তিকেও অন্যান্য মৃত ব্যক্তির মতোই কাফন পরাবে অর্থাৎ কামিজও থাকবে। এ হাদীসের ব্যাপারে তারা বলেন, এটি ঐ সাহাবীর জন্যে একটি বিশেষ বিধান ছিল যা অন্যত্র প্রযোজ্য নয়। –[আ'যমী]

অথবা প্রয়োজনের কারণে তাকে তার দুই কাপড়ে কাফন দিতে বলা হয়েছে, যা জায়েজ আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٥٥٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَمِنْ خَيْرِ اَكْحَالِكُمُ الْاِثْمِدُ فَاِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ اِلٰى مَوْتَاكُمْ)

১৫৫০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা তোমাদের কাপড়সমূহের মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। আর এর দ্বারাই তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও। আর তোমাদের সুরমাসমূহের মধ্যে ইছমিদটাই হলো সবচেয়ে উত্তম। কেননা তা কেশ জন্ম দেয় এবং দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।

–[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী, আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন مَوْتَاكُمْ শব্দ পর্যন্ত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَثْمِدْ : হামযা ও মীমে যের দিয়ে ن জযমবিশিষ্ট, একপ্রকারের পাথর যা থেকে সুরমা তৈরি হয়। উত্তম হচ্ছে এ সুরমা ঘুমের সময় লাগানো। কেননা নবী করীম ﷺ ঘুমের সময় সুরমা লাগাতেন। এছাড়া শোয়ার সময় সুরমা লাগালে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, ফলে উপকার বেশি হয়। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ সাদা কাপড় ব্যবহার করার বিষয়টি আদেশসূচক শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে তার প্রতি গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে। নচেৎ এটি মুস্তাহাব বিষয়।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি খবর হিসেবে বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এটি মানুষের একটি সাধারণ নিয়ম, যা তারা উত্তম পদ্ধতি হিসেবে করে থাকে। আর এ দুটি বিষয় একসঙ্গে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, দুটি বিষয়ই সাজসজ্জা জাতীয়।

١٥٥١ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُغَالُوْا فِي الْكَفَنِ فَاِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيْعًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

১৫৫১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাফনে বেশি খরচ করো না। কেননা তা খুব দ্রুতই ছিনিয়ে নেওয়া হবে। –[আবূ দাঊদ]

١٥٥٢ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِيْ ثِيَابِهِ الَّتِيْ يَمُوْتُ فِيْهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

১৫৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার মৃত্যু আসন্ন হলে তখন তিনি নতুন কাপড় আনিয়ে নিলেন এবং তা পরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ঐ কাপড়েই উঠানো হবে যে কাপড়ে মারা যায়। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসটিকে যদি তার বাহ্যিক অর্থে নেওয়া হয় তাহলে তা অন্যান্য হাদীসের সঙ্গে বৈপরীত্যপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা অন্যান্য হাদীসে এর বিপরীত বক্তব্য এসেছে। ইমাম জাওযী (র.) বলেন, হযরত আবূ সাঈদ

খূদরী (রা.) এ হাদীসটিকে তার বাহ্যিক অর্থে নিয়েছেন। কাফন বিষয়ে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঐ ভালোমন্দ অবস্থা যে অবস্থার উপর সে মৃত্যুবরণ করে। যে আমলের উপর তার সমাপ্তি। যেমন– কোনো ব্যক্তির আমল যদি স্বচ্ছ এবং দোষ-ত্রুটিমুক্ত হয় তাহলে তার ব্যাপারে বলা হয়– فُلَانٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ। তদ্রূপ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-এর তাফসীরে বলা হয়েছে– عَمَلَكَ فَاصْلِحْ 'তোমার আমলকে শুদ্ধ কর।' সুতরাং এ হাদীসেও কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার জাত ও সত্তা।

وَعَنْ ١٥٥٣ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْاُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الْاَقْرَنُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ)

১৫৫৩. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সর্বোত্তম কাফন হচ্ছে জোড়া কাপড়, আর সর্বোত্তম কুরবানির পশু হচ্ছে শিংবিশিষ্ট দুম্বা। –[আবূ দাঊদ, আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحُلَّةُ : দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কামিজের উপর এক ইজার ও একটি চাদর বা লেফাফা। এটা হচ্ছে সুন্নত। আর কামিজ ছাড়া হলে তা হচ্ছে প্রয়োজন মাফিক। আর 'হুল্লাহ' বলা হয় একপ্রকারের দুটি কাপড়কে। এ হাদীসের আলোকে কেউ বলেছে, ইয়েমেনী ডোরাকাটা চাদর দিয়ে কাফন দেওয়া উত্তম। কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুসারে সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়াই সবচেয়ে উত্তম; যেমনটা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ١٥٥٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ وَاَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫৫৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম দিয়েছেন, যেন তাদের শরীর থেকে লোহা ও চামড়ার পোশাক খুলে নেওয়া হয় এবং তাদের শরীরের রক্ত ও বস্ত্রের সঙ্গে যেন দাফন করে দেওয়া হয়। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ : অর্থাৎ তাদেরকে তাদের রক্তমাখা জামাসহ কবর দিয়ে দিতে বলেছেন। এ হাদীসে গোসল করানো এবং নামাজ পড়ার কোনো উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শহীদকে গোসলও করানো হবে না, তার জানাজার নামাজও পড়া হবে না। কেননা সে এমনিতেই ক্ষমাপ্রাপ্ত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তাকে গোসল দেওয়া হবে না, তবে তার জানাজার নামাজ পড়া হবে।

শহীদদের গোসল না দেওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। এ বিষয়ে মতভেদ নেই। কিন্তু নামাজ পড়া না পড়ার ব্যাপারে দু-ধরনের হাদীসই রয়েছে। ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হচ্ছে, সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস যে, নবী করীম ﷺ ওহুদের শহীদদের জানাজার নামাজ পড়েননি। কিন্তু এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের জানাজার নামাজ পড়েছেন। এছাড়া রাসূল ﷺ হযরত হামযা (রা.)-সহ আরো অনেকের জানাজার নামাজ পড়েছেন বলে প্রমাণিত আছে, যা মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হয়েছে। তাই مُثْبِتْ এবং نَافِيْ -এর মূলনীতি হিসেবেও শহীদদের উপর নামাজ পড়ার দিকটিকেই প্রাধান্য দিতে হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৫৫৫ - عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اُتِىَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ كُفِّنَ فِىْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّىَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِنْ غُطِّىَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَاُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَلَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِىْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৫৫৫. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে ইবরাহীম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) -এর কাছে খানা নিয়ে আসা হলো, তখন তিনি রোজাদার ছিলেন। তিনি বললেন, হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরকে শহীদ করা হলো, তখন তাঁকে শুধুমাত্র একটি চাদরে কাফন দেওয়া হলো, সে চাদরে তাঁর মাথা ঢেকে দেওয়া হলে পা দুটি খুলে যায়, পা দুটি ঢেকে দিলে মাথা খুলে যায়, অথচ তিনি আমার চেয়ে উত্তম মানুষ ছিলেন।

হযরত ইবরাহীম বলেন, আমার মনে হয় তিনি একথাও বলেছেন যে, হামযা শহীদ হলেন, অথচ তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। এরপরে দুনিয়া আমাদের জন্যে এত প্রশস্ত করে দেওয়া হলো যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অথবা বলেছেন দুনিয়া আমাদেরকে এত পরিমাণে দেওয়া হলো, যা দেখতে পাচ্ছ। যার কারণে আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের নেক আমলের প্রতিফল আমাদেরকে আগেভাগে দুনিয়াতেই দেওয়া হয়ে গেল কিনা! একথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং খানা খাওয়া ছেড়ে দিলেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بُسِطَ لَنَا : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিজয় ও গনিমতের মাধ্যমে বা ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে যে সাহাবায়ে কেরাম ধনসম্পদের মালিক হয়ে গেছেন সেদিকে ইঙ্গিত করা।

حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অর্থাৎ আমরা এ ভয় করতে শুরু করেছি যে, আমরা সে দলের দলভুক্ত হয়ে গেছি যে দলের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَدْحُوْرًا অর্থাৎ 'যে আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করে আমি তাদের যা ইচ্ছা এখানেই দিয়ে থাকি। পরে তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশে করবে নিন্দিত অবস্থায় ও অনুগ্রহ থেকে দূরীভূত অবস্থায়।' -[সূরা ইসরা : আয়াত- ১৮]

এমনিভাবে যাদের ব্যাপারে অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভার পেয়েছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ।' -[সূরা আহকাফ : আয়াত- ২০]

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে এ ধমক দিয়েছেন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) প্রবল ভয়ের কারণে এ আশঙ্কা করেছিলেন যে তিনিও এ অভিশপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত কিনা? নচেৎ বাস্তবিকভাবে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেসব লোক যারা শুধু ইহ দুনিয়াকেই কামনা করে, এছাড়া আখিরাত তাদের লক্ষ্য নয়। যাদের বেঁচে থাকাই হচ্ছে ভালো খাওয়া ও ভালো পরার জন্য এবং যারা তাদের জীবনকে শুধুমাত্র খেল-তামাশায় কাটিয়ে দেয়। ইলম ও আমলের প্রতি যাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এ রাস্তায় তারা কোনো প্রকার কষ্ট করতে রাজি নয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করা যে নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ামত ভোগ করে ইলম ও আমলের জন্যে শক্তি অর্জন করে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, এ আয়াতদ্বয়ের দ্বারা সে কখনো উদ্দেশ্য নয়; বরং নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ফল খেয়েছেন, পানি পান করেছেন এরপর এভাবে দোয়া পাঠ করেছেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আ'যমী (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, তিন বা দুই কাপড় সম্ভব না হলে এক কাপড়ে এমনকি অসম্পূর্ণ কাপড়ে দাফন করাও জায়েজ আছে।

وَعَنْ ١٥٥٦ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ حُفْرَتَهٗ فَاَمَرَ بِهٖ فَاُخْرِجَ فَوَضَعَهٗ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهٖ وَاَلْبَسَهٗ قَمِيْصَهٗ قَالَ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৫৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আসলেন এবং তাকে কবর থেকে উঠানোর জন্যে আদেশ দিলেন। তাকে কবর থেকে বের করে আনা হলো। রাসূল ﷺ তাকে নিজের দুই হাঁটুর উপর রাখলেন এবং তার কাফনের উপর নিজের থুথু মারলেন। এছাড়া তিনি তাঁর নিজের জামাটিও তাকে পরিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী জাবের (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাসূল ﷺ -এর চাচা হযরত আব্বাসকে একটি জামা পরিয়ে দিয়েছিল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : বদর যুদ্ধে হযরত আব্বাস (রা.) কাফের অবস্থায় মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়ার পর তাঁর গায়ে জামা ছিল না। তিনি রাসূল ﷺ -এর চাচা হওয়ার সুবাদে অনেকে তাঁকে জামা পরাতে চাইলেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামা ব্যতীত অন্য কারো জামাই তাঁর শরীরের সঙ্গে খাপ খেল না। তখন আব্দুল্লাহ তার জামাটি হযরত আব্বাস (রা.)-কে পরিয়ে দিল। রাসূল ﷺ তাই তাঁকে নিজের জামা দিয়ে তারই প্রতিদান দিলেন। কিন্তু এ ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে মুনাফিকদের জানাজার নামাজ পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন- وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ অর্থাৎ 'মুনাফিকদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাজা পড়বেন না এবং দোয়ার জন্যে তার কবরের নিকটও দাঁড়াবেন না।' -[সূরা তাওবা : আয়াত- ৮৪] -[আ'যমী]

এ প্রসিদ্ধ মুনাফিকের জানাজার নামাজ পড়া এবং নিজের গায়ের জামা খুলে তাকে পরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মোল্লা আলী কারী (র.) তাঁর 'মেরকাত' গ্রন্থে।

بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ وَالصَّلٰوةِ عَلَيْهَا

পরিচ্ছেদ : লাশের অনুগমন ও জানাজার নামাজ

جَنَازَةٌ : এর দ্বারা লাশ রাখার খাটও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার স্বয়ং লাশও উদ্দেশ্য হতে পারে। অভিধান গ্রন্থ 'মাগরিব' -এ রয়েছে جَنَازَةٌ যের দিয়ে হলে এর অর্থ হচ্ছে– খাট, আর যবর দিয়ে جَنَازَةٌ অর্থ হচ্ছে– লাশ। আবার কেউ এর বিপরীতও বলেছেন। اَلصَّلٰوةُ শব্দটি عَطْف হয়েছে اَلْمَشْيُ শব্দের উপর। অর্থাৎ জানাজার নামাজ পড়া।

মৃত ব্যক্তির উপর নামাজ পড়া একটি ফরজে কেফায়া আমল। কেউ পড়ে ফেললে তা সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ আদায় না করে তাহলে সবাই গুনাহগার হবে। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ব্যতীত তার উপর নামাজ পড়া জায়েজ নেই। যদি কোনো মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো ব্যতীতই কবরে রাখা হয় কিন্তু এখনো মাটি দেওয়া হয়নি, তাহলে তাকে উঠিয়ে গোসল দেবে এরপর মাটি দেবে। তবে মাটি দেওয়া হয়ে গেলে তাকে আর মাটি খুঁড়ে তুলবে না এবং কবরের উপর জানাজার নামাজ পড়বে না।

জানাজার নামাজ আদায় করার পদ্ধতি হচ্ছে, নিয়ত করে প্রথম তাকবীর বলে হাত বেঁধে দাঁড়াবে। অতঃপর নামাজের শুরুতে যে ছানা পড়া হয় অর্থাৎ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ পুরা পড়বে এবং দ্বিতীয় তাকবীর বলবে। দ্বিতীয় তাকবীরের পর নামাজের বৈঠকে যে দরূদ পড়া হয় সে দরূদ অর্থাৎ দরূদে ইবরাহীম পাঠ করবে। এরপরে তৃতীয় তাকবীর বলবে এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ .

উপরিউক্ত দোয়াটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পড়বে চাই মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী হোক। আর যদি মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে ছেলেদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا .

আর মেয়েদের বেলায় নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً .

উভয়ের জন্যে একই দোয়া শুধুমাত্র যমীরগুলো مُذَكَّرٌ -এর পরিবর্তে مُؤَنَّثٌ এবং সিফতের শব্দ مُؤَنَّثٌ উচ্চারণ করবে। –[আ'যমী]

এছাড়া গায়েবী জানাজার নামাজ পড়া, নামাজে তাকবীর বলা, হাত উঠানো, সূরা পড়া-নাপড়া, লাশের সঙ্গে চলা, লাশ দাফন করা পর্যন্ত সঙ্গে থাকার ফজিলত এবং জানাজার আদব-এহতেরাম রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস এ পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥٥٧ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهٗ عَنْ رِقَابِكُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৫৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাজা দাফনের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কর। কেননা সে যদি নেককার হয়ে থাকে তাহলে তো ভালো। তোমরা তাড়াতাড়ি তাকে তার ভালো ফলের দিকে এগিয়ে দাও। আর যদি এর অন্যথা হয় তাহলে সে খারাপ, সে খারাপকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে রেখে দিলে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ : এখানে দ্রুত চলার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাভাবিক হাঁটার চেয়ে একটু দ্রুত হাঁটা; দৌড়া উদ্দেশ্য নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর 'আল উম্ম' গ্রন্থে বলেন, জানাজা নিয়ে এমনভাবে হাঁটবে যে হাঁটা হাঁটার গতিতে সবচেয়ে দ্রুত। কিন্তু এমনভাবে দৌড়াবে না যার ফলে জানাজায় আগমনকারী দলের জন্যে পেছনে পেছনে আসা কষ্টকর হয়ে যায়। তবে যদি কোনো লাশ ফুলে যাওয়া, ফেটে যাওয়া বা অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে দৌড়ে যেতে কোনো সমস্যা নেই।

হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি নেককার হোক বা বদকার হোক সর্বাবস্থায় তাকে তাড়াতাড়ি দাফন করাই উত্তম। যদি নেককার হয় তাহলে বেহেশতী মানুষ দ্রুত বেহেশতের কাছাকাছি চলে যাওয়াই তার জন্যে উত্তম। আর যদি বদকার হয় তাহলে এ নিকৃষ্ট লাশকে দীর্ঘক্ষণ নিজেদের মাঝে ধরে রাখার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই; বরং যত দ্রুত তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের ঘাড়কে মুক্ত করা যায় ততই উত্তম।

وَعَنْ ١٥٥٨ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৫৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লাশ খাটে রাখার পর লোকেরা যখন তাকে কাঁধে তুলে নেয় তখন মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয় তাহলে বলে, তোমরা আমাকে সামনে নিয়ে চল। আর যদি সে বদকার হয় তাহলে সে নিজের পরিবারের লোকদের বলে, হায়! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তার এ আওয়াজ মানুষ ব্যতীত সবাই শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনত, তাহলে বেহুঁশ হয়ে মারা যেত। –[বুখারী]

وَعَنْهُ ١٥٥٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন জানাজা দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে জানাজার সঙ্গে চলে সে যেন জানাজা রাখার আগে না বসে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : জানাজা দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়ার এ হাদীস সম্পর্কে কাজি ইয়ায (র.) বলেন, দাঁড়ানোর এ আদেশটি হয়তো মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে হবে, অথবা মৃত্যুর ভয়াবহতা অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে এবং এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে যে, এটি এমন এক অবস্থা যে অবস্থা দেখে একজন মানুষ মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে যাবে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সে তার আপন অবস্থায় স্থির থাকতে পারে না। ফলে অস্থির হয়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক হাদীসে এসেছে– إِنَّمَا الْمَوْتُ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا অর্থাৎ 'মৃত্যু একটি ভয়ানক জিনিস, সুতরাং তোমরা কোনো জানাজা দেখলে দাঁড়িয়ে যাও।' অবশ্য এ দাঁড়ানোর দ্বারা জানাজার নামাজের জন্যে দাঁড়ানোও উদ্দেশ্য হতে পারে।

জানাজা দেখে দাঁড়ানো না দাঁড়ানোর বিষয়ে দু-ধরনের হাদীস রয়েছে। আলোচ্য হাদীসে দাঁড়ানোর কথা রয়েছে, আর পরবর্তীতে উল্লিখিত হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে না দাঁড়ানোর কথাও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'শরহুস সুন্নাহ' গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর হাদীসটি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীস إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا -কে রহিত করেছে। আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেন, চাইলে দাঁড়াবে, আর চাইলে বসবে। কোনো কোনো সাহাবীর ব্যাপারে বর্ণিত আছে তাঁরা জানাজার আগে আগে যেতেন এবং জানাজা তাদের কাছে পৌছা পর্যন্ত তাঁরা বসে থাকতেন। ইমাম ত্বাহাভী (র.) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জানাজা দেখে দাঁড়ানোর হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। وَفِيْهِ بَحْثٌ

وَعَنْ ١٥٦٠ جَابِرٍ (رض) قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا يَهُوْدِيَّةٌ فَقَالَ اِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَاِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৬০. অনুবাদ : হযরত জাবের (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একটি জানাজা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। তখন তার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এটি একটি ইহুদি মহিলার লাশ। তিনি উত্তরে বললেন, মৃত্যু একটি ভয়ানক বিষয়। সুতরাং তোমরা যখন কোনো লাশ দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٥٦١ عَلِيٍّ (رض) قَالَ رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِيْ فِي الْجَنَازَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَاَبِيْ دَاوٗدَ قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ.

১৫৬১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা [লাশ দেখে] রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়াতে দেখেছি, ফলে আমরাও দাঁড়িয়েছি। আবার তাঁকে বসতে দেখেছি, ফলে আমরাও বসেছি। ইমাম মালেক ও আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ জানাজা দেখে প্রথমে দাঁড়াতেন এরপর বসে থাকতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসের দুটি অর্থ হতে পারে− ১. লাশ দেখে রাসূল ﷺ যখন দাঁড়াতেন তখন আমরাও দাঁড়াতাম, আর তিনি যখন বসতেন আমরাও তখন বসতাম। ২. যে কালে রাসূল ﷺ লাশ দেখে দাঁড়াতেন আমরাও তখন দাঁড়াতাম, আর যখন তিনি তা ত্যাগ করলেন তখন আমরাও তা ত্যাগ করলাম। দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে বুঝা যায়, [illegible]নার বিধানটি প্রথমে ওয়াজিব ছিল− পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

وَعَنْ ١٥٦٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের নিয়তে কোনো মুসলমানের জানাজার সঙ্গে থেকেছে এবং তার সঙ্গে থেকে তার নামাজ পড়েছে এরপর তার দাফন সম্পন্ন করেছে, সে দুই কীরাত পরিমাণ ছওয়াব নিয়ে ফিরেছে, সে প্রতিটি কীরাত হচ্ছে ওহুদ পাহাড়ের মতো। আর যে ব্যক্তি তার নামাজ পড়ে দাফনের আগে চলে এসেছে, এক কীরাত ছওয়াব নিয়ে ফিরেছে। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ١٥٦٣ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعٰى لِلنَّاسِ النَّجَاشِىَّ الْيَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নাজাশী যেদিন মারা গেলেন সেদিন নবী করীম ﷺ লোকদেরকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানালেন এবং তাদেরকে নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হয়ে গেলেন। এরপর তাদেরকে কাতার বন্দি করালেন এবং চারটি তাকবীর দিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَعٰى لِلنَّاسِ : نَعٰى শব্দের অর্থ হচ্ছে– মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন। শব্দটি **نَعَاهُ نَعْوًا وَنَعْيًا** থেকে সংগৃহীত।

اَلنَّجَاشِىَّ : শব্দটির **نُوْن** হরফে যের ও যবর দুটিরই বর্ণনা আছে তবে যের দিয়ে বেশি সহীহ। তিনি হচ্ছেন হাবশা দেশের বাদশাহ। তাঁর নাম ছিল **اَصْحَمَهْ** [আসহামাহ]। তিনি রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান এনেছেন, কিন্তু রাসূল ﷺ -কে দেখেননি। মুহাজির মুসলমানদের জন্যে তিনি এক মজবুত আশ্রয়স্থল ছিলেন। নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ নবী করীম ﷺ এভাবে দিয়েছিলেন– **قَدْ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ صَالِحٌ يُقَالُ لَهُ اَصْحَمَةُ فَقُوْمُوْا عَلَيْهِ** অর্থাৎ 'আজ এক সৎ ও নেক বান্দা মারা গেছে, যাকে 'আসহামাহ' নামে ডাকা হয়, তোমরা তাঁর নামাজে দাঁড়াও।' অন্য এক বর্ণনায় আছে রাসূল ﷺ বলেছেন– **قُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلٰى اَخِيْكُمُ النَّجَاشِىِّ** অর্থাৎ 'তোমরা দাঁড়াও এবং তোমাদের ভাই নাজাশীর জানাজার নামাজ পড়।' তখন তাদের কোনো একজন বলেন উঠল, এক হাবশী বন্য মানুষের জানাজার নামাজ পড়তে রাসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করছেন! তখন তার এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করেন–

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ .

এ হাদীসের আলোকে ইমাম শাফেয়ী (র.) অনুপস্থিত লাশের নামাজ পড়া জায়েজ মনে করেন। হযরত ইবনে হাজার মক্কী (র.) বলেন, গায়েবানা জানাজার পক্ষে এ হাদীসটি স্পষ্ট দলিল। কিন্তু হানাফী ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এ হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্যে এটি একটি খাস ঘটনা ছিল; অন্যদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

আলোচ্য হাদীসকে এভাবে ব্যাখ্যা করার দুটি মৌলিক কারণ রয়েছে–

১. একটি কারণ হচ্ছে, রাসূলের এমন বহু প্রিয় মানুষ সাহাবায়ে কেরাম দূরদূরান্তে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের কারো গায়েবানা জানাজা পড়েননি বা কাউকে পড়তে বলেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় এটি সাধারণ ব্যাপক কোনো হুকুম নয়, তাই তা অনুসরণের কোনো বিষয় নয়।
২. দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, নাজাসীর জানাজার বিষয়ে অনেকগুলো অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে, তন্মধ্যে বর্ণনায় এমনও রয়েছে যে, নাজাশীর লাশকে রাসূল ﷺ -এর সামনে করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে রাসূল ﷺ -এর জন্যে তা গায়েবানা জানাজা ছিল না, বরং এটি তাঁর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেরই বহিঃপ্রকাশ। এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখেই আলোচ্য হাদীসকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। –[মেরকাতের আলোকে]

وَعَنْ ١٥٦٤ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى (رحـ) قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاِنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৬৪. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) আমাদের জানাজার নামাজগুলোতে চার তাকবীর বলতেন। কিন্তু একবার তিনি এক জানাজায় পাঁচ তাকবীর বললেন। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেও করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : জানাজার নামাজে চার তাকবীরের বিষয়ে সমগ্র উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। আলোচ্য হাদীসের ব্যাপারে ইমাম নববী (র.) বলেন, উম্মতের ইজমা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা ইবনে আবদুল বারসহ আরো ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা উদ্ধৃত করেছেন যে, চার তাকবীরের অতিরিক্ত তাকবীর দেওয়া হবে না। আর এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) -এর ঘটনার পর এ ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে। তবে সহীহ মতানুসারে কারো কারো দ্বিমত থাকা অবস্থায়ও ইজমা হতে পারে।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এখানে এ সম্ভাবনাও আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (র.) ভুলে পাঁচ তাকবীর দিয়ে ফেলেছেন, এরপর পাঁচ তাকবীর দেওয়া সত্ত্বেও সে নামাজ সহীহ হয়ে গেছে– একথা প্রমাণ করার জন্যে তিনি রাসূল ﷺ -এর নামাজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ ও এককালে পাঁচ তাকবীরে জানাজার নামাজ পড়েছেন। কেননা উক্ত হাদীসে এমন কোনো কথা পাওয়া যায় না যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) পাঁচ তাকবীরে জানাজার নামাজ পড়ার হাদীসটি রহিত হওয়ার প্রবক্তা নন।

وَعَنْ ١٥٦٥ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ (رحـ) قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৫৬৫. অনুবাদ : হযরত ত্বালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের পেছনে এক জানাজার নামাজ পড়েছি। তিনি সেই নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন এরপর বলেছেন, আমি তা এজন্যে পড়েছি যাতে তোমরা জানতে পার যে, এটা সুন্নত। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত এটাই যে, জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়া হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম ছাওরী (র.) -এর মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাজার নামাজে কখনো সূরা ফাতেহা পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। কোনো কোনো সাহাবী থেকে যে জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়ার কথা বর্ণিত আছে তা হচ্ছে দোয়া বা ছানা হিসেবে। –[আ'যমী]

অর্থাৎ জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা বা কুরআনের অন্য কোনো অংশ তেলাওয়াতের কোনো বিধান নেই। যার ফলে সাধারণ আমলও তা ছিল না। আর সে কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমি যে কাজটি করেছি তা কোনো বিদ'আত নয়। এটি করলে করা যেতে পারে। ওলামায়ে কেরাম তাঁর এ আমলের একটি সহীহ ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, জানাজার নামাজে ছানা পড়ার একটি বিধান রয়েছে, আর সে বিধানটিই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূরা ফাতেহার মাধ্যমে সম্পাদন করেছেন। যার মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ হামদ ও ছানা রয়েছে।

وَعَنْ ١٥٦٦ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَ وَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَ عَذَابَ النَّارِ قَالَ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৬৬. অনুবাদ : হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়লেন। তখন তিনি যে দোয়া পড়েছিলেন, আমি তা মুখস্থ করে রেখেছি। তিনি বলেছিলেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ الخ 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার প্রতি দয়া কর। তাকে শান্তিতে রাখ এবং তাকে মাফ কর। তাকে সম্মানজনক আতিথ্য দান কর। তার প্রবেশদ্বার প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও শিলা দ্বারা ধুয়ে দাও। তাকে তার গুনাহসমূহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে নাও যেভাবে তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করে দিয়েছ। তুমি তাকে তার ঘরের চেয়ে উত্তম ঘর দান কর এবং তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দান কর, তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান কর। তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবরের আজাব ও জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচিয়ে রাখ। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে– এবং তাকে কবরের ফিতনা থেকে ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখ। –[মুসলিম]

বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এ দোয়ার ফলে আমি কামনা করেছিলাম যে, এ মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম!

وَعَنْ ١٥٦٧ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رض) اَنَّ عَائِشَةَ (رض) لَمَّا تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَتْ اَدْخِلُوْا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّٰى اُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَاُنْكِرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِبْنَىْ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَاَخِيْهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৬৭. অনুবাদ : হযরত আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) ইন্তেকাল করলেন তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, তাকে মসজিদে নিয়ে এস যাতে আমি তার জানাজার নামাজ পড়তে পারি। কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাব লোকেরা গ্রহণ করতে চাইল না। তখন তিনি বললেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়যার দুই ছেলে সুহায়েল ও তার ভাইয়ের জানাজার নামাজ মসজিদে পড়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ : তিনি আশারায়ে মুবাশশারার একজন এবং কাদেসিয়া যুদ্ধের সেনাপতি। মদিনা থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত আকীক নামক স্থানে তাঁর বাড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। মানুষের কাঁধে কাঁধে করে তাঁকে মদিনায় নিয়ে আসা হয়েছে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করার জন্যে। তখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর খেলাফত চলছিল।

اِبْنَيْ بَيْضَاءَ : দুই ছেলের এক ছেলের নাম سُهَيْل [সুহায়েল]। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অপর ছেলের নাম ছিল سَهْل [সাহল] তারা উভয়ে নবম হিজরিতে মারা গেছেন। বায়যা হচ্ছেন তাদের মা, যার নাম ছিল دَعْد [দা'দ] বিনতে জাহদাম। তাদের বাপের নাম ছিল আমর ইবনে ওয়াহব ইবনে রাবীয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ অন্যান্যরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের আলোকে মসিজদে জানাজার নামাজ পড়াকে মাকরূহ বলেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, তখন অনেক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। মসজিদে জানাজার নামাজ পড়ার বিষয়টি রহিত হওয়া তাঁদের জানা না থাকলে তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের বিরোধিতা করতেন না। তাই তাঁরা বলতে চান, মসজিদে জানাজার নামাজ পড়ার অনুমতি রহিত হয়ে গেছে বলেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রস্তাবকে তারা গ্রহণ করতে পারেননি। এছাড়া রাসূল ﷺ যে মসজিদে জানাজার নামাজ পড়েছেন তা কোনো ওজরবশতও হতে পারে। যেমন– বৃষ্টির কারণে বা তা রাসূল ﷺ -এর বিশেষ কোনো বিষয় ছিল। অথবা এর বৈধতা বুঝানোর জন্যে তিনি তা করেছেন। কোনো বর্ণনায় রয়েছে– তিনি তখন ই'তিকাফে ছিলেন।

وَعَنْ ١٥٦٨ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسْطَهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৬৮. অনুবাদ : হযরত সামূরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পেছনে এক মহিলার জানাজার নামাজ পড়েছি যে নেফাস অবস্থায় মারা গেছে। তখন রাসূল ﷺ তার শরীরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : জানাজার নামাজ পড়ানোর সময় ইমাম লাশের কোন বরাবর দাঁড়াবেন? এ বিষয়টি এ হাদীসের একটি মৌলিক বিষয়। এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, আমাদের মাযহাব হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াবে। মৃত ব্যক্তি চাই পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে ইমাম তার মাথা বরাবর দাঁড়াবে আর মহিলা হলে তার কোমর বরাবর দাঁড়াবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ক্ষেত্রে আলোচ্য হাদীস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন যে, এখানে وَسْط শব্দ রয়েছে যা কোমরের দিকে ইঙ্গিত করে। কেননা কোমর হচ্ছে মানুষের মাঝখান। এছাড়া হযরত আনাস (রা.)-এর একটি আমল বর্ণিত আছে, যেখানে তিনি একজন পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে জানাজার নামাজ আদায় করেছেন, আর অপর এক মহিলার কোমর বরাবর দাঁড়িয়ে জানাজার নামাজ আদায় করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ -ও এভাবে নামাজ পড়েছেন। এ বর্ণনাটি হচ্ছে আবূ দাঊদ (র.)-এর।

হানাফী ওলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত আনাস (রা.)-এর এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেছেন। তাহলে হযরত আনাস (রা.) -এর হাদীসটি কোনো এক পক্ষের দলিল হওয়া সম্ভব নয়।

আর আলোচ্য হাদীসে যে মহিলার মাঝখান বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা সিনা উদ্দেশ্য নিতে কোনো বাধা নেই। কেননা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাগ হিসেবে সিনাই মানুষের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কারণ সিনার উপরের অংশে রয়েছে মাথা ও দুই হাত, আর নীচের অংশে রয়েছে পেট ও দুই পা। তার মাঝখান বললে, কোমরের চেয়ে সিনা উদ্দেশ্য হওয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٦٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتٰى دُفِنَ هٰذَا قَالُوْا الْبَارِحَةَ قَالَ اَفَلَا اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالُوْا دَفَنَّاهُ فِىْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهٗ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৬৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাকে রাতের বেলায় দাফন করা হয়েছিল। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এ লোককে কখন দাফন করা হয়েছে? লোকেরা বলল, গতরাতে। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? লোকেরা বলল, আমরা রাতের অন্ধকারে তাকে দাফন করেছি, তাই তখন আপনাকে জাগানো পছন্দ করিনি। একথা শুনে রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। অতঃপর রাসূল তার জানাজার নামাজ পড়লেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম কবরের উপর জানাজার নামাজ পড়াকে জায়েজ বলেন। চাই তার জানাজার নামাজ একবার পড়া হোক বা না হোক। কিন্তু ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ না পড়েই যদি তাকে কবর দেওয়া হয় এবং তার লাশ এখনো পচে-গলে শেষ হয়ে যায়নি বলে ধারণা হয় তাহলে কবরের উপর তার জানাজার নামাজ পড়ে নেওয়া জায়েজ। পক্ষান্তরে কবর দেওয়ার আগে যদি তার জানাজার নামাজ একবার হয়ে থাকে বা পড়া হয়নি কিন্তু তার লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাহলে তার কবরের উপর আর নামাজ পড়া যাবে না।

আলোচ্য হাদীসে যে কবরের উপর দ্বিতীয়বার নামাজ পড়ার উল্লেখ এসেছে এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি কথা বলেছেন। প্রথমত রাসূলের এ নামাজ বা সালাত দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য, পারিভাষিক নামাজ উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়ত কেউ বলেছেন, রাসূল ﷺ -এর জামানায় রাসূল ﷺ -এর বেলায় জানাজার নামাজ ছিল ফরজে আইন, আর অন্যদের উপর ছিল ফরজে কেফায়া। এ কারণে রাসূল ﷺ-এর এটি বিশেষ আমল ছিল। তৃতীয়ত কেউ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির কবরের অন্ধকার দূর করার ক্ষেত্রে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নামাজ বিশেষভাবে কার্যকরি। যেমন পরবর্তী হাদীসে এসেছে– اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوَّةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِىْ عَلَيْهِمْ। এ কারণে তিনি সেসব কবরের উপর জানাজার নামাজ পড়েছেন, যেগুলোর নামাজ তিনি পড়েননি। আর এ বৈশিষ্ট্য যেহেতু উম্মতের কারো জন্যে নেই তাই এ বিধানও তাদের জন্যে প্রযোজ্য হবে না।

وَعَنْ ١٥٧٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ اَوْ شَابٌّ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عَنْهَا اَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ اَفَلَا كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالَ فَكَاَنَّهُمْ صَغَّرُوْا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهٗ فَقَالَ دُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهٖ فَدَلُّوْهُ

১৫৭০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি কালো মহিলা বা একটি যুবক মসজিদে ঝাড়ু দিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে মারা গেছে। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কেন আমাকে খবর দিলে না? যেন সাহাবায়ে কেরাম তার বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে তার কবরটি দেখিয়ে দাও! তাঁরা দেখিয়ে দিলেন।

فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلٰوتِىْ عَلَيْهِمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ)

তিনি তার কবরের উপর জানজার নামাজ পড়লেন এবং বললেন, এ কবরসমূহ তার বাসিন্দাদের জন্যে অন্ধকারে পরিপূর্ণ। আর তাদের উপর আমার সালাতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে তাদের কবরকে আলোকিত করে দেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٥٧١ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ اَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَاِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوْا لَهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُوْلُ هُمْ اَرْبَعُوْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَخْرِجُوْهُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৭১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মাওলা কুরাইব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, কুদাইদ বা ওসফান নামক স্থানে তাঁর এক ছেলে মারা গেল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, কুরাইব! দেখত কি পরিমাণ লোক জড় হয়েছে? কুরাইব বললেন, আমি বের হয়ে দেখলাম, বেশ লোক তার জন্য জমায়েত হয়েছে। আমি তাঁকে জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মনে কর তারা চল্লিশজনের মতো হবে? কুরায়েব বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তাকে বের করে নিয়ে এস। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি কোনো মুসলমান মারা গেলে তার জানাজার নামাজে যদি এমন চল্লিশজন মানুষ একত্র হয় যারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করে না তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٥٧٢ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৭২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি মুসলমানদের একটি জামাত কোনো মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়ে যাদের সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তারা সবাই ঐ মৃত ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করে তাহলে অবশ্যই তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** জানাজার নামাজে শরিক লোকদের সুপারিশ গ্রহণ করার বিষয়ে এর আগের হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় চল্লিশজনের সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। আর এ হাদীসে বলা হয়েছে একশতজন। এ প্রসঙ্গে তুরপুশতী (র.) বলেন, কুরাইব কর্তৃক বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস এ দুটির মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা এ ধরনের ক্ষেত্রে কম সংখ্যাটা বড় সংখ্যার তুলনায় পিছনে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমার ওয়াদা করেন, তখন তাঁর নিয়ম এটা নয় যে, এর অতিরিক্ত হলে ফজিলত কমিয়ে দেবেন; বরং তিনি তা আরো বাড়িয়েই দেন। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আধিক্য বুঝানো; নির্দিষ্ট সংখ্যা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

وَعَنْ ١٥٧٣ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ مَا وَجَبَتْ فَقَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةِ الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ .

১৫৭৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম একটি জানাজার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তার ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে। এরপর তাঁরা আরেকটি জানাজার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে। তখন হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কি অবধারিত হয়ে গেছে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা এ লোকর ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করেছ, ফলে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর অপর ব্যক্তির ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করেছ, ফলে তার জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা [মু'মিনরা] হচ্ছ দুনিয়ার বুকে আল্লাহর সাক্ষী। –[বুখারী ও মুসলিম] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, মু'মিনরা দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجَبَتْ : অর্থাৎ লোকেরা তার ব্যাপারে যা ভালো মন্তব্য করেছে, তা যদি বাস্তব হয়ে থাকে এবং সে অবস্থার উপরই সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত। এমনিভাবে যে ব্যক্তির ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা হয়েছে সে যদি বাস্তবে সে রকম হয় এবং সে খারাপ অবস্থার উপরই মারা যায় তাহলে তার জন্যে জাহান্নাম অবধারিত।

যাইনুল আরব (র.) বলেন, মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করা বা খারাপ মন্তব্য করা তার জন্যে জান্নাত-জাহান্নাম ওয়াজিব করে না; বরং এ মন্তব্য তাদের জান্নাতি বা জাহান্নামি হওয়ার উপর একটি আলামত।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসাযুক্ত কথার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ وَجَبَتْ বলার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, তাদের এ প্রশংসাই তাদের জান্নাতি বা জাহান্নামি হওয়ার একটি কারণ।

এমনিভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর একথা– হে আমার সাহাবী বা হে মু'মিনগণ! اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ 'তোমরা জমিনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী' এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেননা এখানে ইযাফতটা সম্মানবাচক এবং আল্লাহর দরবারে এটি একটি উঁচু মাকামকে প্রমাণ করে। এছাড়া এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার তাযকিয়াও রয়েছে। একটি জানাজার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার পর তারা সত্যবাদী হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব ঐ মৃত ব্যক্তির বেলায় তাদের এ মাকামের একটি প্রভাব ও উপকারিতা থাকা চাই। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেবেন। প্রশংসিত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের এ ভালো ধারণাকে সত্যায়ন করবেন; এটা তাদের সম্মানার্থে যেমন– দোয়া ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। এর উপর ভিত্তি করে মৃত ব্যক্তির জন্যে জান্নাত বা জাহান্নাম অবধারিত করবেন। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াতেও বিবৃত হয়েছে–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

ইবনুল মালিক (র.) বলেন, কেউ বলেছেন, হাদীস থেকে একথা পাওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তির ফায়দার ক্ষেত্রে তাদের এ সাক্ষের একটা দলিল রয়েছে। অন্যথায় তাদের এ প্রশংসার কোনো ফায়দা থাকত না। –[মেরকাত]

فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا : তাঁরা তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র.) বলেন, যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে একজন মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করলেন? অথচ সহীহ হাদীস শরীফে মৃত লোকদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য বা তাদেরকে বকাঝকা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব, ঐ নিষেধের বিষয়টি হচ্ছে মুনাফিক ও কাফের ব্যতীত অন্যান্য মু'মিন বান্দাদের ক্ষেত্রে। এর বিপরীতে যারা মুনাফিক, কাফের প্রকাশ্য অপরাধী বা বিদ'আতি তাদের অপকর্ম থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্যে তাদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করতে কোনো নিষেধ নেই।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তবে ফাসেক ও বিদ'আতি যদি প্রকাশ্য অপরাধী হয় তাহলে তারা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সমালোচনা করতে হয় তাদের অপকর্ম থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সে বিষয়টি বাকি থাকে না। তাই তাদের সমালোচনার কোনো ফায়দাও নেই। এছাড়া এ সম্ভবনাও থাকে যে, এরা হয়তো তওবা করে মারা গেছে। তাই জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, ইয়াযীদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিদ'আতিদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে। এছাড়া এখানে আরেকটি কথা আছে, আর তা হচ্ছে এ হাদীসে মৃত ব্যক্তির সমালোচনা করা হয়েছে এমন কোনো কথা নেই। -[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٧٤ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا وَثَلٰثَةٌ قَالَ وَثَلٰثَةٌ قُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৫৭৪. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমানের পক্ষে চারজন মুসলমান সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যদি তিনজন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, তিনজন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যদি দুজন সাক্ষ্য দেয়? তিনি বললেন, দুজন সাক্ষ্য দিলেও। এরপর আমরা তাঁকে একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করিনি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হাদীসে প্রথমত একশতজন, পরে চল্লিশজন, অতঃপর চারজন, ক্রমে তিনজন ও দুজনের সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর অতিশয় দয়ার প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন এবং আল্লাহ তা'আলাও তা মঞ্জুর করেছেন। কুরআনে কারীমে রয়েছে- رَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ অর্থাৎ 'আমার দয়া সব জিনিসের উপর ব্যাপক।' -[আ'যমী]

وَعَنْ ١٥٧٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৫৭৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মৃতদেরকে মন্দ বলো না। কেননা তারা যা করেছে তার ফল পেয়েছে। -[বুখারী]

وَعَنْ ١٥٧٦ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৫৭৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহুদের যুদ্ধের শহীদগণের প্রতি দু দুজনকে একই কাপড়ে কাফন দিতেন, এরপর জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে কুরআন বেশি শিখেছে? যখন তাদের কোনো একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হতো, তখন তিনি তাকেই আগে কবরে রাখতেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিন এদের জন্যে সাক্ষী হব। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদেরকে তাদের রক্তসহ কবর দিতে আদেশ দিতেন। তাদের জানাজার নামাজও পড়েননি এবং তাদেরকে গোসলও দেওয়া হয়নি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীস অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (র.) শহীদগণের গোসল না দিতে এবং জানাজা না পড়ার কথা বলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) গোসলের বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে একমত হলেও তিনি তাদের জানাজার নামাজ পড়তে বলেন। কেননা জানাজার নামাজ পড়ার ব্যাপারে যেসব হাদীস রয়েছে, তাঁর মতে সেগুলো বেশি নির্ভরযোগ্য। –[আ'যমী]

তবে মনে রাখতে হবে যারা জিহাদে শহীদ হয়নি; বরং অন্য এমন কোনো কারণে মারা গেছে যে কারণে মারা গেলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে এসেছে এমন ব্যক্তির জন্যে জানাজার নামাজ তো পড়তে হবেই, তাকে গোসলও দিতে হবে। তদ্রূপ যারা জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে পরে বাড়িতে মারা গেছে তাদের বেলায়ও এ একই হুকুম।

وَعَنْ ١٥٧٧ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِفَرَسٍ مَعْرُوْرٍ فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِىْ حَوْلَهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৫৭৭. অনুবাদ : হযরত জবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জন্যে জিনবিহীন একটি ঘোড়া নিয়ে আসা হলো। তিনি ইবনে দাহদাহের জানাজা থেকে ফেরার সময় সে ঘোড়ায় আরোহণ করলেন আর আমরা তাঁর চারপাশে হাঁটছিলাম। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥٧٨ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِىْ يَمْشِىْ خَلْفَهَا وَاَمَامَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَيُدْعٰى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ رِوَايَةِ اَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِىِّ وَالنَّسَائِىِّ وَابْنِ مَاجَةَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِىْ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَفِى الْمَصَابِيْحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ ـ

১৫৭৮. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আরোহী ব্যক্তি জানাজার পেছনে পেছনে চলবে। আর পদাতিক লোকেরা লাশের পেছনে, সামনে, ডানে, বামে ও একদম পাশেও চলতে পারবে। অসম্পূর্ণ বাচ্চার জানাজার নামাজ পড়া হবে এবং তার বাবা-মার জন্যে ক্ষমা ও দয়ার দোয়া করা হবে। –[আবূ দাউদ]

কিন্তু আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, আরোহী ব্যক্তি জানাজার পেছনে চলবে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি যে পাশে চায় সে পাশ দিয়ে চলবে এবং শিশুরও নামাজ পড়বে। 'মাসাবীহ' গ্রন্থে হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ আছে মুগীরা ইবনে যিয়াদের নাম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلسِّقْطُ : শব্দের سِيْن হরফে তিন ধরনের হরকতই হতে পারে। তবে যের দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। سِقْط বলা হয় যে বাচ্চার কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে এবং পরিপূর্ণ হওয়ার আগেই প্রসবিত হয়ে গেছে।

يُصَلَّى عَلَيْهِ : অর্থাৎ অসম্পূর্ণ বাচ্চার জানাজার নামাজ পড়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বাচ্চা যদি প্রসবের পর কান্নার শব্দ করে তাহলে তার নামাজ পড়া হবে; নচেৎ পড়া হবে না। আর ইমাম আহমদ (র.) বলেন, পেটের মধ্যে বাচ্চার বসবাস যদি চারমাস দশদিন হয়ে যায় এবং তার মাঝে রূহ এসে যায় তাহলে তার উপর নামাজ পড়া হবে, যদি সে কান্নার শব্দ নাও করে।

ইমাম ইবনে হুমাম (র.) বলেন, اِسْتِهْلَالٌ বা বাচ্চার আওয়াজ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার মাঝে এমন কিছু পাওয়া যাওয়া, যার দ্বারা সে জীবিত বলে বুঝা যায়। আর তা হয় কোনো অঙ্গ নড়াচড়ার শব্দ দ্বারা। এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য হচ্ছে বাচ্চার অধিকাংশ জীবিত অবস্থায় বের হয়ে আসা। অতএব তার অধিকাংশ বের হওয়ার পর যদি সে নড়াচড়া করে তাহলে তার জানাজার নামাজ পড়া হবে। আর যদি কম অংশ বের হওয়া পর্যন্ত নড়াচড়া করে তাহলে নামাজ পড়া হবে না। –[মেরকাত]

এ প্রসঙ্গে আরও বহু হাদীস রয়েছে সেগুলো নিয়ে মোল্লা আলী কারী (র.) আলোচনা করেছেন।

وَعَنْ ١٥٧٩ الزُّهْرِيِّ (رح) عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ - وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَاَهْلُ الْحَدِيْثِ كَاَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلًا -

১৫৭৯. অনুবাদ : হযরত যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি সালেহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে দেখেছি, তাঁরা জানাজার সামনে সামনে চলেন। –[আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) জানাজার সামনে চলার পক্ষে দলিল দিয়ে থাকেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল দেন পরবর্তী হাদীসটি দিয়ে। জানাজার পেছনে চলার হেকমত হচ্ছে, সামনে জানাজার দিকে তাকিয়ে নিজের সতর্ক হওয়া এবং নসিহত হাসিল করা। আর সামনে চলার হেকমত হচ্ছে, তারা যেন মৃত ব্যক্তির জন্যে সুপারিশকারী, আর সুপারিশকারী সব সময় যার জন্য সুপারিশ করে তার সামনে থাকে।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, প্রথমটির সঙ্গে একথাও বলা হবে যে, পেছনে থাকবে যাতে জানাজা বহন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে যেন সহযোগিতা করতে পারে। আর এর দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হয় যে, লোকেরা পেছনে পেছনে এসে তাকে শেষ বিদায় জানাচ্ছে, আর মৃত ব্যক্তি হচ্ছে অগ্রপথিক এবং তারা হচ্ছে তার অনুসারী পথিক।

ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, যারা জানাজা বিদায় করবে তাদের জন্যে উত্তম হচ্ছে জানাজার পেছনে পেছনে থাকা তবে তার সামনে চলা জায়েজ আছে। কিন্তু যদি বেশি দূরে চলে যায় বা সবাই সামনে চলে যায় তাহলে মাকরূহ হবে। জানাজার ডানে বামে চলবে না।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ শেষ কথাটি হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত। সম্ভবত এর দ্বারা তিনি মাকরূহ তানযীহী বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ ডানে বামে চলার দ্বারা পেছনে চলার উত্তম আমলটি ছুটে যায়। ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, যারা জানাজার পেছনে পেছনে চলবে তাদের জন্যে সশব্দে জিকির করা বা আওয়াজ করে তেলাওয়াত করা মাকরূহ। সুতরাং তাঁরা মনে মনে জিকির করবে।

وَعَنْ ١٥٨٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلَا تُتَّبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ مَاجِدٍ الرَّاوِيْ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ .

১৫৮০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লাশের অনুসরণ করা হয়, লাশ কারো অনুসরণ করে না। যারা আগে চলে গেছে তারা লাশের সঙ্গে নয়। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ] তিরমিযী (র.) বলেন, বর্ণনাকারী আবূ মাজেদ 'মাজহুল'।

وَعَنْ ١٥٨١ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلٰثَ مِرَارٍ فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ رُوِيَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ .

১৫৮১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাজার অনুসরণ করল এবং তিনবার লাশ বহন করল, সে তার উপর অর্পিত কর্তব্য আদায় করল। –[তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব]

শরহুস সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ দুই পায়ার মাঝখানে হযরত সা'দ ইবনে উবাদার জানাজা বহন করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَمَلَهَا ثَلٰثَ مِرَارٍ : অর্থাৎ জানাজা নেওয়ার পথে বহনকারীদেরকে তিনবার সহযোগিতা করবে। অর্থাৎ একবার নেবে, আবার বিশ্রাম করবে, এভাবে মোট তিনবার বহন করলে সে তার উপর অর্পিত সহযোগিতার দায়িত্ব আদায় করে ফেলল। কিন্তু এর দ্বারা ঋণ ও গিবত ইত্যাদি ক্ষমা হবে না।

بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ : দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খাটের সামনের দিকের দুই খুঁটির মাঝখান। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব এটাই যে, জানাজা তিনবারে বহন করবে। একজন সামনে দুই খুঁটির মাঝখানে ধরবে, আর অপর দুজন পেছনে ধরবে, প্রত্যেকে একটি খুঁটি কাঁধে নেবে। এটা হচ্ছে জমিন থেকে জানাজা উঠানোর সময়। এরপর যে কেউ যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে চারজনে ধরবে। প্রত্যেকে একটি করে খুঁটি কাঁধে নেবে।

আ'যমী (র.) বলেন, লম্বা দুটি দণ্ডের সামনের মাথা হয়তো খুব কাছাকাছি ছিল, তাই তিনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুটি দণ্ড একসাথে কাঁধে নিয়েছেন। এছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) এক্ষেত্রে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের অনুসারে চারজন বহন করার কথা বলেন।

وَعَنْ ١٥٨٢ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ اَلَا تَسْتَحْيُوْنَ اَنَّ مَلَائِكَةَ اللّٰهِ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ وَاَنْتُمْ عَلٰى ظُهُوْرِ الدَّوَابِّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ نَحْوَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوْفًا .

১৫৮২. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে একটি জানাজার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি কিছু আরোহী লোককে দেখে বললেন, তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? আল্লাহর ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলছে, আর তোমরা বাহনের পিঠে চড়ে আছ। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবূ দাঊদ (র.) এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র.) বলেছেন, ছাওবানের এ রেওয়ায়েতটি মওকূফ হিসেবে বর্ণিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীসে জানাজার সঙ্গে আরোহণ করে চলার উপর ধমক দেওয়া হয়েছে। অথচ এর আগে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আরোহী ব্যক্তি জানাজার পেছনে পেছনে চলবে। বাহ্যিকভাবে এ দুটি হাদীস বৈপরীত্যপূর্ণ মনে হয়। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, বিনা ওজরে জানাজার সঙ্গে বাহনে চড়ে চলা মাকরূহ। কেননা বাহনে চড়াটা একটি মজার ব্যাপার, যা এমন অবস্থায় উপযুক্ত নয়। তবে কেউ যদি ওজরবশত বাহনে চড়তেই হয় তাহলে সে জানাজার পেছনে পেছনে থাকবে, সামনে যাবে না। আলোচ্য হাদীসে যাদেরকে ধমকি দেওয়া হয়েছে, বাহ্যত তাদের কোনো ওজর ছিল না। সুতরাং এ দুটি হাদীসের মাঝে আর কোনো বৈপরীত্য রইল না।

وَعَنْ ١٥٨٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫৮৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন।

–[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীসের আলোকে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হবে। কিন্তু হানাফী ওলামায়ে কেরামসহ অন্যান্যরা বলেন, জানাজার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়ার কোনো বিধান নেই। আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনাসূত্র হিসেবে অগ্রহণযোগ্য, কেননা হাদীসটি শুধুমাত্র আবূ শায়বা ইবরাহীম ইবনে ওসমান ওয়াসেতীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। আর সে হচ্ছে মুনকারুল হাদীস। এছাড়া বাস্তবিকভাবে হাদীস মাওকূফভাবে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ এটি রাসূল ﷺ -এর আমল নয়; বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিজের আমল।

وَعَنْ ١٥٨٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ)

১৫৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোনো মৃত ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়বে তখন তার জন্যে মন দিয়ে খালেসভাবে দোয়া কর। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْهُ ١٥٨٥ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَشْهَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاُنْثَانَا وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِيْمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِسْلَامِ وَفِىْ اٰخِرِهِ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ـ

১৫৮৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাজার নামাজ পড়তেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ـ "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিতদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের মৃতদের ক্ষমা করে দাও। আমাদের উপস্থিতদেরকে ও অনুপস্থিদেরকে, আমাদের ছোটদেরকে ও বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও নারীদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্য থেকে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে জীবিত রাখ, আর আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করবে তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে বিপদে ফেলো না।" –[আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

নাসায়ী (র.) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ ইবরাহীম আশহালী থেকে তার পিতার সূত্রে এবং وَاُنْثَانَا পর্যন্ত তার বর্ণনা শেষ। আর আবূ দাঊদ (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, "যাকে জীবিত রাখবে তাকে ঈমানের সঙ্গে জীবিত রাখ, আর যাকে মৃত্যু দেবে তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও।" আর বর্ণনার শেষে রয়েছে, "তার মৃত্যুর পর তুমি আমাদেরকে বিপদে ফেলো না [পথভ্রষ্ট করো না] "

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَصَغِيْرِنَا : ছোটরা গুনাহমুক্ত, এরপরও তাদের জন্যে কেন ক্ষমা চাওয়া হয়েছে? এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার মক্কী (র.) বলেন, ছোটদের বেলায় এ দোয়া হচ্ছে তাদের মাকাম বুলন্দ করানোর জন্যে। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তাঁর এ ব্যাখ্যাটি সহীহ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বাচ্চার জানাজার নামাজ পড়েছেন এবং সে নামাজে তিনি এ দোয়া পড়েছেন– اَللّٰهُمَّ قِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَضِيْقَهُ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে কবরের আজাব ও তার সংকীর্ণতা থেকে হেফাজত কর।" –[মেরকাত]

আলোচ্য হাদীসে ছোট বড় দ্বারা যুবক ও বৃদ্ধও উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। এছাড়া আরো অনেকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। মূলত এখানে সব ধরনের প্রকার উল্লেখ করে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সকল মুসলমান নরনারীকে ক্ষমা করে দাও।

لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ : অর্থাৎ তার মৃত্যুর কারণে আমাদের যে কষ্ট হয়েছে এবং তার উপর আমরা যে ধৈর্য ধরেছি, সে ছওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না।

وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ : অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর এ মৃত্যুর কারণে আমরা যেন কোনো বিপদে না পড়ি বা ফিতনার শিকার না হয়ে যাই; বরং তার মৃত্যু দেখে যেন আমরা আমাদের মৃত্যুর ব্যাপারে নসিহত হাসিল করতে পারি এবং সেজন্যে প্রস্তুতি নিতে পারি। কোনো বর্ণনায় আছে– لَا تُضِلَّنَا অর্থাৎ আমাদেরকে ঈমানের নিয়ামত দেওয়ার পর নতুন কোনো পরীক্ষায় ফেলো না। অর্থাৎ ঈমান বিরোধী কার্যক্রমে আমরা যেন জড়িয়ে না পড়ি।

জীবিত থাকার সঙ্গে ইসলাম এবং মৃত্যুর সঙ্গে ঈমানকে উল্লেখ করার বিভিন্ন হেকমতের মাঝে যে হেকমতটি সবচেয়ে স্পষ্ট তা হচ্ছে, ইসলাম হচ্ছে ঈমানের ফলাফল যা কথা, কাজ ও অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তাই জীবনের জন্যে এটাই উপযোগী যে, শরিয়তের এসব বিধিবিধান নিয়ে জীবনযাপন করবে। আর ঈমান হচ্ছে আকিদা ও বিশ্বাসের মূল হাকীকত যা মৃত্যুকালে বেশি প্রযোজ্য। কেননা মৃত্যুকালে সে ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান পালন করতে সক্ষম নয়, তখন বরং ঈমানই তার একমাত্র সম্বল।

প্রসিদ্ধ বর্ণনায় এভাবে জীবনের সঙ্গে ইসলাম এবং মৃত্যুর সঙ্গে ঈমানের উল্লেখ এসেছে। আর আবূ দাউদের বর্ণনায় যে আগে পরে করা হয়েছে, তা বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে এ পরিবর্তন হয়েছে। অথবা এ হিসেবে আগে পরে হয়েছে যে, ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তাই বর্ণনাকারী একটির স্থানে অপরটি বসিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো সমস্যা মনে করেননি। এছাড়া এর আরো ব্যাখ্যা রয়েছে।

উল্লেখ্য, জানাজার নামাজের দোয়া হাদীস শরীফে একাধিক বর্ণিত আছে। এগুলোর মধ্যে যে কোনোটি পড়া যায়। শুধু এতটুকু নিশ্চিত হতে হবে যে, দোয়াটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে কিনা।

وَعَنْ ١٥٨٦ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ (رضـ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৫৮৬. অনুবাদ : হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে এক মুসলমান ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়লেন। তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি– اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - "হে আল্লাহ অমুকের ছেলে অমুক তোমার দায়িত্বে ও তোমার আশ্রয়ের বেষ্টনিতে রয়েছে। অতএব তুমি তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। তুমিইতো প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ও সত্যের অধিকারী। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং তার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয় তুমি অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

–[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٥٨٧ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৫৮৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভালো কাজসমূহের উল্লেখ কর, আর তাদের মন্দ কাজসমূহের উল্লেখ থেকে বিরত থাক। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালী (র.) বলেন, জীবিত ব্যক্তির সমালোচনার চেয়ে মৃত ব্যক্তির সমালোচনা বেশি জঘন্য। কেননা জীবিত ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং তার সুরাহা করে ফেলা দুনিয়াতে সম্ভব, কিন্তু মৃত ব্যক্তির বেলায় তা সম্ভব নয়।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে যারা গোসল দেয় তারা যদি মৃত ব্যক্তির মাঝে আশ্চর্য কিছু অনুভব করে। যেমন– চেহারা আলোকিত হয়ে যাওয়া, সুগন্ধ বের হওয়া ও দ্রুত গোসলের কাজ সুসম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি দেখে তাহলে তা প্রকাশ করবে এবং মানুষের কাছে বলবে। আর যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখে যেমন– দুর্গন্ধ, চেহারা ও শরীর কালো হয়ে যাওয়া বা চেহারা বদলে যাওয়া ইত্যাদি দেখলে তা কারো কাছে বলা হারাম।

وَعَنْ ١٥٨٨ نَافِعٍ أَبِيْ غَالِبٍ (رحـ) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ عَلٰى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءُوْا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوْا يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسْطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ هٰكَذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ نَحْوَهُ مَعَ زِيَادَةٍ وَ فِيْهِ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ ـ

১৫৮৮. অনুবাদ : হযরত নাফে আবূ গালেব (র.) বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর পেছনে এক পুরুষ ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়েছি। তিনি তার মাথা বরাবর দাঁড়িয়েছেন। এরপর লোকরা এক কুরাইশী মহিলার জানাজা নিয়ে এল এবং তারা বলল, হে আবূ হামযা! এর জানাজার নামাজ পড়ুন। তখন তিনি খাটের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন। তখন আনাস ইবনে যিয়াদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাঁড়াতে দেখেছেন? আপনি নারী ও পুরুষের যে বরাবর দাঁড়িয়েছেন, রাসূল ﷺ -ও কি সে বরাবর দাঁড়িয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

আবূ দাঊদ (র.) এ কথাই বর্ণনা করেছেন, তবে সেখানে একটি অতিরিক্ত অংশ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তিনি মহিলার কোমর বরাবর দাঁড়িয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٥٨٩ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى (رحـ) قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৫৮৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে হুনাইফ, ওফায়েদ ইবনে সা'দ (রা.) কাদেসিয়া নামক স্থানে বসেছিলেন, তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হলো। তারা তখন উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদেরকে বলা হলো, এতো স্থানীয় এক অমুসলিম জিম্মি ব্যক্তির লাশ। তাঁরা বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশ দিয়ে এক ইহুদির জানাজা নিয়ে যাওয়া হলো, তখন রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এতো এক ইহুদির লাশ। জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, তা কি একটি প্রাণ নয়।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٥٩٠ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتّٰى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حِبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ لَهُ إِنَّا هٰكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ خَالِفُوْهُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ الرَّاوِيْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

১৫৯০. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো জানাজার পেছনে পেছনে চলতেন তখন লাশ কবরে রাখা পর্যন্ত তিনি বসতেন না। এরপর এক ইহুদি আলেম এসে তাঁকে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমরাও এমনটি করি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে রাসূল ﷺ দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়ে বসা শুরু করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা তাদের [ইহুদিদের] বিরোধিতা কর। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ; কিন্তু তিরিমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব। রাবী বিশর ইবনে রাফে' সবল নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কোনো জায়েজ বা মুস্তাহাব আমল যদি কাফের বা বিদ'আতিদের শেয়ার বা পরিচয় বহনকারী বিষয় হয় তাহলে তা পরিত্যাগ করা উত্তম।

তবে এতটুকু বিধান আপন অবস্থায় বহাল রয়েছে যে, লাশের খাট মানুষের কাঁধ থেকে জমিনে রাখার আগ পর্যন্ত অনুসরণকারীরা বসবে না। এরপর কবর দেওয়ার আগে বসতে কোনো অসুবিধা নেই। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٩١ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

১৫৯১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাজার জন্যে দাঁড়িয়ে যেতে আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন। এরপর তিনি বসতে আরম্ভ করেছেন এবং আমাদেরকে বসতে বলেছেন। –[আহমদ]

وَعَنْ ١٥٩٢ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ (رحـ) قَالَ إِنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১৫৯২. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পাশ দিয়ে একটি জানাজা অতিক্রম করে গেলে হযরত হাসান (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন; কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) দাঁড়ালেন না। তখন হযরত হাসান (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি একটি ইহুদির জানাজার জন্যে দাঁড়িয়ে যাননি? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, হ্যাঁ, তবে পরে তিনি বসে থাকতেন। –[নাসায়ী]

وَعَنْ ١٥٩٣ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ اِنَّمَا مَرَّ بِجَنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى طَرِيْقِهَا جَالِسًا وَكَرِهَ اَنْ تَعْلُوْا رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَامَ - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

১৫৯৩. অনুবাদ : হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) বসাছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর পাশ দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হলো। এ সময় জানাজা পার হয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত লোকেরা দাঁড়িয়ে রইল। তখন হযরত হাসান (রা.) বললেন, আসল ব্যাপার হচ্ছে এক ইহুদির জানাজা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন রাসূল ﷺ সে রাস্তায় বসাছিলেন। ইহুদির জানাজা তার মাথার উপর দিয়ে যাবে এ বিষয়টি তিনি পছন্দ করেননি বিধায় তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) এ হাদীসে জানাজা দেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন এবং না দাঁড়ানোর পক্ষে বিস্তারিত কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ এর আগের হাদীসে তিনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বিপরীত দাঁড়ানোর পক্ষে কথা বলেছেন এবং নিজেও দাঁড়িয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, সম্ভবত তাঁর না দাঁড়ানোর ঘটনাটি পরের। অর্থাৎ অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পেরেছেন যে, জানাজা দেখে যে রাসূল ﷺ দাঁড়াতেন তা বিভিন্ন কারণে ছিল, যা সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়। তাই জানাজা দেখলে দাঁড়ানোর বিষয়টি মৌলিক কোনো বিধান নয়।

وَعَنْ ١٥٩٤ اَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَّتْ بِكَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ اَوْ نَصْرَانِيٍّ اَوْ مُسْلِمٍ فَقُوْمُوْا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُوْمُوْنَ اِنَّمَا تَقُوْمُوْنَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৫৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পাশ দিয়ে যখন কোনো ইহুদি, নাসারা বা মুসলমানের লাশ অতিক্রম করে যাবে তখন তোমরা তার জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। কেননা তোমরা ঐ লাশের জন্যে দাড়াচ্ছ না; তোমরা বরং দাঁড়াচ্ছ তার সঙ্গে যে ফেরেশতাগণ রয়েছেন তাঁদের জন্যে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** লাশ দেখে দাঁড়ানো এবং না দাঁড়ানো উভয় পক্ষে একাধিক হাদীস রয়েছে। এ ছাড়া হাদীসে দাঁড়ানোর বিভিন্ন কারণেরও উল্লেখ এসেছে। তন্মধ্যে মৃত্যুকে একটি মহাবিপদ মনে করা, অমুসলিমের লাশ মাথার উপর দিয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করা, লাশের সঙ্গে উপস্থিত ফেরেশতাদের সম্মান করা এবং মুসলমান মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ বিবৃত হয়েছে। শায়খ দেহলভী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর শেষ নির্দেশ যদি না দাঁড়ানোর পক্ষে দলিল বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে অপর হাদীসগুলোকে মানসূখ মনে করতে হবে। কিন্তু আমাদের ফকীহগণ দাঁড়ানোকেই উত্তম মনে করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে তা মানসূখ নয়। –[আ'যমী]

وَعَنْ ١٥٩٥ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَقِيْلَ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ اِنَّمَا قُمْتَ لِلْمَلاَئِكَةِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১৫৯৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একটি জানাজা রাসূলে কারীম ﷺ -এর পাশ দিয়ে অতিক্রম হলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটি একটি ইহুদির জানাজা। তিনি বললেন, আমি তো ফেরেশতাদের জন্যে দাঁড়িয়েছি। -[নাসায়ী]

وَعَنْ ١٥٩٦ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّىْ عَلَيْهِ ثَلٰثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ اَوْجَبَ فَكَانَ مَالِكٌ اِذَا اسْتَقَلَّ اَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلٰثَةَ صُفُوْفٍ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ اِذَا صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلٰثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ ثَلٰثَةُ صُفُوْفٍ اَوْجَبَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ ـ

১৫৯৬. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুবায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কোনো মুসলমান মারা যাওয়ার পর যদি তিন কাতার লোক তার জানাজার নামাজ পড়ে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে বেহেশত অবধারিত করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীসের কারণে হযরত মালেক ইবনে হুবায়রা যদি জানাজার লোক কম মনে করতেন, তাহলে তাদেরকে তিন কাতারে ভাগ করে দিতেন। -[আবূ দাউদ]

তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে– বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মালেক ইবনে হুবায়রা (রা.) যখন কারো জানাজার নামাজ পড়তে যেতেন এবং উপস্থিত লোক তাঁর কাছে কম বলে মনে হতো, তখন তিনি তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করে দিতেন। এরপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার জানাজার নামাজ তিন কাতার মানুষ পড়েছে তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

وَعَنْ ١٥٩٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৫৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ -এর জানাজার নামাজ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ নামাজে এ দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ ـ "হে আল্লাহ! তুমি তার রব। তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। তুমি তাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছ এবং তুমিই তার রূহ তুলে নিয়ে গেছ। তুমি তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জান। আমরা সুপারিশকারী হিসেবে এসেছি, তাই তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।" -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٥٩٨ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (رحـ) قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَلٰى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১৫৯৮. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পেছনে এমন এক শিশু বাচ্চার জানাজার নামাজ পড়েছি যে এখনো কোনো গুনাহ করেনি। সে নামাজে আমি শুনেছি তিনি বলছেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা কর।" –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) একটি নাবালেগ শিশুর জন্যে কবরের আজাব থেকে মুক্তির দোয়া করেছেন। অথচ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের কোনো গুনাহ নেই। তাহলে এর ব্যাখ্যা কি? এ প্রসঙ্গে কাজি ইয়ায (র.) বলেন, বিষয়টি এমন হতে পারে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ থেকে এমন কোনো কথা শুনেছেন যে, কবরের আজাব ছোট-বড় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। সে কারণে তিনি এ বিশ্বাসই রাখতেন যে, শিশুদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়, তাই তিনি এ দোয়া করেছেন।

কেউ বলেছেন, এখানে কবরের আজাব দ্বারা শাস্তি বা সওয়াল ও জওয়াব উদ্দেশ্য নয়; বরং শুধুমাত্র একাকিত্বের কারণে যে মনের বেদনা ও কষ্ট হয় এমনিভাবে কবরের খিঁচুনি ইত্যাদি উদ্দেশ্য, যা ছোট-বড় সবার বেলায় হতে পারে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٥٩٩ الْبُخَارِيِّ (رحـ) تَعْلِيْقًا قَالَ يَقْرَأُ الْحَسَنُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَاَجْرًا .

১৫৯৯. অনুবাদ : ইমাম বুখারী (র.) থেকে মুয়াল্লাক হাদীস হিসেবে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হযরত হাসান (র.) বাচ্চাদের জানাজায় সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন এবং এ দোয়া পড়তেন– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَاَجْرًا "হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমাদের জন্যে অগ্রপথিক, ব্যবস্থাপক, রক্ষিত ভাণ্ডার ও আমলের প্রতিদান হিসেবে গ্রহণ কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَلَفٌ : সলফ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে আগে চলে গেছে, سَلَفُ الْمَالِ বলা হয় মালের যে মূল্য অগ্রিম আদায় করে দেওয়া হয়। এখানে যে মারা গেছে তাকে এ অর্থে সলফ বলা হয়েছে যে, তার মৃত্যুতে সবরের কষ্ট হয়েছে। সে কারণে তার দ্বারা জান্নাতের অগ্রিম মূল্যশোধ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ যেন তাকে সে হিসেবেই গ্রহণ করে।

فَرَطٌ : বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কাফেলার আগেভাগে চলে এবং কাফেলা কোথায় অবস্থান করলে ভালো হবে তা তালাশ করে বের করে এবং প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে। ঘাস, পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে। যে শিশু আগে মারা যায় সে যেন পরবর্তীদের জন্যে আখিরাতের সুখ-শান্তির বন্দোবস্ত করে।

হযরত হাসান বসরী (র.) জানাজার প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতেন। এটা তাঁর একান্তই নিজস্ব মত ছিল।

ذُخْرٌ : বলা হয় ঐ জমাকৃত ধনভাণ্ডারকে যা বিপদাপদে কাজে আসে। আর কিয়ামতের বিপদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ, তাই তখন যেন এ শিশু কাজে আসে সে দোয়া করা হচ্ছে।

وَعَنْ ١٦٠٠ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الطِّفْلُ لَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلَا يُوْرَثُ -

১৬০০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শিশু জন্ম হয়ে যদি কাঁদার শব্দ না করে তাহলে তার জানাজার নামাজ পড়া হবে না, সে কারো উত্তরাধিকারী হবে না এবং তারও কেউ উত্তরাধিকারী হবে না। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] কিন্তু ইবনে মাজাহ (র.) "তারও কেউ উত্তরাধিকারী হবে না" এ অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ ١٦٠١ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقُوْمَ الْاِمَامُ فَوْقَ شَىْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِىْ اَسْفَلَ مِنْهُ - رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ فِى الْمُجْتَبٰى فِىْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ -

১৬০১. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামকে উপরে এবং লোকদেরকে তার পিছনে নিচে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। -[দারাকুতনী তাঁর মুজতাবা কিতাবের জানাজা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম মোক্তাদী উপরে নিচে দাঁড়ানোর এ বিধানটি শুধুমাত্র জানাজার নামাজের জন্যে খাস নয় এবং হাদীসে এ ধরনের কোনো কথা নেই।

ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, লাশ যদি কোনো প্রাণীর পিঠে বা মানুষের হাতের উপর রাখা থাকে আর এ অবস্থায় তার জানাজার নামাজ পড়া হয়, তাহলে নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা লাশটা হচ্ছে ইমামদের মতো। আর জায়গার ভিন্নতা একতেদা করাকে বাধা দেয়। তিনি অন্যত্র বলেছেন, জানাজার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া, পবিত্র হওয়া এবং তাকে মুসল্লিদের সামনে রাখা। এ কারণেই অনুপস্থিত লাশের এবং কোনো বাহনের উপর রাখা লাশের জানাজার নামাজ সহীহ হবে না।

بَابُ دَفْنِ الْمَيِّتِ
পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির দাফন

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরজ। মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে। আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর যুগেই আল্লাহর নির্দেশে দাফনের এ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এ পৃথিবীর বুকে মানুষের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত আদম (আ.)-এর ছেলে হাবীল। সেই হাবীল-এর লাশ দাফন করাকে কেন্দ্র করেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দাফনের নির্দেশনা আসে।

কবর সাধারণত দুই রকমের হয়ে থাকে। একপ্রকার شَقٌّ [শক] বা সিন্দুকী কবর। আরেক প্রকার لَحْدٌ [লাহদ] বা বগলী কবর। সিন্দুকী কবর হচ্ছে যা সোজা লম্বা গর্তের মতো হয়। আর বগলী কবর হচ্ছে যে কবরে কেবলার দিকে লাশের প্রস্থ পরিমাণ অতিরিক্ত খোড়া হয়। মাটি ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে বগলী পদ্ধতিতে কবর করাই উত্তম। অন্যথায় সিন্দুকী কবর করবে।

মুর্দাকে কিভাবে কবরে নামাবে, কিভাবে মাটি দেবে এবং কবরের আকৃতি কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ক হাদীস এ পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٠٢ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رحـ) اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ هَلَكَ فِيْهِ الْحَدُوْا لِىْ لَحْدًا وَانْصِبُوْا عَلَىَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬০২. অনুবাদ : হযরত আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) যে অসুস্থতায় মারা গিয়েছিলেন সে অসুস্থতার সময় বলেছিলেন, তোমরা আমার জন্যে বগলী কবর করবে এবং কাঁচা ইট দাঁড় করিয়ে দেবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে করা হয়েছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীস দ্বারা বগলী কবর উত্তম হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা রাসূল ﷺ -এর জন্যে বগলী কবর করা হয়েছে। এছাড়া কাঁচা ইট দিয়ে হালকা প্রাচীরের মতো করে দেওয়াও উত্তম। কেননা রাসূল ﷺ -এর কবরে তাও করা হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ -এর কবরের ইটের সংখ্যা ছিল নয়টি।

وَعَنْ ١٦٠٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ جُعِلَ فِىْ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬০৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবরে একটি লাল চাদর দেওয়া হয়েছিল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : লাল চাদরটি রাসূল ﷺ -এর ব্যবহৃত চাদর ছিল। নববী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাওলাদের মধ্য থেকে শুকরান নামক এ মাওলা ঐ চাদরটি কবরের মাঝে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, রাসূল ﷺ -এর পর আর কেউ তা ব্যবহার করুক তা আমি চাই না। ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ অন্যান্য ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, লাশের নিচে চাদর ইত্যাদি বিছানো মাকরূহ। এ হিসেবে কেউ বলেছেন, এটা রাসূল ﷺ -এর জন্য খাস ছিল।

কেউ বলেছেন, রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.) চাদরটি নিয়ে ঝগড়া করছিলেন তাই সমস্যা সমাধান করার জন্য শুকরান চাদরটি কবরে দিয়ে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্দিল বার (র.) বলেছেন, কবরে মাটি ঢালার আগে চাদরটি তুলে ফেলা হয়েছিল। সুতরাং অন্য কারো ক্ষেত্রে এর বৈধতার আর কোনো সুযোগই থাকে না।

١٦٠٤ - وَعَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ (رحـ) اَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৬০৪. অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান তাম্মার (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম ﷺ -এর কবর উটের পিঠের ন্যায় উঁচু দেখেছেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُسَنَّمٌ : শব্দটির نُوْن তাশদীদযুক্ত এবং তার উপরে যবর। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, তা হচ্ছে উটের পিঠের মতো করে দেওয়া যা বরাবর বিছিয়ে দেওয়ার বিপরীত।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীস দিয়ে দলিল দেন যে, কবরের আকৃতি চতুর্ভুজ হয়ে চ্যাপটা হওয়ার চেয়ে উটের পিঠের মতো দুদিকে ঢালু হওয়ার আকৃতিটি উত্তম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, চ্যাপটা করে চতুর্ভুজ আকৃতি করা উত্তম। কেননা কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) এঁদের সবার কবর ব্যাপকভাবে বিছানো ছিল। এছাড়া আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ তাঁর ছেলের কবরও চ্যাপটা করে তৈরি করেছিলেন। সাইয়েদ (র.) বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, রাসূলে কারীম ﷺ -এর কবর আগে যেভাবে ছিল সেভাবে তাকে রাখা হয়নি। তাকে উটের পিঠের মতো বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর এক শায়খ থেকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কবরকে চতুর্ভুজ আকৃতি এবং পাকা করতে নিষেধ করেছেন। ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, ইবনে আবী শায়বা (র.) তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান (র.) বলেন, যে ঘরের ভিতর রাসূল ﷺ, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর কবর, আমি সে ঘরে প্রবেশ করেছি। দেখেছি কবরগুলো 'মুসাল্লাম' উটের পিঠের মতো। মেরকাত গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে তাতে দেখা যেতে পারে।

١٦٠٥ - وَعَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِيِّ (رحـ) قَالَ قَالَ لِىْ عَلِيٌّ اَلَا اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا اِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হাইয়াজ আল আসাদী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাব না যেমন কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? আর তা হচ্ছে, তুমি কোনো মূর্তি পেলে তা না ভেঙ্গে দাঁড়াবে না, আর কোনো উঁচু কবর পেলে তা সমান না করে রাখবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ কবর যার উপর কিছু তৈরি করার কারণে উঁচু হয়ে গেছে, ঐ কবর উদ্দেশ্য নয় যাকে বালু ও পাথর দিয়ে চিহ্নস্বরূপ সামান্য উঁচু করে দেওয়া হয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা মুস্তাহাব। এর চেয়ে উঁচু করা মাকরূহ। যদি এর চেয়ে উঁচু করা হয় তাহলে তা ভেঙ্গে দেওয়া মুস্তাহাব। তবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তা কতটুকু পরিমাণ ভাঙ্গা হবে? জমিন পর্যন্ত সমান করে দেবে– আলোচ্য হাদীসের শব্দ থেকে এটাই বুঝা যায়। ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যে কবরের উপর উঁচু প্রাসাদের মতো তৈরি করে ফেলত তা ভেঙ্গে সমান করে দেওয়া। নচেৎ মুসাল্লাম পদ্ধতির সামান্য উঁচু যে কবর তা সমান করে দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٦٠٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ وَاَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬০৬. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে চুনকাম করতে, তার উপর ঘর বানাতে এবং তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কবরে চুনকাম করা মাকরূহ। এর দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। একটি হচ্ছে, কবরের উপরের অংশে বালুমাটি জড় করে তা চুনা দিয়ে লেপে দেওয়া। আর এর দ্বারা কবরে ঘর নির্মাণ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর কবরের উপর ঘর তৈরি মাকরূহ যদি কবর নিজস্ব জায়গায় হয়। আর জাতীয় কবরস্থানে তা করা হারাম। কেউ নির্মাণ করলে তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব; যদি তা মসজিদও হয়।

আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, ঘর বানানোর দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। হয়তো পায়া দিয়ে স্থায়ী ঘর বানানো, অথবা উদ্দেশ্য হতে পারে তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী আবাসন তৈরি করা। এ দুটিই নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, এটি জাহিলি যুগের একটি প্রথা। তারা এক বছর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তিকে ছায়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কবরের উপরে তাঁবু খাটিয়ে রাখত। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর ভাই আব্দুর রহমানের কবরের উপরে চালাঘর দেখে বললেন, এই ছেলে! এটা খুলে ফেল; তার আমলই তাকে ছায়া দেবে।

وَاَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ : কবরের উপর বসা নিষেধ। চাই তা কথাবার্তা বলার জন্যে হোক, বা পেশাব-পায়খানা করার জন্যে হোক, বা কান্নাকাটি করার জন্যে হোক, সর্বাবস্থায় তা নিষেধ। কেননা এর দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে হেয় করা হয়।

وَعَنْ ١٦٠٧ اَبِىْ مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا اِلَيْهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬০৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মারছাদ গানাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপর বসো না এবং সেদিকে ফিরে নামাজ পড়ো না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٦٠٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهٖ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ জ্বলন্ত কয়লার উপর বসা এবং তা তোমাদের কাপড়কে জ্বালিয়ে দেওয়া অতঃপর তা চামড়া পর্যন্ত ভেদ করে যাওয়া উত্তম, সে কবরের উপর বসার চেয়ে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো কোনো হাদীসে কবরের উপর বসার বিষয়টিকে সাধারণভাবে নিষেধ করা হয়েছে, আর কিছু হাদীসে খুব কঠিনভাবে তা নিষেধ করা হয়েছে– যেমন আলোচ্য হাদীসে। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম বলেন, কঠিন নিষেধটি পায়খানা-পেশাবের জন্যে বসার ক্ষেত্রে এবং তা হারাম। আর স্বাভাবিক নিষেধ অন্যান্য কারণে বসার ক্ষেত্রে, যা মাকরূহ। এরকমভাবে কবরের উপর ভর দেওয়া বা হেলান দেওয়াও বসার মতোই নিষেধ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٠٩ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالْاٰخَرُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُوْا اَيُّهُمَا جَاءَ اَوَّلًا عَمِلَ عَمَلَهُ فَجَاءَ الَّذِيْ يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

১৬০৯. অনুবাদ : হযরত উরওয়া ইবনে জুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনায় দুই ব্যক্তি ছিল যাদের একজন বগলী কবর খুঁড়ত, অপরজন বগলী খুড়ত না। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, দুজনের মধ্যে যে আগে আসবে সে তার মতো করে কাজ করবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি এল যে বগলী কবর করত। তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য বগলী কবর তৈরি করল। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে সাহাবী (لَحْد) বগলী কবর খুঁড়তেন তিনি হচ্ছেন হযরত আবূ তালহা যায়েদ ইবনে সাহল আনসারী (রা.), আর যিনি (شَقّ) সিন্দুকী খবর খুঁড়তেন তিনি হচ্ছেন হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)। তিনি ضَرِيْح 'যরীহ' কবর তৈরি করতেন। আর তা হচ্ছে, কবরের মধ্যখানে সিন্দুক তৈরি করা।

এ ঘটনার মাঝে একটি আলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে, এর মাঝে রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অথবা বলা যায়, সাহাবায়ে কেরামের একটি কারামত প্রকাশ পেয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বগলী করব খুঁড়তে বলে গিয়েছিলেন; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এ নিয়ে মতভেদ হয়ে গেল যে, কোন ধরনের কবর হবে। অবশেষে তাঁরা এ কথার উপর একমত হলেন যে, কবর খুঁড়তে যে ব্যক্তি আগে আসবে সে তার মতো করে কবর করবে। ঘটনাচক্রে ঐ ব্যক্তিই আগে আসলেন যিনি বগলী বকর খুঁড়তেন। ফলে বগলী কবর করা হলো, যা রাসূল কারীম ﷺ -এর হুকুম ছিল এবং এভাবে বিষয়টির সহজ সমাধান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে করে দিলেন।

وَعَنْ ١٦١٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ .

১৬১০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লাহদ আমাদের জন্যে আর শাক্ক অন্যদের জন্যে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। আহমদ জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ হতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِغَيْرِنَا : এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মুসলমান ব্যতীত অন্যরা। কিন্তু এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাসূল ﷺ -এর জামানায় দুই ধরনের কবরই খোঁড়ার অনুমতি ছিল। কেউ বলেছেন, অন্যরা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মদিনাবাসী ব্যতীত অন্যরা। কেননা মদিনার মাটি শক্ত থাকার কারণে সেখানে 'লাহদ' করা সহজ ছিল। পক্ষান্তরে মক্কা বা অন্যান্য এলাকায় বগলী কবরের চেয়ে সিন্দুকী কবরই বেশি উপযুক্ত।

তবে যাইনুল আরব (র.) তুরপুশতী (র.)-এর অনুসরণ করতে গিয়ে বলেন, লাহদ হচ্ছে আমাদের জন্যে উত্তম, আর শাক্ক হচ্ছে অন্যদের জন্যে বেশি উত্তম। অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে যারা ঈমানদার ছিল তারা সিন্দুকী কবর পছন্দ করত, এর দ্বারা বগলী কবর উত্তম হওয়া সাব্যস্ত হয়। পাশাপাশি এর দ্বারা সিন্দুকী কবরকে নিষেধও করা হয়নি। -[মেরকাত]
এ হাদীসের ব্যাখ্যা অন্যান্যরা আরো অন্যভাবেও করেছেন।

وَعَنْ ١٦١١ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ اُحُدٍ اِحْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاَعْمِقُوْا وَاَحْسِنُوْا وَادْفِنُوْا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلٰثَةَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوْا اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيُّ) وَرَوٰى اِبْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ وَاَحْسِنُوْا ـ

১৬১১. অনুবাদ : হযরত হিশাম ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, ওহুদের যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা কবর খুঁড়, প্রশস্ত কর এবং সুন্দর কবর কর। এরপর দুজন বা তিনজন করে প্রতি কবরে দাফন কর। আর যার কুরআন বেশি জানা তাকে আগে কেবলার দিকে দাও। -[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী। ইবনে মাজাহ 'সুন্দর কর' পর্যন্ত রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ওলামায়ে কেরাম বলেন, কবরের গভীরতা এতটুকু হওয়া উত্তম যেন কোনো ব্যক্তি কবরে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করলে কবরের পাড় হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ বরাবর হয়। -[মেরকাত]
তবে মাটি শক্ত না হলে এতদূর গভীর করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে কারণে মাঝারি আকৃতির লোকদের বুক পরিমাণ গভীর করা সুন্নত। আর কবরের প্রস্থ দেড় থেকে দুই হাত হওয়া চাই। -[আ'যমী]

وَعَنْ ١٦١٢ جَابِرٍ (رض) قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ اُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِيْ بِاَبِيْ لِتَدْفِنَهٗ فِيْ مَقَابِرِنَا فَنَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوا الْقَتْلٰى اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَلَفْظُهٗ لِلتِّرْمِذِيِّ)

১৬১২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমার ফুফু আমার আব্বার লাশ নিয়ে আসলেন আমাদের কবরস্থানে দাফন করার জন্যে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করলেন, তোমরা নিহত ব্যক্তিদেরকে তাদের আপন জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে এস। -[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী; কিন্তু শব্দ তিরমিযীর]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَضَاجِعُهُمْ : অর্থ হচ্ছে مَقَاتِلُهُمْ অর্থাৎ শহীদগণ যেখানে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে সেখানেই দাফন কর। তাদেরকে সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যেয়ো না। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারেও একই মাসআলা। তাঁরা বলেন, মানুষ কোথাও মারা গেলে তাকে সেখান থেকে অন্যত্র দূরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ। আর তা এ কারণে যে, মৃত লাশ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি লাশ পচে-গলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তা হারাম। তা তাঁরা বলেন এ আদেশটি ওয়াজিব হিসেবে।

তবে হাদীসের বাহ্যিক দিক থেকে বুঝা যায় এ হুকুমটি শুধুমাত্র শহীদগণের জন্য– স্বাভাবিক মৃত ব্যক্তিদের জন্য নয়। কেননা এর আগে একটি বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে তাঁর বাড়ি থেকে মদিনা নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তা করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতের উপস্থিতিতে। তখন তাঁরা কেউই এ ক্ষেত্রে বাধা দেননি। তাই ওলামায়ে কেরাম বলেন, সাধারণ মৃত ব্যক্তির লাশ প্রয়োজন হলে স্থানান্তর করা যায়, তবে দাফন করা হয়ে গেলে তাকে সেখান থেকে তুলে নেওয়া জায়েজ নেই। তবে যদি তাকে অন্য কোনো লোকের জমিনে দাফন করা হয় এবং সে এর উপর রাজি না থাকে তাহলে তাকে স্থানান্তর করা যাবে। –[মেরকাত, আ'যমী]

وَعَنْ ١٦١٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سُلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

১৬১৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মাথার দিক থেকে কবরে নামানো হয়েছে। –[ইমাম শাফেয়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে লাশ কবরে নামানোর এটাই সুন্নত পদ্ধতি; কিন্তু অন্যান্য হাদীসের আলোকে হানাফী ওলামায়ে কেরাম বলেন, ডানদিক থেকে নামানো হচ্ছে সুন্নত পদ্ধতি। –[আ'যমী]

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে লাশ কবরের পায়ের দিকের পাড়ে নিয়ে যাবে এবং সেদিক থেকে কবরে নামাবে। তবে কেউ কেউ এ বিষয়টিকে বিপরীত পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে লাশ কবেরের মাথার দিকে রাখবে এবং সেদিক থেকে আগে পা পরে বাকি অংশ ধীরে ধীরে নামিয়ে আনবে।

কিন্তু হানাফী ওলামায়ে কেরাম বলেন, কবরের ডানদিক থেকে পুরুষ লাশ একসঙ্গে নামাবে। অর্থাৎ আমাদের দেশে শাফেয়ী মাযহাব হিসেবে লাশ কবরের দক্ষিণ পাড়ে বা উত্তর পাড়ে রাখবে, আর হানাফী মাযহাব হিসেবে পশ্চিম পাড়ে রাখবে।

وَعَنْهُ ١٦١٤ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَاُسْرِجَ لَهُ بِسِرَاجٍ فَاَخَذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتَ لَاَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْاٰنِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ).

১৬১৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রাতের বেলায় একটি কবরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর জন্যে চেরাগ জ্বালানো হলো। তিনি ডানদিক থেকে লাশ নিলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন! তুমি বড় কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলে এবং খুব কুরআন তেলাওয়াতকারী ছিলে। –[তিরমিযী। শরহে সুন্নায় হাদীসটিকে যঈফ বলা হয়েছে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটি হানাফী মাযহাবের দলিল। যেভাবে এর আগের হাদীসের আওতায় আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটিকে 'হাসান' পর্যায়ের বলেছেন।

আলোচ্য হাদীসে যে ব্যক্তির দাফন সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে আবূ নুয়াঈম (র.) বলেন, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ যুলবিজাদাঈন। এছাড়া এ হাদীসটি রাতের বেলায় লাশ দাফন করা বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল।

وَعَنْ ١٦١٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ الثَّانِيَةَ .

১৬১৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ কোনো লাশকে যখন কবরে রাখতেন, তখন বলতেন- بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ "আল্লাহর নামে, আল্লাহর হুকুমে এবং আল্লাহর রাসূলের ধর্মের উপর।" অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নতের উপর। -[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] আবূ দাউদ দ্বিতীয় অংশটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ١٦١٦ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (رحـ) عَنْ اَبِيْهِ مُرْسَلاً اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَثٰى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا وَاَنَّهٗ رَشَّ عَلٰى قَبْرِ اِبْنِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ قَوْلِهٖ رَشَّ)

১৬১৬. অনুবাদ : হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) তাঁর পিতা মুহাম্মদ (র.) থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ এক মৃত ব্যক্তির উপর উভয় হাত মিলিয়ে তিন কোষ মাটি দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর ছেলে ইবরাহীমের কবরের উপর পানি ছিটিয়েছেন এবং তার উপর নুড়ি পাথর দিয়েছেন। -[শরহে সুন্নাহ] ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধু وَاَنَّهٗ رَشَّ ..... থেকে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, লাশ কবরে রেখে কাঁচা ইট বসানোর পর যারা কবরের মাথার দিকে থাকবে তারা দুই হাতে করে মাটি নেবে এবং কবরে নিক্ষেপ করবে। এখানে একটি যঈফ হাদীসে এরকমও রয়েছে যে, মাটি তিন কোষ দেবে এবং প্রথমবার مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ দ্বিতীয়বার وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ও তৃতীয়বার وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى পড়বে। -[মেরকাত]

وَاَنَّهٗ رَشَّ : রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর ছেলে ইবরাহীমের কবরের উপর পানির ছিটা দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম বলেন, যেসব এলাকায় বৃষ্টি নেই সেসব এলাকায় কবরের উপর ঠাণ্ডা পবিত্র পানি ছিটিয়ে দেওয়া সুন্নত। এর দ্বারা এ কামনা করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত দ্বারা মৃত ব্যক্তির কবরকে যেন শীতল ঠাণ্ডা করে দেন। -[মেরকাত]

আ'যমী (র.) বলেন, কবরের উপর পানি ছিটানো এবং মাটি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে কাদা বানিয়ে কবরের উপর লেপে দেওয়া জায়েজ আছে।

وَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ : ইবনে মালেক (র.) বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরের উপর পাথর বিছিয়ে দেওয়া সুন্নত, যাতে কোনো হিংস্র প্রাণী কবর থেকে লাশ তুলে না ফেলে এবং যেন তা কবরের আলামত হয়।

وَعَنْ ١٦١٧ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُوْرَ وَاَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَاَنْ تُوْطَأَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৬১৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ কবরের উপর চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন, তার উপর কিছু লিখতে এবং কবরকে পায়ে মাড়াতে নিষেধ করেছেন। -[তিরমিযী]

وَعَنْهُ ١٦١٨ قَالَ رُشَّ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ الَّذِيْ رَشَّ الْمَاءَ عَلٰى قَبْرِهٖ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى رِجْلَيْهِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

১৬১৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কবরের উপর পানি ছিটানো হয়েছিল। যিনি পানি ছিটিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন বেলাল ইবনে রাবাহ। তিনি একটি মশক দিয়ে পানি ছিটিয়েছেন। মাথার দিক থেকে শুরু করে পায়ের দিকে গিয়ে শেষ করেছেন।

-[বায়হাকী দালায়েলে নবুয়তে]

وَعَنْ ١٦١٩ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ (رضـ) قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمٰنُ بْنُ مَظْعُوْنٍ (رضـ) اُخْرِجَ بِجَنَازَتِهٖ فَدُفِنَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا اَنْ يَأْتِيَهٗ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهَا فَقَامَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِيْ يُخْبِرُنِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهٖ وَقَالَ اُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ اَخِيْ وَاَدْفِنُ اِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِيْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৬১৯. অনুবাদ : হযরত মুত্তালিব ইবনে আবূ ওদায়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) যখন ইন্তেকাল করেছেন তখন তাঁর জানাজা বের করে আনা হলো এবং দাফন করা হলো। সে সময় নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনতে আদেশ করলেন। লোকটি পাথরটি বহন করতে পারছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দুই হাতা গুটিয়ে নিলেন।

হযরত মুত্তালিব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, আমি যেন রাসূল ﷺ -এর বাহুদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি, যখন তিনি উভয় হাতা গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর তিনি পাথরটি বহন করে এনে তার [ওসমানের] মাথার পাশে রাখলেন এবং বললেন, এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবরে চিহ্ন দিচ্ছি এবং আমার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার পাশে কবর দেব। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَبْرَ اَخِيْ : রাসূলে কারীম ﷺ ওসমান ইবনে মাযঊনকে নিজের ভাই বলেছেন। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে– ১. তাঁর সম্মানার্থে রাসূল ﷺ তাকে ভাই বলেছেন। ২. হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন কুরাইশী হওয়ার কারণে তাকে ভাই বলেছেন। ৩. রাসূল তাকে ভাই বলার কারণ হচ্ছে হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ -এর দুধভাই ছিলেন। এ শেষ অভিমতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রা.) ১৩ পুরুষের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন. দুবার হিজরত করেছেন, বদর যুদ্ধে শরিক হয়েছেন এবং মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেছেন।

وَاَدْفِنَ اِلَيْهِ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অর্থাৎ তার সঙ্গে দাফন করব। রাসূলে কারীম ﷺ -এর একথার আলোকে ওলামায়ে কেরাম বলেন, নিকটাত্মীয়দেরকে এক জায়গায় কাছাকাছি দাফন করা মুস্তাহাব। রাসূল কারীম ﷺ সর্বপ্রথম তাঁর ছেলে ইবরাহীমকে ওসমানের সঙ্গে কবর দিয়েছেন।

وَعَنْ ١٦٢٠ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (رحـ) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا اُمَّاهُ اِكْشِفِيْ لِيْ عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِيْ عَنْ ثَلٰثَةِ قُبُوْرٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ مَطْبُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৬২০. অনুবাদ : হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে গেলাম এবং বললাম, আম্মা! আমাকে নবী করীম ﷺ ও তাঁর দুই সঙ্গীর কবর খুলে দেখান। তিনি পর্দা সরিয়ে আমাকে তিনটি কবর দেখালেন সেগুলো উঁচুও ছিল না, আবার জমিন বরাবর বিছানোও ছিল না। সেগুলোর উপর মরুভূমির লাল বালু বা নুড়ি পাথর বিছানো ছিল। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ١٦٢١ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ جَلَسْنَا مَعَهٗ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَزَادَ فِيْ اٰخِرِهٖ كَاَنَّ عَلٰى رُءُوْسِنَا الطَّيْرَ.

১৬২১. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক আনসারী ব্যক্তির জানাজায় বেরিয়েছি। আমরা যখন তার কবর পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনও কবর খোঁড়া হয়নি, তখন নবী করীম ﷺ কেবলার দিকে মুখ করে বসে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে বসে পড়লাম। –[আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনায় এর শেষে এ অতিরিক্ত অংশটুকু রয়েছে যে, "আমরা এমনিভাবে বসাছিলাম যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে।"

وَعَنْ ١٦٢٢ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهٖ حَيًّا ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৬২২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতো।

–[মালেক, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ গুনাহের দিক থেকে একজন জীবিত ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে দেওয়া যে পরিমাণ গুনাহ, একজন মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গাও সে পরিমাণ গুনাহ। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো জীবিত ব্যক্তিকে যেভাবে অপমান করা জায়েজ নেই, তেমনিভাবে একজন মৃত ব্যক্তিকেও সেভাবে অপমান করা জায়েজ নেই। ইবনুল মালেক (র.) বলেন, এর দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর দ্বারা মৃত ব্যক্তি যন্ত্রণা অনুভব করে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٢٣ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُدْفَنُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ اَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِىْ قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِىْ قَبْرِهَا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৬২৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মেয়ের দাফন চলাকালে উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের পাড়ে উপবিষ্ট; তাঁর দু-চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। সে সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে আজ রাতে স্ত্রীসহবাস করেনি? আবূ তালহা (রা.) বললেন, আমি আছি। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তার কবরে অবতরণ কর, তখন আবূ তালহা তার কবরে নামলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এখানে রাসূল ﷺ -এর মেয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ওসমান (রা.) -এর স্ত্রী উম্মে কুলসুম (রা.)।

لَمْ يُقَارِفْ : 'নেহায়া' গ্রন্থে আছে– قَارَفَ الذَّنْبَ বলা হয় যখন কেউ গুনাহ করে। আর قَارَفَ اِمْرَأَتَهٗ অর্থ হচ্ছে, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছে। জামেউল উসূলে রয়েছে– لَمْ يُقَارِفْ অর্থ হচ্ছে– সে কোনো গুনাহ করেনি। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেনি। –[মেরকাত]

কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে চেয়েছেন, তাঁর মেয়ে যে মারা গেল, তার স্বামী ওসমান এ রাতে তার অন্য কোনো স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছেন কিনা? আর তাই প্রমাণিত হলো যে, তিনি সহবাস করেছেন। কারণ তিনি لَمْ اُقَارِفْ اَنَا বলে জবাব দেননি। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ মন্তব্যের দুর্বলতা স্পষ্ট।

فَانْزِلْ فِىْ قَبْرِهَا : আবূ হালহা (রা.) কবরে নেমেছেন এবং রাসূল ﷺ -এর মেয়েকে দাফন করেছেন আর তিনি মাহরাম নন এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম বলেন, আবূ তালহা মূলত অন্যদের সহযোগিতা করার জন্যে নেমেছেন, তিনি উম্মে

কুলসুমকে স্পর্শ করেননি। অথবা এমন হতে পারে যে, পরপুরুষ মৃত নারীকে কবরে নামাতে পারে– এর বৈধতা বুঝানোর জন্যে এ কাজটি করা হয়েছে।

ইবনুল হুমাম (র.) বলেন, মহিলাদের লাশ কবরে পুরুষরাই নামাবে, পুরুষরাই উঠাবে। কেননা জীবিত অবস্থায় কোনো পরপুরুষ মহিলাকে আবরণের সঙ্গে স্পর্শ করতে পারে, তাই মৃত্যুর পরেও পারবে। সুতরাং কোনো নারী মারা গেলে তার যদি মাহরাম না থাকে তাহলে তার প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে বয়স্ক ভালো লোকেরা তাকে দাফন করবে। এমন কেউ না থাকলে সৎ ও ভদ্র যুবকেরা তাকে দাফন করবে। তবে যদি তার মাহরাম কেউ থাকে, যদিও সে দুধের সম্পর্কে হোক বা বিবাহের সম্পর্কে হোক তাহলে সেই তাকে কবরে নামাবে এবং দাফন করবে।

ইমাম নববী (র.) বলেন, সৎ পরপুরুষের চেয়ে মাহরাম ও স্বামী দাফন করা উত্তম। এ অভিমতের উপর আলোচ্য হাদীস দ্বারা কোনো প্রকার আপত্তি করার সুযোগ নেই। কেননা হতে পারে এখানে রাসূলে কারীম ﷺ ও হযরত ওসমান (রা.) -এর কোনো ওজর ছিল, যার দরুন তাঁরা কবরে নামতে পারেননি। –[মেরকাত]

এছাড়া হযরত ওসমান (রা.) কবরে না নামার ব্যাপারে আরো বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

وَعَنْ ١٦٢٤ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ لِابْنِهِ وَهُوَ فِيْ سِيَاقِ الْمَوْتِ إِذَا اَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَاِذَا دَفَنْتُمُوْنِيْ فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ اَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَاْنِسَ بِكُمْ وَاَعْلَمَ مَاذَا اُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّيْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬২৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি মরণকালে তাঁর ছেলেকে বলেছেন, আমি যখন মরে যাব তখন যেন আমার সঙ্গে কোনো বিলাপকারিণী ও আগুন না থাকে। অতঃপর তোমরা যখন আমাকে দাফন করে ফেলবে তখন ধীরে ধীরে আমার উপর মাটি ঢালবে। এরপর তোমরা আমার কবরের পাশে এতক্ষণ পরিমাণ সময় অবস্থান করবে যতক্ষণ সময়ের মধ্যে একটি উট জবাই করে তার গোশত বণ্টন করে দেওয়া যায়, যাতে আমি তোমাদের উপস্থিতি দ্বারা স্বাভাবিকতা বোধ করতে পারি এবং আমি আমার রবের প্রেরিত ফেরেশতাদেরকে কি জবাব দেব তা বুঝে উঠতে পারি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَائِحَةٌ : যারা চিৎকার করে বিলাপ করে কাঁদে। সাহাবীর উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো– তাদের বিলাপের ফলে মৃত ও জীবিত সবাই কষ্ট পায়। এমনিভাবে জানাজায় অনুগমনকারীদেরকে মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়, আর আখেরাতের চিন্তা থেকেও তাদেরকে গাফেল করে দেয়।

وَلَا نَارٌ : অর্থাৎ অহংকার ও বড়াই করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আগুন নেবে না। এছাড়া আগুন মৃত ব্যক্তির জন্যে একটি খারাপ আলামতও, তাই তা পরিহার করবে।

আর কিছুক্ষণ যে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন, তা মূলত রাসূলে কারীম ﷺ-এর আরেকটি হাদীসের অনুসরণ। সেটি হচ্ছে রাসূল ﷺ বলেছেন– اِسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ لِاَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْأَلُ অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ইস্তেগফার কর এবং তার দৃঢ়তার জন্যে দোয়া কর। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো দাফন শেষ করে একথা বলতেন।

وَعَنْ ١٦٢٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوْهُ وَاَسْرِعُوْا بِهٖ اِلٰى قَبْرِهٖ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ ـ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهٗ مَوْقُوْفٌ عَلَيْهِ ـ

১৬২৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন তোমরা তাকে আটকে রেখো না এবং তাকে দ্রুত তার কবরে পৌঁছে দাও। আর তার মাথার কাছে সূরা বাকারার শুরু অংশ এবং পায়ের কাছে সূরা বাকারার শেষ অংশ যেন পাঠ করা হয়। –[বায়হাকী এটা তাঁর শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা মাওকূফ হাদীস অর্থাৎ হুযূর ﷺ -এর বাণী নয়, আব্দুল্লাহর বাণী।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সূরা বাকারার শুরু অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শুরু থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত, আর শেষ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত। কবর দেওয়ার পর কি পাঠ করা হবে? এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। তবে এগুলোর পরস্পরে কোনো বিরোধ নেই। যেটাই পড়া হবে সেটাই উপকারে আসবে। আর মোল্লা আলী কারী (র.) আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ঈসালে ছওয়াব প্রসঙ্গে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রয়োজনে তা দেখা যেতে পারে।

وَعَنْ ١٦٢٦ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ بِالْحُبْشِىِّ وَهُوَ مَوْضَعٌ فَحُمِلَ اِلٰى مَكَّةَ فَدُفِنَ بِهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ اَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ :

كُنَّا كَنَدْمَانَىْ جَذِيْمَةَ حِقْبَةً * مِنَ الدَّهْرِ حَتّٰى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَاَنِّىْ وَمَالِكًا * لِطُوْلِ اِجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ اِلَّا حَيْثُ مِتَّ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৬২৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আবী মুলাইকা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর যখন 'হুবশী' নামক স্থানে মারা গেলেন, তখন তাকে মক্কায় নিয়ে এসে সেখানে দাফন করা হলো। এরপর যখন হযরত আয়েশা (রা.) এলেন তখন তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরের কবরের পাশে এলেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন–

كُنَّا كَنَدْمَانَىْ جَذِيْمَةَ حِقْبَةً * مِنَ الدَّهْرِ حَتّٰى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَاَنِّىْ وَمَالِكًا * لِطُوْلِ اِجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

"আমরা দীর্ঘদিন ধরে জাযীমার দুই সহচরের মতো দিন কাটিয়ে আসছিলাম, যার দরুন বলা হয়েছিল, তারা দুজন কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। অতঃপর আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম, তখন দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও যেন আমি ও মালেক একসঙ্গে একটি রাতও কাটাইনি ।" এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি তোমার পাশে উপস্থিত থাকতাম তাহলে তুমি যেখানে মৃত্যুবরণ করেছে, সেখানেই তোমাকে দাফন করতাম। আর আমি যদি উপস্থিত থাকতাম তাহলে তোমার জিয়ারত করার জন্যে আসতাম না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحُبْشِيُّ : এটা মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গা। জাওহারী (র.) বলেন, এটি মক্কার নিচু এলাকার একটি পাহাড়।

جَزِيْمَةَ : জাযীমা কোনো কোনো কপিতে আছে 'জুযাইমা'। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ 'জাযীমা' হচ্ছে ইরাক ও জাযীরার বাদশাহ, সে আরবকে তার রাজ্যভুক্ত করেছিল।

مَالِكٌ : মালেক হচ্ছে কবির ভাই, সে মারা গেছে। হযরত আয়েশা (রা.) যে কবির কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন, কবি তাতে স্বীয় ভাইয়ের ব্যাপারে শোক প্রকাশ করেছেন।

وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ : এর দ্বারা বুঝা যায় মেয়েদের জন্যে জিয়ারত উত্তম নয়। যদিও এক সময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকার পর মহিলাদেরকে কবর জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

١٦٢٧ وَعَنْ اَبِيْ رَافِعٍ (رضـ) قَالَ سَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَعْدًا وَرَشَّ عَلٰى قَبْرِهٖ مَاءً. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৬২৭. অনুবাদ : হযরত আবূ রাফে' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-কে কবরে নামিয়েছেন এবং তার কবরের উপর পানি ছিটিয়েছেন। –[ইবনে মাজাহ]

١٦٢٨ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ ثُمَّ اَتَى الْقَبْرَ فَحَثٰى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ ثَلٰثًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৬২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি জানাজার নামাজ পড়েছেন এরপর কবরের কাছে এসেছেন এবং তার মাথার দিকে তিন মুষ্টি মাটি দিয়েছেন। –[ইবনে মাজাহ]

١٦٢٩ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (رضـ) قَالَ رَاٰنِي النَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ اَوْ لَا تُؤْذِهٖ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৬২৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে হাযম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে একটি কবরের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখে বললেন, তুমি এ কবরবাসীকে কষ্ট দিয়ো না। অথবা বলেছেন, তাকে কষ্ট দিয়ো না। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে কষ্ট দ্বারা আত্মিক কষ্ট উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এভাবে কবরে হেলান দিয়ে বসার দ্বারা কবরবাসীকে অপমান করা হয়। এতে তার আত্মা কষ্ট পায়। তাই রাসূলে কারীম ﷺ তাকে এভাবে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

পরিচ্ছেদ : মৃতের জন্যে কান্নাকাটি করা

মৃত ব্যক্তির জন্যে কাঁদা অন্যায় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সন্তানদের মৃত্যুতে, সাহাবীদের মৃত্যুতে কেঁদেছেন। তবে তা হতে হবে নিঃশব্দে। নিষিদ্ধ হচ্ছে চিৎকার করে বিলাপ করা, হা-হুতাশ করা ও বুকে পিঠে চাপড়ানো। এমনিভাবে এমন কোনো আরচণ করা যার দ্বারা অধৈর্য ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। আচরণ অনেক সময় এতদূর পর্যন্ত পৌছে যে তাকে কুফরি বলা চলে। তাই এ বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা জরুরি।

মৃত ব্যক্তির একান্ত কাছের যেসব লোক শোকাহত অবস্থায় রয়েছে তাদের প্রতি শোক প্রকাশ করা, সান্ত্বনা দেওয়া এবং ধৈর্য ধরার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করা অন্যান্য দূরবর্তী আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপর দায়িত্ব। এছাড়া আরো কিছু দায়িত্বও তাদের উপর রয়েছে, এ পরিচ্ছেদের বিভিন্ন হাদীসে বিবৃত হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের লোকদের পদ্ধতিগত কিছু ভুল রয়েছে। অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যায়, অনেক লোক সশব্দে আফসোস করতে থাকে এবং এমন এমন আলোচনা করে যার দরুন পরিবারের লোকদের শোক আরো জেগে উঠে। এ সকল ক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর অনুসরণ করা হলে আর কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ!

এছাড়া মৃতের পরিবারের জন্যে খানা পাঠানো তাদের সার্বিক খবরাখবর নেওয়া সম্পর্কে এ পরিচ্ছেদে অনেক হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٣٠ اَنَسٍ (رض) قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهٗ وَشَمَّهٗ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهٖ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاَنَا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৩০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আবূ সাইফ কামারের ঘরে প্রবেশ করলাম। সে ছিল ইবরাহীমের দুধমার স্বামী। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবরাহীমকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে চুমা দিলেন। তার গায়ের ঘ্রাণ নিলেন। এরপর আমরা তার ঘরে আবার গেলাম। তখন ইবরাহীম প্রাণত্যাগ করছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চোখ দুটি অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। রাসূল ﷺ -কে কাঁদতে দেখে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনিও? রাসূল ﷺ বললেন, ইবনে আওফ! এ হচ্ছে রহমত ও দয়া। এরপর রাসূল ﷺ আবারও কাঁদলেন এবং বললেন, চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে, অন্তর ব্যথিত হচ্ছে, এরপরও আমরা তাই বলছি, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। আর হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা সবাই শোকার্ত।

-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَبُوْ سَيْفِ الْقَيْنِ : তাঁর নাম হচ্ছে বারা, তাঁর স্ত্রী উম্মে সাইফের নাম হচ্ছে খাওলা বিনতে মুনযির আনসারিয়া (রা.)। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, তাঁর নাম রাইয়ান। তিনি নবী করীম ﷺ -এর ছেলে ইবরাহীমের দুধমা ছিলেন।

اَلْقَيْنِ : শব্দটি قَافٌ হরফে যবর ও يَاءٌ হরফে জযমের সাথে। অর্থ হচ্ছে– কামার বা কর্মকার।

كَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ : ظِئْر শব্দটি ظ তে যের ও ء জযমের সঙ্গে। ظِئْر বলা হয় ঐ মহিলাকে যে অন্যদের সন্তানকে দুধ পান করায়। তবে শব্দটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত। অর্থাৎ যে মহিলা অন্যের সন্তানকে দুধ পান করায় তার স্বামীকেও ظِئْر বলা হয়। কেননা স্ত্রীর দুধ তার থেকে সৃষ্টি হয়।

হযরত ইবরাহীম যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ১৬/১৭ বছর। আর কেউ আঠারো বছর বলেছেন।

قَبَّلَهُ وَشَمَّهُ : চুমু দিয়েছেন এবং তার চেহারায় উপর রাসূল নিজের নাক ও চেহারা এমনভাবে রেখেছেন যেন তিনি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় শিশুদেরকে আদর-স্নেহ করা সুন্নত ও নববী পদ্ধতি। বর্ণিত আছে, একব্যক্তি বলেছে– আমার দশটি বাচ্চা আছে, আমি তাদের কাউকে চুমা দেইনি। রাসূলে কারীম ﷺ শুনে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া কেড়ে নিয়ে থাকে তো আমার করার কিছু নেই।

يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ : অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। جَادَ جَوْدًا দান করার অর্থ থেকে। অর্থাৎ তিনি প্রাণত্যাগ করছিলেন।

وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ : এখানে وَاَنْتَ শব্দটি একটি উহ্য অংশের উপর عَطْف হয়েছে। উহ্য অংশটি হচ্ছে– اَلنَّاسُ يَبْكُوْنَ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَبْكِىْ كَمَا يَبْكِىْ؟ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অর্থাৎ আপনিও এমন করছেন? মসিবতের কারণে মানুষ যেমন ব্যথিত হয় আপনিও সেরকম হচ্ছেন। সাহাবী এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করেছেন। তিনি মনে করছেন এ কান্না মসিবতের মোকাবিলা করা ও সবর করার ক্ষেত্রে অক্ষমতার প্রমাণ। রাসূলে কারীম ﷺ এ ধারণার জবাব দিয়েছেন যে, তুমি যে অশ্রু ঝরানো দেখতে পাচ্ছ তা অধৈর্যের কোনো আলামত নয়; বরং এ হচ্ছে দয়া ও স্নেহের বহিঃপ্রকাশ।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসের শেষ অংশে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, "চোখ অশ্রু ঝরাচ্ছে ......" সে কথা তার اِنَّهَا رَحْمَةٌ -এর ব্যাখ্যা। এর মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কারো মৃত্যুতে যদি মন দুঃখিত না হয় তাহলে তা তার পাষাণ হৃদয়ের দলিল। যদি চোখে পানি না আসে তাহলে তা তার স্নেহ ও দয়ার স্বল্পতাকে প্রমাণ করে। অতএব নিজের সন্তানের মৃত্যুতে হাসার চেয়ে কান্নাই উত্তম।

وَعَنْ ١٦٣١ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ اَرْسَلَتْ اِبْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ اِلَيْهِ اَنَّ ابْنًا لِّىْ قُبِضَ فَأْتِنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهٗ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

১৬৩১. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর মেয়ে তাঁর কাছে এই বলে খবর পাঠালেন যে, আমার একটি ছেলে মৃত্যু মুখে পতিত, তাই আপনি আসুন! তখন রাসূল ﷺ লোক মারফত সালাম পাঠিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা নিয়ে যান তা তাঁর এবং যা রেখে যান তাও তাঁর। আর জীবন-মরণ সবই তাঁর কাছে একটি সময়ের সঙ্গে নির্ধারিত। অতএব সে যেন সবর করে এবং ছওয়াবের আশা করে।

এরপর তিনি আল্লাহর দোহাই দিয়ে তাকে আসার জন্যে আবার পাঠালেন, তখন রাসূল উঠলেন। রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব ও যায়েদ

وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهٖ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهٖ فَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইবনে ছাবেত (রা.)-সহ আরো অনেকে। শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে তুলে দেওয়া হলো তখন শিশুটির প্রাণ ছটফট করছিল। এতে রাসূল ﷺ -এর দু-চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। হযরত সা'দ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এ কি? রাসূল ﷺ বললেন, এটা হচ্ছে দয়া; যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে দয়াবানদের প্রতি দয়া করেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّ اِبْنًا لِىْ قُبِضَ : এখানে قُبِضَ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অর্থাৎ যে প্রাণ ত্যাগের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। 'নেহায়া' গ্রন্থে রয়েছে قُبِضَ الْمَرِيْضُ বলা হয় যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি মারা যায় অথবা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে যায়।

আলোচ্য হাদীসে রাসূল ﷺ -এর মেয়ে হচ্ছেন হযরত যায়নাব (রা.)। আর শিশু সন্তানটির ব্যাপারে কেউ বলেছেন, সে হচ্ছে আলী ইবনে আবিল আস। আবার কেউ বলেছেন, সে হচ্ছে উসামা বিনতে আবিল আস। যেমনটা মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসে কারো প্রতি শোক প্রকাশের একটি নিয়ম শেখানো হয়েছে। সে কারণে আল্লামা শায়বানী (র.) বলেছেন, কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে চাইলে তার কাছে সালাম পাঠাবে এবং ইন্নালিল্লাহ .... বলবে।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর একটি ছেলে মারা গেলে নবী কারীম ﷺ তাঁর প্রতি এভাবে শোক প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ . فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اَمَّا بَعْدُ، فَاَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الْاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، وَرَزَقَنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ، فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلِيْنَا وَ اَوْلَادَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهَنِيْئَةِ وَعَوَارِيَةِ الْمُسْتَوْدَعَةِ، مَتَّعَ بِهَا اِلٰى اَجَلٍ مَعْدُوْدٍ، وَيَقْبِضُهَا لِوَقْتٍ مَعْلُوْمٍ، ثُمَّ افْتَرَضَ الشُّكْرَ اِذَا اَعْطٰى، وَالصَّبْرَ اِذَا ابْتَلٰى، فَكَاَنَّ اِبْنَكَ مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيْئَةِ، وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ، مَتَّعَكَ بِهٖ فِىْ غِبْطَةٍ وَسُرُوْرٍ، قَبَضَهُ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَثِيْرٍ الصَّلَاةَ وَالرَّحْمَةَ وَالْهُدٰى، اِنِ احْتَسَبْتَ فَاصْبِرْ، وَلَا يُحْبِطْ جَزَعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمْ، وَاَعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَا يَدْفَعُ حُزْنًا، وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ وَالسَّلَامُ .

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا؟ : অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.) মনে করেছিলেন সব ধরনের কান্নাই হারাম আর রাসূল ﷺ তা ভুলে গেছেন। তার এ ধারণার প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, শুধু কান্না ও অশ্রু ঝরানো হারাম নয় এবং মাকরূহও নয়; বরং এ হচ্ছে রহমত ও সবরের বহিঃপ্রকাশ এবং এটি একটি গুণ। হারাম তো হচ্ছে বিলাপ করা, হা-হুতাশ করা, গালে থাপ্পড় মারা ও জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা। –[মেরকাত]

فَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ : اَلرُّحَمَاءُ শব্দটি رَحِيْمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে رَاحِمٌ 'দয়াবান'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে বান্দার প্রতিই দয়া করেন যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার দয়ার গুণে গুণান্বিত, যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য বান্দাদের প্রতি দয়া করে। অতএব যারা দয়া করে না, আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি দয়া করেন না।

وَعَنْ ١٦٣٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اشْتَكٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوٰى لَهٗ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهٗ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهٗ فِىْ غَاشِيَةٍ فَقَالَ قَدْ قُضِىَ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهٖ اَوْ يَرْحَمُ وَاِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ عَلَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৩২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.) একটি রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে দেখতে এলেন, সঙ্গে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মারা গেছে? তারা বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তখন নবী করীম ﷺ কেঁদে ফেললেন, নবী করীম ﷺ -এর কান্না দেখে উপস্থিত লোকেরাও কেঁদে ফেলল। এরপর তিনি বললেন, তোমরা শুনে রাখ! আল্লাহ তা'আলা চোখের অশ্রু ঝরানোর কারণে এবং অন্তরের বেদনার কারণে কাউকে শাস্তি দেন না; বরং আল্লাহ শাস্তি দেন বা দয়া করেন এর কারণে– এই বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর বললেন, মৃত ব্যক্তির জন্যে পরিবারের লোকদের বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فِىْ غَاشِيَةٍ : غَاشِيَةٌ -এর এক অর্থ হচ্ছে– অসুস্থতার চরম অবস্থা। আরেক অর্থ হচ্ছে– অসুস্থতার প্রবলতার কারণে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা। যার ফলে রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞেস করেছেন, সে মারা গিয়েছে কিনা? আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, غَاشِيَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অসুস্থতার ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া, মৃত্যুর অবস্থা উদ্দেশ্য নয় কেননা তিনি সে অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়েছিলেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেছেন। আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, غَاشِيَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা তখন তাকে ঘিরে রেখেছিল, হয়তো তার সেবায় বা তার সাক্ষাতের জন্যে লোকেরা ভিড় করেছিল। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, غَاشِيَةٌ দ্বারা এ উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি ঐ কাপড় যা দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আর ঢেকে রাখার কারণেই রাসূল ﷺ বুঝতে পারেননি যে, সে মারা গেছে নাকি জীবিত আছে।

اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ عَلَيْهِ : হাদীসের এ বর্ণনায় রয়েছে بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ, অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهٖ 'আরেক বর্ণনায় রয়েছে بِبُكَاءِ اَلْحَىِّ অপর এক বর্ণনায় রয়েছে يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهٖ مَا نِيْحَ عَلَيْهِ, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে مَنْ يُبْكَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ এভাবে বিভিন্ন বর্ণনায় এটি বর্ণিত হয়েছে, যা বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) তাদের এ বর্ণনাকে অস্বীকার করেছেন এবং তিনি দাবি করেছেন হযরত ওমর ও ইবনে ওমর বিষয়টি ভুলে গেছেন বা অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে তা গুলমাল করে ফেলেছেন এবং এ কথাটি রাসূল ﷺ -এর হাদীসে হওয়াকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এ ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্যের পক্ষে এ আয়াত দিয়ে দলিল দেন– وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى "কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।" সুতরাং জীবিতদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তির শাস্তি হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, মূলত বিষয়টি হচ্ছে এ রকম যে, নবী করীম ﷺ এক ইহুদি মহিলার ব্যাপারে বলেছিলেন– اِنَّهَا تُعَذَّبُ وَهُمْ يَبْكُوْنَ عَلَيْهَا অর্থাৎ "ওকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আর তারা তার জন্যে কাঁদছে।" হযরত আয়েশা (রা.) এর অর্থ এভাবে করেছেন যে, ইহুদি মহিলাকে তার কুফরির কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল, যখন তার পরিবারের লোকেরা তার জন্যে কাঁদছে। তাদের কান্নার কারণে শাস্তি হয়নি।

এটা হচ্ছে হযরত ওমর ও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণনার বিপরীতে হযরত আয়েশা (রা.) -এর বক্তব্য। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরাম আয়াত ও হাদীসের দুটি আলাদা ক্ষেত্র বের করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা দ্বিমতও হয়েছে। এরপরও দ্বিমতের বক্তব্যগুলো থেকেও এ বাহ্যিক বৈপরীত্যের সমাধান বেরিয়ে আসে।

জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে যদি সে তার জন্যে কাঁদতে ও বিলাপ করতে অসিয়ত করে যায়, আর পরিবারের লোকেরা তার অসিয়ত পূরণার্থেই কান্নাকাটি করে। এক্ষেত্রে তার শাস্তি হবে কারণ সে কান্নার মূল কারণ। আর যদি সে এমন অসিয়ত না করে যায় তাহলে এ কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তির কোনো শাস্তি হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى

কেউ বলেছেন, এখানে মৃত ব্যক্তি দ্বারা মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে ঘিরে কান্নাকাটি করলে, হা-হুতাশ করলে এটা তার জন্যে কষ্টকর হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কথাই এখানে বেশি সঠিক বলে মনে হয়। কেননা অন্য আয়াতে রয়েছে– لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরাম হাদীস ও আয়াতের মাঝে যে সমাঞ্জস্য সাধন করেছেন এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বক্তব্য খণ্ডন হয়ে যায়। কেননা মৃত ব্যক্তি যদি পরিবারের লোকদেরকে হা-হুতাশ করার জন্যে অসিয়ত করে যায় বা তাদের হা-হুতাশকে সে পছন্দ করে তাহলে তা তারই আমল হলো, অন্যের বোঝা তার ঘাড়ে চাপেনি। আর সে কারণেই দেখা যায় আল্লাহ তা'আলার অনেক বান্দা মৃত্যুর আগে পরিবারের লোকদেরকে কান্নাকাটি না করার জন্যে অসিয়ত করে গেছেন। –[মেরকাতের আলোকে]
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

তবে এ আলোচনা ঐ কান্না নিয়ে যা সশব্দে হবে এবং হা-হুতাশের মাধ্যমে হবে। নচেৎ নিঃশব্দ কান্না ও চোখের পানি পড়ার দ্বারা কারো কোনো গুনাহ হবে না।

وَعَنْ ١٦٣٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৩৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা নিজেদের চেহারায় আঘাত করে, জামার বুক ফেড়ে ফেলে এবং জাহিলি যুগের মতো হা-হুতাশ করে তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٦٣٤ اَبِىْ بُرْدَةَ (رض) قَالَ اُغْمِىَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى فَاَقْبَلَتْ اِمْرَاَتُهٗ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمِىْ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا بَرِئٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَلَفْظُهٗ لِمُسْلِمٍ .

১৬৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আবূ মূসা (রা.) বেহুঁশ হয়ে গেলেন, তখন তাঁর স্ত্রী উম্মে আব্দুল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। অতঃপর হযরত আবূ মূসা (রা.) স্বাভাবিক হয়ে স্ত্রীকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মাথার চুল ছিঁড়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে এবং জামার গলা ছিঁড়ে ফেলে আমি তার থেকে মুক্ত। –[বুখারী ও মুসলিম; কিন্তু শব্দ মুসলিমের]

وَعَنْ ١٦٣٥ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ اَلْفَخْرُ فِى الْاَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الْاَنْسَابِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ মালেক আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে জাহিলি যুগের চারটি প্রথা রয়ে গেছে যা তারা ছাড়ছে না– ১. গুণের বড়াই, ২. কোনো বংশের নিন্দা, ৩. গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা এবং ৪. শোকের বিলাপ। তিনি আরো বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর আগে তওবা না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে দাঁড় করানো হবে যে, তার গায়ে আলকাতরা মাখা পোশাক থাকবে এবং ক্ষত ও ঘায়ের জামা থাকবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উম্মতের মাঝে জাহিলি যুগের চারটি স্বভাব থেকে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, এ স্বভাবগুলো উম্মতের মাঝে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং তারা কখনো এ স্বভাবগুলো সমূলে ছাড়তে পারবে না, যেমনিভাবে তারা অন্যান্য স্বভাব ছাড়তে পেরেছে। ফলে এ চারটি স্বভাব যদিও বা কেউ ছেড়ে দেয়, তো আরেক দল তা আঁকড়ে ধরবে।

اَلْفَخْرُ فِى الْاَحْسَابِ : حَسَبٌ বলা হয় কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে। যেমন– বীরত্ব, দানশলীতা ও বাগ্মিতা ইত্যাদি। কেউ বলেছেন, حَسَبٌ হচ্ছে পূর্বপুরুষের অবদান ও ঐতিহ্য। ইবনুস সফাইত বলেন, حَسَبٌ ও كَرَمٌ হচ্ছে যা কোনো ব্যক্তির মাঝে থাকে, যদিও তা তার বাপদাদাদের মাঝে না থাকে। আর مَجْد ও شَرَف বলা হয় যা শুধুমাত্র বাপদাদাদের মাঝে থাকার দ্বারাই হয়। লোকেরা বলে থাকে– مَنْ فَاتَ حَسَبُهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِحَسَبِ اَبِيْهِ অর্থাৎ "যার নিজের বিশেষত্ব নেই, সে তার বাপদাদার গুণাগুণ দিয়ে উপকৃত হতে পারে না।" আর অন্যকে ছোট জ্ঞান করার জন্যে নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় মনে করা জায়েজ নেই।

اَلطَّعْنُ فِى الْاَنْسَابِ : অর্থাৎ মানুষের বংশের মাঝে কোনো ত্রুটি ঢুকিয়ে দেওয়া বা ত্রুটির দাবি করা অর্থাৎ কেউ অপর কোনো লোকের বাপদাদাদেরকে হেয় করা বা গালি দেওয়া এবং নিজের বাপদাদাকে প্রাধান্য দেওয়া। এমনটি করা জায়েজ নেই। তবে ইসলাম ও কুফরের তুলনা চলতে পারে। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তবে যদি কেউ মুসলমানদের কষ্ট দিতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে করা যায়।

اَلْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ : অর্থাৎ নক্ষত্রের অসিলা দিয়ে বৃষ্টি কামনা করা। জাহিলি যুগে কাফেররা বলত– مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا অর্থাৎ "আমরা অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি।" মুসলমানদের মাঝে সে বিষয়টি এভাবে রয়ে গেছে যে, অমুক নক্ষত্র উদিত হওয়ার কারণে বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এভাবে বলা হারাম। আর এভাবে বলা ওয়াজিব যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি।

سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ : اَلْقَطِرَانُ শব্দটির قَافٌ হরফে যবর ও طَاءٌ হরফে যের দিয়ে। অর্থ হচ্ছে– আলকাতরা।

دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার শরীরে এমন ক্ষত ও চুলকানি ছড়িয়ে পড়বে যে তা তার লৌহবর্মের মতো তাকে ঘিরে রাখবে। তখন তার চুলকানির চিকিৎসার জন্যে ক্ষতস্থানগুলোতে গরম আলকাতরা ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে এ ঔষধ তার জন্যে পূর্বেকার অসুস্থতার চেয়ে আরো বেশি কষ্টকর হতে পারে। কেননা তাতে আলকাতরা কাপড়ে থাকবে এবং এর কারণে আগুন তার চামড়াকে আরো দ্রুত ঘিরে ধরবে আর এতে বীভৎস রূপ ধারণ করবে।

তুরপুশতী (র.) বলেন, ক্ষতের জামা পরানোর কারণ হচ্ছে, সে ব্যক্তি তার জ্বালাময় কথাবার্তা দ্বারা মসিবতগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর ক্ষতবিক্ষত করে দিত। সে কারণে তাকে সে ধরনের শাস্তিই দেওয়া হয়েছে। আর আলকাতরার জামা দেওয়ার কারণ হচ্ছে, সে মাতম করার সময় কালো কাপড় পরেছে। তাই সে যেন এ কালো কাপড় পড়ে যথাযথ শাস্তি ভোগ করে সেজন্যে এ পোশাক দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, জাহিলি যুগের চারটি চরিত্রের মাঝে শুধুমাত্র একটির শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর : এর জবাবে বলা যায়, এ শেষ বিষয়টি নারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর তারা কোনো নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে না, যেভাবে পুরুষরা বিরত থাকে। তাই তাদের জন্য অতিরিক্ত শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٦٣٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اِتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ قَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّىْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِىْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৩৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন একটি কবরের পাশে ক্রন্দনরতা এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। সে বলল, আমার কাছ থেকে সরে যাও, আমি যে বিপদে পড়েছি তুমি সে বিপদে পড়নি। মহিলাটি তখন রাসূল ﷺ -কে চিনতে পারেনি। তাকে বলা হলো, ইনি নবী করীম ﷺ। অতঃপর মহিলাটি নবী করীম ﷺ -এর দরজায় আসল এবং সেখানে কোনো দারওয়ান দেখতে পেল না। সে এসে বলল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রাসূল ﷺ বললেন, ধৈর্য তো ধরতে হয় প্রথম ব্যথার সময়। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٦٣٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلٰثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ اِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে শুধুমাত্র কসম পুরা করার জন্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاِنَّ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ শপথ! "তোমরা প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করবে।" আল্লাহ তা'আলা কৃত এ শপথ পুরা করার জন্যেই যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান মারা গেছে সেও নিমিষের জন্যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলের উপর দিয়ে সে অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করার কারণে তার গায়ে আগুনের আঁচ পর্যন্ত লাগবে না। –[আ'যমী]

وَعَنْهُ ١٦٣٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ لَا يَمُوْتُ لِاَحَدٍ لُكُنَّ ثَلٰثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ اِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ اَوِ اثْنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَوِ اثْنَانِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا ثَلٰثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ .

১৬৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু আনসারী মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে এবং এর উপর ছওয়াবের আশা রাখবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মধ্য থেকে এক মহিলা বলে উঠল, হে আল্লাহ রাসূল ﷺ! যদি দুটি মারা যায় তাহলে? তিনি বললেন, দুটি মারা গেলেও। –[মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, এমন তিনটি সন্তান যারা গুনাহের বয়সে পৌঁছেনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : তিনটি সন্তানের কথা বলার পর যে রাসূল ﷺ দুটি সন্তানের কথাও বলেছেন– এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আ'যমী (র.) বলেন, তিনটির কথা বলার পর দুটির কথা তিনি ওহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলেন। অথবা এমন হতে পারে যে, তিনি তখন দোয়া করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেছেন।

এ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ : কোনো বর্ণনায় শুধুমাত্র তিন সন্তানের উল্লেখ এসেছে, আর কোনো বর্ণনায় لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ অতিরিক্ত অংশটুকু আছে। এর অর্থ হচ্ছে, তারা এখনো প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়নি যে তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের কলম চলবে এবং তারা তাদের জন্যে গুনাহ লিখবে। আর কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা এখনো গুনাহ করেনি। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে তারা এমন পর্যায়ে এখনো পৌঁছেনি যে তাদের জন্যে গুনাহ লেখা হবে।

وَعَنْهُ ١٦٣٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৬৩৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার নিকট আমার মু'মিন বান্দার জন্যে জান্নাত ব্যতীত আর কোনো বদলা নেই। যখন আমি তার দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটিকে তুলে নেই আর সে তার উপর সবর করে। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٤٠ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৬৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাপকারিণী ও বিলাপ শ্রবণকারিণীকে লানত করেছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিলাপ করা ও শোনা যেহেতু সাধারণত নারীরাই করে থাকে সে জন্যে এ হাদীসে নারীদের কথা বলা হয়েছে। নচেৎ পুরুষরাও যদি এ গর্হিত কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের জন্যেও একথা প্রযোজ্য হবে। –[আ'যমী]

وَعَنْ ١٦٤١ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَشَكَرَ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللّٰهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِىْ كُلِّ اَمْرِهٖ حَتّٰى فِى اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَأَتِهٖ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৬৪১. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনের ব্যাপারটি বড় আশ্চর্যজনক! সে যদি কল্যাণের ভাগী হয় তখন সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করে, আর যদি সে কোনো বিপদে পড়ে তাহলে সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং ধৈর্যধারণ করে। ফলে মু'মিন তাঁর প্রতিটি কাজে ছওয়াবের ভাগী হয়। এমনকি সে তাঁর স্ত্রীর মুখে যে লুকমা তুলে দেয় তার বদলায়ও।

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ١٦٤٢ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَهُ بَابَانِ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَاِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৬৪২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই দুটি করে দরজা রয়েছে। একটি দরজা হচ্ছে, যা দিয়ে তার আমল ঊর্ধ্বে গমন করে আরেকটি দরজা হচ্ছে, যা দিয়ে তার রিজিক অবতীর্ণ হয়। এরপর মু'মিন লোকটি যখন মারা যায় তখন দরজা দুটি তার জন্যে কাঁদে। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ– فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ অর্থাৎ "তখন আকাশ ও জমিন তাদের জন্যে কাঁদেনি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে দুটি দরজার কান্না দ্বারা সরাসরি কান্নাও হতে পারে যেমন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এটাই যে, প্রতিটি বস্তুই তার ভাষায় তাসবীহ পড়ে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে ইত্যাদি। অথবা এর অর্থ হতে পারে, ঐ দুটি দরজায় অবস্থিত ফেরেশতাগণ এ মু'মিনের জন্যে কাঁদেন। –[মেরকাত]

এ প্রসঙ্গে فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ আয়াতটি উল্লেখ করে রাসূলে কারীম ﷺ এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, কাফেরদের প্রতি মায়ায় যেহেতু আকাশ-জমিন কাঁদেনি বুঝা গেল মু'মিনের জন্যে আকাশ জমিন কান্নাকাটি করে। –[আ'যমী]

وَعَنْ ١٦٤٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ اُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ فَقَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ اُمَّتِكَ قَالَ فَاَنَا فَرَطُ اُمَّتِىْ لَنْ يُصَابُوْا بِمِثْلِىْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৬৪৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যার দুটি নাবালেগ মৃত সন্তান থাকবে, তাদের অসিলায় আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করবেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উম্মতের কারো যদি একটি নাবালেগ মৃত সন্তান থাকে তাহলে? তিনি বললেন, যার একটি নাবালেগ মৃত সন্তান থাকবে তাকেও, হে তাওফীক প্রাপ্তা! হযরত আয়েশা (রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উম্মত থেকে যার একটি নাবালেগ মৃত সন্তানও থাকবে না, তার কি হবে? তিনি বললেন, আমি তার জন্যে অগ্রপথিক হব। কেননা তারা আমাকে হারানোর কষ্টের মতো আর কোনো কষ্ট পায়নি।
–[তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَرَطَانِ : বেগুনাহ দুটি সন্তান, যারা মা বাবার আগে মারা গেছে। فَرَطٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– অগ্রগামী হওয়া, আগে চলে যাওয়া, যে আগে যায় তাকে বলা হয় فَرَطٌ ও فَارِطٌ ; নিষ্পাপ যে সন্তান মা-বাবার আগে মারা গেছে তাকে فَرَطٌ এ কারণে বলা হয়েছে যে, সে আগে গিয়ে তার মা-বাবার জন্যে জান্নাতে যাওয়ার এবং সেখানে অবস্থান করার আয়োজন করে। যেমনিভাবে যে কোনো কাফেলার অগ্রগামী দলটি আগে আগে গিয়ে সে কাফেলার থাকার বন্দোবস্ত করে থাকে, তাদের প্রয়োজনীয় দানা-পানির ব্যবস্থা করে। এমনিভাবে সন্তান মৃত্যুর পর তারা যে ধৈর্য ধরেছে সে ধৈর্যের কারণে তারা বেহেশতে প্রবেশ করে। অথবা ঐ সন্তানই তাদের মাতাপিতার জন্যে সুপারিশ করতে থাকে, ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করে। –[মেরকাত]

রাসূলে কারীম ﷺ দুই সন্তান মারা যাওয়ার কথা বলেছেন, পরে হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করার কারণে বলেছেন, এক সন্তান মারা গেলেও সে তার মাতাপিতার জান্নাতে প্রবেশ করার অসিলা হবে। আর যাদের কোনো সন্তান এভাবে মারা যায়নি তাদের জন্যে আমি অগ্রপথিক। আমি তাদের জন্যে সুপারিশ করব। কেননা আমাকে হারানোর যে ব্যথা তারা অনুভব করেছে তার চেয়ে কঠিন ব্যথা তারা আর পায়নি। তবে এ শেষ বিষয়টি ওদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য যারা রাসূল ﷺ -কে দেখেছেন। কেননা তাঁকে দেখার পর হারানোর ব্যথা সত্যিই অসহ্য ছিল।

وَعَنْ ١٦٤٤ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৬৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিয়েছ? তখন তারা বলে, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা কি তার কলিজার ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করলেন, আমার বান্দা কি বলল? তারা বলেন, সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং ইন্নালিল্লাহ পড়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার বান্দার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নাম দাও 'বায়তুল হামদ'। −[আহমদ ও তিরমিযী]

وَعَنْ ١٦٤٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ مَرْفُوْعًا اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمِ الرَّاوِىْ وَقَالَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَوْقُوْفًا ـ

১৬৪৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেবে সে তার সম পরিমাণ ছওয়াব পাবে। −[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি غريب যা রাসূলের হাদীস হিসেবে শুধুমাত্র আলী ইবনে আসেম নামক এ বর্ণনাকারীই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কেউ কেউ এ হাদীসটি এ বর্ণনাসূত্রে মুহাম্মদ ইবনে সূকা থেকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ١٦٤٦ اَبِىْ بَرْزَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى ثَكْلٰى كُسِىَ بُرْدًا فِى الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৬৪৬. অনুবাদ : হযরত আবূ বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সন্তানহারা মাকে সান্ত্বনা দেবে তাকে বেহেশতে একটি ডোরাকাটা চাদর পরানো হবে। −[তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব।]

وَعَنْ ١٦٤٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِصْنَعُوْا لِاٰلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৬৪৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত জা'ফর (রা.) -এর মৃত্যু সংবাদ এল, তখন নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্যে খানা তৈরি কর। কেননা তাদের কাছে এমন শোক সংবাদ এসেছে, যা তাদেরকে খানা থেকে বিরত করে রাখবে।
–[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : অর্থাৎ এ শোক সংবাদের দুঃখ-ব্যথা তাদেরকে খানা তৈরি করা থেকে বিরত রাখবে, ফলে তারা তাদের অজান্তে দুর্বল হয়ে পড়বে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীস একথা প্রমাণ করে যে, শোকার্ত পরিবারের জন্যে খানা তৈরি করা নিকটাত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীর জন্যে মুস্তাহাব।

আর এ খানা তৈরি করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে একদিন একরাতের খানা তৈরি করা। কেননা খানা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার মতো শোক সাধারণত একদিনের বেশি স্থায়ী হয় না। কেউ বলেছেন, সান্ত্বনা দেওয়া বা শোক প্রকাশের যে তিনদিন সময়-রয়েছে সে সময় পর্যন্ত তাদের জন্যে খানা তৈরি করবে। যখন তাদের জন্যে খানা তৈরি করবে তখন তাদেরকে আদর-সমাদর করে হলেও খাওয়ানোর চেষ্টা করবে, এটাই উত্তম। যাতে লজ্জা ও দুঃখের কারণে খানা ছেড়ে দিয়ে তারা দুর্বল না হয়ে পড়ে। কিন্তু দূর থেকে খানা তৈরি করে পাঠানো, অথবা বিলাপকারিণীদের জন্যে নিকটের লোকেরা খানা তৈরি করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এর দ্বারা গুনাহের ব্যাপারে সহযোগিতা করা হয়। আর লোক সমাগমের উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা খানা পাকানো একটি নিকৃষ্ট বিদ'আত। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন– كُنَّا نَعُدُّهُ مِنَ النِّيَاحَةِ অর্থাৎ "আমরা এ বিষয়টি বিলাপ করার শামিল মনে করতাম।" তার এ কথা দ্বারা এমন আয়োজন হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। ইমাম গাযালী (র.) বলেন, এসব খানা খাওয়া মাকরূহ।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ বিদ'আত ও মাকরূহ হওয়ার বিধান হচ্ছে, যদি সেই আয়োজনে এতিম বা অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল না থাকে, আর যদি সে আয়োজনে এতিম বা অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল থাকে, তাহলে তা সর্বস্বীকৃত মতে হারাম।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٤٨ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৪৮. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যার জন্যে বিলাপ করা হয়েছে তাকে কিয়ামতের দিন ঐ কথাগুলো দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে, যা তার বিলাপে বলা হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : বিলাপে যা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিলাপে তার যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, সেসব গুণের কথা উল্লেখ করে কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি না দুনিয়াতে এমন এমন গুণের অধিকারী ছিলে? এ বলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। যদি সে এ বিলাপের কারণ হয়ে থাকে। –[আ'যমী]

وَعَنْ ١٦٤٩ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَ ذُكِرَ لَهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ تَقُوْلُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ اَوْ اَخْطَاَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِىْ عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৪৯. অনুবাদ : হযরত আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলা হলো যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, "মৃতের জন্যে জীবিত ব্যক্তিদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়", তখন আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আবূ আব্দুর রহমানকে ক্ষমা করুন। তবে তিনি মিথ্যা বলেননি, বরং তিনি ভুলে গেছেন বা ভুল বুঝেছেন। আসল বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন এক ইহুদি মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার জন্যে কান্নাকাটি করা হচ্ছিল, তখন তিনি বলেছেন, তারা তার জন্যে কাঁদছে অথচ তাকে তার কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

[এ প্রসঙ্গে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে।]

وَعَنْ ١٦٥٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ (رض) قَالَ تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنِّىْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمٰنَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ اَلَا تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ فَاِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلَاءِ الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اُدْعُهُ فَرَجَعْتُ اِلٰى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ اِرْتَحِلْ فَالْحَقْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا اَنْ اُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ

১৬৫০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর এক মেয়ে মক্কায় মারা গেলে আমরা তার জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য আসলাম। সেখানে হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও এসেছেন। আমি তাঁদের দুজনের মাঝে উপবিষ্ট। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আমর ইবনে ওসমানের দিকে মুখ করে বললেন, তুমি কি কাঁদতে নিষেধ করবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্যে তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, হযরত ওমর (রা.)-ও এ ধরনের কথা বলতেন। এরপর তিনি বর্ণনা করলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে মক্কা থেকে বের হলাম। আমরা যখন 'বাইদা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন হযরত ওমর (রা.) সামুরা গাছের ছায়ায় অবস্থানরত একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি আমাকে বললেন, গিয়ে দেখ এ কাফেলাটি কাদের? আমি দেখলাম, তারা হচ্ছে সুহাইবের দল। আমি তাকে জানালাম। তিনি বললেন, ওকে ডাক। আমি সুহাইবের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, আপনি চলুন এবং আমীরুল মু'মিনীনের সঙ্গে মিলিত হোন। এরপর হযরত ওমর (রা.) যখন হামলায় আক্রান্ত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) কাঁদতে কাঁদতে ঘরে

صُهَيْبٌ يَبْكِىْ يَقُوْلُ وَا اَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اَتَبْكِىْ عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ عُمَرَ لَا وَاللّٰهِ مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلٰكِنْ اِنَّ اللّٰهَ يَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

প্রবেশ করলেন এবং বলছিলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার সঙ্গী! তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে সুহাইব তুমি আমার জন্যে কাঁদছ? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির জন্যে তার পরিবারের কিছু কিছু কান্নার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর হযরত ওমর (রা.) যখন মারা গেলেন, তখন এ বিষয়টি আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর (রা.)-এর উপর রহম করুন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন হাদীস বর্ণনা করেননি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। তবে কাফেরের জন্যে তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ তা'আলা কাফেরের শাস্তি বাড়িয়ে দেন। হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, এ বিষয়ে তোমাদের জন্যে কুরআনই যথেষ্ট- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى "কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে হাসান ও কাঁদান। ইবনে আবী মুলায়কা বলেন, এ কথার পর হযরত ইবনে ওমর (রা.) আর কিছু বলেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٦٥١ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِىَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَ جَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِىْ شَقَّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ اِنْهَهُنَّ فَاَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللّٰهِ غَلَبْنَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَزَعَمْتُ اَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِىْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ لَنْ تَفْعَلَ مَا اَمَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৫১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কাছে যখন ইবনে হারেছা, জা'ফর ও ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ এল, তিনি বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় তখন বেদনার ছাপ স্পষ্ট ছিল। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছি। তখন তাঁর কাছে একটি লোক এল এবং বলল, জা'ফরের ঘরের মহিলারা কান্নাকাটি করছে। রাসূল ﷺ তাদেরকে নিষেধ করার জন্যে তাকে বললেন। সে গেল এরপর দ্বিতীয়বার ফিরে এসে বলল, তারা তার কথা মানছে না। রাসূল ﷺ আবার বললেন, তুমি তাদেরকে নিষেধ কর। এরপর লোকটি তৃতীয়বার আবারও ফিরে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহর শপথ ওরা আমাদেরকে পরাস্ত করে দিয়েছে। তখন আমার মনে হয়েছে রাসূল ﷺ বলেছেন, তাহলে তাদের মুখে মাটি ভরে দাও। তখন আমি নিজে নিজে বললাম, তোমার মুখে ছাই পড়ুক! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে যে আদেশ করেছেন, তুমি তা করতে পার না, আবার রাসূল ﷺ -কে বিরক্ত করতেও ছাড় না। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٦٥٢ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيْبٌ وَفِىْ اَرْضِ غُرْبَةٍ لَاَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ اِذْ اَقْبَلَتْ اِمْرَأَةٌ تُرِيْدُ اَنْ تُسْعِدَنِىْ فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تُدْخِلِى الشَّيْطَانَ بَيْتًا اَخْرَجَهُ اللّٰهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ اَبْكِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৫২. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ সালামা মারা গেল তখন আমি বললাম, হায়! একজন পরদেশী মুসাফির পরদেশে মারা গেল। আমি তাঁর জন্যে এমন কাঁদা কাঁদব যা আলোচিত বিষয় হয়ে যাবে। আমি কাঁদার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম। এরই মধ্যে এক মহিলা আমাকে সহযোগিতা করার জন্যে এল এসে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পড়ল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি এমন ঘরে শয়তানকে প্রবেশ করাতে চাও যে ঘর থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে বের করে দিয়েছেন। একথা তিনি দুবার বললেন, ফলে আমি কান্না থেকে বিরত থাকলাম, আর কাঁদলাম না। -[মুসলিম]

وَعَنْ ١٦٥٣ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ اُغْمِىَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ اُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِىْ وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ اَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا اِلَّا قِيْلَ لِىْ اَنْتَ كَذٰلِكَ زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৬৫৩. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) একবার বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর বোন আমরাহ কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল, হায় পাহাড়সম ভাই! হায় অমুক গুণের অধিকারী! হায় অমুক গুণের অধিকারী! এভাবে তাঁর গুণাবলি উল্লেখ করতে লাগল। অতঃপর যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এল, তখন তিনি বললেন, তুমি আমার যে গুণের কথাই বলেছ প্রত্যেকবারই আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তুমি কি এমন? অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত এ অংশটুকু আছে, এরপর যখন তিনি মারা গেলেন, তখন তাঁর বোন তার জন্যে কাঁদেনি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হযরত ওমর (রা.)-এর মাযহাবকে সমর্থন করে। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবিতদের বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তিদের কবরে শাস্তি হয় এ বিষয়টি এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

وَعَنْ ١٦٥٤ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ فَيَقُوْلُ وَاجَبَلَاهُ وَاسَيِّدَاهُ وَنَحْوَ ذٰلِكَ اِلَّا وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ مَلَكَيْنِ يَلْهَزَانِهٖ وَيَقُوْلَانِ اَهٰكَذَا كُنْتَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ)

১৬৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর যখন তার পরিবারের বিলাপকারীরা বিলাপ শুরু করে এবং বলতে থাকে, হায় পর্বতসম ব্যক্তি! হায় আমাদের সর্দার! ইত্যাদি তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে ফেরেশতা নিযুক্ত করেন যারা তার বুকে আঘাত করতে থাকে এবং জিজ্ঞেস করতে থাকে তুমি কি এমন ছিলে? -[তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, এটা গরীব; কিন্তু হাসান।]

وَعَنْ ١٦٥٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ اٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَاِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيْبٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ)

১৬৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারের কেউ একজন মারা গেলে পরে মহিলারা তার জন্যে কাঁদতে জড় হলো, তখন হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে নিষেধ করার জন্যে এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এদেরকে ছাড়, কারণ চোখ অশ্রুসিক্ত, অন্তর বিপদগ্রস্ত এবং বিপদ সদ্যাগত। -[আহমদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসের বাহিক্য অর্থ থেকে বুঝা যায়, তাদের কান্না সশব্দে ছিল, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে ছিল না। তাই হযরত ওমর (রা.) কান্নার এ প্রথা বন্ধ করার জন্যে তাদেরকে নিষেধ করেছেন। বিশেষত নবী করীম ﷺ -এর সামনে যেন এ নিকৃষ্ট কাজের বহিঃপ্রকাশ না ঘটে। কিন্তু নবী কারীম ﷺ মহিলাদের ওজরের কথা উল্লেখ করে তাকে থামাতে চেষ্টা করেছেন। অথবা তা এ কারণেও হতে পারে যে, হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে মারতে শুরু করেছিলেন, তাই রাসূল ﷺ তাকে বাধা দিয়েছেন। যেমন পরবর্তী হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ١٦٥٦ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَتِ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهٖ فَاَخَّرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ وَقَالَ مَهْلًا يَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ اِيَّاكُنَّ وَنَعِيْقَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهٗ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৬৫৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা যায়নাব মারা গেলে লোকেরা কাঁদল, তখন হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে চাবুক দিয়ে মারতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, ওমর! একটু থাম! এরপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা শয়তানের মতো চিৎকার করা থেকে বিরত থাক। এরপর বললেন, দেখ এ কান্না যতক্ষণ অন্তর থেকে হবে ততক্ষণ তা আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে এবং তা দয়ার প্রকাশ। আর যখন তা হাত ও জবান থেকে হবে তখন তা শয়তানের পক্ষ থেকে । -[আহমদ]

وَعَنْ ١٦٥٧ الْبُخَارِىِّ (رح) تَعْلِيْقًا قَالَ لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلٰى قَبْرِهٖ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ فَسَمِعَتْ صَائِحًا يَقُوْلُ اَلَا هَلْ وَجَدُوْا مَا فَقَدُوْا فَاَجَابَهٗ اٰخَرُ بَلْ يَئِسُوْا فَانْقَلَبُوْا .

১৬৫৭. অনুবাদ : ইমাম বুখারী (র.) থেকে তা'লীক পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে, যখন হযরত হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী মারা গেলেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর কবরের উপর এক বছর যাবৎ তাঁবু খাটিয়ে রাখলেন, এরপর তুলে নিলেন। তখন তিনি শুনতে পেলেন অদৃশ্য থেকে কেউ একজন আওয়াজ দিয়ে বললেন, আরে! তারা যা হারিয়েছে তা ফিরে পেয়েছে? তখন অপর একজন তার উত্তরে বলে উঠল, তারা নিরাশ হয়েছে এবং ফিরে গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য বর্ণনার বাহ্যিক অর্থ এটাই বুঝে আসে যে, এ তাঁবু বানানো হয়েছিল প্রিয়জনেরা বসে যেন কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে এবং নিকটস্থ লোকেরা যেন তাঁর জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া করতে পারে। তবে ইবনে হাজার মক্কী (র.) বলেছেন, তার এ কাজটি অনর্থক একটি মাকরূহ কাজ ছিল যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٦٥٨ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَاَبِىْ بَرْزَةَ (رضـ) قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَنَازَةٍ فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوْا اَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُوْنَ فِىْ قُمُصٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُوْنَ اَوْ بِصَنِيْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُوْنَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُوْنَ فِىْ غَيْرِ صُوَرِكُمْ قَالَ فَاَخَذُوْا اَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُوْدُوْا لِذٰلِكَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৬৫৮. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) ও আবূ বুরযা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে এক জানাজার নামাজে গেলাম। তখন তিনি একটি দলকে দেখতে পেলেন, তারা তাদের চাদরগুলো ফেলে দিয়েছে এবং শুধু জামা পড়ে চলাফেরা করছে। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি জাহিলি যুগের আচরণ গ্রহণ করেছ, নাকি জাহিলি প্রথার অনুরূপ গ্রহণ করেছ? আমি তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তোমাদের জন্যে এমন বদদোয়া করব যাতে তোমরা তোমাদের এ চেহারা থেকে অন্য চেহারায় রূপান্তরিত হও। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে তারা তাদের চাদরগুলো নিল এবং আর কখনো এমন করেনি। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٦٥٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُتَّبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৬৫৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ জানাজার পিছনে চলতে নিষেধ করেছেন যে জানাজার সঙ্গে বিলাপকারিণী মহিলা থাকে। –[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, জানাজার সঙ্গে বিলাপকারিণী থাকলে সে জানাজায় শরিক হওয়া নিষেধ। তদ্রূপ অন্য কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ও যদি হয়, তখনও নিষেধ। তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ের উপরে এ হাদীসটি একটি মূলনীতি যে, এমন কোনো মজলিসেই উপস্থিত হওয়া যাবে না যে মজলিসে গুনাহের কাজ হয়। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٦٦٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ مَاتَ ابْنٌ لِىْ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ شَيْئًا يُطَيِّبُ بِاَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ ﷺ قَالَ صِغَارُهُمْ دَعَامِيْصُ الْجَنَّةِ يَلْقٰى اَحَدُهُمْ اَبَاهُ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلَا يُفَارِقُهُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ)

১৬৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আমার এক ছেলে মারা গেছে, ফলে তার জন্যে আমি মনে খুব দুঃখ পেয়েছি। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন কিছু শুনেছেন যা আমাদের মৃতদের বিষয়ে আমাদেরকে সান্ত্বনা দেবে? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তাদের শিশু সন্তানরা জান্নাতে বিচরণকারী হবে। তাদের কোনো একটি শিশু তাদের পিতার দেখা পেলে তার কাপড়ের আঁচল টেনে ধরবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর আগে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। –[মুসলিম ও আহমদ; কিন্তু শব্দ আহমদেরই।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دَعَامِيْص : শব্দটি বহুবচন, এর একবচন دُعْمُوْص এক ধরনের কালো পোকা যা পুকুর ইত্যাদিতে পানি কমে গেলে দৃষ্টিগোচর হয়। এমনিভাবে دُعْمُوْص বলা হয় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করে অর্থাৎ শিশুরা জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে এবং জান্নাতের ঘরগুলোতে প্রবেশ করে, আর তাদেরকে কেউ বাধা দেয় না। যেমন দুনিয়ার শিশুদেরকে কেউ বাধা দেয় না।

وَعَنْ ١٦٦١ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَاْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ قَالَ اِجْتَمِعْنَ فِىْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِىْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَاَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ اِمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلٰثَةً اِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوِ اثْنَيْنِ فَاَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৬৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কাছে এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! পুরুষেরা আপনার হাদীস হাসিল করে ফেলেছে। তাই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে একটি দিন ঠিক করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে আসব। আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে আমাদেরকে শিখাবেন। তিনি বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক জায়গায় একত্র হও। তারা একত্রিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তাদেরকে শেখালেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে নারীই তার মৃত্যুর আগে তিনটি সন্তানকে পাঠিয়ে দিয়েছে, সে সন্তানরা অবশ্যই তার জন্যে আগুন থেকে বাধাদানকারী হবে। তখন উপস্থিত মহিলাদের একজন বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি দুটি সন্তান পাঠায়? সে একথাটি দুবার বলল, রাসূলে কারীম ﷺ জবাবে বললেন, যদি দুটিও হয়, যদি দুটিও হয়, যদি দুটিও হয়। –[বুখারী]

وَعَنْ ١٦٦٢ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفّٰى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ اِلَّا اَدْخَلَهُمَا اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ اِثْنَانِ قَالَ اَوْ اِثْنَانِ قَالُوْا اَوْ وَاحِدٌ قَالَ اَوْ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ اُمَّهٗ بِسَرَرِهٖ اِلَى الْجَنَّةِ اِذَا احْتَسَبَتْهُ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْ قَوْلِهٖ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ ـ

১৬৬২. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো দুই মুসলমান পিতামাতার তিনটি সন্তান মারা যাবে, তাদের দুজনকে আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি দুটি সন্তান হয়? তিনি বললেন, যদি দুটিও হয়। তারা বলল, যদি একটি হয়? তিনি বললেন, যদি একটিও হয়। এরপর তিনি বলেন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! একটি মৃত প্রসবিত সন্তান অবশ্যই তার নাভিলতা দিয়ে টেনে তার মাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, যদি সে ধৈর্যের সঙ্গে ছওয়াবের আশা রাখে। –[আহমদ; কিন্তু ইবনে মাজাহ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ হতে শেষ পর্যন্ত।]

وَعَنْ ١٦٦٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَدَّمَ ثَلٰثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قَدَّمْتُ اِثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ قَالَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَ وَاحِدًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৬৬৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান আগে পাঠিয়ে দিয়েছে, তারা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যে মজবুত কেল্লা হয়ে যাবে। হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমি দুটি সন্তান পাঠিয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, দুটি পাঠালেও। কারীদের সর্দার আবুল মুনযির উবাই ইবনে কাব (রা.) বললেন, আমি মাত্র একটি সন্তানকে আগে পাঠিয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, একটি পাঠালেও। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ; কিন্তু তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটা গরীব।]

وَعَنْ ١٦٦٤ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَاْتِى النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَتُحِبُّهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَبَّكَ اللّٰهُ كَمَا اُحِبُّهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تُحِبُّ اَنْ لَا تَاْتِىْ بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُ خَاصَّةً اَمْ لِكُلِّنَا قَالَ بَلْ لِكُلِّكُمْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৬৬৪. অনুবাদ : হযরত কুররা মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসত এবং তার সঙ্গে তার একটি ছেলেও আসত। একদিন নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে ভালোবাস? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তেমন ভালোবাসুক যেমন আমি তাকে ভালোবাসি। এরপর একবার নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলেটার কি হলো? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সে মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি পছন্দ কর না যে, তুমি জান্নাতের যে দরজায়ই আসবে সে দরজাতেই দেখতে পাবে সে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। একথা শুনে উপস্থিতদের একজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এটি কি তার জন্যে বিশেষ কিছু নাকি আমাদের সবার জন্যে? রাসূল ﷺ বললেন, না, বরং তোমাদের সবার জন্যে। –[আহমদ]

وَعَنْ ١٦٦٥ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ اِذَا اَدْخَلَ اَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ اَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتّٰى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৬৬৫. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত প্রসবিত সন্তানের মাতাপিতাকে জাহান্নামে দেওয়া হলে সে তার রবের নিকট আবদার করবে। তখন তাকে বলা হবে, হে মৃত প্রসবিত সন্তান যে তার রবের নিকট আবদার করছে! তুমি তোমার মাতাপিতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। ফলে সে তার নাভিলতা দিয়ে তাদের টেনে নিয়ে যাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবে। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلسِّقْطُ : শব্দটি س হরফে যের দিয়ে; سِقْط বলা হয় ঐ সন্তানকে যে ছয়মাস পূর্ণ হওয়ার আগে প্রসবিত হয়ে যায়। তবে এখানে আরেকটু ব্যাপকতা রয়েছে।

يُرَاغِمُ : শব্দের অর্থ হচ্ছে– সে ঝগড়া করে, আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ ঝগড়া হচ্ছে একটি অদৃশ্য ঝগড়া। যেমন অন্য এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَاَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ، فَقَالَ : مَهْ! فَقَالَتْ : هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ . قَالَ : نَعَمْ . اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ؟ فَقَالَتْ : بَلٰى .

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ বিষয়টিকে تَخْيِيْل বা অদৃশ্য কাল্পনিক বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া এ বিষয়টি হওয়া সম্ভব। আর শিশু সন্তানের ঝগড়া করা এবং নাভিলতা দিয়ে টেনে নেওয়ার বিষয়টিকে 'রেহেম' -এর হাদীসের উপর কিয়াস করা যায় না। কেননা 'রেহেম' হচ্ছে একটি অদৃশ্য বিষয় যা ধরাছোঁয়ার বাইরে। –[মেরকাত]

وَعَنْ ١٦٦٦ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِبْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৬৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি বিপদের প্রথম আঘাতে সবর কর এবং ছওয়াবের আশা কর তাহলে আমি তোমার জন্যে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস পছন্দ করব না। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٦٦٧ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَاِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذٰلِكَ اِسْتِرْجَاعًا اِلَّا جَدَّدَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَاَعْطَاهُ مِثْلَ اَجْرِهَا يَوْمَ اُصِيْبَ بِهَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৬৬৭. অনুবাদ : হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে কোনো মুসলমান নর-নারী কোনো বিপদে আক্রান্ত হওয়ার পর যদি সে ঐ বিপদকে স্মরণ করে 'ইন্না লিল্লাহ........' পড়ে, যদিও তা অনেক দিন পড়েও হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নতুন করে আবার ছওয়াব দান করবেন, যে পরিমাণ ছওয়াব বিপদে পড়ার সময় পেয়েছিল। –[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ١٦٦٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَاِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ .

১৬৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও সে যেন 'ইন্না লিল্লাহি.....' পড়ে, কেননা এটিও একটি বিপদ।

وَعَنْ ١٦٦٩ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ يَا عِيْسٰى إِنِّىْ بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِذَا أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوْا اللّٰهَ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ احْتَسَبُوْا وَصَبَرُوْا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ قَالَ أُعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِىْ وَعِلْمِىْ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ ـ

১৬৬৯. অনুবাদ : হযরত উম্মুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুদ দারদা (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম ﷺ -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে ঈসা! আমি তোমার পর এমন একটি জাতি সৃষ্টি করব যাদের কাছে তাদের পছন্দনীয় কিছু পৌঁছলে তারা আল্লাহ তা'আলার হামদ প্রকাশ করবে, আর তারা অপছন্দনীয় কিছুতে আক্রান্ত হলে ছওয়াবের আশা করবে এবং সবর করবে অথচ তাদের সহ্যশক্তি ও বুদ্ধি থাকবে না। হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তাদের পক্ষে এটা কিভাবে সম্ভব হবে, অথচ তাদের সহ্যশক্তি থাকবে না এবং বুদ্ধিও থাকবে না? আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি আমার সহ্যশক্তি ও ইলম থেকে তাদেরকে দান করব। –[হাদীস দুটি বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حِلْم : হচ্ছে এমন একটি উপযুক্ত গুণ যা মানুষকে তাড়াহুড়া করা থেকে বিরত রাখে এবং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাকে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সে ক্ষেত্র মতো অধিষ্ঠিত হয় এবং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে; অহংকার করে না। বালামুসিবতে ধৈর্য ধরে, হা-হুতাশ করে না। আর আকল বা বিবেক তাকে এমন সব কাজ থেকে বিরত রাখে যা তার জন্যে করা উচিত নয়। ফলে বিবেক তাকে কুফরি থেকে বাধা দেয় এবং দয়াময় ও অনুগ্রহকারী আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করে। এ গুণের দ্বারা সে জানতে পারে, সবকিছু আল্লাহ তা'আলার হাতে, আল্লাহ তা'আলা যা চেয়েছেন তাতেই কল্যাণ।

আর যখন তাদের এ ধৈর্য ও বিবেক না থাকা সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করবে, শোকর আদায় করবে, তখন তা আরো আশ্চর্যজনক বিষয় হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে তা হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সরাসরি প্রদত্ত ইলম ও ইলহাম দ্বারা, যাকে পরিভাষায় 'ইলমে লাদুন্নী' বলা হয়। যার ফলে তারা ধৈর্য ও শোকর উভয়ের প্রকাশ ঘটাতে পারে।

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

পরিচ্ছেদ : কবর জিয়ারত

এ পরিচ্ছেদে মূলত কবর জিয়ারতের বৈধতা, এর ফজিলত ও ছওয়াব এবং কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে কি কি নিয়মকানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে সে প্রসঙ্গে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

زِيَارَةٌ শব্দটি زَارَ - يَزُوْرُ বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ হচ্ছে– কারো বাড়িতে যাওয়া তার খবরাখবর নেওয়ার জন্যে বা কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থাৎ সাক্ষাৎ করা।

শরিয়তের পরিভাষায় জিয়ারত বা কবর জিয়ারতের অর্থ হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে গিয়ে তার জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া করা। ওলামায়ে কেরামের মতে, কবর জিয়ারত করা একটি মুস্তাহাব ও উত্তম আমল। কবর জিয়ারতের একটি মৌলিক কায়দা হচ্ছে, এ জিয়ারত জীবিতদেরকে তাদের অত্যাসন্ন মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যার ফলে মানুষ দুনিয়ার মহব্বত সরিয়ে দিয়ে মনের মধ্যে আখিরাতকে স্থান দেয়, সকল কাজকর্মে আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। ফলে জীবনের মধ্যে একটি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٧٠ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَاَمْسِكُوْا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلَّا فِىْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِى الْاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৭০. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা জিয়ারত করতে পার। এরকমভাবে তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানির গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন যতদিন রাখতে চাও তোমরা তা রাখতে পার। আর মশক ব্যতীত অন্য কোনো পাত্রে নবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা সকল পাত্রে তা পান করতে পার। তবে নেশাদার কিছু পান করো না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : কবর জিয়ারত এক সময় নিষেধ ছিল। ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ কবরস্থানে গিয়ে অনেক সীমালঙ্ঘন করত। সেসব কুপ্রথা ও অবৈধ প্রথাসমূহ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম প্রথম কবর জিয়ারতকে নিষেধ করতেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম যখন ইসলামি রীতিনীতি পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ইসলামের বিধানাবলি তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হয়ে যায় তখন তিনি তাদেরকে কবর জিয়ারতের অনুমতি দান করেন। তবে এ পরবর্তী অনুমতিতে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা? এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন, মহিলারাও এ অনুমতির আওতায় এসেছে।

কুরবানির গোশত তিনদিনের বেশি না রাখার বিধানটি ছিল এরকম যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে দরিদ্র মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশি, হিজরতের কারণে ধনীদের হাতও খালি ছিল, এ কারণে রাসূলে কারীম ﷺ সচ্ছল ও সক্ষম ব্যক্তিদেরকে তিনদিনের অতিরিক্ত গোশত নিজের কাছে না রেখে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থার পরিবর্তন ঘটার পর তিনি এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন এ হাদীসের মাধ্যমে।

'নবীয' অর্থাৎ খেজুর ভেজা পানি। গম-চাল ইত্যাদি ভেজানো পানির বিধানাও এরকম। মশক ব্যতীত অন্য কোনো পাত্রে ভেজানোর অনুমতি ছিল না। কারণ অন্যান্য পাত্রে পানি সহজে গরম হয়ে তা নেশাদার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু পরে এ হাদীসের মাধ্যমে এ বিধানেও শিথিলতা করা হয়েছে। −[আ'যমী]

وَعَنْ ١٦٧١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ زَارَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْرَ اُمِّهٖ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهٗ فَقَالَ اِسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ وَاَسْتَاْذَنْتُهٗ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করেছেন। কবরে গিয়ে তিনি নিজেও কেঁদেছেন সঙ্গীদেরকেও কাঁদিয়েছেন। এরপর বললেন, আমি মায়ের জন্যে ক্ষমা চাইতে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুমতি চেয়েছি, আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাঁর কবর জিয়ারত করার অনুমতি চাইলাম তো আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো। অতএব তোমরা কবর জিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَبَكٰى : রাসূল ﷺ তাঁর মায়ের জন্যে কেঁদেছেন, হয়তো মায়ের বিচ্ছেদের কারণে, হয়তো মায়ের কবরের শাস্তির কথা মনে করে, অথবা মায়ের মৃত্যুতে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে কেঁদেছেন। ইবনুল মালিক (র.) বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায়, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদা জায়েজ আছে। কেউ বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর মা কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবর জিয়ারত করে শেখাতে চেয়েছেন যে, উম্মতের উপর মা-বাপ ও নিকটআত্মীয়দের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাসূল ﷺ তাঁর মায়ের জন্যে ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি চাইলেন; তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। কেননা তাঁর মা কাফের অবস্থায় মারা গেছেন। আর কোনো কাফেরকে আল্লাহ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। −[মেরকাত]

আর জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ এতে মা-বাবার অধিকার রক্ষা হয়। পাশাপাশি জিয়ারতের মাধ্যমে মৃত্যু স্মরণে আসে। এতে জীবিত ব্যক্তির ফায়দা রয়েছে।

এ হাদীস এবং আরো অন্যান্য হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মা কাফের থাকা অবস্থায় মারা গেছেন। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের অভিমত এটাই। তবে পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেছেন, নবীজী ﷺ -এর মা-বাপ দুজন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের উপর ছিলেন এবং সে ধর্মের উপরই মারা গেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মা-বাবাকে জীবিত করে দিয়েছেন, ফলে তাঁরা ঈমান গ্রহণ করে পুনরায় মারা গেছেন। তবে আলোচ্য হাদীসের সাথে এগুলোর কোনোটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করাই ভালো। −[আ'যমী]

وَعَنْ ١٦٧٢ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৭২. অনুবাদ : হযরত আবূ বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম যখন কবরের দিকে যাওয়ার জন্যে বের হতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এ দোয়া শিখাতেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ الخ "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মৃত্যুপুরীর মু'মিন ও মুসলমানরা। আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে শরিক হচ্ছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।" –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে বোঝা যায় মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি জীবিতকে সালাম দেওয়ার মতোই অর্থাৎ নামের আগে দোয়া উল্লেখ করা। এটাই হচ্ছে শরিয়তের বিধান। আর জাহিলি যুগে তারা দোয়ার আগে নাম উল্লেখ করত।

أَهْلَ الدِّيَارِ : এর মাঝে নসব হয়েছে نِدَاءٌ -এর ভিত্তিতে। অর্থাৎ مُنَادٰى مُضَافٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (র.) বলেন, اِخْتِصَاص -এর ভিত্তিতে নসব হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে এর আগের যমীর থেকে بَدَل হওয়া হিসেবে মাজরূরও হতে পারে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কবরের জায়গাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ دَارٌ বা বাড়ি বলেছেন। কেননা মৃত ব্যক্তিরা সেখানে জমায়েত হয়েছে, যেমনিভাবে জীবিতরা কোনো ঘরে একত্র হয়।

এ হাদীসে কবর জিয়ারতের একটি নিয়ম এবং সালামের একটি প্রকার রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া আরো অন্যান্য হাদীসেও আরো দোয়া ও সালামের উল্লেখ এসেছে। এগুলোর যে কোনোটিই পড়া যায়। সবগুলোই পালন করা যায়। এগুলোর পরস্পরে কোনো বৈপরীত্য নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٧٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

১৬৭৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ মদিনার কিছু কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেলেন, তখন তিনি তাদের দিকে চেহারা ফিরিয়ে বললেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ "সালাম তোমাদের প্রতি হে কবরবাসীরা! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী দল, আর আমরা তোমাদের পেছনে আসছি।" –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٦٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৭৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে যে রাতে রাসূল ﷺ তার কাছে থাকার পালা আসত সেসব রাতে রাসূলে কারীম ﷺ রাতের শেষভাগে জান্নাতুল বাকীর দিকে বের হয়ে যেতেন এবং গিয়ে বলতেন- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ . "হে মু'মিন দলের বাসস্থানের অধিবাসীরা! তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের সঙ্গে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা তোমরা কিয়ামদের দিন পাবে। আর ইনাশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। হে আল্লাহ! বাকী'য়ে গারকাদের অধিবাসীদেরকে ক্ষমা করে দাও।" -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَقِيْعٌ : মদিনার একটি কবরস্থানের নাম। 'নেহায়' গ্রন্থে রয়েছে بَقِيْعٌ হচ্ছে প্রত্যেক প্রশস্ত জায়গা। আর কোনো জায়গাকে তখনই بَقِيْعٌ বলা হয়, যখন সেখানে গাছ অথবা গাছের গোড়া থাকে। আর اَلْغَرْقَدُ একপ্রকারের গাছের নাম যা সেখানে ছিল। এখন সে নাম রয়ে গেছে, কিন্তু সে গাছ নেই।

١٦٧٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ كَيْفَ اَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَعْنِىْ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ قَالَ قُوْلِىْ اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৭৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি কি বলব? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কবর জিয়ারতের সময় রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, তুমি বল- اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ . "মু'মিন ও মুসলমানদের বাসস্থানের অধিবাসীদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইয়ের প্রতি দয়া করুন। আর আমরা শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।" -[মুসলিম]

وَعَنْ ١٦٧٦ مُحَمَّدِ ابْنِ النُّعْمنِ (رحـ) يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَه وَكُتِبَ بَرًّا ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا)

১৬৭৬. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে নু'মান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি জুমাবারে তার মা-বাবা অথবা তাদের যে কোনো একজনের কবর জিয়ারত করবে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং পিতামাতার বাধ্য সন্তান হিসেবে তার নাম লেখা হবে।

[বায়হাকী (র.) হাদীসটি তাঁর শো'আবুল ঈমান গ্রন্থে মুরসাল হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ١٦٧٧ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৬৭৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত কর। কেননা করব জিয়ারত দুনিয়াবিমুখতা সৃষ্টি করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। -[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٦٧٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَالَ قَدْ رَاٰى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ هٰذَا كَانَ قَبْلَ اَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِىْ رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّمَا كَرِهَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ تَمَّ كَلَامُهُ ـ

১৬৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর জিয়ারতকারিণী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।

তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। তিনি আরো বলেছেন, কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম মনে করেন, নবী করীম ﷺ যে কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন তার আগের এ হাদীস। এরপর যখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন তখন এর মাঝে নারী-পুরুষ সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেউ বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ মহিলাদের কবর জিয়ারতকে অপছন্দ করার কারণ হচ্ছে, তাদের ধৈর্যের স্বল্পতা এবং হা-হুতাশ বেশি করা।

-[তিরমিযীর কথা শেষ।]

وَعَنْ ١٦٧٩ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَدْخُلُ بَيْتِىَ الَّذِىْ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنِّىْ وَاضِعٌ ثَوْبِىْ وَاَقُوْلُ اِنَّمَا هُوَ زَوْجِىْ وَاَبِىْ فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللّٰهِ مَا دَخَلْتُهُ اِلَّا وَاَنَا مَشْدُوْدَةٌ عَلَىَّ ثِيَابِىْ حَيَاءً مِنْ عُمَرَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৬৭৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ রয়েছেন অর্থাৎ কবরে আমি সে ঘরে প্রবেশ করতাম এবং নির্দ্বিধায় কাপড় খুলে রাখতাম। আমি ভাবতাম, এতো আমার স্বামী আর আমার পিতা। এরপর যখন তাদের সঙ্গে ওমরকে দাফন করা হলো, তখন থেকে আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি কখনো গায়ে চাদর না মুড়িয়ে সেখানে প্রবেশ করিনি। আর তা করেছি ওমরের প্রতি আমার লজ্জার কারণে। −[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত আয়েশা (রা.) মসজিদে নববীর পাশের যে ঘরে থাকতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর নবীগণ যেখানে ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাদেরকে দাফন করা হয়। সে হিসেবে হযরত আয়েশা (রা.) -এর ঘরেই নবী কারীম ﷺ -কে দাফন করা হয়েছে। পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -কেও সেখানে দাফন করা হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) সেখানে প্রবেশ করলে সতর ঢেকে রাখার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। কারণ পিতা ও স্বামীর ক্ষেত্রে সতরের বিশেষ কোনো বাড়াবাড়ি নেই। কিন্তু পরবর্তীতে যখন হযরত ওমর (রা.) -কে তাঁদের সঙ্গে দাফন করা হয়েছে তখন থেকে হযরত আয়েশা (রা.) সে ঘরে গিয়ে সতর খোলার ব্যাপারে আগের মতো শিথিলতা করতেন না।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, যদি কোনো ব্যক্তিকে জীবিত থাকা অবস্থায় সম্মান করা হয়, তাহলে তার প্রতি মৃত্যুর পরও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। −[মেরকাত।

كِتَابُ الزَّكٰوةِ
অধ্যায় : জাকাত

زَكٰوةٌ [জাকাত]-এর আভিধানিক অর্থ :

اَلزَّكٰوةُ (بِفَتْحِ الزَّاءِ) শব্দটি اَلْجِنْس বা জাতিগত দিক থেকে زَكٰى মূল হতে নির্গত زَكْو অথবা এ শব্দটি نَاقِصْ وَاوِىْ অথবা نَاقِصْ يَائِىْ ; অভিধানবেত্তাগণ এর অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ—

১. اَلتَّطْهِيْرُ বা পবিত্রকরণ। যেমন, কুরআনে এসেছে– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

২. اَلزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ বৃদ্ধি বা ক্রমবৃদ্ধি অর্থে। যেমন বলা হয়– زَكَى الزَّرْعُ اِذَا نَمَا وَ زَادَ [এ প্রসঙ্গে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ]

৩. اَلْمَدْحُ বা প্রশংসা করা অর্থে। যথা– زَكّٰى نَفْسَهٗ اِذَا مَدَحَهَا

৪. اَلْبَرَكَةُ বা প্রাচুর্য অর্থে। যেমন– زَكَتِ الْبُقْعَةُ اِذَا بُوْرِكَ فِيْهَا

৫. اَلثَّنَاءُ الْجَمِيْلُ উত্তম গুণকীর্তন অর্থে। যেমন– زَكَّى الشَّاهِدَ اِذَا اَثْنٰى عَلَيْهِ

৬. اَلصَّلَاحُ বা পরিশুদ্ধ অর্থে। যথা– هٰذَا الْاَمْرُ لَا يَزْكُوْ لِفُلَانٍ اَىْ لَا يَصْلُحُ لَهٗ

বস্তুত জাকাত শব্দটি স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর কয়েকটি মাত্র উল্লিখিত হয়েছে। (تَنْظِيْمُ الْاَشْتَاتِ)

زَكٰوةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের বিধানানুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মধ্য হতে নির্দিষ্টাংশ জাকাত পাবার যোগ্যদের মধ্যে বিতরণ করা। তবে এতে কোনো বিনিময় বা লাভালাভের আশা করা হতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও দূরে রাখা। اَلدُّرُّ الْمُخْتَارُ গ্রন্থকারের মতে–

تَمْلِيْكُ جُزْءِ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى .

অর্থাৎ শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট সম্পদ হাশেমী ও তাদের মাওলা ব্যতীত গরিব অনাথ মুসলমানকে স্বত্বাধিকারী করা। কোনো উপকারের আশা করা ব্যতীত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে।

ইমাম নববী (র.) বলেন, ধন-সম্পদ হতে একটি নির্দিষ্ট অংশ বের করাকে জাকাত বলে। আর যে সম্পদ হতে জাকাত বের করা হয় তা জাকাত আদায়ের কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে বরকত হয় এবং তা বিপদাপদ হতেও রক্ষা পায়।

ইসলামে জাকাতের স্থান : ইসলামি জীবন বিধানে জাকাত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। অর্থনৈতিক ইবাদতের মধ্যে এটি অন্যতম। এই বিধানটি ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি বা রুকন। ঈমান ও নামাজর পরই এর স্থান। যেমন কুরআনে এসেছে– وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে শরিয়তসম্মত জাকাতকে সদকাও বলা হয়েছে। যেমন সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে রয়েছে যে–

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهِ الخ

আর উক্ত সূরার ১০৩ নং আয়াতে আছে যে- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

অর্থাৎ আপনি তাদের মাল হতে জাকাত গ্রহণ করুন যা দ্বারা তাদেরকে পাক ও পবিত্র করবেন।

সূরা আন'আমের ১৪১ নং আয়াতে এসেছে যে, وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ তথা আল্লাহর হক আদায় কর শস্য কাটার সময়। আর এই সম্পর্কীয় অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা অত্র পর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, শরিয়তে জাকাতের ফরজিয়্যাতের একটি অকাট্য বিষয়। এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হবে।

জাকাত কখন ফরজ হয় : জাকাত কখন ফরজ হয় এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা যায় যা নিম্নরূপ-

১. ইবনে খুযাইমা (র.) বলেন, জাকাত হিজরতের পূর্বে ফরজ হয়েছে।

দলিল : তিনি উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন, যাতে তার হাবশায় হিজরত সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অত্র হাদীসে জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা.) নাজ্জাশীকে বলেছিলেন- "اَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ" আর হাবশায় হিজরত মদীনায় হিজরতের পূর্বে হয়েছিল।

২. জমহুর মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ বলেন, জাকাত হিজরতের পরে ফরজ হয়েছে।

দলিল :

সকলে ঐকমত্য যে, صَوْمِ رَمَضَانَ-এর পরে জাকাত ফরজ হয়েছে। আর صَوْمِ رَمَضَانَ হিজরতের পর ফরজ হয়েছে।

যে আয়াতের মাধ্যমে জাকাত ফরজ হয়েছে, সে আয়াত হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে।

তবে হিজরতের পর কোন সালে জাকাত ফরজ হয়েছিল তা নিয়েও মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ মতানৈক্য করেছেন। যেমন-

১. কেউ কেউ বলেন, প্রথম হিজরিতে জাকাত ফরজ হয়েছে।

২. আবার কেউ বেউ বলেন, দ্বিতীয় হিজরিতে রোজা ফরজ হবার পূর্বে ফরজ হয়েছে। ইমাম নববী (র.) এ মতের সমর্থন করেছেন।

৩. আল্লামা ইবনুল আসীর (র.) বলেন, নবম হিজরিতে জাকাত ফরজ হয়েছে। যেমন- হযরত ثَعْلَبَةَ بْنُ حَاطِبٍ-এর ঘটনায় এসেছে যে, لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَامِلًا الخ

তবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম দ্বিতীয় মতের উপর একমত হয়েছেন তথা দ্বিতীয় হিজরিতে মদীনায় জাকাত ফরজ হয়। আর হিজরতের পূর্বাপর নিয়ে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে এর সমাধানে ইবনে কাছীর সূরা মুয্যাম্মিলের وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, জাকাত মক্কায় ফরজ হয় কিন্তু এর পরিমাণ (مِقْدَارُ) মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও জাকাত ফরজ ছিল : পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জানা যায় যে, পূর্বকালের প্রত্যেক নবীর উম্মতের উপর সমানভাবে নামাজ, জাকাত ইত্যাদি আদায় করার কঠোর নির্দেশ ছিল। হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর বংশের পরবর্তী নবীদের কথা আলোচনা করার পর বলা হয়েছে- "আমি তাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়েছি। তারা আমার বিধান অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করে, পথ-প্রদর্শন করে। আমি ওহীর সাহায্যে তাদেরকে ভাল কাজ করার, নামাজ কায়েম করার এবং জাকাত আদায় করার আদেশ করেছি। ফলে তাঁরা খাঁটিভাবে আমার ইবাদত করতো। আদেশ পালন করতো।"—[সূরা আম্বিয়া- ৭৩]

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا -

হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর পরিবারস্থ লোকদেরকে নামাজ ও জাকাত আদায় করার আদেশ করতেন। -[মরিয়ম- ৫৫]

হযরত মূসা (আ.) তাঁর নিজের ইহ ও পরকালের কল্যাণ চেয়ে দোয়া করলে জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাকে ইচ্ছা তাকে আমার আজাবে নিক্ষেপ করব। যদিও আমার অনুগ্রহ সকল জিনিসের উপরই পরিব্যাপ্ত রয়েছে। কিন্তু তা (সেই অনুগ্রহ) কেবলমাত্র সেই লোকদের জন্যেই নির্দিষ্ট করব, যারা আমাকে ভয় করবে এবং জাকাত আদায় করবে। আর যারা আমার কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত বনী ইসরাঈল জাতির অন্তর ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্যে প্রাণ দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করত না। বর্তমানকালের ইহুদিরাই এর বাস্তব উদাহরণ। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা এই মহান সম্মানিত নবীর

প্রার্থনার জবাবে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, "তোমার উম্মত যথারীতি জাকাত আদায় করলে, আমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে। অন্যথায় আমার শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে এবং এরপরও হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে এই সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তাদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করবে না এবং রীতিমতো নামাজ ও জাকাত আদায় করবে। —[বাকারা, রুকূ' : ১০]

হযরত নবী করীম ﷺ -এর পূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-কেও একই সঙ্গে নামাজ ও জাকাত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন, আমি যেখানেই থাকি না কেন? এবং যতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন নামাজ পড়া ও জাকাত আদায় করার জন্যে আমাকে নির্দেশ করেছেন। —[মরিয়ম– ৩১]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ এবং অন্যান্য বহু আয়াত হতে জানা যায় যে, প্রত্যেক নবীর যুগে দীন ইসলাম নামাজ ও জাকাত এ দু'টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিল। এক আল্লাহকে বিশ্বাসী কোনো জাতিকেই এ দু'টি কাজ হতে কখনও নিষ্কৃতি দেওয়া হয়নি।

জাকাত না দেওয়ার পরিণাম : জাকাত না দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ الخ -

যারা সোনা, রুপা জমা সঞ্চয় করে রাখে, অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না। আপনি তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন ঐ সম্পদগুলোকে দোজখের আগুনে গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পাঁজরে-পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে দাগ দেওয়া হবে এবং বলা হবে এখন এর স্বাদ গ্রহণ কর, যা তোমরা [দুনিয়াতে] জমা করেছিলে। —[তাওবা : ৩৪-৩৫]

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কিছু সম্পদ দান করেছেন, আর তারা তা নিয়ে কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে মঙ্গল, বরং এটা তাদের পক্ষে অমঙ্গল। অচিরেই কিয়ামতের দিন তাই তাদের ঘাড়ে শিকলের ন্যায় পরিয়ে দেওয়া হবে, যার ব্যাপারে তারা কৃপণতা করেছে।

উল্লিখিত আয়াত দুটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, জাকাত না দেওয়ার পরিণাম কতই ভয়াবহ।

জাকাত অস্বীকার করা কুফরি : জাকাত ফরজ হওয়ার মূল বিধান ও নির্দেশ স্পষ্টভাবে কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। যদিও জাকাতের হার তথা আদায়ের পদ্ধতি হাদীসের মাধ্যমে এসেছে। যেমন– কুরআনের ভাষায় নামাজ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ পাওয়া গেলেও এর ওয়াক্ত, রাকআতের বিবরণ হাদীসের দ্বারাই বিবৃত হয়েছে। মোটকথা, জাকাত ফরজ হওয়ার বিধান 'ওহীয়ে মাত্‌লু' এবং হার-পরিমাণের বিধান নির্ধারণ 'ওহীয়ে গাইরে মাত্‌লু'। সুতরাং জাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদ ও কাফের।

নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের পর ইয়ামামার বনু হানীফাসহ কিছু গোত্রের লোক জাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল; তখন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাদের বিরুদ্ধে অনুরূপভাবে যুদ্ধ করেছেন যেমনি যুদ্ধ করতে হয় কাফেরদের সাথে। অথচ তারা নামাজ পড়ত, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাদের ঈমানও আছে বলে দাবি করত। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের কোনো একটি ভিত্তি অস্বীকারকারী কাফের। তার বিরুদ্ধে লড়াই করা আবশ্যক।

জাকাতের খাতসমূহ : مَصَارِفُ الزَّكٰوةِ বা জাকাতের খাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ - ٦٠)

অত্র আয়াতে জাকাতের খাত মোট আটটি বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. اَلْفُقَرَاۤءُ : এটি فَقِيْرٌ শব্দের বহুবচন। হানাফী ইমামদের মতে, ফকির সে ব্যক্তি যার নিকট জাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। অর্থাৎ যৎসামান্য সম্পদ রয়েছে। আর اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ-এর মতে ফকির এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার ব্যক্তিগত ভরণপোষণের মতো সামান্য পরিমাণ সম্পদও নেই।

২. اَلْمَسَاكِيْنُ : হানাফীদের মতে, যার সামান্য পরিমাণ সম্পদও নেই। এমনকি বাড়িঘরও নেই– সেই মিসকিন। আর اَئِمَّةٌ ثَلَاثَةٌ -এর মতে, এমন ব্যক্তিকে মিসকিন বলে যার স্বল্প পরিমাণ সম্পদ আছে; কিন্তু তাতে তার ও তার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

৩. اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا **বা জাকাত আদায়কারী ব্যক্তিবর্গ :** ইমাম রাষ্ট্রের কর্মচারি। অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থ বিভাগের জাকাত আদায়কারী কর্মচারীগণও জাকাতের অর্থের হকদার।

৪. اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ : তথা ইসলামের প্রতি কারো অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্যে কাউকে জাকাতের অর্থ দান করা যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কাউকে জাকাতের সম্পদ দেওয়া যায়, যাকে দিলে তার মন ইসলাম গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে অথবা নও মুসলিম যাকে দিলে তার মন ইসলামের প্রতি দৃঢ় থাকবে অথবা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় কোনো অমুসলিম নেতাকে ইসলামের প্রতি মিতালী ও ঐ এলাকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যে তাকে জাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে।

৫. وَفِى الرِّقَابِ : তথা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের মুক্ত করে দেওয়ার জন্যে তাদেরকে মুক্তিপণ হিসেবে জাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

৬. وَالْغَارِمِيْنَ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত। স্বীয় সঞ্চিত অর্থের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ঋণ করে তার পরিবার পরিচালনা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করলে এবং সে ঋণ পরিশোধে অক্ষম গরিব ঋণগ্রস্তকে জাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে।

৭. وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহর পথে তথা জিহাদ পরিচালনা বা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকামী মুজাহিদদের জিহাদ ও আন্দোলন পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্যে জাকাতের সম্পদ ব্যয় করা যাবে।

৮. وَابْنِ السَّبِيْلِ : এর শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ হলো– পথের সন্তান। মূলত এর ভাবার্থ হলো মুসাফির অবস্থায় থাকাকালীন যার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। চলার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাকে জাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

যেসব খাতে জাকাত ব্যয় করা যাবে না :

১. ধনী স্বচ্ছল তথা অর্থসম্পদশালী লোক।

২. কর্মক্ষম, উপার্জনশীল ও শক্তিসম্পন্ন মানুষ।

৩. খোদাদ্রোহী, নাস্তিক, ইসলামের সাথে শত্রুতাপোষণকারী কিংবা প্রতিবন্ধকতাকারী। সর্বসম্মত মতে এদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। জমহুরে ফকীহদের মতে জিম্মিরাও জাকাত পেতে পারে না।

৪. জাকাতদাতার সন্তান, পিতামাতা এবং তার স্ত্রী এরাও পাবে না। আর অন্যান্য নিকট আত্মীয়গণ পাবে যদিও এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

৫. অনুরূপভাবে নবী করীম ﷺ -এর পরিবার ও বংশধরগণ। বনী হাশেম ও বনু মুত্তালিবের লোকদের ব্যাপারেও ইমামদের মতভেদ আছে। এমনকি বনূ হাশেমের মাওলাগণও জাকাত পাবে না।

যে যে মালে জাকাত দিতে হয় : টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, জমিনে উৎপাদিত ফসল, মাটির নিচে প্রাপ্ত গুপ্তধন, খনিজ দ্রব্য, ব্যাংকে সঞ্চিত টাকা ও শেয়ার বণ্ড ইত্যাদিসহ এক কথায় মুসলমানদের প্রায় সকল মালেই জাকাত ফরজ হয়। নিম্নে সেগুলোর মোটামুটি একটা হিসাব ও পরিমাণ দেওয়া হলো–

১. **গবাদি পশু :** ছাগল, ভেড়া, উট ঘোড়া যদি মালিকের শ্রম ব্যতিরেকে চারণভূমিতে বছরের অধিক সময় বিচরণ করে প্রতিপালত হয়। অর্থাৎ নিজের ঘাস-পানি নিজেই সংগ্রহ করে, যেমন– চরাঞ্চলে এরূপ দেখা যায় এবং গৃহস্থালী কাজের অতিরিক্ত, যা বিক্রির জন্যে অথবা দুধ কিংবা বংশ, বৃদ্ধির জন্যে রাখা হয়, এমন পশুর জাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

২. **ভূমির উৎপাদন :** ধান, গম, যব, খেজুর, আঙ্গুর প্রভৃতি শস্য ও ফল-মূল ইত্যাদি যা সেচ ব্যতীত, বৃষ্টি বা নদীর প্রবাহিত পানিতে উৎপন্ন হয়, এতে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের একভাগ জাকাত দেওয়া ফরজ। ফসল কম হোক কিংবা বেশি হোক তাতে কোনো প্রশ্ন নেই। 'এক-দশমাংশ' হারে দিতে হবে। শরিয়তের ভাষায় একে 'উশর' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, যদি এ সমস্ত ফসল সেচের পানি দ্বারা উৎপাদন করা হয়, তখন এর 'বিশ ভাগের এক ভাগ' জাকাত দিতে হবে।

৩. **সোনা রুপার জাকাত :** 'স্বর্ণ' বিশ মিসকাল বা সাড়ে সাত তোলা হলে এবং রৌপ্য দুইশত দিরহাম বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা হলে, এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হয়। অনুরূপভাবে পণ্য-দ্রব্যেরও চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হয়।

৪. **জমিনে গচ্ছিত গুপ্তধন :** একে শরিয়তের পরিভাষায় বলা হয় كَنْزٌ 'কানয' আর খনিজ ধাতব দ্রব্য, যেমন– সোনা, রুপা, তামা ইত্যাদিকে বলা হয়– مَعَادِنٌ 'মা'আদিন'। আর উভয় দ্রব্য দু'টিকে একত্রে বলা হয় 'রেকায'। কোনো কোনো অবস্থায় কান্‌যেও এক-পঞ্চমাংশ জাকাত দিতে হয়। শরিয়তের এই পঞ্চমাংশ জাকাতকেও 'খুম্‌স' বলা হয়।

৫. যেসব জিনিসে তৈজসপত্র ব্যবহার হারাম, তা স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতব দ্রব্য দ্বারা তৈরি করা হলে, তাতে এবং স্বর্ণে রৌপ্যে নির্মিত উপঢৌকনাদিতে ওজনে কিংবা মূল্যের নিসাব পরিমাণ হলে তাতে জাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

৬. **ব্যবসায়ী মাল :** ব্যবসায়ে নিয়োজিত সম্পদ, পণ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কাপড়, খাদ্য, অলঙ্কারাদি, মূল্যবান পাথর, পশু, গাছ-পালা, জমি, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাবর-অস্থাবর সম্পদে নিসাব পরিমাণ হলে এবং বৎসর পূর্ণ হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে।

৭. স্বাধীন শ্রম ও পেশাভিত্তিক উপার্জিত, অর্জিত সম্পদের উপর জাকাত দিতে হবে, তবে এর জন্যে 'বৎসর' অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়; বরং মাল পাওয়ার সাথে সাথেই জাকাত দিতে হবে।

৮. শেয়ার বণ্ড, সিকিউরিটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি। অর্থের মূল্যমান বহন করে তাতেও জাকাত দিতে হবে।

জাকাত ও করের মধ্যে পার্থক্য :

১. **ধর্মীয় দিক :** জাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। এটা একটি আর্থিক ইবাদত। এ কারণেই এটা ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের উপর ফরজ করা হয়নি এবং এ কারণেই জাকাতদাতা কারও বিনা তলবে স্বেচ্ছায় আপন মালের গোপন হতে গোপনতর তহবিলেরও জাকাত আদায় করে থাকে। পক্ষান্তরে কর আদায়ের ব্যাপারে করদাতা নানারূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে; অথচ এতে তার ঈমানের কোনোরূপ ক্ষতি হবে বলে মনে করে না। অপরদিকে জাকাত আদায় না করলে তার ঈমানের ক্ষতি হবে বলে সে মনে করে।

২. **সুবিধা ভোগ :** করদাতা করের সুবিধা ভোগ করে। কর দ্বারা দেশরক্ষা, উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক কাজ করা হয় আর করদাতা এর সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু জাকাতদাতা জাকাতের কোনো সুবিধা ভোগ করে না। এর সুবিধা ভোগ করে জাকাত গ্রহীতা।

৩. **হার স্থিতিশীল :** জাকাতের মধ্যে করের সমস্ত উত্তম গুণ বিদ্যমান, কিন্তু জাকাতের হার পরিবর্তনশীল নয়। তা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। এ নির্দিষ্টতার কারণে সরকারকে মিতব্যয়ী হতে এবং জনসাধারণের প্রতি আর্থিক জুলুম হতে বিরত থাকতে বাধ্য করে।

পক্ষান্তরে, করের হার পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের অধিকার সরকারকে অমিতব্যয়ী করে তোলে এবং জনসাধারণের প্রতি আর্থিক জুলুম করতে সহায়তা করে।

৪. **প্রয়োগ ক্ষেত্র :** কর ধার্য করা হয় মালের আয়ের উপর; কিন্তু জাকাত ধার্য করা হয় মূল মালের উপর। জাকাত আয় ও মূলধনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। ব্যবসায়ের মওজুদ মালে, উৎপাদনশীল অলস মালে অথবা তা দ্বারা তৈরি গহনায়ও জাকাত ফরজ হয়।

৫. **ব্যয়ের ক্ষেত্র :** রাষ্ট্রের সাধারণ প্রয়োজনসমূহ পূরণার্থে করের অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে। সে খাতসমূহ সরকারই নির্ধারণ করে থাকে। পক্ষান্তরে জাকাতের ব্যয়ের ক্ষেত্র স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট। আর মহানবী ﷺ জাকাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন।

৬. **রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক :** 'কর' আদায়ের ব্যাপারটি সম্পদের মালিক ও প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপার। ফলে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ স্বয়ং কর আরোপ করে উসূল করে এবং সর্বোপরি করের হার নির্ধারণ করে। এমনকি ইচ্ছা মাফিক বাড়াতে, কমাতে কিংবা মওকূফ করতে পারে। আর এমতাবস্থায় মালিক কর আদায় না করলে দুনিয়া বা আখিরাতে কোনো স্থানেই অপরাধী সাব্যস্ত হবে না।

কিন্তু জাকাতের অবস্থা ভিন্নতর। এর হার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। রদ-বদল করার অধিকার কারো নেই। সরকারি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জাকাত উসুল না করলেও মালের মালিকের ঈমানী দায়িত্ব যে, এর হকদারকে জাকাত পৌঁছিয়ে দেওয়া। এরূপ করা তার উপর ফরজ।

৭. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক :** জাকাতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। আর কর ব্যবস্থায় এরূপ কল্পনা করা যায় না। জাকাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা, অপর দিকে করের লক্ষ্য রাষ্ট্রের কোষাগারের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা।

জাকাত ও করের সাদৃশ্য : জাকাত ও করের কতিপয় বৈপরীত্ব থাকলেও উভয়ের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্য ও অভিন্নতার কতিপয় দিক নিম্নে প্রদত্ত হলো–

ক. **বাধ্যকরণ :** বাধ্যকরণ ও জোরপূর্বক আদায় করা– যা না হলে সাধারণত কর আদায় হয় না। এ ব্যবস্থা জাকাতেও রয়েছে। এ ব্যবস্থা তার জন্যে যে ঈমানের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাকাত আদায় না করে। জাকাত দিতে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করেও তা আদায় করার বিধান ইসলামে রয়েছে।

খ. জমা দেওয়ার ভাণ্ডার : কর সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের তহবিলে অর্পণ করা হয়। জাকাতও সরকারের তহবিলেই দেওয়া হয়, তবে তা দিতে হয় কুরআন মাজীদ ঘোষিত জাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের মাধ্যমে।

গ. সরাসরি বিনিময় না পাওয়া : যার উপর কর ধার্য করা হয় সে সমাজের সদস্য হিসেবেই কর প্রদান করে, সে করের বিভিন্ন ব্যবহার ও তৎপরতার দরুন পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়। করের বিনিময়ে সুনির্দিষ্ট কিছু পায় না। অনুরূপভাবে জাকাত দানের মোকাবেলায়ও দাতা কোনো বিশেষ ফায়দা পাওয়ার লক্ষ্যে জাকাত দেয় না। যেহেতু সে মুসলিম সমাজের অংশ, যার সাহায্য-সমর্থন, দায়িত্ব গ্রহণ ও ভ্রাতৃত্বের সুফল সে কামনা করে।

ঘ. সুদূর প্রসারী লক্ষ্য : আধুনিক প্রবণতায় করের সামষ্টিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুনির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য রয়েছে। তা নিছক আর্থিক লক্ষ্যেরও অনেক ঊর্ধ্বে।

অনুরূপভাবে, জাকাতেরও একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে যা দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। এর শেকড় খুব গভীরে নিহিত। উপরোল্লিখিত দিক ব্যতীতও ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে এর প্রভাবও অত্যন্ত প্রকট ও সক্রিয়।

জাকাত প্রদানকারীর জীবনে জাকাতের প্রভাব : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন– "তাদের মাল-সম্পদ হতে তুমি 'জাকাত' আদায় কর, ফলে তুমি এটা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে"। অবশ্য এ 'পবিত্রকরণ ও পরিশুদ্ধকরণ', বস্তুগত ও আত্মিক উভয় প্রকারে হতে পারে। যেমন– ধনী ব্যক্তির আত্মা, মনমানসিকতা এবং এর সাথে তার যাবতীয় সমুদয় মাল-সম্পদ পূর্ণাঙ্গভাবে পরিব্যাপ্ত। জাকাত প্রদানে জাকাতদাতার জীবনে কোন্ কোন্ বিভাগে কি কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. জাকাত মানুষকে লোভ থেকে মুক্ত রাখে : কোনো মুসলমান আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে জাকাত প্রদান করে, তা তাকে গুনাহের মলিনতা হতে বিশেষভাবে লোভ ও কার্পণ্যের হীনতা ও জড়তা হতে পবিত্র রাখে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, লোভ-লালসা ও কার্পণ্য এ বস্তু দু'টি মানুষের অন্তরাত্মাকে খুব বেশি আক্রান্ত করে রাখে। মূলত আত্মতৃপ্তি, ধন-লিপ্সা ও ঐশ্বর্যের প্রেরণা ইত্যাদি– মানুষের স্বভাবগত ধর্ম। আর সে স্বভাব ও প্রকৃতগত ভাবধারা লোভ ও কার্পণ্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। ফলে অন্যদের তুলনায় নিজেকে অধিক সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রেরণা মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে। বস্তুত এই লোভ ও কার্পণ্যের অশুভ পরিণাম ব্যক্তির জন্য যেমন, সমষ্টির জন্যও তেমন ক্ষতিকারক। আর এটা অনস্বীকার্য যে, জাকাত প্রদানের এই শাশ্বত বিধান মানুষকে এই সমস্ত সহজাতব্যাধি হতে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে।

২. জাকাত মানুষকে দানে ও ব্যয়ে অভ্যস্ত করে : মনোবিজ্ঞানীদের মতে– মানুষের অভ্যাসের একটা গভীর প্রভাব ও সম্পর্ক তার চরিত্র ও আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয়। তাই বলা হয়, অভ্যাসের একটা শক্তি ও আধিপত্য আছে, মানুষের জন্মগত প্রথম প্রকৃতির অনুরূপ দৃঢ় বটে। আর অভ্যাস হলো দ্বিতীয় পদ্ধতি। 'জাকাত প্রদান' এ অভ্যাসকে সুমার্জিত করে। ফলে জাকাতদান মানুষকে– অর্থদান, বৈধ পথে সাধারণ ব্যয় এবং ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হতে মানুষকে সাহায্য করে।

যে ঈমানদার-মুসলমান সাধারণভাবে দান-সদ্কায় অর্থ-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করে, ফসল ঘরে তোলার সাথে সাথেই উশর আদায় করে, বৎসর পূর্তির সাথে সাথে অর্জিত আয়ের, ব্যবসায়ী পণ্যের, গবাদি পশুর, ঈদের নামাজের পূর্বে ফেতরা তথা সর্বসময় জাকাত আদায় করে, এমন মুসলমান দান ও অর্থ ব্যয়ের একটা মৌলিক গুণের অধিকারী হতে পারে। তার চরিত্রের গভীরে এই অভ্যাসটির শিকড় গেড়ে যায়। ফলে সে ইহ ও পরকালে– দানশীল তথা মহান লোকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৩. আল্লাহর চরিত্রে ভূষিত হয় : আল্লাহ তা'আলার অসীম গুণাবলির অন্যতম হচ্ছে কল্যাণ, রহমত, অনুগ্রহ ও দয়াবর্ষণ। যার মধ্যে এ গুণগুলো থাকে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। এসব গুণ অর্জনের উদ্দেশ্যে মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা চালিয়ে আল্লাহর চরিত্রে ভূষিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। আর এটাই হচ্ছে মানুষের উন্নতি ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তর। মানুষ যদি কার্পণ্য ও লোভের ঊর্ধ্বে উঠে দান, ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত হতে পারে, তাহলে সে মানবীয় লোভের পঙ্কিলতা হতে ঊর্ধ্বে উঠতে পারে এবং আল্লাহর প্রদত্ত উচ্চতর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিতে ভূষিত হতে পারে।

৪. জাকাত আল্লাহর নিয়ামতের শোকর : নিয়ামতের শোকর ও দাতার কৃতজ্ঞতা একান্তই অপরিহার্য; মানুষের বিবেক এ জন্যে তাড়না করে, প্রকৃতি এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, নৈতিকতা এর দাবি করে এবং সকল ধর্ম ও আইন ব্যবস্থা সে জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দান করে।

জাকাত দাতার মন-মানসিকতায় আল্লাহর শোকরের ভাবধারা জাগিয়ে তোলে। প্রতিটি নিয়ামতের বিনিময়ে মানুষের জাকাত দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সেই নিয়ামত বস্তুগত হোক কি তাৎপর্যগত। এ কারণে মুসলিম সমাজে এ কথা

ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত– তুমি তোমার সুস্থতার জাকাত দাও, তোমার দৃষ্টিশক্তির জাকাত দাও, তোমার ইলমের জাকাত দাও এবং তোমার সন্তানদের সৌভাগ্যের জাকাত দাও! এমনিভাবে একটি নির্মল ভাবধারা মুসলিম মানসে জেগে উঠে। হাদীসেও বলা হয়েছে– 'প্রত্যেকটি জিনিসেরই জাকাত দিতে হয়।'

৫. **দুনিয়াপ্রীতির চিকিৎসা :** মুসলমানের মন দুনিয়াপ্রীতি ও ধন-মালের জন্যে পাগলপারা হওয়া একটি ঘাতক ব্যাধি। আর এ ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে জাকাত প্রদান। এ কারণে শরিয়তের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হিসেবে ধন-মালের মালিককে তার মালের কিছু অংশ তার হাত হতে বের করে দানশীল রূপে আখ্যায়িত হবার ব্যবস্থা করে দেওয়া একান্তই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছে। এই কিছু পরিমাণ মাল কাউকে দিয়ে দেওয়া ধন-মালের প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ মালিকের মনে রয়েছে তা চূর্ণ করে দিতে পারে। মনকে ধন-মালের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, জাকাত ফরজ করা হয়েছে অন্তর হতে দুনিয়া ও ধন-মালের প্রতি চরম আসক্তির সুনির্দিষ্ট ও সঠিক চিকিৎসা বিধানের লক্ষ্যে।

৬. **জাকাত ধনীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে :** "জাকাত তাযকিয়া করে" এ কথার তাৎপর্য হলো– ধনী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি ও তার অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ সাধন। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণের হাত প্রসারিত করে, দীন ও মানবতার খাতিরে নিজের সম্পদ নিয়োজিত করে এবং এভাবে তার উপর আল্লাহর আরোপিত অধিকার যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়, সে তার নিজের মধ্যে একটা প্রশান্তি, সম্প্রসারতা, উদারতা ও বিপুলতা অনুভব করতে আরম্ভ করবে, যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সুখ অনুভব করবে। সে কার্যতই তার দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠবে, নিজের কু-প্রভাব হতে মুক্ত হবে এবং তার প্রবৃত্তির লোভ-লালসা শয়তানকে দমন করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করবে। এটাই মানসিক বিকাশ, উৎকর্ষ ও আত্মিক ঐশ্বর্য লাভ।

৭. **জাকাত ভালবাসা উদ্ভাবক :** জাকাত প্রদানে ধনী ব্যক্তি এবং তার সমাজ সমষ্টির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা ও সূক্ষ্ম সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কটি হয় খুবই দৃঢ় ও মজবুত। ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতাই এর মূল সূত্র। কেননা, মানুষ যখন অন্য কারো সম্পর্কে জানতে পারে যে, তার কল্যাণে সে আগ্রহ রাখে তার যাতে ভাল হয় সে চেষ্টাই সে করে, তার জন্যে যা ক্ষতিকর তা সে দূর করতে চায়; তাহলে সে তাকে স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসবে। তার প্রতি তার মন-মানস অনিবার্যভাবেই আকৃষ্ট হবে। ফকির মিসকিনরাও যখন জানবে যে, এ ধনী ব্যক্তি তার ধন-মালের একটা অংশ তাদেরকে দিবে। তার ধন-মাল বেশি হলে তাদের জন্যে তার ব্যয়ের পরিমাণও অবশ্য বেশি হবে। তখন তারা এ ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তার সাহস বৃদ্ধি করবে। আর জনগণের এ মনোভাবের একটা প্রভাব অবশ্যই আছে। হৃদয়গুলোর উত্তাপ তাকে অধিক উৎসাহিত করবে। সেসব দোয়া ও আন্তরিক শুভেচ্ছা সেই ব্যক্তির কল্যাণকর ও মহানুভবতার কাজে নিমগ্ন থাকার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৮. **জাকাত ধন-মালের পবিত্রতা বিধান করে :** জাকাত যেমন হৃদয়ের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধিতা বিধান করে, তেমনি তা ধনীর ধন-মালের পবিত্রতা সাধন করে, তার প্রবৃদ্ধি ঘটায়। পবিত্রকরণের প্রক্রিয়া হলো– মালের মধ্যে অপরের মাল মিলে মিশে থাকলে তা কলুষিত হয়। সে অপরের মাল তা হতে বের করে না দেওয়া পর্যন্ত তা পবিত্র হতে পারে না। এ কারণে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– "তুমি যখন তোমার মালের জাকাত দিয়ে দিলে, তখন তুমি তা হতে [তোমার পক্ষে] খারাপটা দূর করে দিলে।" অর্থাৎ গরিব-মিসকিনের যে ভাগটা তোমার মালের সাথে ছিল তা সরিয়ে দিয়ে নিজের মালকে পবিত্র করলে।

৯. **'জাকাত' হারাম মালকে পবিত্র করে না :** যে মাল মালিকের কাছে শরিয়তসম্মত উপায়ে পৌঁছে তাই হালাল মাল। আর যা অপহরণ, ছিনতাই, ঘুষ, সুদ ও জুয়া ইত্যাদি যে কোনো অবৈধ উপায়ে পৌঁছে তা হারাম মাল। জাকাত কোনো হারাম মালকে পবিত্র করতে পারে না। যেমন– কয়লা যতবারই ধোয়া হোক না কেন কখনো পরিষ্কার হবে না এবং তা হতে কখনো পরিষ্কার পানি বের হয়ে আসবে না। ফতোয়ার কিতাবে বির্ণত আছে– হারাম মাল দান-সদ্‌কা করে ছওয়াব লাভের আশা রাখে এমন ব্যক্তি কাফের হওয়ার আশংকা থাকে।

১০. **'জাকাত' মূলধনে বৃদ্ধি করে :** জাকাত ধন-মালে প্রবৃদ্ধি ঘটায়। এতে মালে বরকত সৃষ্টি হয়। জাকাত দ্বারা প্রকাশ্যত হ্রাস হতে দেখলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে বৃদ্ধি ঘটে। যেমন আল্লাহর কালামে বর্ণিত হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা সুদকে ধ্বংস করে এবং সদকাকে বৃদ্ধি করে। আর এই প্রবৃদ্ধি কিভাবে ঘটতে থাকে তা মালিকও অনুভব করতে পারে না।

অর্থনীতির আলোকে বুঝা যায় ধনীর হাতের তুলনায় গরিবের হাতে টাকা পয়সা অধিক সচল হয়ে উঠে। কেননা গরিবের মন সর্বদা একটি টাকা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে। ফলে টাকা হাতে আসার পর সে অধিকতর গতিশীল, কর্মতৎপর হয়ে উঠে এবং অবশ্যম্ভাবী পরণতি হিসেবে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের মাধ্যমে এই গতিশীল অর্থই আবার দাতার হাতে প্রাপ্ত হয়ে

ফিরে আসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সেই গরিব উক্ত টাকা দ্বারা বাজার থেকে যা কিছু খরিদ করবে, এর বিক্রেতাও সেই সদ্‌কা বা জাকাতদাতা ব্যক্তিই। ফলে তার প্রদানকৃত টাকা আবার তার কাছে ফিরে আসল, অবশেষে সে উক্ত টাকা দ্বারা আরেকটি পণ্য খরিদ করে দোকানে তুলতে সক্ষম হলো। এভাবে তার মূলধন বৃদ্ধি হতে থাকে।

অর্থনীতিতে জাকাত ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত : জাকাত ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি মাত্র অংশ এবং ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো ইসলামি জীবন ব্যবস্থারই একটি অংশ। সুতরাং গোটা ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে– কমপক্ষে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার সাথে সাথে জাকাত ব্যবস্থা কার্যকরী করা হলে তা যথাস্থানে এমনভাবে সুবিন্যস্ত হবে যাতে কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক থাকবে না। ইসলামি সরকারের আয়ের খাতগুলো প্রথমোক্ত তিনটি খাতের বিপুল অর্থ শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করা হলে মুসলিম রাষ্ট্রে গরিব দরিদ্রের নাম-নিশানাও থাকতে পারে না। উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.)-এর আমলে জাকাত গ্রহণ করার মতো গরিব খুঁজে পাওয়া যেত না। দুঃখের বিষয়, অতঃপর কোনো সরকারই শরিয়তের এই নির্দেশের অনুসরণ করেননি। ফলে পরবর্তীকালে দুনিয়া ইসলামের অর্থনৈতিক আদর্শ হতে বঞ্চিত হয়েছে। সর্বস্তরে অনৈসলামিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনৈসলামিক ব্যবস্থা চালু রেখে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাকাত ব্যবস্থা চালু করলে অবশ্যই তা পর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হবে।

জাকাতের মর্মকথা : জাকাতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কি এবং ইসলাম এর এতবেশি গুরুত্ব দেয় কেন? তা নিম্নোক্ত আলোচনা হতে কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে–

সমাজে যারা বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত, তারা যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে সাধারণত তাদেরকে খুব ভাল করে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেয় এবং যাদেরকে সৎ, নির্ভরযোগ্য, নিষ্ঠাবান ও আস্থাভাজন বলে মনে করে, কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আর অন্যান্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান এবং সর্বাভিজ্ঞ। তিনি যাকে তাকে নিজের বন্ধু বানাবেন, নিজের দলভুক্ত করে নিবেন এবং নিজ দরবারে সম্মান ও নৈকট্যের মর্যাদা দান করবেন অথচ তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিবেন না, তা কখনও হতে পারে না। সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় তাঁর খলীফা বানাতে ও আখিরাতে নৈকট্য দান করতে ইচ্ছা করেন তাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেন। যে কষ্টিপাথরে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করেন তার পাঁচটি ধাপ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত মানুষের জ্ঞানের পরীক্ষা : কারণ বুদ্ধিমান হওয়া ব্যতীত মহাজ্ঞানীর বন্ধু হওয়া সম্ভবপর নয়। মহান আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল দেখে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে কিনা? তাঁর অস্তিত্বের নিশানা দেখে বুঝতে পারে কিনা যে, তিনিই একমাত্র মালিক ও সৃষ্টিকর্তা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তিনিই প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং তিনিই সাহায্যকারী। মহামহীম আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাব দেখেই তাকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত কিতাব বলে বুঝতে পারে এবং তাঁর নবীকেও সঠিক নবী বলে চিনতে পারে। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এরূপ বিচক্ষণ লোককে লক্ষ কোটি মানুষের মধ্য হতে বাছাই করে নিজ দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে গণ্য করেন।

দ্বিতীয়ত মানুষের চরিত্রের পরীক্ষা : প্রথম পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদেরকেই দ্বিতীয় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এ পর্যায়ে যাচাই করা হয় যে, সত্য এবং পুণ্য কাজের পরিচয় লাভ করে তা গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা এবং অন্যায় ও পাপ কাজের পরিচয় লাভ করার পর তা পরিত্যাগ করার যোগ্যতা ও শক্তি তার আছে কিনা? এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কেবল তারাই আল্লাহ তা'আলার দলভুক্ত হতে পারে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন– "খোদাদ্রোহী তাগূতকে যারা সাহসের সাথে পরিত্যাগ করে এবং নির্ভীকভাবে কেবল খোদার দেওয়া বিধান অনুসারেই জীবন যাপন করে, তারা একটি মজবুত রজ্জু দৃঢ়তার সাথে ধারণ করেছে যা কখনও ছিঁড়বে না।"

তৃতীয়ত আনুগত্যের পরীক্ষা : দ্বিতীয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে তৃতীয় পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। এটা আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ ও আনুগত্যের পরীক্ষা, এ পর্যায়ে নিজের কাজ-কর্ম, স্বার্থ, মনঃপুত কাজ ও আনন্দ স্ফুর্তি ত্যাগ করে অনুকূল ও প্রতিকূল সকল অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ যথাযথভাবে পালন করা। গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক বা শীত হোক, সকল সময়ই ডাক শোনা মাত্র হাজির হওয়া। মহান প্রভুর নির্দেশে রমজান মাসে সুবহে সাদেক হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও সম্ভোগ ত্যাগ করা। এ পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয় তাদের সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে ধারণা করা হয় যে, তাদের দ্বারা আল্লাহর কোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। আর যারা কৃতকার্য হয় কেবল তাদেরকেই নির্বাচন করা হয়।

চতুর্থত ত্যাগের পরীক্ষা : তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গও আল্লাহর কর্মচারী রূপে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হতে পারেনি। কেননা তাদের হৃদয়, হীন, বীর্যহীন এবং নীচ কিনা এবং বন্ধুর খাতিরে নিজের অর্থ সম্পদ খরচ করতে প্রস্তুত কিনা? তার পরীক্ষা নেওয়ার এখনও বাকি রয়েছে। যেহেতু স্বার্থপর, অর্থপূজারী, সংকীর্ণমনা ব্যক্তিকে কোনো বুদ্ধিমান নিজের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং এ চতুর্থ পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হয় তারা কোনো মতেই আল্লাহর দলে স্থান পেতে পারে না। এ দলে কেবল তাদেরকেই শামিল করা যেতে পারে যারা আল্লাহর ভালবাসায় জীবন-প্রাণ, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি, বংশ, পরিবার সবকিছুর ভালবাসাকে অকুণ্ঠচিত্তে উৎসর্গ করতে পারে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "তোমরা নিজ নিজ প্রিয় জিনিসগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুণ্য ও মহত্ত্বের উচ্চতম মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।"—[আলে ইমরান : ৯২]

"মনের সংকীর্ণতা ও কৃপণতাকে যারা অতিক্রম করতে পেরেছে কেবল তারাই সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করতে পেরেছে।"
—[আত তাগাবুন : ১৬]

এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। ধনী হয়ে সুখের মধ্যে ডুবে থেকেও যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায় না। আল্লাহর দলে এ ধরনের ধীর প্রকৃতির লোকদেরই প্রয়োজন, যারা বড় বড় প্রাসাদে ভোগ-বিলাস, সুখ ও সম্ভোগের ভেতর থেকেও আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ আর সন্তান যেন তোমাদেরকে কখনও আল্লাহর জিকির হতে বিরত না রাখে। এ সবের জন্যে যারা আল্লাহকে ভুলে যাবে তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" —[আল-মুনাফিকূন– ৯]

"জেনে রেখ, তোমাদের অবস্থা এতদূর খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহর রাহে কিছু খরচ করতে বললে তোমরা সেজন্যে মোটেও প্রস্তুত হও না; বরং তোমাদের অনেকেই তখন কৃপণতা করতে থাক। অথচ যে ব্যক্তি এসব কাজে কৃপণতা করে, সে কৃপণতায় তার নিজেরই ক্ষতি হয়। মূলত আল্লাহ তা'আলা একমাত্র ধনশীল আর তোমরা সকলেই দরিদ্র– তাঁরই মুখাপেক্ষী, প্রভুর রাহে যদি তোমরা আদৌ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত না হও, তবে এ অপরাধের অনিবার্য ফল স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থানে ভিন্ন এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা নিশ্চয় তোমাদের মতো [কৃপণ] হবে না। —[মুহাম্মাদ : ৩৮]

মোটকথা, জাকাত ইসলামের একটি প্রধান স্তম্ভ এবং এটাই তার মূলকথা। একে প্রচলিত সরকারি ট্যাক্সের মতো মনে করা মারাত্মক ভুল। কারণ, আসলে এটা ইসলামের প্রাণ, ইসলামের জীবনী শক্তি। জাকাত ফরজ করার মূলে ঈমানের পরীক্ষা করাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। মানুষ ক্রমাগত পরীক্ষা দিয়ে যেমন উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং সর্বশেষ পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী লাভ করে, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও মানুষের ঈমান যাচাই করার জন্যে কতগুলো পরীক্ষা নির্দিষ্ট করে দেন; প্রত্যেক মানুষকেই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। একজন মানুষ যখন এরূপ পরীক্ষা দিয়ে চতুর্থ পরীক্ষা– অর্থাৎ ধন-সম্পদ দানের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে তখনই সে খাঁটি মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে চতুর্থ পরীক্ষার পরও জীবন উৎসর্গের একটি পরীক্ষা রয়েছে। এটা অত্র পর্বের আলোচ্য বিষয় নয় বিধায় উল্লেখ করা হচ্ছে না। মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় তার মধ্য হতে জাকাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এই জিনিসটির অভাবেই মানুষ নৈতিক ও আর্থিক অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে যায়। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দুনিয়ার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই অর্থনৈতিক বিধানটি যথাযথভাবে সম্পাদন করা।

জাকাতের ব্যাপারে ইসলামি সরকারের দায়িত্ব : সমস্ত মুসলমানের ঐকমত্য যে, জাকাত একটি ইসলামি বিধান। ইসলামে এর স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সরকারকে জাকাতের ব্যাপারে ইসলামি বিধান ভিত্তিক বিশেষ দায়িত্বশীল ও কর্মতৎপর হতে হবে। সর্বত্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অপরিহার্য যা আল্লাহর বিধান মোতাবেক জাকাত সংগ্রহ করবে এবং শরিয়ত নির্দেশিত পথে ব্যয়-বণ্টন করবে। আর এই খাতে সংগৃহীত সম্পদ স্বতন্ত্র মর্যাদায় রাখতে হবে। অন্যান্য খাতের সাথে একে একত্র করা যাবে না। এতে জাকাতের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হবে। কাজেই এর জন্যে স্বাতন্ত্র্য মন্ত্রণালয় থাকা অপরিহার্য।

শরিয়তের ফকীহগণ ও অর্থনীতির সাংগঠনিক পারদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটা স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করতে হবে। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কর ও ফরজ জাকাতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করবে এবং উভয়বিদের সংমিশ্রণ ও অরাজকতা প্রতিরোধ করবে। অবস্থা যেন এমন না হতে পারে যে, দীনদার মুসলমানরা তো এককভাবে জাকাতের দায়িত্ব আদায় করতে থাকবে। আর দীনি দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত নয়, এমন সব মুসলমানগণ জাকাত প্রদানের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। তাই ইসলামি রাষ্ট্রের জন্যে এটা একান্ত পালনীয় ফরজ, গোটা মুসলিম জাতিরও এটা কর্তব্য যে, এ ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতা করা। আর সরকার তার প্রতিনিধি সভা বা সংসদের মাধ্যমে জাকাত আদায়কারী ও বিলি-বন্টনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

জাকাত আদায়ে সরকারের উদাসীনতা দেখলে তখন লোকদের দায়িত্ব : সরকার যদি জাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের দায়িত্ব পালন না করে, কিংবা সরকার যদি ইসলামি বিধান অনুসরণ না করে চলে তথা জাকাত আদায় ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর না করে, কিংবা সরকার যদি ধর্ম নিরপেক্ষবাদী বা ইসলামবিমুখ হয়, জাকাত আদায় না করে নিজের খেয়ালখুশি মতে রাজস্ব কর ধার্যকরণের উপরই নির্ভরশীল হয়, তখন একজন ঈমানদার মুসলমানের কর্তব্য আল্লাহর বিধান মোতাবেক তা যথাস্থানে ব্যয় করা। অমুসলিম শাসক জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে 'কর' হিসেবে যা নিয়ে যায় তা দ্বারা জাকাত আদায় হবে না। সুতরাং একজন মুসলমানের কর্তব্য হবে আল্লাহর বিধান মোতাবেক জাকাত আদায় করে দেওয়া এবং শরিয়তের বর্ণিত খাতসমূহে তা ব্যয় করা। যদি স্বাভাবিকভাবে নিজের সমাজে জাকাত ব্যয় করার মতো কোনো গরিব-মিসকিন বা অন্য কোনো 'খাত' না পাওয়া যায় তখন দূরে অন্য কোনো স্থানে প্রদান করবে যেখানে এর 'খাত' পাওয়া যায়। অন্যথা ইসলাম প্রচার, ইসলামি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামি আন্দোলনে সাহায্য করা ইত্যাদি খাতে ব্যয় করবে। যদি নিজ দেশে এসব কোনো খাতে ব্যয় করা সম্ভবপর না হয় তখন অন্য এমন কোনো দেশে পাঠিয়ে দিবে যেখানে এর যথার্থ খাতে ব্যয় করা সম্ভব হয়।

ইসলামি সরকারের মুখ্য আয়-ব্যয়ের খাত : ইসলামি সরকারের আয়ের খাত শুধু জাকাতই নয়। এর আয়ের খাত প্রধানত চারটি। সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো–

ক. খুমুসের খাত : খুমুস অর্থ এক-পঞ্চমাংশ। এখানে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ মালের খুমুস ($\frac{১}{৫}$), জমিনে প্রাপ্ত গুপ্তধনের খুমুস, খনিজ দ্রব্যের খুমুস এবং শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পত্তি জমা হবে।

ব্যয়ের খাতসমূহ : ১. আল্লাহর রাসূল ﷺ ২. রাসূল ﷺ -এর আত্মীয়বর্গ, ৩. এতিম, ৪. নিঃসম্বল ব্যক্তি ও ৫. মুসাফির। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পর তাঁর ও তাঁর আত্মীয়বর্গের খাত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এ খাতের আয় হতে রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিককেও দেওয়া যেতে পারে।

খ. জাকাতের খাত : এটাই ইসলামি সরকারের আয়ের প্রধান খাত। এ খাতে মুসলমানের যাবতীয় সম্পদের জাকাত ও ফসলের ওশর জমা হবে।

গ. খিরাজের খাত : এ খাতে রাষ্ট্রের অমুসলমান নাগরিকদের নিকট হতে খিরাজ বা ভূমি রাজস্ব, জিযিয়া [দেশ রক্ষা কর] ও বাণিজ্য শুল্ক জমা হবে। এটা ব্যয়ের খাত হলো, দেশ রক্ষা, শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা, জনকল্যাণমূলক কাজ এবং অমুসলমান দরিদ্র।

ঘ. ওয়ারিশবিহীন সম্পত্তি : এ খাতে রাষ্ট্রের সীমানাধীন যাবতীয় লা-ওয়ারিশ সম্পত্তি জমা হবে। এগুলো ব্যয় হবে– লা-ওয়ারিশ সন্তান, পঙ্গু ব্যক্তির সাহায্য-সহযোগিতা এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে।

ঙ. অতিরিক্ত করের খাত : অপব্যয় পরিহার করা সত্ত্বেও যদি উপরিউক্ত খাতসমূহ হতে সরকারের ব্যয় সংকুলান না হয়, তাহলে সরকারের পক্ষে আবশ্যক অনুযায়ী কর ধার্য করার বিধান ইসলামি শরিয়তে রয়েছে। –[শামী]

শেষকথা : 'জাকাত' ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও উৎস। আর ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো ইসলামি জীবন ব্যবস্থারই অংশ। অতএব, গোটা ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে, অন্তত ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে কার্যকরী করার সাথে সাথে 'জাকাত' ব্যবস্থা কার্যকরী করা হলে এর কার্যকারিতাসহ যাবতীয় সুফল স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। কিন্তু গোটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনৈসলামিক ব্যবস্থা চালু রেখে এর সাথে জাকাত ব্যবস্থা চালু করতে গেলে তখন এটা খাপ ছাড়া দেখা যাবেই।

জাকাত ব্যবস্থা যেহেতু ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই একটি বিশেষ অংশ, তাই এখানে আমরা জাকাত সম্পর্কে মোটামুটি কিছু আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

আল্লাহপ্রদত্ত অর্থ ব্যবস্থার একটা অংশ হলো জাকাত। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থা সমাজে চালু হলে এবং এ জাকাত ব্যবস্থা যথাযথ প্রয়োগ করা হলে– মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে কখনও সংঘর্ষ বা ব্যতিক্রম অবস্থা দেখা দিতে পারে না। এই সুন্দর ও শাশ্বত ব্যবস্থাকে পরিহার করার ফলেই আজ দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট। বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত উন্নত জাতিসমূহ যদি একবার কুরআন ও হাদীসের দেওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা-গবেষণা করত, তবে অবশ্যই দেখতে পেত যে, আর কোনো ইজম বা কোনো ব্যবস্থাই ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার মতো এমন সুন্দর ব্যবস্থা দিতে পারেনি। তবে ইসলামের অর্থ ব্যবস্থার রূপরেখা এখানে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয় বলে আমরা শুধু 'জাকাত' ব্যবস্থার উপরেই কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি। আশা করি, পাঠকবৃন্দ এই আলোচনার আলোকে ইসলামের জাকাত ব্যবস্থার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং সে অনুযায়ী ইসলামি জীবন বিধান পালনে অগ্রগামী হবেন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٦٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৮০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে [শাসনকর্তা নিযুক্ত করে] পাঠালেন, তখন বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ, তুমি তাদেরকে [প্রথমে] এ কথার সাক্ষ্য দিতে আহবান করবে যে "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল"। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা এক দিন ও রাত্রে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। তারা যদি এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবহিত করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন। তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদেরকে ফেরত [বণ্টন করে] দেওয়া হবে। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয়, তবে সাবধান! তুমি তাদের ভাল ভাল মালামাল হতে বেঁচে থাকবে [অর্থাৎ ভাল ভাল মাল বেছে বেছে জাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে না] এবং মজলুম তথা নিপীড়িতের অভিশাপ হতে বেঁচে থাকবে কেননা তাদের বদদোয়া ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যখানে কোনো পর্দা নেই [তথা তা দ্রুত কবুল হয়]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাকাতের আভিধানিক অর্থ : اَلزَّكٰوةُ শব্দটি بِفَتْحِ الزَّاءِ এটি "زَكْو" অথবা "زَكَى" মূলবর্ণ হতে নির্গত। জিনসে نَاقِصْ وَاوِىْ অথবা نَاقِصْ يَائِىْ আভিধানবেত্তাগণ زَكَاةٌ-এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন–

১. اَلتَّطْهِيْرُ বা পবিত্র করা। যেমন, কুরআনের বাণী– "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا" أَىْ طَهَّرَهَا مِنَ الْأَدْنَاسِ

২. اَلزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ বা বৃদ্ধি অর্থে। যেমন, বলা হয়– زَكَى الزَّرْعُ : اِذَا نَمَا وَزَادَ

৩. اَلْمَدْحُ বা প্রশংসা অর্থে। যেমন– زَكَّتْ نَفْسَهٗ اِذَا مَدَحَهَا

৪. اَلْبَرَكَةُ বা প্রাচুর্য অর্থে। যেমন– زَكَى الْبُقْعَةُ اِذَا بُوْرِكَ فِيْهَا

৫. اَلثَّنَاءُ الْجَمِيْلُ চমৎকার গুণকীর্তন অর্থে। যেমন– زَكَى الشَّاهِدُ إِذَا أَثْنٰى عَلَيْهِ

৬. اَلصَّلَاحُ বা পরিশুদ্ধ অর্থে। যেমন– هٰذَا الْاَمْرُ لَا يُزَكِّىْ لِفُلَانٍ اَىْ لَا يَصْلُحُ لَهٗ

৭. আল্লামা عَيْنِىْ বলেন– اَلزَّكٰوةُ اِسْمُ التَّزْكِيَةِ

৮. আবুল আলী বলেন– اَلزَّكٰوةُ صَفْوَةُ الشَّيْءِ

জাকাতের পারিভাষিক অর্থ :

১. اَلدُّرُّ الْمُخْتَارُ গ্রন্থের লেখক বলেন–

اَلزَّكٰوةُ هُوَ تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ فَقِيْرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনা স্বার্থে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে প্রদান করাই জাকাত।

২. আল্লামা আইনী (র.) বলেন– اَلزَّكٰوةُ هُوَ اِيْتَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ اِلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ

৩. কারো মতে, هِيَ تَمْلِيْكُ جُزْءٍ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيْرٍ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمُمَلِّكِ

৪. ইবনে কুদামা (র.) বলেন– هِيَ حَقٌّ يَجِبُ فِى الْمَالِ

৫. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– اَلزَّكَاةُ الْعَطَاءُ جُزْءٌ مِنَ النِّصَابِ الْحَوْلِيِّ اِلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مُطَّلِبِيٍّ

৬. اَلْمُغْنِىْ গ্রন্থকার বলেন– اَلزَّكَاةُ هِيَ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ يَجِبُ فِى الْمَالِ

مَتٰى فُرِضَتِ الزَّكٰوةُ জাকাত কখন ফরজ হয় : জাকাত কখন এবং কোথায় ফরজ হয়েছে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইবনে খুযাইমাসহ একদল মুহাদ্দিস বলেন, হিজরতের পূর্বে মক্কাতে ফরজ হয়েছে। তিনি حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ দ্বারা দলিল দিয়েছেন, যাতে তার হাবশায় হিজরত সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এ হাদীসে হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) নাজ্জাশীকে লক্ষ্য করে বলেছেন– "وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّيَامِ" আর একথা সকলের নিকট পরিষ্কার যে, هِجْرَتُ اِلَى الْحَبْشَةِ মদীনায় হিজরতের আগে হয়েছে।

২. জমহুরে মুহাদ্দিসীন বলেন, জাকাত হিজরতের পরে মদীনায় ফরজ হয়েছে। তাঁদের দলিল হচ্ছে নিম্নরূপ–

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةُ فَنَزَلَتْ فَرِضِيَّةُ الزَّكٰوةِ ـ

সকলের ঐকমত্যে রোজা দ্বিতীয় হিজরিতে মদীনায় ফরজ হয়েছে। যেহেতু জাকাত রোজার পরে ফরজ হয়েছে সেহেতু তা হিজরতের পরে মদীনাতেই ফরজ হয়েছে।

এদের মধ্যে আবার মতানৈক্য রয়েছে যে, কত হিজরিতে ফরজ হয়েছে।

ক. কেউ কেউ বলেন, প্রথম হিজরিতে।

খ. ইমাম নববী (র.) বলেন, দ্বিতীয় হিজরিতে।

গ. ইবনুল আছীর (র.) বলেন, নবম হিজরিতে।

ঘ. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন– نَزَلَتْ فَرِضِيَّةُ الزَّكٰوةِ بِمَكَّةَ اِجْمَالًا وَفِى الْمَدِيْنَةِ تَفْصِيْلًا

উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উত্তর :

ক. হযরত জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) যখন হাবশায় হিজরত করেন তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রমজানের রোজা ফরজ ছিল না। সুতরাং বলা যায় যে, জা'ফর তাইয়্যার (রা.) যে নামাজ রোজা ও জাকাতের কথা নাজ্জাশীর কাছে উল্লেখ করেছেন তা হিজরতের অনেক দিন পরে।

খ. অথবা, হাদীসে উল্লিখিত নামাজ, রোজা ও জাকাত দ্বারা নির্ধারিত ফরজ নামাজ, রোজা ও জাকাত উদ্দেশ্য নয়।

রাসূল ﷺ মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে কখন পাঠিয়েছেন? মহানবী ﷺ মু'আয (রা.)-কে কখন ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন এ ব্যাপারে ওলামা ও ঐতিহাসিকদের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. فَتْحُ الْمُلْهِمِ গ্রন্থকার বলেন, অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের বছর রাসূল ﷺ মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন।

২. اَلْاِكْلِيْلُ গ্রন্থকার বলেন, মহানবী ﷺ তাবুক অভিযান হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরিতে হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠান।

৩. اَلطَّبَقَاتُ গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবম হিজরির রবিউল উখরা মাসে হযরত মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানো হয়েছিল।

৪. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, দশম হিজরিতে বিদায় হজের পূর্বে মহানবী ﷺ তাঁকে ইয়েমেনে পাঠান।
৫. ইবনে সা'দ (র.) বলেন, দশম হিজরিতে রবিউস সানীতে মহানবী ﷺ মুয়াযকে ইয়েমেনে পাঠান।
৬. ওয়াকেদী (র.) বলেন, তাবুক যুদ্ধ হতে ফেরার পর নবম হিজরিতে প্রেরণ করেন। যেমন–

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِى السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ بَعْدَ رُجُوْعِهِ مِنْ تَبُوْكَ -

তাঁকে শাসনকর্তা হিসেবে পাঠিয়েছেন নাকি বিচারক হিসেবে?
১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, وَالِىْ বা শাসনকর্তা হিসেবে পাঠানো হয়েছে।
২. ইবনু আব্দুল বার বলেন, তাকে قَاضِىْ বা বিচারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।
মূলকথা হলো তাঁকে উভয় পদের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কেননা বর্তমানের ন্যায় সে সময় দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পদ ছিল না।

রোজা ও হজকে উল্লেখ না করার কারণ : রোজা ও হজ ইসলামের অন্যতম দু'টি রুকন হওয়া সত্ত্বেও তা উল্লেখ হয়নি; অথচ এ দু'টি বিধান হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়ামনে প্রেরণের পূর্বেই ফরজ হয়েছিল। এ দুটি বিষয়ের উল্লেখ না করার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যথা–

১. شَيْخُ الْهِنْدِ বলেন, যেখানে اَرْكَانْ বর্ণনা উদ্দেশ্য হয় সেখানে সমস্ত আরকান উল্লেখ করা হয়। যেমন– "بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ" আর যেখানে دَعْوَتْ উদ্দেশ্য হয় সেখানে اِعْتِقَادِىْ হিসেবে كَلِمَهْ ও بَدَنِىْ হিসেবে নামাজ, مَالِىْ হিসেবে জাকাত উল্লেখ করা হয়। যেমন– فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ এ জন্যে এখানে صَوْم ও حَجّ-এর উল্লেখ করা হয়নি।
২. ইবনুস্ সালাহ (র.) বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর মূল ফরমানে এ দু'টি বিষয়েরই উল্লেখ ছিল; কিন্তু হাদীস বর্ণনাকারী সংক্ষেপকরণের উদ্দেশ্যে এ দু'টি বিষয়কে বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।
৩. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেছেন, মূল হাদীসে রোজা ও হজের উল্লেখ না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, শরিয়তে নামাজ ও জাকাতের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বিধায় এখানে এ দু'টিই উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদেরও বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় যে, নামাজ ও জাকাতের কথা একসঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে রোজা ও হজের উল্লেখ নেই, যদিও এ দু'টিও ইসলামের রোকনের মধ্যে শামিল।
৪. অথবা صَوْم ও حَجّ-এর তুলনায় সালাত ও জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এ দু'টি উল্লেখ করা হয়নি।
৫. عَلَّامَه عُثْمَانِىْ বলেন, এখানে تَبْلِيْغِ اِسْلَامْ-এর পদ্ধতি শেখানো উদ্দেশ্য। এ জন্য উদাহরণ স্বরূপ তিনটি উল্লেখ করেছেন।
৬. অথবা যেহেতু শাহাদাত, সালাত এবং জাকাতের বিধান কাফেরদের জন্যে সর্বাধিক কঠিন, তাই এ তিনটিকে উল্লেখ করে صَوْم ও حَجّ-কে বাদ দিয়েছেন।
৭. অথবা দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের মধ্যে যে দু'টি বেশি কষ্টকর ও গুরুত্বপূর্ণ তাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

কাফেররা শরিয়তের শাখা-বিধানের জন্যে সম্বোধিত কিনা : এটা একটি বিতর্কিত বিষয় যে কাফেররা দুনিয়াতে ইসলামি শরিয়তের শাখা-বিধানসমূহের জন্যে সম্বোধিত কিনা? এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। ফিক্‌হ বিজ্ঞানের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে যে, হানাফী ও শাফেয়ী ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, কাফেররা দুনিয়াতে মৌলিক জাতীয় বিষয় যেমন– ঈমান ও প্রতিফল [যেমন– শাস্তি ও কেসাস ইত্যাদি]-এর জন্যে সম্বোধিত। অর্থাৎ ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে, হত্যা করলে কেসাস নেওয়া হবে।
কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার কোনো ইবাদত না করার জন্য পাকড়াও করা হবে কিনা এ ব্যাপারে হানাফী আলেমগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন–
ক. একদল মাশায়েখ বলেন– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি শাখা-বিধানসমূহের উপর বিশ্বাস ও এটা আদায় করা সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তাদের মতে, কেবলমাত্র মৌলিক বিধান তথা ঈমান গ্রহণ না করার কারণেই শাস্তি দেওয়া হবে। শাখা বিধানসমূহ পালন না করার দরুন কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না।
খ. কোনো কোনো মাশায়েখের মতে, কাফেররা ইসলামের শাখাসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে সম্বোধিত হবে; পালনের ব্যাপারে নয়। বুখারার কতিপয় হানাফী ইমামের মতামত এটাই।

গ. কতিপয় ইরাকী হানাফী মাশায়েখের মতে, কাফেরদেরকে শরিয়তের শাখা-বিধানসমূহের উপর ঈমান আনা ও যথাযথভাবে পালন করা উভয়ের ব্যাপারেই সম্বোধন করা হবে। মোটকথা, ঈমান ও আস্থা না আনার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।

ঘ. সমকন্দের হানাফী মাশায়েখে কেরাম বলেন, কাফেরগণকে শরিয়তের শাখা-বিধানসমূহে বিশ্বাস না রাখা কিংবা তা পালন করার ব্যাপারে সম্বোধন করা হবে না। বুখারীর হানাফী ইমাগণের অভিমতও অনুরূপ। তাদের যুক্তি হলো কাফেরদেরকে শরিয়তের শাখা-বিধানসমূহের ব্যাপারে বাধ্য করাটা যদি শুদ্ধ হয়, তবে তা পালন করলেও শুদ্ধ হওয়ার কথা, অথচ কোনো কাফেরের নামাজ রোজা ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই একথা বুঝতে হবে যে, শাখা-বিধানসমূহের ব্যাপারে তাদের জন্যে বাধ্যবাধকতা নেই।

ঙ. ইরাকের কতিপয় হানাফী মাশায়েখে কেরাম, শাফেয়ী ও মালেকীগণ এই মত পোষণ করেন যে, শাখা-বিধানসমূহের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস পালনের ব্যাপারে কাফেররা (مُكَلَّفْ) 'মুকাল্লাফ'। তাদের দলিলসমূহ–

قَوْلُهُ تَعَالٰى ١. مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ـ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ـ ٢. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ـ ٣. فَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ـ ٤. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ ٥. وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুশরিক কাফেররা শরিয়তের শাখাসমূহের ব্যাপারে সম্বোধিত। অন্যথা নামাজ, জাকাত ইত্যাদি পরিত্যাগের দরুন কেন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলো? আর কেনই বা ইবাদত ও হজের ব্যাপারে আদেশ করা হলো? কেননা, اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা ঈমানদার ও কাফের উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।

তাদের দলিলসমূহের জবাব :

১. প্রথম আয়াতের মর্মার্থ হলো, আমরা নামাজের উপর বিশ্বাসী ছিলাম না, এখানে নামাজ না পড়া উদ্দেশ্য নয়।

২. দ্বিতীয় আয়াতে সর্বাগ্রে ঈমানের কথা বলা হয়েছে কাজেই যখন তারা ঈমান আনয়ন করেনি, তখন নামাজ পড়েনি, জাকাতও দেয়নি।

৩. তৃতীয় আয়াতে نَفِى الزَّكٰوةِ দ্বারা نَفِىْ اِسْلَامْ উদ্দেশ্য। একে বলা হয় تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ যেমন হাদীসে وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ বলে اَعْقَابُ দ্বারা পুরো ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

৪. আর পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে اَلنَّاسُ দ্বারা শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, শরিয়তের শাখাসমূহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে পূবশর্ত হলো ঈমান। কাজেই কাফের মুশরিকরা সর্বপ্রথম ঈমানের জন্যে সম্বোধিত হবে।

এক শহর হতে অন্য শহরে জাকাত স্থানান্তর করা জায়েজ আছে কিনা? : এক শহর হতে অন্য শহরে জাকাতের অর্থ ও মাল স্থানান্তর করা জায়েজ কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَثَوْرِيْ وَغَيْرِهِمْ :

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও সুফিয়ান ছাওরীর মতে, এক শহর হতে অন্য শহরে যাকাতের মাল প্রেরণ করা বৈধ নয়। তঁদের দলিল হচ্ছে–

(الف) اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بِمُعَاذٍ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ -

(ب) قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اَخَذْنَا عَنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَ وَضَعْنَاهَا الخ

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফীদের মতে এক শহর হতে অন্য শহরে যাকাতের মাল প্রেরণ جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ। কেননা হুযূর ﷺ গ্রাম থেকে যাকাত উঠায়ে মদিনার গরিব আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করতেন।

دُرُّ الْمُخْتَارِ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অন্য শহরে জাকাতদাতার আত্মীয় বা طَالِبُ الْعِلْمِ থাকলে কিংবা তথাকার লোকেরা বেশি অভাবী হলে স্থানান্তর করা মাকরূহ নয়; বরং উত্তম।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব :

১. فُقَرَائِهِمْ-এর যমীরটি عَامٌ চাই সে শহরের মুসলমান হোক বা অন্য শহরের মুসলমান হোক।

২. عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ-এর কথার জবাবে বলা যায় যে, তা কোনো ঘটনা বা স্থানকালের সাথে সুনির্দিষ্ট। এটাকে حُكْمِ عَامٍ বলা যাবে না।

জাকাতের খাতসমূহ হতে শুধুমাত্র একটিকে নির্দিষ্ট করার কারণ : পবিত্র কুরআনে আটটি খাতের মধ্য হতে এখানে শুধুমাত্র فُقَرَاءُ বা দরিদ্রদেরকে تَخْصِيْص করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.) বলেন যে, আটটি বিষয়ের মধ্যে মূলত এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আর এটার বিশেষ কারণ হলো, একথা বুঝাবার জন্যে যে, ধনীর সম্পদের মধ্যে দরিদ্রদের অংশ রয়েছে। যেমন, কুরআনের বাণী– (الاية) وَفِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْم **-এর অর্থ :** হযরত মু'আয (রা.)-কে মজলুমের বদদোয়া হতে দূরে থাকার জন্যে রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

ক. ক্ষমতাসীন ব্যক্তি হিসেবে প্রাপ্যাংশের অতিরিক্ত মাল গ্রহণ না করা, কেননা এটা চরম জুলুম।

খ. দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে কাউকেও কষ্ট না দেওয়া।

لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ **-এর অর্থ :** উল্লিখিত হাদীসাংশে দু'টি অর্থ হতে পারে। যেমন–

ক. মজলুম বা নিপীড়িতদের অভিশাপ ও আল্লাহর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। অর্থাৎ মজলুম বা নিপীড়িতদের অভিশাপ ফেরত দেওয়া হয় না; বরং তা আল্লাহ কবুল করে থাকেন।

খ. এটা দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মজলুম বা নিপীড়িতদের দোয়া অতি তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে থাকে, সামান্যতম সময়ও বিলম্ব করা হয় না।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূল আব্বাস, উপাধি হিবরুল উম্মা ও রয়ীসুল মুফাসসিরীন। পিতার নাম নাম আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, মাতার নাম উম্মুল ফাদল লুবাবা বিনতে হারেছ।

তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর আপন চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনা বিনতে হারিছ তাঁর আপন খালা। এ হিসেবে রাসূল ﷺ তাঁর খালু। তিনি তাঁর বংশ সূত্র হলো– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ।

জন্ম : তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে শিয়াবে আবী তালিবে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি عَبَادِلَةُ اَرْبَعَةٌ -এর অন্যতম ছিলেন। জন্মের পর রাসূল ﷺ নিজ মুখের থুথু দিয়ে তাকে 'তাহনীক' করেন। রাসূলের ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স কত ছিল? নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন– ১৩ বছর, কেউ বলেন– ১৫ বছর, কেউ বলেন– ১০ বছর। রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর জন্যে اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْل [হে আল্লাহ! আপনি তাকে ফিক্হ ও তাফসীরের অগাধ জ্ঞান দান করুন] বলে দোয়া করেছেন।

মর্যাদা ও কৃতিত্ব : তিনি হযরত ওমর ফারূক (রা.) উসমান (রা.)-এর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন– هُوَ فَتَى الْكُهُوْلِ অর্থাৎ তিনি তরুণ প্রবীণ। বয়সে নবীন হলেও তিনি বুদ্ধিতে ছিলেন পাকা। তাবেয়ী মাসরূক (র.) তাঁর মর্যাদা বর্ণনা এভাবে করেছেন– وَكُنْتُ اِذَا رَاَيْتَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتَ اَجْمَلَ النَّاسِ فَاِذَا تَكَلَّمَ اَفْصَحَ النَّاسَ فَاِذَا تَحَدَّثَ قُلْتَ اَعْلَمَ النَّاسِ তিনি নিজে বলেন– ضَمَّنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ (اُسْدُ الْغَابَةِ) তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে স্বচক্ষে দু'বার দেখেছেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। আল্লামা আইনীর মতে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০টি। কারো মতে, ২৬৬০টি। বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৯৫টি আর বুখারী এককভাবে ১২০ এবং মুসলিম ৪৯ টি হাদীস তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : শেষ জীবনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (র.)-এর শাসনামলে তায়েফ নগরীতে মতান্তরে ৬৮/৭০/৭১ হিজরি সনে ৭০ কিংবা ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে দাফন করার পর মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন– مَاتَ وَاللّٰهِ الْيَوْمَ حَبْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ, আজ এ জাতির জ্ঞানসমুদ্র ইহধাম ত্যাগ করলেন।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম মু'আয। উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। পিতার নাম জাবাল। তিনি খাযরাজ গোত্রীয় একজন আনসারী সাহাবী।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ২৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় আকাবায় রাসূল ﷺ -এর হাতে বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ঐ আকাবাতে সর্বমোট সাত জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। সে সময় রাসূল ﷺ তাঁকে দেখে বলেছেন– نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

৩. **যুদ্ধে অংশগ্রহণ** : বদর ছাড়া অন্যান্য সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, যেহেতু তিনি দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সেহেতু তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

৪. **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন** : মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ﷺ তাঁকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এছাড়া হযরত আবূ বকর এবং ওমরের শাসনামলেও তিনি ইসলামের নিরলস সেবক হিসেবে কাজ করে যান।

৫. **হাদীস বর্ণনা** : তিনি রাসূল ﷺ হতে সর্বমোট ৭৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। সাহাবী ও তাবেয়ীদের অনেকে তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে তাঁর থেকে তিনটি আর মুসলিম একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব** : তাঁর সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন- يَأْتِى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَامَ الْعُلَمَاءِ আর ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ مُطِيْعًا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ অর্থাৎ মু'আয সব কল্যাণের শিক্ষাগুরু এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত ছিলেন।

৭. **ইন্তেকাল** : ১৮ হিজরি সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। বায়তুল মাকদিস ও দামেশকের মাঝামাঝি "বায়সান" নগরীর পূর্ব দিকে তাঁকে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ١٦٨١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَاُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَ ظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ اُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْاِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ اِبِلٍ لَا يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا تَطَاُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِاَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلٰهَا رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرٰهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

১৬৮১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সোনা রুপার মালিক, যে তা হতে তার হক [জাকাত] আদায় করে না যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তখন তার জন্যে আগুনের অনেক পাত বানানো হবে হবে সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে আর তা দ্বারা তার পাঁজরে, ললাটে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই পৃথক করা হবে আবার পুনরাবৃত্তি করা হবে [অর্থাৎ ঠাণ্ডা হলে পুনরায় গরম করে দাগ দেওয়া হবে] সেদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। [তার এ শাস্তি চলতে থাকবে] যতক্ষণ না বান্দার বিচার-ফয়সালার সমাধান হবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ রাস্তা অবলম্বন করবে আর তা হয়তো বা জান্নাতের দিকে হবে নতুনা জাহান্নামের দিকে।

তখন জিজ্ঞেস করা হলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট সম্পর্কে কি হুকুম? রাসূল ﷺ বললেন, কোনো উটের মালিক, যে তা হতে তার হক আদায় করবে না। তার হকসমূহের মধ্যে একটি হলো পানি পান করানোর দিন তার দুধ দোহানো [ও তার সদকা করাও] কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তাকে এক সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে, সেদিন তার একটি উটের বাচ্চাও হারিয়ে যাবে না, [অর্থাৎ সবগুলোই উপস্থিত থাকবে] সবগুলো উটই মোটা মোটা হবে। তারা তাকে খুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে এবং মুখে কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখন প্রথম দল অতিক্রম করবে পুনঃ শেষ দল প্রত্যাবর্তন করবে। এটা এমন একদিনে করা হবে যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। [এরূপ চলতে থাকবে] যতক্ষণ

حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّىْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَاهُ بِاَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلٰهَا رُدَّ عَلَيْهِ اُخْرٰهَا فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْخَيْلُ قَالَ فَالْخَيْلُ ثَلٰثَةٌ هِىَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ فَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلٰى اَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِىَ لَهُ وِزْرٌ وَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ ظُهُوْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِىَ لَهُ سِتْرٌ وَاَمَّا الَّتِىْ هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فِىْ مَرْجٍ وَ رَوْضَةٍ فَمَا اَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا اَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ اَرْوَاثِهَا وَاَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تُقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ

বান্দাদের বিচার-ফয়সালা সমাধা না হবে এবং সে তার পথ অবলম্বন না করবে তা জান্নাতের দিকে হোক বা জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! গরু ছাগল সম্পর্কে কি হুকুম? রাসূল ﷺ বললেন, কোনো গরু ছাগলের মালিক যে তা হতে তার হক [জাকাত] আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তাকে সমতল মাঠের মধ্যে উপুড় করে ফেলা হবে, তাদের মধ্য হতে একটিও হারিয়ে যাবে না, একটিও নেড়ে, শিংহীন বা শিংভাঙ্গা হবে না। তারা তাকে শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দ্বারা পিষতে থাকবে। যখন তাদের প্রথম দল অতিক্রম করবে শেষ দল পুনঃ এসে পড়বে। এটা এমন এক দিনে হবে যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এভাবে শাস্তি চলতে থাকবে বান্দাদের বিচার-ফয়সালা সমাধা না হবে এবং সে তার পথ অবলম্বন না করবে তাই তা জান্নাতের দিকে হোক কিংবা জাহান্নামের দিকে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘোড়া সম্পর্কে কি হুকুম? রাসূল ﷺ বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার– ১. যে ঘোড়া মানুষের জন্য পাপের কারণ, ২. যে ঘোড়া মানুষের জন্য আবরণ বা নিরাপত্তার উপকরণ স্বরূপ এবং ৩. যে ঘোড়া মানুষের জন্যে পুণ্যের কারণ। যে ঘোড়া মালিকের জন্যে পাপের কারণ তা ঐ ঘোড়া যা লোক দেখানোর জন্যে গর্ব-অহংকারের কারণে এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার জন্যে পালন করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করা পাপের কারণ। আর যে ঘোড়া মালিকের জন্যে আবরণ তা ঐ ঘোড়া যা কোনো মালিক আল্লাহর রাস্তায় পালন করেছে, অতঃপর তার পিঠ ও ঘাড়ের সম্পর্কে আল্লাহর হক ভুলেনি। এটা তার জন্যে নিরাপত্তা বা আবরণ স্বরূপ। আর যে ঘোড়া মালিকের জন্যে পুণ্যের কারণ তা ঐ ঘোড়া যা কোনো চারণভূমিতে বা তৃণময় বাগানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের [উপকারের] জন্যে পালন করেছে। তখন ঘোড়া এই চারণভূমি বা বাগান হতে যা কিছু ভক্ষণ করবে তার পরিমাণ নেকী তার আমলনামায় লেখা হবে। তার গোবর ও প্রস্রাবের পরিমাণ নেকীও তার আমলনামায় লেখা হবে। আর যদি তা রশি ছিড়ে একটি কি দু'টি মাঠও বিচরণ করে, তবে নিশ্চয় তার পদচিহ্ন ও গোবরসমূহ পরিমাণ পুণ্য তার আমলনামায় লেখা

شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ عَدَدَ اٰثَارِهَا وَاَوْرَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَامَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيْدُ اَنْ يَسْقِيَهَا اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ عَدَدَ مَاشَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِى الْحُمُرِ شَىْءٌ اِلَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হবে। আর যদি তার মালিক তাকে নদীতে নিয়ে যায় এবং তা নিজেই নদীর পানি পান করে অথচ তাকে পানি পান করানোর ইচ্ছা মালিকের ছিল না তবুও তার পানি পান পরিমাণ তার আমলনামায় পুণ্য লেখা হবে।

অতঃপর আরও প্রশ্ন করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! গাধা সম্পর্কে কি বিধান? রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, আমার কাছে গাধা সম্পর্কে এ স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াত ছাড়া আর কিছু নাজিল হয়নি– "ফামাই ইয়ামাল্ মিছকালা যাররাতিন খাইরাই ইয়ারাহু ওয়া মাই ইয়ামাল মিছকালা যাররাতিন শাররাই ইয়ারাহু" অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ উত্তম কাজ করবে সে তার প্রতিফল দেখবে। আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল দেখবে। [অর্থাৎ গাধার জাকাত দিলেও পুণ্য হবে]। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে বিচারের দিবসকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে পঞ্চাশ হাজার বছরের কথা বলে মূলত সেই দিনের ভয়াবহতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তথা সেই দিনটি কাফের মুশরিকদের নিকট অধিক দুঃখ-কষ্টের কারণে পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো হবে। আর অন্যান্য পাপীদের নিকট তাদের পাপ অনুযায়ী দীর্ঘতর হবে। খাঁটি মু'মিনদের নিকট অতি সামান্য সময়ই মনে হবে। এমনকি কারো জন্যে দু' রাকআত নামাজ আদায় করার সময় পরিমাণ স্বল্প সময় বলে অনুভূত হবে। সেদিন যে কাফেরদের জন্যে কঠোরতম হবে সে বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

١. فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ . ٢. رَا الْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا .

জাকাত ফরজ হওয়ার হিকমত : ইসলামি শরীয়ার যে কোনো বিধান প্রবর্তনের পেছনে কোনো না কোনো হিকমত নিহিত রয়েছে। যেমন বলা হয় "فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ" তাই জাকাতের মধ্যেও নিম্নোক্ত রহস্যগুলো পাওয়া যায়–

১. সামাজ থেকে দরিদ্রতা দূর হয়।	৭. ধনী ও গরিবদের মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টির শুভ সূচনা হয়।
২. অভাবমুক্ত ইসলামি সমাজ গঠিত হবে।	৮. জাকাত অর্থদান ও ব্যয়ের প্রতি অভ্যস্থ করে।
৩. রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ভারসাম্যতা সৃষ্টি হবে।	৯. জাকাতদাতার সামাজিক মর্যাদা সৃষ্টি হয়।
৪. জাকাতদাতার আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জিত হয়।	১০. জাকাত মানুষের লোভ নিবারণ করে।
৫. জাকাতের মাধ্যমে মালের প্রবৃদ্ধি ঘটে।	১১. জাকাত দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয়।
৬. জাকাত ধন-মালের পবিত্রতা বিধান করে।	১২. জাকাত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে।

স্বর্ণের ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ : স্বর্ণের নিসাব হচ্ছে– ২০ মিছকাল বা ৭ $\frac{১}{২}$ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম এ পরিমাণ স্বর্ণ কারো মালিকানায় পূর্ণ এক বছর থাকলে আধা মিছকাল তথা শতকরা ২ $\frac{১}{২}$ ভাগ হারে জাকাত আদায় করতে হবে। এর কম হলে জাকাত আবশ্যক নয়। যেমনি রাসূল ﷺ বলেছেন– فِىْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ نِصْفُ مِثْقَالٍ

রুপার জাকাতের নিসাব : রৌপ্যের নিসাব হবে ২০০ তোলা বা ৬১২.২৫ গ্রাম। এ পরিমাণ রৌপ্য কারো মালিকানায় পূর্ণ একবছর থাকলে ৫ দিরহাম বা শতকরা ২ $\frac{১}{২}$ টাকা হারে জাকাত প্রদান করতে হবে। এই পরিমাণের কম হলে কোনো অবস্থাতেই রৌপ্যের উপর জাকাত আদায় করা ফরজ নয়। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন–

فَاِذَا كَانَتْ مِاَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

তবে কারো নিকট যদি স্বর্ণ-রৌপ্য উভয়টি থাকে আর কোনোটির নিসাব স্বতন্ত্রভাবে জাকাতের নিসাব পরিমাণ না থাকে, তাহলে দেখতে হবে উভয়টির মূল্য যোগ করলে কোনো একটির নিসাব পরিমাণ মূল্যের সমান হয় কিনা?

যদি কোনো একটিরও নিসাব পরিমাণ মূল্যের সমান হয়, তবে সেটির হিসেবেই শতকরা ২ $\frac{১}{২}$ টাকা জাকাত দেওয়া ফরজ। আর যদি উভয় ক্ষেত্রেই নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে যে ক্ষেত্রে জাকাত প্রাপক অধিক উপকৃত হয় সে হিসেবে জাকাত প্রদান করতে হবে।

যখন গরু, ছাগল ও উটের উপর জাকাত ফরজ হয় : উল্লেখ্য যে, শুধু চাষাবাদ বা বোঝা টানার উদ্দেশ্যে যে গরু, ছাগল-মহিষ লালনপালন করা হয়, তার সংখ্যা নিসাব পরিমাণ বা তদুর্ধ হলেও তাতে জাকাত ফরজ নয়। জাকাত ফরজ কেবলমাত্র সে সকল গরু মহিষে যা বংশ বৃদ্ধি ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা ও পোষা হবে। অবশ্য কোনো কোনো ফকীহের মতে, প্রথমোক্ত গরু-মহিষের অন্তত একবার জাকাত দেওয়া উচিত।

গরু মহিষের জাকাতের নিসাব হলো ৩০টি, কেননা রাসূল ﷺ বলেন–

وَفِى الْبَقَرِ فِىْ كُلِّ ثَلٰثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِى الْاَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ

ছাগল ও দুম্বার জাকাতের নিসাব হলো ৪০ টি, যেমন নবী করীম ﷺ বলেছেন–

وَفِىْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِىْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ

উটের জাকাতের নিসাব হলো ৫টি যথা রাসূল ﷺ বলেছেন– لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

ঘোড়ার উপর জাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : আরোহণ, বোঝা বহন ও জিহাদের জন্যে ঘোড়া এবং খিদমতের জন্যে ক্রীতদাস থাকলে তাতে জাকাত নেই। আর যদি ক্রীতদাস ও ঘোড়া ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে হয়, তবে তাতে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ফরজ হবে। আর যদি দুধ উৎপাদন, বংশ বৃদ্ধি ও প্রজননের জন্যে হয়, তবে তাতে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَاِسْحَاقَ وَاَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী (র.) মালেক (র.) আহমদ (র.) ইসহাক (র.) আহলে যাওয়াহির (র.) সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) মাকহূল (র.) আতা (র.) সুফিয়ান (র.) যুহরী (র.) শা'বী (র.) হাকাম (র.) ইবনে সীরীন (র.) এবং সাহেবাইন (র.)-এর মতে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

তাদের দলিল : তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয় পেশ করেন–

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِىْ عَبْدِهٖ وَلَا فِىْ فَرَسِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢. عَنْ عَلِيٍّ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ وَ زُفَرَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইব্রাহীম নাখয়ী (র.), হাসান ইবনে আবূ সুলাইমান (র.) ও ইমাম যুফার (র.) প্রমুখের মতে, বংশ বৃদ্ধির জন্যে যে ঘোড়া বছরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে বিচরণ করে এবং পুরুষ ও স্ত্রী একত্রে মিশে আছে তাতে জাকাত ধার্য হবে। এ ধরনের ঘোড়ার মাথা পিছু এক দিনার অথবা এর দাম করে প্রতি দু'শ দিরহামে পাঁচ দিরহাম জাকাত দিতে হবে।

আর যদি শুধু পুরুষ ঘোড়া হয় অথবা শুধু স্ত্রী ঘোড়া হয়, তবে জাকাত ধার্য হবে না। তাঁদের মতে ক্রীতদাসের মধ্যেও জাকাত ওয়াজিব।

তাঁদের দলিল : তাঁরা নিজেদের মতের অনুকূলে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেন–

١. عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهٗ قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ يَقُوْمُ الْخَيْلَ وَيَدْفَعُ صَدَقَتَهَا اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ

٢. قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ اَنَّهٗ كَانَ يَاْخُذُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْخَيْلِ ـ

٣. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِىْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ وَلَيْسَ فِى الرَّابِطَةِ شَئٌ ـ

٤. فِىْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ـ (دَارُ قُطْنِىْ)

٥. عَنْ حَارِثَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ اِلٰى عُمَرَ (رضـ) فَقَالُوْا اِنَّا قَدْ اَصَبْنَا اَمْوَالًا خَيْلًا وَ رَقِيْقًا وَاِمَاءً نُحِبُّ اَنْ نُزَكِّيَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَا فَعَلَهُ صَاحِبِىْ قَبْلِىْ فَافْعَلَهُ اَنَا ثُمَّ اِسْتَشَارَ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا حَسَنٌ ـ (اَلْحَدِيْثُ)

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের উত্তর : মালেক (র.) ও শাফেয়ী (র.) প্রমুখের প্রদত্ত দলিলের জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, তাদের পেশকৃত হাদীসে যে ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা ঐ সকল ঘোড়া উদ্দেশ্য যা আরোহণ, বোঝা বহন ও জিহাদের কাজে ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে হাদীসে যে ক্রীতদাসের কথা উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল ক্রীতদাস, যা খিদমতের কাজে নিয়োজিত। আর এমন গরু, ঘোড়া ও ক্রীতদাসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব নয়।

ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : ঘোড়ার পিঠ ও ঘাড় সম্পর্কে আল্লাহর হক ভুলেনি। এর অর্থ হলো, কষ্ট ক্লিষ্টে কোনো পথচারী পথিককে এমন অবস্থায় এর পিঠে তুলে নিয়েছে। অথবা বিপদে পড়া কোনো ব্যক্তির মাল-সামানা এর পিঠে তুলে নিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রয়োজন মোতাবেক তার ঘাস পানি বা খাদ্য সরবরাহ করা এবং এর সাথে সদয় আচরণ করাই 'আল্লাহর হক'। অথবা কেউ ধার চাইলে তাকে ধার দেওয়া ইত্যাদি।

وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا-এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসাংশের অর্থ হলো– মুসাফির, গরিব-মিসকিনদেরকে কিছু দুধ দান করা। বিশেষত যারা পানি পান ও দুধ দোহনের সময় তথায় উপস্থিত থাকে। ইবনে বাত্তাল বলেন, এটা বদান্যতা ও সৌজন্যমূলক আচরণ বৈ অন্য কিছু নয়। আবার কারো মতে, জাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বে এরূপ করার নির্দেশ ছিল। পরে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

রাবী পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের এত বেশি মতানৈক্য যে, এত মতানৈক্য আর কোনো ব্যাপারে পাওয়া যায় না। তাঁর নাম নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে ৬৫টি পর্যন্ত মত পাওয়া যায়। ইসলাম-পূর্ব যুগে তার নামের কয়েকটি হলো– ১. আব্দুশ শামস ২. আব্দু আমর ৩. আব্দুল লাত ৪. আব্দুল ওযযা প্রভৃতি। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হলো–

১. আব্দুল্লাহ ইবনে সখর, ২. আব্দুর রহমান ইবনে সখর, ৩. ওমায়ের ইবনে আমির ইত্যাদি।

উপনাম : আবূ হুরায়রা। পিতার নাম, সখর। মাতার নাম, উম্মিয়া বিনতে সফীহ অথবা মায়মূনা।

এ সম্পর্কে عَبْدُ الْحَقِّ مُحَدِّثْ دِهْلَوِيْ বলেন–

اِنَّهٗ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ شَمْسٍ اَوْ عَبْدُ عَمْرٍو وَفِى الْاِسْلَامِ عَبْدُ اللّٰهِ اَوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ـ

২. আবূ হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : এ নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন– اِنَّمَا سُمِّىَ اَبَا هُرَيْرَةَ لِاَنَّهٗ كَانَ لَهٗ هِرَّةٌ صَغِيْرَةٌ يَحْمِلُهَا اِلَيْهِ

আল্লামা ইবনুল বারও এ মতের পক্ষে পক্ষে সমর্থন করেছেন। বর্ণিত আছে, একদা তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর পবিত্র দরবারে একটি বিড়াল ছানা জামার আস্তিনের নিচে নিয়ে উপস্থিত হন। হঠাৎ রাসূলে কারীম ﷺ-এর সামনেই বিড়াল ছানাটি বেড়িয়ে পড়ে। রাসূল ﷺ এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে রসোচ্ছলে তাকে اَبَا هُرَيْرَةَ বলে সম্বোধন করেন। পরবর্তীতে তিনি এ নামকেই নিজের জন্যে পছন্দনীয় মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে اَلْاِكْمَالُ فِىْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ প্রণেতা বলেন– غَلَبَتْ عَلَيْهِ كُنْيَتُهٗ فَهُوَ كَمَنْ لَا اِسْمَ لَهٗ

৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মুতাবিক ৭ হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে বিখ্যাত সাহাবী তুফায়েল ইবনে আমার আদ দাওসীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আর রাসূল ﷺ থেকে পৃথক হননি। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত হাদীসের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল বার (র.) বলেন–

وَاظَبَ عَلَيْهِ رَاغِبًا فِى الْعِلْمِ رَاضِيًا بِشِبْعِ بَطْنِهٖ وَكَانَ يَدُوْرُ مَعَهٗ حَيْثُ مَا دَارَ يَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُ اَحَدٌ مِنْهُمْ بِمُلَازَمَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَلِذٰلِكَ كَثُرَ حَدِيْثُهٗ ـ

মর্যাদা ও কৃতিত্ব : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। আল্লামা আইনী (র.)-এর মতে তাঁর বর্ণিত হাদীস হলো– ৫৩৭৪ টি। ইমাম বুখারীর ভাষ্যানুযায়ী তাঁর থেকে ৮ শত এরও বেশি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি খুব উঁচু স্তরের মুত্তাকী ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) যৌথভাবে ৩২৬ টি আর এককভাবে ইমাম বুখারী (র.) ৭৯টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৯৩/৭৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কারো মতে সম্মিলিতভাবে উভয়ে ৮২২ খানা আর এককভাবে বুখারী ৪০৪ খানা এবং মুসলিম ৪১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।
ইন্তেকাল : তিনি ৭৮ বছর বয়সে ৬৭/৫৮/৫৯ হিজরিতে মদীনার অদূরে কাসবা নাম স্থানে ইন্তেকাল করেন। ওয়ালীদ ইবনে ওকাবা তাঁর জানাজা পড়ান এবং তাঁকে জান্নাতুন বাকীতে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْهُ ١٦٨٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ (الاية) - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৬৮২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন আর সে তার জাকাত প্রদান করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা সাপ স্বরূপ বানানো হবে যার চক্ষুর উপর দু'টি কাল বিন্দু থাকবে। কিয়ামতের দিন তাকে তার গলায় বেড়ী স্বরূপ করা হবে। অতঃপর সাপ তার মুখের দু'দিকে [কামড় দিয়ে] ধরবে। তারপর বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সংরক্ষিত ধন। অতঃপর রাসূল ﷺ 'ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াব্খালূনা' আয়াত পাঠ করলেন। আয়াতটির অর্থ– 'যারা কৃপণতা করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা নিয়ে তারা যেন না ভাবে যে, এটা তাদের জন্যে উত্তম; বরং এটা তাদের জন্যে মন্দ যা নিয়ে তারা কৃপণতা করছে। অতি শীঘ্র কিয়ামতের দিন তাদের গলায় তা বেড়ীস্বরূপ করা হবে।" –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : জাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। জাকাতের মাধ্যমে সম্পদের পবিত্রতা অর্জিত হয় এবং মালিক সম্পদের দায় হতে মুক্ত হয় নতুবা এ সম্পদকে কিয়ামতের ময়দানে বিষাক্ত সর্পে পরিণত করা হবে আর তা তাকে অনবরত কামড় দিতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার সেই সম্পদ যা তুমি জমা করে রেখেছ।

وَعَنْ ١٦٨٣ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ لَهٗ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ اَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلَّا اُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْظَمَ مَا يَكُوْنُ وَاَسْمَنَهٗ تَطَاُهٗ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهٗ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ اُخْرٰهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلٰهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কোনো ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল, ভেড়া থাকবে অথচ সে তার হক অর্থাৎ জাকাত আদায় করবে না ঐগুলোকে কিয়ামতের দিন পূর্বে যেরূপ ছিল তার চেয়ে বিরাট ও মোটা-তাজা করে আনা হবে। তারা তাকে তাদের খুর দ্বারা পিষতে থাকবে এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। যখনই তাদের শেষ দলটি অতিক্রম করবে প্রথম দলটিকে তার উপর পুনরায় আনা হবে। এভাবে চলতে থাকবে যে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা সামাধা না হয়ে যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম জুনদুব ইবনে জুনাদাহ অথবা বুরাইয়া। উপনাম আবূ যর। উপাধি শায়খুল ইসলাম। পিতার নাম জুনাদাহ। তবে তিনি আবূ যর নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে যে ক'জন ব্যক্তি আইয়ামে জাহেলিয়াতের কুসংস্কার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন; হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) তাঁদের অন্যতম। তাই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন রাসূলে কারীম ﷺ -এর সংবাদ পেয়েই মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লামা মানাযির আহসান গিলানী (র.) তাঁকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি নিজে বলেছেন, আমি প্রথম চার জন ইসলাম গ্রহণকারীদের চতুর্থ।

৩. **রাসূলের সাহচর্য :** মদীনায় অবস্থানকালে তিনি সর্বদা রাসূলে কারীম ﷺ -এর খিদমতে থাকতেন। যাতুর রিকা যুদ্ধকালে রাসূল ﷺ তাঁকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন।

৪. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** তিনি ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ। তিনি পণ্ডিত, সাধক, মার্জিত স্বভাবের লোক ছিলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করাকে তিনি হারাম মনে করতেন। صَاحِبُ الْاِكْمَالِ তাঁর সম্পর্কে বলেন–

وَهُوَ مِنْ اِعْلَامِ الصَّحَابَةِ وَ زُهَّادِهِمْ وَالْمُهَاجِرِيْنَ

৫. **হাদীস শাস্ত্রে অবদান :** তিনি সর্বমোট ২৮১ টি হাদীস বর্ণনা করেন, এর মধ্যে ৩১ টি হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে এককভাবে ইমাম বুখারী (র.) ২ টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) ১৭টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **ইন্তেকাল :** তিনি সম্পদ পুঞ্জীভূত করাকে হারাম মনে করতেন। এ ব্যাপারে প্রথমে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং পরে উসমান (রা.)-এর সাথে মতবিরোধ হলে তিনি মদীনার অদূরবর্তী রাবাযা নামক এক বিয়াবনে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করেন এবং সেখানেই হিজরি ৩২ সনে ৮ই জিলহজ ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামাজের ইমামতি করেন ফকীহুল উম্মাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)।

وَعَنْ ١٦٨٤ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৮৪. **অনুবাদ :** হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কাছে জাকাত আদায়কারী আসবে সে যেন তোমাদের নিকট হতে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে ফিরে যায়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** জাকাত উসুলকারী কর্মচারী– জাকাত উসুল করে প্রকৃতপক্ষে জাকাতদাতাকে গুনাহের আবর্জনা হতে পবিত্র করে। আর সে নিজেও স্বতঃস্ফূর্ত মনে নিজের জাকাত আদায় করে দিয়েছে, মনের মধ্যে কোনো প্রকারের কুণ্ঠাবোধ করেনি। ফলে জাকাতদাতার পরহেজগারী ও খোদাভীরুতা দেখে জাকাত আদায়কারী সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারে এবং জাকাতদাতাকে যথারীতি পবিত্র করতে পেরেছে বলে নিজের আত্মতৃপ্তি লাভ হতে পারে। এ সবকিছুকে লক্ষ্য করেই নবী করীম ﷺ বলেছেন, জাকাত প্রদান করলে উসুলকারীর মনে অসন্তুষ্টি থাকতে পারে না। মোটকথা, উসুলকারীর সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম জারীর, উপনাম আবূ আমর। পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তিনি ইয়েমেনের বাজালী গোত্রের নেতা এবং উম্মতে মুহাম্মদীর ইউসুফ বলে পরিচিত।

২. **বংশ পরম্পরা :** জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাবির ইবনে মালিক ইবনে নসর ইবনে ছা'লাবা ইবনে জা'শাম ইবনে আওফ ইবনে খুযায়মা ইবনে হারব ইবনে আলী আল-বাজালী।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তাঁর ইসলাম গ্রহণ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. আল্লামা আইনী (র.)-এর এ বিষয়ে দু'টি অভিমত রয়েছে– ক. তিনি রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের ৪০ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। খ. তিনি দশম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

২. ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, তিনি রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের সাত মাস পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

৩. স্বয়ং হযরত জারীর (রা.) তিনি বলেছেন– اَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بِاَرْبَعِيْنَ يَوْمًا 'আমি রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

৪. **হাদীসের খেদমত :** হযরত জারীর সর্বমোট ১০০টি হাদীস বর্ণনা করেন এর মধ্যে ৮টি মুত্তাফাকুন আলাইহি আর এককভাবে ইমাম বুখারী (র.) ১টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৭টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৫. **ইন্তেকাল :** তিনি ৫১ হিজরি মতান্তরে ৫৪ হিজরি সনে কিরকিসিয়া নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৫ জন পুত্র সন্তান ছিল।

وَعَنْ ١٦٨٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلَانٍ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِذَا اَتَى الرَّجُلُ النَّبِىَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ـ

১৬৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো সম্প্রদায় যখন নবী কারীম ﷺ -এর কাছে তাদের জাকাত নিয়ে আসত রাসূল ﷺ বলতেন– "হে আল্লাহ! তুমি অমুকের পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর"। আমার পিতা একবার রাসূল ﷺ -এর কাছে নিজের জাকাত নিয়ে আসলেন তখন রাসূল ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবূ আওফার পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ কর।" –[বুখারী ও মুসলিম]

অপর বর্ণনায় আছে যখন কোনো ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে নিজের জাকাত নিয়ে আসত, তখন রাসূল ﷺ বলতেন, "আল্লাহ তুমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ কর।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাকাত প্রদানকারীর জন্যে দোয়া করা মোস্তাহাব। মহানবী ﷺ ও 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহিম' শব্দ দ্বারা দোয়া করতেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলারও নির্দেশ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ 'জাকাত উসুল করার পর, প্রদানকারীর জন্যে আপনি দোয়া করুন'। আব্দুল্লাহ্ বলেন– একবার আমার পিতা নিজের সদকা [জাকাত] নিয়ে এলেন তখন হুযূর ﷺ আমার পিতাকে 'হে আল্লাহ্! আবূ আওফার পরিবার-পরিজনদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর' বাক্য দ্বারা দোয়া করেছেন।

সালাত শব্দ দ্বারা দোয়া করা প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ :

اَلصَّلٰوةُ শব্দটি দ্বারা রাসূল ﷺ ও অন্য কারো জন্যে দোয়া করা বৈধ কিনা? এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরূপ– আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, اَلصَّلٰوةُ শব্দটি দোয়া ও কল্যাণ কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে, রাসূল ﷺ ছাড়া অন্য লোকের ক্ষেত্রেও এ শব্দটির প্রয়োগ বৈধ। কেননা মহান আল্লাহ জাকাতদাতাদের জন্যে দোয়া করা প্রসঙ্গে বলেছেন, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ 'আপনি তাদের জন্যে দোয়া করুন।'

তিনি বলেন, এ শব্দ দ্বারা দোয়া করা মোস্তাহাব। যেমন রাসূলে কারীম ﷺ দোয়া করেছেন– اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا لِمَنْ اَتَاهُ بِصَدَقَتِهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِىْ اَهْلِهِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনে বরকত নাজিল কর।

তবে শব্দটি সম্মান ও মর্যাদার অর্থে ব্যবহৃত হলে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ -এর জন্যেই নির্দিষ্ট হবে, অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হবে না।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, صَلٰوةٌ শব্দ প্রয়োগে রাসূল ﷺ ও অন্য লোকদের জন্যে দোয়া করা বৈধ কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে–

কারো মতে শব্দটি দ্বারা সাধারণ রহমত অর্থ বুঝানো হলে তা মাকরূহ হবে।

আবার কেউ বলেন, হারাম। কেউ বলেন, তা উত্তমতার বিপরীত, আবার কারো মতে সুন্নত। আরেকদল বলেন, শব্দটি দ্বারা যদি সাধারণ রহমত অর্থ নেওয়া হয়, তবে তা মুবাহ হবে এবং যদি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শনের অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে মাকরূহ হবে।

আর যারা বলেন, اَلصَّلٰوةُ শব্দ প্রয়োগ রাসূল ﷺ ছাড়া অন্যদের জন্যে জায়েজ নয়। তাদের কথা হলো যে, শব্দটি রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্যেই নির্দিষ্ট।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, اَلصَّلٰوةُ শব্দটি যদি দোয়া বা কল্যাণ কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তা রাসূলে কারীম ﷺ ছাড়া অন্যান্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম আব্দুল্লাহ ও আলকামাহ, উপনাম আবূ মুয়াবিয়া। পিতার নাম আবী আওফা ও খালিদ। তবে তিনি ইতিহাসের পাতায় ইবনে আবী আওফা নামে পরিচিত।

২. **নসবনামা :** আব্দুল্লাহ/আলকালামাহ ইবনে খালিদ ইবনে হারিছ ইবনে আবী উসাইদ ইবনে রিফায়াহ্ ইবনে ছা'লাবা ইবনে হাওয়াযিন ইবনে আসলাম ইবনে আফসা।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** ৬ষ্ঠ হিজরিতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলেন। তিনি বায়'আত রিদওয়ানে উপস্থিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন

৪. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** তিনি খায়বর, হুনায়নসহ অনেক যুদ্ধে ইসলামের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। তিনি একজন অমিততেজা বীর ছিলেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে দীর্ঘদিন বায়তুলমাল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। মক্কা বিজয়সহ রাসূল ﷺ -এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন।

৫. **হাদীসের খেদমত :** তিনি সর্বমোট ৯৫ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ১০ টি مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ আর এককভাবে ইমাম বুখারী (র.) ৫টি হাদীস বর্ণনা করেন, ইমাম মুসালিম এককভাবে তার বর্ণিত কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি।

৬. **ইন্তেকাল :** তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেন ৮৬, কেউ বলেন ৮৮ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি কূফায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

وَعَنْ ١٦٨٦ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হযরত ওমর (রা.)-কে জাকাত আদায় করার জন্যে পাঠালেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হলো, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) ও আব্বাস (রা.) জাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবনে জামীল খোদার নিয়ামতের অস্বীকার এ জন্যে করেছে যে, সে গরিব ছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাকে ধনী করে দিয়েছেন। আর খালিদের ব্যাপারে (তার কাছে জাকাত চেয়ে) তোমরা তার প্রতি জুলুম করছ। সে তার বর্ম ও সমস্ত মালপত্র আল্লাহর রাস্তায় [জিহাদের জন্যে] উৎসর্গ করে রেখেছে। আর [আমার চাচা] আব্বাস, তার জাকাতও তার সমপরিমাণ আমার জিম্মায় আছে। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, হে ওমর! তোমার কি জানা নেই যে, কোনো ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য। [অতএব তার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত]। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ذَهَبَ عُمَرُ (رضـ) اَنْ يُحْصِلَ لِاَيِّ قِسْمٍ مِنَ الزَّكٰوةِ : হযরত ওমর (রা.) কি রকম জাকাত উসুল করতে গমন করেছেন? ওমর (রা.)-কে কোন ধরনের জাকাত উসুল করতে প্রেরণ করা হয়েছে? এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

কিছু সংখ্যকের মতে এটা ছিল নফল সদকা। কেননা যদি ফরজ জাকাত হতো তাহলে কেউই এটা দিত অস্বীকার করতো না। তবে এ মতটি দুর্বল।

অধিকাংশের মতে ফরজ সদকা উসুল করার জন্যে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। কেননা, নবী করীম ﷺ -এর যুগে নফল সদকা উসুল করার জন্যে কোনো কর্মচারী নিয়োগ করা হতো না।

تَوْضِيْحُ قَوْلِهِ يَنْقِمُ بْنُ جَمِيْلٍ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসাংশে রাসূলে কারীম ﷺ ইবনে জামীলের অকৃতজ্ঞতার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন– ইবনে জামীল এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল। রাসূলে কারীম ﷺ তার দারিদ্র মোচনের জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, যার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধনী করে দেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দোয়া কবুল করেন। সে ধনী হলেও অকৃতজ্ঞ থেকে যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ধন-দৌলত পাওয়াটা শুধু সৌভাগ্যের উম্মোচন ঘটায় না; বরং কখনো কখনো দুর্ভাগ্যের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। নবী কারীম ﷺ -এর কথার তাৎপর্য হলো, ইবনে জামীলের জাকাত না দেওয়ার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে একটি মাত্র কারণ এ হতে পারে যে, সে এক সময় গরিব ছিল, এখন আল্লাহ তাকে মালদার করায় সে তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইবনে জামীল প্রথমে মুনাফিক ছিল, অবশ্য পরে খালিস দিলে তওবা করেছেন। তবে অনেকেই তাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

تَشْرِيْحُ قَوْلِهِ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا **-এর ব্যাখ্যা :** খালিদ ইবনে ওয়ালিদের উপর জাকাত ওয়াজিব ছিল না। কেননা, সে নিজের যাবতীয় মাল-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে রেখেছিল। আর ওয়াকফ সম্পত্তিতে জাকাত হয় না।

প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, জাকাত আদায়কারী হযরত ওমর (রা.) খালিদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি দেখতে পেয়ে বুঝেছিলেন যে, এ সমস্ত মাল ব্যবসায়িক পণ্য। প্রকৃতপক্ষে হযরত খালিদ (রা.) তা মুসলমানদের জিহাদের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে রেখেছিলেন। এ ওয়াকফ মালের জাকাত নেই। তাই তার কাছে জাকাত তলব করাতে "জুলুম করা হয়েছে" বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অথবা এর ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি নিজের সমুদয় মাল-সম্পদ নফলী সদকা হিসেবে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছে, সে ফরজ সদকা হতে কেমন করে বিরত থাকতে পারে? সম্ভবত তোমরা তার প্রতি অবিচার করেছ। বীর ব্যক্তি অবিচার সহ্য করতে পারে না।

এরই কাছাকাছি আল্লামা তীবী (র.) একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন যে, হাতিম শব্দটি বললে যেমন দানশীল ব্যক্তিকে বুঝায়, খালিদ শব্দটি বললেও তেমনি বাহাদুর ব্যক্তিকে বুঝায়। এখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমরা খালিদকে অহেতুক দোষারোপ করছ। অথচ বাহাদুরী ও কার্পণ্য একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।

قَوْلُهُ فَهِىَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا الخ **-এর তাৎপর্য :** এ বাক্যাংশের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. হযরত আব্বাস (রা.) যেহেতু অর্থ সংকটে পতিত হয়েছিলেন সে জন্যে তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তার জন্যে দুই বছরের জাকাত বিলম্বে পরিশোধের অনুমতি দিয়েছিলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কিছু সময় অবকাশ দেওয়া ইমামের জন্যে বৈধ। রাসূলে কারীম ﷺ এটাও বলেছেন যে, তাঁর জাকাত আদায়ের জিম্মাদার আমি।
২. কারো মতে এ বাক্যাংশের অর্থ হলো– রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আব্বাস (রা.) হতে দুই বছরের জাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বেই অগ্রিম আদায় করেছিলেন। যখন তহশীলদার হযরত আব্বাস (রা.)-এর কাছে জাকাত তলব করলেন, তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, তার জাকাত আমার কাছে পৌঁছেছে।
৩. অথবা অর্থ রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আব্বাস (রা.)-এর কাছ থেকে জাকাতের উদ্দেশ্যে কর্জ গ্রহণ করেননি; বরং অন্য কোনো কাজের জন্য কর্জ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর জাকাত দেওয়া হলে তিনি এটা জাকাত হিসেবে গণ্য করে নিয়েছেন।
৪. ইমাম তুরপশ্তী (র.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আব্বাস (রা.)-এর কাছ থেকে দুই বছরের জাকাতই ধার নিয়েছিলেন। একটি চলতি বছরের অপরটি পরবর্তী বছরের। জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই জাকাত আদায় করা সম্ভবত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিশেষত্ব ছিল।

অগ্রিম জাকাত আদায় করা বৈধ কিনা? জাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বে জাকাত আদায় করা জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ক. ইমাম মালিক (র.) ও লাইস (র.)-এর অভিমত : ইমাম মালিক (র.) ও লাইস ইবনে সা'দ (র.) -এর মতে, সময়ের পূর্বেই অগ্রিম যাকাত আদায় করা মাকরূহ।

খ. হযরত হাসান বসরী (র.)-এর অভিমত : হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে অগ্রিম জাকাত আদায় করা অবৈধ। এরূপ ক্ষেত্রে পুনরায় আদায় করতে হবে।

গ. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.), শাফিয়ী (র.) ও আহমদ (র.) তথা জমহূরের মতে, অগ্রিম জাকাত আদায় করা বৈধ। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন। তা হলো–

"بِاَنَّهُ ﷺ اَخَذَهَا مِنْهُ مُعَجَّلًا" وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ تَعْجِيْلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَثَبَتَ بِذٰلِكَ تَعْجِيْلُ الزَّكٰوةِ جَائِزٌ -

তবে উল্লিখিত ইমামগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, কত বছরের জাকাত আদায় করা বৈধ। সুতরাং ইমাম শাফেয়ীর মতে, শুধু এক বছরের অগ্রিম জাকাত আদায় করা যেতে পারে। তবে ইমাম আহমদ (র.) বলেন, দু'বছরের পর্যন্ত অগ্রিম জাকাত আদায় করার সুযোগ রয়েছে।

عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ -এর ব্যাখ্যা : صِنْوٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– গাছের শাখা-প্রশাখা। একটি গাছের একাধিক শাখা থাকলে প্রত্যেক শাখাকে বলা হয় صِنْوٌ ; এখানে হুযূর ﷺ -এর কথার তাৎপর্য হলো– পিতা যেমন আপন পুত্র বা সন্তানের কাছে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার অধিকারী, আমার চাচাও আমার কাছে তা পাওয়ার অধিকার রাখেন। কেননা, পিতা ও চাচা তাঁরা উভয় যে একই বৃক্ষের দু'টি শাখা। মোটকথা, আমার চাচা জাকাত না দেওয়ার মতো লোক নন। তোমরা তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছ তা প্রত্যাহার করা উচিত। কেননা, তিনি যে শুধু চলতি বৎসরের জাকাত দিয়েছেন, তাই নয়; বরং আরো এক সনের জাকাত আগাম দিয়েছেন। অথবা তিনি দেননি এতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি নিজেই চাচার জন্যে জিম্মাদার। মোটকথা, হুযূর ﷺ চাচার প্রতি পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

وَعَنْ ١٦٨٧ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلٰى اُمُوْرٍ مِمَّا وَلَّانِىَ اللّٰهُ فَيَاْتِىْ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذِهٖ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ فَهَلَّا جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ بَيْتِ اُمِّهٖ فَيَنْظُرَ اَيُهْدٰى لَهٗ اَمْ لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَاْخُذُ اَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا اِلَّا جَاءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَحْمِلُهٗ عَلٰى رَقَبَتِهٖ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهٗ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرًا لَهٗ خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَفِىْ قَوْلِهٖ هَلَّا جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اُمِّهٖ اَوْ اَبِيْهِ فَيَنْظُرَ اَيُهْدٰى اِلَيْهِ اَمْ لَا دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ كُلَّ اَمْرٍ يُتَذَرَّعُ بِهٖ اِلٰى مَحْظُوْرٍ فَهُوَ مَحْظُوْرٌ وَكُلُّ دَخِيْلٍ فِى الْعُقُوْدِ يُنْظَرُ هَلْ يَكُوْنُ حُكْمُهٗ عِنْدَ الْاِنْفِرَادِ كَحُكْمِهٖ عِنْدَ الْاِقْتِرَانِ اَمْ لَا هٰكَذَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ ـ

১৬৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুমাইদ সায়িদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আয্দ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যা নামক এক ব্যক্তিকে জাকাত আদায়ের জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। অতঃপর যখন সে [মদীনায়] ফিরে আসল, তখন বলল, এটা আপনাদের জাকাত আর এটা আমাকে উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এটা শুনে নবী করীম ﷺ ভাষণ দিলেন, তিনি প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, ব্যাপার হলো– আমি তোমাদের মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তিকে এমন কিছু কাজে নিয়োগ করি, যা করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন এসে বলে, "এটা আপনাদের জন্যে জাকাত এবং এটা আমাকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হাদিয়া।" সে কেন নিজের বাবা মায়ের ঘরে বসে এটা লক্ষ্য করে না যে, তাকে উপঢৌকন দেওয়া হয় কিনা?

সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি এটা হতে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, এটা নিজ ঘাড়ে নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। যদি এটা উট হয় চিঁ চিঁ করে ডাকবে, যদি গাভী হয় তবে হাম্বা হাম্বা রব করবে, আর যদি ছাগল হয় তবে ভ্যা ভ্যা রব করবে। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ নিজের দু'হাত এতটুকু উঠালেন যাতে আমরা তার বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি? হে আল্লাহ আমি কি পৌছে দিয়েছি? –[বুখারী ও মুসলিম]

খাত্তাবী বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী "সে কেন নিজের বাবা মায়ের ঘরে বসে এটা লক্ষ্য করে না যে, তাকে উপঢৌকন দেওয়া হয় কিনা? এ কথার প্রমাণ যে, যে জিনিসকে কোনো হারামের দিকে উপলক্ষ্য বানানো হয়, তবে এ উপলক্ষ্যও হারাম। প্রতিটি আক্দ যা কয়েকটি আকদের মধ্যে প্রবেশ করে এটা দেখা যাবে যে, এর পৃথক পৃথক হওয়া অবস্থায় ঐ হুকুমই আছে যা একত্র অবস্থায় ছিল, না ব্যতিক্রম হয়েছে। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জাকাত আদায়কারী কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ করাকে মহানবী ﷺ খুবই অপছন্দ করেছেন এবং তা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অথচ অন্য এক হাদীসে হাদিয়া আদান-প্রদান করাকে উৎসাহিত করেছেন। যেমন– বলেছেন, তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান-প্রদান কর। এতে পরস্পর ভালবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

এর সমাধানে বলা হয় যে, জাকাত উসুলকারী কর্মচারীকে যা দেওয়া হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে হাদিয়া ছিল না। কেননা, এর অভ্যন্তরে ব্যক্তিস্বার্থ নিহিত রয়েছে ফলে তা ঘুষ ছিল। যদিও একে হাদিয়া বলে নামকরণ করা হয়েছে। গভীরভাবে যাচাই করলে দেখা যাবে, যেখানে 'ঘুষ' আদান-প্রদান করা হয় সেখানে ভালবাসার স্থলে ঘৃণা-বিদ্বেষই প্রকাশ পায়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে পরে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। আর হাদীস– تَهَادَوْا تَحَابُّوْا এটা উত্তরোত্তর স্নেহ ও ভালবাসাকে বৃদ্ধি করে। এতে দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ জড়িত থাকে না। সুতরাং হাদিয়া প্রদান করা উত্তম নীতি। এ হিসেবে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে ঘুষ ও হাদিয়া তথা উপঢৌকন ও উৎকোচ গ্রহণ দু'টি পৃথক পৃথক জিনিস।

কর্মচারীর পক্ষে উপঢৌকন গ্রহণ করা বৈধ কিনা? সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে সরকারি চাকরিরত অবস্থায় কোনো প্রকার হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য হাদীসটি এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তদুপরি হযরত ওমর (রা.) বাহরাইনে নিযুক্ত জাকাত আদায়ের কর্মচারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর প্রাপ্য উপঢৌকন বায়তুল মালে জমা করেছিলেন। উপঢৌকন গ্রহণ করা বৈধ হলে হযরত ওমর (রা.) এরূপ করতেন না। তবে হাদিয়াদাতা যদি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হয় কিংবা তাদের পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া আদান-প্রদানের পূর্ব হতে নিয়ম-রেওয়াজ থাকে, এমতাবস্থায় হাদিয়া দেওয়া বা গ্রহণ করা বৈধ। কেননা, তখন এ ধারণা হবে না যে, এর পেছনে দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ নিহিত রয়েছে। তবে সরকারি কর্মচারী যদি এ কথা বুঝতে পারে যে, এটাকে তার দুর্বলতা হিসেবে ব্যবহার করবে তখন তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। মূল কথা, ব্যক্তি নিজেই ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, তার উপঢৌকনের পেছনে উদ্দেশ্য কি? কিন্তু বর্তমান সমাজের উৎকোচ বা ঘুষ বলতে কোনো বস্তু আর অবৈধ রাখা হয়নি এবং নাম পরিবর্তন করে এটাকে বখশিশ নামে রূপান্তর করা হয়েছে। যেমন– 'সুদ'-কে বলা হয় ইন্টারেস্ট। 'মদ-শরাবকে' বলা হয় ব্রাণ্ডী, মৃতসঞ্জীবনী ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন– وَمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, সরকারি কর্মচারীর পক্ষে কোনোরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করা বৈধ নয়; বরং হারাম।

ইমাম খাত্তাবীর উক্তি دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ كُلَّ اَمْرٍ يُتَذَرَّعُ بِهِ الخ-এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ হারামের মাধ্যমও হারাম এবং ওয়াজিবের মাধ্যমও ওয়াজিব। তার এই নীতিকথা উল্লিখিত হাদীসের বাক্য– هَلَّا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ اُمِّهٖ اَوْ اَبِيْهِ فَيَنْظُرَ اَيُهْدٰى لَهٗ اَمْ لَا দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে বস্তু কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর মাধ্যমে হয় তাও নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সে যদি মা-বাবার ঘরে থাকে, কোনো চাকরি বা দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকে, তখন তার কাছে কোনো হাদিয়া নিশ্চিত আসবে না। কাজেই চাকরিরত অবস্থায় যে হাদিয়া তার কাছে এসেছে তা বৈধ হতে পারে না।

দ্বিতীয় সূত্র হলো– অনেকগুলো চুক্তি তথা আক্‌দের অভ্যন্তরে যে উদ্দেশ্য ও শর্তাবলি থাকে, সেখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এর বিধান ব্যক্তিগত অবস্থায় অর্থাৎ শর্তাবলি না থাকা অবস্থায়ও সে বিধান প্রয়োগ হয় কিনা, যা সমষ্টিগতভাবে হয়ে থাকে। মোটকথা, পৃথক ও সমষ্টি উভয় অবস্থায় বিধান একইরূপ হলে শর্তাবলি অবৈধ হবে না। কিন্তু একইরূপ না হলে তা অবৈধ হবে।

হাদিয়া ও ঘুষের মধ্যে পার্থক্য : হাদিয়া ও ঘুষের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে যা নিম্নরূপ–

১. কোনো স্বার্থ উদ্ধার বা বিনিময় পাওয়ার শর্তে কাউকে কিছু প্রদান করা হলে তাকে رِشْوَةٌ বা ঘুষ বলা হয় আর কোনো বস্তু বিনিময় পাওয়া ব্যতিরেকে নিছক মহব্বত ও ভালবাসার তাগিদে প্রদান করা হলে তাকে هَدِيَّةٌ বলে।

২. হাদিয়া সাধারণত ছোট বড়কে প্রদান করে পক্ষান্তরে ঘুষ ছোট বড় কোনো তারতম্য নেই।

৩. ঘুষের ফলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় পক্ষান্তরে হাদিয়ার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

৪. হাদিয়া উভয় দিক হতে পারে আর ঘুষ একদিক থেকে হয়।

৫. হাদিয়া জায়েজ ও বৈধ আর ঘুষ হারাম ও অবৈধ।

وَعَنْ ١٦٨٨ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مُخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلًا يَاْتِىْ بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৬৮৮. অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে উমাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে আমরা যাকে কোনো কাজে কর্মচারী নিয়োগ করি, সে যদি একটি সুঁচ পরিমাণ বা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র কোনো বস্তু আমাদের নিকট হতে গোপন করে তবে এটা এমন খিয়ানত, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : যে ব্যক্তি কোনো চাকুরি কিংবা দায়িত্বে নিযুক্ত হয়, তার অধীনে যাবতীয় সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব তারই উপর ন্যস্ত থাকে। যেমন– জাকাতের উসুলকৃত সম্পদ, যুদ্ধের ময়দানে গনিমতের মালামাল এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোনো পদে নিয়োজিত থাকা ইত্যাদি। যদি অন্যায়ভাবে এর ব্যবহার করে বা আত্মসাৎ করে তবে সে আমানতে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত হবে। উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ সে কথাটি উল্লেখ করে মানুষদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, এ সমস্ত সম্পদে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র জিনিসও আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন সে নিজেই তা বহন করে নিয়ে আসবে। অর্থাৎ তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। কুরআনে এসেছে যে, وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ, যে যা খেয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٨٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْاٰيَةَ كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِىَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ وَ ذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَقَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَلَا اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৬৮৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত "ওয়াল্লাযীনা ইয়াক্‌নিযূনায যাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা......" [অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সংরক্ষণ করে .....] নাজিল হয়, মুসলমানদের উপর এটা ভারী অনুভব হলো। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি আপনাদের চিন্তা দূর করে দেব। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকটে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী! এ আয়াত আপনার সাহাবীদের কাছে ভারী মনে হচ্ছে। এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জাকাত এ জন্যে ফরজ করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের অবশিষ্ট মাল সম্পদকে পবিত্র করে নেন এবং মিরাস ফরজ করেছেন [এবং আর একটি কথা বলেছেন যা আমি ভুলে গেছি] যাতে সম্পদ তোমাদের পরবর্তীদের জন্যে হয়। রাবী বলেন, এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) [খুশিতে] 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আমি কি তোমাকে বলে দেব না যে, মানুষ যে জিনিস সঞ্চয় করে তন্মধ্যে ভাল জিনিসটি কি? ভাল জিনিস হলো পুণ্যবতী স্ত্রী। যখন তার দিকে তাকায়, সে তাকে সন্তুষ্ট করে, যখন তাকে আদেশ করে, সে তা পালন করে এবং যখন সে তার নিকট হতে দূরে থাকে সে তার অধিকার সংরক্ষণ করে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, সোনা-রুপাকে আরবি পরিভাষায় 'সামানাঈন' বা 'হাজারাঈন' বলা হয়। যদি তা শরিয়তের নির্দেশিত নিসাব পরিমাণে পৌঁছে তখন যে কোথাও যে কোনোভাবে থাকুক না কেন তাতে জাকাত ওয়াজিব তথা ফরজ হয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– 'যারা সোনা-চাঁদি সংরক্ষণ করে এবং তার জাকাত দেয় না' তাদের মারাত্মক পরিণতি হবে বলে যখন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ঘোষণা করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম বিরাট দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কেননা, তাঁরা ধারণা করেছিলেন, সোনা-রুপা সামান্য পরিমাণে থাকলেও জাকাত দিতে হবে। ফলে একদিন মূল সম্পদই তো শেষ হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরামের এ হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন উঠলেন, আপনারা ধৈর্যধারণ করুন, অস্থির হবেন না, আমি অচিরেই রাসূল ﷺ হতে এর যথাযথ ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে আপনাদের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে দেব। অতঃপর তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থার কথা জানালে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জাকাত দেওয়ার বিধানটি তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর কিছু নয়; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা বটে। কেননা, জাকাত না দিলে সমুদয় মাল-সম্পদ অপবিত্র ও হারাম মিশ্রিত থাকে। কিন্তু জাকাত দেওয়ার পর অবশিষ্ট মাল পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়, একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত ওমরকে বললেন, একথা জেনে রেখ যে, মানুষের সঞ্চয় ও সংরক্ষিত বস্তুর মধ্যে পুণ্যবতী স্ত্রীই হলো উত্তম সম্পদ যা সংরক্ষণ যোগ্য। যার মধ্যে এ তিনটি মহৎ গুণ রয়েছে। যেমন– যে রূপবতী তার দিকে তাকালেই আনন্দে চক্ষু জুড়ে যায়, আনুগত্যশীলা ও স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ধন-মাল এবং নিজের সতিত্ব সংরক্ষণকারিণী। এ কারণেই হযরত আলী (রা.) فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً -এর ব্যাখ্যায় বলেন– সতী, সুন্দরী, ষোড়শী তরুণী ও শ্রীলতা সংরক্ষণকারিণী।

كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ -এর ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত আলোচ্য আয়াতটিকে সাহাবায়ে কেরাম এজন্যে ভারী মনে করলেন যে, তারা মনে করেছিলেন, সোনা-রুপা সংরক্ষণ করাই বিপজ্জনক। এর পরিণামে জাহান্নামের আগুনের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অথচ কমবেশ প্রত্যেকের কাছে কিছু না কিছু সোনা-রুপা অবশ্যই আছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই সংশয় ও দুশ্চিন্তার অবসান এরূপে করলেন যে, সোনা-রুপা কিংবা অন্যান্য মাল-সম্পদ সংরক্ষণ বা সঞ্চয় করা কোনো দূষণীয় বস্তু নয়। তবে এটা তখনই দূষণীয় তথা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে যদি এর ন্যায্য হক অর্থাৎ জাকাত আদায় না করা হয়। বস্তুত জাকাত সদকা আদায় করলে তখন আর তা 'কানয'-এর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। ধন-সম্পদ সঞ্চয় বা সংরক্ষণ করা যে বৈধ এর প্রমাণস্বরূপ তিনি মিরাসের কথাটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ তার ত্যাজ্য সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। যদি সে কোনো সম্পদই না রেখে যায় তাহলে ওয়ারিশগণ কিসের উত্তরাধিকারী হবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা মিরাসকে ফরজ করেছেন। আল্লাহর কালামে উত্তরাধিকারীদের অংশও বণ্টন করা হয়েছে। হুযূর ﷺ -এর এ ব্যাখ্যা শুনে খুশিতে হযরত ওমর (রা.) তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন।

اَلْكَنْزُ -এর অর্থ : اَلْكَنْزُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক দিক থেকে এর অর্থ– জমা করা, সঞ্চয় করা, ভূমিতে পুঁতে রাখা। আর اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ আয়াতে اَلْكَنْزُ দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্য বা অন্যান্য মাল-সম্পদ ইত্যাদির জাকাত আদায় না করে তা পুঞ্জীভূত করাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, যে মালের জাকাত আদায় করা হয় না, ইসলামি শরিয়তে তাকে কানয বলা হয়। আর যে মালের জাকাত আদায় করা হয়, তা কানয-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– إِذَا تُوُدِّيَ زَكٰوتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

▮ ইমাম নববী (র.) বলেন, ইবনে জারীরের মতে, যে ধন-সম্পদ হতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় না, কুরআন মাজীদে সে সম্পদকে 'কানয' বলা হয়েছে।

▮ কাযী আয়ায (র.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর বর্ণনা হতে যখন সাহাবীগণ এ কথাটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, যেসব মালের জাকাত দেওয়া হয়, সে মাল সংরক্ষণকরণে কোনো দোষ নেই এবং তা কানযের আওতায় পড়ে না, তখন তাঁরা মাল-সম্পদ সঞ্চয় করার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে দেখে রাসূলে কারীম ﷺ তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন– পার্থিব মাল-সম্পদ সংরক্ষণ করা অপেক্ষা সুন্দরী ও পুণ্যবতী স্ত্রীই উত্তম সম্পদ। কারণ, তা দীর্ঘস্থায়ীও বটে। বস্তুত সোনা, রুপা তখনই উপকারে আসে যখন তাকে নিজের অধিকার হতে সরিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ খরচ করা হয়। পক্ষান্তরে পুণ্যবতী নারী সর্বক্ষণ নিজের কাছে ও অধিকারে থাকে, তার দ্বারা নিজের যেমন মনতুষ্টি হয় তেমনি তাকে দীন ও চরিত্র রক্ষার ঢাল স্বরূপও বলা চলে।

إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন তার পরমা সুন্দরী স্ত্রীর দিকে তাকায়, তখন স্ত্রী তাকে আনন্দিত করে। অর্থাৎ, রূপবতী স্ত্রীই স্বামীর আনন্দের কারণ হয়। কেননা, একদিকে যেমন সে গুণবতী, রূপবতী এবং উত্তম চাল-চলন ও চরিত্রের অধিকারিণী, অপরদিকে যখন স্বামী তাকে কোনো ব্যাপারে নির্দেশ দেয়, সে তা পালন করে এবং যখন স্বামী তার কাছ হতে দূরে থাকে, সে স্বামীর অধিকার সংরক্ষণ করে। আর এসব গুণের অধিকারিণী হওয়ার কারণে স্বামী অপরাপর নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হতে বিরত থাকে, যা দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ حَصَنَ ثُلُثَيْ دِيْنِهِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে তার দুই-তৃতীয়াংশ দীনদারি নিরাপদ করল।

১৬৯০ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَاْتِيْكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُوْنَ فَاِنْ جَاءُوْكُمْ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ وَخَلُّوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُوْنَ فَاِنْ عَدَلُوْا فَلِاَنْفُسِهِمْ وَاِنْ ظَلَمُوْا فَعَلَيْهِمْ وَاَرْضُوْهُمْ فَاِنَّ تَمَامَ زَكٰوتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوْا لَكُمْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৬৯০. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে আতীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন। অতি শীঘ্রই তোমাদের কাছে ছোট একটি আরোহী দল আসবে, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে। যখন এরা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে স্বাগতম জানাবে এবং তারা যা চাইবে তা তাদেরকে উজাড় করে দেবে। যদি তারা সুবিচার করে তবে তাদের কল্যাণ হবে, আর অবিচার করলেও তাদের উপরেই বর্তাবে। তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে, কেননা তোমাদের জাকাতের পরিপূর্ণতা তাদের সন্তুষ্টি, আর তারাও যেন তোমাদের জন্যে দোয়া করে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ জাকাত উসুলকারী কর্মচারীদেরকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে, যেন তারা জুলুম-অত্যাচার করে অন্যায়ভাবে জাকাত আদায় না করে। আর জাকাত প্রদানকারী মালদার ব্যক্তিদেরকে প্রশস্ত মনে সন্তুষ্টচিত্তে জাকাত প্রদান করতে উৎসাহ দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত জাবির বিন আতীক বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শীঘ্রই তোমাদের কাছে জাকাত উসুলকারী কতক লোক আসবে যাদেরকে তোমরা মনে-প্রাণে বরণ করতে রাজি হবে না। কেননা, তারা ন্যায়-নীতিতে জাকাত আদায় করবে না। তবে তোমাদের কর্তব্য হবে এই যে, তোমরা তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগতম জানাবে। কেননা, তারা শাসকের তথা সরকারের প্রতিনিধি। কাজেই তাদেরকে সম্মান করা স্বয়ং শাসককেই সম্মান প্রদর্শন করা। পক্ষান্তরে তাদেরকে অপমান করা, শাসককেই অসম্মান করা; যা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। সুতরাং জাকাতে তারা যেসব বস্তু নিতে চায় তোমরা তা স্বেচ্ছায় প্রদান করবে। অবশ্য তোমাদের সান্ত্বনা এটুকু যে, যদি তারা ইনসাফ ও ন্যায়-নীতিতে জাকাত উসুল করে তবে উভয়ের জন্য কল্যাণ। কিন্তু যদি তারা জুলুম-অত্যাচার করে তখন এর কুফল তাদের উপরই বর্তাবে। আর তোমরা একথা স্মরণ রাখবে যে, তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখাই [যতটুকু সম্ভব] তোমাদের জাকাতের পরিপূর্ণতা অর্জন হবে। আর তারাও তোমাদের আচরণে ও জাকাত প্রদানে তোমাদের জন্য দোয়া করবে। এটাই হলো জাকাত প্রদান ও আদায়ের উত্তম পন্থা।

سَيَاْتِيْكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের مُبْغَضُوْنَ শব্দটি بُغْضٌ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো– ঘৃণিত ও অপ্রিয় বা অপছন্দনীয়। এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ– ১. বাক্যের অর্থ এই যে, ঐ সমস্ত জাকাত আদায়কারী কর্মচারী যাদেরকে দুশ্চরিত্র ও অহংকারের ভিত্তিতে ঘৃণা করত। ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, ঘৃণার ব্যাপারটা প্রকৃতিগত; শরিয়তের ব্যাপার নয়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত কর্মচারী খারাপ আচরণের লোক নন। কিন্তু যেহেতু তারা মানুষের স্বভাবজাত প্রিয়বস্তু মাল-সম্পদ আদায় করেন এ জন্যে প্রকৃতিগতভাবে মানুষ তাদেরকে অপ্রিয় মনে করে। এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য এ জন্যে যে, রাসূল ﷺ স্বয়ং سَيَاْتِيْ অর্থাৎ 'অতিশীঘ্রই তোমাদের কাছে আসবে' শব্দটি বলেছেন। যাতে বুঝা যায় যে, ঐ সমস্ত কর্মচারী আরোহী দল রাসূল ﷺ -এরই নিয়োজিত। রাসূল ﷺ কখনও অহংকারী ও অত্যাচারী কর্মচারী নিয়োগ করবেন না। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কর্মচারীগণ অত্যাচারী ছিলেন না। কারণ, তারা যদি মূলতই অত্যাচারী হতো তবে জাকাতদাতার

জন্যে দোয়ার আদেশ কেমন করে করা হতে পারে। অথচ তাদের জন্যে রাসূলে কারীম ﷺ لِيَدْعُوا لَكُمْ বলে দোয়া করতে বলেছেন।

অথবা, বাক্যটির এ অর্থও হতে পারে যে, রাসূল ﷺ -এর পরে এমন লোক তোমাদের শাসক হবে যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করবে। আর তাদের প্রতিনিধি কর্মচারী জাকাত উসুলকারী দলও সেই একই চরিত্রের হবে। ফলে তারা জাকাত উসুলে ন্যায়-নীতি অনুসরণ করবে না। তবুও তোমাদের উচিত তাদেরকে স্বাগত জানানো ও সন্তুষ্ট করা। আর জুলুম-অত্যাচারের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে। তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট করে বিদায় দেবে। তবে জাকাত প্রদানকারীর জন্যে দোয়া করতে হয়, তাই তারাও তোমাদের জন্যে দোয়া করবে। এটাই হলো উত্তম পন্থা।

وَعَنْ ١٦٩١ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ جَاءَ نَاسٌ يَعْنِيْ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَاْتُوْنَا فَيَظْلِمُوْنَ فَقَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ ظَلَمُوْنَا قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ وَاِنْ ظُلِمْتُمْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৬৯১. অনুবাদ : হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল লোক অর্থাৎ আরব বেদুঈনদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে এসে বলল, জাকাত আদায়কারীদের কতিপয় লোক আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের প্রতি জুলুম করেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের জাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে সন্তুষ্ট করবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমাদের প্রতি জুলুম করে তবুও? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের প্রতি যদি জুলুম করা হয় তবুও তোমরা জাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করবে [অর্থাৎ জাকাত আদায় করবে]। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জাকাত আদায়কারী ব্যক্তি অন্যায়ভাবে দাবি করলেও জাকাত প্রদান করা বন্ধ করা যাবে না। যেমন তিনি বলেন– একবার গ্রাম্য বেদুঈনদের কতিপয় লোক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ অভিযোগ করল যে, সরকারি রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা জাকাত আদায়ের বেলায় তাদের উপর জুলুম করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট করে বিদায় কর। তারা বলল, তারা জুলুম করলেও কি তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ! জুলুম করলেও তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ وَاِنْ ظُلِمْتُمْ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ পাওয়া যায় যে, জাকাত আদায়কারী তহশীলদার বা কর্মচারী অন্যায়ভাবে জাকাত উসুল করলেও তা নীরবে সয়ে নিতে হবে এবং তাদেরকে যে কোনো অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখতে হবে, অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা অযৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

এর জবাবে বলা হয়–

ক. রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অত্যাচারীকে জেনে শুনে এ কাজে নিয়োগ করেননি। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের স্বভাবজাত লোভ ও আসক্তি যে প্রবল এটাও অনস্বীকার্য। এ ছাড়া ইসলামের পূর্বে আরবে কোনো সুসংগঠিত সরকার তো ছিলই না, তদুপরি তাদের সমাজে জাকাত অথবা রাজস্ব প্রদানেও কোনো নিয়ম ছিল না। অপরদিকে জাকাত উসুলকারী কর্মচারীগণ তাদের মাল-সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চাইতেন। এটাই তাদের নিকট অবিচার মনে হতো। নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে কতিপয় গোত্রের লোকদের জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির মূলেও এ কারণটিই প্রধান ছিল।

খ. রাসূল ﷺ সৎচরিত্র ও ন্যায়-নিষ্ঠাবান লোকদেরকেই এ কাজে নিয়োগ করেছেন। তবে কেউ যদি অবিচার করেও থাকে, এটা তার ব্যক্তিগত স্বভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর ফলে অবিচারের প্রতিবাদে জাকাত প্রদান বন্ধ করা যাবে না। অবিচারের কুফল তারা নিজেরাই ভোগ করবে। মনে রাখতে হবে, জাকাত উসুলকারীরা জুলুম করলেও তাদের সন্তুষ্টি বিধান করা ওয়াজিব। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বের হাদীসে স্পষ্টত বলেছেন– فَاِنَّ تَمَامَ زَكٰوتِكُمْ رِضَاهُمْ অর্থাৎ তোমাদের জাকাতের পরিপূর্ণতা তাদের সন্তুষ্টির উপরই নির্ভরশীল।

গ. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসের মধ্যে وَاِنْ শব্দটি শর্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে এর 'জাযা' উহ্য মেনে নেওয়া প্রমাণিত হয়। তখন অর্থ হবে– 'তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে, তোমাদের ধারণা মতে যদিও তোমাদের উপর জুলুমও হয়'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জুলুম করলে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ওয়াজিব নয়। এ ধরনের বাক্য নবী ﷺ -এর অপর হাদীসেও পাওয়া যায়। যেমন– اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ মোটকথা সর্বাবস্থায় জাকাত বা রাজস্ব উসুলকারীর কাছেই প্রদান করতে হবে, অন্য কারো কাছে নয়; সে অবিচার করলেও তাকে দিতে হবে।

وَعَنْ ١٦٩٢ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ قَالَ لَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৬৯২. অনুবাদ : হযরত বশীর ইবনে খাসাসিয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল!] জাকাত আদায়কারীগণ আমাদের উপরে সীমালঙ্ঘন করে থাকেন। আমাদের প্রতি যে পরিমাণ সীমালঙ্ঘন করেন আমরা কি সে পরিমাণ আমাদের মাল গোপন করে রাখব? রাসূল ﷺ বললেন, না! –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মালের অধিকারী জাকাত উসুলকারী কর্মচারী হতে কিছু সম্পদ গোপন রাখা এবং তার জাকাত আদায় না করা, খেয়ানত ও প্রতারণার শামিল। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ জাকাত উসুলে মালিকের উপরে জুলুম-অবিচার করতেন। তাই তারা নিজেদের কিছু মাল গোপন রেখে অবশিষ্ট মালের জাকাত দেওয়ার জন্যে নবী কারীম ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। মূলত জাকাত উসূলকারীগণ তাদের মালের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চাইতেন বলে লোকেরা একে জুলুম ধারণা করতেন। বস্তুত ঘটনা এরূপ নয়, রাসূলুল্লাহর নিযুক্ত কর্মচারীগণ স্বভাবতই জালিম ছিলেন না।

وَعَنْ ١٦٩٣ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِهٖ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ)

১৬৯৩. অনুবাদ : হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে জাকাত আদায়কারী কর্মচারী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে বিজয় লাভকারী গাজীর মতো। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ দীনের একটা বিশেষ অংশ। কখনো তা ফরজে আইন– এ পরিণত হয়। আর জাকাতও 'ফরজে আইন'। জাকাত দ্বারা ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত রক্ষা পায় এবং জিহাদ দ্বারা মূল দীনের সংরক্ষণ স্থাপিত হয়। ফলে উভয়টি দীন-ইসলাম সংরক্ষণে একই ধরনের সহায়ক। এ হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– জাকাত উসুলকারী কর্মচারী যিনি ন্যায়নীতির সাথে তা আদায় করে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজীর ন্যায়, যতক্ষণ সে জিহাদে লিপ্ত থাকে। মোটকথা, গাজী ও জাকাত উসুলকারী কর্মচারীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে এক সমান।

وَعَنْ ١٦٩٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّا فِىْ دُوْرِهِمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৬৯৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে এবং তিনি [পিতামহ] রাসূলে কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, [কর্মচারী কর্তৃক] আনানোও যাবে না [মালিক কর্তৃক] দূরে সরানোও যাবে না, আর তাদের জাকাত তাদের বাড়িতে ছাড়া আদায় করা যাবে না। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাকাত উসুলকারী কর্মচারী মহল্লা বা গ্রামের এক প্রান্তে বসে থাকবে এবং মালের মালিককে স্ব-স্ব জাকাতের জিনিস গরু, ছাগল বা অন্যান্য জিনিস তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাধ্য করা অথবা জাকাতদাতা তার পশু কিংবা অন্যান্য জিনিসগুলো নিয়ে নিজের বস্তী এলাকা হতে দূরে, অন্যত্র কোথাও সরে পড়া এবং উসুলকারী কর্মচারীকে তথায় গিয়ে জাকাত নিয়ে আসতে বাধ্য করা প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেছেন, জাকাত উসুলকারী ও জাকাতদাতা কেউই এ দু'টির কোনোটি করতে পারবে না। সুতরাং এ দুটির সমন্বয় সাধনে তিনি বলেছেন, প্রত্যেকের সদকা, জাকাত তাদের নিজ নিজ বাড়ি-ঘরে গিয়েই উসুল করতে হবে। ফলে কর্মচারী তহশীলদারও মহল্লার এক প্রান্তে বসে থাকতে পারবে না। আর জাকাত প্রদানকারী ব্যক্তিও গবাদি পশুকে নিজ বাসস্থান হতে দূরে সরিয়ে নিতে পারবে না।

اَلْجَلَبُ ও اَلْجَنَبُ-এর পরিচয় ও পদ্ধতিদ্বয় : جَلَبٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– টেনে আনা, একস্থান থেকে অন্যস্থানে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। পরিভাষায় جَلَبٌ বলা হয়–

هُوَ نُزُوْلُ السَّاعِيْ مَحَلًّا عَنِ الْمَاشِيَةِ وَعَدَمُ اِتْيَانِهٖ اِلٰى اَمَاكِنِ الْمُزَكِّيْنَ لِاَخْذِ الصَّدَقَاتِ

جَلَبٌ-এর পদ্ধতি : জাকাতের ক্ষেত্রে جَلَبٌ-এর দু'টো পদ্ধতি হতে পারে। যেমন–

১. একটি পদ্ধতি হলো–

اَنْ يَنْزِلَ السَّاعِيْ مَحَلًّا بَعِيْدًا عَنِ الْمَاشِيَةِ وَلَا يَاْتِيْ اَمَاكِنَهُمْ لِاَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَلٰكِنْ يَاْمُرُهُمْ اَنْ يَجْلِبُوْا نَعَمَهُمْ اِلَيْهِ.

অর্থাৎ জাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা দূরবর্তী কোনো অবস্থানে থেকে জাকাতদাতা মালিককে তার দূরবর্তী দপ্তরে জাকাতের সম্পদ নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করা।

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ : এতে জাকাতদাতার কষ্ট হয়। এ জন্যে রাসূল ﷺ বলেছেন– وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّا فِيْ دُوْرِهِمْ

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো– اِلْحَاقُ مَالٍ بِمَالٍ اٰخَرَ لِاِتْمَامِ النِّصَابِ

অর্থাৎ নিসাব পূর্ণ করণার্থে এক ধরনের পশু বা মালের সাথে অন্য রকম পশু বা মালকে একত্রিত করা। অথবা, দু'জন জাকাতদাতার মালকে একত্রিত করে নিসাব পূর্ণ করা।

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ : এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কারণ ইসলামে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।

جَنَبٌ-এর পরিচয় : جَنَبٌ শব্দটিও বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, দূরে সরিয়ে নেওয়া।

আর পরিভাষায় جَنَبٌ হলো– يَنْزِلُ السَّاعِيْ بِاَقْصٰى مَحَالِ اَهْلِ الصَّدَقَةِ

جَنَبٌ-এর পদ্ধতি : জাকাতের ক্ষেত্রে جَنَبٌ-এর পদ্ধতি হচ্ছে দুটি। যথা–

১. একটি পদ্ধতি হলো– اِحْتِبَاسُ الْبَهَائِمِ بَعِيْدًا عَنِ الدَّارِ

অর্থাৎ জাকাতের পশুগুলোকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে জাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাকে সেখানে যেতে বলা।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো– كِتْمَانُ الْبَهَائِمِ অর্থাৎ জাকাত প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় পশুগুলোকে ময়দানে ছেড়ে দেওয়া যাতে আদায়কারী কর্মকর্তার গণনা করতে কষ্ট হয়।

হুকুম : এগুলোর কোনোটাই ইসলামে জায়েজ নেই। কারণ, প্রথম পদ্ধতিতে জাকাত আদায়কারী কর্মকর্তার কষ্ট হয় আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মাল গোপন করা হয়।

اَبِيْهِ ও جَدِّهٖ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আমর ইবনে শুয়াইবের বংশ পরিচয় হলো–

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

এই স্থলে اَبِيْهِ-এর "ه" সর্বনামটির مَرْجِعٌ [প্রত্যাবর্তন স্থল] হলো عمرو অর্থাৎ আমর তার পিতা শুয়াইব হতে বর্ণনা করেছেন। আর جَدِّهٖ-এর মধ্যকার "ه" সর্বনামটির مَرْجِعٌ সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে–

ক. যদি اَبِيْهِ وَجَدِّهٖ দ্বারা স্বয়ং আমরের পিতা ও দাদা উদ্দেশ্য হয়, তখন বাক্যটি এভাবে হবে, আমর স্বীয় পিতা শুয়াইব হতে এবং শুয়াইব নিজের পিতা তথা আমরের দাদা মুহাম্মদ হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বিশারদদের মতে, তখন এ সনদে বর্ণিত হাদীস 'মুরসাল' হবে। কেননা, আমরের দাদা মুহাম্মদ (র.) নবী করীম ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি।

খ. আর যদি أَبِيهِ وَجَدِّهِ -এর যমীর দ্বারা শুয়াইবের পিতা মুহাম্মদ ও দাদা আবদুল্লাহ উদ্দেশ্য হয়, তখন বাক্যটি এভাবে হবে– শুয়াইব তার পিতা মুহাম্মদ হতে এবং মুহাম্মদ শুয়াইবের দাদা আবদুল্লাহ হবে, তখন হাদীসবেত্তাগণের মতে এ সনদে বর্ণিত হাদীস 'মুনকাতি' হবে। কেননা, শুয়াইব নিজের দাদা আবদুল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। এ অবস্থার হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। এ কারণে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) উক্ত সনদে বর্ণিত হাদীস স্ব-স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেননি।

وَعَنْ ١٦٩٥ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكٰوةَ فِيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةً اَنَّهُمْ وَقَفُوْهُ عَلٰى ابْنِ عُمَرَ -

১৬৯৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি মাল অর্জন করলে তাতে জাকাত দিতে হবে না। যতক্ষণ এর উপরে বছর উত্তীর্ণ না হয়ে যায়। –[তিরমিযী]

তিরমিযী (র.) একদল হাদীস বিশারদের নাম উল্লেখ করেন যারা হাদীসটি ওমরের উপর মওকূফ করেছেন। অর্থাৎ ইবনে ওমরের উক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বছরের মাঝখানে নতুন জাতীয় কোনো মাল-সম্পদের মালিক হয়, তার সেই হস্তগত নতুন মালের জাকাত দিতে হবে না, যে পর্যন্ত এর উপর এক বৎসর অতিবাহিত না হয়ে যায়। অর্থাৎ বছরের মাঝখানে হস্তগত মালের জন্যে সে তারিখ হতে এক বৎসরের হিসাব করতে হবে। এটাই হলো হাদীসের মূল বক্তব্য।

মালে মুসতাফাদের সংজ্ঞা : বছরের মাঝখানে যে কোনো সময় মূলধন ব্যতীত নতুনভাবে কোনো মাল হস্তগত হলে তাকে মালে মুসতাফাদ বলা হয়। যেমন কারও চল্লিশটি বকরি রয়েছে এবং তাতে ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। অতঃপর সে ক্রয় সূত্রে বা ওয়ারিশ সূত্রে আরও চল্লিশটি বকরির মালিক হলো। এ শেষোক্ত চল্লিশটি বকরি হলো মালে মুস্তাফাদ বা নতুন অর্জিত মাল। এ নতুন মালের এক বছর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত জাকাত আবশ্যক হবে না বলে অত্র হাদীসে বলা হয়েছে।

মালে মুস্তাফাদের জাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : মালে মুস্তাফাদকে প্রথমে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

ক. যদি কারো নিকট কোনো মাল থাকে এবং বছরের মাঝখানে এর বিপরীত জাতীয় কোনো মাল তার অর্জিত হয়। এ মালে মুস্তাফাদকে আসল মালের সাথে মিলানো যাবে না। সকল ইমামের এ বিষয়ে ঐকমত্য। যেমন– কারো কাছে উট আছে, বছরের মাঝখানে তার গরু, ছাগল অর্জিত হলো। অথচ এটা আসল মালের ব্যতিক্রম শ্রেণীর মাল। কাজেই এটাকে প্রথম মাল অর্থাৎ উটের সাথে একত্রিত করা যাবে না, বরং এ মালে মুস্তাফাদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে হিসাব রেখে বর্ষপূর্তি করতে হবে।

খ. যদি মালে মুস্তাফাদ আসল মালের সমশ্রেণী হয়, তবে এটাও এক প্রকার মালে মুস্তাফাদ। এটাও আবার দু' ধরনের হতে পারে। প্রথমত যদি সে অর্জিত মাল তার আসল মাল হতে অর্জিত হয়, তখন তার এ অর্জিত মালের জন্যে স্বতন্ত্রভাবে বর্ষপূর্তির আবশ্যক হবে না; বরং আসল মালের বর্ষ শেষে এর সাথে একত্রিত করে সে অর্জিত মালেরও জাকাত দিতে হবে, যদিও শেষে অর্জিত মালে এক বছর পূরণ হয়নি।

দ্বিতীয়ত মালে মুস্তাফাদ যদিও আসল মালের সমশ্রেণী বা সমজাতীয়; কিন্তু আসল মাল হতে বৃদ্ধি পায়নি; বরং অন্যকোনো সূত্রে অর্জিত হয়েছে। যেমন– খরিদ সূত্রে কিংবা হেবা, দান সূত্রে কিংবা ওয়ারিশ সূত্রে। এ ধরনের মালে মুস্তাফাদের জাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, উক্ত মালে মুস্তাফাদ আসল মালের অধীন হয়ে জাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং পৃথকভাবে বছর পূর্তি হয়ে স্বতন্ত্রভাবে এর জাকাত আদায় করতে হবে। আলোচ্য হাদীসে সেই কথাই বলা হয়েছে।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَثَوْرِيْ وَحَسَنْ بَصْرِيْ وَغَيْرِهِمْ : কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, হাসান বসরী ও হাসান ইবনে সালেহ (র.) প্রমুখ বলেন, মালে মুস্তাফাদ আসল মালের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আসল মালের বর্ষপূর্তি হলেই এর সাথে মুস্তাফাদ মালসহ সমুদয় মালের জাকাত দিতে হবে। যেমন– কারো কাছে ৪০টি বকরি আছে, ছয় মাস পরে ৪১টি বকরি মুস্তাফাদ হিসেবে অর্জিত হলো। সুতরাং ৪০টি বকরির উপরে যখন বর্ষপূর্তি হবে, তখন মুস্তাফাদ ৪১টিরও জাকাত আদায় করতে হবে। –[মিরকাত]

তাঁদের দলিল : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِعْلَمُوْا اَنَّ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تُؤَدُّوْنَ فِيْهِ زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ (اَلْحَدِيْثُ) ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কারো নিকট এক হাজার টাকা থাকে এবং প্রত্যহ তার কাছে দুই হাজার, তিন হাজার, চার হাজার ও পাঁচ হাজার টাকা আসে। আর প্রতিটি টাকার অংকের জন্যে যদি পৃথক পৃথক বর্ষপূর্তি হিসাব রাখতে হয়, তবে এটা নিঃসন্দেহে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করবে। অথচ ইসলামে কোনো কিছুই কঠিন করা হয়নি। কাজেই সৃষ্ট সমস্যা ও জটিলতা দূর করার জন্যে বলা হয় যে, আসল মালের উপর বর্ষপূর্তি হলে, যদি তাতে জাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে, তখন সমুদয় মালের উপরই জাকাত ওয়াজিব হবে। এ মতের সমর্থনে হযরত উসমান ও ইবনে আব্বাস (রা.)-সহ বহু তাবেয়ীনের বর্ণনাও পাওয়া যায়।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের পেশকৃত তিরমিযীর হাদীসটি সম্পর্কে বলা যায় যে, ১. এর অন্যতম রাবী আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম দ্বা'ঈফ। ২. আর বস্তুত আলোচ্য হাদীসে যে মালে মুস্তাফাদের কথা বলা হয়েছে, তা সে মুস্তাফাদ অর্থ নয়, যে মুস্তাফাদ সম্পর্কে ফকীহগণ মতভেদ করছেন; বরং এতে আভিধানিক অর্থে মুস্তাফাদ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এইমাত্র সদ্য মালদার হয়েছে তথা মাল সম্পদ অর্জন করেছে, এক বৎসর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত তাতে জাকাত দিতে হবে না।

রাবী পরিচিতি :

১. **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) :** নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ আবদুর রহমান, পিতার নাম হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। মাতার নাম– যয়নব বিনতে মাযউন।

২. **নসবনামা :** বংশ পরম্পরা হলো– আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আব্দুল উয্যা ইবনে রাবাহ ইবনে কুরত ইবনে রাজাহ ইবনে আদী ইবনে আদী ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই। তাঁর নবম পুরুষ রাসূলের সাথে মিলে যায়।

৩. **জন্ম :** তিনি ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তথা নবুয়তের দ্বিতীয় বছর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

৪. **ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত :** নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর তিনি স্বীয় পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১৩তম বছরে হিজরত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১১ বছর।

৫. **জিহাদে অংশগ্রহণ :** বদর ও ওহুদে তিনি বয়স কম হওয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে পরবর্তীতে তিনি সকল জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ইরান, সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো অভিযানে বীরত্বের পরিচয় দেন।

৬. **চরিত্র :** তিনি বহুগুণের আধার ছিলেন। তিনি আল্লাহভীতি, রাসূল প্রেম, সুন্নাহর অনুসরণ, ইবাদতের একাগ্রচিত্ততা, বদান্যতা, আত্মত্যাগ, বিনয়, অল্পে তুষ্টি ও স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত মাইমূন ইবনে মেহরান (রা.) বলেন– مَا رَاَيْتُ اَوْرَعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ "আমি ইবনে ওমরের চেয়ে ধর্মভীরু কাউকে দেখিনি"।

৭. **হাদীসের সংখ্যা :** তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০টি। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে দ্বিতীয়। মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস ১৭০টি। আর এককভাবে বুখারীতে ৮১টি আর মুসলিমে ৩১টি হাদীস রয়েছে।

৮. **ইন্তেকাল :** তিনি হিজরি ৭৩/৭৪ সালে, ৮৩/৮৪ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযার নামাজে ইমামতি করেন তৎকালীন গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। ইবনে ওমর (রা.)-এর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে হিলে দাফন করতে চাইলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বাধা দেওয়ার কারণে মতান্তরে যতোয়া/মোহাচ্ছাব/কাঘ নামক স্থানে দাফন করা হয়।

١٦٩٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهٖ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهٗ فِىْ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

১৬৯৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বর্ষপূর্তির পূর্বে আগাম জাকাত দেওয়া যায় কিনা? সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে এর অনুমতি দিলেন। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অর্থ– সম্পদ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নিসাব পরিমাণ হলে– জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত হলো বর্ষে পূর্তি হওয়া। কাজেই বর্ষ পূর্তি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি বর্ষপূর্তি হওয়ার পূর্বেই জাকাত দিতে চায় কিংবা মাল-সম্পদের একটা আনুমানিক হিসাব করে আগাম জাকাত আদায় করে, তবে তার এভাবে

জাকাত দেওয়া বৈধ হবে কিনা? হযরত আব্বাস (রা.) এ কথাটি নবী করীম ﷺ -এর কাছে জানতে চাইলেন। জবাবে তিনি তাঁকে এর অনুমতি দিয়েছেন।

আগাম জাকাত প্রদানের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ : বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে জাকাত প্রদান করা জায়েজ আছে কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ : ইমাম মালেক (র.) বলেন, বর্ষপূর্তির পূর্বে জাকাত আদায় করা জায়েজ নেই। অর্থাৎ পূর্বে আদায় করলেও বর্ষপূর্তির পর পুনরায় আদায় করতে হবে। (তাঁর গ্রন্থ) মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে– لَا زَكٰوةَ فِىْ مَالٍ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ অর্থাৎ বর্ষপূর্তি হওয়ার আগে কোনো মালের জাকাত দিতে হয় না।

এ ছাড়া তিনি নামাজের উপর কিয়াস করে বলেন, ওয়াক্তের আগে যেমন নামাজ পড়া জায়েজ নেই; বরং পড়লেও ওয়াক্ত আসলে পুনঃ পড়তে হবে। অনুরূপভাবে জাকাত ফরজ হয় বর্ষপূর্তি হলে; কাজেই বর্ষপূর্তির আগে আদায় করলেও বর্ষপূর্তি শেষে পুনরায় আদায় করতে হবে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : ইমাম শাফেয়ী, আবূ হানীফা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মতে, বর্ষপূর্তির পূর্বে আগাম প্রদান করলেও জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা, জাকাত আদায়ের জন্যে বর্ষপূর্তি হওয়া শর্ত নয়; বরং মাল বৃদ্ধি পাওয়া এবং নিসাব পরিমাণ হওয়াই শর্ত। তবে অনুরূপ মালে বর্ষ শেষে জাকাত দেওয়া ওয়াজিব। 'বর্ষপূর্তির আগে জাকাত দেওয়া যাবে না বা দিলেও আদায় হবে না' এমন কোনো কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ অভিমত হলো– শুধু এক বছরের আগাম জাকাত দেওয়া জায়েজ, এর অধিককালের জায়েজ নেই।

مَذْهَبُ اِمَامِ اَحْمَدَ : ইমাম আহমদ (র.) বলেন, একত্রে দু'বছরের জাকাত অগ্রিম দেওয়া যায়, এর বেশি কালের জায়েজ নেই। তাঁর দলিল হলো নবী করীম ﷺ হযরত আব্বাস (রা.) হতে একসাথে দু'বৎসরের অগ্রিম জাকাত গ্রহণ করেছিলেন।

ইমাম মালেকের দলিলের জবাব : ইমাম মালেকের অভিমতের সমর্থনে কোনো দলিল নেই। অথচ আমরা পূর্বেই বলেছি, জাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে বর্ষপূর্তি হওয়া শর্ত নয়; বরং নিসাব পরিমাণ মাল হওয়া শর্ত।

দ্বিতীয়ত জাকাতকে নামাজের সাথে কিয়াস করা জায়েজ হবে না। কেননা নামাজের জন্যে 'ওয়াক্ত' হলো সবব বা শর্ত, আর জাকাতের জন্যে মাল বৃদ্ধি হওয়া সবব বা শর্ত। কাজেই উভয়টির শর্ত পৃথক পৃথক।

রাবী পরিচিতি :

১. **হযরত আলী (রা.) :** নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান, আবূ তুরাব। মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। উপাধি মুরতাজা, হায়দার, আসাদুল্লাহ। আবদুল্লাহ নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি হাশেমী বংশোদ্ভূত এবং রাসূল ﷺ -এর চাচাতো ভাই।

২. **বংশানুক্রম :** আলী ইবনে আবী তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই আল-কুরাইশী।

৩. **জন্ম :** তিনি ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রাসূলে কারীম ﷺ নবুয়ত লাভের দশ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি একবার রাসূল ﷺ হযরত খাদীজা (রা.)-কে নামাজ পড়তে দেখে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, এটা আল্লাহর দীন। হযরত খাদীজা (রা.) তাকে দাওয়াত দিলেন। তখনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ১০ বছর।

৫. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** হযরত আলী (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীস–

اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ (اَسَدُ الْغَابَةِ ج - ٤)

তিনি আরবি ব্যাকরণের প্রবর্তক। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন– اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وعلانية আয়াতটি হযরত আলী (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়।

৬. **বর্ণিত হাদীস :** তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৮৬ টি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে ২০টি আর এককভাবে বুখারী (র.) ৯টি এবং মুসলিম (র.) ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৭. **জিহাদে অংশ গ্রহণ :** তিনি তাবূক ব্যতীত প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাবূক যুদ্ধে তিনি মদীনায় রাসূল পরিবারের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন–

اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى

৮. বিবাহ : তিনি রাসূল– দুহিতা, সাইয়্যিদাতু আহলিল জান্নাহ হযরত ফাতিমা যুহরা (রা.)-কে বিবাহ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে অন্য বিবাহ করেন।

৯. খেলাফত : হযরত উসমান (রা.)-এর শহীদ হওয়ার পর তিনি ৩৫ হিজরিতে খেলাফতের মসনদে আসীন হন। প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ এই দায়িত্ব পালন করেন।

১০. ইন্তেকাল : হযরত আলী (রা.) হিজরি ৪০ সনের ১৮ই রমজান ফজরের নামাজের সময় খারিজী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম কর্তৃক তলোয়ার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং তিনদিন পর শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। কূফার জামে মসজিদের পাশে মতান্তরে নাজফে আশরাফে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

১৬৯৭. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ فِيْ إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ الْمُثَنّٰى بْنَ الصَّبَاحِ ضَعِيْفٌ .

১৬৯৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল ﷺ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন– সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো এতিমের অভিভাবক হয়েছে, যার সম্পদ রয়েছে, সে যেন ঐ মাল-সম্পদ ব্যবসায় খাটায় এবং এমনিতেই ফেলে না রাখে; যাতে জাকাত ঐ মালকে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। –[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে কথা আছে। কেননা-এর অন্যতম রাবী মুসান্না ইবনে সাব্বাহ য'ঈফ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কেউ কোনো এতিমের অভিভাবক হলে, তার জান-মালসহ যাবতীয় বিষয়ে দায়িত্বশীল। এতিমের মাল-সম্পদকে অন্যায়ভাবে ভোগ করা কিংবা তাদেরকে যথাযথভাবে লালনপালন না করার ব্যাপারে কুরআনে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। অপর দিকে মাল-সম্পদের জাকাত আদায় করা ফরজ, অন্যথা পরকালে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, এতিমের মাল নিসাব পরিমাণ হলে, তার অভিভাবক এতে জাকাত আদায় করতে হবে কিনা? এ প্রসঙ্গে একবার নবী ﷺ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বললেন, তোমরা যে এতিমের মুরব্বী বা অভিভাবক আছ বা হয়েছে, তোমাদের একান্ত উচিত সেই মাল-সম্পদকে কোনো ব্যবসা-তেজারতে খাটিয়ে বৃদ্ধি করতে থাকা, এমনিতেই ফেলে না রাখা। কেননা, মূলধন হতে প্রতি বৎসর জাকাত আদায় করতে থাকলে, অবশেষে তা হ্রাস পেতে পেতে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এতিমের সম্পদে জাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : এতিমের সম্পদে জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে, এতিমের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব।

হযরত ওমর, আলী, আয়েশা ও ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণও এ মত পোষণ করেন। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ - (تِرْمِذِيْ)

এখানে বলা হয়েছে যে, এতিমের সম্পদকে যদি ব্যবসার মাধ্যমে বৃদ্ধি করা না হয়, তাহলে জাকাত দিতে দিতে একদিন তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এতিমের সম্পদেও জাকাত ওয়াজিব।

مَذْهَبُ إِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ ثَوْرِيْ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَشُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শুরাইহ, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখয়ী, হাসান বসরী, আবূ ওয়ায়িল ও শা'বী (র.) প্রমুখের মতে এতিমের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব নয়। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, যার উপর নামাজ ফরজ হয়নি, তার উপরে জাকাত ফরজ হয় না। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন–

১. إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ (أَبُوْ دَاوُدَ ، اَلنَّسَائِيْ ، اَلْحَاكِمُ)

٢. إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيْمِ فَقَالَ احْصُ زَكٰوةَ مَالِهِ وَلَا تُزَكِّيْهِ فَإِذَا بَلَغَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ (ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ)

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাব : হানাফীদের পক্ষ হতে শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ প্রমুখ ইমামদের দলিলের জবাব নিম্নরূপ–

ক. আমর বিন শুয়াইব বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এ হাদীসটির সনদে ত্রুটি আছে। কেননা, হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুসান্না ইবনে আস-সাববাহ নামী বর্ণনাকারী দুর্বল। ইমাম নাসায়ী (র.)-ও বলেছেন, হাদীসটি পরিত্যক্ত।

খ. শামসুল আইম্মা প্রমুখ আলেমের মতে, হাদীসে উল্লিখিত صَدَقَةٌ শব্দটি نَفَقَةٌ [খোর-পোষ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং রুকনুদ্দীন ইমাম যাদাহ বলেছেন, اَلصَّدَقَةُ هِيَ النَّفَقَةُ ; কেননা, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– نَفَقَةُ الْمَرْءِ عَلٰى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ মুসলিম শরীফে একটি হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلٰى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ কাজেই হাদীসে উল্লিখিত صَدَقَةٌ শব্দটি زَكٰوةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং نفقة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে প্রমাণিত হলো যে, এতিমের সম্পদে জাকাত ওয়াজিব নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٦٩٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَإِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর পরে খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন আরবদের মধ্যে যারা কুফরি করার কুফরি করল [অর্থাৎ জাকাত দিতে অস্বীকার করল। ফলে খলিফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন]। তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, আপনি লোকদের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে তখন পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত তারা কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বলল। ফলে সে ব্যক্তি আমার কাছ হতে জান ও মাল নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের নীতি যথাস্থানে বলবৎ থাকবে। [তার অন্তরে কি আছে।] এর হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর উপর। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন– আল্লাহর কসম, যারা নামাজ ও জাকাতের মাঝে পার্থক্য করে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব [অর্থাৎ নামাজ পড়তে স্বীকার করে কিন্তু জাকাত দিতে অস্বীকার করে]। কেননা, জাকাত হলো মালের হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি বকরির বাচ্চাও জাকাত হিসেবে প্রদান করতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় প্রদান করত, আমি তার জন্যেও তাদের সাথে যুদ্ধ করব। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের জন্যে আবূ বকর (রা.)-এর অন্তরকে খুলে দিয়েছেন এবং এটাও বুঝতে পারলাম যে, তিনিই সঠিক সিদ্ধান্তের উপর আছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর মুসলমানের ঐকমত্যে হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় ইয়ামামার অধিবাসীগণ দলবদ্ধ হয়ে জাকাত দিতে অস্বীকার করল। ফলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) আপত্তি তুলে বললেন– আপনি এসব লোকের সাথে কিরূপে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী করীম ﷺ বলেছেন– "আমাকে তখন পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালিমায়ে বিশ্বাসী হয়ে মুখে উচ্চরণ না করে। ফলে যে ব্যক্তি মুখে তা উচ্চারণ করল, তারা তাদের জান-মাল ইত্যাদি আমার নিকট হতে নিরাপদ করে নিল। কিন্তু ইসলামের দাবি যথাস্থানে বহাল থাকবে। অর্থাৎ, ইসলামের দাবি অনুসারে দণ্ডবিধি তার উপর কার্যকর করার প্রয়োজন হলে তা যথাবিহিত কার্যকর হবে। এরপরও যদি অন্তরে কুফরি গোপন রাখে, তবে তার হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর উপরে সোপর্দ; আমার উপরে নয়।" উত্তরে খলিফা আবূ বকর (রা.) দৃঢ়তার সাথে বললেন– আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যারা নামাজ ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে অর্থাৎ নামাজকে ফরজ মনে করে এবং আদায়ও করে। আর জাকাতকে ফরজ মনে করে না এবং আদায়ও করে না, এমন সব লোকের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব। কারণ, জাকাত হলো মাল-সম্পদের হক, যা আদায় করা ফরজ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যদি তারা একটি বকরির বাচ্চা উসুল করতেও আমাকে বাধা দেয়, যা নবী করীম ﷺ -এর জমানায় তারা প্রদান করত, আর এখন আমাকে প্রদান করতে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যেও তাদের সাথে যুদ্ধ করব। এভাবে উভয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর হযরত ওমর (রা.) বলে উঠলেন, এতক্ষণে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় যুদ্ধের জন্যে আবূ বকর (রা.)-এর বক্ষকে খুলে দিয়েছেন এবং আমি এটাও বুঝতে পারলাম যে, তিনি সঠিক সত্যপথের উপর রয়েছেন।

وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলের ﷺ ইন্তেকালের পর কতিপয় মুসলমান পুনরায় কুফরিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। মূলত আন্তরিক দিক থেকে আগে থেকেই তারা কাফের ছিল, যদিও বাহ্যিক দিক থেকে তাদেরকে মুসলমান মনে হয়েছে। হাদীসে وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ বলে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

কাযী আয়ায বলেন, রাসূলের ﷺ ইন্তেকালের পর যারা ইসলাম ত্যাগ করেছিল, তাদেরকেই كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ বুঝানো হয়েছে। তারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন–

১. مُرْتَدِّيْن : একদল সরাসরি ইসলাম ত্যাগ করে মূর্তি পুজা শুরু করেছিল।

২. مُدَّعِيْنِ نُبُوَّة : একদল মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামা কাজ্জাব ও আসওয়াদ আনাসীর অনুসরণ করেছিল।

৩. مُنْكِرِيْنِ زَكٰوة : আরেকটি দল ছিল যারা ইসলামের উপরই আস্থাশীল কিন্তু জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারা মনে করত, নবীর ﷺ যুগেই জাকাত ফরজ ছিল; এখন আর তা ফরজ নেই।

তৃতীয় দলের লোক যারা নামাজ ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে জাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু কুফরিতে প্রত্যাবর্তন করেনি, হযরত আবূ বকর (রা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে জাকাত দানে বাধ্য করেন।

জাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে আবূ বকর (রা.) কিভাবে যুদ্ধ করলেন : হযরত আবূ বকর (রা.) শুধুমাত্র জাকাত অস্বীকার করার কারণে তাদের সাথে কেন যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিসগণ বলেন–

১. রাসূলের ﷺ বাণী– بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ -এর ভিত্তিতে কালিমা, নামাজ, রোজা ও হজের সাথে জাকাতও ইসলামের অন্যতম ভিত্তি। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করলে ঈমানদার দাবি করা যাবে না। মূলত তারা কাফের ছিল। আর কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা যায়। এ জন্যেই আবূ বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

২. ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম রাজস্ব আয়ের উৎস জাকাত বায়তুল মালে জমা না হলে ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে। তাই আবূ বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে জাকাত প্রদানে বাধ্য করেন।

৩. জাকাত ও নামাজ উভয়ই ইসলামের রুকন। সালাত ও জাকাতের কথা একই সাথে কুরআনের বহু জায়গায় বলা হয়েছে। অতএব, উভয়ের বিধান এক। সালাত অস্বীকার করলেও তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব।

যুদ্ধের ফলাফল : রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পর ইয়ামামার একদল লোক দলবদ্ধভাবে জাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযরত আবূ বকর (রা.) মনে করলেন যে, ইসলামি সমাজের দেহ হতে এ ব্যাধি নির্মূল না করলে এটা সমাজের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বে। তাই তিনি সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাস্ত করে জাকাত দিতে বাধ্য করলেন। নতুবা লোক একের পর এক ইসলামের সমস্ত রোকনকেই অস্বীকার করত এবং সূতিকাগারেই ইসলামের বিনাশ হতো। এটি যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মাইলফলক হিসেবে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাবে।

হযরত আবূ বকর (রা.) এ কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং তার প্রতি সাহাবায়ে কিরামের সমর্থন লাভ করে এটাই প্রমাণ করলেন যে, ইসলামের কোনো রোকনকে অস্বীকার করা কুফরি। এরূপ ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে ইসলাম ত্যাগীর নামান্তর, তাকে হত্যা করা শরিয়তের নির্দেশ।

হযরত ওমর (রা.) কেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বিরোধিতা করেছিলেন? : মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ ـ

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে– حَتّٰى يَشْهَدُوْا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوْا بِمَا جِئْتُ بِهٖ

এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শরিয়তের বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করতে হবে। এর মধ্য হতে তারা যদি একটি বিধানকেও অস্বীকার করে এবং তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও উক্ত বিধান পালনে বিরত থাকে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। এখন প্রশ্ন হলো যে, হাদীসের স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.) ও আবূ বকর (রা.)-এর মধ্যে কিভাবে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

অত্র প্রশ্নের উত্তর এই যে, হযরত ওমর (রা.)-এর শুধু ইসলামের প্রধান ভিত্তি কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর প্রতিই লক্ষ্য ছিল, সম্ভবত পরবর্তী বিধান তখন তাঁর স্মৃতিপটে আসেনি। অনুরূপভাবে হযরত আবূ বকরের (রা.) অবস্থাও একই ছিল বিধায় তিনি কিয়াস বা যুক্তি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– إِلَّا بِحَقِّهٖ -এর ব্যাপকতা দ্বারা ওমর (রা.)-এর প্রতিবাদের উত্তর দেন এবং জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

▮ এ বিষয়ে আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) بِحَقِّهٖ দ্বারা জাকাত ছাড়া অন্য কিছু মনে করেছিলেন, তাই হযরত আবূ বকর (রা.) স্মরণ করিয়ে দেন যে, জাকাতও ইসলামের মৌলিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং এ যুদ্ধ কুফরের কারণে নয়; বরং জাকাতকে ইসলামের বিধানরূপে অস্বীকার করার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং فَإِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ বলে তিনি যুদ্ধের আরো প্রমাণ দেন যে, দেহ ও সম্পদের নিরাপত্তায় ইসলামের পক্ষ হতে আরোপিত শর্তসমূহ পূরণ করার সাথে সম্পর্কিত সম্পদের হক আদায় করা দেহের হক আদায় করার মতোই। আর কোনো হুকুম একাধিক শর্তাধীন হলে, তা একটি শর্ত পূর্ণ করা দ্বারা পালন করা হয়েছে বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

▮ অথবা হযরত ওমর (রা.)-এর ধারণা ছিল যে, যুদ্ধ তো কুফরির কারণে হয়ে থাকে। আর এখানে তো কুফরি পাওয়া যায়নি। সুতরাং আবূ বকর (রা.) কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? তারা তো শুধু জাকাত অস্বীকার করেছে।

এর জবাব হলো, এ যুদ্ধটি কুফরির ভিত্তিতে ছিল না; বরং জাকাত দিতে অস্বীকার করার কারণে তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

إِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ কথার তাৎপর্য : হাদীসের বাণী– إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র বাণী– إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" মুখে উচ্চারণপূর্বক অন্তরে তার প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। সে যদি কাউকে হত্যা, চুরি ইত্যাদি করে, তবে তাকে নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

আর وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা ঈমান এনে বাহ্যিকভাবে ইসলামের আহকাম মেনে চলে, কিন্তু মনের গভীরে কুফরি ও নিফাকী গোপন করে রাখে, তাদের বিচারের দায়িত্ব আল্লাহর উপর; রাসূলের ﷺ উপর নয়। কারণ অন্তরের মালিক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, যেমন কুরআনের ভাষ্য– إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

হাদীস ও কুরআনের মধ্যে বিরোধ ও এর সমাধান : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ" অর্থাৎ "দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই" অথচ আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানদের সাথেও দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা জায়েজ। ফলে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন।

১. আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহর দীন গ্রহণের ব্যাপারে কারও উপর জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। দীন গ্রহণের ব্যাপারে সকলেই স্বাধীন। হাদীসের অর্থ হলো যারা দীন গ্রহণ করেছে তাদেরকে সংশোধন করা। তা জবরদস্তি করেও হতে পারে।

২. অথবা আয়াতের অর্থ হলো, দীন গ্রহণের পরে কেউ কোনো বিধান পালন করতে অপারগ হয়ে পড়লে তাতে জবরদস্তি চলবে না। আর হাদীসের উদ্দেশ্য হলো– দ্বীন গ্রহণের পর স্বেচ্ছায় কোনো বিধান পরিত্যাগ করে গোটা ইসলামি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেওয়া যায় না।

৩. অথবা দীন গ্রহণের পর কোনো মুসলমান যদি ইসলামের কোনো ফরজ ও ওয়াজিব বিধানকে অস্বীকার করে তবে জোর-জবরদস্তিপূর্বক সে বিধানের স্বীকৃতি আদায় করা এবং মেনে চলতে বাধ্য করা। ইসলামের প্রশাসনিক ও ফৌজদারী আইনসমূহ এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

৪. হাদীসে বর্ণিত লড়াই করার অর্থ হলো, ইসলামি রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কাঠামোকে অবক্ষয় হতে রক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু আয়াতের ব্যাখ্যানুসারে এটা অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুরূপ ব্যবস্থা নয়।

৫. অথবা এটাও হতে পারে যে, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ আয়াতের হুকুম ইসলামের প্রথমদিকে বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত আয়াতের হুকুম রহিত হয়েছে।

وَعَنْهُ ١٦٩٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُلْقِمَهُ اَصَابِعَهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৬৯৯. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কোনো লোকের সংরক্ষিত মাল কিয়ামতের দিন নেড়ে [কেশহীন] সাপ হবে। তার মালিক তা হতে পলায়ন করবে। কিন্তু সাপ তাকে আঘাত করতে থাকবে যতক্ষণ না তার আঙ্গুলগুলো [খাদ্যরূপে] তার [সাপের] মুখে দেবে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইহজগতে জিনিসের যে আকৃতি ও স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে, পরজগতে তার পরিবর্তন ঘটবে। যেমনিভাবে আমরা রূহজগতে যেরূপে ছিলাম, বাস্তব জগতে এখন এর বিপরীত আকৃতিতে জীবন ধারণ করেছি। আলোচ্য হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) অনুরূপ কথাই নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন– এ জাগতিক জীবনে যার কাছে মাল-সম্পদ আছে, সে একে জমা করে তথা সঞ্চয় করে সদকা জাকাতবিহীন অবস্থায় রেখেছে। কিয়ামতের দিন সেই মালের আকৃতি কেশবিহীন বিষধর সাপে রূপান্তর হয়ে এর মালিককে দংশন করতে থাকবে। সে পালাতে চেষ্টা করবে বটে, কিন্তু সে সাপ তার পিছু ধাওয়া করবে। অবশেষে তার হাতের অঙ্গুলিসমূহ খাদ্যরূপে সাপের মুখে দিলে তখন সে পিছনে ধাওয়া বন্ধ করবে এবং তাকে অনবরত কামড়াতে থাকবে।

حَتّٰى يُلْقِمَهُ اَصَابِعَهُ **-এর ব্যাখ্যা :** কেউ ধন-সম্পদের মালিক হলো, কিন্তু সে এক হক তথা জাকাত আদায় করল না, কিয়ামতের দিন তার এ সম্পদ কেশবিহীন বিষধর সর্পে রূপান্তরিত হয়ে উক্ত মালিককে দংশন করতে থাকবে। সে পালাতে চেষ্টা করবে কিন্তু সাপ তার পিছু ছাড়বে না। অবশেষে তার আঙ্গুলগুলো খাদ্যরূপে সাপের মুখে দেবে, তখন সাপ তার পেছনে ধাওয়া বন্ধ করবে। সায়্যিদ জামালুদ্দীন (র.)-এর মতে, উপরিউক্ত বাক্যটির দু' ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. اَنْ يُلْقِمَ الشُّجَاعُ اَصَابِعَ صَاحِبِ الْمَالِ অর্থাৎ কেশবিহীন বিষধর সর্পটি উক্ত মালিকের আঙ্গুলগুলোকে গলাধঃকরণ করবে। এমতাবস্থায় يُلْقِمَهُ اَصَابِعَهُ পদটি -এর "ه" যমীর হতে بَدَل হবে।

২. এবং اَنْ يُلْقِمَ صَاحِبُ الْمَالِ الشُّجَاعَ اَصَابِعَ نَفْسِهِ অর্থাৎ উক্ত মালের মালিক স্বীয় আঙ্গুলগুলোকে কেশবিহীন বিষধর সর্পটির জন্যে মুখের গ্রাস বানাবে। কেননা, এ হাত ও আঙ্গুল দ্বারাই সে এ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, বস্তুত তার ধন-সম্পদই সাপের রূপ ধারণ করবে।

وَعَنِ ١٧٠٠ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّيْ زَكٰوةَ مَالِهِ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْ عُنُقِهِ شُجَاعًا ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (الْاٰيَةَ) - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৭০০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার মালের জাকাত আদায় করবে না কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ঘাড়ে সাপ স্বরূপ বানাবেন। অতঃপর তিনি এর সমর্থনে আল্লাহর কিতাব হতে আয়াত পাঠ করলেন– "যারা কৃপণতা করে তারা যেন আল্লাহ তাদেরকে যে মাল দান করেছেন তা নিয়ে মনে না করে যে, তা তাদের জন্যে কল্যাণময় হয়েছে ......।" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। –[তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহান আল্লাহ তা'আলা ইহজগতে অর্থ-সম্পদ দান করে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন যে, তারা কি তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে কিনা এবং ঠিক মতো জাকাত আদায় করে কিনা? যদি তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে তবে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা তার এ সম্পদকে সাপ বানিয়ে তার ঘাড়ে আরোহণ করিয়ে দেবেন এবং উক্ত সাপ তাকে অনবরত দংশন করতে থাকবে।

وَعَنْ ١٧٠١ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالًا قَطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهٖ وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ قَالَ يَكُوْنُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَقَدِ احْتَجَّ بِهٖ مَنْ يَّرٰى تَعَلُّقَ الزَّكٰوةِ بِالْعَيْنِ هٰكَذَا فِي الْمُنْتَقٰى وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِاِسْنَادِهٖ اِلٰى عَائِشَةَ وَقَالَ اَحْمَدُ فِيْ خَالَطَتْ تَفْسِيْرُهٗ اَنَّ الرَّجُلَ يَاْخُذُ الزَّكٰوةَ وَهُوَ مُوْسِرٌ اَوْ غَنِيٌّ وَاِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ -

১৭০১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে সম্পদে জাকাত মিশবে, নিশ্চয় তা তাকে ধ্বংস করে দেবে। –[শাফিয়ী, বুখারী] তাঁর তারিখ গ্রন্থে এবং হুমাইদী তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হুমাইদী [এর ব্যাখ্যায়] বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমার উপরে জাকাত ফরজ হলো অথচ তুমি আদায় করলে না [অর্থাৎ মাল হতে জাকাতরূপে আদায় করলে না]। এখনতো হারাম মাল তোমার হালাল মালকেও ধ্বংস করে দেবে। তার সাথে ঐ ব্যক্তি দলিল গ্রহণ করেন, যিনি বলেন যে, জাকাতের সম্পর্ক মূল মালের সাথে রয়েছে। মুনতাকা গ্রন্থে অনুরূপ রয়েছে, বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে বর্ণনা করেন, যার সনদ হযরত আয়েশা (রা.) পর্যন্ত উল্লেখ করেন। ইমাম আহমদ (র.) خَالَطَتْ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোনো ব্যক্তি জাকাত গ্রহণ করল [অর্থাৎ নিজে জাকাত না দিয়ে নিজের মালের সাথে নিয়ে খেল] অথচ সে স্বচ্ছল বা ধনী ব্যক্তি [জাকাত গ্রহণের যোগ্য নয়], এ জাকাতের মাল অপর মালকে ধ্বংস করবে, কারণ এটা গরীব মিসকিনের হক।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যেসব সম্পদের মধ্যে জাকাত ফরজ হয়েছে, যেমন– কোনো ব্যক্তির নিসাব পরিমাণ মেষ, বকরি বা গরু আছে, সে উক্ত বকরি বা গরুর জাকাতের অবিকল বকরি বা গরু না দিয়ে বরং তার মূল্য বা সমপরিমাণ মূল্যের অন্যকোনো জিনিস প্রদান করল। সুতরাং এভাবে জাকাত দেওয়া বৈধ হবে কিনা? জনমনে একটা প্রশ্ন জাগে। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জাকাতের মাল যে মালের সাথে মিশ্রিত হবে, সে মাল ধ্বংস হবেই।

ওয়াজিবকৃত সম্পদ ব্যতীত অন্য সম্পদের দ্বারা জাকাত দান প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ : যেসব দ্রব্য-সামগ্রীর উপর জাকাত ফরজ হয়েছে তা হতে না দিয়ে তার মূল্য জাকাত দেওয়া যাবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (র.) ও তাঁদের অনুসারীগণ অত্র হাদীস অনুসারে বলেন, যে মাল জাকাতরূপে ফরজ হয়েছে ঐ মাল হতেই জাকাত আদায় করতে হবে। এ জন্যেই জাকাতের দ্রব্যের মূল্য দেওয়া যাবে না। কারণ এখানে مَا خَالَطَتْ শব্দ দ্বারা মূল মালের সাথে মিশানোর কথা বলা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র.)-এর ব্যাখ্যাও প্রায় অনুরূপ, তবে তিনিও বলেন, জাকাত মূল মালের মধ্যেই ওয়াজিব নয়। তিনি আরও বলেন, যদি কারো উপর জাকাত ফরজ হয়, আর সে জাকাতের মালকে নিজের আসল মালের সাথে মিশিয়ে ফেলল, অথচ সে সম্পদশালী ধনী ব্যক্তি, পক্ষান্তরে সে জাকাতই গ্রহণ করল, বস্তুত তা গরিব-মিসকিনের হক।

হুমাইদী কর্তৃক বর্ণিত রাসূল ﷺ -এর ব্যাখ্যামূলক হাদীসটি সম্ভবত ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট কোনো কারণে গ্রহণযোগ্য হয়নি। অন্যথা রাসূল ﷺ -এর ব্যাখ্যা বিদ্যমান থাকতে কারো পক্ষে অন্যকোনো ব্যাখ্যার কল্পনাও করা যায় না।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, জাকাতের দ্রব্যের মূল্য দিলেও জাকাত আদায় হবে। কারণ ফকিরকে যে জাকাত দেওয়ার হুকুম করা হয়েছে তার দ্বারা সে "رِزْق" -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং আয়াতে বলা হয়েছে– وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا এ প্রতিশ্রুতি দ্বারা রিজিক পৌঁছানোই উদ্দেশ্য। আর রিজিক বলতে মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদাকে বুঝায়। মানুষ কখনো মালের মুখাপেক্ষী হয়, আবার কখনো মূল্যের মুখাপেক্ষী হয়।

মূলত গরিব-মিসকিনের অভাব মোচন করাই যেহেতু জাকাতের মূল উদ্দেশ্য, সেহেতু মূল সম্পদ কিংবা এর বিনিময় বা মূল্য দ্বারাও জাকাত প্রদান করা জায়েজ হবে। অবশেষে তাঁর কথা হলো, জাকাত প্রদান না করলে, তখন তা হারামে-হালালে মিশ্রিত হয়ে যায় আর তখনই এ হারাম মূল্য হালালকে ধ্বংস করে। কিন্তু যখন মূল মালের জাকাত, চাই মূল বস্তুর অংশ দ্বারা কিংবা মূল্য দ্বারা প্রদান করা হয়, তখন আর مَا خَالَطَتْ বা মিশ্রিত হয়েছে বলা যাবে না। কাজেই হাদীসটি হানাফী মাযহাবের বিপরীত নয়।

বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম আয়েশা। উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দীকা, হুমায়রা। খেতাব উম্মুল মু'মিনীন। পিতার নাম আবূ বকর (রা.) এবং মাতার নাম উম্মে রুম্মান।

২. **বিবাহ :** মাত্র ছয় বছর বয়সে রাসূল ﷺ -এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি নয় বছর বয়সে ১ম হিজরিতে রাসূলের ﷺ ঘরে যান এবং বাসর রাত্রি কাটান। তিনি রাসূলের ﷺ একমাত্র কুমারী স্ত্রী। রাসূল ﷺ তাঁকে খুব ভালবাসতেন।

৩. **কৃতিত্ব :** কুরআন-হাদীসের জ্ঞান ও শরয়ী মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তার তুলনা তিনিই।

৪. **চারিত্রিক পবিত্রতা ঘোষণা :** তাঁর বিরুদ্ধে ইফকের যে মিথ্যা ঘটনা রটানো হয়েছিল তা কুরআনের আয়াত দ্বারা খণ্ডন করে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়।

৫. **হাদীসের অবদান :** সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০টি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে ১৭৪টি আর স্বতন্ত্রভাবে ইমাম বুখারী (র.) ৫৪টি এবং মুসলিম (র.) ৫৮ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** হযরত আয়েশা (রা.) ইসলামি জ্ঞানের আধার ছিলেন। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। যেমন– فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ

৭. **ইন্তেকাল :** হযরত আয়েশা (রা.) ৬৬ বছর বয়সে ৫৭/৫৮ হিজরি সালে ১৭ রমজান মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

بَابُ مَا يَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ

পরিচ্ছেদ : যেসব পণ্য-সামগ্রীতে জাকাত ফরজ হয়

মানুষের সকল সামগ্রীর উপর জাকাত ফরজ নয়; বরং বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের উপরই জাকাত আবশ্যক হয়ে থাকে; বরং এমন কিছু সম্পদ আছে যার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তাই কোন কোন সামগ্রীর জাকাত দিতে হবে? আলোচ্য পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কীয় হাদীসসমূহই আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٧٠٢ - عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরের জাকাত নেই, পাঁচ আওকিয়ার কম রৌপ্যে কোনো জাকাত নেই এবং পাঁচ 'যাওদে'র কম সংখ্যক উটের জাকাত নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

চার প্রকারের ধন-সম্পদের উপর জাকাত আবশ্যক হয়। ১. সোনা-রুপা বা নগদ মুদ্রা। ২. তেজারতী বা ব্যবসার দ্রব্যসামগ্রী। ৩. কিছু সংখ্যক গৃহপালিত পশু এবং ৪. ভূমির উৎপন্ন ফসল। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ তিন প্রকারের জিনিসের মধ্যে কোন জিনিসের কি পরিমাণ হলে জাকাত দিতে হবে তা বর্ণনা করেছেন। "নবী করীম ﷺ বলেছেন– 'খেজুর' পাঁচ অসকের কম হলে, 'রুপা' পাঁচ আওকিয়ার কম হলে এবং 'উট' পাঁচটির কম হলে জাকাত দিতে হবে না। উল্লিখিত এই তিন জিনিসের জাকাত সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে দ্বিমত নেই। কিন্তু ভূমির শ্রেণী ও এর উৎপন্ন ফসলের জাকাত ধার্য হওয়ার মধ্যে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

اَوْسُقٌ ، اَوَاقٌ ও ذَوْدٌ-এর অর্থ : اَوْسُقٌ-এর অর্থ : কামুস ও নিহায়া-এর ভাষ্য অনুযায়ী اَوْسُقٌ শব্দটি وَسَقٌ-এর বহুবচন। আর এর পরিমাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

এক ওসাক = ৬০ সা
এক সা = ৪ মুদ্দ
এক মুদ = ২ রতল
এক রতল = ১৩০ দিরহাম
সুতরাং এক ওসাকের পরিমাণ হবে–
১৩০ × ২ = ২৬০
২৬০ × ৪ = ১০৪০
১০৪০ × ৬০ = ৬২,৪০০ দিরহাম।
আমাদের দেশীয় হিসেব অনুযায়ী–
এক ওসাক = ৬০ সা
এক সা = ৩ সের ৯ ছটাক।

অতএব, ৫ = ওসাক ২৬ মণ ২৬ সের ৯ ছটাক।
তবে কারো কারো মতে, ৫ ওসাক প্রায় ২৮ মণ।

اَوَاقٍ -এর অর্থ : اَوَاقٍ শব্দটি اُوْقِيَّةٌ -এর বহুবচন। এক اُوْقِيَّةٌ = ৪০ দিরহাম। সুতরাং পাঁচ اُوْقِيَّةٌ = ২০০ দিরহাম।
আর আমাদের দেশীয় হিসেব অনুযায়ী এক দিরহাম = ০.২৬ তোলা, ফলে ২০০ দিরহাম = ৫২ $\frac{1}{2}$ তোলা।

ذَوْدٌ -এর অর্থ : ذَوْدٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে اَذْوَادٌ কিন্তু এর সংখ্যা নির্ধারণে মতভেদ বিদ্যমান। যেমন–

১. কারো মতে, ذَوْدٌ বলতে ২ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা।

২. কারো মতে, ذَوْدٌ বলতে– ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা।

৩. কেউ বলেন, পাঁচ ذَوْدٌ -এর পরিমাণ কমপক্ষে ১৫টি এবং সর্বোচ্চ ৫০টি উট।

ভূমিতে উৎপাদিত সম্পদের জাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : জমিনে উৎপাদিত ফসলের উপর জাকাত ওয়াজিব হওয়ার নিসাবের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম নিম্নরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَصَاحِبَيْنِ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখের বক্তব্য হলো, জমির উৎপন্ন ফসল যদি কাঁচামাল না হয় এবং তার পরিমাণ কমপক্ষে ৫ ওসাক তথা ২৬ মণ ১০ সের হয় এবং সারা বছর স্থায়ী থাকে, তবে তার 'উশর' বা 'নিছফে উশর' আদায় করতে হবে। অন্যথায় জাকাত ওয়াজিব হবে না।

দলিল :

١. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ -

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُجَاهِدٍ وَ زُفَرَ وَغَيْرِهِمْ ইমাম আযম, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, ইবরাহীম নাখয়ী, মুজাহিদ ও যুফার (র.) প্রমুখের অভিমত হলো, জমিনের উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক, এক বছর পূর্ণ হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় জাকাত হিসেবে 'উশর' কিংবা 'নিসফে উশর' আদায় করতে হবে।

দলিল : ক. কুরআন–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ -

٢. وَاٰتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٖ -

খ. হাদীস–

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ . (بُخَارِى)

٤. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ عُشْرٍ . (مُسْلِمٌ)

আহনাফের পক্ষ হতে বিপরীত মত পোষণকারীদের জবাব : হানাফী ইমামগণ ও শাফেয়ী (র.), মালেক ও সাহেবাইনের দলিলের জবাবে বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস ব্যবসায়ী দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভূমির উৎপাদিত ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা সে যুগে মানুষ ওয়াসাকের ওজন দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করত।

রৌপ্যের জাকাতের নিসাব : ন্যূনতম যে পরিমাণের উপর জাকাত ফরজ হয় তাহলো ২০০ দিরহাম রৌপ্য। দেশীয় হিসেবে ৫২ $\frac{1}{2}$ তোলা বা ৬১২.২৫ গ্রাম। ওলামায়ে আহনাফের নিকট এর পরিমাণ প্রায় ৭০০ গ্রাম। এই নিসাব পরিমাণ রৌপ্য কারো নিকট পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর শতকরা ২ $\frac{1}{2}$ টাকা হারে জাকাত আদায় করা ফরজ। এ পরিমাণের চেয়ে কম হলে জাকাত ফরজ হবে না।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলে যদি কোনো একটির নিসাব পরিমাণ হয়, তবে সেটির হিসেবে শতকরা ২ $\frac{1}{2}$ টাকা হারে জাকাত দিতে হবে।

দলিল :

حَدِيْثُ عَلِيٍّ (رضـ) اِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِىْ فِى الذَّهَبِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ -

খেজুর, কিসমিস ও দানাজাতীয় শস্য সম্পর্কে ইমামের মতভেদ : খেজুর, কিসমিস ও দানাজাতীয় শস্য তা খাদ্যসামগ্রী হোক বা না হোক তাতে জাকাত ধার্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে, উল্লিখিত বস্তুসমূহের পরিমাণ যদি ৫ ওসাক তথা প্রায় ২৮ মণ হয়, তবে তাতে এক দশমাংশ জাকাত আদায় করতে হবে। এ পরিমাণের কম হলে জাকাত আদায় করতে হবে না।

দলিল : হাদীস–

١. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ".

٢. إِنَّمَا أُمِرَانَ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ.

২. ইমাম আবূ হানীফা, ওমর ইবনে আযীয, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখয়ী প্রমুখের মতে, খেজুর, কিসমিস ও দানাজাতীয় শস্যের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা না হোক এবং এক বছর পূর্ণ হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় এক-দশমাংশ জাকাত দিতে হবে।

দলিল : ক. কুরআন–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ" -

٢. قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ" -

খ. হাদীস–

٣. قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

٤. إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَنْ يَاْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ -

---

١٧٠٣ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِيْ عَبْدِهٖ وَلَا فِيْ فَرَسِهٖ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ لَيْسَ فِيْ عَبْدِهٖ صَدَقَةٌ اِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭০৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– মুসলমানদের ক্রীতদাস ও ঘোড়ায় জাকাত নেই। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তার ক্রীতদাসে সাদকায়ে ফিতর ছাড়া কোনো সদকা নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোনো মুসলমানের নিত্য ব্যবহারিক জিনিস, যার প্রতি সে সর্বদা মুখাপেক্ষী, এমন জিনিসে জাকাত ওয়াজিব হয় না। যেমন– ঘরের আসবাবপত্রসমূহ। অনুরূপভাবে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, কোনো মুসলমানের গোলাম এবং ঘোড়ার জন্যেও জাকাত দিতে হবে না। কারণ এগুলো তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, গোলামের জন্যে শুধু সদকায়ে ফিতর দিতে হয়। কেননা তার ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার মালিকই বহন করে। তবে গোলাম বা বাঁদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করলে তাতে জাকাত দিতে হবে।

গোলাম ও ঘোড়ার জাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ক্রীতদাস ও ঘোড়া যদি ব্যবসায়ের পণ্য না হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাতে জাকাত নেই। যেমন– সওয়ারির জন্যে, বোঝা বহন ও জিহাদের জন্যে ঘোড়া এবং নিজের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম ও খেদমতের জন্যে গোলাম থাকলে তাতেও জাকাত দিতে হবে না। তবে যদি এগুলো ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে হয়, তবে এতে সর্বসম্মতিক্রমে জাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি ঘোড়া বংশবৃদ্ধি, প্রজনন ও দুধ উৎপাদনের জন্যে হয়, তবে তাতে জাকাত ফরজ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَصَاحِبَيْنِ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও সাহেবাইন (র.)-সহ একদল ইমামের অভিমত হলো– لَا زَكٰوةَ فِي الْخَيْلِ مُطْلَقًا অর্থাৎ ঘোড়ার জন্যে জাকাত দিতে হবে না। উপরের আলোচ্য হাদীসই তাদের প্রধান দলিল। ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সমর্থনে বলেছেন, আবূ হুরায়রার হাদীস অনুসারেই ওলামায়ে কেরামের আমল চলে আসছে। ফকীহগণ বলেন, চারণশীল ঘোড়া ও গোলামের ক্ষেত্রে জাকাত প্রযোজ্য হবে না, যদি তা নিজের ব্যবহার ও খেদমতের জন্যে হয়। কিন্তু যদি ব্যবসার জন্যে হয়, তখন বৎসর শেষে এর মূল্যের উপর জাকাত ধার্য হবে। তাদের দলিল– عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عُفِوَتْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ অর্থাৎ ঘোড়া এবং গোলামের জাকাত মাফ করা হয়েছে।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ حَمَّادٍ وَاِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىْ وَ زُفَرَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, ইবরাহীম নাখয়ী, হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান ও ইমাম যুফার (র.) বলেন, যে ঘোড়া বংশবৃদ্ধির জন্যে রাখা হয় এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় চারণভূমিতে বিচরণ করে এবং পুরুষ ঘোড়া ও স্ত্রী ঘোড়া একসাথে মিলিত হয়ে একই চারণভূমিতে বিচরণ করে, এমন সব ঘোড়ায় জাকাত দিতে হবে।

আল্লামা সারাখসী (র.) বলেন, সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-ও এ মত পোষণ করেছেন। এ ধরনের ঘোড়ায় মাথা-পিছু এক দীনার অথবা এর সমপরিমাণ মূল্য সাব্যস্ত করে প্রতি দু'শত দিরহামে পাঁচ দিরহাম জাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি শুধু পুরুষ ঘোড়া কিংবা শুধু স্ত্রী ঘোড়া হয়, তবে জাকাত দিতে হবে না। তবে আমাদের প্রচলিত ফতোয়ার বড় বড় গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে যে, সাহেবাঈনের মতের উপরেই ফতোয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম সাহেবের দলীল–

১. فِىْ كُلِّ فَرَسٍ مِنْ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ اَوْعَشَرَةُ دَرَاهِمَ

২. وَعَنْ جَابِرٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ وَلَيْسَ فِى الرَّابِطَةِ شَيْئٌ.

৩. وَعَنْ سَائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ عُمَرَ لَمَّا بَعَثَ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ اِلَى الْبَحْرَيْنِ اَمَرَهُ اَنْ يَاْخُذَ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ شَاتَيْنِ اَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ -

মোটকথা, ঘোড়ার জাকাতে ঘোড়া নেওয়া যাবে না; বরং প্রত্যেক ঘোড়ার পরিবর্তে এক এক দীনার বা দশ দশ দিরহাম নেওয়া হবে।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাঈনের পেশকৃত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, এটা সওয়ারি ও সৈনিকদের ঘোড়া। কেননা, যুদ্ধের ঘোড়ার জাকাত নেই। অন্যথা হযরত ওমর ঘোড়ার জাকাত গ্রহণ করতেন না। যেমন– اِنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ يُقَوِّمُ الْخَيْلَ وَيَدْفَعُ صَدَقَتَهَا اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ এছাড়া আসরার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে–

لَمَّا سَمِعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيْثَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا قَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ اَرَادَ فَرَسَ الْغَازِىْ وَاَمَّا مَا طَلَبَ نَسْلَهَا وَ رَسْلَهَا فَفِيْهَا الزَّكٰوةُ فِىْ كُلِّ فَرَسٍ دِيْنَارٌ اَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ -

ফলকথা হলো, হযরত ওমর (রা.)-এর জমানায় ঘোড়ার জাকাতের প্রচলন ছিল এবং এটাও বলা হয় যে, তখন এ ব্যাপারে ইজমাও হয়েছে। অন্যথা লোকেরা হযরত ওমরের এ কাজে প্রতিবাদ করতেন না।

আর 'ক্রীতদাস' দ্বারা খেদমতের গোলাম বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন– জাকাত দেওয়া কিংবা না দেওয়া উভয় প্রকারের প্রমাণ আছে। তাই গোলামের জাকাত না দিলেও চলবে। কিন্তু মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীস আমাদের দলিল– رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ ... فِيْهِ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ ظُهُوْرِهَا وَلَا فِىْ رِقَابِهَا অর্থাৎ ঘোড়ার ও গোলামের উভয়টির জাকাত আদায় করতে হবে।

وَعَنْ ١٧٠٤ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِىْ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ

১৭০৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁকে যখন বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন তখন তাঁকে এ নির্দেশ নামাটি লিখে দিলেন, "বিসমিল্লাহির রাহামানির রাহীম" এটা জাকাতের তালিকা যা আল্লাহর রাসূল মুসলমানদের প্রতি ফরজ করে দিয়েছেন এবং যার আদেশ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন। অতএব যে কোনো মুসলমানের নিকট এর নির্ধারিত নিয়মে চাওয়া হলে সে যেন তা প্রদান করে, আর যার কাছে এর অধিক চাওয়া হবে সে যেন তা না দেয়। চব্বিশ বা তার কম সংখ্যক উটে ছাগল ভেড়া দ্বারা জাকাত দিতে হবে। প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি বকরি, যখন উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশে পৌছবে তখন তাতে একটি এক বছরের মাদি উট [জাকাত] দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা ছয়ত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশে পৌছবে তখন গর্ভধারণ

وَّثَلٰثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اُنْثٰى فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلٰثِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثٰى فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ اِلٰى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَّسِتِّيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذْعَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مَّعَهٗ اِلَّا اَرْبَعٌ مِّنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيْهَا شَاةٌ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهٗ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذْعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهٗ جَذْعَةٌ وَعِنْدَهٗ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهٗ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهٗ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذْعَةُ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذْعَةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهٗ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهٗ اِلَّا بِنْتَ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِىْ شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهٗ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهٗ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ

উপযোগী একটি চার বছর বয়সী মাদি উট [জাকা]) দিতে হবে। যখন একষট্টি হতে পঁচাত্তরে পৌছবে একটি পাঁচ বছর বয়সী স্ত্রী উট [জাযা'আ] দিতে হবে। যখন ছিয়াত্তর হতে নব্বই সংখ্যায় পৌছে তখন তাতে দু'টি দু'বছর বয়সী [বিন্‌তে লাবূন] মাদি উট দিতে হবে। আর যখন একানব্বই হতে একশত বিশ সংখ্যায় পৌছবে তখন তাতে দু'টি গর্ভধারণ উপযোগী চার বছর বয়সী [হিক্‌কা] মাদি উট [জাকাত] দিতে হবে। যখন একশত বিশ সংখ্যার বেশি হবে তখন প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি দু'বছর বয়সী মাদি উট দিবে এবং প্রত্যেক পঞ্চাশটি উটে একটি গর্ভধারণ উপযোগী চার বছর বয়সী মাদি উট দিবে। আর যার নিকট শুধু চারটি উট রয়েছে তাতে কোনো জাকাত নেই, তবে হ্যাঁ যদি মালিক কিছু দিতে চায় [তবে প্রচুর ছওয়াব হবে], যখন পাঁচ সংখ্যায় পৌছবে তখন একটি বকরি প্রদান করবে।

যার উটের সংখ্যা এতটুকু পৌছেছে যে, যাতে জায'আ অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়সী মাদি উট জাকাত দিতে হয় [অর্থাৎ ৬১-৭৫ পৌছেছে] তার কাছে পাঁচ বছর বয়সী মাদি উট নেই কিন্তু চার বছর বয়সী মাদি উট যার আছে তার কাছ হতে হিক্‌কা অর্থাৎ চার বছর বয়সী [গর্ভধারণ উপযোগী] মাদি উটই গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে জাকাতদাতা দু'টি বকরি দিবে যদি তার পক্ষে সহজ হয় অথবা বিশ দিরহাম দিবে। যে হিক্‌কা অর্থাৎ চার বছর বয়সী মাদি উট জাকাত প্রদান উপযোগী উটের সংখ্যায় পৌছেছে [অর্থাৎ ৪৬-৬০ সংখ্যায় পৌছেছে] অথচ তার কাছে চার বছর বয়সী মাদি উট নেই, তকে পাঁচ বছর বয়সী [জাযা'আ] মাদি উট গ্রহণ করা হবে এবং মুসাদ্দিক [জাকাত আদায়কারী কর্মচারী] তাকে [জাকাতদাতাকে] বিশ দিরহাম বা দু'টি বকরী প্রদান করবে। যে ব্যক্তি চার বছর বয়সী মাদি উট জাকাত প্রদান উপযোগী উটের সংখ্যায় পৌছেছে অথচ তার কাছে বিনতে লাবূন বা দু'বছর বয়সী মাদি বাচ্চা ছাড়া নেই, তবে মুসাদ্দিক তার কাছ হতে বিনতে লাবূন গ্রহণ করবে: জাকাতদাতা তার সাথে দু'টি বকরি অথবা বিশ দিরহাম প্রদান করবে। যে ব্যক্তি দু'বছর বয়সী মাদি উট জাকাত প্রদান উপযোগী উটের সংখ্যায় পৌছেছে. তার কাছে চার বছর বয়সী মাদি উটই গ্রহণ করা হবে. এমতাবস্থায় মুসাদ্দিক জাকাতদাতাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরি প্রদান করবে। যে ব্যক্তি দু'বছর

مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

বয়সী মাদি উট প্রদান উপযোগী উটের সংখ্যায় পৌঁছেছে অথচ দু'বছর বয়সী [মাদি] উটের বাচ্চা তার কাছে নেই তার কাছে এক বছর বয়সী মাদি বাচ্চা [বিনতে মাখায] আছে তার কাছ হতে এক বছর বয়সী মাদি বাচ্চাই গ্রহণ করা হবে, জাকাতদাতা তার সাথে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরি প্রদান করবে। আর যে ব্যক্তির জাকাত এক বছর বয়সী [বিনতে মাখায] বাচ্চায় পৌঁছেছে, অথচ এক বছর বয়সী বাচ্চা তার কাছে নেই বরং তার কাছে দু'বছরের মাদি বাচ্চা [বিনতে লাবূন] আছে, তবে তার কাছ হতে এটাই গ্রহণ করা হবে। এমতাবস্থায় মুসাদ্দিক জাকাতদাতাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরি প্রদান করবে। যদি তার নিকট এক বছর বয়সী মাদি [বিনতে মাখায] না থাকে; বরং তার কাছে দু'বছর বয়সী পুরুষ বাচ্চা [ইবনে লাবূন] থাকে তবে তার কাছ হতে এটাই গ্রহণ করা হবে। তার জন্যে তাকে [জাকাতদাতাকে] কিছুই ফেরত দেওয়া হবে না [কেননা, পুরুষ বাচ্চার মূল্য কম]।

ছাগল-ভেড়ার জাকাত প্রসঙ্গ : ১. চারণভূমিতে বিচরণশীল ছাগল ভেড়ার যখন সংখ্যা সীমা চল্লিশ হতে একশত বিশে পৌঁছে তখন একটি বকরি দিতে হবে। ২. যখন একশত বিশের উপরে বৃদ্ধি পেয়ে দু'শতে পৌঁছবে, তবে তাতে দু'টি বকরি দিতে হবে। যখন দু'শত হতে বৃদ্ধি পেয়ে তিনশত সংখ্যাসীমায় পৌঁছবে তখন তাতে তিনটি বকরি প্রদান করতে হবে। আর যখন তিনশতের উপরে বৃদ্ধি পাবে তবে প্রতি শতে একটি করে বকরি জাকাত দিতে হবে। যদি কারও চারণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া ছাগল ভেড়ার সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হয় তবে তাতে কোনো জাকাত নেই; তবে হ্যাঁ, যদি মালিক কিছু দিতে চায় [তবে তার প্রচুর ছওয়াব হবে।] জাকাত বৃদ্ধপশু, ত্রুটিপূর্ণ পশু এবং নরপশু দেওয়া ঠিক হবে না। হ্যাঁ, যদি জাকাত আদায়কারী স্বেচ্ছায় নিতে চায় তবে স্বতন্ত্র কথা। জাকাত প্রদানের ভয়ে একত্রে থাকা পশুকে পৃথক পৃথক করা যাবে না। যে সকল বকরি দুই অংশীদারের তাকে সমানে দু'ভাগে বিভক্ত করে তা হতে জাকাত নেওয়া হবে। রৌপ্যের জাকাত ওশরের এক-চতুর্থাংশ [অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ]। যদি কারও কাছে একশ নব্বই দিরহামের বেশি না থাকে তবে তাতে কোনো জাকাত নেই, তবে হ্যাঁ যদি মালিক কিছু দিতে চায় [তবে তার প্রচুর ছওয়াব হবে]। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) হযরত আনাস (রা.)-কে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন. হযরত আনাস (রা.) বাহরাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় তাকে জাকাতের নিয়ম ও হার সম্বলিত একখানা নির্দেশনামা লিখে দিয়েছিলেন। যার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে প্রদান করেছেন। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে. জাকাতের হার স্বয়ং আল্লাহই নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যদিও কুরআনে তা উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই জাকাতের হার পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। আলোচ্য হাদীসে মোট তিনটি বিষয়ে জাকাত দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– উট. ছাগল-ভেড়া ও রূপা।

উটের জাকাতের ক্ষেত্রে ইমামগণের মতভেদ : উটের জাকাতের ব্যাপারে একশ বিশ পর্যন্ত যে বর্ণনা হাদীসে এসেছে তা নিয়ে কোনো ইমামের মতানৈক্য নেই। কিন্তু উটের সংখ্যা একশত বিশের বেশি হলে তখন এতে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে–

مَذْهَبُ اِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালেক (র.) শাফিয়ী (র.) ও আহমদ (র.)-এর মতে– বিশের পরে প্রতি চল্লিশটি উটে একটি দু'বছর বয়সী মাদি উট [বিনতে লাবূন] এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটে একটি চার বছর বয়সী গর্ভধারণ উপযোগী মাদি উট দিতে হবে। তাঁরা অত্র হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। তবে তাঁদের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি একশত বিশের ঊর্ধ্বে একটিও বেশি হয়, তবে তিনটি বিনতে লাবূন অর্থাৎ দু'বছর বয়সী মাদি উট দিতে হবে। এ বিধান একশত ত্রিশ সংখ্যা পর্যন্ত। তিনি আবূ দাঊদ ও ইবনে মুবারক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– اِذَا زَادَتِ الْاِبِلُ عَلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ অর্থাৎ, যদি একশত বিশের ঊর্ধ্বে একটিও হয় তবে দু'বছর বয়সী মাদি উট তিনটি দিতে হবে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এর এক অভিমত।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, একশত বিশের উপরে দু' একটি বৃদ্ধি পেলে ঐ বর্ধিত পশুর জন্যে কিছুই জাকাত দিতে হবে না, তবে একশত ত্রিশে পৌঁছলে একটি চার বছর বয়সী মাদি ও দু'টি দু'বছর বয়সী মাদি উট জাকাত দিতে হবে। কেননা, তাতে একবার পঞ্চাশ ও দু'বার চল্লিশ রয়েছে। এভাবে একশত চল্লিশে দু'টি চার বছর বয়সী ও একটি দু'বছর বয়সী এবং একশত পঞ্চাশে তিনটি চার বছর বয়সী মাদি উট জাকাত দিতে হবে। এভাবে প্রতি চল্লিশটিতে দু'বছর বয়সী [বিনতে লাবূন] এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে চার বছর বয়সী [হিক্কা] উট জাকাত হতে থাকবে। এটাই ইমাম আহমদ (র.)-এর মাযহাব।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : ইমাম আযম (র.), ইব্‌রাহীম নাখয়ী (র.) ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) -এর মতে, একশত বিশের ঊর্ধ্বে দু'একটি বেশি হলে এ বেশির জন্যে জাকাত হবে না। তবে পাঁচটি হলে অর্থাৎ মোট একশত পঁচিশটি হলে দু'টি বকরি, একশত পঁয়ত্রিশটি হলে দু'টি চার বছর বয়সী মাদি উট এবং তিনটি বকরি, একশত চল্লিশটি হলে দু'টি চার বছর বয়সী মাদি উট এবং চারটি বকরি, একশত পঁয়তাল্লিশ হতে একশত পঞ্চাশের পূর্ব পর্যন্ত একটি এক বছর বয়সী মাদি উট ও দু'টি চার বছর বয়সী মাদি উট এবং একশত পঞ্চাশে পৌঁছলে তিনটি চার বছর বয়সী মাদি উট দিতে হবে। একশত পঞ্চাশের উপর বৃদ্ধি পেলে আবারও ইসতিনাফে ফরজ হবে। অর্থাৎ পাঁচটি বৃদ্ধি পেলে তিনটি চার বছর বয়সী মাদি উট-এ একটি বকরি, আরও পাঁচটি বৃদ্ধি পেলে বকরি একটি বৃদ্ধি পাবে। এভাবে দু'শতে পৌঁছলে চারটি চার বছর বয়সী মাদি উট দিতে হবে। এরূপে ক্রমবৃদ্ধি চলতে থাকবে।

قَوْلُهُ لَايُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ **-এর ব্যাখ্যা :** পৃথক পৃথক পশুকে একত্র করা যাবে না এবং একত্রে থাকা পশুকে পৃথক পৃথক করা যাবে না। এ বাক্য দু'টির **প্রথম অংশ :** 'পৃথক পৃথক পশুকে একসাথে করা যাবে না' যেমন– এক ব্যক্তির ৪০টি বকরি আছে। হিসাব মতে, তাকে জাকাতে একটি বকরি দিতে হয়। কিন্তু সরকারি কর্মচারী জাকাত উসূল করতে আসতে দেখে সে নিজের বকরিগুলো অন্য আর এক ব্যক্তির ৪০ টির সাথে মিলিয়ে দিলে কর্মচারী ৮০টি বকরি এক ব্যক্তির ধারণা করে একটি বকরি নিয়ে গেল। ফলে তার অংশে তার বকরির জাকাত একটি বকরীর অর্ধেক হিস্যা পড়ল– এটা প্রতারণা। কাজেই এটা জায়েজ নয়।

দ্বিতীয় অংশ : 'এক সাথে থাকা পশুকে পৃথক পৃথক করা যাবে না'। যেমন– কোনো ব্যক্তির ১২০টি বকরি আছে। হিসাব মতো জাকাতে একটি বকরি দিতে হয়। জাকাত উসূলকারী কর্মচারী একে তিন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ৪০ হতে একটি করে বকরি নিয়ে গেল। এরূপ করা অত্যাচার ও জুলুম। কাজেই এটাও জায়েজ হবে না।

মোটকথা এ বাক্যের দ্বারা জাকাতদাতা ও জাকাত গ্রহীতা উভয়কেই অন্যায় পথ অবলম্বন হতে নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ-এর ব্যাখ্যা : যেসব পশু দু' ব্যক্তির মধ্যে একসাথে হয়ে আছে তাকে পৃথক করে ভিন্ন ভিন্ন জাকাত ধার্য করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইমামত্রয় অর্থাৎ ইমাম মালেক (র.), শাফেয়ী (র.) ও আহমদ (র.) প্রমুখ বলেন, একত্রে মিলিত থাকার ব্যাপারটি স্থান ভিত্তিক হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফ (র.) বলেন, এটা মালিকানা ভিত্তিক হবে। যেমন এক ব্যক্তি বিশটি এবং অপর ব্যক্তিরও বিশটি বকরি আছে সব বকরি একত্রে মিলে ঘাস খায়, বিচরণ করে, দুধ দেয় ও বাচ্চা দেয় ইত্যাদি। এরূপ একত্র মিশ্রণকে খিলাতাতুল জাওয়ার বলা হয়। ইমামত্রয় বলেন, এরূপ মিশ্রণে স্থানের ভিত্তিতে গোটা বকরি পালটি এক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব তাঁরা বলেন, উপরিউক্ত মোট চল্লিশটি বকরিতে একটি বকরি জাকাত দিতে হবে। অতঃপর যার অংশ হতে জাকাত আদায়কারী বকরি নিল সে অপর শরিকের কাছ হতে তার অংশ আদায় করবে।

ইমামত্রয় তাঁদের অনুকূলে আলোচ্য হাদীসের لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ বাক্যটির ব্যবহার করেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মালিকানার ভিত্তিতে তা দু'ভাগ হবে। উদাহরণে উল্লিখিত চল্লিশটি বকরির ক্ষেত্রে তা দু'ভাগ হলে প্রত্যেকের ভাগে বিশটি করে পড়ে। অতএব, এক জনেরও জাকাত হবে না। অপর দিকে যদি শরিকানা ছাগলের পালে দু'জন সমান শরিক হয়, আর ছাগল সংখ্যা মোট আশিটি হয়– এরূপ ক্ষেত্রে ইমামত্রয়ের মতে, স্থান ভিত্তিতে একত্রে নিসাব ধরলে মাত্র একটি বকরি জাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে মালিকানার ভিত্তিতে দু'ভাগে বিভক্ত করলে উভয়ের ভাগেই চল্লিশটি করে বকরি পড়ে। ফলে উভয়কেই একটি করে বকরি জাকাত দিতে হয়। জাকাত আদায়কারী দু'টি বকরি লাভ করে। ইমামত্রয়ের মতানুয়ায়ী জাকাত উসুলকারী মাত্র একটি বকরি লাভ করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, তারা جَمْعٌ وَتَفْرِيْقٌ-এর যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেখানে মালিকানা হিসেবে جَمْعٌ وَتَفْرِيْقٌ-এর অর্থ স্থান হিসেবে নয়। কারণ, আমরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছি যে, একই নিসাবের মাল যদি দু' জায়গায় থাকে তবে একই নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এতে জাকাত ধার্য হবে। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, جَمْعٌ ও تَفْرِيْقٌ মালিকানা অনুসারে হবে।

রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম– আনাস, উপনাম– আবূ হামযা, আবূ উমামা, আবূ উমাইয়া, আবূ উমাইমা। পিতার নাম– মালিক। মাতার নাম– উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান।

২. **বংশানুক্রম :** আনাস ইবনে মালিক ইবনে যমযম ইবনে হারাম ইবনে জানব ইবনে আমির ইবনে আসিম ইবনে নাজ্জার। তিনি বংশগত খাযরাজী ছিলেন।

৩. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** তিনি রাসূলের অন্যতম খাদেম, এমনকি তিনি خَادِمُ الرَّسُوْلِ ﷺ বলে ইতিহাসে পরিচিত। তিনি একটানা দশ বছর রাসূল ﷺ -এর খেদমত করেন।

৪. **যুদ্ধে অংশ গ্রহণ :** তিনি বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাহরাইনের গভর্নর ও বসরার মুফতি ছিলেন।

৫. **হাদীস বর্ণনা :** আল্লামা আইনী এবং خُلَاصَة -এর লেখক বলেন, হযরত আনাস (রা.) এক হাজার দু'শ ছিয়াশি খানা হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহ হলো ১৬৮ খানা, আর ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ৮৩ খানা ও মুসলিম (র.) ৯১ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **সন্তান-সন্ততি :** তাঁর একশত মতান্তরে ৮০ জন সন্তান ছিল। দু'জন মেয়ে বাকি সকলে ছেলে।

৭. **ইন্তেকাল :** তিনি বসরায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন– কারো মতে ৯০, কারো মতে ৯১, কারো মতে ৯২, কারো মতে ৯৩ হিজরি। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ / ১০৭ / ১১০ বছর। বসরায় তাঁর গৃহের পার্শ্বে 'তেফ' অথবা 'কছর' নামক মহল্লায় তাকে সমাহিত করা হয়।

١٧٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৭০৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে জমিকে আকাশ অথবা প্রবহমান কুয়া পানি দান [সিক্ত] করে অথবা নালা দ্বারা সিক্ত হয় এতে ওশর বা এক-দশমাংশ আবশ্যক এবং যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয় এতে অর্ধ ওশর অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ। —[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পানি ব্যতীত ফসল উৎপাদন একেবারেই অসম্ভব। মৃত জমিনকে পানিই জীবন দান করে, আবার ভূমি দুভাবে সিঞ্চিত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি, ঝর্ণা কিংবা খাল-বিল ও নদ-নদীর পানি দ্বারা। এখানে পানি বা সেচের জন্যে ব্যক্তির কোনো শ্রমের প্রয়োজন হয় না। কাজেই এমন ভূমির উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ জাকাতে প্রদান করতে হবে। কিন্তু যে জমিনে মানুষ কষ্ট করে পানি সেচন করে, এমন ভূমির উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের একভাগ জাকাত দিতে হবে।

বাহ্যত এ হাদীসটির অধ্যায়ের প্রথমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সুতরাং সেই হাদীসের টীকায় এর জবাব দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের প্রেক্ষিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ভূমিতে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলেই ওশর বা অর্ধ ওশর দিতে হবে, চাই তা দীর্ঘ মেয়াদী ফসল হোক, বা স্বল্প মেয়াদী কাঁচা মাল তথা শাক-সবজি হোক। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বল্প মেয়াদী শাক-সবজিতে ওশর নেই।

জমিতে উৎপাদিত সকল কিছুর জাকাতের ব্যাপারে হুকুম : ভূমির উৎপন্ন ফসল ও ফসলের জাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَصَاحِبَيْنِ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ বলেন, ভূমির উৎপন্ন ফসল ও ফল যদি কাঁচামাল না হয় এবং তার পরিমাণ কমপক্ষে ৫ ওসাক তথা ২৬ মণ ১০ সের হয় এবং সারা বছর স্থায়ী থাকে, তবে তার এক-দশমাংশ জাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি ৫ ওসাক থেকে কম হয় বা অস্থায়ী ফসল হয়, যেমন শাক-সবজি, তবে তাতে জাকাত দিতে হবে না।

দলিল :

١. قَوْلُهُ ﷺ "لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" .

٢. قَوْلُهُ ﷺ "لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ" .

مَذْهَبُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ বলেন, ভূমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা না হোক, একবছর পূর্ণ হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় এক-দশমাংশ জাকাত দিতে হবে।

তাঁদর দলিল :

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ" .

٢. قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ" .

একই ভূমিতে ওশর ও খাজনার হুকুম : একই ভূমিতে ওশর ও খাজনা আবশ্যক হবে কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, একই জমিতে ওশর ও খাজনা একই সময় ধার্য হতে পারে। সুতরাং খারাজী জমিতে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা হতে খাজনা এবং ওশর উভয়টি নেওয়া হবে। কেননা, হাদীসের বাণী– فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ এ কথাটি এবং وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ الخ বাক্যটি عَامٌ অর্থাৎ খারাজী কিংবা ওশরী জমি বলে নির্দিষ্ট করা হয়নি। ফলে 'খাজনা' হলো ভূমির হক এবং 'ওশর' হলো ফসলের হক।

مَذْهَبُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, একই জমিতে ওশর ও খারাজ উভয়টি একত্রিত হতে পারে না। কেননা, ওশরের জন্যে ওশরী জমি হওয়া শর্ত। খারাজী জমিতে খারাজ বা খাজনা ওয়াজিব হয়, ওশর ওয়াজিব হতে পারে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে– لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَلَا خَرَاجٌ فِيْ أَرْضِ مُسْلِمٍ এতদ্ভিন্ন খারাজী জমিতে ওশর নেওয়ার প্রমাণ কোনো ইমাম হতে বর্ণিত নেই। আর فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الخ এটা ওশরী জমি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

"عَثَرِيًّا" **শব্দের বিশ্লেষণ :** عَثْرًا وَعَثِيْرًا وَعِثَارًا বাবে عَثَرَ নَصَرَ، ضَرَبَ، سَمِعَ ও كَرُمَ অর্থ– পতিত হওয়া, পদস্থলিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া; عَثَرَ عَثْرًا وَعُثُوْرًا [বাবে نَصَرَ] অবগত হওয়া, রহস্য জানা।

হাদীসে উল্লিখিত عَثَرِيًّا দ্বারা কি বুঝনো হয়েছে এ সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা–

১. "আসরিয়া" ঐ সমস্ত খেজুরবৃক্ষ, যার মূল ঐ বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত করা হয়, যা কোনো গর্তে সঞ্চিত রাখা হয়েছিল।

২. কেউ কেউ বলেন, "আসারিয়া" এমন ফসল যাতে বৃষ্টির পানি ছাড়া অন্য কোনো পানির প্রয়োজন হয় না।

৩. কেউ কেউ বলেন, "আসারিয়া" এমন ফসল যা ঐ জমিনে উৎপন্ন হয়, যে জমিন পানির নিকটবর্তী হওয়াতে সদা সিক্ত থাকে।

কামূস অভিধানে عَثَرِيٌّ 'আসারী' অর্থ– বৃষ্টির পানিতে যা সিঞ্চিত হয়। মূলত اَلْعَاثُوْرُ شِبْهُ نَهْرٍ يُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ يُسْقٰى بِهِ الْبُقُوْلُ وَالزُّرُوْعُ وَالنَّخْلُ আসারী ঐ সমস্ত গর্ত বা কূপ, যা জমিনে তৈরি করা হয় এবং বৃষ্টির সময় সে কূপে পানি সঞ্চয় করে রাখে এবং পরে প্রয়োজন মাফিক সে পানি শাক-সবজি, ফসলাদি ও খেজুর বাগানে সেচন করা হয়। মোটকথা এমন ফসল যাতে বৃষ্টির পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানির প্রয়োজন হয় না। এতে মালিকের শ্রম নেই বললেই চলে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টির পানিতেই জমিন সিঞ্চিত হয়েছে। ফলে তার উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ জাকাত দিতে হবে। আর বর্তমানে আমাদের দেশে ইরির ফসলে মেশিনের সাহায্যে নদী-নালা হতে যে পানি সেচন করা হয় তা 'আসারীর বিপরীত। কাজেই তার উৎপন্ন ফসলে 'অর্ধ উশর' তথা বিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে।

"اَلنَّضْحُ" শব্দের বিশ্লেষণ :

"اَلنَّضْحُ" শব্দটি বাবে فَتَحَ ও ضَرَبَ -এর ক্রিয়ামূল, যার অর্থ– পানি ছিটানো, ক্ষেতে দেওয়ার জন্যে নর্দমা বা কূপ হতে পানি আনা, ঐ পানি যা দ্বারা ক্ষেত সিক্ত করা হয়, ঐ সকল বস্তু যা পানির ন্যায় তরল। অথবা اَلنَّضْحُ শব্দটি বহুবচন। نَضْح বলতে ঐ প্রকার উটকে বুঝায়, যার পিঠে করে সেচের জন্যে পানি আনা হয়। এর একবচন نَضْح এবং স্ত্রীলিঙ্গ نَاضِحَة

وَعَنْ ١٧٠٦ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, পশুর আঘাত মাফ, কূপে পড়াতেও মাফ, খনিতেও মাফ এবং রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ [খুমুস] রয়েছে। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সামাজিক কতিপয় অপরাধের বিধি-বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন– পশু কারো হাতে আবদ্ধ নয়, সাথে কোনো লোক নেই। এমতাবস্থায় এটা কাউকে আঘাত করলে কিংবা কারো সম্পদ নষ্ট করলে মালিকের উপর দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আসবে না। জমিনের মালিক নিজের ভূমিতে কূপ খনন করতে মজদুর নিলেন তার ক্রটি ব্যতিরেকে শ্রমিক দুর্ঘটনায় পতিত হলে মালিকের কোনো দণ্ড হবে না। অনুরূপভাবে খনিতেও দণ্ড দিতে হবে না। আর জমিনের গর্ভে প্রাপ্তদ্রব্য খনিতে প্রাপ্ত হোক বা কোথাও প্রোথিতরূপে হোক এর এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। প্রতিটি বাক্য বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, যা পরবর্তীতে আলোচিত হচ্ছে।

رِكَاز -এর অর্থ ও রিকাযের জাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

اَلرِّكَازُ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلرِّكْزُ ও اَلرِّكَازُ উভয় শব্দই اِسْم مَصْدَرْ রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে থেকে رَكَزَ يَرْكِزُ رِكْزًا -এর ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ১. পুঁতে রাখা ২. লুকিয়ে রাখা ৩. গেড়ে রাখা ইত্যাদি। যেমন বলা হয়– رَكَزَ اللّٰهُ الْمَعَادِنَ فِي الْأَرْضِ

اَلرِّكَازُ -এর পারিভাষিক অর্থ :

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে– اَلرِّكَازُ هُوَ مَالٌ مَرْكُوْزٌ تَحْتَ اَرْضٍ مِنْ مَعْدِنٍ خَلْقِيٍّ وَمِنْ كَنْزٍ دَفِيْنٍ
অর্থাৎ, ভূগর্ভে যে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়, চাই তা প্রাকৃতিক হোক বা মানুষের প্রোথিত হোক তাকে রিকায বলা হয়।

২. اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطُ অভিধানে বলা হয়েছে– اَلرِّكَازُ هُوَ مَا رَكَزَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْأَرْضِ مِنَ الْمَعَادِنِ فِيْ حَالَتِهَا الطَّبِيْعِيَّةِ

৩. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে– اَلرِّكَازُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَنْزٍ دَفِيْنٍ فَقَطْ

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ زَكٰوةِ الرِّكَازِ : রিকাযের জাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. আহনাফের মতে, রিকায জাতীয় সম্পদ কম হোক বা বেশি হোক, এর এক-পঞ্চমাংশ জাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

দলিল : "قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

২. জমহুরের মতে, রিকায জাতীয় সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা মালিকের হাতে এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তবে তাতে ৪০ ভাগের এক ভাগ জাকাত দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয়, তবে জাকাত দিতে হবে না।

দলিল : "قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرِّكَازِ "لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكٰوةُ

اَلْبِئْرُ جُبَارٌ-এর ব্যাখ্যা : اَلْبِئْرُ جُبَارٌ বাক্যে اَلْبِئْرُ শব্দের অর্থ হচ্ছে কূপ। আর جُبَار শব্দের অর্থ হচ্ছে– দণ্ডহীন, মার্জনীয়। সুতরাং اَلْبِئْرُ جُبَارٌ হাদীসাংশ দ্বারা রাসূল ﷺ এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, যদি কেউ কূপে পড়ে মারা যায়, তবে কূপের মালিককে সেজন্যে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত মাসআলা নিম্নরূপ–

১. যদি কোনো লোক নিজ মালিকানাধীন জমিতে কূপ খনন করে, অতঃপর সে কূপে কোনো শ্রমিক বা পথিক পড়ে নিহত হয়, তবে মালিককে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে না।

২. নিজ মালিকানাধীন জমি যদি জনসাধারণের যাতায়াতের পথে হয় এবং সড়ক ও জনপথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে কূপ খনন করা হয়, তাহলেও মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

৩. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কূপ খনন করা হলে তাতে যদি কেউ পড়ে নিহত বা আহত হয় তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪. অন্যের জমিতে অনুমতি ব্যতীত কূপ খনন করা হলে এবং তাতে পড়ে কেউ আহত বা নিহত হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ-এর ব্যাখ্যা : عَجْمَاء শব্দটি اَعْجَم শব্দের বহুবচন। এটা عَجْم মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যে কথা বলতে পারে না, বোবা। হাদীসে عَجْمَاء দ্বারা গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর কথা বলা হয়েছে। কেননা, এগুলো কথা বলতে পারে না; কারণ এরা ভাষাহীন।

আর جُبَار শব্দের অর্থ হচ্ছে– ক্ষমার্হ, দণ্ডহীন। সুতরাং اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ হাদীসাংশ দ্বারা রাসূল ﷺ বুঝাতে চাচ্ছেন যে, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু যদি কাউকে আঘাত করে কিংবা ক্ষতিসাধন করে অথবা মেরে ফেলে, সেজন্যে তার মালিককে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ সম্পর্কে ইমামগণের মতামত নিম্নরূপ–

১. জমহুরের মতে, গৃহপালিত পশু যদি রাতের বেলায় কিংবা মালিক বা রাখাল সাথে থাকাবস্থায় কারো ক্ষতি সাধন করে, অথবা কাউকে মেরে ফেলে সেজন্যে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যথায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

২. আহনাফের মতে, গৃহপালিত জন্তু কর্তৃক ক্ষয়ক্ষতি দিনে হোক কিংবা রাতে হোক পশুকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ-এর ব্যাখ্যা : وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ খনিতেও মাফ অর্থাৎ, মালিকের ত্রুটি ব্যতীত শ্রমিক খনি দুর্ঘটনায় পতিত হলেও মালিকের কোনো দণ্ড দিতে হবে না।

ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত ভূমিতে সোনা, রুপা, লোহা, তামাসহ যে কোনো ধাতব পদার্থের খনিতে জাকাত ওয়াজিব হবে, নাকি খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে– এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে।

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মালেক (র.) বলেন, ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদে যেমন কোনো জাকাত নেই তেমনি খুমুসও ওয়াজিব হবে না তবে খাঁটি সোনা বা রুপার খনি হলে তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাঈন (র.)-এর মতে, খনি যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন এতে খুমুস ($\frac{১}{৫}$) ওয়াজিব হবে। তারা অত্র হাদীসের পরবর্তী অংশ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ দ্বারা নিজেদের অনুকূলে দলিল পেশ করেন। কেননা, খনিও রিকাযের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং খনিতে রিকাযের বিধান অর্থাৎ খুমুস প্রযোজ্য হবে।

খনিজ সম্পদের প্রকারভেদ : মা'দান বা খনিজ সম্পদ সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা– তরল, কঠিন ও গলনশীল। তরল পদার্থ যেমন– তৈল, পানি, রাল, রাং গন্ধক ইত্যাদি। সর্বসম্মতিক্রমে তাতে খুমুস নেই। কঠিন পদার্থ যেমন– চুনা, হরনাল, পাথর ও ইয়াকূত, যা আগুনে গলে না। এগুলোতেও সর্বসম্মতিক্রমে খুমুস হবে না। গলনশীল কঠিন পদার্থ যেমন– সোনা, রুপা, সীসা ও তামা ইত্যাদিতে হানাফী মতে, খুমুস দিতে হবে যদি তা খারাজী বা ওশরী জমিতে পাওয়া যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٠٧ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسَبُهٗ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ هَاتُوْا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا وَدِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتّٰى تَتِمَّ مَائَتَىْ دِرْهَمٍ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِنْ زَادَتْ فَثَلٰثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِلَّا تِسْعٌ وَّثَلٰثُوْنَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهَا شَىْءٌ وَفِى الْبَقَرِ فِىْ كُلِّ ثَلٰثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِى الْاَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ ـ

১৭০৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি [আরোহণের] ঘোড়া ও [খেদমতের] কৃতদাসের জাকাত ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তোমরা রৌপ্যের জাকাত দিতে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম করে। আর একশত নব্বই দিরহামেও জাকাত নেই। যখন রুপা দুই শত দিরহামে পৌঁছে তখন এতে পাঁচ দিরহাম জাকাত হবে। -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

অন্য একটি বর্ণনায় ইমাম আবূ দাউদ হারিছ আওয়ার হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন. (হারিছের শিষ্য) যুহাইর বলেছেন, আমার মতে হযরত হারিছ হযরত আলী (রা.) হতে এবং হযরত আলী (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে ওশরের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ চল্লিশের একাংশ প্রদান করবে। আর যতক্ষণ না দু'শত দিরহাম পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর জাকাত নেই। যখন কারও নিকট পূর্ণ দু'শত দিরহাম হবে, তখন তাতে পাঁচ দিরহাম জাকাত ওয়াজিব হবে। অতঃপর তার উপরে যত বেশি হবে এ হিসেব অনুযায়ী জাকাত দিবে। ছাগল ভেড়ার জাকাত সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, চল্লিশটি বকরি হতে একশত বিশ বকরি পর্যন্ত একটি বকরি জাকাত ওয়াজিব। যদি এর উপরে এক বকরিও অধিক হয় তবে দু'শত পর্যন্ত দু'টি বকরি জাকাত ওয়াজিব হবে। দু'শতের বেশি হলে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বকরি জাকাত ওয়াজিব হবে। যদি তিনশতেরও বেশি হয় তবে প্রতি শতে করে একটি বকরি জাকাত ওয়াজিব হবে। যদি ঊনচল্লিশটি বকরিও হয় তবে তোমার উপর কোনো জাকাত নেই।

আর গরু প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি পূর্ণ এক বছর বয়সী বাছুর এবং চল্লিশটি গরুতে একটি পূর্ণ দু'বছর বয়সী বাছুর গরু [মুসান্না] জাকাত দিতে হয়। আর [দৈনন্দিনকার] কাজের গরুতে কোনো জাকাত নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসের বিশেষ তিনটি অংশ রয়েছে-

১. নিজের খেদমত ও কাজ-কর্মের গোলাম এবং সওয়ারি ও মালবাহী ঘোড়ার জন্যে জাকাত দিতে হবে না। রৌপ্যের জাকাত সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন, দুইশত দিরহামের কমে জাকাত দিতে হবে না। কিন্তু যখন দুইশত দিরহাম হবে তখন প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম হিসেবে দুশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম জাকাত দিতে হবে।

২. ছাগল ভেড়ার জাকাত সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন, এটা চল্লিশের কম হলে জাকাত দিতে হবে না। চল্লিশ সংখ্যা হতে ১২০ পর্যন্ত হলে একটি বকরি দিতে হবে। ১২০ -এর উপরে ১টি হলেও ২০০ পর্যন্ত ২টি বকরি এবং ২০০ -এর উপরে ১টি হলেও ৩০০ পর্যন্ত ৩টি বকরি দিতে হবে। ৩০০ হতে বেশি হলে প্রত্যেক একশতে একটি করে দিতে হবে। এমনকি এক শতের কমে ৩৯৯ পর্যন্ত পূর্ব হিসাবের ৩টিই বহাল থাকবে। প্রকাশ থাকে যে, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার হিসাব একই নিয়মে চলবে। তবে এর মধ্যে প্রত্যেকটির হিসাব স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক। এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীকে একত্র করে নিসাব পূর্ণ করা যাবে না।

৩. গরু ও মহিষের নিসাব ৩০টি হলে, এক বছরের বাছুর এবং ৪০টি হলে দু' বছরের বাছুর দিতে হবে। এখানেও উভয়টির হিসাব পৃথক পৃথক করতে হবে। অত্র হাদীসে নবী করীম ﷺ যাদেরকে সম্বোধন করেছেন, সম্ভবত তাদের কারো উট ছিল না। তাই এখানে উটের জাকাতের কথা উল্লেখ করেননি। অবশেষে তিনি এটাও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, হাল চাষের কাজে ব্যবহৃত গরু, মাল বহনকারী উট ইত্যাদির জাকাত দেওয়া ওয়াজিব নয়; কেননা এগুলো মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত।

قَدْ عَفَوْتُ -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো আমি ক্ষমা করে দিলাম। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শরিয়তের বিধান রচনা ও প্রয়োগ করার অধিকার নবী করীম ﷺ -এর জন্যে ছিল। মহান আল্লাহ তাকে এ অধিকার প্রদান করেছেন।

নিসাবের অতিরিক্ত ভাংতি সম্পদের জাকাত প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ : সোনা রুপার জাকাতের নিসাব সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত রয়েছে এতে কারো দ্বিমত নেই। যেমন রুপা দুইশত দিরহামের কম হলে জাকাত আবশ্যক হবে না। এমনিভাবে সোনা বিশ মিসকাল তথা ৭ $\frac{১}{২}$ সাড়ে সাত তোলার কম হলেও জাকাত দিতে হবে না।

তবে কারো কাছে সোনা ও রুপা উভয়টি এ পরিমাণ আছে যে, কোনো একটিও নিসাব পরিমাণ হয় না তখন উভয়টিকে একত্রিত করে রুপার মূল্যের হিসাবে জাকাত দিতে হবে।

এখন কথা হলো দুই নিসাবের মধ্যবর্তী ভাংতি মালের জাকাত দিতে হবে কিনা? এ সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَثَوْرِيٍّ وَصَاحِبَيْنِ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে আবূ লায়লা ও সাহেবাঈন (র.) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন, সোনা ও রুপার নিসাবের উপরে যদি সামান্য কিছুও বাড়তি হয়, এতে হিসাব করে জাকাত দিতে হবে। যেমন, দুই শত দিরহামের উপরে এক দিরহাম বেশি হলো, সুতরাং এ অতিরিক্ত দিরহামের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে। তারা বলেন, হাদীসের বাক্য فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ এটা একটি عَامّ বা ব্যাপক শব্দ, অর্থাৎ চাই কম হোক কিংবা বেশি হোক এতে হিসাব অনুযায়ী যা ধার্য হয় তা আদায় করতে হবে। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَحَسَنْ بَصْرِيْ وَعَطَاء : ইমাম আবূ হানীফা, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, মাক্‌হুল, হাসান বসরী, আতা শা'বীসহ অনেক ইমামগণ বলেন, সোনার নিসাব বিশ দিনারের উপর যদি চার দিনার এবং রুপার নিসাব দুই শত দিরহামের উপর চল্লিশ দিরহাম বেশি হয়, তবে প্রতি চার দিনারে এক দিরহাম এবং প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম জাকাত দিতে হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, নিসাব হতে বাড়তি যদি পাঁচ হয়, তখন তাতে ঐ হিসেবে জাকাত ওয়াজিব হবে। বায়হাকী বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর লিখিত তালিকাকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। নবী করীম ﷺ আমর ইবনে হাযমকে ইয়েমেন দেশে পাঠাবার সময় এটা লিখিতভাবে দিয়েছিলেন যে,

فِيْ كُلِّ خَمْسِ اَوَاقِيْ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَادَ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ـ

হাসান বসরী হতে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) আবূ মুসা আশ'আরী (রা.)-কে লিখেছেন—

فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ـ (طَحَاوِيْ)

ইবনে আবূ শাইবাহ-এর বর্ণিত সহীহ সনদে মারফূ' হাদীস নবী করীম ﷺ বলেছেন—

اِذَا بَلَغَتْ خَمْسُ اَوَاقٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ـ

তাদের দলিলের জবাব : তাদের দলিলের জবাবে বলা হয়— ১. فَمَا زَادَ فَعَلٰى الخ এ হাদীসে বর্ণনাকারী হারিছে আওয়ার ও আসেম উভয় বিতর্কিত ব্যক্তি। ২. যুবায়ের (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস মারফূ' হওয়ার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। ৩. হাদীসটি যদি মারফূ' হয়ও তবুও فَمَا زَادَ দ্বারা সাধারণত বাড়তি হওয়ার অর্থ নয়; বরং এর অর্থ 'যদি নিসাব হতে চল্লিশ দিরহাম বেশি হয়'। তখন আর উভয় পক্ষের দলিলের মধ্যে বিরোধ থাকে না। এছাড়া হযরত মু'আয (রা.) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে—

لَا تَأْخُذْ مِنَ الْكُسُوْرِ شَيْئًا

وَعَنْ ١٧٠٨ مُعَاذٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلٰثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

১৭০৮. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাকে ইয়েমেনের দিকে [শাসনকর্তা বানিয়ে] প্রেরণ করলেন, তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি পূর্ণ এক বছর বয়সী নর বা মাদি বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি দু'বছর বয়সী বাছুর জাকাত আদায় করে।

—[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে, নবী করীম ﷺ নবম হিজরিতে হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়ামন দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান, যাওয়ার সময় তাঁকে প্রশাসনিক ব্যাপারে বিস্তারিত একখানা নির্দেশনামা সাথে দিয়েছেন, এর মধ্যে জাকাত সম্পর্কীয় বিধানসমূহও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর একাংশ এটাও ছিল যে, গরুর জাকাতে প্রত্যেক ৩০টির মধ্যে একটি একসালা নর বা মাদি বাছুর এবং প্রত্যেক ৪০ টির জন্য এক দুই বছরের একটি মাদি বাছুর দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, মহিষও গরুর পর্যায়ভুক্ত।

وَعَنْ ١٧٠٩ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُعْتَدِيْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৭০৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জাকাত আদায়ে সীমালঙ্ঘনকারী জাকাতে বাধাদানকারীর মতো। −[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন। এটা ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাণশক্তি তাই এ জাকাত উসুলের সময় কোনো রকম সীমালঙ্ঘন করতে পারবে না এতে যেমনি পাপ হবে তেমনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি হবে।

اَلْمُعْتَدِيْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যা দু'ভাবে হতে পারে তথা জাকাত আদায়কারী এবং জাকাত প্রদানকারী উভয়ের মধ্যে এ সীমালঙ্ঘন হতে পারে যা নিম্নরূপ−

প্রথমত জাকাত উসূলকারী কর্মচারীর সীমালঙ্ঘন। যেমন− ১. যে কর্মচারী জাকাত উসুলের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের ধার্যকৃত ফরজ সীমালঙ্ঘন করে, সে ততটুকু পাপ করে যে ঐ জাকাত দেয় না। ২. অথবা জাকাত আদায়ে কর্মচারী বেশি আদায় করে। ফলে সে পাপের দিক দিয়ে ঐ ব্যক্তির সমান হবে, যে লোক কোনো মালদারকে জাকাত প্রদানে নিষেধ করে। ৩. অথবা যে আদায়কারী বেছে বেছে ভাল মালগুলো জাকাতে গ্রহণ করে, সে জাকাত বাধাদানকারীর মতোই পাপী।

দ্বিতীয়ত জাকাত প্রদানকারী মালের মালিককে বুঝানো হয়েছে। যেমন− ১. মালিক কিছু কিছু মাল লুকিয়ে রেখে সীমালঙ্ঘন করে, সে পাপের দিক দিয়ে ঐ ব্যক্তির সমান যে আদৌ জাকাত দেয় না। ২. অথবা এমন ব্যক্তি বা লোকদেরকে তার জাকাত প্রদান করে যারা প্রকৃত হকদার নয়। তার পাপ জাকাত না দেওয়ারই সমান। কেননা, তার জাকাত আদায় হয়নি। ৩. অথবা সমস্ত মাল দান সদকায় কিংবা জাকাতের নামে এমনভাবে প্রদান করে যে, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে কিছুই রাখে না, এমন ব্যক্তিও সীমালঙ্ঘনকারী। ৪. অথবা জাকাত প্রদান করে খোটা দেয়, ফলে এতে গ্রহীতার মনঃকষ্ট হয়।

وَعَنْ ١٧١٠ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১৭১০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো প্রকার শস্য ও খেজুরে জাকাত নেই যতক্ষণ তা পাঁচ ওয়াসাকে না পৌঁছে।

—[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঐ সব তরিতরকারি, শাক-সবজি ও ফল-ফলাদি, যেগুলো দীর্ঘদিন ভাল থাকে না কিংবা বছরের শেষ পর্যন্ত গুদামজাত করাও যায় না। এ জাতীয় জিনিসে জাকাত হবে কিনা? জনমনে প্রশ্ন জাগতে পারে। সুতরাং তা নিরসনের ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, দানা জাতীয় শস্য তথা কাঁচা মাল যেমন শাক-সবজি ও তরিতরকারি ইত্যাদি। এসব জিনিসে জাকাত দিতে হবে না। তবে হ্যাঁ খেজুর পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে জাকাত দিতে হবে। এর কম হলে দিতে হবে না।

ফলমূল শাক-সবজির জাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : মূসা ইবনে তালহা (রা.) বলেন, আমাদের কাছে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর লিপি পৌঁছেছে, তিনি হুযূর ﷺ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন– إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, শস্য ও খেজুরে জাকাত দিতে হবে।

জমহূরে ওলামা বলেন, শাক-সবজি ও কাঁচা মালে জাকাত ওয়াজিব হয় না, যেগুলো বেশি দিন ভাল থাকে না এবং পূর্ণ বছর গুদামজাতও করা যায় না। আলোচ্য হাদীসই তাঁদের দলিল। অবশ্য শস্য ও খেজুরের জাকাত দিতে হবে, যদি তা পাঁচ ওয়াসাক বা তার চেয়ে বেশি হয়। এ অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে ওয়াসাকের হিসাব ও পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, খেজুর, আঙ্গুর, কিসমিস ও দানা জাতীয় শস্য এবং অন্যান্য শস্য কম হোক বা বেশি হোক এর নির্দিষ্ট কোনো নিসাব নেই। তাতে জাকাত দিতে হবে। কেননা, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীস ও কুরআনের আয়াতটি সাধারণ বিধান। এতে নিসাব ও পরিমাণের উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

১- فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ عُشْرٍ -

২- قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ -

তাদের দলিলের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে বিপরীত মত পোষণকারী দলিলের জবাবে অর্থাৎ আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, এ হাদীস ব্যবসায়িক দ্রব্যসামগ্রী ও ব্যবসায়িক শস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

وَعَنْ ١٧١١ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ مُرْسَلٌ رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ -

১৭১১. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর একখানা পত্র আছে, যা তাকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ হতে প্রদান করা হয়েছিল। ইবনে তালহার বর্ণনা, তিনি বলেন রাসূলে কারীম ﷺ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন– গম, যব, আঙ্গুর ও খেজুর হতে জাকাত আদায় করতে। হাদীসটি শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঐতিহাসিকভাবে এটাই প্রসিদ্ধ যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে হাদীস লিখা হতো না বা হয়নি। উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের খেলাফত আমলে তথা ৯৯ হিজরিতেই লিখা শুরু হয়েছে এ কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়, বরং নবী ﷺ -এর জমানায়ও কম বেশি কিছু না কিছু হাদীস লিখা হয়েছিল, কোনোটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে, আবার কোনোটি কোনো কোনো সাহাবী আপনি হতেই। হুযূরের নির্দেশে যে কিছু কিছু লিখা হয়েছে আলোচ্য হাদীসই এর প্রমাণ। যেখানে তিনি গম, যব, কিসমিস ও খেজুর হতে জাকাত উসুল করার জন্য ইয়ামনের শাসনকর্তা হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে লিখিতভাবে নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন।

يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ -এর ব্যাখ্যা : জমিতে উৎপাদিত ফসলের জাকাত নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ–

আল্লামা ইবনুল মালিক বলেন, হাদীসের উল্লিখিত উক্ত চারটিরই শুধুমাত্র $\frac{১}{১০}$ বা $\frac{১}{২০}$ অংশ দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট জমিতে উৎপাদিত কেবলমাত্র খাদ্য জাতীয় দ্রব্যতে $\frac{১}{১০}$ বা $\frac{১}{২০}$ অংশ জাকাত ওয়াজিব।

আর আহনাফের নিকট জমিতে উৎপাদিত সকল দ্রব্যতে $\frac{১}{১০}$ বা $\frac{১}{২০}$ অংশ জাকাত ওয়াজিব। তা খাদ্য জাতীয় হোক বা না হোক। তারা বলেন, তথায় ঐ চারটি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হতো বলে ঐ চারটির কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হযরত মু'আয (রা.)-এর নিকট লিখিত কপি যদি শুদ্ধভাবে অনুলিখন হয়ে থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, সেখানে জাকাত আদায়ের মতো উপযুক্ত অন্য কোনো দ্রব্য না থাকায় উল্লিখিত চারটি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করেছেন, তাহলে এর অর্থ হলো– এ জাতীয় দ্রব্য থেকে জাকাত আদায় করা হবে। আর গম-যব উল্লেখ করার কারণ হলো– অন্যান্য দ্রব্যের চেয়ে সেখানে এগুলো বেশি হতো। কাজেই হানাফীদের মতানুযায়ী খাদ্য জাতীয় বস্তুতে জাকাত আবশ্যক হবে।

وَعَنْ ١٧١٢ عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ زَكٰوةِ الْكُرُوْمِ اِنَّمَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدّٰى زَكٰوتُهٗ زَبِيْبًا كَمَا تُؤَدّٰى زَكٰوةُ النَّخْلِ تَمْرًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১৭১২. অনুবাদ : হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ আঙ্গুরের জাকাত সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা পরিমাপ করা হবে যেভাবে খেজুরের গাছে পরিমাপ করা হয়, অতঃপর যাবীব বা মিষ্টি অবস্থায় এর জাকাত দেওয়া হবে যেভাবে খেজুরের জাকাত 'তামার' অবস্থায় দেওয়া হয়। —[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক সময় খায়বার এলাকাটি ইহুদিদের দখলে ছিল। সপ্তম হিজরিতে মুসলমানরা তা জয় করেন। সেই এলাকাটি ছিল অত্যধিক খেজুরের বাগানসমৃদ্ধ। এক চুক্তির মাধ্যমে সেই এলাকাটির রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকের দায়িত্ব মহানবী ﷺ ইহুদিদের উপরে ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু তারা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। তারা সমস্ত ফসলের কথা জাকাত বা ওশর খারাজের সময় প্রকাশ করত না; বরং কিছু লুকিয়ে রাখত। তাই জাকাত উসুলকারীগণ ফল কাঁচা থাকতেই একবার এক গাছের উপরেই অনুমান করে যেতেন, যাতে তারা প্রতারণা করার সুযোগ না পায়। রাসূল ﷺ বলেছেন– খুরমা গাছের উপরে যে কাঁচা খুরমা আছে তা এরূপে অনুমান করতে হবে যে, শুকালে তার ওজন বা পরিমাণ কতটুকু হবে, ফলে সে পরিমাণের উপর জাকাত উসুল করতে হবে। অনুরূপভাবে আঙ্গুরের অবস্থাও তাই হবে। এতে অনেকটা সঠিক পরিমাপ না হলেও ইহুদিদের প্রতারণার জন্যে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

অনুমান করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : ফল-ফলাদি জাকাতের জন্যে অনুমান করা যাবে কিনা এবং কিভাবে করবে? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেন, অনুমানকারী কর্মচারীর উচিত, অনুমান করার সময় মালের মালিকের প্রতি উদারতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করবে তথা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বাদ দিবে, এর জাকাত নিবে না। যেন তারা সেই অংশগুলো দ্বারা নিজে উপকৃত হতে পারে এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দিতে পারে। সহল ইবনে আবূ হাসামার হাদীস তাদের অন্যতম দলিল।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আবূ হানীফা (র.) বলেন, জাকাতের হুকুম সম্পূর্ণ মালের অনুসারে ওয়াজিব হয়, কাজেই তা বাদ দেওয়া যাবে না।

ইমাম আহমদের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, নবী করীম ﷺ -এর সে বিধানটি কেবল মাত্র খায়বরের ইহুদিদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। কেননা, আমরা পূর্বেই বলেছি, তাদের সাথে মহানবী ﷺ -এর একটা আধা-আধি ভাগের চুক্তি হয়েছিল।

বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.) : নাম– আত্তাব, পিতার নাম– উসাইদ। তিনি উমাইয়া বংশের করশী উপশাখার। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। হুনাইনের যুদ্ধে যাবার সময় রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তিনি গভর্নর থাকা অবস্থায়ই রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁকে উক্ত পদেই বহাল রাখেন।

মর্যাদা : তিনি মক্কার অভিজাত, সম্ভ্রান্ত এবং সুশীল মানুষ ছিলেন।

ইন্তেকাল : তিনি ১৩তম হিজরিতে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের দিন ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ١٧١٣ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ (رض) حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَاِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

১৭১৩. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে আবূ হাসমা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, যখন তোমরা অনুমান করবে এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিয়ে অবশিষ্ট গ্রহণ করবে যদি এক-তৃতীয়াংশ না-ই ছাড় কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ ছাড়বে।

—[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাকাত উসুলকারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুকুম মালিকদের প্রতি দয়া পরবশ হয়েই করেছিলেন। যাতে তারা নিজের গরিব প্রতিবেশী ও মুসাফিরদেরকে নিজেদের অংশ হতে দিতে না হয়। রাসূলে কারীম ﷺ -এর এ নির্দেশ এ জাতীয় ফল-ফলাদির সাথেই সীমাবদ্ধ। কেননা, এটা খাদ্য-খোরাকও বটে, কেবল 'তাফাক্কুহ্' বা আনন্দ উপভোগের সামগ্রী নয়।

وَعَنْ ١٧١٤ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ اِلٰى يَهُوْدَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ اَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৭১৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে খায়বরের ইহুদিদের কাছে পাঠাতেন, তিনি তাদের খেজুর মিষ্টি হওয়ার সময়েই খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বেই অনুমান করে পরিমাপ করতেন।

—[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গাছের ফল, ফসল সঠিকভাবে পরিমাপ করতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) ছিলেন অত্যধিক পারদর্শী। খায়বরের ইহুদিরা বশ্যতা স্বীকারকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বার্ষিক যে পরিমাণ ফল-ফসল দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিমাপ করার জন্যে ইবনে রাওয়াহা (রা.)-কে পাঠাতেন। সুতরাং সেই ফল-ফসল পাকার সময় অর্থাৎ ফল বাড়তির সময় শেষ হয়ে গেলে, খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বেই তিনি গিয়ে তা অনুমান করে পরিমাপ করতেন।

এখানে পর পর কয়েকটি হাদীস হতে বুঝা যায় যে, ফলের ব্যাপারে অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাপ করাই যথেষ্ট। কিন্তু ফকীহদের মতে এটা সুদ হবে। সুতরাং মেপে নেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের মতে এ সকল হাদীস সুদ হারাম হওয়ার পূর্বকালের ঘটনা। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, ফকীহদের এ অভিমত অযৌক্তিক। কেননা, বেচাকেনার ব্যাপারে অনুমান ভিত্তিক লেনদেন করা জায়েজ নেই, তাতে সুদ হবে। অথচ এখানে আলোচনা হলো জাকাতের।

وَعَنْ ١٧١٥ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعَسَلِ فِىْ كُلِّ عَشَرَةِ اَزُقٍّ زِقٌّ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ فِىْ اِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا الْبَابِ كَثِيْرُ شَىْءٍ)

১৭১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন মধুতে প্রত্যেক দশ মশকে এক মশক জাকাত। —[তিরমিযী]

তিরমিযী বলেছেন, এ সনদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সহীহ সূত্রে বেশি কিছু বর্ণিত পাওয়া যায় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মধুর জাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, দশ মশক পরিমাণ মধু কারো নিকট থাকলে জাকাত ওয়াজিব হয়। এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَوْزَاعِيْ وَ زُهْرِيْ وَغَيْرِهِمْ :

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.), আহমাদ (র.), ইসহাক (র.), আওযায়ী (র.), যুহরী (র.), রবীয়াহ (র.) ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (র.) প্রমুখ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রাচীন অভিমত অনুসারে দশ মশক মধুতে এক মশক মধু জাকাত ওয়াজিব হয়। তাঁরা আলোচ্য হাদীস ও নিম্নলিখিত দলিল সমূহ তাঁদের মতের অনুকূলে পেশ করেন–

২. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً অর্থাৎ তাদের মালামাল হতে জাকাত গ্রহণ করো, মধুও এক প্রকার মাল। অতএব, এটা হতেও জাকাত গ্রহণ করতে হবে। ইমাম আবূ বকর রাযী (র.) ও আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হানাফীগণ নিম্নলিখিত হাদীসসমূহ দ্বারাও দলিল পেশ করেন–

١. عَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ـ

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلٰى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ عَنِ الْعَسَلِ عُشْرًا - (تِرْمِذِيْ)

٣. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ (رضـ) أَمَرَهُ فِي الْعَسَلِ بِالْعُشْرِ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّ عِنْدَنَا وَادِيًا فِيْهِ عَسَلٌ كَثِيْرٌ فَقَالَ عَلَيْهِمْ فِيْ كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ (عَطَاء خُرَاسَانِيْ)

٥. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْخَذُ فِيْ زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً مِنْ أَوْسَطِهَا قَالَ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ـ

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ :

ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত অনুযায়ী মধুর ক্ষেত্রে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

ক. عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَسَلِ فِي الْيَمَنِ قَالَ لَمْ أُوْمَرْ فِيْهِ شَيْئٌ.

খ. অনুরূপভাবে বাদায়েস্ সানায়ে গ্রন্থে ইমাম শাফিয়ী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, মধুর ক্ষেত্রে ওশর ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত যতগুলো রেওয়ায়াত আছে এর একটিও প্রমাণের স্তরে পৌঁছেনি।

জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, তারা প্রথম দলিলে হযরত মু'আয (রা.)-এর উক্তি– لَمْ أُوْمَرْ فِيْهِ شَيْئٌ নিয়েছেন। এ আদেশ প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, জাকাত ওয়াজিব হয়নি। হযরত মু'আয (রা.)-এর নেতিবাচক জবাবের তুলনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, ওশর ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলো প্রমাণের স্তরে পৌঁছেনি; কিন্তু আমাদের মতে, কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

মধুতে যে ওশর হবে তার নিসাব সংক্রান্ত ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এ বিষয়ে বিভিন্ন রকমের অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, দশ মশক হলে তবে ওশর দিতে হবে, তিনি পাঁচ মণের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শরহে বিকায়া গ্রন্থে সাহেবাঈনের মাযহাবে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, মধুতে ওশর প্রদানের জন্যে নিসাব পাঁচ ওয়াসাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

কিন্তু ইমাম আযম (র.) বলেন, মধুতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কোনো নিসাব নির্দিষ্ট নেই। মধু কম হোক বা বেশি হোক এতে ওশর ওয়াজিব হবে। তিনি প্রকাশ্য হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন– فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ

তাঁদের হাদীসের জবাব এই যে, তাতে জাকাতের উল্লেখ আছে অথচ এখানে স্পষ্টভাবে ওশরের বর্ণনা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান আধুনিক যুগে মধু আহরণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে একটি পেশা বিশেষ এবং এটা একটি বিশেষ সম্পদও বটে। সুতরাং এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর قَوْلِيْ এবং فِعْلِيْ হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের কার্যক্রম বর্তমান থাকায় মধুর মধ্যে জাকাত ওয়াজিব না হওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

وَعَنْ ١٧١٦ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৭১৬. অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা জাকাত দাও– যদিও তোমাদের গহনাপত্রেরও হোক না কেন? কেননা, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই হবে বেশির ভাগ। —[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহানবী ﷺ -এর সাধারণ অভ্যাস যদিও এটা ছিল যে, অধিক সময় পুরুষদেরকে ওয়াজ-নসিহত শুনাতেন, কিন্তু মাঝে মধ্যে এককভাবে মহিলা সমাজেও ভাষণদান করতেন এবং তাদের সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নসিহত করতেন। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর স্ত্রী যয়নব (রা.) বলেন, একবার হুযূর ﷺ কেবলমাত্র মহিলাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দানকালে বললেন, তোমরা তোমাদের পক্ষ হতে সদকা তথা জাকাত আদায় কর, এমনকি তোমাদের ব্যবহৃত অলংকারাদি হলেও জাকাত আদায় করা আবশ্যক। কেননা, মি'রাজের রাত্রে আমি বেহেশত ও দোজখ পরিভ্রমণকালে দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসী বেশির ভাগই মহিলা। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে– اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ অর্থাৎ, খেজুরের একটি টুকরা দ্বারা হলেও জাহান্নামের আগুন হতে বেঁচে থাক। এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, সদকা, জাকাত দ্বারা দোজখের শাস্তি হতে নিরাপদে থাকা যেতে পারে। তাই রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে সদকা, জাকাত প্রদান করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্যবহারের অলংকারের জাকাত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারের জাকাত দিতে হবে কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْاَحْنَافِ وَغَيْرِهِمْ : সাহাবীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.), ইবনে মাসঊদ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ এবং তাবেয়ীদের মধ্যে একদল শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী তথা সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.), সা'দ ইবনে যুবায়ের (র.), আতা (র.), মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.), জাবির ইবনে ইয়াযীদ (র.), মুজাহিদ (র.), যুহরী (র.), তাউস (র.), যাহহাক (র.), আলকামা (র.), আসওয়াদ (র.), ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) প্রমুখ এবং ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.), শাফেয়ী (র.) [পূর্বমত অনুসারে] এবং সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর অভিমত এই যে, মহিলাদের ব্যবহারের অলংকারে জাকাত ওয়াজিব হবে।

দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

১. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَدَّادٍ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ (رض) فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكٰوتَهُنَّ؟ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ - (رَوَاهُ حَاكِمٌ وَاَبُوْدَاوُدَ)

২. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ دَخَلْتُ وَخَالَتِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْنَا اَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا اَتُعْطِيَانِ زَكٰوتَهَا فَقُلْنَا لَا فَقَالَ اَمَا تَخَافَانِ اَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ اَسْوِرَةً مِنَ النَّارِ اَدِّيَا زَكٰوتَهَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৩. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا بِنْتٌ لَهَا وَفِيْ اَيْدِيْ اِبْنَتِهَا مُسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنَ الذَّهَبِ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكٰوةَ هٰذَا قَالَتْ لَا قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাযী (র.) লিখেন যে, আমাদের মাযহাব মতে, মহিলাদের ব্যবহারের অলংকারের জাকাত হওয়াই বিশুদ্ধ কথা, কুরআন মাজীদের اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ আয়াতই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ, এটা ছাড়া রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাধারণ বাণীসমূহ এর পক্ষে প্রমাণ বহন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ক. هَاتُوْا رُبُعَ عُشْرِ اَمْوَالِكُمْ খ. فِى الرِّقَّةِ رُبُعُ عُشْرٍ

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ : পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মধ্যে ইবনে ওমর (র.), জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (র.), হযরত আয়েশা (র.) ও কাসেম ইবনে মুহাম্মদ সায়াবী (র.) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এবং ইমামগণের মধ্যে ইমাম মালেক (র.), শাফেয়ী (র.), আহমাদ (র.) ও ইসহাক (র.) প্রমুখের অভিমত হলো মহিলাদের ব্যবহারের অলংকারে জাকাত ওয়াজিব হবে না। তাঁরা নিম্নোক্ত দলিলসমূহ উপস্থাপন করেন–

١. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ لَيْسَ فِى الْحُلِيِّ زَكٰوةٌ ـ

٢. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَا زَكٰوةَ فِى الْحُلِيِّ - (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

٣. عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ سَلْمَانَ قَالَتْ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْحُلِيِّ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهِ زَكٰوةٌ - (دَارُقُطْنِىْ)

٤. عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا كَانَتْ تَلِى بَنَاتَ أُخْتِهَا يَتَامٰى فِىْ حِجْرِهَا فَلَا تَخْرُجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكٰوةَ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

٥. إِنَّ ابْنَ خَالِدٍ سَأَلَ جَابِرًا عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيْهِ زَكٰوةٌ فَقَالَ جَابِرٌ (رض) لَا وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِيْنَارٍ - (شَافِعِىٌّ وَبَيْهَقِىٌّ)

তাঁদের দলিলের জবাব : হানাফীদের পক্ষ হতে উপরিউক্ত ইমামগণের দলিলের জবাবে বলা হয়েছে যে–

১. তাঁরা দলিলে যে জাবির (রা.)-এর হাদীস নিয়েছেন, ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, এ হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। এর অন্যতম রাবী আফিয়া ইবনে আইয়ুব মাজহূল বা অপরিচিত।

২. আল্লামা আমীর ইয়েমেনী (র.) সুবুলুস সালাম গ্রন্থে বলেন, সহীহ হাদীসের বর্তমানে আছার মূল্যহীন। অতএব, এক্ষেত্রে আছার আমলযোগ্য নয়।

৩. হযরত আয়েশা (রা.)-এর জাকাত না দেওয়ার কারণ হলো তাঁর ভগ্নির কন্যাগণ ছিল এতিম। এতিমের সম্পদে যে জাকাত হয় না তা সহীহ্ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

৪. বর্ণনাকারী হতে যখন স্বীয় বর্ণনার বিপরীত আমল পাওয়া যায় তখন উক্ত বর্ণনা বাতিল যোগ্য হয়। হযরত আয়েশা (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.) হতে জাকাত হওয়ার আমল সম্বলিত মারফূ' ও মাওকূফ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং জাকাত না হওয়ার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. মাওকূফ ও মারফূ' হাদীসে দ্বন্দ্ব হলে মারফূ' হাদীসই আমলযোগ্য হওয়া বিধিসম্মত। এ জন্যে উক্ত ইমামগণের হাদীস আমলযোগ্য হবে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, সোনা-রুপার অলংকার ব্যবহৃত হোক বা না হোক নিসাব পরিমাণ হলে তার উপর জাকাত দিতে হবে। কেননা, এর মূল্যের উপরই বিশ্বের বাজার নির্ভর করে আর এটা হলো মালে নামী বা বর্ধনশীল সম্পদ।

فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ -এর ব্যাখ্যা : একদা রাসূল ﷺ মহিলা সমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা [জাকাত] দাও, যদিও তা তোমাদের গহনা থেকে হোক না কেন। কেননা কিয়ামতের দিন তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামবাসী হবে। এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন–

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, মহিলাদের অধিকাংশই দোজখবাসী হবে। কারণ–

لِمَحَبَّةِ الدُّنْيَا الْبَاعِثَةِ عَلٰى تَرْكِ الزَّكٰوةِ وَالصَّدَقَةِ ـ

২. তারা প্রায় সময়ই দান-খয়রাত করতো না এবং গহনার জাকাত আদায় করতো না।

৩. অধিকাংশ মহিলাই স্বামীর হক আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। ফলে তারা স্বামীর নাফরমানী করে।

وَعَنْ ١٧١٧ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ أَيْدِيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا تُؤَدِّيَانِ زَكٰوتَهُ قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَأَدِّيَا زَكٰوتَهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ رَوَى الْمُثَنّٰى بْنُ الصَّبَّاحِ

১৭১৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন রমণী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন করল তখন তাদের দু'হাতে দু'টি স্বর্ণের বালা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর জাকাত আদায় কর? তারা উত্তর দিল, 'না'। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ তা'আলা [কিয়ামতের দিন] তোমাদেরকে আগুনের বালা পরাবেন? তারা বললেন, কখনও না তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তোমরা এর জাকাত প্রদান করবে। —[তিরমিযী]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هٰذَا وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ وَابْنُ لَهِيْعَةَ يُضَعَّفَانِ فِى الْحَدِيْثِ وَلَا يَصِحُّ فِى هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَئٌ -

তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটির অনুরূপ হাদীস মুসান্না বিন সাব্বাহ ও আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। মুসান্না বিন সাব্বাহ ও ইবনে লাহিয়া উভয়ই হাদীসে যয়ীফ। এ পরিচ্ছেদে নবী করীম ﷺ হতে সহীহ সূত্রে কিছু প্রমাণিত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একবার দু'জন মহিলা নবী কারীম ﷺ -এর কাছে যে কোনো কাজে আসল। তখন তাদের হাতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি ছিল, যার জাকাত তারা দেয়নি বা দিত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথায়ও তারা স্বীকার করেছে যে, তারা তার জাকাত আদায় করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তাহলে তোমরা কি এটা পছন্দ করবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ত'আলা তোমাদেরকে আগুনের চুড়ি পরিয়ে দিবেন? তারা বলল, তা কখনও হতে পারে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তাই হয়, তবে তোমরা এর জাকাত আদায় করবে। মোটকথা, এ হাদীস হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ব্যবহৃত অলংকারেও জাকাত দিতে হবে।

وَعَنْ ١٧١٨ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدّٰى زَكٰوتُهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْدَاوُدَ)

১৭১৮. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণের 'বালি' পরিধান করতাম। আমি একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি সেই গুপ্তধনের অন্তর্গত [যার বিষয়ে কুরআনে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে?] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যা জাকাতের নিসাব পর্যন্ত পৌছে যায় এবং এর জাকাত দেওয়া হয় তা গুপ্তধন নয়। —[মালিক ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে যে, اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الخ অর্থাৎ যারা সোনা-রুপার জাকাত আদায় করে না তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। অর্থাৎ যে মালের জাকাত দেওয়া হয়নি তা 'কান্‌য' তথা গুপ্তধনের অন্তর্গত। হযরত উম্মে সালামার কাছে স্বর্ণের এক প্রকার গহনা বিশেষ যা কানে পরিধান করা হয়, পরা অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি হুযুর ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এ অলংকার গুপ্তধন তথা 'কান্‌য' এর আওতাভুক্ত কিনা অর্থাৎ এটা অপরাধ হওয়ার মতো মাল কিনা? হুযূর ﷺ বললেন, জাকাত দিলে আর এটা 'কান্‌য' থাকবে না যদি তা নিসাব পরিমাণে পৌছে।

রাবী পরিচিতি :

১. **উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) :** নাম– হিন্দ, উপমান– উম্মে সালামা, পিতার নাম– সুহাইল, আবূ উমাইয়া নামে প্রসিদ্ধ। মাতার নাম– আতিকা বিনতে আমির।

২. **বংশানুক্রম :** হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখযূম।

৩. **প্রথম বিবাহ :** হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর বিবাহ প্রথমে তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল আসাদের সাথে হয়। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর দুধ ভাই। তিনি মূল নাম অপেক্ষা আবূ সালামাহ উপনামেই বেশি প্রসিদ্ধ।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** নবুয়তের শুরু লগ্নে তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. **হিজরত :** তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন হাবশায় হিজরত করেন। পরে আবার মক্কা মুকাররমায় হিজরত করেন। সেখান হতে প্রথমে তাঁরা স্বামী পরে তিনি একাকী মদীনায় হিজরত করেন। তিনি মদীনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা।

৬. রাসূলের সাথে বিবাহ : হিজরি চতুর্থ সালে তাঁর প্রথম স্বামী আবূ সালামা ইন্তেকাল করলে হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যস্থতায় রাসূল ﷺ -এর সাথে শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। রাসূল ﷺ -এর গৃহে তাঁর কোনো সন্তান জন্ম হয়নি। পূর্বের স্বামীর গৃহে তাঁর চারটি সন্তান ছিল।

৭. শারীরিক গঠন : তিনি অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী ছিলেন। ইসাবাহ গ্রন্থে তাঁকে অসামান্য রূপসী বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে- كَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ مَوْصُوْفَةً بِالْجَمَالِ الْبَارِعِ

৮. মর্যাদা ও কৃতিত্ব : রাসূলে কারীম ﷺ -এর সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণই বহু গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তবুও হযরত আয়েশা (রা.) এবং উম্মে সালামার জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। তিনি একজন অনুসন্ধিৎসু গবেষক ছিলেন।

৯. ইন্তেকাল : তাঁর ইন্তেকালের সন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য মতানুসারে তিনি ৮৪ বছর বয়সে ৬১/৬২/৫৯/৬৩ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ করা হয়।

وَعَنْ ١٧١٩ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৭১৯. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করতেন- আমরা যা বিক্রির জন্য তৈরি করি তার যেন সদকা [জাকাত] দেই। —[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দিরহাম, দিনার তথা সোনা, রুপা ও পশুর মধ্যেই জাকাত ওয়াজিব হয়। আর পবিত্র কুরআনুল কারীমেও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, কোন কোন মালে জাকাত দিতে হবে। তাই এ প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক- ব্যবসায়ী পণ্যের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা হযরত সামুরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস থেকে পাই। হযরত সামুরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন সব মালে জাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন যা আমরা ব্যবসার জন্যে প্রস্তুত রাখি। তথা ব্যবসার সম্পদে জাকাত দেওয়ার জন্যে রাসূল ﷺ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ব্যবসায়ের সম্পদের জাকাতের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ :

مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ আহলে জাওয়াহিরের মতে, ব্যবসায়ের মালে জাকাত নেই। কেননা, জাকাত ফরজ হওয়া শুধু নস দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। নস শুধু দিরহাম, দিনার ও গৃহপালিত পশুর ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অন্য কিছুতে যদি জাকাত ফরজ হয় তবে কিয়াসের দ্বারা হবে, আর কিয়াস তো দলিল নয়।

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ اَرْبَعَةٍ : চার ইমামের মতে, ব্যবসায়ের মালে জাকাত ফরজ হবে, যদি এর মূল্য সোনা ও রুপার নিসাবের সমতুল্য হয়। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে উপরোল্লিখিত হাদীস ও নিম্নলিখিত দলিলসমূহ পেশ করেন-

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

এ ধরনের আম শব্দে ব্যবসায়ের মালও অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ এ হাদীসে সর্বপ্রকার মালে জাকাত ফরজ করা হয়েছে। তা ব্যবসায়ের হোক বা অন্য কোনো প্রকারের হোক।

١. عَنْ مَرْوَانَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمِ قَالُوْا فِى الْعُرُوْضِ تُدَارُ الزَّكٰوةُ كُلَّ عَامٍ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكٰوةُ حَتّٰى تَاْتِىَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ -

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ مَالٍ يُدَارُ فِىْ عَبِيْدٍ اَوْ دَوَابٍّ اَوْ بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ يُدَارُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ فِىْ كُلِّ عَامٍ - (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَيْسَ فِى الْعُرُوْضِ زَكٰوةٌ اِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ - (بَيْهَقِىْ)

আহলে জাওয়াহিরের যুক্তির জবাব : চার ইমামের পক্ষ হতে আহলে জাওয়াহিরের যুক্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, ব্যবসায়ের মালের জাকাত শুধু কিয়াসের দ্বারাই নয়; বরং কুরআনের আয়াত ও বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এর উপরে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "কিয়াস শরিয়তের দলিল নয়" এ কথা বলাও কুরআনের আয়াতের বিপরীত।

وَعَنْ ١٧٢٠ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا اِلَّا الزَّكٰوةَ اِلَى الْيَوْمِ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১৭২০. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত রাবীয়া ইবনে আবূ আব্দুর রহমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একাধিক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল ইবনে হারিছ মুযানীকে 'ফারয়ে'র দিকের 'কাবালিয়া' নামক স্থানের খনিসমূহ জায়গীর রূপে প্রদান করেছিলেন। সে সকল খনির জাকাত ছাড়া অদ্যাবধি আর কিছু আদায় করা হয়নি। —[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোনো রাজা বাদশাহ বা জমিদার কোনো সৈন্য কিংবা প্রজাবৃন্দকে বৃত্তি বা দান হিসেবে কোনো জায়গা বা এলাকা প্রদান করাকে اَقْطَعَ বলা হয়, সাহিত্যের ভাষায় একে 'জায়গীরদারী' বলে। নবী করীম ﷺ হযরত বেলাল ইবনে হারিছ মুযানীকে 'কাবালিয়া' নামক একটি এলাকা জায়গীর হিসেবে দান করেছেন সেখানে অনেকগুলো খনি ছিল। ইবনে মালেক বলেন, স্থানটি ছিল সমুদ্রের উপকূলে খনিগুলো ছিল অনাবাদ, নবী করীম ﷺ তাকে স্থানটি আবাদ করার জন্যে দিয়েছিলেন। সেসব খনির জাকাত ছাড়া অদ্যাবধি অন্য কিছু আদায় করা হয় না।

খনির প্রকারভেদ : খনি সাধারণত তিন প্রকার– ১. যা জমাটবদ্ধ নয়। যেমন তৈল, পানি, রাং ও গন্ধক ইত্যাদি। এতে সর্বসম্মতিক্রমে খুমুস দিতে হবে না। ২. যা জমাটবদ্ধ অথচ গলানোর উপযোগী নয়, যেমন– চুনা, হরিতাল, পাথর ও ইয়াকূত ইত্যাদি। এ জাতীয় খনিজ পদার্থেও খুমুস দিতে হবে না। ৩. যা জমাটবদ্ধ তবে আগুনে গলানো যায়, যেমন– সোনা, রুপা ও সীসা ইত্যাদি।

খনির জাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সোনা-রুপার খনিতে জাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু লোহা ও সীসা ইত্যাদির খনিতে জাকাত দিতে হবে না। ইমাম আহমদ (র.) বলেন– সোনা-রুপার খনিতে নিসাবের সীমা পরিমাণ পৌঁছলে 'রোবয়ে উশর' অর্থাৎ ৪০ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। যদি সোনা-রুপা ছাড়া অন্য কোনো পদার্থের খনি হয়, তখন এর মূল্য হিসাব করে দু' শত দিরহাম হলে, ওশরের এক-চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে। তারা আলোচ্য হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা তথা হানাফীদের মতে সব রকমের খনিতে 'খুমুস' এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে, যদি তা খারাজী কিংবা ওশরী জমিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি মালিকানাধীন জমিতে পাওয়া যায় তখন এ সম্পর্কে ইমাম আযমের দু'টি অভিমত রয়েছে। যদি এটা বাসগৃহে পাওয়া যায়, তখন ইমাম আযম (র.)-এর মতে খুমুস হবে না; বরং জাকাত দিতে হবে।

আর সাহেবাঈন (র.) বলেন, খুমুস হবে। ইমাম শাফেয়ীর দ্বিতীয় অভিমত হলো যদি এটা পেতে মানুষের পরিশ্রম ও চেষ্টা খাটাতে হয়, তখন এতে ৪০ ভাগে এক ভাগ দিতে হবে। আর যদি বিনা পরিশ্রমে পেয়ে যায়, তখন 'খুমুস' দিতে হবে। ইমাম আযম (র.)-এর দলিল হলো সেই প্রসিদ্ধ হাদীস– وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

উল্লেখ্য যে, رِكَاز -এর দু'টি অর্থ। একটি হলো খনি আর দ্বিতীয়টি হলো كَنْز বা গুপ্তধন। প্রথম অর্থ হলো প্রকৃত আর দ্বিতীয়টি হলো রূপক।

উল্লেখ্য যে, বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থকার এতে কয়েকটি দলিল গ্রহণ করেন। প্রথমত এখানে রিকাযকে পেছনের শব্দের উপরে عَطْف করা হয়েছে এবং মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহির বিপরীত হচ্ছে। সুতরাং এখানে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, রিকায দ্বারা খনি বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত رِكَاز শব্দটি رَكْز হতে অনুসৃত হয়েছে। رَكْز -এর আভিধানিক অর্থ ভূমি হতে উদ্ভূত হওয়া। খনিতে যা কিছু আছে, প্রকৃতপক্ষে তা ভূমি হতে উদ্ভূত। তবে كَنْز এরূপ নয়। কেননা, كَنْز -কে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ না কেউ জমিতে পুঁতে রাখে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : হানাফীগণ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আনীত দলিলের জবাব এভাবে দিয়েছেন–

১. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, মূল রেওয়ায়াতে– لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا اِلَّا الزَّكٰوةُ اِلَى الْيَوْمِ কথাটি নেই। এটা রাবী কর্তৃক মুদরাজ করা হয়েছে, অর্থাৎ বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

২. ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুয়াত্তায় ইঙ্গিত করেছেন যে, এ হাদীসটি মাওকূফ হাদীসের বিপরীত হওয়াতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, এটা ঐ হাদীস নয়, যা মুহাদ্দিসগণ প্রমাণ করেন। যদি প্রমাণ করেনও তাতে তো জায়গীরের কথা উল্লেখ আছে, জাকাতের কথা উল্লেখ নেই।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র.) বলেন, যদি জাকাতের কথা বর্ণিতও হয় তবে ওশরের এক-চতুর্থাংশের কোনো নস নেই; বরং আরও দু'টি অর্থের সম্ভাবনা থাকে। এক- এতে খুমুস নেওয়া হবে, যা মূলত জাকাত। দুই– যখন এর মালিক হবে এবং এতে এক বছর পূর্তি হবে তখন জাকাত দিবে। এটা একদল মুহাদ্দিসের অভিমত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٢١ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِى الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَلَا فِى الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلَا فِىْ اَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِى الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِى الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصَّقْرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ - (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ)

১৭২১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, শাক-সবজিতে জাকাত নেই, ধার দেওয়া খেজুর গাছের খেজুরের জাকাত নেই, পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলে জাকাত নেই, কর্মের উট-গরুতে জাকাত নেই, 'জাব্‌হা'-তে জাকাত নেই। বর্ণনাকারী সাকর বলেন, 'জাব্‌হা' বলতে ঘোড়া, খচ্চর ও কৃতদাস বুঝায়। —[দারে কুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আলী (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যেসব বস্তু কাঁচা মাল, একদিকে মানুষের 'খাদ্য' হিসেবে পরিগণিত নয়। অর্থাৎ তা দ্বারা জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়; বরং এটা খাদ্যের সহায়ক, যেমন– ক্ষিরা, শশীন্দা, মূলা, সীম, গাঁজর, শালগম, তরমুজ বেগুন ইত্যাদি। শুধু এগুলো খেয়ে কোনো মানুষ জীবন ধারণ করে না; বরং চাউল, গম, যব ইত্যাদি হলো মূল খাদ্য।

দ্বিতীয়ত এসব জিনিস দীর্ঘদিন গুদামজাতও করা যায় না। কাজেই এসব জিনিসে জাকাত দিতে হবে না। অনুরূপভাবে কাম-কাজে ব্যবহৃত গরু বা উটের জাকাত নেই। পাঁচ ওসকের কম শস্যে জাকাত নেই এবং 'জাব্হা'তেও জাকাত নেই। অন্যতম রাবী সাকার এর ব্যাখ্যায় বলেন, ঘোড়া, খচ্চর ও গোলামকে 'জাব্হা' বলা হয়। এমনিভাবে ধার দেওয়া খেজুর গাছের খেজুরেও জাকাত দিতে হবে না।

اَلْعَرَايَا-এর অর্থ : اَلْعَرَايَا শব্দটি عَرِيَّةٌ-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো اَلْعَطَايَا বা দান অনুদান। আর পারিভাষিকভাবে ঐ সব খেজুর গাছকে বুঝায় যা মালিক দয়াপরবশ হয়ে কোনো গরিব, মিসকিনকে এভাবে দান করে যে, তারা এর ফল-ফলাদি এক বছর বা ততোধিক সময় পর্যন্ত ভোগ করবে। এর কোনো বিনিময় নেই।

কামূস গ্রন্থকার বলেন, اَلْعَرَايَا হলো কোনো খেজুরগাছের ফল খাওয়ার নিমিত্তে এক বছরের জন্যে দান করা।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এ প্রকার ফলের মধ্যে জাকাত ওয়াজিব হয় না। তিনি এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন–

ক. এ প্রকার গাছের সংখ্যা এমন বেশি হয় না, যাতে এর ফসল জাকাতের নিসাবে পৌঁছতে পারে।

খ. এ প্রকার গাছ ও তার ফসলের মালিক এক বছরের জন্যে নিজে মালিক থাকে না, বরং মালিকানা অন্যকে হস্তান্তর করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ভূমিতে যা কিছু উৎপন্ন হোক তার এক-দশমাংশ জাকাত দেওয়া ওয়াজিব। যেমন– হাদীসে এসেছে– فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ-এর দলিল ও বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বিধায় এখানে তা পুনরুল্লেখ করা হলো না।

وَعَنْ ١٧٢٢ طَاوُسٍ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اُتِىَ بِوَقْصِ الْبَقَرِ فَقَالَ لَمْ يَاْمُرْنِىْ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِشَيْءٍ (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِىْ وَالشَّافِعِىُّ) وَقَالَ الْوَقْصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيْضَةَ -

১৭২২. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত তাউস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [ইয়ামনের শাসনকর্তা] হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর নিকট একবার এতগুলো গাভী আনা হলো যা নিসাব পর্যন্ত পৌঁছেনি। হযরত মু'আয (রা.) বললেন, রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে তা হতে কিছু গ্রহণ করতে আদেশ করেননি। –[দারে কুত্নী, শাফিয়ী]

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, 'ওয়াকস' অর্থ যা নিসাব হতে কম, যা জাকাতের নূন্যতম সীমা পর্যন্ত পৌঁছেনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গরু-মহিষের নিসাবের ন্যূনতম সংখ্যা হলো ত্রিশ। এর কম হলে জাকাত আবশ্যক হবে না। হযরত মুয়ায (রা.) যখন ইয়ামনের শাসক ছিলেন, তখনই তাঁর কাছে এসব গরু জাকাতের জন্যে আনা হয়েছিল। হযরত মু'আয (রা.) যদিও বলেছেন, এ পরিমাণ গরুর জাকাত নেওয়ার জন্যে আমাকে নির্দেশ করা হয়নি। বস্তুত এ সম্পর্কিত শরিয়তের বিধান অদ্যাবধি অনুরূপভাবেই চলে আসছে; এর কোনো পরিবর্তন হয়নি, হবেও না।

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
পরিচ্ছেদ : ফেতরা দান

صَدَقَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে صَدَقَاتٌ ; শাব্দিক অর্থ হলো– দান।
আর اَلْفِطْرُ শব্দটি বাবে نَصَرَ বা ضَرَبَ -এর মাসদার আভিধানিক অর্থ– ভঙ্গ করা, বা ধ্বংস করা, বিদীর্ণ করা। অতএব উভয়ের সম্মিলিত অর্থ হলো, দানের মাধ্যমে ভঙ্গ করা, তবে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখকে বলা হয় يَوْمُ الْفِطْرِ বা عِيْدُ الْفِطْرِ কেননা, একাধারে একমাস রোজা রাখার পর ঐ তারিখে রোজা ভঙ্গ করা হয়।
কাজেই ঈদুল ফিতরের দিন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার নিজের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততির পক্ষ হতে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে সদকা আদায় করে তাকে সদকাতুল ফিতর বলা হয়, একে زَكٰوةُ الْفِطْرِ বা اَلْفِطْرَةُ ও বলা হয়।
আল্লামা আইনীর ব্যাখ্যানুযায়ী এখানে যে اِضَافَة হয়েছে তা اِضَافَةٌ اِلَى السَّبَبِ বা কারণসূচক সম্বন্ধ আর এটা হলো রমজানের ফিতর, একে زَكٰوةُ الصَّوْمِ - زَكٰوةُ الرَّمَضَانِ -ও বলা হয়। সাদাকাতুল ফিতরের হুকুম নিয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতানুযায়ী এটা ওয়াজিব।
ইমাম ওয়াকী ইবনুল-জাররাহ বলেন– زَكٰوةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَةِ السَّهْوِ لِلصَّلٰوةِ অর্থাৎ রমজান মাসের যাকাতুল ফিতর নামাজের সিজদায়ে সাহুর সমতুল্য। অর্থাৎ নামাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে যেমন সিজদায়ে সাহু দ্বারা এটা পূর্ণ হয়ে যায় তদ্রূপ রোজার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সদকাতুল ফিতর দ্বারা এর প্রতিকার হয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে সদকাতুল ফিতর সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আলোচিত হচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম পরিচ্ছেদ

١٧٢٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের প্রত্যেক স্বাধীন, নারী, পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপরে সদকায়ে ফিত্‌র হিসেবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব ফরজ করেছেন এবং নামাজে বের হওয়ার পূর্বেই এটা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রমজানের রোজার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিপূর্ণতার জন্যই সদকাতুল ফিতর আবশ্যক করা হয়েছে। যেমনি নামাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূর্ণ হয় সহু সিজদার মাধ্যমে, এছাড়া ধনী-গরিব উভয়ে যেন অন্তত ঈদের দিন উত্তম পোশাক ও উন্নত মানের খাবার খেয়ে যেতে পারে এ জন্যেই এ ফিতরার ব্যবস্থা, আর এ ফিতরা নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির উপর আবশ্যক হয়।

সদকায়ে ফিতরের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করা ফরজ।

দলিল : হাদীস–

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ -

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ فِيْ اٰخِرِ رَمَضَانَ اَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ - فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ -

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْنِ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে, সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

দলিল : হাদীস–

١. اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِيْ فِجَاجِ مَكَّةَ اِلَّا اَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ الخ

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِيْ اَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

مَذْهَبُ مَالِكٍ (رحـ) ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, সদকায়ে ফিতর আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

দলিল : হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস। উক্ত হাদীসে فَرَضَ শব্দটি قَدَّرَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হলো– وُجُوْب সাব্যস্ত হওয়া।

কারো কারো মতে, জাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর ফরজ ছিল। পরে তা রহিত হয়ে যায়। এটি অত্যন্ত দুর্বল অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা যায় যে, خَبَر وَاحِد হচ্ছে ظَنِّى তা দ্বারা فَرْضِيَّتْ সাব্যস্ত হয় না।

ফেতরা কার উপর ওয়াজিব :

কারো প্রতি صَدَقَةُ الْفِطْرِ ওয়াজিব হওয়ার জন্য ইসলামি শরিয়ত যে সকল শর্ত আরোপ করেছে, তা হচ্ছে যথাক্রমে–

১. স্বাধীন হওয়া। সুতরাং গোলামের উপর صَدَقَةُ الْفِطْرِ ওয়াজিব নয়।

২. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর তা ওয়াজিব নয়।

৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। সুতরাং কেউ যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তবে তার উপর صَدَقَةُ الْفِطْرِ ওয়াজিব হবে না।

৪. নিসাব পরিমাণ সম্পদ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে অতিরিক্ত হওয়া।

ফেতরা কখন ওয়াজিব হয় : صَدَقَةُ الْفِطْرِ কখন ওয়াজিব হয়, এ ব্যাপারে ইমামগণের দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় صَدَقَةُ الْفِطْرِ ওয়াজিব হয়। অতএব, সুবহে সাদিকের পর যে সন্তান জন্ম হয়েছে বা যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পর মুসলমান হয়েছে, তার উপর صَدَقَةُ الْفِطْرِ ওয়াজিব হবে না।

২. ইমাম আহমদ, শাফেয়ী ও ইসহাক (র.) মতে, ফিতরের রাত সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে صَدَقَةُ الْفِطْرِ ওয়াজিব হয়। صَدَقَةُ الْفِطْرِ ঈদের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব।

সদকায়ে ফিতর দেরি করে দেওয়ার হুকুম : নামাজের পর এবং সেদিনের صَدَقَةُ الْفِطْرِ আদায় বিলম্বিত হওয়া জায়েজ কিনা, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। যথা–

হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, সদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্ধারিত সময় ঈদুল ফিতরের দিন। এর আগে বা পরে আদায় করলে তা আদায় হবে না। কেননা এটা এ দিনের সাথেই খাস।

দলিল : ফাতহুল মুলহিম কিতাবের বর্ণনা– صَدَقَةُ الْفِطْرِ حَقٌّ مَعْرُوْفٌ بِيَوْمِ الْفِطْرِ

হানাফীদের মতে, صَدَقَةُ الْفِطْرِ আদায় করার নির্দিষ্ট কোনো সময় সীমা নেই। তবে ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করা মোস্তাহাব।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, صَدَقَةُ الْفِطْرِ আদায়ের ক্ষেত্রে ঈদের দিন থেকে দেরি করা ঠিক নয়। কেননা ঈদের দিনের পরে তা আদায় করলে اداء হবে না; বরং তা হবে قَضَاء

ফেতরার গমের পরিমাণের ব্যাপারে হুকুম : حِنْطَة তথা গম দিয়ে صَدَقَةُ الْفِطْرِ আদায় করার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ দিতে হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা (র.), মুয়াবিয়া, ইবনে মাসঊদ ও জাবির (রা.)-এর মতে, গম দিয়ে صَدَقَةُ الْفِطْرِ আদায় করার ক্ষেত্রে মাথাপিছু অর্ধ সা' দিতে হবে।

দলিল :

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَضَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهٖ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ .

٢. اِنَّهٗ ﷺ اَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزَمٍ فِىْ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ -

٣. فِىْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهٗ شَئٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ -

٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ صَارِخًا بِمَكَّةَ صَاحَ اَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ (وَهُوَ نِصْفُ صَاعٍ) .

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.)-এর মতে, এক্ষেত্রে মাথাপিছু এক সা' দিতে হবে।

দলিল :

١. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَىْ حِنْطَةٍ -

٢. فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اِسْحَاقَ زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ -

٣. فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ -

٤. وَفِى الْحَاكِمِ اَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ -

কাফের গোলামের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায়ের হুকুম : ক্রীতদাস যদি কাফের হয়, তবে সদকা আদায়ের দায়িত্ব কি অভিভাবকের উপর? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত নিম্নরূপ–

১. ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, কাফের ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে মনিবের সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়।

দলিল : হাদীস– عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ فَرَضَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى النَّاسِ .... اَوْ عَبْدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

২. ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী (র.)-এর মতে, কাফের ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

দলিল : হাদীস–

١. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِىْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَدُّوْا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ اَوْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى يَهُوْدِىٍّ اَوْ نَصْرَانِىٍّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ -

٢. اَخْرَجَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِىْ مُصَنَّفِهٖ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوْكِهِ النَّصْرَانِىِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ -

শিশু ও গোলামের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায়ের হুকুম : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ক্রীতদাস ও শিশুর উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। অথচ ক্রীতদাস সম্পদের অধিকারী নয় এবং শিশু শরিয়তের মুকাল্লাফ নয়। অতঃপর তারা কিভাবে সদকায়ে ফিতর আদায় করবে?

এর সমাধানে মিশকাতের হাশিয়াতে বলা হয়েছে– উক্ত হাদীসে عَلٰى হরফে জারটি مِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ক্রীতদাসের সদকা তার মনিবের পক্ষ থেকে আর শিশুর সদকা তার অভিভাবকের পক্ষ থেকে আদায় করবে?

সদকায়ে ফিতর আদায়ের সময় : সাদাকাতুল ফিতর কখন আদায় করতে হবে, সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

مَذْهَبُ حَسَنِ ابْنِ زِيَادٍ : হাসান ইবনে যিয়াদের মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করার সময় হলো ঈদের দিন। যদি সে দিনের মধ্যে আদায় করা না হয়, তবে এটা তার জিম্মা হতে রহিত হয়ে যায়।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফী মতাবলম্বীদের মতে, সদকাতুল ফিতর আদায় করার সময় হলো, পূর্ণ জীবন অর্থাৎ জীবনের যে কোনো সময় আদায় করলেই তা আদায় হিসেবে গণ্য হবে। ঈদুল ফিতরের দিন অতিক্রম হয়ে গেলেও তা তার জিম্মায় থেকে যায়। কেননা, শরিয়ত প্রণেতা যখন এর আদেশ করেছেন, তখন তা আদায় করার জন্যে কোনো সময় নির্ধারিত করেননি। অবশ্য ইমাম চতুষ্টয় এ কথার উপর একমত যে, ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মোস্তাহাব।

নিসাব শর্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য : সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে নেসাব পরিমাণ মাল বা সম্পদ থাকা শর্ত কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা শর্ত নয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির নিকট নিজের ও পরিবারের পোষ্যদের এক দিনের খরচ পরিমাণ সম্পদ থাকার পর অতিরিক্ত সদকাতুল ফিতর সমতুল্য সম্পদ থাকে, তার উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব।

দলিল :

رَوٰى اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ صَعْيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَدُّوْا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ اَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ شَكَّ حَمَّادٌ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ غَنِيٍّ اَوْ فَقِيْرٍ اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ اللّٰهُ اَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِيْ -

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা শর্ত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও ঋণ আদায় করার পর জাকাতের নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ অথবা ঐ পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের মালিক হয়, তার উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। অবশ্য এক্ষেত্রে বর্ষপূর্তি হওয়া ও ক্রমবর্ধনশীল মাল হওয়া শর্ত নয়। তিনি তাঁর মতের পক্ষে এ হাদীসটি পেশ করেন–

اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا صَدَقَةَ اِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

আলোচ্য হাদীসে সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ধনী হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। আর শরিয়তে ধনী তাকেই বলা হয়, যে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তর : তাঁর উল্লিখিত হাদীসটি দুর্বল এবং শায, সুতরাং সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় এটা দলিল হতে পারে না।

وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى-এর ব্যাখ্যা : ঈদুল ফিতরের নামাজে বের হওয়ার পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর দেওয়ার নির্দেশ মূলত মুস্তাহাব পর্যায়ের। এ সম্পর্কে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে বিলম্বে আদায় করা জায়েজ বিধায় মোস্তাহাবের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে একদিনের বেশি বিলম্ব করা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যেখানে নির্দেশটি মোস্তাহাব হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে সেখানে খবরে হাসানের ফায়দা দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজে বের হওয়ার পূর্বে দেবে তারটা গ্রহণযোগ্য উত্তম সদকা হবে আর যদি পরে দেয় তাহলে গতানুগতিক দানের মতো হবে।

وَعَنْ ١٧٢٤ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা [রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে] সদকায়ে ফিতর এক সা' খাদ্য, অথবা এক সা' যব, এক সা' খেজুর, এক সা' পনির অথবা এক সা' আঙ্গুর দিতাম। –বুখারী ও মুসলিম

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে খাদ্য দ্বারা 'গম' বুঝানো হয়েছে। কেননা, সে যুগে সাধারণত গমই ছিল মানুষের খাদ্য। হানাফীদের পক্ষ হতে বলা হয় যে, গমের দ্বারা আদায়কালে অর্ধ সা' দিলেও আদায় হয়ে যাবে। অন্যান্য বস্তুতে এক সা' দিতে হয় তাই গরিব মিসকিনের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং তাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'গম' দ্বারাও পূর্ণ এক সা' দিতেন, এছাড়া ইবাদতের মধ্যে কম দেওয়ার চেয়ে বেশি দেওয়ার মানসিকতা থাকা খুবই উত্তম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٢٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ فِىْ اٰخِرِ رَمَضَانَ اَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

১৭২৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রমজানের শেষের দিকে বললেন, তোমরা তোমাদের রোজার সদকা আদায় কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সাদাকায় এক সা' খেজুর, অথবা যব অথবা অর্ধ সা' গম প্রত্যেক স্বাধীন, কৃতদাস পুরুষ অথবা নারী, ছোট অথবা বড় সকলের উপরে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে ইবনে আব্বাসের কথা ঘোষিত হয়েছে। মূলত অত্র হাদীসটিও আমাদের হানাফীদের দলিল যে, খেজুর ও যব আদায় করতে হবে অর্ধ সা' আর গম বা আটা আদায় করতে হবে এক সা'।

وَعَنْهُ ١٧٢٦ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৭২৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোজাকে অনর্থক কথা ও অশালীন কথা হতে পবিত্র করার জন্যে এবং নিঃস্বদের মুখে খাদ্য দেওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সদকায়ে ফিতর সাহু সিজদারই মতো, সাহু সিজদা যেমন নামাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিপূর্ণতায় সহায়ক হয় তেমনি সদকাতুল ফিতরও রমজানের রোজার পরিপূর্ণতা আনয়ন করে। এছাড়া ফেতরা দ্বারা সমাজের অসহায় শ্রেণীর সহায়তা করে ইসলামে সাম্যতার নজির স্থাপন করেছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٢٧ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فِىْ فِجَاجِ مَكَّةَ اَلَا اِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ اَوْ سِوَاهُ اَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৭২৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মক্কার গলিসমূহে ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করালেন যে, তোমরা জেনে রাখ! সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-স্ত্রী, স্বাধীন-ক্রীতদাস, ছোট-বড় সকলের উপর ফরজ। দু' 'মুদ' গম বা তা ছাড়া অন্য কিছু অথবা এক সা' খাদ্য। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'মুদে অর্ধ সা'। চার মুদে এক সা'। এক মুদ = চৌদ্দ ছটাক। এক সা' = সাড়ে তিন সের প্রায়। আলোচ্য হাদীসে 'অন্য কিছু' বলতে আঙ্গুর বা কিসমিসকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আঙ্গুর বা কিসমিস গমের সমপর্যায়ের। অতএব গমের দ্বারা দিলে অর্ধ সা আদায় করলেই চলবে।

সদকাতুল ফিতর কার উপর ওয়াজিব : সদকাতুল ফিতর কার উপর ওয়াজিব এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.)-এর মতে, যে ব্যক্তির নিকট নিজের এবং পরিবারের পোষ্যদের একদিনের খরচ পরিমাণ সম্পদ থাকার পর অতিরিক্ত সদকাতুল ফিতর সমতুল্য সম্পদ থাকে, তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যে ব্যক্তি নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও ঋণ আদায় করার পর জাকাতের নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ অথবা ঐ পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের মালিক হয়, তার উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। অবশ্য এক্ষেত্রে বর্ষপূর্তি হওয়া ও ক্রমবর্ধমানশীল মাল হওয়া শর্ত নয়। তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন– إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)
আলোচ্য হাদীসে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ধনী হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। আর শরিয়তে ধনী তাকেই বলা হয়, যে নিসাবের মালিক।

* কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ফতহুল বারী ও দুররে মানসূর গ্রন্থে রয়েছে, হযরত ইবনে ওমর, আবূ সাঈদ খুদরী ও আমর ইবনে আউফ (রা.) বলেন, উপরিউক্ত আয়াতটি সদকাতুল ফিতর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

وَعَنْ ١٧٢٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اِثْنَيْنِ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ وَأَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

১৭২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা অথবা ছা'লাবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবূ সু'আইর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক সা' গম প্রত্যেক দু'ব্যক্তির পক্ষ হতে চাই ছোট হোক বা বড় হোক, স্বাধীন হোক বা দাস হোক, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। তোমাদের মধ্যে যে ধনী ব্যক্তি আল্লাহ এটা [ফিতরা] দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন। আর যে গরিব আল্লাহ তাকে, যা সে দান করেছে তার চেয়ে অধিক ফেরত দেবেন। –[আবূ দাউদ]

بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

পরিচ্ছেদ : যার জন্যে জাকাত বৈধ নয়

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٢٩ أَنَسٍ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭২৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুরের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং বললেন, সদকার খেজুর বলে যদি আমি ভয় না করতাম তবে নিশ্চয় তা খেয়ে ফেলতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সদকা জাকাতের মাল নবী করীম ﷺ -এর জন্যে হারাম, পথে পড়ে থাকা বস্তু খাওয়ার জন্যে তাঁর আগ্রহ করার অর্থ এই যে, তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন বিধায় এমন সামান্য বস্তুও খাওয়ার প্রতি লোভ করেছিলেন; বরং এটা ক্ষুদ্র জিনিস হলেও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত, যা অপচয় কিংবা মানুষের পদতলে মাড়াতে দেওয়া উচিত নয়। আর প্রসঙ্গক্রমে এটাও বুঝা যায় যে, রাস্তায় পড়া কোনো জিনিস এত নগণ্য হয় যে, মালিকের পক্ষ হতে তা তালাশ করার সম্ভাবনা নেই কিংবা তার প্রতি তেমন কোনো প্রয়োজনও নেই, এমন সামান্য জিনিস নিয়ে যথাযথ কাজে লাগানো মোস্তাহাব। অবশ্য তাক্ওয়ার ভিত্তিতে সন্দেহের স্থলে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম।

وَعَنْ ١٧٣٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৩০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৌহিত্র হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) একটি সদকার জাকাতের খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, কাখ, কাখ, যাতে সে খেজুরটি ফেলে দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– তুমি কি জান না যে, আমরা সদকা [জাকাত] খাই না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সদকা-জাকাত হলো সম্পদের ময়লা-আবর্জনা। তাই এটা নবী-পরিবার কোনো অবস্থাতেই ভক্ষণ করতে পারেন না। কেননা, নবুয়তের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ফলে নবী পরিবার পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত পরিবার হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। এ জন্যেই মহানবী ﷺ হযরত হাসানের মুখ হতে সদকার খেজুরটি ফেলে দিতে বললেন।

وَعَنْ ١٧٣١ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِاٰلِ مُحَمَّدٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৩১. অনুবাদ : হযরত আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবীয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই এ জাকাত মানুষের সম্পদের ময়লা। এটা মুহাম্মদ ﷺ ও মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের জন্যে হালাল নয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজন কারা? একই অর্থবোধক একাধিক হাদীস আলোচ্য অধ্যায় ও অন্যান্য অধ্যায়ে রয়েছে এ সমস্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে সম্মানিত ইমামগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য যে, রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর পরিবারের জন্যে জাকাতের মাল গ্রহণ করা হারাম। কেননা, তাকে মানুষের মালের ময়লা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ জন্যেই তা নবী ও তাঁর পরিবারের জন্যে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। মহানবীর 'আল' সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ আছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য আলেমের মতে, নবী পরিবার বা 'আলে নবী' বলতে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব উভয়ই শামিল। দলিল–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَشْرَكَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مَعَ اَبِيْ هَاشِمٍ فِيْ سَهْمِ ذَوِى الْقُرْبٰى وَلَمْ يُعْطِ اَحَدًا مِنْ قُبَيْلِ قُرَيْشٍ غَيْرَهُمْ –

তাদের এ দান এ জন্যে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু তাদেরকে সদকা হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এতে বুঝা যায় যে, উভয় গোত্রই রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে তাদের জন্যে জাকাতের মাল হারাম ছিল।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও ইমাম আহমাদ (র.)-এর এক মতে, নবী পরিবার বলতে শুধু বনী হাশিমকে বুঝাবে। বনী মুত্তালিবের জন্য জাকাতের মাল গ্রহণ জায়েজ আছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ الْاٰيَةَ দ্বারা তারা সাধারণভাবে দরিদ্র ও নিঃস্বদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এ সাধারণ হতে বনী হাশিম বের হয়ে গিয়েছে। কেননা, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا يَنْبَغِيْ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ সুতরাং রাসূল ﷺ -এর পরিবার বলতে বনী হাশিমকে বুঝাবে। বনী হাশেমের উপরে বনী মুত্তালিবকে কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, বনী হাশেম রাসূল ﷺ -এর অধিক নিকটবর্তী এবং সম্ভ্রান্ত। হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ زُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ هَاشِمٍ لَا تُنْكِرُ فَضْلَهُ لِلْمَوْضِعِ الَّذِيْ وَضَعَكَ اللّٰهُ مِنْهُمْ الخ –

আরও বর্ণিত আছে– عَنْ مُجَدِّدِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْخَلِيْفَةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اٰلُ النَّبِيِّ هُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ خَاصَّةً –

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : হানাফীদের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ বনী হাশিমের সাথে বনী মুত্তালিবকেও দিয়েছেন, এটা তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার কারণে দিয়েছেন, তাদেরকে সদকা হতে বঞ্চিত হওয়ার বিনিময়ে নয়। সুতরাং এতে বনী মুত্তালিব সদকা হতে বঞ্চিত হয়েছিল এটা প্রমাণিত হয় না।

* ইবনে হোবাইরাহ তদীয় গ্রন্থ আফসাহতে লিখেছেন যে, বনী হাশিমের জন্যে জাকাত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তারা পাঁচটি গোত্রে বিভক্ত। ১. আব্বাস গোত্র, ২. জা'ফর গোত্র, ৩. আলী গোত্র, ৪. আকীল গোত্র এবং ৫. হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব গোত্র।

* আল্লামা ইবনে আবেদীন (র.) বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চতুর্থ পিতৃপুরুষ ছিলেন আবদে মানাফ। আবদে মানাফের চার সন্তান ছিল– হাশিম, মুত্তালিব, নওফেল ও আবদে শামস। অতঃপর হাশেমের চার পুত্র ছিল। তন্মধ্যে রাসূল ﷺ -এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবও একজন ছিলেন। আবদুল মুত্তালিব ছাড়া হাশিমের তিন পুত্রের বংশ বাদ যাবে। আবদুল মুত্তালিবের বারো পুত্র ছিল। এদের মধ্যে আব্বাস, আলী, জাফর, আকীল ও হারিসের সন্তানগণ ব্যতীত অন্য সকলের সন্তান যদি মুসলমান হয় এবং দরিদ্র হয় তবে তাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে। এতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সকল বনী হাশিমের জন্যে জাকাতের মাল খাওয়া হারাম নয়; বরং উল্লিখিত পাঁচজনের অধঃস্তন লোকদের জন্যে হারাম।

اٰل ও اَهْل -এর মধ্যকার পার্থক্য : اٰل ও اَهْل উভয়ই সমার্থবোধক। অর্থ– পরিবার বা বংশধর। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ক. اٰل শব্দের সম্বন্ধ বিবেকবান (ذَوِى الْعُقُوْلِ) -দের সাথে হয়ে থাকে। যেমন– اٰلُ الرَّسُوْلِ পক্ষান্তরে اَهْل -এর সম্বন্ধ বিবেকবান ও বিবেকহীন উভয়ের সাথে হয়ে থাকে। যেমন– اَهْلُ اللّٰهِ - اَهْلُ الْحَقِّ - اَهْلُ الْبَيْتِ

খ. اٰل -এর সম্বন্ধ বিবেকবানদের মধ্য হতে শুধু পুংলিঙ্গের সাথে হয়ে থাকে। সুতরাং اٰل فاطمة বলা যাবে না। কিন্তু اَهْل -এর সম্বন্ধ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের সাথে হতে পারে।

গ. اٰل শব্দটি শুধু সম্ভ্রান্ত পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চাই পার্থিব ব্যাপারে সম্ভ্রান্ত হোক বা উভয় জগতে সম্ভ্রান্ত হোক। যেমন– اٰلُ الرَّسُوْلِ ، اٰلُ فِرْعَوْنَ

اٰل -এর اِضَافَتْ ইসমে ظَاهِر -এর সাথে হয় আর اَهْل -এর اِضَافَتْ ইসমে ظَاهِر ও ضَمِيْر উভয়ের দিকে হয়।

وَعَنْ ١٧٣٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُتِىَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيْلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيْلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৩২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যখন কোনো খাদ্য আনয়ন করা হতো তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, এটা কি হাদিয়া না সদকা? যদি বলা হতো সদকা, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন– তোমরা খাও এবং তিনি নিজে খেতেন না। যদি বলা হতো হাদিয়া উপঢৌকন, তখন তিনি এতে হাত রাখতেন এবং তাদের সাথে খেতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সদকা ও হাদিয়ার পার্থক্য :

১. সদকা হলো ঐ দান যা পুণ্যের উদ্দেশ্যে গরিব-দুঃখীকে দান করা হয় অথবা মালের দেয় কর্তব্য সম্পাদনার্থে যা গরিব ও নিঃস্বদেরকে দেওয়া হয়। যেমন– জাকাত ও ফিতরা ইত্যাদি।
পক্ষান্তরে হাদিয়া হলো উপহার বা উপঢৌকন সামগ্রী যা বন্ধু-বান্ধব বা কোনো সম্মানী ব্যক্তির সম্মান ও মনসন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে ও তাঁর পরিবারের লোকদের জন্যে যাবতীয় সদকা হারাম ছিল এবং হাদিয়া হলাল ছিল।

২. সদকার মধ্যে ছওয়াবের নিয়ত থাকে পক্ষান্তরে হাদিয়ার মধ্যে বেশির ভাগ মনোতুষ্টির নিয়ত থাকে যদিও তাতে ছওয়াব পাওয়া যায়।

৩. সদকার প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে هَدِيَّة প্রত্যাবর্তন জায়েজ আছে।

৪. হাদিয়ার عِوَضْ দেওয়ার কালে তা بَيْع -এর হুকুমে চলে আসে তবে صَدَقَة -এর عِوَضْ দিলেও তা بَيْع -এর হুকুমে আসে না।

وَعَنْ ١٧٣٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلٰثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا عُتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِىْ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَلَمْ اَرَ بُرْمَةً فِيْهَا لَحْمٌ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ وَاَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৩৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাকে কেন্দ্র করে তিনটি সুন্নত জারি হয়েছে। প্রথম সুন্নত হলো, তাকে মুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর তাকে বর্তমান স্বামীর সাথে থাকা না থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সুন্নাত হলো, তার সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, পরিত্যক্ত মিরাসের অধিকারী সেই ব্যক্তি হবে যে তাকে মুক্ত করেছে; তৃতীয় সুন্নত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ঘরে প্রবেশ করলেন [এবং দেখলেন]। পাতিলে গোশত জোশ হচ্ছে অতঃপর খাওয়ার জন্যে তাঁর নিকট রুটি এবং ঘরের অন্য সালুন উপস্থিত করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি পাতিল দেখিনি? পাতিলে গোশত রয়েছে। তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। কিন্তু সে গোশত বারীরাকে সদকা দেওয়া হয়েছে। অথচ আপনি সদকার মাল খান না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এটা বারীরার জন্যে সদকা কিন্তু আমাদের জন্যে হাদিয়া। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত বারীরা (রা.) ছিলেন এক ইহুদির দাসী। এক সময় মালিকের সাথে তার মুক্তিপণের বিষয়ে চুক্তি হয় [আরবি পরিভাষায় একে বলা হয় "মোকাতাবাহ"] বারীরা মুক্তিপণের ব্যাপারে এক সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর শরণাপন্ন হলে তিনি তাকে এ

শর্তে মুক্তিপণ পরিশোধ করে দাসত্ব হতে আজাদ করতে রাজি হলেন যে, তার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত মিরাস আয়েশা নিজেই ভোগ করবেন। কিন্তু তার মালিক ইহুদি উক্ত মিরাস প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাল। পরে ঘটনাটি হুযূর ﷺ -কে জানানো হলে তিনি স্পষ্টভাবে বললেন–

১. 'আজাদকৃত দাসের মিরাস সে ব্যক্তিই পাবে, যে তাকে আজাদ করে।' অর্থাৎ এখানে বারীরা মিরাস হযরত আয়েশাই পাবেন।

২. ইতোপূর্বে মুগীস নামে এক দাসের সাথে বারীরার বিবাহ হয়েছিল। আজাদ হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাকে উক্ত বিবাহ বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে এখ্তিয়ার বা অধিকার দিয়েছেন। ফলে সে উক্ত স্বামীকে পরিত্যাগ করে। কেননা মুগীস [স্বামী] তখনও ক্রীতদাসই ছিল। মোটকথা এ হাদীস হতে এটা বুঝা যায় যে, দাসী আজাদী লাভের পর পূর্বের বিবাহ ইচ্ছা করলে বহালও রাখতে পারে অথবা বিচ্ছেদও ঘটাতে পারে।

৩. আর একদিন হুযূর ﷺ বারীরার ঘরে গেলেন, তখন সে হুযূর ﷺ -এর সম্মুখে সাধারণ খানা অর্থাৎ রুটি ও মামুলি ধরনের সালুন [তরকারি] হাজির করে; অথচ সে সময় তার চুলায় হাঁড়িতে গোশত রাঁধা হচ্ছিল, যা হুযূর ﷺ নিজেও দেখতে পেলেন। তাই তিনি জানতে চাইলেন তাকে গোশত দেওয়া হলো না কেন? উত্তরে তার পরিবারস্থ লোকেরা বলল, এটা সদকার গোশত, যা বারীরাকে দেওয়া হয়েছে, অথচ আপনি সদকা খান না। তখন তিনি বললেন, এটা বারীরার জন্যে সদকা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া বা উপঢৌকন। অর্থাৎ বস্তুর মালিক পরিবর্তন হয়ে গেলে, তখন সে বস্তুর হুকুম [বিধান]ও পরিবর্তন হয়ে যায়। একে আরবি ভাষায় বলে– تَبَدُّلُ الْمِلْكِ يُثْبِتُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ মোটকথা তখন আর তা সদকা থাকে না; বরং তা হাদিয়া হয়ে যায়, আর এটা ভোগ করা আমার জন্যেও হালাল। বারীরাকে কেন্দ্র করে ইসলামি শরিয়তে উল্লিখিত তিনটি সুন্নত (বিধান) প্রবর্তিত হয়েছে।

اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ দ্বারা ইঙ্গিত : হযরত বারীরা ছিলেন এক ইহুদির দাসী। উক্ত ইহুদির সাথে তার চুক্তি হয় যে, সে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণ প্রদানে সক্ষম হলে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। বারীরা মুক্তিপণের ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.)-এর শরণাপন্ন হলে হযরত আয়েশা (রা.) তাকে খরিদ করেন, অতঃপর মুক্ত করে দিতে সম্মত হন; কিন্তু ইহুদি শর্ত করে যে, বারীরা মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সে পাবে, ব্যাপারটি রাসূল ﷺ -কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন– اَلْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ "মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে ব্যক্তি, যে তাকে মুক্ত করছে"। اَلْوَلَاءُ বলতে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বুঝানো হয়েছে।

অত্র হাদীসাংশ দ্বারা একটি শরয়ী বিধান উদ্ভাবিত হয়। আর তা হলো, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীর কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকা অবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে ব্যক্তি, যে তাকে মুক্ত করেছে।

এর দ্বারা এ কথার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বারীরার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক ইহুদি লোকটি হবে না; বরং আযাদকারী আয়েশাই হবেন।

هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -এর অর্থ : রাসূল ﷺ এবং হাশিমীয়দের জন্যে জাকাত ও সদকার মাল খাওয়া জায়েজ নেই। তাই রাসূল ﷺ একদা দারিদ্রপীড়িত বারীরার বাসায় গেলে তাঁকে আপ্যায়নার্থে রুটি ও সাদকার গোশত না দিয়ে অন্য তরকারি দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ কে গোশত না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! এগুলো এমন গোশত যা বারীরাকে সদকা করা হয়েছে। আর আপনিতো সদকার কোনো বস্তু গ্রহণ করেন না। এ জন্যে আপনাকে গোশত দেওয়া হয়নি। তাদের জবাব শুনে রাসূল ﷺ বললেন, هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ অর্থাৎ এটা বারীরার জন্যে সদকা কিন্তু আমাদের জন্যে হাদিয়া। বারীরা তা সদকা হিসেবে পেয়ে যদি আমাদেরকে আপ্যায়ন করায়, তবে তা হাদিয়ায় পরিণত হবে। সুতরাং আমাদের জন্যে তা হাদিয়া হিসেবে ভক্ষণ করাতে কোনো দোষ নেই।

অত্র হাদীস হতে উদ্ভাবিত বিধানসমূহ :

১. কোনো বিবাহিতা দাসী স্বীয় মনিব হতে আজাদ হতে পারলে, বর্তমান গোলাম স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকা বা না থাকার অধিকার লাভ করে।

২. কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসী মৃত্যুকালে স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে গেলে তখন সে মৃত দাস-দাসীর পরিত্যক্ত মিরাস সে ব্যক্তিই পাবে যে তাকে আজাদ করেছে।

৩. নবী ﷺ ও বনূ হাশিমের জন্যে জাকাত বা সদকায়ে ওয়াজিবাহ গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

৪. সদকায়ে ওয়াজিবাহ গ্রহণকারী, সদকা গ্রহণ করার পর তা এমন লোককেও দান বা হাদিয়া করতে পারে যার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে সদকা খাওয়া জায়েজ নেই। যেমন আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মূল বস্তুটি [অর্থাৎ গোশত] নবী ﷺ বা বনূ হাশেমের জন্যে হারাম নয়; বরং বস্তুটি গুণগত দিক ও নামটির কারণে তাদের জন্যে হারাম ছিল। পরে যখন এর জাকাত বা সদকা গুণটি গুণগত ও নামগত পরিবর্তন হয়ে হাদিয়া বা উপঢৌকন হয়ে গেছে তখন এটা নবী ﷺ তথা বনু হাশিমের জন্যেও জায়েজ।

৫. অত্র হাদীস হতে এটা বুঝা যায় যে, কোনো জিনিসের মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল বস্তুটির মান বা গুণও পরিবর্তন হয়ে যায়।

وَعَنْهَا ١٧٣٤ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৭৩৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর বিনিময়ে কিছু দান করতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা সুন্নত। যেমন– অপর এক হাদীসে এসেছে যে, তোমরা হাদিয়া বা উপঢৌকন আদান-প্রদান কর! ফলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। সুতরাং এর প্রতিদান হিসেবে কিছু প্রদান করা মোস্তাহাব। অবশ্য হাদিয়া প্রদানকারী এর বিনিময়ে কিছু ফেরত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে না।

وَعَنْ ١٧٣٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ دُعِيْتُ اِلٰى كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৭৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমাকে (গরু-ছাগলের) একটি খুরা খেতেও দাওয়াত দেওয়া হয় তবে আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করব, যদি একটি বাহুও আমাকে উপহার দেওয়া হয় আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করব। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নগণ্য জিনিসের জন্যেও কেউ আগ্রহ ভরে আমন্ত্রণ করলে তা গ্রহণ করা সুন্নত এবং সৌজন্যের পরিচায়ক। অনুরূপভাবে সামান্য জিনিসও উপহার প্রদান করলে তা সসম্মানে গ্রহণ করা সুন্নত। সামান্য জিনিস বলে উপহার সামগ্রীকে তুচ্ছ করা বা প্রত্যাখ্যান করা খুবই অন্যায়। দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের মুসলমানদের কোনো কোনো সমাজে উপহারের দ্রব্য সামান্য বা কম মূল্যের হলে নানা প্রকার সমালোচনা করতে এমনকি প্রত্যাখ্যান করতেও দেখা যায়। তারা রাসূল ﷺ -এর এ শিক্ষাকে উপেক্ষা করছে। অথচ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা হাজারও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও তারা স্থানীয় রেওয়াজ হিসেবেই নবীর এ শিক্ষাটিকে অনুসরণ করে চলছে। তাই আমাদেরও উচিত অতি নগণ্য উপহার হলেও তা সানন্দে গ্রহণ করা।

وَعَنْهُ ١٧٣٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَا يَجِدُ غِنًا يُغْنِيْهِ وَلَا

১৭৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে ব্যক্তি মিসকিন নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাকে এক দুই মুঠ খাদ্য ও দু' একটি খেজুর দান করা হয়, কিন্তু প্রকৃত মিসকিন সে ব্যক্তি যার কাছে এতটুকু সংস্থান পাওয়া না যায় তাকে

يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

পরমুখাপেক্ষী হতে বিরত রাখে এবং তাকে [চুপ চাপ থাকার কারণে] নিঃস্ব বলে চেনাও যায় না যে, তাকে লোকে সদকা দান করবে, আর সে নিজে উঠে লোকের কাছে কিছু প্রার্থনাও করে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অভাবের তাড়নায় মানুষের দ্বারে দ্বারে খাদ্যের জন্য হাত পাতলে তাকে প্রকৃত মিসকিন বলা চলে না। কারণ, এমনও বহু লোক আছে, যার তেমন অভাব নেই, তবুও কুস্বভাবের তাড়নায় ভিক্ষা বৃত্তি করে বেড়ায়। ফলশ্রুতিতে মানুষ তাকে দু' এক লোকমা খাদ্য ও দু'একটা খেজুর দান করে। অথচ প্রকৃত মিসকিন হলো সে, যার কাছে জীবন ধারণের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী নেই। অথবা খেয়ে বেঁচে থাকার পরিমাণ খাবার বস্তুও নেই। অথচ সে ব্যক্তি এমন চুপ চাপ জীবন যাপন করে যে, ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের দরুন সাধারণ মানুষ এ কথাও বুঝতে পারে না যে, ঐ লোকটি দীন-হীন কালাতিপাত করছে। যদি মানুষ তার প্রকৃত অবস্থা জানত বা বুঝতে পারত, তবে তাকে দান-সদকা করত। উপরন্তু সে কারো কাছে কিছু চায়ও না। মোটকথা ভিক্ষার ভান করে বেড়ালেই তাকে ভিক্ষুক বলা যায় না; প্রকৃত অভাবী তালাশ করে নিতে হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٣٧ اَبِيْ رَافِعٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِاَبِيْ رَافِعٍ اِصْحَبْنِيْ كَيْ مَا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتّٰى اٰتِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْأَلَهُ فَانْطَلَقَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَاِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৭৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে জাকাত আদায়ের কর্মচারী নিয়োগ করে পাঠালেন। (কর্মস্থলে যাওয়ার সময়) সে আবূ রাফে'-কে বলল, তুমি আমার সাথী হও তাহলে তুমি তার একাংশ পাবে। তখন আবূ রাফে' বলল– না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস না করি। অতঃপর সে রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাছে গেল এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদের [হাশিমী গোত্রের] জন্যে জাকাতের মাল হালাল নয়, আর কোনো গোত্রের দাসও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, [অর্থাৎ তুমি আমাদের হাশিমী গোত্রের দাস। অতএব তোমার জন্যেও জাকাতের মাল হালাল নয়]। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-এর ব্যাখ্যা : যে গোলাম যে গোত্র বা ব্যক্তি আজাদ করে, তার বংশ পরিচিতি উক্ত গোত্র বা ব্যক্তি হতে শুরু হয়। অর্থাৎ সে উক্ত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন কোনো অমুসলিম যেই গোত্র বা বংশের লোকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, সে গোত্র হতেই তার বংশ পরিচিতি শুরু হয়। এ প্রেক্ষিতে আবূ রাফে' বনূ হাশেমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জাকাতের মাল তার জন্যে হালাল ছিল না।

রাবী পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আসলাম, উপনাম আবূ রাফে'। তিনি ছিলেন হযরত আব্বাস (রা.)-এর কিবতী গোলাম। আব্বাস (রা.) তাঁকে হুযূর ﷺ -এর জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আর হুযূর ﷺ আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ শুনে তাকে আজাদ করে দিয়েছিলেন, তবে তিনি আবূ রাফে' নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

كَانَ قِبْطِيًّا وَكَانَ لِلْعَبَّاسِ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَشَّرَ النَّبِيَّ ﷺ بِإِسْلَامِ الْعَبَّاسِ أَعْتَقَهُ প্রণেতা বলেন– اَلْإِكْمَالُ

২. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু কাফেরদের ভয়ে প্রকাশ করতে সাহস পাননি।

৩. **হিজরত :** বদর যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

৪. **জিহাদে যোগদান :** তিনি বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে যোগদান করেন।

৫. **হাদীসের সংখ্যা :** তিনি সর্বমোট ৬৮ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **ইন্তেকাল :** তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে اَلْإِكْمَالُ গ্রন্থকারের মতে– إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ عُثْمَانَ بِيَسِيْرٍ অর্থাৎ তিনি উসমানের মৃত্যুর কিছু পূর্বে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে যেসব বিখ্যাত সাহাবী ইন্তেকাল করেন, তিনি তাঁদের একজন।

١٧٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ)

১৭৩৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ধনী ব্যক্তি ও শক্তিমান ব্যক্তির জন্যে জাকাত হালাল নয়। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী।

আর আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা যাকে কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছেন বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, এ অনুগ্রহ বা নিয়ামতের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। অনুরূপভাবে সুস্বাস্থ্য একটি ঈর্ষার বস্তু বটে। তার ভিক্ষাবৃত্তি বা সদকা জাকাত খাওয়া একটি ঘৃণিত কাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি সে স্তরে নেমে যায় প্রকারান্তরে সে আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের অবমাননা করল। তাই এমন লোকদের জন্যে সদকা খাওয়া হালাল নয় বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

ধনীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ : সাধারণত অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়াকে ধনাঢ্যতা বলা হয়। অপর এক হাদীসে এসেছে, خَيْرُ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ অর্থ– অন্তরের ধনাঢ্যতাই উত্তম সম্পদশালী। অতএব কারো কাছে কিছু চাওয়ার মানে হলো সে আর সম্পদশালী নয়। তবে সম্পদ হলো একটি ক্রমবর্ধমান বস্তু। সুতরাং শরিয়তের পরিভাষায় ধনী লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. ক্রমবর্ধমান মালের নিসাব পরিমাণ এক বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালিকের উপর জাকাত ফরজ হয়। এমন ধনী ব্যক্তির জন্যে সদকা বা জাকাত গ্রহণ করা হারাম।

২. অবর্ধনশীল মালের যারা নিসাব পরিমাণের মালিক হয়, তাদের জন্যে জাকাত ফরজ নয়। অবশ্য ফেতরা ও কুরবানি তাদের উপর ওয়াজিব। তাদের জন্যে জাকাত গ্রহণ করা হারাম। যেমন– মধ্যম শ্রেণীর লোক; মাল-সম্পদ এই পর্যায়ের আছে যে, ফরজ জাকাত দিতে হয় না। তবুও ধনী বলে সমাজের কাছে স্বীকৃত।

৩. যার কাছে একদিন ও এক রাতের খাবার সামগ্রী আছে, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র আছে, এমন লোকও নিম্ন শ্রেণীর ধনীর মধ্যে শামিল। এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে চাওয়া ব্যতীত জাকাত গ্রহণ করা জায়েজ। কিন্তু অন্যের নিকট প্রার্থনা করে জাকাত গ্রহণ করা হারাম।

لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ **-এর ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ :** যু-মিররা বা সুস্থ-সবল ব্যক্তি বলতে যার সর্বাঙ্গ সঠিক ও সুস্থ আছে এবং যে রোজগার করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির কোনো কিছু ভিক্ষা করা ও জাকাতের মাল গ্রহণ করা সম্পর্কে ইমামদের মতামত নিম্নরূপ :

ক. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, উপার্জনক্ষম ও পূর্ণাঙ্গ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষা করা বা জাকাতের মাল গ্রহণ করা হারাম। তিনি অত্র হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।

খ. ইমাম আহমদ (র.), ইসহাক (র) ও ইবনে মুবারক (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অপর একটি অভিমত অনুযায়ী সুস্থ-সুঠাম ও উপার্জনক্ষম হলেও নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে তার পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া বৈধ।

গ. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও অভিমত ইমাম আহমাদ (র.) প্রমুখের মতোই। তাঁর মতে, উপরিউক্ত হাদীসটির বিধান রহিত হয়ে গেছে। কেননা, ইবনে মাসঊদ বর্ণিত হাদীসে রাসূল কারীম ﷺ ধনী হওয়ার ও প্রার্থনা না করার অবস্থাটি একটি জিজ্ঞাসার জবাবে নিম্নরূপ তুলে ধরেছেন– قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ অর্থাৎ ধনী হওয়ার নিম্নতম সীমা পঞ্চাশ দিরহাম বা সমমূল্যের স্বর্ণের মালিক হওয়া। সুতরাং এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, উপার্জনক্ষম ও সুস্থ-সুঠাম থাকলেও যদি নিসাবের মালিক না হয় তবে তার পক্ষে চাওয়া জায়েজ। কেননা, রাসূল ﷺ যখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা করে পাঠালেন, তখন আদেশ করেছিলেন ধনী মুসলমানদের কাছ থেকে জাকাত গ্রহণ করে ফকিরদের মধ্যে বণ্টন করতে। এখানে ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করতে বলা হয়েছে। আর ফকির কথাটি আম বা ব্যাপক, চাই সে সুস্থ-সুঠাম হোক বা অসুস্থ বিকলাঙ্গ হোক। আমরা এ হাদীসটিকে এ জন্যে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছি যে, এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেষ বয়সের কার্যকলাপ। কারণ তিনি হযরত মু'আয (রা.)-কে তাঁর অন্তিমকালেই ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন।

ঘ. ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি পঞ্চাশ দিরহামের মালিক হবে, তার জন্যে সদকার মাল গ্রহণ করা জায়েজ নয়। তাকে দেওয়াও জায়েজ নয়। তিনি নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন–

عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) اَنَّهُمْ قَالُوْا لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ عِوَضُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

অর্থাৎ হযরত আলী (র.), ইবনে মাসঊদ (রা.), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) প্রমুখ বলেন, যার পঞ্চাশ দিরহাম বা সমমূল্যের স্বর্ণ আছে তার সদকা গ্রহণ বৈধ নয়।

ইমাম মালেক (র.)-এর দলিলের জবাব : ইমাম আযম (র.) এর জবাব দেন, এতে জাকাত প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির জাকাত প্রার্থনা করা হারাম। আর এ ধরনের জাকাত গ্রহণ মাকরুহ বুঝিয়েছে। –[বাদায়েউস সানায়ে, তা'লীকুস সবীহ]

ঙ. মিরকাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার লিখেছেন, উপার্জনক্ষম সুস্থ-সুঠাম ব্যক্তির সদকা প্রার্থনা সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। এক দলের মতে, হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী তা হারাম। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। আর অপর এক দলের মতে, তিনটি শর্ত সাপেক্ষে মাকরুহের সাথে তা বৈধ। শর্তগুলো হলো–

১. নিজ আত্মমর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না।
২. কাকুতি-মিনতি ও বারবার আবেদন করবে না।
৩. যার কাছে চাওয়া হয় তাকে বাধ্য করবে না এবং কষ্ট দেবে না। এ তিনটি শর্তের কোনো একটি পাওয়া গেলেই সকলের মতে সদকা প্রার্থনা হারাম।

وَعَنْ ١٧٣٩ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَجُلَانِ اَنَّهُمَا اَتَيَا النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَاَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيْنَا النَّظْرَ وَخَفَضَهُ فَرَاٰنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ اِنْ شِئْتُمَا اَعْطَيْتُكُمَا وَلَاحَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

১৭৩৯. অনুবাদ : হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার তাবেয়ী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে দু' ব্যক্তি অবহিত করেছেন যে, বিদায় হজকালে তারা উভয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে আসলেন, তখন রাসূল ﷺ সদকা [জাকাত] বণ্টন করেছিলেন। তখন তারা দু'জনেই তাঁর কাছে সদকা হতে কিছু চাইলেন। [তারা বলেন,] তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে চাইলেন এবং দৃষ্টি অবনত করলেন। তিনি আমাদেরকে কর্মক্ষম দেখলেন এবং বললেন, যদি তোমরা চাও তবে তোমাদেরকে দিতে পারি। কিন্তু তাতে ধনী ও সবল উপার্জনক্ষম লোকের কোনো অংশ নেই। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূলে কারীম ﷺ যখন জাকাতের মাল বণ্টন করেছিলেন, তখন দু'জন সাহাবী সেখানে গেলেন এবং কিছু হিস্যা পেতে চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে সুস্থ-সবল, স্বাস্থ্যবান এবং উপার্জনক্ষম দেখে মাল দেননি; বরং তাদেরকে বললেন, তোমরা চাইলে দিতে পারি তবে সুস্থ-সবল কর্মক্ষম লোকদের জন্যে এটা বৈধ নয়। অর্থাৎ তোমরা জাকাতের মালের উপযুক্ত নও। রাসূল ﷺ -এর কথার মধ্যে সরাসরি নিষেধ বাক্য না থাকলেও ইঙ্গিতে বুঝা গেল যে, তিনি তাদেরকে সে মাল হতে অংশ দিতে রাজি ছিলেন না। কেননা, তা ছিল গরিব, দুঃস্থ ও অসহায়দের সম্পদ।

وَعَنْ ١٧٤٠ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَى الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَوِ ابْنِ السَّبِيْلِ -

১৭৪০. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সম্পদশালী ব্যক্তির জন্যে জাকাত হালাল নয়। তবে হ্যাঁ, পাঁচ ব্যক্তির জন্যে হালাল। তারা হলো– ১. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজি ২. জাকাত আদায়কারী কর্মচারী ৩. সাময়িকভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ৪. অথবা এমন ব্যক্তি যে নিজের মাল দ্বারা জাকাতের মাল খরিদ করেছে অথবা ৫. এমন ব্যক্তি যার প্রতিবেশী মিসকিন, সেই মিসকিনকে কেউ জাকাত দিয়েছে আর সে মিসকিন ঐ ধনীকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। –[মালিক ও আবূ দাউদ]

আবূ দাউদের অপর বর্ণনায় সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে– অথবা মুসাফির।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সম্পদশালী ব্যক্তির জন্যে জাকাত সদকা গ্রহণ করা জায়েজ নেই। বাহ্যিক অর্থে হাদীসটির মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ জাকাত বা সদকা মানে ফরজ সদকা। কেননা, প্রয়োজনবোধে এমন ব্যক্তিও নফল সদকা ভোগ করতে পারবে। হাদীসের মধ্যে পাঁচ শ্রেণীর লোককে পৃথকীকরণ করা হয়েছে যে, তারা উল্লিখিত নফল সদকা গ্রহণ করলে তা হারাম বা নাজায়েজ হবে না।

لِغَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ **-এর বিশ্লেষণ :** ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে গাজিদের মধ্যে ফকিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, শরিয়তের প্রচলিত নিয়মে এটাই বুঝা যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন– 'ফী সাবীলিল্লাহ' শব্দ দ্বারা নবীজী ﷺ কাফেলা হতে বিচ্ছিন্ন হাজীকে বুঝিয়েছেন। কেননা, কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার উটটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে। তখন রাসূলে কারীম ﷺ তাকে ঐ উটের পিঠে কোনো এক হাজীকে চড়াতে আদেশ করেন। এ দ্বারাই বুঝা যায় যে, হজে গমনই আল্লাহর রাস্তায় গমন। তবে শরিয়তের প্রচলিত অর্থের ভিত্তিতে জমহুরের মতে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উক্তিই গ্রহণযোগ্য। ইমাম মুহাম্মদ (র.) দলিল হিসেবে যে হাদীসকে নিয়েছেন তার জবাব এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'সাবীলিল্লাহ' শব্দ দ্বারা আম অর্থ গ্রহণ করেছেন। যাতে যুদ্ধে সেনাদল হতে বিচ্ছিন্ন এবং হজের কাফেলা হতে বিচ্ছিন্ন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। –[ফাতহুল মুলহিম]

- ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, গাজিকে জাকাতের মাল প্রদান করা জায়েজ আছে, যদিও সে ধনী হয়। তিনি হযরত আতা (র.) এবং আবূ দাউদে বর্ণিত হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। এখানে ধনীদের জন্যে জাকাত হালাল হওয়া নফী (نَفِى) করে গাজিকে তা হতে ইস্তিছনা (اِسْتِثْنَاء) করা হয়েছে। নফী হতে ইস্তিছনা করা হলেও তা ইসবাতে পরিণত হয়।

- ইমাম আযম (র.)-এর মতে, গাজি যদি আর্থিকভাবে দুর্বল না হয়; বরং ধনী হয় তবে তার জন্যে জাকাত হালাল নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ এবং হযরত মু'আযের হাদীস– اُمِرْتُ اَنْ اٰخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِكُمْ وَاَرُدُّهَا فِيْ فُقَرَائِكُمْ যদি গাজিদের মধ্যে ধনীকেও জাকাত দেওয়া জায়েজ হয়, তবে হাদীসের দ্বারা যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তা বৃথা হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : গাজিকে যে শপথ করা হয়েছে তা ঐ গাজিকে বুঝাবে যে আর্থিক অসচ্ছল। যেহেতু সে ঠেকায় পড়ে যাওয়ার পূর্বে ধনী ছিল। এ জন্যে অতীতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ধনীই বলা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হলো, জাকাত খরচের খাত ঐ সমস্ত ফকিরগণই। এ জন্যে গাজিদের মধ্যেও যারা ফকির তারা জাকাত পাবে।

لِعَامِلٍ عَلَيْهَا-এর ব্যাখ্যা : আমিল ঐ সমস্ত কর্মচারী যাদেরকে রাষ্ট্রপতি বা গভর্নর জাকাত আদায় করার জন্যে নিয়োগ করেন। আল্লামা সানী (র.) বলেন, শাফেয়ী মতে, জাকাত আদায়কারী কর্মচারীর জন্যে এক-অষ্টমাংশ। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, জাকাত আদায়কারী কর্মচারী আট বা সাত ভাগের এক ভাগের হকদার হবে না; বরং ইমাম তাদের বেতন বা ভাতা হিসেবে যা নির্ধারণ করে দেন সে তাই পাবে।

اَلْغَارِمُ-এর পরিচয় : হানাফী মতে, 'গারিম' প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যার উপরে ঋণের বোঝা আছে। তার সম্পদের পরিমাণ দেনার পরিমাণ হতে বেশি নয়। (হিদায়া) এরূপ ব্যক্তির জাকাত নেওয়া জায়েজ আছে। অথবা গারিম দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যার উপর দিয়ত ওয়াজিব অথবা অন্য কেউ ঋণী ছিল, মীমাংসা করতে গিয়ে অপরের দেনার দায়িত্ব নিজের জিম্মায় গ্রহণ করেছে, ফলে সে ঋণী হয়েছে।

اَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ-এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সদকার মাল নিজের মালের বিনিময়ে খরিদ করা। জমহুরের মতে– ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্যে নিজের প্রদত্ত জাকাতের মাল অথবা অন্যের প্রদত্ত জাকাতের মাল খরিদ করা জায়েজ নেই।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, নিজের প্রদত্ত জাকাতের মাল নিজেই খরিদ করা জায়েজ নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নিজে খরিদ জায়েজ আছে। ইমাম মালেকের দলিল–

اِنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَرَادَ اَنْ يَتَبَايَعَهُ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

যারা তাকে (জাকাতের মাল খরিদ করাকে) মাকরুহ বলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাকরূহে তানযীহী বলেন, আবার কেউ কেউ মাকরুহে তাহরীমী বলেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নিজে খরিদ জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) অত্র হাদীস (عَنْ عَطَا بْنِ يَسَارٍ) দ্বারাই দলিল গ্রহণ করেন।

وَعَنْ ١٧٤١ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ (رضـ) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلًا فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَعْطِنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ)

১৭৪১. অনুবাদ : হযরত যিয়াদ ইবনে হারিছ সুদায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে আসলাম এবং তাঁর হাতে বায়‘আত করলাম। পরবর্তী রাবী বলেন, অতঃপর যিয়াদ এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আমাকে কিছু জাকাতের সম্পদ দিন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, জাকাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা রাসূল বা অপর কারও নির্দেশের অপেক্ষা করেননি; বরং তিনি নিজে সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে তিনি আট প্রকারের হকদারের জন্যে আট ভাগে ভাগ করেছেন। তুমি যদি এ ভাগগুলোর মধ্যে কোনো ভাগে পড় তাহলে আমি তোমাকে দেব। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ -এর বিশ্লেষণ : জাকাতের হকদারের মধ্যে যাদেরকে জাকাত দিতে হবে, এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কুরআন মাজীদে বর্ণিত জাকাতের হকদার আট প্রকার লোকদের মধ্য হতে কমপক্ষে তিনজনকে জাকাত দিতে হবে। তবে যদি কোনো এক প্রকারের লোক পাওয়া না যায় তাহলে উপস্থিত অন্যদের মধ্যে জাকাত বণ্টন করে দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ الخ

যেহেতু পবিত্র কুরআনে জাকাত প্রাপ্য লোকদের বর্ণনায় আট প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, সেহেতু প্রত্যেক প্রকারের লোককে দেওয়া আবশ্যক। কেননা, উল্লিখিত আয়াতে لَام অক্ষরটি অধিকার সাব্যস্ত করে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো অত্র হাদীস–

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ .... فَجَزَّاءَ هَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ -

▮ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কুরআনুল কারীমে যেহেতু আট প্রকারকেই জাকাতের প্রাপ্য বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সুতরাং আট প্রকারের সকলকেই জাকাত দিতে হবে।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ (র.) বলেন, আট প্রকারের মধ্য হতে যে কোনো এক প্রকারের একজনকে দিলেই জাকাত আদায় হয়ে যাবে, প্রত্যেক প্রকারের লোককে দেওয়া আবশ্যক নয়। এ ব্যাপারে তাঁরা পবিত্র কুরআনের আয়াত– اِنْ تُبْدُو الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ -কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা বলেন, উল্লিখিত আয়াতে صَدَقَات শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। সুতরাং এর মধ্যে জাকাতও অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত উল্লিখিত আয়াতে শুধুমাত্র فُقَرَاء -কে জাকাত দিলেই জাকাত আদায়ের জন্যে যথেষ্ট হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে সুতরাং সহজ ব্যাপারটিতে কঠিন করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

▮ তাঁরা বলেন, মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ও হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মু'আয (রা.) ইয়েমেনে ভূমির জাকাত উসুল করে শুধুমাত্র এক ধরনের লোকের মধ্যে বন্টন করেন। এ মতের সমর্থনে আল্লামা জাস্সাস তাঁর প্রণীত আহকামুল কুরআন গ্রন্থে হযরত ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস. হযরত হুযায়ফা, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, এ বর্ণনার বিরোধী মতাবলম্বনে কোনো বর্ণনা নেই, এটা যেন ইজমার নামান্তর। ইমাম তাহাবী (র.) ও ইবনে আবদুল বার (র.) এ মতের সমর্থন করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তর : কুরআনুল কারীমে উল্লিখিত আট প্রকারের বর্ণনা হয়েছে এ মর্মে যে, এরাই জাকাতের প্রকৃত হকদার। এরা ছাড়া অন্য কাউকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেই। এখানে لَام অক্ষরটি অধিকার সাব্যস্ত বা اِسْتِحْقَاق -এর ভিত্তিতে বর্ণিত হয়নি।

▮ আর اِنَّمَا দ্বারা সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো, শুধুমাত্র আট প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধতার জন্যে। এখানে لَام টি اِسْتِحْقَاق বা অধিকার সাব্যস্ত করার জন্যে যদি হয়, তাহলে পৃথিবীর সকল ফকির-মিসকিনকে দেওয়া জরুরি। আর সেটা অসম্ভব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হিসেবে আনয়নকৃত হাদীসকেই অনেকে য'ঈফ বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٤٢ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رض) قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَاَعْجَبَهُ فَسَاَلَ الَّذِىْ سَقَاهُ مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَرَدَ عَلٰى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَاِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ فَحَلَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِىْ سِقَائِىْ فَهُوَ هٰذَا فَاَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৭৪২. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) কিছু দুধ পান করলেন, তা তাঁর কাছে খুব সু-স্বাদু লাগল, অতঃপর যে দুধ পান করাল তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ দুধ কোথায় পেলে? সে তাঁকে জানাল যে, সে এক জলাশয়ে পৌঁছেছিল, সে যার নাম বলল, সেখানে জাকাতের উট ছিল, তারা [রক্ষকরা] পানি পান করাচ্ছিল। তারা দুধ দোহালে আমি তা আমার মশকের মধ্যে ভরলাম, এটা সেই দুধ। হযরত ওমর (রা.) নিজের হাত মুখে প্রবেশ করালেন এবং বমি করে তা উদ্গীরণ করে ফেললেন। −[মালিক, বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যে জলাশয়ে কিংবা কূপে উটকে পানি পান করানো হয় এবং সেখানেই এর দুধও দোহন করা হয় আর ফকির মিস্কিনদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়− জনৈক ব্যক্তি একদিন এমন কিছু দুধ পেয়েছিল যা সে পরে হযরত ওমর (রা.)-কে পান করিয়েছে। পান করার পর হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করে যখন জানতে পারলেন যে, তা সদকার উটের দুধ ছিল তখন তিনি নিজের গলার ভেতরে আঙ্গুল দিয়ে তা বমি করে ফেলেছেন।

মূলত এটা ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর একান্ত পরহেজগারী ও সতর্কতা। অন্যথায় যদি কোনো ফকির বা মিসকিন সদকায় প্রাপ্ত কোনো জিনিস কোনো মালদার ব্যক্তিকে দান বা উপঢৌকন করে তবে তার পক্ষে এটা ভোগ করা জায়েজ আছে কেননা, মালিক পরিবর্তন হওয়ার দরুন বস্তু ও বস্তুর হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যায়। বারীরার প্রসিদ্ধ হাদীস এর স্পষ্ট প্রমাণ।

بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْئَلَةُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ

পরিচ্ছেদ : যার জন্যে সওয়াল করা হালাল নয় এবং যার জন্যে হালাল

অপরের নিকট কিছু প্রার্থনা করা বা হাত পাতা ইসলামি জীবন বিধান অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম। ইসলাম এরূপ কর্মকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং শ্রম ও শ্রমজীবীকে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত। ফলে তার মর্যাদাও সর্বশীর্ষে। আর অন্যের নিকট কিছু প্রার্থনা করা তার এ মর্যাদার পরিপন্থি। মহানবী ﷺ -এর শিক্ষাও ছিল তাই। তবে একান্ত প্রয়োজনে নিরুপায় অবস্থায় কিছু গ্রহণ করাতে দোষ নেই। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٧٤٣ - عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ حَتّٰى تَاْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَاْمُرُ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قُبَيْصَةُ اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ اِلَّا لِاَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَقُوْمَ ثَلٰثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهٖ لَقَدْ اَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْئَلَةِ يَا قُبَيْصَةُ سُحْتٌ يَاْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৪৩. অনুবাদ : হযরত কুবায়সা ইবনে মুখারিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি দেনার জামিন হলাম। অতঃপর তা পরিশোধ করণার্থে কিছু চাইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার কাছে জাকাতের মাল আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর। তখন তোমাকে কিছু দিতে আদেশ করব। অতঃপর বললেন, হে কুবায়সা! তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো লোকের পক্ষে সওয়াল করা হালাল নয়। এক, ঐ ব্যক্তি যে অপরের দেনার জামিন হয়েছে, তার জন্য সওয়াল করা হালাল; যতক্ষণ সে দেনা পরিশোধ না করে। অতঃপর সে নিজেকে তা হতে বিরত রাখবে। আর একজন এমন ব্যক্তি যার উপর এমন বিপদ পৌঁছেছে যা তার সম্পদকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তার জন্যে সওয়াল করা হালাল; যতক্ষণ সে তার প্রয়োজন পূরণ করার মতো অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মতো কিছু অর্জন না করে এবং আর একজন ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি অভাবে পড়েছে, এমনকি তার গোত্রের তিনজন প্রতিবেশী সাক্ষ্য দিবে যে সত্যিই সে অভাবে পড়েছে। তার জন্যে সওয়াল করা হালাল; যতক্ষণ সে তার জীবিকা নির্বাহের মতো অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেঁচে থাকার মতো কিছু অর্জন না করে। এ তিন অবস্থায় সওয়াল ছাড়া অন্যান্য সকল সওয়ালই হারাম। হে কুবায়সা! সওয়ালকারী সওয়ালের দ্বারা যা ভক্ষণ করে তা হারাম। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে তিন শ্রেণীর যে কোনো শ্রেণীর লোকের জন্যে হাত পাতার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো যার কাছে এক দিনের খোরাকি এবং সতর ঢাকার জন্যে এক টুকরা কাপড় আছে তার জন্যে ভিক্ষা করা উচিত নয়। আর উল্লিখিত তিন ব্যক্তি সত্যিকার বিপদগ্রস্ত ও বিপন্ন, তাই তাদের জন্যে সওয়াল করা বৈধ। তবে শর্ত হলো উক্ত প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর আর সওয়াল করা হালাল হবে না।

ফকির ও মিসকিনের পার্থক্য : ফকির ও মিসকিনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য আছে বলে অনেকে মনে করে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, যার কাছে নিজের এবং পরিজনের এক দিনের পরিমাণ খাদ্য আছে সে ফকির। তার জন্যে সদকা-জাকাত নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু কারো কাছে কিছু চাওয়া হালাল নয়। অথবা উপার্জন করার মতো শক্তি-সামর্থ্য আছে তার জন্যেও সওয়াল করা জায়েজ নেই। আর যার কাছে কিছুই নেই এবং উপার্জন ক্ষমতাও নেই সে মিসকিন। তার জন্যে সদকা-জাকাত গ্রহণ এবং সওয়াল করা উভয়টি জায়েজ আছে।

تَحَمَّلَ حَمَالَةً-এর অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো লোকের পক্ষে ভিক্ষার জন্যে হাত বাড়ানো বৈধ নয়। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি হলো تَحَمَّلَ حَمَالَةً যে, অপরের দেনার জামিন হয়েছে। অর্থাৎ বিবদমান দু'ব্যক্তির বা দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নিজ সম্পদ ব্যয় করে তার মীমাংসা করতে গিয়ে ঋণী হয়ে যায়, তবে তার জন্যে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা পরিমাণ সম্পদের সওয়াল করা বৈধ।

حَتّٰى يَقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجٰى-এর মর্মার্থ : নিজ সম্প্রদায়ের তিনজন লোকের সাক্ষ্য সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তি অভাবী বলে প্রমাণিত হলে তার জন্যে সওয়াল করা বৈধ। সাক্ষ্যদানের শর্ত এ জন্যে করা হয়েছে, যাতে কেউ তার প্রতি ভিক্ষাবৃত্তির অভিযোগ বা অপবাদ রটাতে না পারে; বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। আর নিজ সম্প্রদায়ের তিনজনের সাক্ষ্যদানের কথা এ জন্যে বলা হয়েছে যে, নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরাই উক্ত ব্যক্তির অসহায় ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত। সুতরাং এ তিনজনের সাক্ষ্যই গোটা সমাজের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। তিনজন সাক্ষীর বিষয়টি মোস্তাহাব ও সতর্কতামূলক, নতুবা ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

وَعَنْ ١٧٤٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْاَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكْثِرْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের মাল বাড়ানোর জন্যে লোকজনের কাছে মাল প্রার্থনা করে, নিশ্চয় সে যেন আগুনের অঙ্গার প্রার্থনা করল। কম প্রার্থনা করুক বা বেশি প্রার্থনা করুক। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কাজি আয়ায (র.) বলেন, সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে যদি কেউ অন্যের কাছে হাত পাতে, তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লামা নববী (র.) বলেন, এ অর্থও হতে পারে যে, সে হাত পেতে যা পেল অবিকল সে বস্তুটি আগুনের অঙ্গারে পরিণত হবে এবং তাকে এর দ্বারা দাগ লাগানো হবে। যেমন– জাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ١٧٤٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْاَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَاْتِىَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِىْ وَجْهِهٖ مُزْعَةُ لَحْمٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মানুষ সর্বদা লোকের কাছে সওয়াল করতে থাকে, এমনকি কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার মুখে সামান্য গোশতের প্রলেপও থাকবে না। অর্থাৎ বেইজ্জত অবস্থায় উঠবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যদি কোনো ব্যক্তি প্রয়োজন ব্যতীত শুধুমাত্র সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট সওয়াল করবে তার চেহারায় কিয়ামতের দিন সামান্য পরিমাণও গোশত থাকবে না। আল্লামা কাজি আয়ায (র.) বলেন, এর মূল অর্থ তা নয় যা হাদীসের বাহ্যিক অর্থে বুঝে যায়; বরং অর্থ হলো কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি চরম লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আল্লাহর কাছে স্বীয় মুখ দেখানোর মতো মান-মর্যাদা থাকবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, অহেতুক অন্যের কাছে হাত পাতার চিহ্ন স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে তার চেহারায় কোনো গোশতই থাকবে না; শুধু হাঁড়ই থাকবে।

وَعَنْ ١٧٤٦ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُلْحِفُوْا فِى الْمَسْئَلَةِ فَوَاللّٰهِ لَا يَسْئَالُنِىْ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْئَلَتُهُ مِنِّىْ شَيْئًا وَاَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتُهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৪৬. অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সওয়ালে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ আমার নিকট কিছু চাইবে আর তার চাওয়া আমার নিকট হতে তার জন্য কিছু বের করে নিবে। অথচ আমি এতে অসন্তুষ্ট। এমন হতে পারে যে, আমি যা তাকে প্রদান করেছি তাতে বরকত প্রদান করা হবে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন− আমার কাছে তোমরা এমন মিনতির স্বরে কিছু প্রার্থনা করো না, যার ফলে আমি অসন্তুষ্টচিত্তে অপারগ হয়ে তা প্রদান করতে বাধ্য হয়ে পড়ি। সুতরাং এটাও স্মরণ রেখ, আমার অসন্তুষ্টিতে যা কিছু আমি প্রদান করব তাতে কখনো বরকত হাসিল হবে না। মোটকথা প্রয়োজনের তাগিদে যা কিছু চাইতে হয় তা স্বাভাবিক নিয়মে চাইবে। ফলে আমি যা দেব তাতে আল্লাহ কল্যাণ দান করবেন। কিন্তু যদি সওয়ালের মধ্যে বাড়াবাড়ি কর, তবে আমার অসন্তুষ্টি থাকবে ফলে তাতে কোনো কল্যাণ অর্জিত হবে না।

বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম :** নাম মুয়াবিয়া, উপনাম আবূ আবদুর রহমান, পিতার নাম সখর, তবে আবূ সুফিয়ান নামেই প্রসিদ্ধ। মাতার নাম হিন্দা বিনতে ওতবা।

২. **বংশানুক্রমে :** মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান সখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে মানাফ আল-কুরাইশী। রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে ৬ষ্ঠ পুরুষে গিয়ে তাঁর বংশ মিলে যায়।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** কোনো বর্ণনা মতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** তিনি কাতিবে ওহী, রাসূল ﷺ -এর শ্যালক, রাসূলের বংশের লোক (৬ষ্ঠতম পুরুষ হিসেবে), রাসূলের পরিত্যক্ত নিদর্শনের রক্ষক, হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক ভূষিত "আরবের কিসরা", রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন− (تِرْمِذِىْ) اَوَّلُ يَغْزُو جَيْشُ الْبَحْرِ قَدْ اَوْجَبُوْا এ হাদীসের মিসদাক সকল হাদীস বিশারদের মতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)। তিনি বিশ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৩৬/ ১৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৫. **রাসূলের সাথে সম্পর্ক :** রাসূল ﷺ -এর সাথে তার একাধিক সম্পর্ক রয়েছে। যেমন−

ক. তিনি রাসূলের বংশের লোক। খ. তাঁর বোন উম্মে হাবিবাকে রাসূল ﷺ বিয়ে করেছেন। গ. হুযূর ﷺ -এর কাতিবীনে ওহীর তিনি অন্যতম সদস্য।

৬. **রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালন :** হযরত ওমর (রা.) তাকে ১৮ হিজরিতে দামেশকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর হযরত উসমান (রা.) তাকে সমগ্র সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। এরপর হযরত হাসান (রা.) ৪১ হিজরিতে তাঁর হাতে খেলাফতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। অবশেষে তিনি ৬০ সাল পর্যন্ত ২০ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

৭. **রেওয়ায়াত :** তিনি সর্বমোট ১৬৩/১৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহি হলো ৪ খানা। আর ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ৮ খানা এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৫ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

৮. **ইন্তেকাল :** হিজরি ৬০ সনে ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি দামেশক নগরীতে ইন্তেকাল করেন। দেহাক ইবনে কায়েস তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান।

وَعَنْ ١٧٤٧ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيْ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اَعْطُوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৭৪৭. অনুবাদ : হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ রশি নিয়ে লাকড়ির বোঝা নিজের পিঠে বয়ে আনবে এবং তা বিক্রি করবে। তবে আল্লাহ তা'আলা তা দ্বারা তার ইজ্জত রক্ষা করবেন। এটা তার জন্যে উত্তম যে, সে লোকের কাছে কিছু চাইবে আর লোক তাকে কিছু দেবে অথবা নিষেধ করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত হাদীসে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের জন্যে ভিক্ষা না করা বা কারো নিকট কিছু না চাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে বলা হয়েছে যে, বন-জঙ্গল হতে কাঠ কেটে পিঠে বহন করে বাজারে এনে বিক্রি করা কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেননা, মূলত ভিক্ষা করাটাই লজ্জা ও ঘৃণার কাজ। তারপরেও ভিক্ষা চাইলে পাওয়া বা না পাওয়া উভয়টির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং না পেলে অধিকতর লজ্জা ও ঘৃণার কাজ। পক্ষান্তরে কাঠ এনে বিক্রি করা একদিকে যেমন লজ্জাজনক কাজ নয়, অপরদিকে এর বিনিময়ে টাকা পাওয়াটা নিশ্চিত। কাজেই কারো কাছে কিছু চাওয়া মাকরূহ বা নিষিদ্ধ।

অপছন্দনীয় প্রার্থনা করার প্রকারভেদ : কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করা অপছন্দের ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত। হারাম, মাকরূহ ও মোবাহ। ১. যে ব্যক্তি মালদার সে নিজেকে অভাবগ্রস্ত বলে অন্যের কাছে পেশ করে কিছু চাওয়া 'হারাম'। ২. যার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ আছে যে, অন্যের কাছে হাত পাতার প্রয়োজন নেই। আবার নিজের অবস্থাকে কারো কাছে খাটো করেও পেশ করে না। এ অবস্থায় কিছু চাওয়া 'মাকরূহ'। ৩. কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর কাছে উত্তম পদ্ধতি ও ন্যায়-নীতির মাধ্যমে চাওয়া 'মোবাহ'। আর প্রয়োজনবোধে প্রাণ রক্ষার জন্য কিছু চাওয়া 'ওয়াজিব'। শেষকথা হলো প্রবৃত্তির চাহিদা ব্যতিরেকে, চাওয়া ব্যতীত আপনা-আপনি বৈধভাবে কোনো বস্তু হাতে আসলে তা গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই।

وَعَنْ ١٧٤٨ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৪৮. অনুবাদ : হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদা] আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কিছু চাইলাম এবং তিনি আমাকে তা দিলেন। অতঃপর আমি আবারও কিছু চাইলাম, তিনি আবারও আমাকে তা দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে হাকীম! নিশ্চয় এ মাল সবুজ মিষ্টি ঘাসের মতো। আর যে তা মনের লোভ ছাড়া গ্রহণ করে তাকে তাতে বরকত দেওয়া হয়, আর যে তা লালসার সাথে গ্রহণ করে তাকে ঐ মালে বরকত দেওয়া হয় না এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয় যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে অথচ তৃপ্তি পায় না। স্মরণ রেখো, উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। হাকীম বলেন– অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার কসম, আপনার পরে আমি আর কারো মাল কমাব না [তথা কারো কাছে কিছু চাইব না] যে পর্যন্ত আমি দুনিয়া ছেড়ে না যাই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম প্রয়োজনের তাগিতে হুযূর ﷺ -এর কাছে বায়তুল মাল হতে নিজের প্রাপ্য [ন্যায্য অংশ] চেয়েছেন, যা হুযূর ﷺ-ও তাকে প্রদান করেছেন। কিন্তু তৃতীয় বারে তাকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা ছিল পূর্ণ সতর্কতা ও পরহেজগারীর ইঙ্গিত। মালের প্রয়োজন আছে বলে লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করা উচিত নয়। তার পুনঃ পুনঃ চাওয়া হতে বুঝা যায় যে, তিনি মাল-সম্পদের প্রতি অত্যধিক আসক্ত ও লোভী। তাই হুযূর ﷺ তাকে দুনিয়ার সম্পদের প্রকৃত অবস্থাটি বলে দিলেন যে, তা সবুজ ও নয়নাভিরাম আর খেতে সুস্বাদু ও সুমিষ্ট। কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষায় চাইলে তাতে কল্যাণ হবে না। তাই তিনিও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এরপর অথবা হুযূর ﷺ এর পর তিনি আর কখনো কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করে নিবেন না।

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى-এর মর্মার্থ : উপরের হাত নিচের হাত হতে শ্রেয়। এখানে উপরের হাত দ্বারা দাতার হাতকে বুঝানো হয়েছে। অথবা ঐ হাতকে বুঝান হয়েছে, যা কিছু পাওয়ার আশায় অন্যের প্রতি প্রসারিত হয় না, আর নিচের হাত দ্বারা গ্রহীতার বা ভিক্ষার হাত বুঝান হয়েছে। আবার কারো মতে, নিচের হাত দ্বারা কৃপণের হাত উদ্দেশ্য।

لَا اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا-এর ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূল ﷺ -এর জন্য নিবেদিতপ্রাণ। রাসূলের প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ পালনে তাঁরা ছিলেন সদা প্রস্তুত। তাঁরা ব্যক্তি স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে হলেও রাসূলের বাণীকে অলঙ্ঘনীয় রাখতেন। রাসূলের অপছন্দনীয় প্রতিটি কথা ও কাজ বর্জন করতে তাঁরা এতটুকুও দ্বিধাবোধ করতেন না। উল্লিখিত হাদীসটিতে এরই একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। হাকীম ইবনে হিযাম বারবার মাল চাওয়ায় রাসূল ﷺ তাঁকে যে উপদেশ বাণী শুনিয়েছিলেন, এর প্রেক্ষিতে তিনি এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আমি আর কারো কাছে কিছু চাইব না বা প্রার্থনা করব না।

রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম হাকীম, উপনাম আবূ খালিদ, পিতার নাম হিযাম। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

২. **জন্ম :** বাদশাহ আবরাহা কর্তৃক আক্রমণের ১৩ বছর পূর্বে তিনি কা'বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** মক্কা বিজয়ের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি ৬০ বছর মুশরিক অবস্থায় জীবন-যাপন করেন।

৪. **জিহাদে যোগদান :** মুসলমান হওয়ার পরে সংঘটিত জিহাদসমূহে তিনি বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলেও জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

৫. **হাদীসের সংখ্যা :** তিনি সর্বমোট ৪০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ওরওয়া, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** তিনি একশ' দাস-দাসী আজাদ করেন। তিনি ৪০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ওরওয়া ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন।

৭. **ইন্তেকাল :** তিনি হিজরি ৫৪ সনে ১২০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৬০ বছর মুশরিক অবস্থায় আর ৬০ বছর মুসলমান অবস্থায় জীবন যাপন করেন।

وَعَنْ ١٧٤٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى هِيَ السَّائِلَةُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৪৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনি যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সদকা এবং সওয়াল হতে বিরত থাকা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন; "উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম, উপরের হাত হলো দাতার হাত নিচের হাত হলো ভিক্ষুকের হাত"। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٧٥٠ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ إِنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِيْهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কিছু চেয়েছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে তা দিলেন। অতঃপর তারা আবারও কিছু চাইলেন, এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দিলেন; অবশেষে তাঁর নিকট যা ছিল নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার নিকট যে সম্পদ থাকবে আমি তা তোমাদেরকে না দিয়ে জমা রাখব না। [মনে রেখ!] যে ব্যক্তি সওয়াল হতে বেঁচে থাকতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেন, যে কারো মুখাপেক্ষী হয় না, আল্লাহ তাকে পরমুখাপেক্ষী করেন না, যে ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দান করেন। মনে রেখ! ধৈর্য হতে উত্তম ও প্রশস্ত কোনো দান কাউকেও দেওয়া হয় না। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাল-সম্পদের প্রতি লোভ থাকা স্বাভাবিক। এটা মানুষের মৌলিক চাহিদা। তবে প্রয়োজনের তাগিদে কারো কাছে কখনো কখনো সওয়াল করার অনুমতি শরিয়তের বিধানে থাকলেও ধৈর্যধারণ করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। কেননা, ধৈর্যকে সমস্ত উত্তম চরিত্রাবলির শীর্ষ বলা হয়েছে। আর অভিজ্ঞতার আলোকেও এটা প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি পর মুখাপেক্ষী হতে বেঁচে থাকতে চায় এবং সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন।

وَعَنْ ١٧٥١ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّىْ فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهٖ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ - (متفق عليه)

১৭৫১. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [আমার জাকাত আদায়ের পারিশ্রমিক হিসেবে] আমাকে কিছু দিতে চাইতেন। তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে গরিব কাউকে আপনি এটা দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এটা গ্রহণ কর এবং নিজের মালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও; আর তা হতে দান কর। যে মাল তোমার কাছে আসে− অথচ তুমি এর লালসা কর না, তার জন্যে প্রার্থনাও কর না− তা গ্রহণ কর। আর যা এভাবে আসে না, তার পিছনে নিজের মনকে নিয়োজিত করো না। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বেচ্ছায় হযরত ওমর (রা.)-কে কিছু মাল দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন না; বরং তার চেয়ে অধিক অসহায় গরিবকে তা প্রদান করতে বললেন। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। তবে কোন শাসক বা বাদশা যদি তার শাসিত কোনো প্রজাকে কিছু দান করেন তা গ্রহণ করার বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, দান ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা মোস্তাহাব। আর যদি বাদশাহ হারামভাবে মাল সঞ্চয় করে এবং তা হতে দান করে তখন তা গ্রহণ করা হারাম হবে; তাই তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

রাবী পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস, গুণবাচক নাম ফারূক। পিতার নাম খাত্তাব আর মাতার নাম হানতামা বিনতে হাশিম। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।

২. **জন্ম :** তিনি হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে রাসূল ﷺ -এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. **বংশানুক্রম :** ওমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদুল ওযযা ইবনে রিবাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কারাত ইবনে রাজাহ ইবনে আদী ইবনে কা'ব, আর কুরাইশী। তাঁর বংশানুক্রম অষ্টম পুরুষে এসে রাসূল ﷺ -এর সাথে মিলে যায়।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি নববী ৬ষ্ঠ সালে মতান্তরে ৫ম সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। তাঁর পূর্বে ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরই ইসলাম প্রকাশ্যতা লাভ করে এবং তিনি "فاروق" উপাধিতে ভূষিত হন।

৫. **খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ :** হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি হিজরি ১৩ সালের ২৩শে জমাদিউস সানী খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর হিজরি ২৩ সালের ২৩শে জিলহজ তাঁর খেলাফত সমাপ্ত হয়। তাঁর খেলাফতের সময়সীমা হলো সর্বমোট ১০ বছর ৬ মাস।

৬. **বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :** তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সর্বমোট ৫৩৯ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

৭. **ইন্তেকাল :** হিজরি ২৩ সালের ২৪শে জিলহজ বুধবার দিন তিনি মসজিদে নববীতে ইশার নামাজে ইমামতি করার জন্যে দাঁড়ালে আবূ লু'লু নামক জনৈক অগ্নিপূজক ক্রীতদাস বিষাক্ত তরবারি দ্বারা তাঁর মাথা ও নাভিতে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। আহত অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭শে জিলহজ শনিবার তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

৮. **দাফন ও নামাজে জানাযা :** হযরত সোয়াইব (রা.) তাঁর নামাজে জানাযার ইমামতি করেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনুমতিক্রমে রওজায়ে নববীর মধ্যে সিদ্দীকে আকবরের বাম পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٥٢ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ اَبْقٰى عَلٰى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ اِلَّا اَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ اَوْ فِىْ اَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

১৭৫২. অনুবাদ : হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সওয়াল করা হলো জখমস্বরূপ, যা দ্বারা অন্বেষণকারী নিজের মুখমণ্ডলকে জখম করছে। যে চায় নিজের মুখমণ্ডলকে বহাল রাখতে পারে, আর যে চায় জখম হওয়ার জন্যে ছেড়ে দিতে পারে। তবে কোনো ব্যক্তি দেশের প্রশাসনের কাছে কিছু আবেদন করতে পারে [যার কাছে জনসাধারণের অধিকার রয়েছে] অথবা এমন ক্ষেত্রে চাইতে পারে যা ছাড়া কোনো উপায় নেই। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বাদশা বা শাসকের আয়ত্তাধীন যে সমস্ত মাল-সম্পদ রয়েছে তা বায়তুল মালের সম্পদ, দেশের সমস্ত নাগরিক এর অংশীদার। কাজেই সে তার নিজের প্রাপ্য অংশের জন্য সওয়াল করতে পারে। এতে সামাজিকভাবে কোনো দোষ বা লজ্জার কোনো কারণ থাকতে নেই। বস্তুত প্রত্যেক প্রজা তার শাসকের মুখাপেক্ষী থাকার মধ্যে কারো দ্বিমত নাই। অনুরূপভাবে যার সওয়াল করা বা অন্যের কাছে হাত পাতা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। যেমন– ফকির, মিসকিন ও ঋণগ্রস্ত ইত্যাদি, তারাও সওয়াল করতে কোনো দোষ নেই। এছাড়া যদি কেউ কারো কাছে সওয়াল করল, সে যেন নিজের মুখমণ্ডলকে তথা ইজ্জত আবরুকে জখম ও ক্ষত-বিক্ষত করল। সুতরাং হুযূর ﷺ বলেছেন, কেউ যদি নিজের ইজ্জতকে বাঁচাতে চায় তবে বাঁচাতে পারে আর বিনষ্ট করতে চাইলেও তা পারে।

اِلَّا اَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ -এর ব্যাখ্যা : রাষ্ট্রপতির দান গ্রহণ করা যাবে কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে– আল্লামা তীবী ও ইমাম গায্যালী (র.) বলেন, যদি রাষ্ট্র প্রধানের দানকৃত বস্তুতে হারামের আধিক্য হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না। তার কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। আর যদি এরূপ না হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবেদন করা যাবে।

আল্লামা তীবী (র.) উপরিউক্ত মতকে মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে সমর্থন করেছেন। আবার 'শরহে মুহাযযাব' নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে কিছু আবেদন করাকে মাকরূহ বলেছেন। তবে "সালাফ" বা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র প্রধানের দানকে গ্রহণ করেছেন। আর কিছু সংখ্যক আলেম তা বর্জন করেছেন।

لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا -এর বিশ্লেষণ : যে দ্রব্য ছাড়া গত্যন্তর নেই ঐ দ্রব্য রাষ্ট্র প্রধান বা সরকারের কাছে আবেদন করতে পারে। শুধু তাই-ই নয়; যদি মানুষ জীবন ধারণের জন্যে এক মুষ্টি অন্ন বা লজ্জা সংবরণ করার মতো এক টুকরো বস্ত্রের যোগাড় করতে না পারে তখন ঐ দ্রব্যগুলো সরকারের কাছে আবেদন করা ওয়াজিব।

হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির উপর যদি হজ ফরজ হয় কিন্তু তিনি হজ করেননি, পরবর্তীতে সে গরীব হয়ে যায় তাহলে হজ পালনার্থে ঐ ব্যক্তির জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের কাছে আবেদন করা ওয়াজিব। –[মিরকাত, খণ্ড– ২, পৃ. ৪৫৫]

وَعَنْ ١٧٥٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَسْئَلَتُهُ فِيْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ اَوْ خُدُوْشٌ اَوْ كُدُوْحٌ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৭৫৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কোনো কিছু সওয়াল করে, অথচ তার কাছে এমন সম্পদ আছে যা তাকে অমুখাপেক্ষী করতে পারে, সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। তখন তার সওয়াল তার চেহারায় [খুমূশ বা খুদূশ অথবা কুদূহ রাবীর সন্দেহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ তিনটি শব্দের যে কোনো একটি বলেছেন, সবগুলোরই প্রায় অনুরূপ অর্থ, অর্থাৎ আঘাতস্বরূপ হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাকেও কতটুকু মাল অমুখাপেক্ষী করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এর সমমূল্যের স্বর্ণ। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خُمُوْشٌ اَوْ خُدُوْشٌ اَوْ كُدُوْحٌ -এর ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত শব্দ خُمُوْشٌ اَوْ خُدُوْشٌ اَوْ كُدُوْحٌ শব্দগুলোর প্রয়োগ নিয়ে হাদীসের ভাষ্যকারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন– শব্দগুলো সমার্থবোধক, সকল শব্দ রাসূল ﷺ -এর মুখনিঃসৃত শব্দ। তবে এ হাদীসের বেলায় কোন শব্দটি প্রয়োগ করেছেন সে ব্যাপারে সন্দিহান থাকায় বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার সময় সবগুলো শব্দই ব্যবহার করেছেন সতর্কতা অবলম্বনার্থে এবং মর্মোদ্ধারের জন্যে।

অথবা হতে পারে প্রত্যেকটি শব্দের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং আমরা বলব এবং اَلْكُدُوْحُ ও اَلْخُدُوْشُ এক নয় اَلْخُمُوْشُ ও اَلْخُدُوْشُ এক নয়।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ শব্দগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। অর্থাৎ কম, মধ্যম এবং বেশি আবেদন করার সময় তিনস্থলে তিনটি শব্দ ব্যবহার হয়।

মুখাপেক্ষী সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে ব্যক্তিকে ধনী বলা যাবে এবং অন্যের নিকট হাত পাতা বৈধ হবে না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, যার সব সময় বা অধিকাংশ সময় সকাল-বিকালের খাওয়া জোটে সে ধনী। তার জন্যে অন্যের নিকট হাত পাতা বৈধ হবে না।

দলিল : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا الْغَنِيُّ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْئَلَةُ؟ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ -

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যে ব্যক্তি পাঁচ আওকিয়া বা ২০০ দিরহাম অথবা তৎসমমূল্যের সম্পদের মালিক হবে, সে-ই ধনী। তার জন্যে অন্যের নিকট হাত পাতা বৈধ হবে না।

দলিল : قَوْلُهُ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا -

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যে ব্যক্তি ৫০ দিরহাম বা তৎসমূল্যের সম্পদের মালিক হবে, সে-ই ধনী। তার জন্যে অন্যের নিকট হাত পাতা বৈধ হবে না।

দলিল : قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يُغْنِيْهِ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ -

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : 'কাফি' গ্রন্থে আছে যে, হানাফীদের উত্থাপিত হাদীস অন্যান্যের উত্থাপিত হাদীসসমূহের জন্য রহিতকারী। মুসনাদুল হিন্দ শায়খ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.)-ও তাঁর লুম'আত গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, যে ধনাঢ্যতা আবেদনকে নিষিদ্ধ করে, এর পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলোতে প্রকৃতপক্ষে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, অধিক সন্তান ও সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষের অবস্থাও বিভিন্ন হয়ে থাকে। কারো জন্যে মুখাপেক্ষিতার নিম্নতম স্তর পাঁচ আওকিয়া অর্থাৎ দু'শত দিরহাম, আবার কারো জন্যে পঞ্চাশ দিরহাম, আবার কারো জন্যে সকাল-বিকালের খোরাকি পরিমাণ।

وَعَنْ ١٧٥٤ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ قَالَ النُّفَيْلِيُّ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ فِيْ مَوْضِعٍ أٰخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْئَلَةُ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ وَقَالَ فِيْ مَوْضِعٍ أٰخَرَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

১৭৫৪. অনুবাদ : হযরত সাহ্ল ইবনে হানযালিয়্যাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি কিছু চায় অথচ তার কাছে এতটুকু সম্পদ আছে যা তাকে মুখাপেক্ষীহীন করে, নিশ্চয় সে [জাহান্নামের] আগুন অধিক সংগ্রহ করছে।

এ হাদীসে অন্যতম রাবী নুফাইলী অপর এক স্থানে বলেছেন, [রাসূল ﷺ- এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো] ধনাঢ্যতার সীমা কি? যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে কারো পক্ষে প্রার্থনা করা উচিত হয় না। রাসূল ﷺ বললেন, সকাল-বিকালের খানা পরিমাণ। রাবী নুফাইলী অন্যত্র বলেছেন, যার নিকট একদিনের অথবা একদিন বা রাতের তৃপ্ত পরিমাণ খাদ্য আছে। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ١٧٥٥ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوْقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ -

১৭৫৫. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র.) বনী আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি [সাহাবী] হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করল অথচ তার কাছে এক উকিয়া [অর্থাৎ চল্লিশ দিরহাম] অথবা তার সমপরিমাণ অন্য কোনো জিনিস আছে, তবে সে সওয়ালে সীমালঙ্ঘন করল। –[মালেক, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِلْحَافٌ শব্দের বিশ্লেষণ : ইলহাফ (إِلْحَافٌ) অর্থ– অনুনয়-বিনয় করা, কাতরভাবে প্রার্থনা করা, জোর করে সওয়াল করা, পুনঃ পুনঃ সওয়াল করা, সওয়ালে জোঁকের মতো আঁকড়িয়ে থাকা। এটা নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। কুরআন মাজিদে এরূপ করাকে 'ভাল লোকের কাজ নয়' বলা হয়েছে।

وَعَنْ ١٧٥٦ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ اِلَّا لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ وَمَنْ سَاَلَ النَّاسَ لِيُثْرِىَ بِهٖ مَالَهٗ كَانَ خُمُوْشًا فِىْ وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَرَضْفًا يَاْكُلُهٗ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৭৫৬. **অনুবাদ :** হযরত হুবশী ইবনে জুনাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– ধনী ব্যক্তি এবং সক্ষম ও সুঠাম পুরুষের জন্যে ভিক্ষা হালাল নয়. তবে হ্যাঁ! ভয়ানক অভাবে পতিত ব্যক্তি ও অপমানকর দেনায় আবদ্ধ ব্যক্তির জন্যে হালাল। আর যে ব্যক্তি নিজের মাল বৃদ্ধির জন্যে মানুষের কাছে চাইবে. কিয়ামতের দিন তার চেহারা ক্ষত স্বরূপ হবে এবং ভিক্ষালব্ধ সম্পদগুলো জাহান্নামের গরম পাথরখণ্ড হবে. যা সে ভক্ষণ করতে থাকবে। [এতদসত্ত্বেও] সে যদি ইচ্ছা করে সওয়াল কম করুক আর সে ইচ্ছা করে বেশি করুক। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٧٥٧ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْاَلُهٗ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَىْءٌ فَقَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهٗ وَنَبْسُطُ بَعْضَهٗ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِىْ بِهِمَا فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِىْ هٰذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ فَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ وَقَالَ اِشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَاْتِنِىْ بِهٖ فَاَتَاهُ بِهٖ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْدًا بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا

১৭৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারীদের এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে কিছু সওয়াল করতে আসল। তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? সে বলল, জি. হ্যাঁ! একটি কম্বল আছে: এর এক অংশ আমরা গায়ে দেই এবং অপর অংশ বিছাই। আর একটি পেয়ালা আছে: যাতে করে আমরা পানি পান করি। রাসূল ﷺ বললেন. তুমি ঐ দু'টি আমার কাছে নিয়ে এসো! সে উভয়টি তাঁর নিকট নিয়ে আসল রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়টিকে নিজের হাতে নিয়ে বললেন. এ দু'টি কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এ দু'টি এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন. কে এক দিরহামের বেশি দিতে পারে? এ কথা তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন। এক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টি দু' দিরহামে নিতে পারি। তিনি উভয়টি তাকেই দিলেন এবং দু' দিরহাম নিলেন এবং ঐ আনসারীকে দিরহাম দু'টি দিয়ে বললেন, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিন এবং তা নিজের পরিবারকে দাও এবং অপর দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিন এবং তা নিয়ে আমার কাছে এসো! [আদেশ মতো] সে তা নিয়ে তাঁর কাছে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের হাতে তাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন. তুমি এটা নিয়ে যাও এবং [জঙ্গলে গিয়ে] কাঠ কাটতে থাক এবং বিক্রি কর। আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে আর না দেখি। লোকটি চলে গেল এবং কাঠ কাটতে ও বিক্রয় করতে লাগল। অতঃপর সে [পনের দিন পরে] রাসূলে কারীম

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ الْمَسْئَلَةُ نُكْتَةً فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَصْلُحُ اِلَّا لِثَلٰثَةٍ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى ابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ)

ﷺ -এর কাছে আসল। তখন সে দশ দিরহামের মালিক হলো। তার কিছু দিরহাম দ্বারা সে কাপড় চোপড় খরিদ করল এবং কিছু দ্বারা খাদ্যদ্রব্য। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তোমার জন্যে কিছু চাওয়া হতে উত্তম। সওয়াল [ভিক্ষা] কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে দাগ স্বরূপ হবে। স্মরণ রেখো! তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে কিছু সওয়াল করা উচিত নয়। মাটিতে মিশিয়ে দেয় এমন অভাবী, চরম লাঞ্ছিত, ঋণগ্রস্ত ও পীড়াদায়ক রক্তপণ বা দিয়তের জন্য দায়ী ব্যক্তি। –[আবূ দাঊদ।

ইবনে মাজাহ রাসূলে কারীম ﷺ -এর উক্তি يَوْمَ الْقِيَامَةِ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ **-এর ব্যাখ্যা :** যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে এবং তার উপর দিয়ত ওয়াজিব হয় অথচ দিয়ত দেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ নেই। আর হন্তার পক্ষ থেকে দিয়ত দিয়ে দেওয়ার মতো কোনো অভিভাবক বা বন্ধুও নেই এবং সরকারি কোষাগার থেকেও সে সাহায্য পাচ্ছে না। অন্যদিকে মৃতব্যক্তির অভিভাবকগণও দিয়ত চাচ্ছে। যদি দিয়ত না দেয় তাহলে ফিতনা এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে; বরং পূর্বের চেয়ে আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে তাহলে ঐ দিয়ত আদায়ের জন্যে মানুষের নিকট চাওয়া বৈধ।

وَعَنْ ١٧٥٨ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنٰى اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ اَوْ غِنًى اٰجِلٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৭৫৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে অভাবে পড়ল আর তা লোকের কাছে প্রকাশ করল, তার অভাব মোচন হবে না। আর যে আল্লাহ তা'আলার কাছে নিবেদন করল, অচিরেই আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন, শীঘ্রই তার মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা বিলম্বে তাকে ধনী করার মাধ্যমে। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ١٧٥٩ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ اَنَّ الْفِرَاسِيَّ (رض) قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَاِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِيْنَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৭৫৯. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত ইবনুল ফিরাসী (র.) হতে বর্ণিত, তাঁর পিতা ফিরাসী (রা.) বলেছেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি কারো কাছে কিছু সওয়াল করতে পারি? নবী করীম ﷺ বললেন, "না"। যদি তোমার একান্ত সওয়াল করতেই হয়, তবে পুণ্যবান লোকদের নিকট সওয়াল করবে।

–[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পুণ্যবানদের নিকট চাওয়ার কারণ : পুণ্যবান বা মাহাত্ম্য ব্যক্তিদের কাছে কিছু চাওয়ার জন্যে নির্দেশ বা পরামর্শ উত্তমতর হিসেবে বলা হয়েছে। কেননা, তারা প্রার্থনাকারীকে ঘৃণা বা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন না। যা কিছু প্রদান করেন তা হালাল ও পবিত্র মাল হতেই দান করে থাকেন। সর্বোপরি তাঁরা হন দয়ালু ও উদারমনা, তাই ভিক্ষুককে শুধুমাত্র কিছু মাল দিয়ে বিদায় করেন না; বরং দোয়াও করে থাকেন, যা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। এ জন্যে রাসূল ﷺ পুণ্যবান লোকদের নিকট চাইতে বলেছেন।

وَعَنْ ١٧٦٠ ابْنِ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ اسْتَعْمَلَنِىْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَنِىْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِىْ عَلَى اللّٰهِ قَالَ خُذْ مَا اُعْطِيْتَ فَاِنِّىْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَمَّلَنِىْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْئَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৭৬০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমাকে জাকাত আদায়ের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলেন। যখন আমি কাজ শেষ করলাম এবং আদায়কৃত সম্পদ তাঁকে দিলাম। তখন তিনি আমার জন্যে তার পারিশ্রমিক দিতে (খাজাঞ্চিকে) আদেশ করলেন। তখন আমি বললাম, আমি এ কাজ শুধু আল্লাহর জন্যে করেছি, আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকটই পাব। তিনি বললেন, তোমাকে যা দেওয়া হয় তা গ্রহণ কর। কেননা, একবার আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় এ কাজ করেছিলাম এবং রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। তখন আমিও তোমার কথার ন্যায় কথা বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, তোমার প্রার্থনা করা ব্যতীত তোমাকে যা কিছু দান করা হবে তুমি তা খাবে এবং অপরকে দান করবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٧٦١ عَلِيٍّ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْاَلُ النَّاسَ فَقَالَ اَفِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَفِىْ هٰذَا الْمَكَانِ تَسْاَلُ مِنْ غَيْرِ اللّٰهِ فَخَفَقَهُ بِالدِّرَّةِ - (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

১৭৬১. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আরাফার দিনে এক ব্যক্তিকে মানুষের কাছে কিছু প্রার্থনা করতে শুনে বললেন, তুমি এ দিনে আর এ স্থানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাচ্ছ? অতঃপর তিনি তাকে চাবুক দ্বারা কষাঘাত করলেন। –[রাযীন]

وَعَنْ ١٧٦٢ عُمَرَ (رض) قَالَ تَعْلَمُنَّ اَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَاَنَّ الْاَيَاسَ غِنًى وَاَنَّ الْمَرْءَ اِذَا يَئِسَ عَنْ شَىْءٍ اِسْتَغْنٰى عَنْهُ - (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

১৭৬২. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল, তোমরা জেনে রেখ! লোভই হলো দরিদ্রতা, নৈরাশ্যই হলো ধনাঢ্যতা। যখন মানুষ কোনো কিছুতে আশাহীন হয় [অর্থাৎ তার জন্য কারো নিকট আশা পোষণ করা ত্যাগ করে] তখন তাতে সে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। –[রাযীন]

وَعَنْ ١٧٦٣ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَكْفُلُ لِيْ اَنْ لَّا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لَا يَسْئَلُ اَحَدًا شَيْئًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৭৬৩. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কে আমার কাছে জামিন হতে পারে যে, লোকের কাছে সে কিছু প্রার্থনা করবে না? আমি তার জন্যে জান্নাতের জামিন হতে পারি। তখন হযরত ছাওবান (রা.) বললেন, হুযূর আমি পারি। রাবি বলেন, এরপর হযরত ছাওবান (রা.) কারো কাছে কোনো কিছু চাননি। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ١٧٦٤ اَبِيْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ اَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَلَاسَوْطَكَ اِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتّٰى تَنْزِلَ اِلَيْهِ فَتَاْخُذَهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৭৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন, তিনি আমার উপরে এ শর্ত আরোপ করলেন যে, তুমি কোনো মানুষের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করবে না। আমি বললাম, হ্যাঁ। [এমনকি তিনি এটাও] বললেন যে, যদি তোমার চাবুকটি মাটিতে পড়ে যায় তবুও না, বরং তুমি নিজে [ঘোড়ার পিঠ হতে] অবতরণ করে তা উঠিয়ে নাও। –[আহমদ]

بَابُ الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ

পরিচ্ছেদ : দানের মাহাত্ম্য ও কৃপণতার নিন্দা

اَلْاِنْفَاقُ শব্দটি বাবে اِفْعَال -এর মাসদার যা نَفْق মূলধাতু হতে নির্গত. এর শাব্দিক অর্থ হলো খরচ করা বা ব্যয় করা আর اَلْاِمْسَاكُ শব্দটিও বাবে اِفْعَال -এর মাসদার যার শাব্দিক অর্থ হলো ব্যয় না করা, আবদ্ধ রাখা। আর এখানে اِنْفَاق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দান করা আর اِمْسَاك দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কৃপণতা বা বখিলী করা। দানশীলতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কর্ম আর কৃপণতা একেবারেই নিন্দনীয়। হাদীসে এসেছে, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু। সামাজিকভাবেও দানশীলতা মানুষকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করায়। আর কৃপণতা মানুষকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে। আর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এ দানের মূর্তপ্রতীক; তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক হাদীসে তাঁর দানকে প্রবহমান বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদ এ সম্পর্কীয় হাদীসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٦٥ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِىْ اَنْ لَّا يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ اِلَّا شَىْءٌ اُرْصِدُهٗ لِدَيْنٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৭৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি এটাই পছন্দ করব যে, আমার উপর তিন রাত অতিক্রম করতে না করতেই তা যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। তবে সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা আমি দেনা পরিশোধের জন্যে রাখব। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ -এর অতি উন্নত দানশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি দানে যে কোনোরূপ কার্পণ্য করেন না তাও বুঝা গেছে, তবে ঋণ পরিমাণ সম্পদ রাখা এটা একান্ত আবশ্যক। কেননা, অপরের ঋণ রেখে দান করাটা শরিয়ত একেবারেই অপছন্দ করে।

اُرْصِدُهٗ لِدَيْنٍ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি এটাই পছন্দ করব যে, আমার উপর তিন রাত অতিক্রম করতে না করতেই যেন তা নিঃশেষ হয়ে যায়। তবে এতটুকু পরিমাণ আমার কাছে রাখব যা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়। নবী করীম ﷺ -এর এ উক্তিটি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দান-সদকার তুলনায় ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব অনেক বেশি। অথচ আমাদের সমাজে অনেক লোক রয়েছে যারা দান-সদকার ব্যাপারে খুবই সোচ্চার, কিন্তু তাদের জিম্মায় যে অপরের পাওনা রয়েছে সেদিকে তাদের বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। এটা নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনিভাবে অনেক নামধারী পীর-বুজুর্গ রয়েছে, ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে যারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। অথচ তাদের উপরে মানুষের যেসব প্রাপ্য রয়েছে তা আদায় করার প্রতি সামান্য ভ্রূক্ষেপও তারা করেন না। এমনি মুহূর্তে আমাদের জন্যে অপরিহার্য হলো সমাজের এ ভুল শুধরিয়ে হাদীসের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করা।

وَعَنْهُ ١٧٦٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৬৬. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখনই আল্লাহর বান্দাগণ সকালে ঘুম হতে উঠে, আসমান হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতার প্রতিদান দাও। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে সর্বনাশ কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٧٦٧ اَسْمَاءَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفِقِيْ وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اِرْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৬৭. **অনুবাদ :** হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, খরচ করতে থাক, হিসাব করো না। হিসাব করলে আল্লাহও তোমাকে দিতে হিসেব করবেন। ধরে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমার ব্যাপারে ধরে রাখবেন। যতটুকু সম্ভব দান করতে থাক। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِرْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ**-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলের বাণী– "যতটুকু সম্ভব দান করবে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কম হলেও দান করবে। আর অল্প দান করা সহজ বলে একে অবহেলার চোখে দেখবে না। কেননা, এ অল্পই কখনো আল্লাহর নিকট বেশির মর্যাদা পায়। অথবা হতে পারে মীযানে এ অল্পই অনেক ভারী হবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন–

وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا -

■ আল্লামা ইবনুল মালেক (র.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ এ নির্দেশ রুখসতের জন্যে দিয়েছেন। কেননা, কোনো কোনো মানুষ দান-সদকা করার শক্তি রাখে না, বা কোনো মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু দান করতে পারে না, এ সকল ক্ষেত্রে অভ্যাস অনুযায়ী অল্প কিছু দান করতে পারে, তাতে যেমন– সামর্থ্যহীন ব্যক্তিও দিতে পারবে। অন্যদিকে স্বামীরও অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। যেমন কাউকে খেজুর দেওয়া বা সামান্য খাদ্য দিয়ে মেহমানদারী করা।

وَعَنْ ١٧٦٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৬৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি [আমার উদ্দেশ্যে] খরচ কর, আমি তোমাকে দান করব। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٧٦٩ اَبِيْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَاَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلٰى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৬৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা আছে, তা দান করবে। এটা তোমার জন্যে উত্তম। আর তাকে ধরে রাখা তোমার জন্যে খারাপ। যদি জীবন ধারণ উপযোগী সম্পদ নিজের কাছে সঞ্চিত রাখ তবে তাতে তুমি নিন্দার যোগ্য হবে না। আর দানের ব্যাপারে তোমার পোষ্যদের থেকে শুরু করবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٧٧٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِنْبَسَطَتْ عَنْهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৭০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কৃপণ ও দানশীলের উদাহরণ হলো সে ব্যক্তির মতো, যাদের শরীরে দু'টি লৌহ বর্ম রয়েছে, যার দরুন তাদের দু'হাত তাদের দু'বুকের ছাতি ও ঘাড়ের সাথে মিশে গেছে। দানশীল যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখনই হাত খুলে যায়, আর কৃপণ যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন তা আরো কমে যায় এবং প্রতিটি কড়া নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে উদাহরণটি রূপক, দানশীল ও কৃপণের মনের অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু দানশীল ব্যক্তি দানের ইচ্ছা হয়েছে। সেহেতু দানশীল ব্যক্তি দানের ইচ্ছা করলে তার অন্তর আরো প্রশস্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি দান করার ইচ্ছা করলে তার অন্তর আরো সংকীর্ণ হয়ে যায়।

وَعَنْ ١٧٧١ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمٰتٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৭১. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– জুলুম হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। কৃপণতা হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে; তাদেরকে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُحّ ও بُخْل -এর মধ্যকার পার্থক্য : شُحّ শব্দের অর্থ– কৃপণতা, আর بُخْل শব্দের অর্থও কৃপণতা। তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে।

شُحّ অর্থ নিজের মাল ধরে রাখার প্রবণতা এবং সাথে সাথে লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে অন্যের মালও ধরে রাখার কু-প্রবণতা। পক্ষান্তরে بُخْل অর্থ শুধু নিজের মাল খরচ না করে ধরে রাখার প্রবণতা।

'শুহহা' বুখল হতেও ভয়ঙ্কর ও খারাপ। شُحّ -এর কারণে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদের প্রতি লালসাবশত অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে অন্যের ক্ষতি সাধন করে। মূলত তা জুলুমের জন্ম দেয়। পক্ষান্তরে بُخْل নিজের আত্মার প্রতি জুলুম করে অপরের প্রতি জুলুম করে না।

▮ কারো মতে, যে বস্তু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ওয়াজিব তা খরচ না করাকে بُخْل বলে। আর شُحّ হচ্ছে بُخْل -এর সাথে সাথে মাল জমা করার প্রতিও আগ্রহী হওয়া। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

রাবী পরিচিতি :

১. নাম ও পরিচিতি : নাম জাবির; উপনাম আবূ আবদুল্লাহ, আবূ আব্দুর রহমান; পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর; মাতার নাম নাসীবাহ।

২. বংশ-পরম্পরা : জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম ইবনে কা'ব ইবনে গনম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা।

৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি দ্বিতীয় আকাবায় পিতাসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

৪. মর্যাদা ও কৃতিত্ব : তিনি রাসূল কারীম ﷺ -এর হুবহু প্রতিচ্ছবি ছিলেন। অল্প বয়সের কারণে তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি মোট ১৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বাসা মসজিদে নববী হতে এক মাইল দূর হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি জামাতে আদায় করতেন। আল্লামা কিরমানী ও আইনী (র.)-এর মতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৫৪০ টি।

৫. হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বমোট ১৫৪০ হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৬০টি মুত্তাফাক আলাইহ। আর ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ২৬টি এবং মুসলিম (র.) ২৬টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. ইন্তেকাল : তিনি মতান্তরে ৭৪/৭৭ হিজরিতে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্বাস ইবনে উসমান তাঁর জানাযা পড়ান তাকে মদীনায় সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ١٧٧٢ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ بِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৭২. অনুবাদ : হযরত হারিছা ইবনে ওহাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা দান কর। কেননা, তোমাদের প্রতি এমন সময় আসবে, লোক তার জাকাত নিয়ে ফিরবে; কিন্তু দান গ্রহণ করার মতো কোনো লোক পাবে না। লোকে বলবে, যদি গতকাল তা নিয়ে আসতে, তবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আমার তাতে প্রয়োজন নেই। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এটা রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী। এর দ্বারা ইমাম মাহদী (আ.)-এর জমানার পূর্ববর্তী সময় ও হযরত ঈসা (আ.)-এর নাজিল হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের পূর্বে এক সময় সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, লোক তার জাকাতের মাল নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরবে; কিন্তু জাকাত গ্রহণ করার মতো কোনো গরিব লোক পাওয়া যাবে না। পূর্বে যারা জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ছিল, তারা বলবে, আমরা গতকাল হলে গ্রহণ করতাম। আজ আমাদের কোনো অভাব নেই।

▌ আল্লামা ইবনুল মালেক (র.) বলেন, সব লোক পরকালের প্রতি আকৃষ্ট ও দুনিয়াত্যাগী হবে। ফলে যার যা আছে সে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। যেহেতু লোকের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি থাকবে না এ জন্যে কেউ মাল গ্রহণ করতেও চাইবে না।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। অপর হাদীসে আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, শেষ জমানায় জমিন আপন কলিজার টুকরাসমূহ [ধাতুসমূহ] বের করে দেবে। বস্তুত রাসূল ﷺ -এর এই ভবিষ্যদ্বাণী ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিতও হচ্ছে। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে তা পুরোদমে প্রকাশিত হবে।

وَعَنْ ١٧٧٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَاْمُلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمُ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [সাহাবীদের মধ্যে] একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! ছওয়াবের দিক দিয়ে কোন দান বড়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তুমি দান কর এমন অবস্থায় যে তুমি সুস্থ, মালের প্রতি রক্ষণশীল, তুমি দারিদ্র্যকে ভয় কর, ধনী হওয়ার আশা পোষণ কর। সুতরাং তুমি এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না, যে পর্যন্ত না তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তখন তুমি বলবে, এ মাল অমুককে দাও, এ মাল অমুককে দাও। অথচ মাল অমুকের জন্যে হয়েই গেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অর্থ-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা মানুষের জন্মগত স্বভাব। আর এর প্রতি রক্ষণশীল হওয়াও যুক্তিযুক্ত। অনুরূপভাবে সুস্থ থাকাকালীন মৃত্যুর কথা স্মরণ না করে আরো অনেক দিন বেঁচে থাকার ধারণায় মাল-সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করার প্রতিও মানুষের প্রবল ঝোঁক থাকে। কাজেই এ সময় সকল ভালবাসা ও লোভ-লালসা ত্যাগ করে দান করতে পারলে তখন কুরআনের বাণী– لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -এর প্রতি আকুণ্ঠ পদক্ষেপ হবে। তখনই হবে দান-সদকার যথার্থ মূল্যায়ন। বর্তমান সমাজে দেখা যায় মানুষ দান-সদকা করে বৃদ্ধ বয়সে, যখন মৃত্যুশয্যায়, যখন বেঁচে থাকার আর কোনো আশা থাকে না, সম্পদের প্রতি ভালবাসাও তিরোহিত হয়ে যায়। এ সময় বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামে অকাতরে দান-সদকা ও অসিয়ত করতে থাকে। এ সময় সে তার সকল সম্পদের এককভাবে মালিক নয়; বরং সে মাত্র এক-তৃতীয়াংশের উপর অধিকার রাখে। অবশিষ্ট মাল তার ওয়ারিশদের। তখন তার এই দান গৃহীত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

وَعَنْ ١٧٧٤ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَاٰنِىْ قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالًا اِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ وَقَلِيْلٌ مَاهُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকটে পৌঁছলাম। তখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় বসেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি আমাকে দেখলেন, তখন বলে উঠলেন, কা'বা গৃহের প্রভুর শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। এটা শুনে আমি বললাম, আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক– তারা কারা? রাসূল ﷺ বললেন, যাদের কাছে অনেক মাল-সম্পদ আছে। কিন্তু যে এরূপ বা এরূপ বা এরূপ করে [অর্থাৎ দান করে] সামনের দিকে, পেছনের দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে [তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়]। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। –[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٧٧٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৭৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে, জান্নাতের কাছাকাছি, মানুষের কাছাকাছি [কিন্তু] জাহান্নাম হতে দূরে। [পক্ষান্তরে] কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হতে দূরে, জান্নাত হতে দূরে, মানুষ হতেও ব্যবধানে কিন্তু জাহান্নামের নিকটে। মূর্খ দানশীল ব্যক্তি কৃপণ উপাসনাকারী হতে অল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দানশীলতা একটি উত্তম গুণ। এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন; মানুষের নিকটও সে প্রিয়। এমন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। ফলে সে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। আর কৃপণ ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালবাসেন না, সে মানুষের নিকটও অপ্রিয়। আর জান্নাত তার থেকে দূরে সরে যাবে এবং জাহান্নাম নিকটবর্তী হবে। এ কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন মূর্খ দানশীল ব্যক্তি কৃপণ ইবাদতকারী হতে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

وَعَنْ ١٧٧٦ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِيْ حَيٰوتِهٖ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهٖ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

১৭৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করার চেয়ে তার জন্যে উত্তম। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ١٧٧٧ اَبِي الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِيْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهٖ اَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ اِذَا شَبِعَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهٗ)

১৭৭৭. অনুবাদ : হযরত আবুদ্ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে দান করে বা দাস-দাসী মুক্ত করে সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো, যে নিজে পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে [অবশিষ্ট] অন্যকে উপহার দেয়। –[আহমাদ, নাসায়ী, দারিমী ও তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

وَعَنْ ١٧٧٨ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُؤْمِنٍ اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৭৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দু'টি স্বভাব একজন ঈমানদারের মধ্যে একসাথ হতে পারে না। ১. কৃপণতা ও ২. দুর্ব্যবহার। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কার্পণ্য ও দুর্ব্যবহার একজন মু'মিনের মধ্যে পাওয়া যায় না, যা বাস্তবতার বিপরীত। এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা তুরপুশ্‌তী (র.) বলেন, স্বভাব দু'টির শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছা এ স্বভাবের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া এবং এ স্বভাবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা– এরূপ চরম অবস্থায় একত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একজন মু'মিনের মধ্যে উল্লিখিত স্বভাব দু'টির কিছু কিছু থাকা মনুষ্য সহজাত প্রবৃত্তিরই অংশ। কখনও সে কৃপণতা করে, আবার কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে খারাপ আচরণও করে থাকে, কিছু পরেই আবার অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে নিজে শাসন করে। আবার কখনও উত্তম ব্যবহার করে থাকে। এরূপ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত হাদীসের বেলায়ও প্রযোজ্য। যথা– নবী করীম ﷺ বলেছেন– لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَلَا إِيْمَانٌ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا অর্থাৎ, বান্দার অন্তরে সর্বদা ধরে রাখার প্রবণতা অর্থাৎ কার্পণ্য ও ঈমান একত্র হতে পারে না।

■ আল্লামা তীবী (র.) ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে দুর্ব্যবহারের অর্থ প্রচলিত দুর্ব্যবহার নয়, মানুষ সচরাচর যাকে দুর্ব্যবহার বলে থাকে; বরং দুর্ব্যবহার বলতে ঐ ধরনের অসদাচরণ বুঝানো হয়েছে, যা ঈমানের বরখেলাপ। এ প্রেক্ষিতে উত্তম আচরণ বলতে আদেশ মতো চলার প্রবণতা এবং নিষেধ হতে আত্মরক্ষার অদম্য ইচ্ছা বুঝাবে। যেমন– এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, "রাসূলে কারীম ﷺ -এর আচরণ ছিল কুরআনের অবিকল।" সুতরাং খারাপ আচরণ তাই, যা কুরআন তথা ঈমানের বিপরীত আচরণ। আর সে ধরনের আচরণ বা ব্যবহার সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, তা একজন ঈমানদারের মধ্যে একত্র হতে পারে না। কৃপণতা যদিও খারাপ আচরণের অংশ বিশেষ, তবু তা সবচেয়ে খারাপ হওয়ায় তার কথা পৃথকভাবে বলা হয়েছে।

وَعَنْ ١٧٧٩ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৭৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রতারক, কৃপণ ও দান করে খোটা প্রদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে উল্লিখিত এ তিন শ্রেণীর লোক সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ফলে শান্ত সমাজ বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়। "এরা বেহেশতে প্রবেশ করবে না," এর অর্থ হলো কৃতপাপের শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে প্রবেশ করবে। অথবা এ সমস্ত দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রবেশ করবে না। মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে বা আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন কিংবা পাপের জন্যে নির্দিষ্ট সময় জাহান্নামে জ্বলার পর তবে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।

اَلْخَبُّ وَالْمَنَّانُ-এর পরিচয় : اَلْخَبُّ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ধোঁকা দিয়ে মানুষের মধ্যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এরূপ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ, এ স্বভাবগুলোর কারণে শাস্তি পাওয়া ব্যতীত প্রথম সুযোগেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। اَلْمَنَّانُ হলো যে ব্যক্তি গরিবকে দান করার পর তার খোঁটা দেয়, অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপরে কিছু পালন করা, সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি ছিল; কিন্তু সে তা করেনি।

রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবূ বকর, উপাধি আতীক ও সিদ্দীক, পিতার নাম উসমান, পিতার ডাকনাম আবূ কুহাফা।

২. **বংশানুক্রম :** আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে উসামন আবূ কুহাফা ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তাইম ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব আল-কুরাইশী।

৩. **জন্ম :** তিনি ৫৭১/৭২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল ﷺ -এর দু'বছর চার মাসের ছোট।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি ইসলাম গ্রহণকারী নারী-পুরুষের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ইসলাম গ্রহণকারী বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম।

৫. **রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহচর্য :** রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। এ কারণেই রাসূল ﷺ তার সম্পর্কে ইরশাদ করেন– لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ (رض) خَلِيْلًا

৬. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, তাকে উদ্দেশ্য করে কুরআনুল কারীমে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কুরাইশ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, বিচক্ষণতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, বদান্যতা ও উদারতা প্রভৃতি গুণাবলির আধার ছিলেন তিনি। তিনি খলীফাতুর রাসূল ছিলেন। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর শ্বশুর ছিলেন। তিনি اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ ছিলেন। রাসূল ﷺ -এর অন্তিম মুহূর্তে তিনি ২৭ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেন।

৭. **খেলাফতের দায়িত্ব লাভ :** রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর খেলাফতের সময়কাল ছিল দু'বছর তিন মাস দশদিন।

৮. **হাদীসের খেদমত :** তিনি সর্বমোট ১৪২ খানা হাদীস বর্ণনা করেন অধিক সতর্কতার কারণেই তাঁর থেকে এত কম হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৯. **ইন্তেকাল :** রাসূলে কারীম ﷺ -এর সর্বাধিক প্রিয় এ মহান খলিফা মুসলিম বিশ্বকে শোকে মুহ্যমান করে ২৩ শে আগস্ট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তাঁকে গোসল করান। আর হযরত ওমর (রা.) তার জানাযার নামাজে ইমামতি করেন। হযরত আয়েশার হুজরায় রাসূল ﷺ -এর পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ١٧٨٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرُّ مَا فِى الرَّجُلِ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِىْ كِتَابِ الْجِهَادِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

১৭৮০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– মানুষের মধ্যে যেসব খারাপ স্বভাব হতে পারে তন্মধ্যে চরম পর্যায়ের কৃপণতা ও চরম কাপুরুষতা [স্বভাবদ্বয়] অধিক খারাপ। –[আবূ দাঊদ]

আমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ হাদীসটি জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

عَنْ ١٧٨١ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا وَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اَنَّمَا كَانَ طُوْلُ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ اَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهٖ زَيْنَبُ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ

১৭৮১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর কোনো কোনো স্ত্রী নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে আপনার সাথে [পরকালে] প্রথমে মিলিত হবে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত অধিক লম্বা সে। তখন তারা কাঠের টুকরা নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগল। তাদের মধ্যে সাওদার হাত সবচেয়ে লম্বা ছিল। কিন্তু কিছু পরেই আমরা বুঝতে পারলাম যে, দীর্ঘ হাত বলতে দানের দিক দিয়ে যে বড় তাকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের মধ্যে শীঘ্রই রাসূল ﷺ -এর সাথে মিলিত হওয়ার মতো যয়নবই ছিলেন। তিনি দান করতে ভালবাসতেন। –[বুখারী]

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقًا بِىْ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ وَكَانَتْ يَتَطَاوَلْنَ اَيَّتُهُنَّ اَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ اَطْوَلُنَا يَدًا زَيْنَبُ لِاَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ -

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে অতি দ্রুত আমার সাথে মিলিত হবে সে, যে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এতে স্ত্রীগণ পরস্পরের হাত মাপতে লাগলেন। তাদের মধ্যে কার হাত সবচেয়ে লম্বা। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট ছিলেন হযরত যয়নব (রা.)। কারণ তিনি নিজের হাত দ্বারা কাজ করতেন এবং দান করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَطْوَلُكُنَّ يَدًا-এর **মর্মার্থ** : يَد শব্দটি যেমন হাত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আরো অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– দয়া, দান, অনুগ্রহ ও কল্যাণ ইত্যাদি। যেমন মহানবী ﷺ -এর বাণী– اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَىَّ يَدًا يُحِبُّهُ قَلْبِىْ এখানে يَد শব্দটি অনুগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূল ﷺ -এর কোনো কোনো স্ত্রী নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমাদের মধ্যে কে আপনার সাথে পরকালে প্রথমে মিলিত হবে'? রাসূল ﷺ উত্তরে আলোচ্য উক্তি করলেন। অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে রাসূলের উক্তিটির অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে কাঠের টুকরা নিয়ে নিজেদের হাত মেপে দেখতে লাগলেন। তাদের মধ্যে হযরত সাওদা (রা.)-এর হাত সবচেয়ে লম্বা ছিল। সুতরাং তাদের ধারণা হলো সাওদাই আগে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু পরে ব্যাপারটি যখন উল্টা হলো। অর্থাৎ হযরত যয়নব (রা.) প্রথমে ইন্তেকাল করলেন, তখন সবাই রাসূল ﷺ -এর কথার মর্ম বুঝতে পারলেন। অর্থাৎ রাসূল يَد দ্বারা এখানে দানের হাত বুঝিয়েছেন হযরত যয়নব (রা.) খুব বেশি দান-খয়রাত করতেন। তাই তিনি اُمُّ الْمَسَاكِيْنِ উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। হযরত যয়নব (র.) ছিলেন রাসূল ﷺ -এর ফুফাত বোন। প্রথমে তাঁর বিবাহ হয়েছিল রাসূল ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম [এবং পোষ্য পুত্র] যায়েদ ইবনে হারিছার সাথে। তিনি তালাক দিলে পরে রাসূল ﷺ স্বয়ং তাঁকে বিয়ে করেন।

وَعَنْ ١٧٨٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ لَاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لَاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِىٍّ فَاَصْبَحُوْا

১৭৮২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, [পূর্ব জমানার] এক ব্যক্তি বলল, নিশ্চয় আমি আজ একটি দান করব। সে নিজের দান নিয়ে বের হয়ে পড়ল এবং এক চোরের হাতে দিল, সকালে মানুষ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, আজ রাতে কেউ একজন চোরকে দান করেছে। এটা শুনে লোকটি বলল, হে আল্লাহ! তোমার জন্যে প্রশংসা যে, আমি একজন চোরকে দান করতে পেরেছি। আমি নিশ্চয় আর একটি দান করব। তখন সে নিজের দান নিয়ে বের হলো এবং তা এক জেনাকারিণীর হাতে দিল। অতঃপর যখন ভোর হলো, লোকেরা বলাবলি করতে লাগল– আজ রাত্রে একজন জেনাকারিণীকে দান করা হয়েছে। [এটা শুনে] লোকটি বলল, হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা যে, আমি একজন জেনাকারিণীকে দান করতে পেরেছি। সে বলল, আমি নিশ্চয় আরো দান করব। সে নিজের দান

يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى غَنِيٍّ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ فَاُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ اَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَاَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَاَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ -

নিয়ে বের হলো এবং একজন ধনী লোকের হাতে দিল। সকাল হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আজ রাত্রে একজন ধনীকে দান করা হয়েছে। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ! তোমার অশেষ প্রশংসা এ জন্যে যে, আমি একজন চোর, একজন জেনাকারিণী ও একজন ধনীকে দান করতে পেরেছি। তখন স্বপ্নে তাকে বলা হলো, তোমার চোরকে দান করা– সম্ভবত এতে সে চুরি হতে বিরত থাকবে এবং জেনাকারিণীকে দান করা– সম্ভবত সে এতে জেনা হতে বেঁচে থাকবে। আর ধনী ব্যক্তি সম্ভবত সে এতে তার উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাকে আল্লাহ যা দান করেছেন, তা হতে নিজেও দান করতে থাকবে। –[বুখারী ও মুসলিম] এ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর।

وَعَنْهُ ١٧٨٣ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحّٰى ذٰلِكَ السَّحَابُ فَاَفْرَغَ مَاءَهُ فِيْ حَرَّةٍ فَاِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ اَلْاِسْمُ الَّذِيْ سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْاَلُنِيْ عَنْ اِسْمِيْ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِيْ هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ لِاِسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ اَمَّا اِذَا قُلْتَ هٰذَا فَاِنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَاٰكُلُ اَنَا وَعِيَالِيْ ثُلُثًا وَاَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৮৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ময়দানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সে মেঘের মাঝে একটি শব্দ শুনতে পেল 'অমুকের বাগান পানিতে সিক্ত কর'। তখন মেঘ একদিকে চলে গেল এবং এক প্রস্তরময় স্থানে পানি বর্ষণ করল। তখন দেখা গেল, নালাসমূহের মধ্যে একটি নালা ঐ পানির সম্পূর্ণটা নিজের মধ্যে জমা করে নিল। লোকটি ঐ পানির অনুসরণ করে দেখল যে, এক ব্যক্তি তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে কোদাল দ্বারা পানিগুলো [নিজের বাগানে] বইয়ে দিচ্ছে। সে তাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি? সে জবাবে বলল, অমুক। সে ঐ নামই বলল, যা সে মেঘের মাঝে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন? তখন [প্রথমোক্ত ব্যক্তি] বলল, আমি মেঘের মাঝে একটি শব্দ শুনেছি, যে মেঘ হতে এ পানি বর্ষিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ কর। আপনার নাম বলা হয়েছে। আপনি এ বাগানে কি করেন? সে বলল, যখন আপনি এরূপ বলেছেন, তবে শুনুন, এ বাগানে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা আমি দেখি। তার এক-তৃতীয়াংশ আমি দান করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি আমার পরিবার নিয়ে খাই এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ এ জমিনের কাজেই লাগাই। –[মুসলিম]

وَعَنْه ١٧٨٤ أَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ
إِنَّ ثَلٰثَةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمٰى
فَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا
فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ
لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ
قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهٗ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهٗ
وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ
الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ
إِسْحٰقُ إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوِ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا
الْإِبِلُ وَقَالَ الْاٰخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً
عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَأَتَى
الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ
حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ
قَالَ فَمَسَحَهٗ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأُعْطِيَ شَعْرًا
حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ
فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا
قَالَ فَأَتَى الْأَعْمٰى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ
قَالَ أَنْ يَّرُدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ
قَالَ فَمَسَحَهٗ فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ بَصَرَهٗ قَالَ فَأَيُّ
الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا
فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِنَ
الْإِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ

১৭৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল একজন কুষ্ঠ রোগী, একজন মাথায় টাক পড়া এবং একজন অন্ধ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন তাদের কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, উত্তম রং, উত্তম চর্ম আর আমার থেকে সে [ব্যাধি] দূর হয়ে যাওয়া, লোক আমাকে যার কারণে ঘৃণা করে। রাসূল ﷺ বলেন, ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলালেন আর তার ঘৃণার বস্তু [ব্যাধি] দূর হয়ে গেল। অতি সুন্দর রং ও উত্তম চর্ম দেওয়া হলো। ফেরেশতা বললেন, তোমার নিকট কোন মাল অধিক প্রিয়? লোকটি বলল, উট অথবা গাভী। রাবী ইসহাকের সন্দেহ হয় কুষ্ঠ রোগী অথবা মাথায় টাক পড়া ব্যক্তির একজন উটের কথা বলল এবং অপরজন গরুর কথা বলল। রাসূল ﷺ বললেন, তাকে দশমাসের গর্ভবতী উট দেওয়া হলো এবং ফেরেশতা তাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে এটায় বরকত দিন! রাসূল ﷺ বললেন, তারপর ফেরেশতা মাথায় টাক পড়া ব্যক্তির নিকট আসলেন এবং বললেন, কোন জিনিস তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে বলল, উত্তম চুল এবং আমার থেকে ঐ রোগ দূর হয়ে যাওয়া যার কারণে লোকে আমাকে ঘৃণা করে। রাসূল ﷺ বললেন, তখন ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলালেন, তার টাক দূর হয়ে গেল এবং তাকে উত্তম চুল দান করা হলো। ফেরেশতা বললেন, কোন মাল তোমার কাছে অধিক প্রিয়? লোকটি বলল, 'গরু'। তখন তাকে একটি গাভীন গরু দেওয়া হলো এবং ফেরেশ্তা বললেন, আল্লাহ তোমাকে এটায় বরকত দিন! রাসূল ﷺ বললেন, অতঃপর [ফেরেশতা] অন্ধের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কোন জিনিস সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি লোকদেরকে দেখতে পাই। রাসূল ﷺ বলেন, ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলালেন। আল্লাহ তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা বললেন, তোমার কাছে কোন মাল বেশি প্রিয়? সে বলল, ছাগল-ভেড়া। তখন তাকে একটি গাভীন বকরি দেওয়া হলো। অতঃপর উট ও গরু বাচ্চা প্রসব করল এবং বকরীটি ছাগলছানা প্রসব করল। যাতে সকলের মালই বৃদ্ধি পেল। [শ্বেতকুষ্ঠ ব্যক্তির] এক মাঠ উটে ভরে গেল, [টেকো ব্যক্তির] এক মাঠ গরুতে ভরে গেল এবং অন্ধ ব্যক্তির

قَالَ ثُمَّ اَنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلَا بَلَاغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْئَلُكَ بِالَّذِىْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ بِهٖ فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ اِنَّهُ كَاَنِّىْ اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذِرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَقَالَ اِنَّمَا وُرِّثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ قَالَ وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِىْ صُوْرَتِهٖ فَقَالَ لَهٗ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلٰى هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ قَالَ وَاَتَى الْاَعْمٰى فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلَا بَلَاغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْئَلُكَ بِالَّذِىْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِىْ فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللّٰهِ لَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَىْءٍ اَخَذْتَهٗ لِلّٰهِ فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِىَ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ছাগল-ভেড়ায় মাঠ ভরে গেল। রাসূল ﷺ বলেন, অতএব তিনি [ফেরেশতা] আপন পূর্ব অবয়ব ও আকৃতিতে সেই শ্বেতকুষ্ঠ ব্যক্তির নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি একজন গরিব-মিসকিন ব্যক্তি। সফরে আমার সব সম্বল শেষ হয়ে গেছে। এখন আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আমার ঘরে পৌঁছার কোনো উপায় নেই। অতঃপর আপনার কাছে সে আল্লাহর নামে সাহায্য চাই, যিনি আপনাকে উত্তম রং, সুন্দর চামড়া ও এতসব উট দান করেছেন। আমাকে একটি উট দান করুন, যাতে আমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারি! তখন লোকটি বলল, আমার অনেক দেনা আছে। তখন তিনি [ফেরেশতা] বললেন, মনে হয় আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি শ্বেতকুষ্ঠরোগী ছিলে না? যাকে লোকে ঘৃণা করত, তুমি গরিব ছিলে, আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন। তখন লোকটি বলল, আমিতো এ মাল বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। তখন তিনি [ফেরেশতা] বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।

রাসূল ﷺ বললেন, অতঃপর তিনি [ফেরেশতা] মাথায় টাকপড়া লোকটি কাছে আসলেন এবং তার পূর্ব আকৃতি ধারণ করলেন এবং আগের ব্যক্তির নিকট যা ব্যক্ত করেছিলেন তাই ব্যক্ত করলেন। সেও পূর্বের ব্যক্তির মতোই উত্তর দিল। তখন তিনি [ফেরেশতা] বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিন; যে অবস্থায় তুমি ছিলে। রাসূল ﷺ বলেন, অতঃপর তিনি [ফেরেশতা] তার পূর্ব অবয়ব ও আকৃতিতে অন্ধ ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব পথিক। আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ ব্যতীত আজ আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছার কোনো উপায় নেই। অতঃপর আমি সে আল্লাহর নামে আপনার কাছে একটি ছাগল চাই, যিনি আপনাকে চক্ষুর জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন। যার দ্বারা আমি গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারব। তখন সে বলল– সত্যই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা ইচ্ছা নিয়ে নিন এবং যা ইচ্ছা রেখে যান। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাস্তায় আপনি যা নিতে চাইবেন আমি অস্বীকার করব না এবং আপনাকে কষ্টও দিব না। তিনি [ফেরেশতা] বললেন, তুমি তোমার মাল রেখে দাও। তোমাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল [আল্লাহ তা'আলা] তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ-এর মর্মার্থ : حِبَالٌ শব্দটি حَبْلٌ-এর বহুবচন। অর্থ– রশি, চুক্তি, উপায়, অবলম্বন, পাথেয়, এমন বস্তু যা দ্বারা দুঃখ লাঘব হয়, কল্যাণকর বস্তু। তবে এখানে অবলম্বন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমার সফরের যাবতীয় অবলম্বন শেষ হয়ে গেছে।

* মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় حِبَالٌ শব্দের স্থলে حِيَالٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। حِيَالٌ শব্দটি حِيْلَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– উপায়, কৌশল। এমতাবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে। আমার কোনো উপায় নেই।

* আল্লামা ইবনুল মালেক বলেন, বুখারী শরীফের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে جِبَالٌ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। আর جِبَالٌ শব্দটি جَبَلٌ-এর বহুবচন। এ ক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ হবে আমার সফর দীর্ঘ হয়ে গেছে। ফলে আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে অসমর্থ হয়ে পড়েছি।

وَعَنْ ١٧٨٥ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقِفُ عَلٰى بَابِيْ حَتّٰى اَسْتَحْيِ فَلَا اَجِدُ فِيْ بَيْتِيْ مَا اَدْفَعُ فِيْ يَدِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدْفَعِيْ فِيْ يَدِهٖ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

১৭৮৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে বুজাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলে কারীম ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কখনো আমার দ্বারে মিসকিন এসে দাঁড়ায়, এতে আমি লজ্জাবোধ করি যে, আমার ঘরে এমন কিছু থাকে না, যা আমি তার হাতে দিতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ব ললেন, গরু-ছাগলের একটি পোড়া খুরও যদি হয় তবে তার হাতে দাও। –[আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

وَعَنْ ١٧٨٦ مَوْلٰى لِعُثْمَانَ قَالَ اُهْدِيَ لِاُمِّ سَلَمَةَ بُضْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ ضَعِيْهِ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ يَاْكُلُهٗ فَوَضَعَتْهُ فِيْ كُوَّةِ الْبَيْتِ وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُوْا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ فَقَالُوْا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ اَطْعَمُهٗ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِلْخَادِمِ اِذْهَبِيْ فَأْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ اللَّحْمِ فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكُوَّةِ اِلَّا قِطْعَةَ مَرْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاِنَّ ذٰلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لَمْ تُعْطُوْهُ السَّائِلَ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

১৭৮৬. অনুবাদ : হযরত উসমান (রা.)-এর আজাদ করা গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাকে এক খণ্ড গোশ্ত হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। রাসূলে কারীম ﷺ-এর গোশ্ত খুব পছন্দনীয় ছিল। উম্মে সালামা তার খাদেমাকে বললেন, তুমি তা ঘরে রেখে দাও। সম্ভবত রাসূলে কারীম ﷺ তা খেতে পারেন। তখন সে [খাদেমা] তা ঘরের একটি তাকে রেখে দিল, এমন সময় এক ভিক্ষুক আসল এবং দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে কিছু দান করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে বরকত দিবেন। তখন তারা [গৃহবাসীরা] বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। তখন ভিক্ষুকটি চলে গেল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, উম্মে সালামা! তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি যা আমি খেতে পারি। তখন উম্মে সালামা বললেন, জি-হ্যাঁ, আছে। তিনি খাদেমাকে বললেন, যাও ঐ গোশ্তগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এনে দাও। সে গিয়ে তাকে এক খণ্ড পাথর ছাড়া কিছু পেল না। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, ঐ গোশ্তখণ্ডই পাথর হয়ে গিয়েছে। কেননা, তোমরা তা ভিক্ষুককে দাওনি। –[ইমাম বায়হাকী (র.) দালায়েলুন নবুওয়াত গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ١٧٨٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا قِيلَ نَعَمْ قَالَ الَّذِىْ يَسْئَلُ بِاللّٰهِ وَلَا يُعْطِىْ بِهِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৭৮৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোক সম্পর্কে সংবাদ দেব না, যে মানুষের কাছে পদমর্যাদার দিক দিয়ে মন্দ? জবাবে বলা হলো, জি-হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, ঐ ব্যক্তি, যার কাছে আল্লাহর নাম করে কিছু চাওয়া হয় এবং তা দেওয়া হয় না। -[আহ্মাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- "আল্লাহর নাম করে কিছু চাওয়া" -এর অর্থ- আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে কোনো ব্যক্তির কাছে দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। আর যে ভিক্ষুক এভাবে কারো কাছে কিছু সওয়াল করে- তার সম্পর্কে এ ধারণা রাখতে হবে যে, সে নিরুপায় অবস্থায় ব্যাকুল হয়ে ভিক্ষার হাত পেতেছে। এছাড়াও তাকে কিছু না দিলে লোক সমাজে সে নিন্দনীয় হবে, কৃপণ বলে চিহ্নিত হবে। সুতরাং ভিক্ষুককে কিছু দেওয়া উচিত। কেননা, মানুষের মিথ্যা বচনা হতে বেঁচে থাকাও হাদীসের নির্দেশ।

وَعَنْ ١٧٨٨ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) اَنَّهُ اِسْتَاْذَنَ عَلٰى عُثْمَانَ فَاَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهٖ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا كَعْبُ اِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرٰى فِيْهِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَصِلُ فِيْهِ حَقَّ اللّٰهِ فَلَا بَاْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ اَبُوْ ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ لَوْ اَنَّ لِىْ هٰذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ وَيَتَقَبَّلُ مِنِّىْ اَذَرُ خَلْفِىْ مِنْهُ سِتَّ اَوَاقِىَّ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ يَا عُثْمَانُ اَسَمِعْتَهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৭৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তখন তার হাতে তার ছড়িটি ছিল। হযরত উসমান (রা.) কা'বে আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, হে কা'ব! আবদুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন। তিনি অনেক ধন-সম্পদ রেখে গেছেন এ সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? জবাবে হযরত কা'ব বললেন, যদি তিনি আল্লাহ তা'আলার [নির্ধারিত] হক আদায় করে গিয়ে থাকেন তবে এতে কোনো ভয়ের কিছু নেই। এ কথা শুনে হযরত আবূ যর নিজের লাঠি উঠিয়ে কা'বকে প্রহার করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যদি আমার জন্যে এ পাহাড় সোনায় পরিণত হয়ে যায়, অতঃপর তা আমি দান করে দেব আর আমার পক্ষে তা কবুল করাও হয়, তবুও আমি পছন্দ করি না যে, তার ছয় উকিয়া পরিমাণও আমি পিছে রেখে যাই। হে উসমান! আমি আপনাকে খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি তা শুনেছেন? এরূপ তিনি তিনবার বললেন, তিনি [উসমান] বললেন, হ্যাঁ, [শুনেছি]। -[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) ছিলেন একজন প্রবীণ ও প্রথম সারির সাহাবী। তিনি রিক্ত ও উদ্বাস্তু অবস্থায় হিজরত করে মদীনায় গেলে, হুযূর ﷺ তাকে হযরত সা'দ ইবনে রাবী'-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করিয়ে দেন। সেখানে তিনি ব্যবসা করতে থাকেন। ফলে এক সময় তিনি বহু ধন-সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। কথিত আছে, ওফাতের পর তার মালের হিসাব করে দেখা গেছে যে, এক চতুর্থাংশের মূল্য ছিল আশি হাজার দিনার সমতুল্য। একজন এত বড় সাহাবী এত অধিক পরিমাণ সম্পদ রেখে ইন্তেকাল করাটা মানুষের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সেই দিন উক্ত বিষয় নিয়ে খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর দরবারেও কথাবার্তা হয়েছিল। এমন সময় দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-ও ছড়ি হাতে তথায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কা'বকে উক্ত মন্তব্য করার কারণে প্রহার করেছিলেন।

হযরত আবূ যর (রা.) কেন হযরত কা'বকে প্রহার করলেন?

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে হযত কা'ব (রা.) কিছু বলেছিলেন। অথচ হযরত আবূ যর (রা.) কিভাবে তাঁকে প্রহার করতে পারেন? তিনি প্রশ্নকারী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন অনুমতিক্রমে প্রবেশকারী একজন শ্রোতা মাত্র। উপরন্তু একজন সাহাবীকে মারধর ও লাঞ্ছিত করা কতটুকু শালীনতার কাজ ছিল। তৃতীয়ত খলিফার দরবারে এ ধরনের কাজ করা কতটুকু শোভনীয় ছিল?

মূল ব্যাপারটা হলো, হযরত আবূ যর (রা.) ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ, সহায়-সম্বলহীন দরবেশ। তাঁর চিন্তাধারাও ছিল ব্যতিক্রম। সামান্য পরিমাণ সম্পদও নিজের কাছে ধরে রাখা ছিল তাঁর স্বভাবের পরিপন্থি। তিনি সর্বদা আযীমতের উপর আমল করতেন। সুতরাং তিনি বলতেন– সম্পদ যা হাতে আসে তা সাথে সাথেই দান-সদকা করে দিতে হবে। জমা করে রাখলেই তা كَنْز [কান্‌য]-এ পরিণত হবে। كَنْز সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে– "যারা আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা না করে সোনা-রুপা জমা করে কিয়ামতের দিন তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে তার কপালে, পাঁজরে ও পিষ্ঠ দেশে দাগ দেওয়া হবে।" বস্তুত হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর মতে, মালের হক তথা ফরজ জাকাত আদায় করে থাকলেও তা كَنْز [কানয]-এ পরিণত হবে এবং উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই যার কাছে দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু আছে তা সবই দান-সদকা করা আবশ্যক।

অপরদিকে হযরত কা'বসহ অন্যান্য সাহাবীদের মতে যে মালের ফরজ জাকাত আদায় করা হয়, তা কুরআনে বর্ণিত كَنْز [কান্‌য]-এর মধ্যে শামিল হবে না। কেননা, কুরআনে وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا [অর্থ– যারা তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না]-এর অর্থ হলো "যারা ফরজ জাকাত আদায় করে না।" আর হযরত উসমান (রা.)-এর কথার জবাবে হযরত কা'ব (রা.) যে নির্দ্বিধায় বলে ফেললেন "যদি তিনি [অর্থাৎ আবদুর রহমান] আল্লাহর হক আদায় করে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই।" আর আবূ যর (রা.) কা'বের এই ঢালাও মন্তব্যকে কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থি রায় বলে মনে করেছিলেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে হযরত কা'ব (রা.) সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। তবে আবূ যরের চিন্তাধারা একদিকে যেমন ছিল স্বতন্ত্র– অপরদিকে তিনি ছিলেন অকুতোভয় ও স্পষ্টবাদী। ফলে জয্‌বার অবস্থায় আদবের জন্যে হযরত কা'বকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত আবূ যর (রা.) নিজের স্বতন্ত্র নীতিতে অটল-অবিচল ছিলেন। ফলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথেও তাঁর অনেক বিতর্ক হয়েছে। কথিত আছে যে, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) শেষ বয়সে প্রায়ই জযবার হালে পৌঁছতেন। এ কারণেই তিনি শেষ দিকে 'রাবযা' নামক স্থানে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেন। তথায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ١٧٨٩ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ اِلٰى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهٖ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهٖ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَاٰى اَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهٖ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَّحْبِسَنِيْ فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهٖ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهٗ -

১৭৮৯. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনায় রাসূলে কারীম ﷺ -এর পেছনে আসরের নামাজ পড়লাম। এরপরে রাসূল ﷺ সালাম ফেরালেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন এবং মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে তাঁর কোনো এক স্ত্রীর হুজরার দিকে গেলেন। সাহাবীগণ তাঁর এ তাড়াতাড়ি প্রস্থানের কারণে হয়রান হলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদের কাছে আসলেন এবং দেখলেন যে, সাহাবীগণ তাঁর এ তাড়াহুড়ার কারণে বিস্মিত হয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমাদের ঘরে কিছু স্বর্ণ আছে তা আমার এখন মনে পড়ল। আমি এ কাজকে খারাপ মনে করলাম যে, তা আমাকে [আল্লাহর নৈকট্য লাভে] বাধা প্রদান করবে, তাই আমি তা বণ্টন করে দিতে আদেশ করলাম। -[বুখারী]

বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ বললেন- আমি ঘরে জাকাতের কিছু স্বর্ণ রেখে এসেছিলাম। আমি এটা খারাপ মনে করেছি যে, রাত্রে তা আমার কাছে রাখি।

وَعَنْ ١٧٩٠ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِيْ فِيْ مَرَضِهٖ سِتَّةُ دَنَانِيْرَ اَوْ سَبْعَةٌ فَاَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُفَرِّقَهَا فَشَغَلَنِيْ وَجَعُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَاَلَنِيْ عَنْهَا مَا فُعِلَتِ السِّتَّةُ اَوِ السَّبْعَةُ قُلْتُ لَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِيْ وَجَعُكَ فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِيْ كَفِّهٖ فَقَالَ مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللّٰهِ لَوْ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهٰذِهٖ عِنْدَهٗ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৭৯০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর [অন্তিম] রোগের সময় আমার কাছে তাঁর ছয়টি বা সাতটি দিনার ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বণ্টন করে দিতে আমাকে আদেশ করেছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর রোগ আমাকে ব্যস্ত রেখেছিল [অর্থাৎ তা বণ্টন করতে ভুলে গিয়েছিলাম]। অতঃপর রাসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে ছয়টি বা সাতটি দিনারের কি হয়েছে? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, কিছুই করা হয়নি। আল্লাহর কসম, আপনার রোগই আমাকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। তখন রাসূল ﷺ তা আনিয়ে নিলেন অতঃপর তা নিজের হাতে রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহর নবীর কি অবস্থা হবে যদি তিনি এখন আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হন এবং এ দিনারগুলো তার কাছে অক্ষত থাকে। -[আহমাদ]

وَعَنْ ١٧٩١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى بِلَالٍ وَعِنْدَهٗ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا بِلَالُ قَالَ شَىْءٌ اِدَّخَرْتُهٗ لِغَدٍ فَقَالَ اَمَا تَخْشٰى اَنْ تَرٰى لَهٗ غَدًا بُخَارًا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اِقْلَالًا - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ)

১৭৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলে কারীম ﷺ বিলাল (রা.)-এর নিকট গমন করলেন, তখন তাঁর [বিলালের] নিকট খেজুরের একটি স্তূপ ছিল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে বিলাল! এটা কি? বিলাল বললেন, অল্প কিছু জিনিস, আগামী দিনের জন্য তা জমা করেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি এর ভয় কর না যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে এর ধোঁয়া দেখতে পাবে? বিলাল! এটা দান করে ফেল। আর আরশের মালিকের পক্ষ হতে দারিদ্র্যের ভয় করো না। –[বায়হাকী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভবিষ্যতের প্রয়োজন মোতাবেক কিছু সঞ্চয় করে রাখা নাজায়েজ নয়। বহু হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এটাও সত্য যে, হুযূর ﷺ বিবিদের জন্যে কিছুদিনের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চয় করে রাখতেন। তবে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু সঞ্চয় না করে আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করাই আযীমত বা সর্বোত্তম। অবশ্য এটা অধিকাংশের বেলায় প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এ হাদীসের প্রেক্ষিতে বলা যায় হুযূর ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে আযীমতের শিক্ষা দিয়েছেন।

وَعَنْهُ ١٧٩٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا اَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِى النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيْحًا اَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغُصْنُ حَتّٰى يُدْخِلَهُ النَّارَ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ) -

১৭৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ বিশেষ। যে দানশীল, সে তার একটি শাখা ধরেছে আর শাখা তাকে ছাড়বে না যতক্ষণ তাকে জান্নাতে প্রবেশ না করাবে। আর কৃপণতা হলো জাহান্নামের একটি বৃক্ষ বিশেষ। যে লোভী সে যেন তার একটি শাখা ধরেছে, আর উক্ত শাখাটি তাকে ছাড়বে না যে পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করাবে। উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তিকে জান্নাত ও জাহান্নামের দু'টি বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। বস্তুত যে দানশীল তার এ দানই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আর যে কৃপণ তার এই কৃপণতাই তাকে জাহান্নাম অভিমুখী করবে।

وَعَنْ ١٧٩٣ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا. (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

১৭৯৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা দান-সদকার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, বালা-মসিবত তাকে [অর্থাৎ দানকে] অতিক্রম করতে পারে না। –[রাযীন]

بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ
পরিচ্ছেদ : দানের মাহাত্ম্য

فَضْلٌ শব্দের অর্থ হলো– মর্যাদা, মাহাত্ম্য, সম্মান। আর صَدَقَةٌ শব্দটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ফরজ জাকাত, নফল দান-খয়রাত ও কল্যাণকর কাজে দান। কাজেই উভয়ের অর্থ হলো দানের মর্যাদা বা মাহাত্ম্য। আর এখানে صَدَقَةٌ দ্বারা ব্যাপক দানই বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হাদীসে এমন কতিপয় কাজ ও বিষয়কে দান বলা হয়েছে যা অর্থের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ হিসেবে অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহকে পূর্ব পরিচ্ছেদের সম্পূরক বা পরিশিষ্ট বলা যায়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে নবী করীম ﷺ -এর সেসব হাদীস আনয়ন করা হয়েছে যেগুলোতে দানের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٧٩٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فُلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি হালাল কামাই হতে একটি খেজুর সমান দান করল– আর আল্লাহ হালাল মাল ব্যতীত কবুল করেন না, আর আল্লাহ তা'আলা ঐ দানকৃত খেজুর নিজের [কুদরতি] ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ খেজুরকে খেজুরের মালিকের জন্য লালন-পালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চা যত্ন সহকারে প্রতিপালন করে যাতে তা [ঐ দান] পাহাড়ের মতো বড় হয়।
–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লাহর রাস্তায় দান করা অত্যধিক মর্যাদা ও কল্যাণের কর্ম। মহান আল্লাহ মানুষের দানকে ধ্বংস করেন না; বরং সুদকে ধ্বংস করেন আর দানকে বৃদ্ধি করেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ দানকে এক শস্যদানা জমিনে রোপণ করার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে, তাতে সাতটি ছড়া ধরে এবং তা হতে কমপক্ষে সাতশত দান উৎপন্ন হয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আরো বর্ধিত করে দেন।

كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فُلُوَّهٗ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে, আল্লাহ তা'আলা নিজের ডান হাতে তা গ্রহণ করেন। অতঃপর তার মালিকের [অর্থাৎ দাতার] জন্যে তা লালন-পালন করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চাকে যত্ন সহকারে লালন-পালন করে। রাসূলে কারীম ﷺ এখানে اَلتَّرْبِيَةُ [লালন-পালন] দ্বারা اَلزِّيَادَةُ [বৃদ্ধি করা]-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন হতে কিছু দান করবে আল্লাহ তা অর্থাৎ, তার প্রতিদান কিয়ামতের দিন বৃদ্ধি করে দিবেন। যাতে পরকালে তার নেকীর পাল্লা ভারী হবে। আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ এ বৃদ্ধিতে ঘোড়ার বাচ্চার লালন-পালনের সাথে তুলনা করে বৃদ্ধির দ্রুতগতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, ঘোড়ার বাচ্চা শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এমনকি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তা বড় হয়ে উঠে। ঠিক এভাবেই দানের ছওয়াবও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর মহান আল্লাহ তো তাকে শস্য দানার সাথে তুলনা করেছেন।

وَعَنْهُ ١٧٩٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সদকা মালকে কমায় না। ক্ষমার দ্বারা বান্দার ইজ্জত আল্লাহ বাড়িয়ে দেন, কমান না এবং যে কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্নত করেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ **-এর মর্মার্থ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দান-সদকা মাল-সম্পদকে কমায় না; বরং বাড়ায়। বাক্যটির মূলকথা হলো– বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও দেখা যায় যে, দান-সদকার দ্বারা সম্পদ কমে যায় কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্যভাবে বরকত দানের মাধ্যমে তা পূরণ করেন। অথবা ভিন্ন পথে আল্লাহ তাকে অনেক বেশি কিছু দান করেন, যা মানুষ অনুভব ও উপলব্ধিও করতে পারে না, অথবা এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তাকে পরকালে বিপুল ছওয়াবের অধিকারী করবেন।

وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا **-এর ব্যাখ্যা :** যদি কারো উপরে কেউ জুলুম করে, আর অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকার পর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, এ সুন্দর আচরণের জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিবেন।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন– কৃপণতা, রাগের মুহূর্তে উগ্র আচরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণ এগুলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, যা শয়তান উসকে দেয়। কিন্তু যদি মানুষ একে অবদমিত করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দিয়ে তিনটি কাজ করান। তা হলো–

১. দানে উদ্বুদ্ধ করান– যাতে তিনি দানশীল হন এবং মানুষের সম্মান লাভ করেন।

২. ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করান– যাতে সহনশীলতার কারণে জনসমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৩. বিনয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন– যাতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই তার সম্মান বৃদ্ধি পায়। –[তা'লীকুস সবীহ]

تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ **-এর অর্থ :** "আল্লাহর উদ্দেশ্যে" অর্থ একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে জনতার কাছে নিজেকে একজন বিনয়ী বলে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিষয়ে বিনয়ী ও নম্র হওয়া। অন্য হাদীসে এসেছে– مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

وَعَنْهُ ١٧٩٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِيَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ اَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا عَلٰى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৯৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে তাকে [পরকালে] জান্নাতের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে। জান্নাতের অনেক [আটটি] দরজা রয়েছে। সুতরাং যে নামাজী ছিল তাকে নামাজের দরজা হতে আহ্বান করা হবে, যে ব্যক্তি মুজাহিদ ছিল তাকে জিহাদের দরজা হতে আহ্বান করা হবে, যে ব্যক্তি দান সদকাকারী ছিল, তাকে দান-সদকার দরজা হতে আহ্বান করা হবে, আর যে ব্যক্তি রোজাদার ছিল, তাকে রাইয়ান [তৃপ্তি] নামক দরজা হতে আহ্বান করা হবে। এটা শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, কোনো ব্যক্তিকে এ [দরজাসমূহের] সকল দরজা হতে আহূত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই [এক দরজা হতে আহূত হলেই যথেষ্ট] তবে কি কেউ এ সকল দরজা হতে আহূত হবে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ! আর আমার আশা যে, আপনি তাদের মধ্যে হবেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَئٍ اِلَخ **-এর মর্মার্থ :** মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে তাকে পরকালে জান্নাতের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে। এখানে زَوْجَيْنِ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে–

- ইবনুল মালিক বলেন, আরবি ভাষায় اَلزَّوْجُ শব্দটি দু'টি বস্তু বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কেননা, زَوْجٌ শব্দের অর্থ– জোড়া। সুতরাং একটি বস্তু তো অপরটির জন্যে জোড়া। আর এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় زَوْجَيْنِ দ্বারা এক জাতীয় দু'টি বস্তুই উদ্দেশ্য হবে, দুই জাতীয় নয়।
- আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এখানে زَوْجَيْنِ দ্বারা দু'জাতীয় দু'টি বস্তু বুঝানো হয়েছে।
- আল্লামা তীবী (র.) বলেন– دِرْهَمَيْنِ - دِيْنَارَيْنِ ও مُدَّيْنِ দ্বারা যেমন এক জাতীয় দু'টি বস্তুকে বুঝায়; তেমনি زَوْجَيْنِ দ্বারাও এক জাতীয় দু'টি বস্তু বুঝায়।
- হযরত আবূ যার (রা.)-কে زَوْجَيْنِ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন– দু'টি ঘোড়া, দু'টি দাস ও দু'টি উট ইত্যাদি।
- কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ দানের হস্ত সর্বদা প্রসারিত রাখা। আর এ অর্থ গ্রহণ করাই সর্বোত্তম। অর্থাৎ, একবার দান করে পুনরায় তা হতে বিরত না থেকে পর পর দান করত পূর্বের দানের সাথে আরেকটি জোড়া মিলাতে থাকা।
- কারো মতে, এখানে زَوْجَيْنِ দ্বারা প্রকাশ্য ও গোপন দুই প্রকারের দানকে বুঝান হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

* অপর একদল বলেন– زَوْجَيْنِ দ্বারা দুই সালাত [নামাজ] অথবা দুই সাওম [রোজা] উদ্দেশ্য। তবে এটা অনেক দূরের কথা। অবশ্য এ কথা বলা যায় যে, গরীবের নফল সালাত ও সাওম ধনীর দান-সদকার সমতুল্য।

وَعَنْهُ ١٧٩٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ اَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِىْ اِمْرِءٍ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৭৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ সকালে রোজাদার হিসেবে উঠেছে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি! অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো জানাযায় শরিক হয়েছে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো নিঃস্বকে খানা খাইয়েছে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো রোগীকে দেখতে গিয়েছে? [এবারও] হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সদগুণগুলো যার মধ্যে একত্র হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জান্নাতে প্রবেশের জন্যে আমলবিহীন একমাত্র ঈমানই যথেষ্ট। তবুও হুযূর ﷺ -এর বাণী– "যার মধ্যে এগুলো একত্র হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"-এর অর্থ হলো সে জান্নাতের প্রত্যেক দ্বারপথে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করবে। যেমন পূর্বের হাদীসে হুযূর ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে এরূপ আশা পোষণ করেছেন।

وَعَنْهُ ١٧٩٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৯৮. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে ছাগলের একটি খুর হলেও যেন দান করাকে তুচ্ছ মনে না করে। [অর্থাৎ নগণ্য হলেও যেন দান করে, তুচ্ছ বলে দান হতে বিরত না থাকে।] –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٧٩٩ جَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭৯৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ও হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেকটি পুণ্য কাজই একটি দান। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'দান-সদকা' শুধু সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সম্পদ দান করলে যেমন দান-সদকা হয়, অন্যান্য নেক কাজের মাধ্যমেও 'দান' হতে পারে। যেমন– হাদীসে বর্ণিত আছে রাস্তা হতে কাটা বা অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তুকে সরিয়ে দেওয়াও দান। জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজ করা, যেমন– ব্রীজ, সাঁকো, পুল ইত্যাদি বানিয়ে দেওয়া, রাস্তা বেঁধে দেওয়া এবং রোগীর সেবা-যত্ন করাও দান। এমনকি ভিক্ষুকের সাথে শালীন আচরণ করাও দানের অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ١٨٠٠ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ ـ(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮০০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে তোমরা ভাল কাজের কোনোটিকেই তুচ্ছ মনে করবে না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে প্রসন্নমুখে সাক্ষাৎ করা হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র হাদীস ও পূর্বেকার হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মাল-সম্পদ ছাড়া অন্য কোনো কাজের মাধ্যমেও 'দান-সদ্কা' হতে পারে। যেমন– অপর কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখা সাক্ষাৎ করাও নফল সদ্কার অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা তীবী (র.) বলেন– اَلْمَعْرُوْفُ মা'রূফ শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক। যেমন আল্লাহর ইবাদত করা, মানুষের সাথে সদাচরণ বজায় রাখা, পরিবার-পরিজনের ভালভাবে ভরণ-পোষণ করা এবং তাদের সাথে সদাচরণ করা ইত্যাদিও মা'রূফ তথা উত্তম পুণ্যময় কাজের অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ١٨٠١ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفِ

১৮০১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেক মুসলমানেরই সদকা করা আবশ্যক। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, যদি সে [দান করার মতো] কিছু না পায়? রাসূল ﷺ বললেন, তবে সে যেন নিজের হাতে কাজ করে, তাতে নিজের উপকার হবে এবং অন্যকেও দান করতে পারবে। সাহাবায়ে কেরাম আবারও জিজ্ঞেস করলেন, যদি [কাজ করার] ক্ষমতা না রাখে অথবা করতে না পারে? রাসূল ﷺ বললেন, তবে সে চিন্তাগ্রস্ত কোনো ঠেকা

قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ব্যক্তির [শারীরিক] সাহায্য করবে। সাহাবীগণ ﷺ বললেন, যদি তাও করতে না পারে? রাসূল ﷺ বললেন, তবে সে ভাল কাজের আদেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আবারও জিজ্ঞেস করলেন, যদি তাও করতে না পারে? তবে সে যেন মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে। কেননা, এটাও তার জন্যে সদকা বিশেষ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** এখানে হাদীসটির মর্মার্থ হলো– 'ভাল ও মন্দ' উভয়টিই কাজ, তবে ভালটির পরিণামে পাওয়া যাবে প্রতিদান, আর মন্দটিতে প্রতিশোধ বা শাস্তি। আর দান-সদকার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিস্তার হয় কল্যাণ। তাই মহানবী ﷺ প্রত্যেক মানুষকে দান-সদকা করার প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের দান করা উচিত বা আবশ্যকীয়। অবশেষে এটাও বলেছেন যে, কল্যাণময় কোনো কাজ করতে শক্তি সামর্থ্য না থাকলে অন্তত নিজের দ্বারা যেন কারো অকল্যাণ বা ক্ষতি না হয় সেই দিকে নজর রাখবে। আর এটাই হবে তার জন্যে সদকা।

রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ মূসা, তিনি এ নামেই পরিচিত। পিতার নাম কায়েস। মায়ের নাম তয়্যিবা।
২. **বংশানুক্রম :** আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস ইবনে সুলায়মান ইবনে হাদ্দার ইবনে আল্যার আশ'আরী। তিনি ইয়েমেনের আশ'আর গোত্রের সন্তান বিধায় তাকে আশ'আরী বলা হতো।
৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাল জানা যায়নি। তবে তিনি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে দুর্বল সনদে রয়েছে যে, তিনি খায়বর অভিযানে ইসলাম গ্রহণ করেন।
৪. **হিজরত :** তিনি প্রথমে হাবশায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন।
৫. **হাদীস শাস্ত্রে অবদান :** তিনি সর্বমোট ৩৬০ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ৫০টি হলো মুত্তাফাক আলাইহ আর ৪৫টি ইমাম বুখারী এবং ২৫টি ইমাম মুসলিম পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন।
৬. **মর্যাদা ও কৃতিত্ব :** তিনি ৩৬০ টি হাদীস রেওয়ায়াত করেন। তিনি বিদায় হজে রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ তাকে ১০ম হিজরিতে ইয়েমেনের আদনা-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর আমলে তিনি বসরা ও কূফার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি ইস্পাহান জয় করেন।
৭. **ইন্তেকাল :** আল্লামা আইনী (র.)-এর মতে, তিনি ৫৪ হিজরিতে ৬৩ বছর বয়সে কূফায় ইন্তেকাল করেন। إِكْمَال গ্রন্থকারের মতে তিনি ৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ١٨٠٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهٗ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلٰوةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮০২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থিরই প্রত্যেক দিন– যাতে সূর্য উদিত হয়– সদকা করা উচিত। দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করাও তার সদকা, কোনো ব্যক্তিকে তার সওয়ারিতে উঠতে সাহায্য করা অথবা তার কোনো আসবাব তাতে উঠিয়ে দেওয়া তার সদকা, কারও সাথে ভাল কথা বলাও সদকা, নামাজের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ তার জন্য এক একটি সদকা এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও তার জন্য সদকা। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٨٠٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلٰثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَظْمًا اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلَاثِ مِائَةٍ فَاِنَّهُ يَمْشِىْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زُحْزِحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮০৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশত ষাট [৩৬০] জোড়া সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি ঐ তিনশত ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহু আকবার বলল, আল্‌হামদু লিল্লাহ বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, সুবহানাল্লাহ বলল, আস্‌তাগফিরুল্লাহ বলল, রাস্তা হতে কাঁটা, পাথর বা হাড্ডি দূর করল অথবা ভাল কাজের উপদেশ দিল কিংবা খারাপ কাজ হতে নিষেধ করল– তা হলে সে সেদিন নিজেকে জাহান্নাম হতে দূরে রেখে চলল। –মুসলিম

وَعَنْ ١٨٠٤ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَاْتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ وِزْرٌ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮০৪. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেক সুবহানাল্লাহ বলা একটি সদকা, প্রত্যেক আল্লাহু আকবার বলা একটি সদকা, প্রত্যেক আলহামদু-লিল্লাহ বলা একটি সদকা, প্রত্যেক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ করা ও খারাপ কাজ হতে বারণ করা একটি সদকা। এমনকি তোমাদের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ নিজের কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে, তাতেও কি তার ছওয়াব মিলবে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি বল, যদি কেউ এটা হারামের জায়গায় রাখত অর্থাৎ, কাম চরিতার্থ করত তবে কি তার গুনাহ হতো না? কাজেই এভাবেই যদি তা হালাল জায়গায় রাখে তবে তার ছওয়াব হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٨٠٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِىُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِىُّ مِنْحَةً تَغْدُوْا بِاِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِاٰخَرَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– দুধালী উটনী ও দুধালী বকরি কাউকেও দুধ খাওয়ার জন্যে ধার দেওয়া উত্তম সদকা। যা সকালে এক পাত্র ও বিকালে এক পাত্র দুধ দেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাহিলিয়া যুগের লোকেরা অন্যান্য মন্দ কাজের পাশাপাশি এই ভাল কাজটিও করতো যে, প্রতিবেশী গরিব লোক– যারা দুধালী উষ্ট্রী বকরি খরিদ করার সামর্থ্য রাখত না, সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা সে সব গরিবদেরকে দুধালী উষ্ট্রী ও বকরি দুধ খাওয়ার জন্যে ধারে

প্রদান করত। আবার দুধ খাওয়া শেষ হলে তা মালিককে ফেরত দিত। যেমন– অন্য এক হাদীসে হুযূর ﷺ বলেছেন– اَلْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ অত্র হাদীসে হুযূর ﷺ আরবদের সেই যুগের এই ভাল প্রথাটির প্রশংসা করেছেন, কাজেই এ রকম সৎকর্মও দান-সদকা। অত্র হাদীস দ্বারা তা-ই বুঝা যায়।

وَعَنْ ١٨٠٦ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ طَيْرٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ -

১৮০৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে কোনো মুসলমান একটি গাছ রোপণ করবে অথবা কোনো ফসল ফলাবে অতঃপর তা হতে কোনো মানুষ, পাখি বা পশু কিছু খাবে তবে তা তার জন্যে সদকা হিসেবে গণ্য হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তা হতে যা চুরি হয়ে যায় তাও তার জন্যে সদকা হিসেবে গণ্য হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র হাদীসের আলোকে ইমামগণ বলেন যে, কোনো বৃক্ষ কিংবা শস্য রোপণকালে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও সদকার নিয়তে বপন করা উচিত। কারণ, গাছের সব ফল কিংবা জমিনে উৎপাদিত ফসল সে একা ভোগ করতে সক্ষম নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَفِىْ اَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ এ আয়াতে اَلْمَحْرُوْمُ দ্বারা পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সকলকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু আল্লাহর বিধানুযায়ী ঐ ফসলে অন্যান্যেরও একটা অধিকার রয়েছে, তাই তখন সদকার নিয়তে লিল্লাহ্ রোপণ ও বপন করা বাঞ্ছনীয়।

وَعَنْ ١٨٠٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُفِرَ لِاِمْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذٰلِكَ قِيْلَ اِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এক ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে যে একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যেতে দেখল, কুকুরটি একটি কুয়ার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং হাঁপাচ্ছে। অধিক পিপাসা তাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছে। এটা দেখে সে নিজের মোজা খুলল এবং নিজের ওড়নার সাথে বাঁধল অতঃপর তার [কুকুরটির] জন্যে কূপ হতে পানি তুলে দিল। এ জন্যে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য ছওয়াব আছে? রাসূল ﷺ বললেন, প্রতিটি তাজা হৃদপিণ্ড বিশিষ্ট প্রাণীর সেবায়ই ছওয়াব আছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রতিটি তাজা হৃদপিণ্ড বিশিষ্ট প্রাণীর সেবায়ই ছওয়াব আছে। বাহ্যত বুঝা যায় যে, হাদীসটির বিধান আম বা ব্যাপক। অর্থাৎ যে কোনো প্রাণীর সেবা করা হোক না কেন, ছওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে তা নয়; বরং হাদীসটির বিধান খাস বা নির্দিষ্ট। অর্থাৎ যেসব প্রাণীকে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। যেমন– সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি। এদের সেবায় ছওয়াব হবে না; বরং এগুলোকে হত্যা করাই ছওয়াবের কাজ।

দু'টি হাদীসের মধ্যকার বিরোধ ও এর সমাধান : উল্লিখিত হাদীসটিতে পরোক্ষভাবে যে কোনো প্রাণীর প্রতি খানাপিনা সরবরাহ করার জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। অথচ অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে– وَلَا يَاكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ অর্থাৎ, নেককার ও আল্লাহ-ভীরু ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাদ্য খেতে না পারে। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এ দ্বন্দ্বের সমাধান এভাবে হতে পারে যে, وَلَا يَاكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ –এটা মেযবানী খানা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর উল্লিখিত হাদীসে طَعَامُ الْحَاجَةِ দ্বারা আবশ্যকীয় খানা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকল না।

তওবা ছাড়া কবিরা মাফ হয় কি? আলোচ্য হাদীস প্রমাণিত হয় যে, কবিরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতের অভিমত এটাই। মহান আল্লাহর ভাষায়– اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ এ আয়াতটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তওবা ছাড়া কবিরা গুনাহ মাফ হতে পারে। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সগীরা গুনাহের জন্যেও শাস্তি দিতে পারেন।

আল্লামা ইবনুল মালেক (র.) বলেন, কবিরা গুনাহ যে তওবা ছাড়া মাফ হতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এ হাদীসই।

وَعَنْ ١٨٠٨ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ اَمْسَكَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ مِنَ الْجُوْعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا فَتَاْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْاَرْضِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেওয়া হলো। সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল। ফলে উক্ত বিড়ালটি ক্ষুধায় মরে গেল। সে মহিলা তাকে খাওয়াত না, ছেড়েও দিত না; যাতে সে জমিনের কীট-পতঙ্গ ধরে খেতে পারে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোনো পশু-পাখি বা জীব-জন্তুকে খাওয়ানো যেমন ছওয়াবের কাজ তেমনি তাকে কষ্ট দেওয়া, খাবার না দেওয়া এবং তাকে স্বাভাবিকভাবে চলতে ফিরতে না দেওয়াও পাপের কর্ম।

وَعَنْ ١٨٠٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ لَاُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُؤْذِيْهِمْ فَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮০৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটি গাছের ডালের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল সে [মনে মনে] বলল, আমি এটাকে মুসলমানের পথ হতে সরিয়ে ফেলব যাতে এটা তাদেরকে কষ্ট না দেয় [অতঃপর সে তাই করল] ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ١٨١٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ رَاَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِىْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮১০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি রাস্তার উপর হতে এমন একটি গাছ কেটে ফেলার কারণে সে জান্নাতে নিশ্চিন্তে ঘুরাফেরা করতেছে, যে গাছটি মানুষকে কষ্ট দিত। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٨١١ أَبِىْ بَرْزَةَ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهٖ قَالَ اِعْزِلِ الْاَذٰى عَنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اِتَّقُوا النَّارَ فِىْ بَابِ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

১৮১১. অনুবাদ : হযরত আবূ বারযাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ -কে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিন, যাতে আমি তা দ্বারা উপকৃত হতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, তবে তুমি মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে ফেলবে। –[মুসলিম]

এ প্রসঙ্গে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস– যাতে اِتَّقُوا النَّارَ শব্দ রয়েছে। আমরা ইনশাআল্লাহ عَلَامَاتُ النُّبُوَّةِ পরিচ্ছেদ বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুসলমানদের কল্যাণ বা উপকার হয় এমন অতিক্ষুদ্র কাজ হলেও তা সদকার সমতুল্য। আর রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও অতীব ছওয়াবের কর্ম। এছাড়া اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ ঈমানের ৭৭টি শাখারও একটি শাখা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨١٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهٗ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلُ مَا قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

১৮১২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম [আনসারী] (রা.) বলেন, যখন নবী কারীম ﷺ [হিজরত করে প্রথম] মদীনায় আগমন করলেন, আমি [তাঁর কাছে] আসলাম। আমি যখনই তাঁর পবিত্র চেহারা দেখলাম তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, তাঁর এ চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা এই : হে লোক সকল! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে, [দরিদ্রকে] খানা খাওয়াবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং রাতে [তাহাজ্জুদ] নামাজ পড়বে, যখন লোক ঘুমে থাকে, তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

وَعَنْ ١٨١٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৮১৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা দয়াময়ের ইবাদত করবে, [দরিদ্রকে] খাদ্যদান করবে এবং সালামের [ব্যাপক] প্রচলন করবে– তবে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٨١٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৮১৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নিশ্চয় দান-সদকা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং খারাপ মৃত্যু রোধ করে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مِيْتَةُ السُّوْءِ **-এর মর্মার্থ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নিশ্চয় দান-সদকা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও রোষকে প্রশমিত করে এবং খারাপ মৃত্যু রোধ করে। এখন প্রশ্ন হলো যে, খারাপ মৃত্যু কি? হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন। যথা–

ক. মৃত্যুর সময় মন্দ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ কঠিন মৃত্যু-যন্ত্রণা হওয়া অথবা ভীষণ ভয়-ভীতির সঞ্চার হওয়া ইত্যাদি। এর ফলে মানুষ আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল হয়ে পড়ে। ফলে খারাপ বাক্য উচ্চারণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

খ. আকস্মিক মৃত্যু ঘটা। যেমন– বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করা, ছাদ ধ্বসে পড়া, আগুনে পুড়ে বা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ইত্যাদি। এ অবস্থায়ও আল্লাহর নাম স্মরণ করা সম্ভব হয় না।

গ. অথবা, খাতিমা বিল-খায়ের হতে বঞ্চিত হওয়া অর্থাৎ ঈমানহারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

ঘ. অথবা, এর মর্ম হলো, মৃত্যুর সময় শয়তান কর্তৃক প্রবঞ্চিত হওয়া।

ঙ. অথবা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

চ. অথবা, দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করা ইত্যাদি।

وَعَنْ ١٨١٥ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ اَخِيْكَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৮১৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেকটি উত্তম কাজই একটি সদকা। তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে প্রসন্ন মুখে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমার বালতি হতে কিছু বেশী পানি তোমার ভাইয়ের পাত্রে ঢেলে দেবে– এগুলোও উত্তম কাজ [অতএব এটাও সদকা]। –[আহমাদ ও তিরমিযী]

وَعَنْ ١٨١٦ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبَسُّمُكَ فِىْ وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَ اِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِىْ اَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِىَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَاِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ دَلْوِ اَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৮১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি একটি সদকা, কারো প্রতি তোমার ভাল কাজের উপদেশ দানও একটি সদকা, কোনো মন্দ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি সদকা, কোনো লোককে পথ হারাবার জায়গায় পথ দেখিয়ে দেওয়াও তোমার জন্যে একটি সদকা, দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তোমার সাহায্য করাও তোমার জন্যে একটি সদকা, রাস্তা হতে পাথর, কাঁটা ও হাড় সরানোও তোমার জন্যে একটি সদকা এবং তোমার বালতি হতে তোমার [অপর] ভাইয়ের বালতিতে পানি ভরে দেওয়াও তোমার জন্যে একটি সদকা। –[তিরমিযী। তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ١٨١٧ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (رض) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذِهٖ لِأُمِّ سَعْدٍ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৮১৭. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সা'দের মা [অর্থাৎ আমার মা] মারা গিয়েছেন, তার জন্যে কোন সদকা উত্তম হবে? রাসূল ﷺ বললেন, 'পানি', তখন তিনি [সা'দ] একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন, এটা সা'দের মায়ের জন্যে [ওয়াকফকৃত]। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আরবভূমিতে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য বস্তু হলো পানি। পানিই তাদের অন্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কাজেই পানির কূপ খনন করা এবং তা সবার জন্যে উপযুক্ত করে দেওয়া অত্যন্ত ছাওয়াবের কর্ম। অপরদিকে পানি হতে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ও গাছপালাসহ সবকিছু উপকৃত হয়। তাই এর أَجْرٌ তথা প্রতিদানও বেশী।

وَعَنْ ١٨١٨ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرًى كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاٍ سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৮১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে তার উলঙ্গ অবস্থায় কাপড় পরিধান করাবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন, যে কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে তার ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য খাওয়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন; আর যে কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে তার তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি পান করাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে [পরকালে] মুখে সীলমোহরকৃত বোতল হতে স্বচ্ছ শরাব পান করাবেন।
-[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَقَاهُ اللّٰهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ-**এর মর্মার্থ :** রাসূল ﷺ বলেছেন যে, যদি কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে তার পিপাসাায় পানি পান করাবে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরকালে সীলমোহরকৃত বোতল হতে স্বচ্ছ শরাব পান করাবেন। এখানে اَلْمَخْتُوْمُ শব্দের অর্থ اَلْمَصُوْنُ বা সুরক্ষিত, যাতে কোনোদিন কেউই হাত লাগায়নি। যার জন্যে বরাদ্দকৃত, শুধু সে-ই তা স্পর্শ করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে مَخْتُوْم দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, বোতলগুলোর মুখ মাটি বা মোমের পরিবর্তে কস্তুরী দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে। আর পানকারী পান করার সময় কস্তুরীর ন্যায় ঘ্রাণ পাবে।

وَعَنْ ١٨١٩ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكٰوةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْاٰيَةَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৮১৯. অনুবাদ : হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয় জাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে [গরিবের] হক রয়েছে। অতঃপর রাসূল ﷺ কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন "লাইসাল বির্‌রা আন তুওয়াল্লু, উজূহাকুম ক্বিবালাল মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগ্‌রিবি" ...... অর্থাৎ তোমরা [নামাজে] পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে, এটাই পুণ্যকাজ নয়।
-[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সূরা বাকারার উপরোল্লিখিত আয়াতে দান-সদকার পরে জাকাতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, জাকাত ও এ দান এক নয় এবং জাকাতই শুধু মালের একমাত্র হক নয়। সুতরাং জাকাত ছাড়াও নিজের সামর্থ অনুযায়ী ঐ সমস্ত খাতে [লোকদেরকে] দান করতে হবে। আমরা মনে করি ইসলামের এই আদর্শ মুসলমানরা পালন করলে একদিকে কতিপয় লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হতো না। অপরদিকে সমাজে গরিব-দরিদ্রেরও অস্তিত্ব থাকতো না; বরং সমাজে অনাবিল স্বর্গীয় সুখ নেমে আসত।

وَعَنْ ١٨٢٠ بُهَيْسَةَ (رضـ) عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِىْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اَلْمَاءُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِىْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اَلْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِىْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৮২০. অনুবাদ : হযরত বুহাইসা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, [তিনি বুহাইসার পিতা] একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! কোন জিনিসের ব্যাপারে কাউকেও নিষেধ করা হালাল নয়? রাসূল ﷺ বললেন, 'পানি'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আর কোন জিনিসের ব্যাপারে কাউকেও নিষেধ করা হালাল নয়? রাসূল ﷺ বললেন, লবণ। তিনি এবারও জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আর কোন জিনিসের ব্যাপারে কাউকেও নিষেধ করা হালাল নয়? রাসূল ﷺ বললেন, যে কোনো ভাল কাজ তুমি করবে তাই তোমার জন্যে ভাল। [অর্থাৎ এরূপ আর কত জিনিসের নাম বলব, যে কোনো ভাল কাজ তুমি করবে তাই তোমার পক্ষে ভাল।] –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর শেষ বাক্যের অর্থ হলো, 'মানুষকে নিষেধ করা হালাল নয়', এমন বহু জিনিস আছে। সুতরাং এভাবে আর কত জিনিসের নাম বলতে থাকব। কাজেই সব কথার শেষ কথা হলো যে কোনো ভাল কাজ করলেই তা তোমার জন্যে ভালো হবে।

কাউকেও লবণ, পানি ইত্যাদি হতে নিষেধ করা ঠিক নয়। সূরা 'আল-মাউন'-এর অংশ অর্থাৎ ওয়াইল জাহান্নামের ভীতি যাদের জন্যে রয়েছে তন্মধ্যে– وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ অর্থাৎ যারা মাউন জিনিস হতে নিষেধ করে তাদের জন্যেও।

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে– وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ তোমরা একে অপরের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করাকে ভুলে যেয়ো না। আর আগুন, পানি ও লবণ ইত্যাদি পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করা উত্তম আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ١٨٢١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيْهَا اَجْرٌ وَمَا اَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

১৮২১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি মৃত জমিকে জীবিত করবে অর্থাৎ, পতিত জমি আবাদ করবে এতে তার জন্যে ছওয়াব রয়েছে, আর তা হতে কোনো প্রাণী যা কিছু খাবে এটাও তার জন্যে দান স্বরূপ হবে। –[দারিমী]

وَعَنِ ١٨٢٢ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَنَعَ مِنْحَةَ لَبَنٍ اَوْ وَرِقٍ اَوْ هُدٰى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৮২২. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি কাউকেও দুধালী গাভী বা ছাগী [দুধ খাওয়ার জন্যে] ধার দেবে বা রৌপ্য ধার দেবে কিংবা কোনো পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখাবে এটা তার জন্যে দাসমুক্তির ছওয়াবতুল্য হবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٨٢٣ اَبِىْ جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَاْيِهِ لَا يَقُوْلُ شَيْئًا اِلَّا صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ قُلْتُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ اِنْ اَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَاِنْ اَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ اَنْبَتَهَا لَكَ وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ اَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قُلْتُ اِعْهَدْ اِلَىَّ قَالَ لَا تَسُبَّنَّ اَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيْرًا وَلَا شَاةً قَالَ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَاِنِ امْرُؤٌ

১৮২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম এবং এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সকল লোক তার পরামর্শে চলে। তিনি যা কিছুই বলেন, তা অনুসারেই মানুষ কাজ করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম লোকটি কে? লোকেরা বলল, ইনি আল্লাহর রাসূল। আবূ জুরাই বলেন, আমি দু'বার তাঁকে বললাম, 'আলাইকাস্ সালামু' ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'আলাইকাস সালামু' বলবে না। কারণ 'আলাইকাস সালামু' বলা হলো মৃতের প্রতি সালাম বলা; বরং বলবে, আস্সালামু আলাইকা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তখন তিনি বললেন, [হ্যাঁ] আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যিনি যদি তোমার কোনো বিপদ হয় আর তুমি তাকে আহ্বান কর, তাহলে তিনি তোমার বিপদ দূর করেন, যদি তোমার অভাব দেখা দেয় আর তুমি তাকে ডাক, তিনি তোমার ফসল উৎপাদন করেন, যদি তুমি কোনো ঘাস ও পানিহীন প্রান্তরে থাক আর তোমার বাহনটি হারিয়ে যায় অতঃপর তুমি তাকে ডাক, তিনি তোমার বাহন তোমাকে ফিরিয়ে দেন।

আমি বললাম, [ইয়া রাসূলুল্লাহ!] আমাকে কিছু উপদেশ দিন! রাসূল ﷺ বললেন, কখনো কাউকে তুমি গালি দেবে না। আবূ জুরাই বলেন, পরে আমি আর কাউকেও গালি দেইনি, চাই স্বাধীন ব্যক্তি হোক বা কোনো দাস, চাই উট হোক কিংবা ছাগল। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, কোনো ভাল কাজকে তুমি তুচ্ছ মনে করবে না। তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলবে, এটাও একটি ভাল কাজ। তোমার লুঙ্গি তোমার পায়ের নালার অর্ধেক পর্যন্ত উঠাও, যদি তুমি এটা না মান্য কর [অর্থাৎ না কর] তবে পায়ের গোড়ালির উপর পর্যন্ত নামাতে পার। সাবধান, লুঙ্গি নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, এটা অহংকারের প্রতীক।

شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ حَدِيثَ السَّلَامِ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَكُونُ لَكَ أَجْرُ ذٰلِكَ وَ وَبَالُهُ عَلَيْهِ)

আর আল্লাহ তা'আলা অহংকারীকে ভালবাসেন না। যদি কেউ যা তোমার মধ্যে দেখে তার কারণে তোমাকে গালি দেয় বা তোমাকে লজ্জা দেয়, সে কারণে তুমি তাকে লজ্জা দিয়ো না, যা তুমি তার মধ্যে দেখ। কেননা, এর ক্ষতি তার উপরেই বর্তাবে। –[আবূ দাঊদ]

তিরমিযী শুধু সালামের হাদীস পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এতে তোমার ছওয়াব হবে এবং এর ক্ষতি তার প্রতিই বর্তাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هٰذِهِ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ-এর অর্থ : জাহিলিয়া যুগ হতে আরবগণ মৃতব্যক্তিকে আলাইকাস সালামু বা আলাইকুমুস সালামু বলত। মহানবী ﷺ জাহিলিয়া যুগের উক্ত প্রচলনটি তুলে দিয়েছিলেন। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, জীবিত কি মৃত, সকলকে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম করা সুন্নত। নবী করীম ﷺ কবরের নিকট গিয়েও অনুরূপ করতেন।

وَعَنْ ١٨٢٤ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

১৮২৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তাঁরা একটি বকরি জবাই করলেন, [এবং মেহমানকে খাওয়ালেন] তখন রাসূলে করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তার কতটুকু বাকি আছে? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তার একটি কাঁধ ছাড়া আর কিছু বাকি নেই। রাসূল ﷺ বললেন, তার একটি কাঁধ ছাড়া সবই আছে। [তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী তাকে সহীহ বলেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا-**এর তাৎপর্য :** পবিত্র কুরআনের বাণী– অর্থাৎ "যা তোমার নিকট আছে তা শেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লাহর নিকট আছে, তা বাকি থাকবে" মহানবী ﷺ এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, বকরির কাঁধটি ছাড়া আর সবকিছুই মেহমান মুসাফিরকে খাওয়ানো হয়েছিল। যা কিছু মেহমান মুসাফিরকে খাওয়ানো হয়েছে, সবকিছুই আল্লাহর নিকট জমাও আছে। তার ছওয়াব পাওয়া যাবে। যেহেতু বকরির কাঁধটি খাওয়ানো হয়নি সেহেতু তা আল্লাহর নিকটও জমা নেই। যা আল্লাহর নিকট নেই তা শেষ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের জন্যে রেখে দেওয়া জিনিস নিঃশেষ হয়ে যাবে, পরকালে পাওয়া যাবে না। আর দান-সদকার ছওয়াব নিশ্চিত পাওয়া যাবে। এ দৃষ্টিকোণ হতে রাসূল ﷺ যথার্থই বলেছেন যে, কাঁধটিই নেই, আর সবটুকু আছে।

وَعَنْ ١٨٢٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللّٰهِ مَادَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৮২৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে একটি কাপড় পরাবে, সে [দাতা] ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হিফাজতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত [গ্রহীতার] পরনে ঐ কাপড়ের এক টুকরাও থাকবে। –[আহমদ ও তিরমিযী]

وَعَنْ ١٨٢٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلٰثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ بِيَمِيْنِهٖ يُخْفِيْهَا أُرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهٖ وَ رَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ اَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ اَحَدُ رُوَاتِهٖ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ كَثِيْرُ الْغَلَطِ)

১৮২৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন যে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। প্রথমত যে ব্যক্তি রাতে উঠে আল্লাহর কিতাব পাঠ করেন। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি কোনো কিছু ডান হাতে সদকা করেন এবং তা গোপন রাখেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন– তার বাম হাত হতে এবং তৃতীয়ত যে ব্যক্তি কোনো সৈন্যদলে ছিলেন, তার দলবল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল আর তখন তিনি [একাই] শত্রুর মুকাবিলা করলেন [হয় শত্রুকে বধ করলেন নতুবা নিজে শহীদ হলেন]। –[তিরমিযী]

তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি শায। তার অন্যতম রাবী আবূ বকর ইবনে আইয়্যাশ অনেক ভুল করতেন।

وَعَنْ ١٨٢٧ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ وَثَلٰثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ فَرَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَاَلَهُمْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَسْاَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِاَعْيَانِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهٖ اِلَّا اللّٰهُ وَالَّذِىْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهٖ فَوَضَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِىْ وَيَتْلُوْا اٰيَاتِىْ وَ رَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَلَقِىَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا فَاَقْبَلَ بِصَدْرِهٖ حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يُفْتَحَ وَالثَّلٰثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ الشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِىُّ الظَّلُوْمُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

১৮২৭. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন তারা হলেন– ১. কোনো ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের নিকট এসে আল্লাহর নাম করে কিছু চাইল, তার ও তাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তার কারণে তাদের কাছে চায়নি– তারা তাকে না বলে দিল, আর এক ব্যক্তি তার দলকে পেছনে ফেলে চুপে চুপে অগ্রসর হলো এবং গোপনে তাকে দান করল। তার এই দান আল্লাহ তা'আলা ও যাকে দান করা হয়েছে সে ব্যতীত আর কেউ জানল না। ২. একদল লোক সারারাত পথ চলল, যখন নিদ্রা তাদের কাছে এর সমতুল্য আর সব জিনিসের চেয়ে প্রিয়তর হয়ে গেল, তারা সকলেই নিজেদের মাথা [ঘুমানোর জন্যে] জমিনে রাখল, তখন সে উঠে দাঁড়াল, আমার সমীপে অনুনয় বিনয় করল এবং আমার আয়াত পাঠ করল এবং ৩. সে ব্যক্তি যে কোনো সৈন্যদলে ছিল এবং শত্রুর মুকাবিলা করল, অতঃপর দলের লোকেরা পরাজিত হলো [অর্থাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে] আর সে একাই নিজের বুক পেতে সম্মুখে অগ্রসর হলো যে পর্যন্ত সে নিহত না হলো অথবা জয়লাভ করল। যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ঘৃণা করেন তারা হলো– ১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, ২. দরিদ্র অহংকারী এবং ৩. ধনী অত্যাচারী। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٨٢٨ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتِ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ نَعَمْ اَلْحَدِيْدُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ قَالَ نَعَمْ اَلنَّارُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ اَلْمَاءُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ اَلرِّيْحُ فَقَالُوْا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ قَالَ نَعَمْ اِبْنُ اٰدَمَ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِيْنِهٖ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهٖ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَ ذَكَرَ حَدِيْثَ مُعَاذٍ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ فِيْ كِتَابِ الْإِيْمَانِ)

১৮২৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন জমিন সৃষ্টি করলেন তা কাঁপতে লাগল। তখন পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং তার উপর কীলক [খুটা] স্বরূপ মারলেন, এতে জমিন স্থির হয়ে গেল, পাহাড়ের শক্তি দেখে ফেরেশতাগণ বিস্মিত হলেন এবং বললেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড় হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ আছে, লোহা, তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে লোহা হতে শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, আগুন, অতঃপর তারা আবারও জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ারদিগার! তোমার সৃষ্টিতে আগুন হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, পানি। এবারও তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে পানি হতে শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, বাতাস। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! তোমার সৃষ্টিতে বাতাস হতেও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, আদম সন্তান– যে তার ডান হাতে সদকা করে আর বাম হাত হতেও তা গোপন রাখে। [অর্থাৎ এর শক্তি পূর্ব বর্ণিত জিনিসগুলো হতেও বেশি]। –[তিরমিযী]

তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস– اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ الخ ঈমান অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَعَمْ اِبْنُ اٰدَمَ تَصَدَّقَ صَدَقَةً **-এর তাৎপর্য :** ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু! বাতাস হতে শক্তিশালী কিছু আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আছে, বনী আদম, যে তার ডান হাতে সদকা করে আর বাম হাত হতেও তা গোপন রাখে। বনী আদম বা আদম সন্তান কোন হিসেবে বেশী শক্তিশালী তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে মানবীয় দৃষ্টিতে যে দিকগুলো ধরা পড়ে, তা নিম্নরূপ–

মানুষের আত্মা এমন সব স্বভাব– প্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত যাকে আগুন, পানি বা বাতাস অবদমিত করতে পারে না। এর চাহিদার বিপরীত তাকে পরিচালিত করতে পারে না। সুতরাং আগুন, পানি ও বাতাসের তুলনায় আত্মা শক্তিশালী। আর এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তার আত্মাকে নিজ ইচ্ছার অনুগত করে রাখতে পারে। যেমন, অন্যের প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে থাকা সত্ত্বেও মানুষ প্রকাশ্যে দান-সদকা না করে গোপনে করে। আর এ কারণেই মানুষ বেশি শক্তিশালী।

■ অথবা, যেহেতু মানুষ অন্যায় ও অসত্য পরিহার করে সৎপথ অবলম্বনের মাধ্যমে শয়তানের চক্রান্তকে নস্যাৎ করতে পারে, তাই সে শক্তিশালী।

▮ অথবা, মানুষ সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর ক্রোধকে নির্বাপিত করে, তাই সে শক্তিশালী।

▮ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মানুষের স্বভাব হলো, সঞ্চয়প্রিয় ও ব্যয়কুণ্ঠ, যা মাটির স্বভাব। অনুরূপভাবে মানুষ সুনাম ও মহিমার প্রত্যাশী, যা আগুন ও বাতাসের স্বভাব। সুতরাং মানুষ যখন অকুণ্ঠভাবে দান-সদকা করে তখন সে মাটির স্বভাবকে পরাজিত করে দেয়। আর দান যখন গোপনে করে, তখন সে আগুন ও বাতাসের স্বভাবের উপর বিজয়ী হয়। তাই মানুষ উল্লিখিত সব বস্তুর চেয়ে শক্তিশালী।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ١٨٢٩ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوْهُ اِلٰى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اِنْ كَانَتْ اِبِلًا فَبَعِيْرَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَبَقَرَتَيْنِ - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

১৮২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে মুসলমান বান্দা আল্লাহর রাস্তায় তার প্রত্যেক প্রকারের মাল হতে এক জোড়া করে দান করবে, জান্নাতের দ্বার রক্ষীগণ তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন। তাদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের নিকট যা আছে তার দিকে ডাকবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা [এক জোড়া দান] কিরূপে হবে– ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাসূলে করীম ﷺ বললেন, যদি উট থাকে তবে দু'টি উট দান করবে, আর যদি গরু থাকে তবে দু'টি গরু। –[নাসায়ী]

وَعَنْ ١٨٣٠ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَدَقَتُهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৮৩০. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত মারছাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন ঈমানদারের ছায়া হবে তার সদকা। –[আহমাদ]

وَعَنْ ١٨٣١ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَسَّعَ عَلٰى عِيَالِهِ فِى النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذٰلِكَ - (رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَ رَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْهُ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَضَعَّفَهُ)

১৮৩১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি আশুরার দিন নিজের পরিবার-পরিজনের খরচা বাড়িয়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা সারা বছর তার প্রতি তাঁর দান প্রশস্ত রাখবেন। তাবিয়ী হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এরূপই [অর্থাৎ হাদীসের উক্তি অনুরূপই] পেয়েছি। –[রাযীন]

বায়হাকী (র.) শুয়াবুল ঈমানে ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি এ হাদীসটিকে য'ঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আশুরা বা মহররমের দশ তারিখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিবস। এ দিবসে পৃথিবী সৃষ্টিসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। উক্ত দিনের অনেক ফজিলতও বর্ণিত হয়েছে। এমনকি এ দিনে রোজা রাখার কথা ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত তারিখে খাবার-দাবারের প্রশস্ততা করার হাদীসটি দ্বা'ঈফ হলেও আমলে কোনো বাধা নেই।

وَعَنْ ١٨٣٢ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الصَّدَقَةَ مَاذَا هِىَ قَالَ اَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللّٰهِ الْمَزِيْدُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৮৩২. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ বাহিলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! সদকার কি ছওয়াব? রাসূল ﷺ বললেন, এর অনেক গুণ [অর্থাৎ দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত] এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট এরও অধিক রয়েছে। –[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ যাকে চান অধিক দান করেন। অত্র হাদীসে সে দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মূলত এখানে প্রশ্ন ছিল সদকার গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে; অথচ নবী করীম ﷺ জবাব দিয়েছেন এর ছওয়াব সম্পর্কে। কারণ গূঢ়তত্ত্ব একদিকে মানুষের জ্ঞানের বাইরে দ্বিতীয়ত এটা জানার মধ্যে মানুষের লাভও কিছুই নেই; বরং উৎসাহ ও আগ্রহ জন্মার জন্যে এর মধ্যে ছওয়াব কি আছে, তা বলে দেওয়াই উচিত। তাই তিনি ছওয়াবের কথাটি উল্লেখ করেছেন এটাও বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকের নীতি।

بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ
পরিচ্ছেদ : উত্তম দান

দান করা একটি উত্তম গুণ। আবার এ গুণ কখনো শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন হয়। যেমন– দাতা নিজেই অভাবী অথচ অপর দরিদ্রকে দান করে। এটাও দানের শ্রেষ্ঠত্ব। আবার কখনো গ্রহীতার কারণে এটা হয়ে থাকে, যেমন নিতান্ত অসহায় বা দরিদ্র নিকটতম আত্মীয়কে দান করা। আবার কখনো স্থানভেদেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়ে, যেমন জিহাদে ও মাদরাসা-মসজিদে দান করা। আলোচ্য পরিচ্ছেদে দানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কীয় ও সাধারণ দান প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٣٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) وَحَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَكِيْمٍ وَحْدَهُ)

১৮৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– উত্তম সদকা এটাই যা সচ্ছলতার সাথে করা হয়। আর তাদের হতে সদকা করা শুরু করবে, যাদের তুমি প্রতিপালন করছ। [বুখারী। মুসলিম একমাত্র হাকীম হতে বর্ণনা করেন]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ غِنًى -এর ব্যাখ্যা : এটা আরবি পরিভাষার একটি বাকরীতি। ইমামগণ বলেন, যারা নিজের বা পরিবারস্থ লোকদের ত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা রাখে না এবং দান করে পরে অনুশোচনা করবে, এমন ব্যক্তির পক্ষে নিজের সচ্ছল অবস্থা বজায় রেখে অর্থাৎ নিজেদের আবশ্যক পরিমাণ অবশিষ্ট রেখে অতিরিক্ত যা থাকে তা দান করা উত্তম।

- আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, নিজেদেরকে অন্যের দ্বারে হাত পাতা হতে বিরত রাখে, এ পরিমাণ মালের মালিককে 'যাহরে গেনা' বলা হয়, ওটাই সদকা করা উত্তম।
- প্রকৃত কথা হলো, 'সচ্ছলতা' আল্লাহর উপর নির্ভরতার অধীনে অন্তরের দানশীলতা ও উদারতার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ছিল। তিনি সমুদয় মালই দান করে দিয়েছিলেন।

  অথবা, মাল-সম্পদ মওজুদ থাকার ভিত্তিতে সচ্ছলতা বিদ্যমান থাকতে হবে। এ দু'টির কোনোটিই ছিল না, এমন ব্যক্তির দান নবী করীম ﷺ গ্রহণ করেননি।
- অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে একদা নবী করীম ﷺ -কে উত্তম দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন– جُهْدُ الْمُقِلِّ। অর্থাৎ গরিবের কষ্টের দান। جُهْدُ الْمُقِلِّ এবং ظَهْرِ غِنًى -এর মধ্যে বৈপরীত্ব নেই। কেননা, যার সহ্য করার মতো ধৈর্য এবং অল্পে তুষ্ট থাকার ন্যায় গুণ নেই, তার জন্যে সচ্ছলতা পরিমাণ মাল বাকি রেখে অবশিষ্টটুকু দান করা উত্তম। আর যার সে গুণ রয়েছে, তার জন্যে সামান্য পরিমাণ রেখে অবশিষ্টটুকু দান করাই উত্তম।

وَعَنْ ١٨٣٤ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى أَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন কোনো মুসলমান নিজ পরিবার-পরিজনের জন্যে খরচ করে এবং এতে ছওয়াবের আশা করে, এটা তার জন্যে সদকা স্বরূপ হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٨٣٥ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهٗ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهٗ فِىْ رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهٗ عَلٰى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِىْ أَنْفَقْتَهٗ عَلٰى أَهْلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ, করেছেন– একটি দিনার যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় [জিহাদে] ব্যয় করেছ, একটি দিনার যা তুমি দাসমুক্ত করতে ব্যয় করেছ, একটি দিনার যা তুমি একজন নিঃস্বকে দান করেছ এবং একটি দিনার যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ [সবগুলোই ছওয়াবের কাজও বটে, তবে] এ সবের মধ্যে যেটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ, ছওয়াবের দিক দিয়ে সেটি অধিক বড়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র হাদীস দ্বারা পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ের কথাই বুঝানো হয়েছে। তাদের জন্যে ব্যয়বাহুল্য করা; কিংবা তাদেরকে বিলাসী করে তোলার জন্যে ব্যয় করা ছওয়াবের কাজ নয় বরং আজাবের আশংকাই রয়েছে। বর্তমান কালের বিত্তবান সম্পদশালী লোকদের মধ্যে এ প্রবণতাই অধিক। এর থেকে বেঁচে থাকা আমাদের একান্তই কর্তব্য।

وَعَنْ ١٨٣٦ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهٗ عَلٰى عِيَالِهٖ وَ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهٗ عَلٰى دَابَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهٗ عَلٰى أَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮৩৬. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কোনো ব্যক্তি যত দিনার ব্যয় করে তন্মধ্যে উত্তম দিনার হলো ঐ দিনার, যা সে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করে। আর ঐ দীনার, যা সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে বাহনের পশুর প্রতি ব্যয় করে এবং ঐ দীনার, যা আল্লাহর পথে জিহাদে নিজের সাথীদের জন্যে ব্যয় করে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٨٣٧ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلِىَ أَجْرٌ إِنْ أُنْفِقُ عَلٰى بَنِىْ أَبِىْ سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ فَقَالَ أَنْفِقِىْ عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৩৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আবূ সালামার সন্তানদের জন্যে খরচ করছি, তারা তো আমারই সন্তান। এতে আমার ছওয়াব হবে কি? রাসূল ﷺ বললেন, তাদের জন্যে খরচ কর। তাদের জন্যে যে পরিমাণ খরচ করবে এর ছওয়াব তুমি পাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٨٣٨ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْئَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنِّيْ وَاِلَّا صَرَفْتُهَا اِلٰى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بَلْ اِئْتِيْهِ اَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتِيْ حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَقَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ اِئْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْاَلَانِكَ اَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِيْ حُجُوْرِهِمَا وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هُمَا قَالَ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ اِمْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

১৮৩৮. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সদকা কর, যদিও তা তোমাদের গহনা হতে হয়। বিবি যয়নব বলেন, [এটা শুনে আমি আমার স্বামী] আবদুল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বললাম, আপনি নিঃস্ব গরিব মানুষ অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সদকা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি রাসূল ﷺ -এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আমি আপনাদের জন্যে খরচ করলে তা আমার জন্যে যথেষ্ট হবে কিনা? নতুবা আমি তা আপনাদের ছাড়া অন্যদের প্রতি খরচ করব। যয়নব বলেন, তখন আবদুল্লাহ আমাকে বললেন, বরং তুমি নিজেই তার কাছে যাও। বিবি যয়নব বলেন, [সে মতে] আমি নিজেই গেলাম [যখন পৌঁছলাম] দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরজায় আনসারীদের এক মহিলাও দাঁড়িয়ে আছে। আমার ও তার প্রয়োজন একই। [অর্থাৎ আমরা উভয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছি]। যয়নব বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে এক অস্বাভাবিক ভীতি প্রদান করা হয়েছে [তাই আমরা তাঁর সম্মুখে যেতে সাহস পেলাম না] যয়নব বলেন, এমতাবস্থায় হযরত বিলাল (রা.) আমাদের কাছে আসলেন, আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে এ খবর দিন যে, দু'জন মহিলা আপনার দরজায় আপনাকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছে যে, তাদের স্বামীদের প্রতি এবং তাদের পোষ্য এতিমদের প্রতি সদকা করলে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা? আর আমরা কারা, এ কথা তাঁকে বলবেন না। হযরত যয়নব বলেন, তখন হযরত বেলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। এ সময় নবীজী ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা দু'জন কারা? তিনি বললেন, একজন আনসারীদের এক মহিলা, অপরজন যয়নব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন– কোন যয়নব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের জন্যে দু'টি করে ছওয়াব রয়েছে। একটি নিকট আত্মীয় হওয়ার ছওয়াব, অপরটি সদকার ছওয়াব।–[বুখারী ও মুসলিম। বর্ণিত শব্দগুলো মুসলিমের]

وَعَنْ ١٨٣٩ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رضـ) اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৩৯. অনুবাদ : হযরত মাইমূনা বিনতে হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় এক দাসীকে মুক্ত করলেন। অতঃপর এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানানো হলো। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তা তোমার মামাদেরকে দান করতে, তবে তোমার অধিক ছওয়াব হতো।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নিকটতম আত্মীয়দেরকে দান করা অত্যধিক ছওয়াবের কাজ। হযরত মাইমূনা (রা.)-এর মামাগণ গরিব ছিল। দাস-দাসী রাখার মতো তাদের সামর্থ্য ছিল না। তাই তাদেরকে উক্ত দাসী দান করা তার উচিত ছিল।

وَعَنْ ١٨٤٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৮৪০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুই প্রতিবেশী আছে। এদের মধ্যে কাকে আমি উপহার দেব? রাসূল ﷺ বললেন, দু'য়ের মধ্যে যার ঘরের দরজা তোমার নিকটবর্তী তাকে দিবে। –[বুখারী]

وَعَنْ ١٨٤١ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তুমি ঝোল রান্না করবে, তাতে পানি বেশি দেবে এবং নিজের প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিবে [অর্থাৎ, তাদেরকেও দেবে]। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঘরের নিকট প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তারপর অন্যদেরকে. আর গৃহে কোনো উন্নত খাবার তৈরি হলে তাতে প্রবিবেশীদেরকেও শরিক করা উত্তম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٤٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৮৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন সদকা উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, দরিদ্রের কষ্টের দান। আর প্রথমে তুমি তাকে দান করবে যাকে তুমি লালন-পালন কর। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٨٤٣ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلٰى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৮৪৩. অনুবাদ : হযরত সুলায়মান ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নিঃস্বকে দান করা হলো শুধু দান, আর তা আত্মীয়ের প্রতি করা হলো দু রকমের কাজ– এক দান, আর এক আত্মীয়তা রক্ষা। [অর্থাৎ দুই গুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে, সদকার ছওয়াব এবং আত্মীয়তা রক্ষার [ছওয়াব]।

[আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী।]

وَعَنْ ١٨٤٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى اَهْلِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَعْلَمُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৮৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসল এবং বলল, আমার কাছে একটি দিনার আছে। [আমি তা কিসে খরচ করব?] রাসূল ﷺ বললেন, এটা তুমি নিজের জন্যে খরচ কর। লোকটি বলল, আমার কাছে আরও একটি দিনার আছে। রাসূল ﷺ বললেন, তা তোমার সন্তানের জন্যে খরচ কর। লোকটি বলল, আমার নিকট আরও একটি দিনার আছে। রাসূল ﷺ বললেন, এটা তোমার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে খরচ কর। সে ব্যক্তি বলল, আমার নিকট আরো একটি দিনার আছে। রাসূল ﷺ বললেন, এটা তোমার ভৃত্যের জন্যে খরচ কর। লোকটি আবারও বলল, আমার নিকট আরো একটি দিনার রয়েছে। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমিই অধিক জান। [অর্থাৎ উপরিউক্ত বর্ণনাক্রম অনুসারে তুমিই বুঝতে পার কোথায় খরচ করবে।] –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٨٤٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَتْلُوْهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّيْ حَقَّ اللّٰهِ فِيْهَا اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يُسْاَلُ بِاللّٰهِ وَلَا يُعْطِيْ بِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

১৮৪৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? উত্তম সে ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, [আবারও তিনি বললেন,] আমি কি তোমাদেরকে বলব না [মর্যাদায়] ঐ ব্যক্তির কাছাকাছি কে? সে ব্যক্তি, যে নিজের স্বল্প সংখ্যক ছাগল ভেড়া নিয়ে [বস্তি হতে] পৃথক হয়ে রয়েছে, তাতে আল্লাহর যে হক আছে তা আদায় করছে। [রাসূল ﷺ আবারও বললেন,] আমি কি তোমাদেরকে বলব না, মানুষের মধ্যে খারাপ লোক কে? মন্দ লোক সে ব্যক্তি, যার কাছে আল্লাহর নাম করে কিছু চাওয়া হয়, আর সে তাঁর নামে তাকে কিছু দেয় না। –[তিরমিযী, নাসায়ী ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লাহর নামে কারো কাছে কিছু চাওয়া মহাপাপ। এতে আল্লাহর নামের অমর্যাদা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর নাম করে কেউ কিছু চেয়ে বসলে, তখন না দেওয়াও অন্যায়। কারো মতে, আল্লাহর নামে যাচনাকারীকে কিছু না দেওয়া উচিত। কারণ এক শ্রেণীর লোক আল্লাহর নাম করে প্রায়শ ভিক্ষা করে থাকে, এ ধরনের লোকদের দান করা বন্ধ করলেই এ পন্থা বন্ধ হয়ে যাবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে কালিমার বিপ্লবী বাণী উচ্চারিত হলে চতুর্দিকে প্রকম্পিত হতো, বাতিলের দুর্গ ভেঙ্গে পড়ত, আজকাল সে কালেমা ভিক্ষুকের মুখের বুলিতে পরিণত হয়েছে। আজকাল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে ডাক দিলে মানুষ এক মুঠি ভিক্ষা নিয়ে আসে। কাজেই ব্যাপারটি আপাত দৃষ্টিতে নগণ্য মনে হলেও তা নগণ্য নয়। এ জন্যেই আল্লাহর নাম, রাসূল ﷺ-এর নাম ও ইসলামি পরিভাষায় অন্যান্য বাক্য খারাপ স্থানে, হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেওয়া উচিত নয়। এ ধরনের অপপ্রয়োগ বন্ধ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আমাদের উচিত।

وَعَنْ ١٨٤٦ أُمِّ بُجَيْدٍ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ)

১৮৪৬. অনুবাদ : হযরত উম্মে বুজাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সওয়ালকারীকে কিছু দিয়ে ফেরাও, যদিও একটা পোড়া খুর হয় [অর্থাৎ অল্প কিছু হলেও দাও]। –[মালিক ও নাসায়ী]

তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র.) এ অর্থই বর্ণনা করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গরু ও বকরি ইত্যাদির খুরকে বলা হয় ظِلْفٌ [যিলফুন] যেমন– ঘোড়ার খুরকে বলে حَافِرٌ [হাফিরুন]। মোটকথা, তাকে [ভিক্ষুককে] কিছু হতে বঞ্চিত করো না। আর مُحْرَقٌ অর্থ– পোড়া হাড়। এটা যদিও কোনো কাজে লাগে না। এখানে মুবালাগা হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু না কিছু দিয়েই তাকে বিদায় করিও। একেবারে খালি হাতে বিদায় দিয়ো না।

وَعَنْ ١٨٤٧ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَاَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا اَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৮৪৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তাকে আশ্রয় দিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম করে [তোমাদের কাছে] কিছু প্রার্থনা করে তাকে তা দান করবে। যে তোমাদেরকে ডাকবে, তার ডাকে সাড়া দিবে। যে তোমাদের প্রতি কোনো উত্তম কাজ করবে তোমরা তাকে প্রতিদান দিবে, যদি প্রতিদান দেওয়ার মতো এমন কিছু না পাও তবে তার জন্যে দোয়া করবে যাবৎ তোমরা ভাবতে পার যে, তোমরা তার প্রতিদান করেছ। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তাকে আশ্রয় দেবে। বাক্যটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আশ্রয় চাইবে এবং আল্লাহর নামের উসিলা ধরে তোমাদের বা অন্যদের ক্ষতি হতে বাঁচার জন্যে তোমাদের কাছে প্রার্থনা করবে, তোমরা আল্লাহর নামের মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবে এবং তা হতে ক্ষতির সমূহ সম্ভবনাকে দূর করে দেবে। অথবা, বাক্যটির অর্থ এ হতে পারে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, তোমরা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তার পিছু নেবে না; বরং তাকে আশ্রয় দেবে এবং বিপদ হতে রক্ষা করবে।

مَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি কোনো উত্তম কাজ করবে, তোমরা তাকে তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ যদি কেউ কথা বা কাজের মাধ্যমে তোমাদের কোনো কল্যাণ করে, তবে তোমরা তার সাথে সদাচরণ করবে। কেননা, কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে- هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ অর্থাৎ, অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহ হওয়াই উচিত। প্রতিদান যদি বস্তু দ্বারা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে অন্তত তার জন্যে দোয়া করবে। কেননা, جَزَاكَ اللّٰهُ [আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন] বলাও একটি প্রতিদান।

وَعَنْ ١٨٤٨ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُسْاَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلَّا الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৮৪৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নামে জান্নাত ব্যতীত কিছু চাওয়া যায় না। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে لَا يُسْاَلُ ফে'লটিকে مَجْهُوْل পড়লে তখন اَلْجَنَّةُ-এর মধ্যে رَفْع হবে, এমতাবস্থায় অর্থ হবে- আল্লাহর নামে কিছু চাইতে হলে, তবে বেহেশতই চাওয়া উচিত। আর তা কোনো মানুষ দিতে পারে না। কাজেই আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া উচিত নয় তথা জায়েজ নেই। আর لَايَسْاَلُ-কে مَعْرُوْف পড়লে তখন اَلْجَنَّةَ-এর মধ্যে نَصَبْ হবে। তখন অর্থ হবে আল্লাহর কাছে পার্থিব কিছু চাওয়া উচিত নয়; বরং চাইতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। ফলে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের দ্বারা জান্নাতও অর্জিত হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٤٩ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرَحَا وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ

১৮৪৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার আনসারীদের মধ্যে হযরত আবূ তালহা খেজুর জাতীয় মালের বড় সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তার সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বীরহা' নামক কূপ তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। এটা মসজিদে নববীর সম্মুখেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই ঐ কূপে যেতেন এবং তার মিঠা পানি পান করতেন। হযরত আনাস বলেন, যখন "লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকূ মিম্মা তুহিব্বূনা" অর্থাৎ "তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না,

فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ مَالِىْ اِلَىَّ بَيْرَحَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْجُوْا بِرَّهَا وَ ذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِفْعَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهٖ وَبَنِىْ عَمِّهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

যতক্ষণ তোমরা যা ভালবাস তা দান না কর” এ আয়াত নাজিল হলো, তখন আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা যা ভালবাস তা দান না কর।” আমার সম্পদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় আমার কাছে বীরহা কূপ। অতএব, এটা আমি আল্লাহর নামে দান করলাম এ আশায় যে, তার পুণ্য ও তাকে সঞ্চিত ধন হিসেবে [পরকালে] আল্লাহর কাছে পাব। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তা দান করুন যেভাবে আল্লাহ আপনাকে বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবাস! সাবাস! এটা একটি লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে আমি শুনলাম। তবে আমি এটাই ভাল মনে করি যে, তুমিই একে তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। তখন আবূ তালহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব। অতঃপর আবূ তালহা এটা আপন আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ١٨٥٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৮৫০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কোনো ভুখা প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ানোই হলো শ্রেষ্ঠ সদকা। –[হাদীসটি বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে كَبِدًا جَائِعًا বা ভুখা প্রাণ বলতে বুঝানো হয়েছে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানো। চাই তা হালাল প্রাণী হোক কিংবা হারাম, পালিত বা বন্য। অপরাপর হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর দরুন জান্নাতে প্রবেশ করেছে। পক্ষান্তরে এক মহিলা একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। অথবা এর দ্বারা মু'মিন হোক বা কাফের হোক উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ

পরিচ্ছেদ : স্বামীর ধন-সম্পদ হতে স্ত্রীর দান

স্বামীর বা মালিকের ধন সম্পদ হতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী বা দাস-দাসী দান-সদকা করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

কিছুসংখ্যকের মতে অপব্যয় বা স্বাভাবিক নিয়মের অতিরিক্ত না হলে খাবার দ্রব্য-সামগ্রী হতে স্বামীর অনুমতি ব্যতীতই স্ত্রী দান-সদকা বা ব্যয় করতে পারব।

আবার কারো অভিমত হলো অনুমতি ছাড়া কিছুই দান-সদকা করা বৈধ হবে না।

ইমাম মুহীউস্ সুন্নাহ (র.) বলেন, সাধারণ ওলামায়ে কেরামের মতামত হলো– স্বামীর সম্পদ হতে স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া দান-সদকা করতে পারবে না, কিংবা পারবে। এর কোনোটির জন্যে প্রকাশ্যে না হলেও ইঙ্গিতে অনুমতি থাকতে হবে। এই বিধান চাকর-চাকরাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আবার কেউ কেউ স্ত্রী ও চাকর-বাকরের মধ্যে পার্থক্য করেন, তারা বলেন– স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর যে পরিমাণ অধিকার থাকে, ভৃত্যের সেই পরিমাণ থাকে না। স্ত্রী ঘরের মাল-সম্পদের দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাই বিনা অনুমতিতে দান-সদকা করার অধিকার রাখে। কিন্তু ভৃত্যের সেই অধিকার নেই। তাই দান করাও জায়েজ নেই। মূলত অনুমতি দুই প্রকারের এক প্রকার অনুমতি হলো নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশ্য অনুমতি, আর দ্বিতীয় প্রকার হলো সমাজের রেওয়াজ বা দেশাচার জনিত স্বাভাবিক অনুমতি।

তবে যার স্বামী বদমেজাজ ও কৃপণ স্বভাবের সে ক্ষেত্রে প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়া দান করা জায়েজ নেই। আর যার স্বামী উদার ও দানশীল স্বভাবের, এছাড়া সামাজিক নিয়মে দান করলে নাজায়েজ হবে না। যেমন, মেহমান আপ্যায়নে স্বামীর অনুমতি নিতে হয় না। মোটকথা, স্বামীর স্বভাব সম্পর্কে স্ত্রী যথার্থ ওয়াফিক থাকে। সুতরাং সেই অনুযায়ী দান-সদকা করা বা না করা নির্ভর করে। অবশ্য নির্দিষ্ট মূল্যবান কোনো বস্তু দান করতে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১৮৫১ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৫১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মহিলা ঘরের খাদ্য হতে অপব্যয় ব্যতিরেকে কোনো কিছু দান করে, এ জন্যে তার ছওয়াব রয়েছে এবং তার স্বামীর জন্যে ছওয়াব রয়েছে তা উপার্জন করার কারণে। এমনিভাবে মাল রক্ষণা-বেক্ষণকারীর জন্যেও রয়েছে অনুরূপ ছওয়াব। এতে একে অন্যের ছওয়াবের কিছুই ঘাটতি করবে না। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যেখানে স্বাভাবিকভাবে স্বামীর অনুমতি থাকে এবং এ দানের জন্যে স্বামীর কৈফিয়ত তলব না করার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, সে ক্ষেত্রে এই হাদীসের প্রেক্ষিতে আমল করার বিধান রয়েছে; কিন্তু যদি স্বামীর আপত্তি থাকে তবে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করা উচিত হবে না। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আবূ উমামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে।

مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا-এর তাৎপর্য : অত্র হাদীসে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, 'ঘর' বস্তুটিকে স্ত্রীর দিকে সংযোজন বা إِضَافَت করা হয়েছে। আর طَعَام শব্দ হতে বুঝা যায় যে, ঐ খাদ্যদ্রব্য যা খাওয়ার জন্য সে তৈরি করেছে। সুতরাং এ খাদ্য হতে দান করতে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে কিনা? হাদীসে এর উল্লেখ নেই। অবশ্য পরবর্তী হাদীসে উল্লেখ আছে যে, স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু সেখানে طَعَام অর্থাৎ খাদ্যের কথাটি নেই। পরিশেষে এটাই বলা যায় যে, সামাজিক রেওয়াজ ও দেশাচার ভিত্তিতে খাদ্যের জন্যে অনুমতি নিতে হবে না। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেই ছওয়াবের অধিকারী হবে।

غَيْرَ مُفْسِدَةٍ-এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসাংশের ব্যাখ্যা হলো, যে বস্তু দান করতে স্বামীর অনুমতি নেই। অথবা এত বেশি দান না করা যাতে স্বামী দেউলিয়া হয়ে পড়তে পারে। অথবা অন্যায়ভাবে খরচ বা অপচয় না করা ইত্যাদিকে غَيْرَ مُفْسِدَةٍ বলা হয়। যদি এর বিপরীত হয় তখন হবে مُفْسِدَةٍ কিন্তু অপচয় হিসেবে দান-সদকা করার কোনো বৈধতা নেই। ফলকথা 'দানের' ধরন ও রকম হতে বুঝা যাবে যে, দানকারিণীর উদ্দেশ্য কি?

لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا-এর তাৎপর্য : ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে لَا يَنْقُصُ-এর দ্বারা ছওয়াবের ভিতরে প্রতিবন্ধক না হওয়া বুঝানো হয়েছে অথবা একে অপরের সমান ছওয়াবের ভাগীদার বুঝাচ্ছে।

কাযী আয়ায (র.) বলেন, ছওয়াব আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। এটা অনুমান দ্বারা বুঝা বা আমলের দ্বারা আন্দাজ করা অসম্ভব। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে যতটা ইচ্ছা দান করেন। সুতরাং একই প্রচেষ্টায় সকলের ছওয়াব সমান হবে।

ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীসের এ উক্তির ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে অংশ গ্রহণ করবে, সে ছওয়াবেরও অংশীদার হবে। এখানে মূল ছওয়াবে অংশীদার হওয়াই বুঝাচ্ছে। এখানে ছওয়াবের কমবেশির হিসেবে হয়নি; বরং কম হোক বা বেশি হোক ছওয়াবের অংশীদার হওয়ার ই'তিবার করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٨٥٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করছেন, যখন কোনো মহিলা তার স্বামীর উপার্জন হতে তার অনুমতি ছাড়াই খরচ [দান] করে তবে তার ছওয়াব স্বামীর ছওয়াবের অর্ধেক হয়।

—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পূর্বে উল্লিখিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে পূর্ণ ছওয়াবের কথা বলা হয়েছে আর অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে অর্ধেক ছওয়াবের কথা। প্রকৃত কথা হলো, যদি স্ত্রী জানে যে, ছোট খাটো কোনো জিনিস দান করলে কিংবা গরিব-মিসকিনকে খানা খাওয়ালে স্বামী অসন্তুষ্ট হবে না, অথবা দেশ ও সমাজে এরূপ প্রথা আছে। যেমন তৎকালীন আরব দেশের প্রথা এরূপই ছিল, তখন স্ত্রী অর্ধেক ছওয়াব পাবে। অবশ্য স্পষ্টভাবে অনুমতি নিয়ে দান করলে তখন পূর্ণ ছওয়াবই হবে যদিও ইতোপূর্বে কোনো একদিন অনুমতি নিয়েই রাখে। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, যেখানে পূর্ণ ছওয়াবের কথা বলা হয়েছে তা এ অবস্থাতেই হবে।

وَعَنْ ١٨٥٣ أَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهٖ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهٖ نَفْسُهٗ فَيَدْفَعُهٗ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهٗ بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমান আমানতদার খাজাঞ্চি– যাকে [মালিক কর্তৃক] যে পরিমাণ মাল দানের নির্দেশ দেওয়া হয় সে তা মনের খুশির সাথে পুরোপুরিভাবে প্রদান করে আর সেই ব্যক্তিকেই প্রদান করে যাকে দেওয়ার জন্যে আদেশ করা হয়েছে। তবে সেও দাতাদের অন্যতম হিসেবে গণ্য হবে।

—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'খাজাঞ্চি' তখনই দাতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যখন তার মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি শর্ত পাওয়া যাবে। ১. মালিকের অনুমতিতে দান করবে। ২. সে পরিমাণ দান করার নির্দেশ দেওয়া হয় তা হতে কিছুই কম দিবে না; বরং পুরোপুরি তা-ই দিবে। ৩. প্রদানকালে তার মনে কোনো প্রকারের কুণ্ঠা থাকবে না; বরং সন্তুষ্টচিত্তে দান করবে এবং ৪. নিজের খুশিমতো যে কোনো গরিব-মিসকিনকে দিবে না; বরং মালিক যাকে দিতে বলবে কেবলমাত্র তাকেই দিবে। উল্লেখ্য যে, এখানে اَلْمُتَصَدِّقِيْنَ শব্দটি দ্বিবচন পড়লে মানিক ও খাজাঞ্চি এ দু'জনকে বুঝাবে আর বহুবচন পড়লে খাজাঞ্চিকে দাতাদের মধ্যে একজন বুঝাবে।

وَعَنْ ١٨٥٤ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৫৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদা এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, আর আমার ধারণা যদি তিনি কথা বলার শক্তি রাখতেন তবে কিছু দান করার আদেশ করে যেতেন, আমি যদি এখন তার পক্ষ হতে কিছু সদকা করি তার ছওয়াব হবে কি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মৃতের জন্যে সদকা ও দোয়া করা হলে এর ছওয়াব তার কাছে পৌঁছে, এটাই হক্কানী ওলামায়ে কেরামের অভিমত। অত্র হাদীসে তাই বুঝা যায়। কিন্তু নামাজ, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি শারীরিক ইবাদতের ছওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে কিনা, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো এর ছওয়াবও পৌঁছে থাকে, যেমনিভাবে দোয়া পৌঁছে। কিন্তু আল্লামা নববী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে বলেছেন, আর্থিক ও মালী সদকার ছওয়াব মৃতের কাছে পৌছার মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব কায়িক তথা বদনী ইবাদতের ন্যায় পৌঁছে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٥٥ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهٖ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا تُنْفِقُ اِمْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৮৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কোনো স্ত্রী তার স্বামীর ঘর হতে কোনো কিছু তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদ্যও নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খাদ্য তো হলো আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। —[তিরমিযী]

[এ হাদীস সংক্রান্ত আলোচনা অত্র পরিচ্ছেদের প্রথম হাদীসের সাথে করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আয়েশা ও আবূ উমামা (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও এর সমাধান : অত্র পরিচ্ছেদের প্রথম হাদীস যা হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তাতে স্ত্রীদেরকে দান-সদকা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং স্বামীর অনুমতির শর্তারোপ করা হয়নি। আর হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীসে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দান করতে নিষেধ করা হয়েছে– এ উভয় হাদীসের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ–

১. হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সে স্বাভাবিক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে স্বামীর অনুমতি স্বাভাবিকভাবেই থাকে এবং এ দানের জন্যে স্বামী কর্তৃক কৈফিয়ত তলব না করার পূর্ণ বিশ্বাস স্ত্রীর থাকে। আর আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি বিশেষ অবস্থার ও বিশেষ সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. অথবা, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর হাদীসটির অনেক পূর্বে বর্ণিত। সুতরাং দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা প্রথম হাদীসের সাধারণ বিধানকে শর্ত সাপেক্ষ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বামীর সম্পদ হতে কোনো কিছু ব্যয়ের জন্যে প্রকাশ্য বা মৌন অনুমোদন থাকার প্রয়োজন।

৩. অথবা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত সদকা জায়েজ হওয়া না হওয়া বিভিন্ন শহরের মানুষের অভ্যাসের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। যেমন– হিজাযের লোকদের স্বাভাবিক অভ্যাসই হলো ভিক্ষুক বা মেহমান আসলেই তাদের আপ্যায়ন করা এবং তাদের জন্যে কিছু ব্যয় করা। আবার অনেক শহরে এ নিয়ম নেই। হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস সেসব শহরের জন্যে প্রযোজ্য যেসব শহরের নারী পুরুষ সকলেই ভিক্ষুক ও মেহমান খাওয়ানোকে স্বাভাবিক নিয়ম মনে করে।

৪. অথবা খাদ্যদ্রব্য বা সামান্য কিছু দানের ব্যাপারে যাতে স্বামী সাধারণত মনে কিছু করেন না– এরূপ দানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি প্রযোজ্য। মূল্যবান কোনো বস্তু দান করতে স্বামীর অনুমোদন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর হাদীসটি প্রযোজ্য।

৫. অথবা গৃহকর্তা বা স্বামীর স্বভাব অনুসারে জায়েজ-নাজায়েজের বিভিন্নতা হবে। স্বামী যদি দানশীল স্বভাবের হন, তবে স্বভাবতই তিনি স্ত্রী কর্তৃক কিছু দান করলে আপত্তি করবেন না। এরূপ পরিবারের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে স্বামী কৃপণ হলে সে ক্ষেত্রে হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীস প্রযোজ্য।

وَعَنْ ١٨٥٦ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النِّسَاءَ قَامَتْ اِمْرَأَةٌ جَلِيْلَةٌ كَاَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا كُلٌّ عَلٰى اٰبَائِنَا وَاَبْنَائِنَا وَاَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ قَالَ الرُّطَبُ تَاْكُلْنَهٗ وَتُهْدِيْنَهٗ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৮৫৬. অনুবাদ : হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের বায়'আত গ্রহণ করতেছিলেন। তখন একজন বলিষ্ঠ গঠনের ভদ্র মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। সম্ভবত তিনি মুযার গোত্রের মহিলা হবেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা আমাদের পিতাদের, পুত্রদের এবং স্বামীদের উপরে বোঝা স্বরূপ। আমাদের পক্ষে তাদের মাল হতে গ্রহণ করা কি হালাল হবে? রাসূল ﷺ বললেন, তাজা খেজুর [সহজ পচনশীল মাল] তা তোমরা খেতেও পার এবং অপরকে উপহারও দিতে পার। —[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র হাদীসে اَلرُّطَبُ শব্দ দ্বারা সামান্য ফল-ফলাদি ও শস্য ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। এটা অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে নিজে গ্রহণ করা এবং অপরকে দান করা তথা বিলানো জায়েজ আছে। তৎকালীন আরব সমাজে এ রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও যে পরিবারে বা সমাজে এ প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে এরূপ করা মহিলাদের পক্ষে জায়েজ আছে। আল্লাহর শোকর যে, আমাদের বর্তমান সমাজেও এ প্রথা যথযথভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٥٧ عُمَيْرٍ مَوْلٰى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ اَمَرَنِىْ مَوْلَاىَ اَنْ اُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِىْ مِسْكِيْنٌ فَاَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذٰلِكَ مَوْلَاىَ فَضَرَبَنِىْ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ قَالَ يُعْطِىْ طَعَامِىْ بِغَيْرِ اَنْ اٰمُرَهُ فَقَالَ اَلْاَجْرُ بَيْنَكُمَا وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوْكًا فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِىْ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْاَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮৫৭. অনুবাদ : আবুল লাহমের গোলাম হযরত উমাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার মনিব আমাকে গোশত শুকাতে আদেশ করলেন। এ সময় আমার কাছে একজন মিসকিন আসল, তখন আমি তা হতে তাকে কিছু খাওয়ালাম। অতঃপর এ সংবাদ আমার মনিব জেনে আমাকে প্রহার করলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে এটা ব্যক্ত করলাম। রাসূল ﷺ তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তাকে মারলে? তিনি বললেন, সে আমার খাদ্য তাকে অনুমতি ব্যতীতই অন্যকে দান করেছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এর ছওয়াব তোমাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত উমাইর (রা.) বলেন, আমি গোলাম ছিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার মনিবের সম্পদ হতে কিছু দান করতে পারি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তার ছওয়াব তোমাদের উভয়ের মধ্যে আধা আধি ভাগ হবে। —[মুসলিম]

بَابُ مَنْ لَا يَعُوْدُ فِى الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : যে আপন সদকা ফিরিয়ে নেয় না

কাউকে কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরত নেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম। শরিয়তের বিধান ছাড়াও সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত কর্ম। হাদীসে এরূপ করাকে পাপ বলে আখ্যায়িত না করলেও একে হীন, নিচু ও জঘন্য মন্দ কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

বস্তুত দান করে তা ফেরত নেওয়া একটি লজ্জাজনক ব্যাপারও বটে আর তার থেকে এ দানকৃত বস্তু খরিদ করাও ঠিক নয়। কেননা, সে ব্যক্তি চক্ষু লজ্জায় পরে তা কম মূল্যেই বিক্রয় করে ফেলবে। কাজেই কোনো অবস্থাতেই দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়া সমীচীন নয়। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٨٥٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهٗ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَشْتَرِيَهٗ وَظَنَنْتُ اَنَّهٗ يَبِيْعُهٗ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهٖ وَلَا تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَهٗ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهٖ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৫৮. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলাম [অর্থাৎ ঘোড়া দান করেছিলাম] যার নিকট ঘোড়াটি ছিল সে তাকে [অযত্নে] নষ্ট করে ফেলল। আমি তাকে খরিদ করতে চাইলাম এবং মনে মনে ভাবলাম যে, সে এটা সস্তা বিক্রি করবে। এ বিষয়ে আমি রাসূলে কারীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তা ক্রয় করো না এবং তোমার সদকা তুমি ফেরত নিয়ো না, যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামে প্রদান করে। কেননা, নিজের সদকা ফেরত গ্রহণকারী হলো এমন কুকুরের ন্যায়, যে নিজের বমি পুনরায় খায়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তুমি তোমার সদকা ফিরিয়ে নিয়ো না। কেননা, যে আপন সদকা ফেরত নেয় সে যেন আপন বমি পুনরায় খায়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সদকার মাল পুনরায় ক্রয় করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : সদকার সম্পদ পুনরায় খরিদ করা জায়েজ আছে কিনা? এ বিষয়ে আহলে জাওয়াহেরও اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ : আহলে যাওয়াহিরের মতে সদকাকৃত সম্পদ পুনঃ ক্রয় করা যাবে না। যদি খরিদ করা হয় তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। তাদের দলিল উপরোল্লিখিত হাদীস।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَشَافِعِىْ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও কূফাবাসী ওলামায়ে কেরামের মতে, সদকা করা মাল পুনরায় খরিদ করা জায়েজ আছে; তবে মাকরূহে তানযীহীর সাথে। বেচাকেনা হয়ে গেলে তা বাতিল হবে না। কেননা, এ কাজের মধ্যে যে অপ্রিয়তা রয়েছে তা বিষয়টির নিজস্ব দোষে নয়; বরং অন্যের কারণে। তা হলো– সদকা গ্রহীতা সদকাদাতার কাছে মাল বিক্রয় করতে সদকাদাতার বিগত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তার কাছে কমদামে বিক্রয় করে থাকে। ফলে সদকাদাতা যতটা সস্তায় খরিদ করে ততটা পরিমাণই সে সদকাকৃত মাল ফেরত গ্রহণ করে। তথা চোখ লজ্জায় সদকাগ্রহীতা উচিত মূল্য হতে যে পরিমাণ কমে দাতাকে দিবে সে পরিমাণে দাতা আপন দান ফেরত গ্রহণকারী সাব্যস্ত হবে। এ জন্যেই এরূপ করা অপ্রিয় কাজ। নতুবা বেচাকেনা বাতিল হওয়ার মতো কোনো শর্ত এখানে পাওয়া যায় না।

আহলে জাওয়াহেরের দলিলের জবাব : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণিত হাদীসের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে ক্রয়ের মাধ্যমে সদকাকৃত মাল ফিরিয়ে আনাকে কুকুরের বমি করে পুনঃ ভক্ষণের সাথে তুলনা করে তা অপ্রিয় কাজ বলে বুঝানোই উদ্দেশ্য। কারণ, সামাজিকভাবেও তা দৃষ্টিকটু। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা মাকরূহে তানযীহী হতে পারে; মাকরূহে তাহরীমী নয়। প্রকৃতপক্ষে, হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারাই ইমাম আবূ হানীফা (র.), মালেক (র.), শাফেয়ী (র.) প্রমুখও দলিল গ্রহণ করেন।

১৮৫৯ وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَتْ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّىْ بِجَارِيَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ وَجَبَ اَجْرُكِ وَ رَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ صُوْمِىْ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّىْ عَنْهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮৫৯. অনুবাদ : হযরত বুরাইদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী কারীম ﷺ -এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকট আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাকে একটি বাঁদি দান করেছিলাম, তিনি মারা গিয়েছেন [মায়ের মিরাস হিসেবে বাঁদিটি পুনরায় আমারই পাওয়া সদকা ফিরিয়ে নেওয়ার অন্তর্গত কি না?] রাসূল ﷺ বললেন, তোমার ছওয়াব নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, আর তোমার উত্তারাধিকার তোমাকে তা ফিরিয়ে দিয়েছে। মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার একমাসের রোজা বাকি ছিল আমি কি তার পক্ষ হয়ে রোজা রাখব? রাসূল ﷺ বললেন হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে রোজা রাখবে। মহিলা আবারও বলল, তিনি কখনও হজ পালন করেননি, আমি কি তার পক্ষ হতে হজ পালন করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে হজ পালন করবে। —[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আমলের ছওয়াব পৌঁছানো যায় কিনা? মানুষ একজনের আমল দ্বারা অন্যকে ছওয়াব পৌঁছাতে পারে কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

মু'তাযিলাগণ বলেন, একজনের আমল দ্বারা অন্যকে ছওয়াব পৌঁছানো যায় না। তারা দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, আল্লাহ বলেছেন– لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى অর্থাৎ মানুষ নিজের প্রচেষ্টার ফল ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। সুতরাং অন্যের আমল দ্বারা সে ছওয়াবও পাবে না।

مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে– রোজা হোক বা নামাজ হোক মানুষ একজনের আমলের ছওয়াব অন্যকে পৌঁছাতে পারবে।

১. যেহেতু কুরআনের আয়াতেই দোয়ার দ্বারা পিতামাতাকে ছওয়াব পৌঁছানোর কথা রয়েছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا –
হযরত সা'দ ইবনে উবাদা হতে বর্ণিত, যখন তার মাতা মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি নবী কারীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তার পক্ষে সদকা করব? রাসূল ﷺ বললেন– হ্যাঁ।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমার নামাজের সাথে তোমার পিতামাতার জন্যে কিছু নামাজ পড় এবং তোমার রোজার সাথে তোমার পিতামাতার জন্যে রোজা রাখ এটা তোমার জন্যে নেকীর পরেও অতিরিক্ত নেকী। —[দারে কুতনী]
ইমাম শাফেয়ী (র.) ও মালেক (র.) নিছক শারীরিক ইবাদতকে বাদ দিয়েছেন– অত্র হাদীস দ্বারা তাদের অভিমতও বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ শারীরিক ইবাদতেও একজন অপর জনের জন্যে ছওয়াব পৌঁছাতে পারে।

৩. সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি তাজা দুম্বা কুরবানি করেছেন। একটি নিজের পক্ষ হতে এবং অপরটি তাঁর উম্মতের পক্ষ হতে।

৪. এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ একজন যে আরেকজনের আমল দ্বারা উপকৃত হবে, এ আয়াত এর অকাট্য প্রমাণ। এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে ফেরেশতাগণ কর্তৃক মু'মিনদের জন্যে এবং মু'মিনগণ কর্তৃক তাদের ভাইদের জন্যে ইসতিগফার অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়ার কথা প্রমাণিত আছে।

كِتَابُ الصَّوْمِ
অধ্যায় : রোজা

সওম বা রোজা শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টকর ইবাদত। এটি ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা এর ফরযিয়্যাত সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন–

১. পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা খোদাভীরুতা অবলম্বন করতে পার।

২. হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন–

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ - (اَلْحَدِيْثُ)

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত– ১. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। ২. নামাজ কায়েম করা, ৩. জাকাত দেওয়া, ৪. রোজা রাখা এবং ৫. হজ করা"।

৩. **ইজমা :** ইসলামের প্রথম যুগ হতে এ পর্যন্ত দলমত নির্বিশেষে সকল উম্মতই রোজা ফরজ বিশ্বাস করে এসেছেন, তা পালন করে এসেছেন এবং এর অস্বীকারকারীকে কাফের মনে করে এসেছেন।

৪. **কিয়াস :** আল্লাহ তা'আলা যে মানুষকে পানাহার করার ও যৌন ক্ষুধা মিটাবার সামগ্রী দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্যে তাঁর নির্দেশে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা হতে বিরত থাকা যুক্তিসঙ্গত কথা। আর এটা রোজার মাধ্যমেই সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, রোজা শুধু উম্মতে মোহাম্মদীর উপর ফরজ নয়; বরং রোজা সর্বযুগে সকল উম্মতের উপরই ফরজ ছিল। পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে مِنْ قَبْلِكُمْ দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তবে এটা বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি যে, কোন উম্মতের উপর কোন মাস বা কতদিন রোজা ফরজ ছিল?

١٨٦٠ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِيْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন রমজান মাস আসে তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে বন্দী করা হয়, অন্য এক বর্ণনায় আছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلصَّوْمُ-এর শাব্দিক ও শরয়ী পরিচিতি : صَوْمٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে صِيَامٌ এটা বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ নিম্নরূপ–

১. 'আল-মুরুযিল মুরাব্বা' কিতাবের হাশিয়ায় বলা হয়েছে–
ক. صَوْم মানে اَلصَّمْتُ বা চুপ থাকা। খ. اَلْكَفُّ বা রক্ষা করা এবং গ. اَلتَّرْكُ বা ছেড়ে দেওয়া।

২. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.)-এর মতে– اَلصَّوْمُ -এর অর্থ– اَلْإِمْسَاكُ عَنِ الْفِعْلِ তথা কাজ থেকে বিরত থাকা।

৩. আল্লামা জুরজানী (র.)-এর মতে, সাওম মানে হলো– اَلْإِمْسَاكُ عَنِ الْقَوْلِ وَغَيْرِهِ বা কথা ও অন্য কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। যেমন কুরআনের ভাষ্য– اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا

صَوْم -এর পারিভাষিক অর্থ : সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো–

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে–

اَلصَّوْمُ اِمْسَاكٌ مَخْصُوْصٌ فِىْ زَمَانٍ مَخْصُوْصٍ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوْصٍ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে কতিপয় নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।

২. আল-কামূসুল ফিকহীর ভাষ্য মতে– هُوَ اِمْسَاكٌ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا فِىْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوْصٍ

৩. আল্লামা জুরজানী (র.) বলেন– اَلصَّوْمُ هُوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْمَغْرِبِ مَعَ النِّيَّةِ

অর্থাৎ নিয়তের সাথে সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা।

রোজা ফরজ হওয়ার সময়কাল :

১. আল্লামা শামনী (র.) ও মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তনের পর মহানবী ﷺ -এর হিজরতের অষ্টাদশতম মাসে মহান আল্লাহ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আয়াতে কারীমা দ্বারা সাওমের বিধান ফরজ করেন।

২. আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরি দ্বিতীয় সনের শা'বান মাসে রমজানের সাওম ফরজ হয় এবং মহানবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় নয়টি রমজান লাভ করেন।

৩. কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম আশুরার সাওম ফরজ হয়েছে।

৪. আবার কেউ কেউ বলেন, রমজানের পূর্বে আইয়ামে বীযের সাওম ফরজ ছিল।

৫. আবার কেউ কেউ বলেন, রমজানের সাওমের পূর্বে কিছুই ফরজ ছিল না।

"فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ" -এর অর্থ : রাসূল ﷺ -এর উক্তি فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ অর্থাৎ রমজানের আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন–

১. কাযী আয়ায (র.) বলেন, উক্তিটি এর প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত অর্থের উপর নির্ভরশীল। এর দ্বারা রমজান মাসের আগমন, ইজ্জত ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. অথবা, উক্তিটি দ্বারা রমজান মাসে ছওয়াব ও ক্ষমার আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. অথবা, এর দ্বারা রমজান মাসে বান্দাদের জন্যে বদান্যতার দরজাসমূহ খুলে দেওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

৪. আল্লামা তুরেপুশ্‌তী (র.) বলেন, এর দ্বারা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ অবতীর্ণ হওয়ার এবং নেক আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. অথবা, এর দ্বারা রমজান মাসে জান্নাতের অমীয় শান্তির প্রবাহ দুনিয়ার দিকে প্রবাহিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ" -এর অর্থ : রাসূল ﷺ -এর উক্তি وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ -এর অর্থ রমজানের আগমনে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন–

১. কাযী আয়ায (র.) বলেন, উক্তিটি রমজান মাসের আগমন, ইজ্জত-সম্মান এবং শয়তানসমূহকে মু'মিনদের ক্ষতি সাধন হতে বিরত রাখার আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. অথবা, উক্তিটি দ্বারা শয়তানের কর্ম প্রতারণার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. অথবা, এর দ্বারা রোজাদারদের প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. অথবা, এর দ্বারা রমজান মাসে জাহান্নামের অশান্তি না থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. অথবা, এর দ্বারা সত্য সত্যই জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ-এর অর্থ : রাসূল ﷺ -এর বাণী– وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ অর্থাৎ রমজান মাস আগমন করলে শয়তানগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয়। হাদীস বিশারদগণের মতে এর মর্মার্থ হলো–

১. এখানে শয়তানের শৃঙ্খলবন্দী দ্বারা শয়তানের কর্ম তৎপরতাকে বুঝানো হয়েছে।

২. অথবা, মু'মিনদের ক্ষতি থেকে শয়তানের বিরত থাকার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩. অথবা, প্রকৃতই শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

৪. অথবা, সকলকে নয় একদল শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে– وَصُفِّدَتْ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيْطَانِ

৫. অথবা, এ উক্তি দ্বারা– تَقْلِيْلُ الْقَبَائِحِ وَالشُّرُوْرِ অর্থাৎ এ মাসে অন্যায়-অবিচার কম হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যখন শয়তান আবদ্ধ থাকে তখন কিভাবে মানুষ পাপ করে? রাসূল ﷺ -এর পবিত্র হাদীসে প্রমাণিত, রমজান মাসে শয়তানকে বন্দী করা হয়। শয়তান বন্দী থাকা সত্ত্বেও মানুষ কিভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয়? এ প্রশ্নের সমাধানে হাদীসবিদগণ বলেন–

১. ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, শয়তানের প্ররোচনার দ্বারা যেমন পাপাচার সংঘটিত হয়, তেমনি অপবিত্র আত্মা, কু-অভ্যাস ও মানুষরূপী শয়তান কর্তৃকও মানুষ পাপাচারে লিপ্ত থাকে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

١. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٢. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ -

২. সকল শয়তানকে নয় বরং কতিপয় শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। যেমন অন্য হাদীসের ভাষ্য–

وَصُفِّدَتْ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيْطَانِ

৩. অথবা, সকল শয়তানকেই বন্দী করা হয় তবে পূর্বে কৃত পাপাচারের প্রভাব রমজানেও চলতে থাকে।

৪. কেউ বলেন, রমজানে শয়তানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বন্ধ থাকলেও তার পরোক্ষ প্রভাবে গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে।

وَعَنْ ١٨٦١ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬১. অনুবাদ : হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান। ঐ দরজা দিয়ে শুধু রোজাদারগণই প্রবেশ করবেন।

—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'রাইয়্যান' নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত আছে, اَلرِّيُّ অর্থ– পরিতৃপ্ত হওয়া। অর্থাৎ রোজাদার যে স্থানে প্রবেশ করবেন, সেখানে অসংখ্য প্রবাহমান নহর, ফল-ফুলের বাগ-বাগিচা ও তৃপ্তিদায়ক বস্তুসমূহ বিদ্যমান থাকবে। অথবা রোজা অবস্থায় তারা ক্ষুৎ-পিপাসায় একেবারে কাতর হয়ে পড়েছিল, তাই এখন তাদেরকে পরিতৃপ্ত স্থানে প্রবেশ করানো হবে।

وَعَنْ ١٨٦٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখে তার পূর্বের সমুদয় গুনাহ [সগীরা] মাফ হবে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রমজানের রাতে ইবাদতে কাটাবে তারও পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কদরের রাত ইবাদতে কাটাবে তারও পূর্বকৃত সমুদয় গুনাহ মাফ করা হবে। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِحْتِسَابًا ও اِيْمَانًا-এর অর্থ :

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, اِيْمَانًا শব্দটি তারকীবে مَفْعُوْل ও حَال উভয়ই হতে পারে। مَفْعُوْل হিসেবে অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূল ﷺ -এর নিকট শরয়ী বিধিবিধান যা কিছু নাজিল করা হয়েছে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং রোজা যে বান্দার উপর ফরজ, তার প্রতিও দৃঢ় আস্থা পোষণ করা।
আর حَال হিসেবে অর্থ হবে– রোজা সম্পর্কে ঈমান রাখা এবং তা আল্লাহর সত্য আদেশ বলে বিশ্বাস করা।

২. কেউ কেউ বলেন, এখানে اِيْمَانًا-এর অর্থ হলো– هُوَ الْاِعْتِقَادُ لِحُصُوْلِ الثَّوَابِ অর্থাৎ ছওয়াব প্রাপ্তির প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা।

اِحْتِسَابًا-এর অর্থ : اِحْتِسَابًا-এর আভিধানিক অর্থ হলো– হিসেব করা, প্রত্যাশা করা, আস্থা রাখা। ব্যবহারিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মিশকাতের টীকায় বলা হয়েছে– طَلَبًا لِلثَّوَابِ অর্থাৎ ছওয়াবের প্রত্যাশা করা। এর মর্মার্থ হলো– আল্লাহ তা'আলার আদেশের ভিত্তিতে ছওয়াব লাভের আশায় রোজা পালন করা। লৌকিকতা বা লোক দেখানোর জন্যে নয়; বরং রোজা ফরজ হওয়ার কারণে নিঃশঙ্কচিত্তে তা পালন করা।

قِيَام رَمَضَان দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসে قِيَام رَمَضَان তথা রমজান মাসে জাগ্রত হওয়া দ্বারা রাত জেগে তারাবীহ ও নফল নামাজ আদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, নামাজের জন্যে قِيَام শর্ত আর قِيَام হচ্ছে নামাজের অন্যতম রুকন। এ জন্যে সরাসরি নামাজের কথা উল্লেখ না করে قِيَام رَمَضَان দ্বারা নামাজের কথা বুঝানো হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, হাদীসে قِيَام رَمَضَان দ্বারা বিশেষভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন– ১. ইবাদত, ২. আল্লাহর জিকির ও ৩. কুরআন তেলাওয়াত।

গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াব লাভের আশায় রমজান মাসের রোজা পালন করে, তার অতীতের সকল ذَنْب বা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সুতরাং হাদীসে ذَنْب বা গুনাহ দ্বারা কোন প্রকারের গুনাহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, হাদীসে ذَنْب বা গুনাহ দ্বারা সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কেননা, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। তবে রোজা পালনের সাথে তওবার নিয়ত করলে কবীরা গুনাহও মাফ পাওয়ার আশা করা যায়।

وَعَنْهُ ١٨٦٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ امْرُؤٌ صَائِمٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৬৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ হতে সাতশতগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়ে থাকে, আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম। কেননা, রোজা একমাত্র আমারই জন্যে রাখা হয়, আর আমিই এর প্রতিদান করব [আমার যত ইচ্ছা]। বান্দা আমারই জন্যে নিজের প্রবৃত্তি পানাহার পরিহার করে থাকে। রোজাদারের জন্যে দু'টি আনন্দ রয়েছে– একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি [পরকালে] তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের সুগন্ধি হতেও অধিক সুগন্ধময়। রোজা হলো ঢাল স্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারও রোজার দিন আসে, সে অশ্লীল কথাবার্তা বলবে না এবং গণ্ডগোল করবে না। তাকে যদি কেউ কটু কথা বলে অথবা লড়াই করতে চায়, তবে সে যেন বলে আমি একজন রোজাদার। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ -এর ব্যাখ্যা : সকল ইবাদতই তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে তারপরও তিনি কেন বললেন যে, اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ এর জবাবে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা আইনী (র.) বলেন, এখানে উক্তিটি দ্বারা রোজার অতিরিক্ত ছওয়াব দানের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ যে কাজের দায়িত্ব নেন, নিঃসন্দেহে তার প্রতিদান হবে অফুরন্ত।

২. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ স্বয়ং রোজার প্রতিদান দেবেন। কেননা, অন্যান্য ইবাদতের প্রতিদানের ভার অনেক সময় ফেরেশতাদের উপর ন্যস্ত থাকে।

৩. আবূ উবায়দা বলেন, রোজা ব্যতীত অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে রিয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু রোজার মধ্যে তা নেই। তাই এরূপ বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে– "قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَاءٌ

৪. আল্লামা জাওযী (র.) বলেন, অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে ধোঁকাবাজির সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু রোজা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই এ কথা বলা হয়েছে।

৫. কেউ কেউ বলেন, রোজার মর্যাদা ও সম্মানার্থে এরূপ বলা হয়েছে।

৬. কেউ কেউ বলেন, রোজার কারণে খাওয়া ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নামান্তর। তাই এরূপ বলা হয়েছে।

৭. অথবা, রোজা ছাড়া অন্যান্য ইবাদতগুলোর মধ্যে গায়রুল্লাহর উপাসনার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রোজার মধ্যে সে সম্ভাবনা থাকে না। তাই একথা বলা হয়েছে।

৮. কতিপয় আলেম বলেন, রোজা এমন একটা ইবাদত, যার ছাওয়াবের পরিমাণ কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জানা আছে। তাই একথা বলা হয়েছে।

৯. অথবা, এটা বলা যায় যে, রোজা ব্যতীত অন্যান্য সকল ইবাদত দ্বারা মজলুম বান্দাদের বিনিময় প্রদান করা হবে আর রোজার দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ লাভ হবে। এ জন্যে রোজাকে সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেমন– বায়হাকী (র.) ইবনে উয়াইনাহ হতে বর্ণনা করেন, "যখন কিয়ামতের দিন হবে, আল্লাহ তার বান্দার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন, তার আমল হতে মজলুমদের দাবি পূরণ করা হবে, এমনকি রোজা ব্যতীত তার কোনো আমলই বাকি থাকবে না। অবশেষে রোজা দ্বারাই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ الخ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ -এর বাণী– "রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশক আম্বরের সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট" এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন।

১. আল্লামা মাকরুযী (র.) বলেন, এখানে রূপকভাবে এ উক্তিটি করা হয়েছে। অর্থাৎ সুগন্ধিকে মানুষ যেভাবে কাছে টেনে নেয় তেমনি রোজাদারকে আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যের মাধ্যমে নিয়ামত দান করবেন।

২. কাযী আয়ায (র.) বলেন– اَلْمُرَادُ بِهٖ تَفُوْحُ رِيْحُ الطِّيْبِ مِنْ اَفْوَاهِ الصَّائِمِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
অর্থাৎ কিয়ামতের দিন রোজাদারের মুখ হতে সুগন্ধিযুক্ত বায়ু নির্গত হবে।

৩. কাযী আয়ায (র.) আরো বলেন, রোজাদার রোজার বিনিময়ে এ পরিমাণ ছওয়াব পাবে, যা মেশক হতেও উত্তম।

৪. আল্লামা বাগবী (র.) বলেন, مُرَادُ بِهِ الثَّنَاءُ عَلٰى صَائِمٍ وَالرِّضَاءُ بِفِعْلِهٖ অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রোজাদারের গুণকীর্তন করা এবং তার কাজের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি বুঝানো।

৫. ইবনে আরাবী ও মাওয়ারদী (র.) বলেন, এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রোজাদারের মুখের গন্ধ ঐ মেশক হতেও উত্তম, যা উত্তম কোনো জনসমাবেশে, ঈদ উৎসবে এবং জিকিরের মজলিসে ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ -এর মর্মার্থ : جُنَّةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ঢাল, পর্দা, প্রতিরক্ষা, হাতিয়ার, রক্ষাকবচ, প্রতিরোধক ইত্যাদি। হাদীসে উল্লিখিত "রোজা প্রতিরক্ষা হাতিয়ার" এর মর্মার্থ নিম্নরূপ–

১. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন– اَلْمُرَادُ بِهٖ اَنَّهٗ حِجَابٌ وَحِصْنٌ لِلصَّائِمِ مِنَ الْمَعَاصِيْ فِي الدُّنْيَا وَمِنَ النَّارِ فِي الْاٰخِرَةِ
অর্থাৎ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রোজা রোজাদারের জন্যে পার্থিব জীবনে অন্যায় থেকে এবং পরকালীন জীবনে নরকাগ্নি থেকে বাঁচার ঢাল স্বরূপ।

২. কাযী আয়ায (র.) বলেন– إِنَّ الصَّوْمَ يَسْتُرُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنْهُمَا مَعًا
অর্থাৎ, রোজা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ থেকে রক্ষা করে, তাই একে جُنَّةٌ বলা হয়েছে।

৩. আল্লামা আইনী (র.) বলেন, পাশবিকতার কারণে মানুষ দোজখে ধাবিত হয় বিধায় রোজার উদ্দেশ্য হলো পাশবিক শক্তির কামনা-বাসনাকে দমন করা। হাদীসে এসেছে– حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ

রোজাদারের মিসওয়াক করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : রোজার দিন রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করার হুকুম কি? এ বিষয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে, রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েজ। অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদ ও আলেম-ওলামা এ মত সমর্থন করেছেন।
দলিল :
عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لَا أُحْصِىْ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ) ـ

২. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, রোজা অবস্থায় দ্বিপ্রহরের পর মিসওয়াক করা মাকরুহ।
দলিল :
فِىْ حَدِيْثِ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ "وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ـ
সুতরাং মিসওয়াক করলে মুখের গন্ধ থাকে না বলে রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরুহ।

৩. আল্লামা মাযহারী (র.) বলেন, রোজাদারের জন্যে সমগ্র দিনে মিসওয়াক করায় রোজার কোনো ক্ষতি হয় না; বরং অধিকাংশ আলেমের মতে তা সুন্নত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১৮٦٤ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِىْ مُنَادٍ يَا بَاغِىَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِىَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَ ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ـ

১৮৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন রমজান মাসের প্রথম রাত হয় শয়তান ও অবাধ্য জিনিসমূহকে শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতঃপর এর একটি দরজাও খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, অতঃপর এর একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। এক আহবানকারী আহবান করতে থাকেন, হে পুণ্যের অন্বেষণকারী! সম্মুখে 'অগ্রসর হও', আর হে মন্দের অন্বেষণকারী! 'থেমে যাও'। এ মাসে আল্লাহ তা'আলা অনেককে দোজখের অগ্নি হতে মুক্তি দেন আর এটা প্রত্যেক রাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।—[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম আহমদ (র.) এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন। তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রমজান মাসে কোনো কাফের ফাসেক মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম কি? : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, রমজান মাসে কোনো কাফের ফাসেক মৃত্যুবরণ করলে তারাও বেহেশতে প্রবেশ করবে। আসলে ব্যাপারটি কি এমন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন–

১. আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, মূলত হাদীসখানি রমজান মাসের সম্মান-মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা উপরিউক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২. 'লামিআত' গ্রন্থকার বলেন, হাদীসের বক্তব্যটি মু'মিনদের জন্যে নির্দিষ্ট। এটি কাফের ফাসেকদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

৩. কেউ কেউ বলেন, কাফেররা চির জাহান্নামী। এ ব্যাপারে কুরআন শরীফের বক্তব্য সুস্পষ্ট। যেমন–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

সুতরাং কাফেরদের বেহেশতে প্রবেশের কল্পনাই করা যায় না। আর ফাসেকরা তাদের পাপানুযায়ী শাস্তি ভোগ করে পরিশেষে জান্নাতে যাবার সুযোগ লাভ করবে।

৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, হাদীসের ব্যাখ্যানুযায়ী দুই শ্রেণীর লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা হলেন–
ক. যারা রমজান মাসে সিয়াম সাধনায় রত থেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।
খ. যেসব মু'মিন বান্দা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, অথচ রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করেছে।

৫. কেউ কেউ বলেন, রমজান মাসের ফজিলত তাদেরই জন্যে নির্দিষ্ট যারা মু'মিন। যাদের মধ্যে ঈমান নেই তাদের জন্যে রমজান মাসের কোনো ফজিলত নেই।

৬. আল্লামা দেহলবী (র.) বলেন, হাদীসে রমজান মাসের ছওয়াবের আধিক্য ও জান্নাতে প্রবেশের সহজ পন্থার কথা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যারা ছওয়াবের কাজ করবে, তাদের জন্যেই জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ থাকবে।

৭. কেউ কেউ বলেন, জান্নাত লাভ করার জন্যে ঈমান শর্ত। সুতরাং কোনো কাফের রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করলেও সে জান্নাত লাভ করবে না।

قَوْلُهُ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَ مَرَدَةُ الْجِنِّ **-এর বিশ্লেষণ :** মানুষের মধ্যে যেমন ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর লোক রয়েছে, অনুরূপভাবে জিন সম্প্রদায়েও উভয় শ্রেণী রয়েছে। مَرَدَةٌ অর্থ– নাফরমান, অবাধ্য। এটা বহুবচন, একবচনে مَارِدٌ অর্থ– মানুষকে বিপথগামী করা ও বিপর্যয়ে ফেলার জন্যে যে জিন নিয়োজিত রয়েছে, সেই জিন শয়তান। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে– শয়তান অন্যান্য মাসে মানুষকে যেরকম বিপথগামী করে বিভ্রান্তিতে পতিত করে রমজান মাসে তা করতে পারে না। কেননা, মানুষের অধিকাংশ পাপ প্রবৃত্তির তাড়না ও যৌন ক্ষুধার দরুন সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান রমজান মাসে রোজায় মশগুল থাকে বিধায় শয়তান সে সুযোগ পায় না। কেননা, রোজা প্রবৃত্তিকে সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। এটাই হলো, 'শয়তানকে শৃঙ্খল আবদ্ধ করার অর্থ'।

শরিয়তে রোজার বিধান প্রবর্তনের হিকমত : ইসলামি শরিয়তে রোজার বিধান প্রবর্তনের পিছনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিকমত বিদ্যমান। যেমন–

১. রোজার মাধ্যমে বান্দা তাকওয়া অর্জন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

২. শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হলো রোজা। হাদীসে এসেছে– اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

৩. রোজা পালনের মাধ্যমে গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ـ

৪. রোজা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। রাসূলের উক্তি– بَابُ الْجَنَّةِ مِنْ اَبْوَابِهَا الرَّيَّانُ لَايَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّائِمُوْنَ ـ

৫. রোজা আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের পন্থা। হাদীসে কুদসী– اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِه ـ

৬. রোজার মাধ্যমে অবারিত রহমত লাভ করা যায়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে– فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ

৭. কুরআন নাজিলের মাস রমজান। রোজার মাধ্যমে কুরআনের ফয়েয লাভ করা যায়। কুরআনের ভাষ্য– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

৮. বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টিতে রোজার বিকল্প নেই।

৯. দুঃখী মানুষের দুঃখ অনুভব করা যায়।

১০. রোজা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত করে।

১১. রোজা চরিত্র হননকারী কুপ্রবৃত্তির দমন ঘটায়।

১২. রোজা বিভিন্ন রোগ জীবাণু ধ্বংস করে শারীরিক সুস্থতা আনয়ন করে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٦٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ)

১৮৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের নিকট রমজানের বরকতময় মাস এসেছে। এর রোজা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ রাখা হয়। এতে অবাধ্য শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। আল্লাহর রহমতের জন্য এতে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস [৮৩ বছর ৪ মাস] অপেক্ষাও শ্রেয়। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে সে প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত হয়েছে। —[আহমাদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ **-এর ব্যাখ্যা :** 'আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়' এর অর্থ আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়া। মানুষ রমজান মাসে পুণ্য কাজ করে, ফলে তাদের আমলনামা ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে নিয়ে যান. এ জন্যে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া দ্বারা ইবাদত কবুল হওয়ার অর্থও হতে পারে।

"قَوْلُهُ "تُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ **-এর মর্মার্থ :** "জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়" বাক্য দ্বারা রূপকভাবে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ মাসে মানুষ খুব কম গুনাহ করে। ফলে মানুষ জাহান্নামে যায় না এবং জাহান্নামের দরজা খোলার প্রয়োজন হয় না। এ মাসে রোজার ফলে সাগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। তবে এটা খুবই দুর্বল ব্যাখ্যা। যেহেতু প্রশ্ন জাগতে পারে যে, জাহান্নামের প্রবেশ তো মৃত্যুর পরে হবে। এর পূর্বেই দরজা বন্ধ রাখাতে লাভ কি? বরং যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এই যে. যদি কেউ রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করে, তবে এ রমজান মাসের সম্মানের কারণে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয় না।

قَوْلُهُ تُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ **-এর তাৎপর্য :** "এতে অবাধ্য শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়", পক্ষান্তরে পূর্বে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে শুধু "শয়তানকে' শৃঙ্খলিত করা হয় বলা হয়েছে।

আপাত দৃষ্টিতে উভয় হাদীসে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এর জবাব হচ্ছে– অবাধ্য শয়তান বলতে এখানে পাপী লোক [যারা নিজেদের প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়] তাদেরকেও বুঝানো হয়েছে। কারণ, রমজানে তারাও কম গুনাহ করে। এ জন্যে রূপক হিসেবে তাদেরকে বন্দী করা হয় বলা হয়েছে। আর শুধু শয়তানদেরকে বন্দী করার কথা যে হাদীসে বলা হয়েছে তার অর্থ হবে– শয়তান কর্তৃক নেককার লোকদেরকে প্রতারণা করা হতে বিরত রাখা হয়। ফলে তারা কবিরা গুনাহ হতে ফিরে থাকে। যদি কদাচিৎ গুনাহ করেও বসে তবে সাথে সাথে তওবা করে সংশোধন করে নেয়।

হাজার মাস হতে উত্তম রাত কোনটি : হাজার মাস হতে উত্তম রাত হলো কদরের রাত। তবে কদরের রাত কোনটি সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। এ কারণে এই রাতটি নির্ধারণের ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেছেন, লাইলাতুল-কদর দু'টি। একটি হলো, শাবান মাসের পনের তারিখ। এ রাতকে লাইলাতুল-বারাআতও বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি হলো, রমজান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো এক রাত।
২. হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও ইকরামা (রা.) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, কদরের রাত সারা বছরের মধ্যে যে কোনো এক রাত। হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদ কাযী খান ও আবূ বকর রাযী (র.) বলেছেন, এটাই হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত।
৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, কদরের রাত রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত। তবে এর জন্যে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই।
৪. শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, রমজানের শেষ দশকের প্রথম রাতই কদরের রাত।

৫. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বর্ণনা করেছেন, এটা রমজানের ১৭ তারিখ রাতে হয়।
৬. ইবনে আবী শায়বা, মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, কদরের রাত রমজানের ২৩ তম রাত।
৭. হযরত ইবনে মাসউদ, শা'বী, হাসান বসরী ও কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রমজানের ২৪ তারিখ কদরের রাত।
৮. ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদসহ (র.) অধিকাংশ আলেমের মতে, রমজানের ২৭তম রাত্রিই লাইলাতুল কদর।

আকলী দলিল : সূরাতুল কদর-এ لَيْلَةُ الْقَدْرِ পদটি তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মোট নয়টি হরফ। সুতরাং ৯ কে ৩ দ্বারা গুণ করলে গুণফল ২৭ হয়। কাজেই লাইলাতুল কদর রমজানের ২৭ তম রাত হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৯. অধিকাংশ ইমামের মতে, রমজানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোর যে কোনো একটি লাইলাতুল কদর। এতে কোনো সংশয় নেই।

দলিল : হাদীস- عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (اَلْبُخَارِيُّ)

وَعَنْ ١٨٦٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৮৬৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রোজা এবং কুরআন [কিয়ামতের দিন] বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। রোজা বলবে- হে প্রতিপালক! আমি তাকে খাদ্য ও কাম প্রবৃত্তি হতে দিনের বেলায় বাধা প্রদান করেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, [হে পরওয়ারদিগার!] আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম হতে বাধা প্রদান করেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তখন উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।
—[বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরআন ও রোজার সুপারিশের ধরন : উক্ত হাদীসে সিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রমজানের রোজা। আর কুরআন দ্বারা কিরাআত উদ্দেশ্য।

- আল্লামা তীবী (র.)-এর মতে, কুরআন উল্লেখের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ নামাজ বুঝানো হয়েছে। কুরআনে এর ব্যবহার আছে। যেমন- وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, রোজা ও কুরআন বান্দার জন্যে কিয়ামতের কঠিন বিপদের সময় সুপারিশ করবে। অথচ রোজা এবং কুরআনের মুখ নেই, তাহলে তারা কিভাবে সুপারিশ করবে? এর উত্তরে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন-

১. আল্লাহ তা'আলা বিশেষ পন্থায় রোজা ও কুরআনকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। ফলে তারা সুপারিশ করবে।
২. অথবা, কিয়ামতের দিন তাদের আকৃতি, মুখ ও ভাষা প্রদান করা হবে।
৩. অথবা, তাদের উভয়কে রূপক ও প্রতীকী ভাষা প্রদান করা হবে, যাতে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই করতে সক্ষম। কুরআনের ভাষায়- اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - অন্যত্র বলা হয়েছে- وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, সেদিন হাত-পা তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা কিছু করেছে তা তারা সাক্ষ্য দিবে। আলোচ্য হাদীসে এরূপ কথাই বলা হয়েছে।

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ **-এর তাৎপর্য :** এখানে صِيَام দ্বারা রমজানের রোজা উদ্দেশ্য আর اَلْقُرْاٰنُ দ্বারা قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ বা কুরআন পঠন উদ্দেশ্য। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে قُرْاٰن বলে তাহাজ্জুদ নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, কুরআন মাজীদের অন্যত্রও قُرْاٰن বলে নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ; মোট কথা, রোজা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার মুক্তির জন্যে সুপারিশ করবে। বস্তুত এ সুপারিশ প্রকৃত অর্থেও হতে পারে, আবার রূপক অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ এ রোজা ও কুরআন পঠন বা নামাজ পরকালীন জীবনে মুক্তির কারণ হবে।

وَعَنْ ١٨٦٧ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৮৬৭. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রমজান মাস আসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ মাস তোমাদের কাছে এসেছে, এতে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস হতেও শ্রেয়। যে ব্যক্তি তা হতে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল প্রকার কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হয়েছে। মূলত এর কল্যাণ হতে চিরবঞ্চিত ব্যক্তিরাই বঞ্চিত হয়। —[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٨٦٨ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (رضـ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهٖ وَعِتْقَ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِي اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَاُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ اَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ -

১৮৬৮. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারিসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার শা'বান মাসের শেষ দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন, রাসূল ﷺ বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের উপরে এক মহান মাস এক কল্যাণময় মা ছায়া বিস্তার করেছে। এটা এমন মাস, যাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেয়। আল্লাহ তা'আলা [তোমাদের জন্যে] এ মাসের রোজাকে ফরজ করেছেন এবং রাতে নামাজ পড়াকে নফল করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে আল্লাহর [নৈকট্য] চেয়ে একটি নেক কাজ করবে সে ঐ ব্যক্তির সমান হবে, যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করছে। এটা ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্য এমন একটি গুণ যার প্রতিদান [ছওয়াব] হলো জান্নাত। এটা পারস্পরিক সহানুভূতির মাস। এটা ঐ মাস যাতে মু'মিন ব্যক্তির রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে এটা তার পক্ষে তার গুনাহসমূহের জন্যে ক্ষমা স্বরূপ হবে এবং তার নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তির কারণ হবে। আর তাকে রোজাদারের সমান ছওয়াব দান করা হবে; এতে তার ছওয়াব হতে কিছুই কমানো হবে না। রাবী বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তো এমন সামর্থ্য রাখে না, যা দ্বারা রোজাদারকে ইফতার করাতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ ছওয়াব ঐ ব্যক্তিকেও দান করেন যে কোনো রোজাদারকে এক ঢোঁক দুধ দ্বারা, একটি খেজুর দ্বারা অথবা এক ঢোঁক পানি দ্বারা ইফ্‌তার করায়। যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে পরিতৃপ্তির সাথে ভোজন করায় আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাউজ [কাউসার] হতে পানীয় পান করাবেন। ফলে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। এটা এমন একটি মাস– যার প্রথম অংশ রহমত, মধ্যম অংশ ক্ষমা এবং শেষ অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তির। যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের দাস-দাসীদের কর্মভার হালকা করে দিবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ -এর ব্যাখ্যা : (مُوَاسَاةٌ) মূলে ছিল مَاسَاةٌ এখানে হাম্‌যাকে ওয়াও দ্বারা সহজ উচ্চারণের লক্ষ্যে পরিবর্তন করে مُوَاسَاةٌ করা হয়েছে। অর্থ– পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশ করা। সাধারণত খাদ্য-দ্রব্যের এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনে রমজান মাসে বিলি-বণ্টনের মধ্যে কেউই কার্পণ্য করে না। প্রশস্ত হৃদয়ে একে অন্যকে শরিক করে। মোটকথা, দান-সদকায় এবং পরোপকারিতায় প্রতিটি মানুষ আনন্দ পায়। বিশেষ করে প্রতিবেশী ও ফকির-মিসকিনের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করার জন্য আলোচ্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

شَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ -এর ব্যাখ্যা : এটা সে মাস যাতে মু'মিনের রিজিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। এ বৃদ্ধি প্রকাশ্যভাবেও হতে পারে আবার অপ্রকাশ্যও হতে পারে। প্রকাশ্যভাবে হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, মু'মিন ধনী হোক, কিংবা গরিব হোক, অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান মাসে কষ্ট করে হলেও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন একটু প্রশস্ততার সাথে করে। আর এটাকেই রিজিক বৃদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অথবা এর মর্ম হচ্ছে– অদৃশ্যভাবে রিজিকের মধ্যে বরকত দান করা হয়। অথবা, এর মর্ম এই যে, রোজার বরকতে পরকালীন জীবনে তাকে প্রশস্ততা দান করা হবে।

وَعَنْ ١٨٦٩ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ اَطْلَقَ كُلَّ اَسِيْرٍ وَاَعْطٰى كُلَّ سَائِلٍ -

১৮৬৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রমজান মাস আসত, তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল বান্দীকে মুক্ত করে দিতেন এবং সকল সওয়ালকারীকেই দান করতেন।

وَعَنْ ١٨٧٠ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ اِلٰى حَوْلٍ قَابِلٍ قَالَ فَاِذَا كَانَ اَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَيَقُلْنَ يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ اَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ اَعْيُنُنَا وَتَقَرُّ اَعْيُنُهُمْ بِنَا - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৮৭০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বছরের প্রথম হতে পরের সন পর্যন্ত রমজানের জন্যে জান্নাত সাজানো হয়ে থাকে। অতঃপর যখন রমজান মাসের প্রথম দিন হয় তখন আরশের নিচে জান্নাতের গাছের পাতা হতে ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের প্রতি এক হাওয়া প্রবাহিত হয়। এখন তারা [হুরগণ] বলেন, হে প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের মধ্য হতে আমাদের জন্যে এমন স্বামীগণ নির্ধারণ করুন যাদের দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হবে, আর আমাদের দেখে তাদের চক্ষু শীতল হবে। —[উপরিউক্ত তিনটি হাদীস ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ١٨٧١ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِاُمَّتِهٖ فِيْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى اَجْرَهٗ اِذَا قَضٰى عَمَلَهٗ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৮৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তাঁর উম্মতকে রমজান মাসের শেষ রাতে ক্ষমা করা হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি কদরের রাত? রাসূল ﷺ বললেন, না; বরং কর্মচারীকে তার পারিশ্রমিক দেওয়া হয় যখনই সে তার কর্ম সম্পন্ন করে [যেহেতু এ রাতে রোজাদারের কর্ম সম্পন্ন হয়]। –[আহমাদ]

আরবি মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। সাধারণত চাঁদকে আরবিতে قَمَرٌ বলে থাকে, তবে পূর্ণিমার তথা ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের চাঁদকে বলে بَدْرٌ আর নতুন চাঁদকে তথা প্রথম তারিখ হতে তিন দিন পর্যন্ত চাঁদকে বলা হয় هِلَالٌ আর অন্যান্য দিবসের চাঁদকে বলে قَمَرٌ। উল্লেখ্য هِلَالٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করা, নতুন চাঁদ আসমানে উদিত হলে চতুর্দিক থেকে মানুষ আনন্দে চিৎকার করে উঠে বলে একে 'হিলাল' বলা হয়। এখানে رُؤْيَةُ الْهِلَالِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রমজানের প্রথম তারিখের চাঁদ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমজান মাসকে পায় সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। আর এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, চাঁদ দেখা ব্যতীত মাস শুরু হয় না। মহানবী ﷺ বলেছেন– صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ অর্থাৎ তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়বে। কাজেই রমজান শুরু হওয়ার সাথে সাথেই রোজা রাখা শুরু করতে হবে; কোনো অবস্থাতেই এর বিপরীত করা যাবে না। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٧٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهٗ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلٰثِيْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৭২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– [রমজান মাসের] চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোজা রেখো না। আর [শাওয়াল মাসের] চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ইফতার করে না। আকাশ মেঘলা থাকার দরুন যদি চাঁদ তোমাদের থেকে গোপন থাকে তবে [শা'বান] মাসের দিনগুলো পূর্ণ করবে। অপর বর্ণনায় আছে– নবী করীম ﷺ বলেছেন, মাস কখনও ঊনত্রিশ রাতে [দিনে]ও হয়। সুতরাং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোজা রাখবে না। যদি মেঘলা আকাশের কারণে চাঁদ তোমাদের থেকে গোপন থাকে তবে [শা'বান মাস] ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ রমজানের রোজা শুরু করা এবং রমজান শেষে এক মাস পর রোজার সিলসিলা ভঙ্গ করে ইফতার করার ব্যাপারে উভয় অবস্থায় চাঁদ দেখার তথা চাঁদ উদয় হওয়ার প্রমাণ সাপেক্ষে শর্ত রেখেছেন। যদি কোনো কারণে চাঁদ দেখা না যায়, তখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সে নির্দেশ বা পরামর্শও দিয়েছেন।

চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আলোচ্য হাদীস দ্বারা রমজানের শুরু ও শেষ সীমানার বিষয়টিকে চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সাওম পালনের ও সাওম ভঙ্গ করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। তাই চাঁদ দেখা কিভাবে প্রমাণিত হবে? এ ব্যাপারে নিম্নে আলোকপাত করা হলো। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে চাঁদের উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমজানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে একজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কিন্তু উদয়স্থল পরিষ্কার থাকলে বহু লোকের চাঁদ দেখা শর্ত। তারা তাদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

দলিল : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْهِلَالَ - (اَلْحَدِيْثُ)

২. ইমাম আহমদের মতে, রমজানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে একজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। চাঁদের উদয়স্থল পরিষ্কার থাকুক কিংবা মেঘাচ্ছন্ন থাকুক।

৩. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, شَوَّالٌ মাসের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে কমপক্ষে দু'জন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি।

৪. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন−

وَاَمَّا مَنْ رَاٰهُ وَحْدَهٗ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهٖ اَوْ لَمْ يُقْبَلْ اَوْ اَخْبَرَهٗ بِهٖ مَنْ اِعْتَمَدَ صِدْقَهٗ فَيَلْزَمُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضٰى رُؤْيَتِهٖ وَاِنْ لَمْ تَثْبُتْ رَمَضَانُ وَلَا شَوَّالٌ عَلَى الْعُمُوْمِ -

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, ইমাম মালেক (র.)-এর মতটিই জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত। −[মিরকাত]

فَاقْدُرُوْا لَهٗ-এর মর্মার্থ : রাসূল ﷺ -এর বাণী− "فَاقْدُرُوْا لَهٗ" -এর মর্মার্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন উক্তি প্রদান করেন। যথা−

১. আল্লামা ইবনে জুরাইজ (র.) বলেন, এটার অর্থ হলো− قَدِّرُوْهُ بِحِسَابِ الْمَنَازِلِ

২. আল্লামা তীবী (র.)-এর মতে, তোমরা যে মাসে অবস্থান করছ সে মাসটি অর্থাৎ শা'বান মাসটি কত দিনে তা পূর্বের মাসসমূহ হিসাব-নিকাশ কর এবং অনুমান করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। অর্থাৎ ত্রিশ দিনে হওয়াটাই আসল কথা। সুতরাং শা'বান মাসকে ত্রিশ দিনেই গণনা কর।

৩. ইমাম মালেক (র.), শাফেয়ী ও আবূ হানীফা (র.) প্রমুখের মতে, এখানে "فَاقْدُرُوْا لَهٗ" -এর অর্থ হলো− শা'বান মাসকে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

৪. ইমাম যুরকানী (র.)-এর মতে− حَقِّقُوْا تَقَادِيْرَ اَيَّامِ شَعْبَانَ حَتّٰى تُكَمِّلُوْهُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

৫. আল্লামা ইমাম নববী (র.) এর অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন−

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِىْ مَعْنٰى فَاقْدُرُوْا لَهٗ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَعْنَاهُ ضَيِّقُوْا لَهٗ وَقَدِّرُوْهُ تَحْتَ السَّحَابِ وَمِمَّنْ قَالَ هٰذَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهٗ مَنْ يُجَوِّزُ صَوْمَ يَوْمِ لَيْلَةِ الْغَيْمِ عَنْ رَمَضَانَ -

فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে রমজান মাসের চাঁদ দেখা না গেলে রাসূল ﷺ শা'বান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করতে বলেছেন। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন−

১. শা'বান মাস সাধারণত ২৯ দিনে হয়। তাই ঐদিন রমজানের চাঁদ দেখা যাবে। তারপর তোমরা রোজা রাখবে। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাসকে ৩০ দিনে পূর্ণ করে তারপর দিন থেকে রোজা রাখবে।

২. অথবা, শা'বান মাস ৩০ দিনে হয়, তবে কখনো ২৯ দিনেও হতে পারে। তাই ঐদিন যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে রোজা রাখবে। অন্যথায় ৩০ দিন পূর্ণ করবে। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে−

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ -

---

وَعَنْ ١٨٧٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়বে। যদি মেঘলা আকাশ চাঁদকে তোমাদের থেকে গোপন করে রাখে তবে শা'বান মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করবে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ। এখানে لِرُؤْيَتِهٖ-এর لَامْ এর বর্ণটি কারণবোধক। অর্থাৎ চাঁদ দেখার কারণে তোমরা রোজা রাখ।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে لَام বর্ণটি وَقْت বা সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ বাক্যে لَام বর্ণটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা চাঁদ দেখার সময় রোজা রাখ। তবে এখানে لَام বর্ণটি بَعْد বা পরে অর্থেও ব্যবহৃত হওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ তোমরা চাঁদ দেখার পর রোজা রাখ।

উল্লেখ্য যে, رُؤْيَة শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক. স্বচক্ষে দেখা খ. জ্ঞানের উপলব্ধি ও গ. স্বপ্নের অনুভূতি। তবে এখানে শব্দটি প্রথম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখ।

'চাঁদ দেখা' সম্পর্কে বিধান : আলোচ্য হাদীসে চাঁদ দেখা অর্থে মূলত رُؤْيَة শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ চর্মচোখে দেখা। কখনও জ্ঞান চোখে দেখা বা স্বপ্নে দেখাকেও 'রূইয়াত' বলা হয়। তবে এখানে এটা প্রথম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। رُؤْيَة هِلَال বা নতুন চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিধানগুলো নিম্নরূপ-

১. ২৯ তারিখে আকাশে চাঁদ এমন স্থানে থাকতে হবে যেখানে থাকলে তা চর্ম চোখে দেখা সম্ভব হয়। সুতরাং কোনো উঁচু স্থানে উঠে যেমন- পাহাড়ে উঠে বা হেলিকপ্টারে চড়ে নিচের চাঁদ দেখলে চলবে না।

২. আবার চাঁদ যথাস্থানে থাকলেও যদি তা চর্মচোখে দেখা না যায় বা যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় তাতেও চলবে না। কারণ, হাদীসে চর্মচোখের কথাই বলা হয়েছে। যেহেতু এটাই হলো সর্বযুগের সর্বস্থানের মানুষের জন্যে সহজতম উপায়। যান্ত্রিক উপায়ে চাঁদ দেখা সর্বত্র সহজ নয়।

৩. মূলকথা হলো যদি চাঁদ উঠে থাকে আর মেঘলা আকাশের দরুন তা দেখা না যায়, ফলে রোজা একটি কম হয় তাতে কোনো পাপ নেই। তবে পরে যদি জানা যায় যে, আশে-পাশে কোথাও ঐ দিন চাঁদ দেখা গিয়েছিল তাহলে ঐ দিনের রোজা কাজা করতে হবে। যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদ দেখে রোজা রাখা বা অনুমান করে রোজা রাখা অপেক্ষা শরিয়তের দৃষ্টিতে এটাই সহজ পথ।

١٨٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَعَقَدَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِىْ تَمَامَ الثَّلٰثِيْنَ يَعْنِىْ مَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلٰثِيْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৭৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমরা নিরক্ষর জাতি। ফলে আমরা লিখতে পারি না, হিসাবও রাখতে জানি না। মাস হয় এই, এই ও এতে [এ বলে তিনি দু'হাতের আঙ্গুলগুলো তিনবার দেখালেন] তৃতীয় বারে তিনি নিজের [একটি] বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ রাখলেন। অতঃপর আবার বললেন, মাস হয় এই, এই ও এতে। [দুই হাতের দশ আঙ্গুল তিনবার দেখালেন] অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনে তথা একবার উনত্রিশ দিনে আর একবার ত্রিশ দিনে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ-এর তাৎপর্য : এখানে اُمِّيَّةٌ বলে اُمَّةُ الْعَرَبِ বা আরব জাতিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তৎকালীন আরবের লোকেরা লিখতে বা পড়তে জানত না। তাই রাসূল ﷺ বলেছেন, আমরা উম্মী বা নিরক্ষর জাতি।

অথবা, اُمِّيَّةٌ বলে اُمّ [মা] -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের মা যে অবস্থায় আমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন, তথা আমরা লেখাপড়া কিছুই জানতাম না, এখনও ঠিক সে অবস্থায় আছি।

অথবা, এখানে اُمِّيَّةٌ বলে اُمُّ الْقُرٰى তথা মক্কাভূমিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমরা মক্কা অধিবাসী, আমরা লেখাপড়া জানি না। পবিত্র কুরআনেও মক্কাকে اُمُّ الْقُرٰى বলা হয়েছে।

وَعَنْ ١٨٧٥ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُوا الْحِجَّةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– ঈদের মাস দু'টি যথা– রমজান ও জিলহজ [একই বছরে] কম হয় না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রমজানকে ঈদের মাস বলার তাৎপর্য : নবী করীম ﷺ রমজানকে কেন ঈদের মাস বললেন? অথচ ঈদ হয় শাওয়াল মাসে। এর সমাধান নিম্নরূপ–

১. আছরম (র.) এর জবাব দেন যে, যেহেতু শাওয়ালের চাঁদ রমজান মাসের শেষ দিনে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় উদিত হয়, এ জন্যে রমজানকেই ঈদের মাস বলা হয়েছে।

২. অথবা, যেহেতু ঈদ রমজানের রোজার কাছাকাছি, আর ঈদের মূল উৎসই রমজানের রোজা, তাই ঈদকে রমজান মাসের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

مَعْنٰى قَوْلِهٖ شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ 'ঈদের মাস দু'টি কম হয় না'-এর ব্যাখ্যা : হাদীস বিশারদগণ আলোচ্য হাদীসাংশের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

১. ইসহাক ইবনে রাওয়াইহ এ বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ মাস দু'টি ঊনত্রিশ দিনে হোক বা ত্রিশ দিনে হোক; কিন্তু মর্যাদায় কম হবে না। সুতরাং ত্রিশ দিন বিশিষ্ট মাসের যে ফজিলত ঊনত্রিশ দিন বিশিষ্ট মাসেরও সেই ফজিলত। ইমাম তাহাবী (র.)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন।

২. অথবা, এর অর্থ এও হতে পারে যে, এ একই বছরে দু'মাসে একই বছরে একত্রে কমতি হয় না। একটি মাস ঊনত্রিশ দিনে হলে অপরটি ত্রিশ দিনে অবশ্যই হবে।

৩. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, জিলহজ মাসের ছওয়াব রমজান মাসের ছওয়াব হতে কম হবে না। কারণ, জিলহজের ১০ তারিখের যে কার্যগুলো তা ছওয়াবের দিক দিয়ে রমজান মাসের কার্যের তুলনায় কম নয়।

৪. ইবনে হাব্বান বলেন, মেঘে ডাকা আকাশ বা অন্যকোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে নতুন চাঁদ না দেখা যাওয়ায় আমাদের দৃষ্টিতে তা কমতি হিসেবে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে কমতি হয় না।

৫. অথবা এটাও হতে পারে যে, নবী কারীম ﷺ -এর জমানায় এ মাস দু'টিতে কমতি হতো না। –[মিরকাত, ফাত্হ, আইনী, তা'লীকুস সবীহ]

দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও এর সমাধান : আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রমজান মাস কখনো ২৯ দিনে হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে হযরত আবূ বাকরা (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মাস কখনো ৩০ দিনের কমে হয় না। অতএব উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ–

ক. অত্র হাদীসে উল্লিখিত لَا يَنْقُصَانِ শব্দের অর্থ এই যে, মাস ২৯ দিনে হোক বা ৩০ দিনে, কিন্তু মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনোরূপ কমতি হবে না। এ অর্থ নয় যে, রমজান মাস ৩০ দিনের কমে হবে না।

খ. অথবা-এর অর্থ এই যে, দু'টি মাস একই বছরে একত্রে কমতি হয় না। একটি মাস ২৯ দিনে হলে অপরটি ৩০ দিনে অবশ্যই হবে।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মেঘে ঢাকা আকাশ বা অন্যকোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে নতুন চাঁদ না দেখা যাওয়ায় আমাদের দৃষ্টিতে তা কমতি দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে কমতি হয় না।

ঘ. অথবা এ-ও হতে পারে যে, নবী ﷺ -এর যুগে এ মাস দু'টিতে কমতি হত না।

وَعَنْ ١٨٧٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমাদের কেউ যেন রমজানের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে অবশ্যই রোজা না রাখেন। তবে হ্যাঁ, যদি কারও [পূর্ব হতেই] এদিনে রোজা রাখার নিয়ম চলে এসে থাকে তবে সে ঐ দিনেও রোজা রাখতে পারে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, রমজানের ব্যাপারে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে রমজান মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার দুই এক দিন পূর্ব হতে রোজা রাখা শুরু করতে নিষেধ করেছেন। 'কান্‌যুল ওম্মাল' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, সাহাবীগণ এভাবে দুই একদিন পূর্ব হতে রোজা রাখার অনুমতি চাইলে নবী ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

নিষেধাজ্ঞার কারণ : রমজান মাসের একদিন দু'দিন পূর্ব হতে রোজা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো– ১. এতে রমজানের ফরজ রোজা রাখার শক্তি অর্জন করা যাবে। ২. অথবা যাতে নফল ফরজের সাথে মিশে না যায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩. অথবা, এটাও হতে পারে যে, শুরু করার আদেশ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে। যদি একদিন-দু'দিন পূর্ব হতে রোজা শুরু করে তবে এ হুকুমটির প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হয় না। –[আইনী, তা'লীকুস সবীহ]

إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ الخ-এর অর্থ : রমজানের দুই একদিন পূর্ব হতে রোজা রাখতে নিষেধ করা হলেও যদি কোনো ব্যক্তির এ নিয়ম থাকে যে, সে নিয়মিতভাবে সপ্তাহের কোনোদিনে, যেমন– জুমা বারে বা সোমবারে রোজা রাখার নিয়ম পালন করে আসছে। আর ঘটনাচক্রে রমজানের পূর্বদিন 'ঐ বার' এসে পড়ে তবে সে নিয়মমাফিক রোজা রাখতে পারবে। সে এ নিষেধের আওতায় পড়বে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১٨٧٧ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৮৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন শাবান মাসের অর্ধেক শেষ হয়ে যায়, তোমরা আর [নফল] রোজা রেখো না।

–[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রমজানের অর্ধেকের পর রোজা রাখা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : শা'বানের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর রোজা রাখা জায়েজ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ : শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতে, শা'বানের ষোল তারিখ হতে রোজা না রাখার হুকুম। তারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত অত্র হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন শা'বান মাসের অর্ধেক চলে যাবে তখন আর রোজা রাখবে না।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, শা'বান মাসের অর্ধেকের পরে নফল হিসেবে রোজা রাখা জায়েজ আছে। তাদের মতে, নিষেধের হাদীসটি য'ঈফ। এর উপর আমল করা যাবে না।

١٨٧٨ وَعَنْهُ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৮৭৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা রমজান মাসের জন্যে শাবানের চাঁদের হিসাব রাখবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস অনুসারে ফিকহবিদগণ শা'বান, রমজান, শাওয়াল ও জিলহজের চাঁদ উঠছে কিনা, এর খেয়াল রাখাকে ওয়াজিব মনে করেন। কারণ, এর উপরে রোজা, ঈদ ও হজ নির্ভর করে। কেননা, শা'বান মাসের প্রথম তারিখ থেকে নির্ভুল হিসাব রাখলে রমজানের হিসাব সহজেই নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।

وَعَنْ ١٨٧٩ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৮৭৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও নবী করীম ﷺ -কে শা'বান ও রমজান ব্যতীত এক সাথে দুই মাসের রোজা রাখতে দেখিনি।

–[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ ও এর সমাধান : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত অত্র হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে শা'বান ও রমযান মাস ছাড়া একাধারে দু'মাস রোজা রাখতে দেখিনি। এতে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ শা'বান মাসেও রোজা রাখতেন। অথচ পূর্বোল্লিখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে শা'বানের অর্ধেকের পরে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকাশ্যত উভয় হাদীসে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান নিম্নরূপ– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয়েছে যে, শা'বানের অর্ধেকের পরে তোমরা রোজা রেখো না –এ আদেশ রাসূল ﷺ -এর শেষ সময়ের আদেশ।

■ **অথবা, এটা বলা হবে যে, শা'বানের অর্ধেকের পরে রোজা রাখতে নিষেধ করাটা উম্মতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্যে করা হয়েছে। যাতে পরবর্তী এক মাস রোজা রাখতে শক্তি পায় এবং নিষ্ঠার সাথে ফরজ রোজা পালন করতে পারে। কিন্তু স্বয়ং রাসূল ﷺ -এর অবস্থা এর ব্যতিক্রম ছিল। রাসূল ﷺ পূর্ণ শা'বান মাস রোজা রেখেও দুর্বল হতেন না।**

■ **অথবা উম্মে সালামার হাদীসে রাসূল ﷺ -এর প্রথম জীবনের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর আবূ হুরায়রার হাদীস তাঁর শেষ বয়সের; অতএব উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।**

وَعَنْ ١٨٨٠ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৮৮০. অনুবাদ : হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোজা রাখল, সে আবুল কাসেম ﷺ -এর সাথে নাফরমানী করল।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সন্দেহের দিনে রোজা রাখার হুকুম : আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন শা'বান মাসের ২৯ তারিখ দিবাগত রাতে চাঁদ দেখা না গেলে পরের দিনকে يَوْمُ الشَّكِّ বা সন্দেহের দিন বলা হয়। কারণ সন্দেহ আছে যে, এটা কি শা'বান মাসের শেষ তারিখ নাকি রমজানের প্রথম তারিখ। এ দিনে রোজা রাখার হুকুম নিয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা–
   ক. এ ব্যাপারে ইমামের রায় গ্রহণীয় হবে। খ. এ দিনে রোজার নিয়তে রোজা রাখা ওয়াজিব। গ. এ দিনে ফরজ কিংবা নফল কোনো রোজাই জায়েজ নেই।
২. **ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন–** এ দিনে রোজা রাখা জায়েজ নেই, ফরজ, নফল যাই হোক না কেন।
   তিনি নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন–
   عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رض) قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ .
৩. **ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (রা.)-এর মতে,** এ দিনে রমজানের রোজার নিয়তে রোজা রাখা জায়েজ নেই। তবে নফল হিসেবে রাখা জায়েজ আছে। আর নফল রোজা রাখার পর ঐদিন রমজান মাস প্রমাণিত হলে তা রমজানের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন হাদীসে এসেছে যে– لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُّعًا
৪. কেউ কেউ বলেন, এ দিনে রমজানের নিয়তে রোজা রাখা হারাম হবে।
৫. **ইমাম আহমদ (র.) বলেন,** এ দিনে রোজা মোস্তাহাব।
৬. কেউ কেউ বলেন, সাধারণত এ দিনে রোজা রাখা মাকরূহ; কিন্তু যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে তার জন্যে এবং বিশিষ্ট আবেদ ও মুত্তাকী লোকদের জন্যে মাকরূহ নয়।

وَعَنْ ١٨٨١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّىْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِىْ هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৮৮১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক বেদুঈন এসে বলল, আমি নতুন চাঁদ দেখেছি অর্থাৎ রমজানের চাঁদ দেখেছি। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এটা সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, হে বেলাল! জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যেন তারা আগামীকাল রোজা রাখে।

–[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلٰى اَهْلِ بَلَدٍ بِرُؤْيَةِ بَلَدٍ اٰخَرَ : এক দেশের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের অধিবাসীদের উপর রোজা রাখা ওয়াজিব কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক, ইকরামা ও সালেম (র.) প্রমুখ বলেন, উদয় স্থলের বিভিন্নতা হলে এক দেশের চাঁদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের অধিবাসীদের উপর রোজা রাখা ওয়াজিব হবে না।

তাঁদের দলিল :

فِىْ حَدِيْثِ كُرَيْبٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَعْمَلْ عَلٰى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِىْ بَلَدِ مِصْرَ وَهُوَ فِى الْمَدِيْنَةِ - وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ ইবনে হাম্বল ও মালেক (র.) প্রমুখের মতে, এক দেশের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের অধিবাসীদের উপর রোজা রাখা ওয়াজিব। যদিও চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা হোক।

দলিল :

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ" .

٢. قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ" .

٣. فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْهِلَالَ فَنَادٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ صُوْمُوْا" .

وَعَنْ ١٨٨٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ تَرَا النَّاسُ الْهِلَالَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ رَاَيْتُهٗ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهٖ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৮৮২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সমবেত লোকেরা চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগল। তখন আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। এতে রাসূল ﷺ রোজা রাখলেন এবং লোকদেরকে রোজা রাখতে আদেশ করলেন। –[আবূ দাউদ ও দারিমী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٨٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৮৮৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসের খুব হিসাব করতেন। এছাড়া অন্যকোনো মাসে এত হিসাব করতেন না। অতঃপর রমজানের চাঁদ দেখে রোজা রাখতেন। যদি [আকাশ] মেঘলা থাকার কারণে চাঁদ গোপন থাকত, তবে শা'বান মাসে ত্রিশ দিনে গণনা করতেন অতঃপর রোজা রাখতেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٨٨٤ اَبِى الْبَخْتَرِىْ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَلَقِيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا اِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ اَىَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ قُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ اَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَاَرْسَلْنَا رَجُلًا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮৮৪. অনুবাদ : তাবিয়ী হযরত আবুল বাখ্তারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম। যখন আমরা বাতনে নাখলা নামক স্থানে অবতীর্ণ হলাম, তখন আমরা সকলে একত্র হয়ে নতুন চাঁদ দেখতে লাগলাম। জনতার মধ্যে কেউ বলল, এটা তিন দিনের চাঁদ আর কেউ বলল, দু'দিনের চাঁদ। পরে আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমরা [রমজানের] চাঁদ দেখেছি। লোকদের মধ্যে কেউ বলে, তা তিন দিনের চাঁদ আর কেউ বলে দু'দিনের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন রাতে দেখেছ? আমরা বললাম, অমুক অমুক রাতে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার তারিখ গণনা করতেন যে রাতে দেখতেন, [সেই রাত থেকে]। সুতরাং যে রাতে তোমরা তা দেখেছ তা সে রাতেরই চাঁদ।

উক্ত হযরত আবুল বাখ্তারী (র.) হতে অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার রমজানের চাঁদ দেখলাম, তখন আমরা 'যাতে ইরক' নামক স্থানে ছিলাম। অতঃপর আমরা এক ব্যক্তিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্যে পাঠালাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা চাঁদ দেখার সাথে মাস নির্ধারণ করেছেন। যদি মেঘলা আকাশের কারণে চাঁদ তোমাদের কাছে গোপন থাকে তবে শা'বান মাসকে পূর্ণ [ত্রিশ দিন] গণনা করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

চন্দ্রোদয়ের উদয়স্থলের বিভিন্নতার হুকুমে ইমামগণের মতভেদ : দ্রাঘিমাংশের ব্যবধানের কারণে চাঁদের উদয়স্থলের যে বিভিন্নতা রয়েছে এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তবে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য কিনা এবং উদয়স্থলের বিভিন্নতার কারণে রোজা রাখা বা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে ভিন্নতা আসবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

১. **আইম্মায়ে ছালাছার অভিমত :** ইমাম (র.) শাফেয়ী মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে–

اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ مُعْتَبَرٌ فَلَا يَلْزَمُ عَلٰى اَحَدٍ اَنْ يَعْمَلَ بِمَطْلَعِ غَيْرِهٖ -

অর্থাৎ চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য। তাই এক শহরে চাঁদ উঠা দ্বারা অন্য শহরবাসীর উপর রোজা রাখা আবশ্যক হবে না। এ ক্ষেত্রে এক মাসের দূরত্বকে মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। সুতরাং এক মাসের পথ পরিমাণ দূরত্ব হলে দু'দেশের জন্যে এক দেশের চাঁদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের উপর রোজা রাখা বা ভাঙ্গার হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

দলিল : ক. কুরআন– قَوْلُهٗ تَعَالٰى "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"

খ. হাদীস–

১. حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ -

২. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِكُرَيْبٍ فَلَا نَزَالُ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلَاثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ -

গ. **আকলী দলিল :** যেমন নামাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বীয় দেশের সময়সূচি অনুযায়ী নামাজ আদায় করে থাকে, রোজাও তেমনি।

২. **ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত :** তিনি বলেন–

اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَيَلْزَمُ عَلٰى اَحَدٍ اَنْ يَعْمَلَ بِمَطْلَعِ غَيْرِهٖ -

অর্থাৎ চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলে রোজা রাখা বা ভাঙ্গা সকলের উপর আবশ্যক।

দলিল : রাসূল ﷺ -এর বাণী– صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা দূরের ও কাছের সকলের জন্যে মানা অপরিহার্য।

৩. **পরবর্তী আহনাফের অভিমত :** পরবর্তী যুগের ওলামায়ে আহনাফ ইমামত্রয়ের মতকে গ্রহণ করেছেন। চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য না হলে রোজা পালনে অসুবিধা দেখা দিবে। এটি নির্ভরযোগ্য বিধায় এর উপরই ফতোয়া।

ذَات عِرْق ও بَطْن نَخْلَة-এর পার্থক্য : 'বাতনে নাখ্লা' একটি প্রসিদ্ধ বস্তীর নাম, মক্কার পূর্বাঞ্চলে এটা অবস্থিত। বর্তমানে এটা 'মুখাইয়্যাক' নামে পরিচিত। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, চাঁদ দেখার পর যখন লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তখন তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে এর সমাধান চাইলে, তিনি যা বলার তাই বললেন। পরে আবার 'যাতে ইর্ক' পৌঁছার পর পূর্ণ প্রবোধ হাসিলের জন্যে পুনরায় তাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি একই উত্তর দিলেন। ফলে উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

قَوْلُهٗ مَدَّهٗ لِرُؤْيَتِهٖ-এর তাৎপর্য : নতুন চাঁদ দেখা পর্যন্ত মাসের সময়সীমাকে দীর্ঘায়িত করা। অর্থাৎ রমজানের চাঁদকে ভালভাবে দেখার জন্যে শা'বান মাসকে এর সময়সীমা ৩০ দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা যুক্তিসঙ্গত।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ : সাহরী ও ইফতার

সন্ধ্যা রাতের খাবারকে ইফতার আর শেষ রাতের খাবারকে সাহরী বলে। সাধারণত সুবহে সাদিকের পূর্বে রোজার নিয়তে পানাহার করাকে সাহরী বলা হয়। আর দিনের শেষে সূর্যাস্তের সাথে সাথে পানাহার করাকে ইফতার বলা হয়। সাহরী ও ইফতারের অনেক ফজিলত রয়েছে। বিশেষ করে সাহরী খাওয়াকে সুন্নত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রন্থকার অত্র পরিচ্ছেদকে পৃথক একটি পরিচ্ছেদ হিসেবে ঘোষণা না করে পূর্বের পরিচ্ছেদের উপসংহার হিসেবে গণ্য করেছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে সাহরী ও ইফতার সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٨٥ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৮৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা সাহরী খাও। কেননা, সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শেষ রাতের খাওয়াকে সাহরী বলে; সাহরী খাওয়া সুন্নত। এ খাওয়ার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই প্রয়োজন না থাকলেও সামান্য কিছু পানাহার করতে হয়, নতুবা মাকরূহ হবে।

وَعَنْ ١٨٨٦ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اُكْلَةُ السَّحَرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮৮৬. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমাদের রোজা এবং আহলে কিতাব [ইহুদি ও খ্রিস্টান]-দের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আহলে কিতাব তথা ইহুদি নাসারাদের ধর্মেও রোজার প্রচলন ছিল, আজও তারা রোজার সাদৃশ্যে উপবাস যাপন করে, কিন্তু সাহরী খায় না। তা-ই আমাদের প্রতি নির্দেশ আমরা সাহরী খেয়ে যেন তাদের সাদৃশ্য হতে আলাদা হয়ে পড়ি।

আর اُكْلَةُ السَّحَرِ অর্থ– নামে মাত্র হলেও সাহরীতে সামান্য কিছু খাওয়া। 'বাদায়ে' গ্রন্থে উল্লেখ আছে– اَلسُّحُوْرُ টি ضَمَّة হলেও তখন মাসদার এবং اَلسَّحُوْرُ টি فَتْح হলে তখন ইস্‌ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

وَعَنْ ١٨٨٧ سَهْلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৮৭. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– মানুষ ততদিন কল্যাণের সাথে থাকবে যতদিন তারা ইফতার শীঘ্র শীঘ্র করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফ্তার করা সুন্নত। সূর্যাস্তের পূর্ব হতেই ইফতারী সামনে নিয়ে অপেক্ষা করা মোস্তাহাব। পেটে ক্ষুধা, বুকে তৃষ্ণা– এমতাবস্থায় খাদ্যবস্তু সামনে নিয়ে ইফতারের সময়ের জন্যে অপেক্ষা করা আত্মসংবরণ ও খোদাভীতির এক অনন্য উদাহরণ। এতে আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং বান্দার আত্মসংবরণ ও কৃচ্ছ্রতা তার ফেরেশতাদেরকে প্রদর্শন করে তার প্রিয় বান্দাদের কৃতিত্ব তুলে ধরেন এবং তাদেরকে তখন ক্ষমা করে দেন।

وَعَنْ ١٨٨٨ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৮৮. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন এ [পূর্ব] দিক হতে রাত আসবে এবং এ [পশ্চিম] দিক হতে দিন প্রস্থান করবে এবং সূর্য অস্তমিত হবে তখনই রোজাদার ইফতার করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٨٨٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৮৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে [মাঝে ইফতার না করে] রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! আপনি তো একাধারে [সাওমে বেসাল] রোজা রেখে থাকেন? রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার মতো? আমি রাত যাপন করি, তখন আমার প্রতিপালক আমাকে আহার করান এবং পান করান। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দিন হলো রোজার মূল مَحَلٌ [স্থান] রাতের কোনো অংশই রোজার মধ্যে সংযুক্ত নয়; বরং রাত হলো রোজা ভেঙ্গে ফেলা তথা ইফতারের সময়। আর 'সওমে বিসাল' করলে রাতেও রোজা রাখা সাব্যস্ত হয়। অথচ এটা রোজার মূল পদ্ধতির বিপরীত। এছাড়া বাস্তবেও অনেক অসুবিধা দেখা দিবে, তাই নবী করীম ﷺ সাহাবী তথা সমস্ত মুসলমানদেরকে 'সাওমে বিসাল' করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য কখনো কখনো হুযূর ﷺ নিজে 'বিসাল' করতেন, তিনি উম্মতকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে তারা অত্যধিক দুর্বল হয়ে অন্যান্য ইবাদতই ছেড়ে দিবে। আর রাসূলের ব্যাপার হলো স্বতন্ত্র।

صَوْمُ الْوِصَالِ-এর অর্থ ও তার হুকুম : وِصَالٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلضَّمُّ وَالْاِتِّصَالُ বা মিলিত হওয়া।

২. اَلتَّتَبُّعُ বা পরস্পর কোনো কাজ করা।

৩. تَتَابُعُ الشَّيْئَيْنِ بِلَا اِنْقِطَاعٍ বা নিরবচ্ছিন্নভাবে দুটি বস্তুর ধারাবাহিকতা ইত্যাদি।

সুতরাং صَوْمِ وِصَال অর্থ– ধারাবাহিকভাবে একের পর এক রোজা পালন করা।

صَوْم وِصَال-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. بَذْلُ الْمَجْهُوْدِ-এর গ্রন্থকার বলেন– هُوَ تَتَابُعُ الصِّيَامِ فِىْ يَوْمَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ اِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ

অর্থাৎ রাত্রিবেলা পানাহার না করে দু'দিন বা ততোধিক দিন ধারাবাহিক রোজা রাখাকে صَوْم وِصَال বলা হয়।

২. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- هُوَ تَتَابُعُ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ اِفْطَارٍ بِاللَّيْلِ

৩. اَلتَّعْلِيْقُ الصَّبِيْحُ -এর গ্রন্থকার বলেন- هُوَ صَوْمُ سَائِرِ السَّنَةِ مِنْ غَيْرِ اِفْطَارٍ فِى الْاَيَّامِ الْمَنْهِيَةِ

৪. ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন- هُوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ لاَ فِطْرَ بَيْنَهُمَا

حُكْمُ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ : রোজা পালনের ক্ষেত্রে وصال করা জায়েজ আছে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

১. ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, সাওরী (র.) ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, صَوْمِ وِصَال জায়েজ নেই; বরং তবে মাকরূহ। তাঁদের কেউ মাকরূহে তাহরীমী, আবার কেউ কেউ মাকরূহে তানযীহীর প্রবক্তা।

দলিল : হাদীস-

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ الخ -

٢. عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

২. কাযী আয়ায, আহমদ, ইসহাক ও ইবনে ওহাব (র.) প্রমুখের মতে, صَوْمِ وِصَال জায়েজ আছে।

দলিল : হাদীস-

١. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ نَهَاهُمْ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ -

٢. اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاصَلَ بِاَصْحَابِهِ يَوْمَيْنِ حِيْنَ اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا -

৩. আসহাবে জাওয়াহেরের মতে, صَوْمِ وِصَال হারাম।

দলিলের জবাব : প্রথম দলিলে যে করুণা পরবশ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে মাকরূহে তাহরীমী হতে কোনো বাধা নেই। কারণ তাহরীমী হওয়ার কারণও করুণা ও দয়ার্দ্রতা।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, সাওমে বেসালের হুকুম রাসূল ﷺ -এর জন্যে সুনির্দিষ্ট ছিল। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন- اِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِنْكُمْ "আমি নিশ্চয় তোমাদের কারো মতো নই" এতেই রাসূল ﷺ -এর জন্যে সুনির্দিষ্টতা বুঝা যায়।

يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ **-এর ব্যাখ্যা :** এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে যা নিম্নরূপ-

১. শরহুস সুন্নাহ প্রণেতা বলেন, আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল ﷺ -কে রাতের গভীরে বেহেশতী খাবার পরিবেশন করতেন।

২. অথবা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর فَيْض رَبَّانِىْ দ্বারা এমনভাবে পানাহারের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে দিতেন, যাতে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি হতো না।

৩. অথবা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বপ্নে পানাহার করতেন। এতেই তিনি শক্তি পেতেন।

৪. অথবা, তাঁর পানাহারের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কেননা, উভয়ের মাঝে যে নিকটতম সম্পর্ক তা অন্য কারো মাঝে নেই।

৫. অথবা, আল্লাহ তাকে পানাহারের পরিবর্তে এমন আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করতেন যাতে তার এ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়ে যেত।

৬. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, এ বাক্যের অর্থ হলো- আল্লাহ আমাকে তাঁর ধ্যানে মগ্ন রেখে পানাহারের পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখেন।

৭. অথবা, যারা আল্লাহর প্রেমে মশগুল তাদের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম। কারণ আশেক প্রেমাসক্তিতে পানাহারের কথা ভুলে যায়। তাই তো কবি বললেন- وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ * وَكُلُّ شَرَابٍ دُوْنَهُ كَسَرَابٍ

صَوْمُ الْوِصَالِ **নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমত :** রোজা পালনে وِصَالُ করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। এ নিষেধের পেছনে কতিপয় হিকমত রয়েছে বলে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. আল্লামা তুরপুশ্তী (র.) বলেন, صَوْمُ وِصَال উম্মতের জন্যে এক কঠিন দায়িত্ব ও অসহনীয় বোঝা স্বরূপ হবে বিধায় তা হতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, সম্পূর্ণ পানাহারবিহীন একাধারে রোজা রাখলে মানুষের দৈহিক শক্তি হ্রাস পায়। ফলে মানুষ অন্যান্য ইবাদত পালনে অপারগ হয়ে পড়ে। তাই সওমে বেসাল পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. صَوْم وِصَال -এর কারণে মানুষের দৈহিক শক্তিতে ঘাটতি দেখা দেওয়ার ফলে তাদের পার্থিব জীবনে জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাই নিষেধ করা হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেন, صَوْم وِصَال পালন করলে মানুষ দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেয় না। তাই এটা নিষেধ করা হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্যে কিনা : রাসূল ﷺ সাওমে বেসাল রাখতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা কি হারামের জন্যে, নাকি মাকরূহের জন্য ছিল, এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১. আসহাবে জাহেরের মতে, এ নিষেধাজ্ঞা تَحْرِيْم -এর জন্যে। তাই এটা মাকরূহ তাহরীমী।

২. জমহুর ওলামার মতে, এ নিষেধাজ্ঞা মূলত تَحْرِيْم -এর জন্যেই ছিল। তাই সাওমে বেসাল পালন জায়েজ নয়।

৩. কেউ কেউ বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা كَرَاهِيَّة তথা মাকরূহে তানযীহীর জন্যে। এর মূল লক্ষ্য হলো বান্দার কষ্ট লাঘব করা।

মোটকথা, উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি মেহেরবানী স্বরূপ সাওমে বেসাল নিষিদ্ধ হয়েছে। তাইতো হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– نَهَاهُمْ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٨٩٠ حَفْصَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَفَهُ عَلٰى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُوْنُسُ الْاَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

১৮৯০. অনুবাদ : হযরত হাফ্সা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে নিয়ত করে না তার রোজা হয় না।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তাবিয়ী মা'মার, যুবাইদী, ইবনে উয়াইনা ও ইউনুস আয়লী তারা সকলেই ইমাম যুহ্রী হতে বর্ণনা করেন এবং বিবি হাফ্সার উপরে 'মওকূফ' করেন অর্থাৎ বিবি হাফ্সার উক্তি হিসেবেই বর্ণনা করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রোজার নিয়ত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : রোজার নিয়ত কখন করতে হবে– এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. হযরত ইবনে ওমর, জাবির (রা.) ইবনে যায়েদ, দাঊদ যাহিরী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, যে কোনো প্রকারের রোজা চাই ফরজ হোক, ওয়াজিব হোক বা নফল হোক রাতেই নিয়ত করতে হবে, নতুবা রোজা শুদ্ধ হবে না। সুতরাং রাতে নিয়ত করা ওয়াজিব। তাঁরা হযরত হাফ্সা (রা.) হতে বর্ণিত অত্র হাদীসকে দলিল গ্রহণ করেন।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহমদ (র.) বলেন, নফল রোজা ব্যতীত অন্যান্য রোজায় রাতেই নিয়ত করা ফরজ।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নফলের ক্ষেত্রে সূর্যাস্তের পূর্বে নিয়ত করলে রোজা শুদ্ধ হবে।

৪. ইমাম আহমাদ (র.)-এর মতে, নফল রোজার ক্ষেত্রে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পূর্বে নিয়ত করাই যথেষ্ট।

৫. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যে রোজা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন– রমজানের রোজা বা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার মানতের রোজা– তার নিয়ত যদি সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পূর্বাহ্নে করে তবে যথেষ্ট হবে, রাতে নিয়ত করা ফরজ নয়।

তাঁদের দলিল :

ক. শায়খাইন (র.) হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, যখন আশূরার রোজা ফরজ হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তা লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দিতে আদেশ করলেন এবং বললেন, সাবধান! যে [ইত্যবসরে] পানাহার করেছে সে যেন আর কিছু না খায়, আর যে কিছু খায়নি সে যেন রোজা রাখে। আলোচ্য হাদীসেও দিনের বেলায় নিয়ত করার আদেশ করা হয়েছে।

খ. এছাড়া কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ হতে ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ আয়াতে পানাহার ও সহবাস ফজর পর্যন্ত মুবাহ রাখা হয়েছে। এখানে ثُمَّ হরফটি تَعْقِيْبٌ مَعَ التَّرَاخِيْ-এর জন্যে। এতে বুঝা গেল যে, সুবহে সাদিক হওয়ার পরে বিলম্ব করে রোজার নিয়ত করা আর সুবহে সাদিকের সময় রোজার নিয়ত করার একই হুকুম হবে। সুতরাং রোজার নিয়ত দিনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত দেরি করা যাবে।

- ইবনে জাওযী (র.) বর্ণনা করেন, এক বেদুঈন নতুন চাঁদ দেখা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার পরে রাসূল ﷺ বললেন, সাবধান! যে পানাহার করেছে সে যেন দিনের অবশিষ্ট অংশে কিছু না খায়, আর যে কিছু খায়নি সে যেন রোজা রাখে।

৬. এমনিভাবে হানাফীদের মতে, নফল রোজাযও রাতে নিয়ত করা ফরজ নয়। যেমন- হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেছেন- "একদা নবী করীম ﷺ আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে [খাওয়ার] কিছু আছে কি? আমরা বললাম, জি না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে আমি এখন রোজাদার হলাম।" এটাও দিবাভাগেই নিয়ত করার প্রমাণ। কিন্তু হানাফীদের মতে, যে রোজা কারো জিম্মায় থাকে। যেমন- রমজানের কাজা, কাফ্ফারা ও সাধারণ মানতের রোজা- তা রাতে নিয়ত করা ব্যতীত জায়েজ হবে না। যেহেতু তা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সেহেতু রোজার প্রারম্ভ হতেই তার নিয়ত থাকতে হবে।

৭. ইমাম মালেক, ইসহাক ও আহমাদ (র.)-এর অন্য এক মতানুযায়ী রমজানের রোজার নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বে করাই অপরিহার্য। তারা এটাকে জাকাতের উপরে কিয়াস করে বলেন যে, রমজান মাসের প্রথম রাত্রে সমস্ত রোজার নিয়ত একসাথে করাও জায়েজ।

وَعَنْ ١٨٩١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ فِيْ يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

১৮৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ আজান শুনে আর খাদ্যের পাত্র তার হাতে থাকে, তবে সে যেন তা রেখে না দেয় যে পর্যন্ত না সে তা হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ হবে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نداء দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল ﷺ -এর বাণী- إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ হাদীসাংশের কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। এ সংক্রান্ত হাদীস বিশারদগণের এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ও মতামত নিম্নে পেশ করা হলো-

১. আল্লামা ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, এখানে আজান দ্বারা হযরত বিলাল (রা.)-এর আজান উদ্দেশ্য। তিনি সুবহে সাদিকের পূর্বে তাহাজ্জুদ ও সাহরী খাওয়ার জন্যে আযান দিতেন। সুতরাং রোজাদার ব্যক্তি সাহরী খাওয়া অবস্থায় বিলালের আজান শুনলে পানাহার ত্যাগ করবে না; বরং সুবহে সাদিকের উপর ভিত্তি করে পানাহার ত্যাগ করবে। যথা-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ .

২. আল্লামা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী (র.) বলেন, হাদীসে اَلنِّدَاءُ দ্বারা যদি ফজরের আজান উদ্দেশ্য হয়, তবে এর অর্থ হবে, তোমরা সুবহে সাদিকের আবির্ভাব হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু আজানের উপর ভিত্তি করে পানাহার পরিত্যাগ করো না। আর যদি মাগরিবের আজান উদ্দেশ্য হয়, তখন এর অর্থ হবে, তোমরা ইফতার করার জন্যে আজানের অপেক্ষা করো না।

৩. 'মাফাতীহ' গ্রন্থকার বলেন, এখানে اَلنِّدَاءُ দ্বারা ফজর নামাজের আজান উদ্দেশ্য। সুতরাং এর অর্থ হবে, রোজাদার ব্যক্তি সাহরী খাওয়া অবস্থায় আজান শুনলেই পানাহার পরিত্যাগ করবে না। কেননা, মুয়াজ্জিন অনেক সময় সুবহে সাদিকের পূর্বেই আজান দিয়ে থাকে।

৪. বাযলুল মাজহূদ গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ এই যে, অত্র হাদীসে নবী করীম ﷺ পানাহার হারাম হওয়ার সম্পর্ক করেছেন সুবহে সাদিক আবির্ভাবের সাথে, মুয়াজ্জিনের আজানের সাথে নয়। কেননা, মুয়াজ্জিন সুবহে সাদিকের পূর্বেও আজান দিয়ে থাকেন। সুতরাং আজানের উপরে নির্ভর করা যায় না। তবে যারা সুবহে সাদিক চিনতে পারে তাদের জন্যে এ বিধান। আর যারা এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ তারা সতর্কতার জন্যে আজান শুনামাত্র পানাহার বন্ধ করবে।

وَعَنْهُ ١٨٩٢ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৮৯২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় সে ব্যক্তিরাই যারা শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সময় মতো ইফতার করা অত্যধিক ছওয়াবের কর্ম। এ সময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নিয়ে গর্ববোধ করে থাকেন। তাই কোনো অবস্থাতেই বিলম্ব করে ইফতার করা ঠিক নয়।

وَعَنْ ١٨٩٣ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنَّهٗ بَرَكَةٌ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَاِنَّهٗ طُهُوْرٌ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ) وَلَمْ يَذْكُرْ فَاِنَّهٗ بَرَكَةٌ غَيْرُ التِّرْمِذِىِّ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى -

১৮৯৩. অনুবাদ : হযরত সালমান ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। কেননা, তাতে বরকত [কল্যাণ] রয়েছে। আর যদি খেজুর না পাওয়া যায় তবে যেন পানি দ্বারা ইফ্‌তার করে। কেননা, তা পবিত্রকারী।

–[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

তিরমিযী ব্যতীত অন্য কেউ فَاِنَّهٗ بَرَكَةٌ অর্থাৎ "কেননা, তাতে বরকত আছে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খুরমা-খেজুর দ্বারা ইফতার করা মোস্তাহাব। কারো মতে, এই হুকুম ঐসব লোকদের জন্যে যাদের প্রধান খাদ্য হলো খুরমা। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে খালি পেটে যে কোনো মিষ্টি বস্তু পাকস্থলীর জন্যে খুবই ফলপ্রসূ হয়। আর পানিকে পবিত্রকারী বলা হয়েছে। কেননা, এর দ্বারা যেমনিভাবে বাহ্যিক পবিত্রতা অবলম্বন করা হয় অনুরূপভাবে আত্মিক পবিত্রতাও হাসিল হয়।

وَعَنْ ١٨٩٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٌ مِنْ مَاءٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ -

১৮৯৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ [মাগরিবের] নামাজের পূর্বেই কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত তবে কয়েকটি শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার কতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত তবে কয়েক ঢোঁক পানি দ্বারা [ইফতার করতেন]। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ] তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

وَعَنْ ١٨٩٥ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا اَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَمُحْيِ السُّنَّةِ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ صَحِيْحٌ)

১৮৯৫. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফ্তার করাবে অথবা কোনো যোদ্ধাকে জিহাদের সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত করে দেবে তবে তার জন্যেও তার অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে।

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে এবং মুহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগবী শরহে সুন্নায়। বাগবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

وَعَنْ ١٨٩٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৮৯৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন, পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং যদি আল্লাহ চান তবে ছওয়াব স্থির হলো। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো অর্থাৎ, পিপাসার কারণে গোটা শরীর যে শুষ্ক ও তপ্ত হয়ে পড়েছিল পানি পান করার সাথে সাথে তা দূরীভূত হয়ে গেল এবং ক্লান্তি ও অবসাদ নিমেষে সতেজ ও চাঙ্গাভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল। আর আল্লাহ চাহেত ছওয়াব স্থির হলো। অর্থাৎ তা নিশ্চিত পাবেই। এখানে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি وَثَبَتَ الْاَجْرُ-এর সাথেই সংযোজিত হবে।

وَعَنْ ١٨٩٧ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ (رض) قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ مُرْسَلًا)

১৮৯৭. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে যুহরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ইফতার করতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন– "আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া আলা রিযকিকা আফত্বারতু" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্যে রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেওয়া রিজিক দ্বারা ইফতার করেছি। –[আবূ দাঊদ, মুরসাল হিসেবে]

وَعَنْ ١٨٩٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৮৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– দীন সর্বদা জয়যুক্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা, ইহুদি ও নাসারারা বিলম্বে ইফতার করে।

–[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অত্র হাদীস হতে বুঝা যায় যে, ইসলামের শাশ্বত বিধানের ব্যাপারে ইসলামের শত্রুরা যা করে এর বিপরীত করাতেই ইসলামের বিজয় নিহিত রয়েছে। অন্যথা তাদের অনুকরণ করলে অচিরেই ইসলামের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান ইসলামের শত্রুদের অনুসরণ করার মধ্যেই তৃপ্তি পাচ্ছে, তবে সর্বক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

وَعَنْ ١٨٩٩ أَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ أَبُوْ مُوْسٰى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৮৯৯. অনুবাদ : তাবিয়ী হযরত আবূ আতিয়্যা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও মাস্রূক হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম যে, হে উম্মুল মু'মিনীন! হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে দু'ব্যক্তি আছেন– তাদের একজন ইফতার শীঘ্র শীঘ্র করেন এবং নামাজও শীঘ্র শীঘ্র পড়েন, অপরজন ইফ্তার দেরিতে করেন এবং নামাজও দেরিতে পড়েন। তখন তিনি [আয়েশা (রা.)] বলেন, দু'জনের কে ইফতার শীঘ্র শীঘ্র করেন এবং নামাজও শীঘ্র শীঘ্র পড়েন? তখন আমরা বললাম, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও এরূপই করতেন। আর অপরজন ছিলেন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফকীহগণের পরিভাষায় কোনো কাজের মধ্যে আযীমত ও রুখ্সত নামে দু'টি পদ্ধতি আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আযীমতের উপর আমল করতেন। আর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) আমল করতেন রুখ্সতের উপর। যেমন কোনো মুসাফিরের সফর অবস্থায় রোজা রাখা আযীমত এবং রোজা না রাখা রুখসত। মোটকথা, উভয়টি জায়েজ। এছাড়া হযরত আবূ মূসা (রা.) অপেক্ষা ইবনে মাসউদ (রা.) অধিকতর ফিকহবিদ ও জ্ঞানী ছিলেন। তাই তিনি আযীমতের উপরই আমল করেছেন।

وَعَنْ ١٩٠٠ الْعِرْبَاضِ ابْنِ سَارِيَةَ (رضـ) قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى السُّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৯০০. অনুবাদ : হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমজানের সাহরী খেতে ডাকলেন এবং বললেন, এ বরকতময় খানার দিকে এসো। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٩٠١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ سُحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

১৯০১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মু'মিনদের জন্য খেজুর কতইনা উত্তম সাহরী।

–[আবূ দাঊদ]

بَابُ تَنْزِيْهِ الصَّوْمِ

পরিচ্ছেদ : রোজার পবিত্রতা রক্ষা করা

تَنْزِيْهٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার نَزَهٌ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো দূরে রাখা, দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত রাখা বা نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْقَبِيْحِ তথা নিজেকে গুনাহ হতে পবিত্র রাখা। যে সকল কাজ করলে রোজা নষ্ট বা মাকরূহ হয় বা ছওয়াব কম হয় কিংবা বিনষ্ট হয়ে যায় সে সকল কাজ হতে রোজাকে দূরে রাখা বা বাঁচিয়ে রাখাই হলো রোজার তানযীহ। আলোচ্য পরিচ্ছেদে রোজাকে যাবতীয় ত্রুটি হতে মুক্ত রাখার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٠٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৯০২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং তা অনুসারে কার্যকলাপ করা পরিত্যাগ করেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ পরিত্যাগ করাই রোজার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো এই কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে নিজের মধ্যে সর্বপ্রকার গুনাহ্ ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং খোদাভীতির মহান গুণাবলি অর্জন করা। পবিত্র কুরআনের মধ্যেও এ উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ; বস্তুত গুনাহ পরিত্যাগের পথে রোজা একটি বিরাট পদক্ষেপ। রোজা পালনের মাধ্যমে এ গুণাবলি হাসিল করতে না পারলে রোজার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ الخ-এর তাৎপর্য : আলোচ্য হাদীসাংশটি একটা রূপক বাক্য। একে বলা হয়- نَفْىُ السَّبَبِ اِرَادَةَ نَفْىِ الْمُسَبَّبِ এ বাক্যটি রোজা কবুল না হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, রোজা পালনের মৌলিক উদ্দেশ্য পানাহার পরিত্যাগ করা নয়; বরং কু-প্রবৃত্তি দমন, ক্রোধ সংবরণ এবং যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত আচার-আচরণ ও কথাবার্তা পরিহার করে নিজেকে নিষ্কলুষ-পরিশুদ্ধ মানুষরূপে গড়ে তোলা। সুতরাং যে ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারল না, তার রোজার নামে কষ্ট করা ব্যতীত আর কিছুই অর্জিত হবে না। ফলে মহান আল্লাহও তার প্রতি অনুগ্রহশীল হবেন না।

١٩٠٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاَرْبِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯০৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা অবস্থায় [নিজ বিবিগণকে] চুম্বন করতেন, তাদের দেহের সাথে দেহ মিলাতেন। তিনি তোমাদের অপেক্ষা নিজের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অধিক সক্ষম ছিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ রোজা অবস্থায় আপন বিবিদেরকে চুম্বন করতেন। আলোচ্য হাদীস হতে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে তিনি অর্থাৎ নবী করীম ﷺ করেছেন বলে সর্ব সাধারণ উম্মতেরাও করতে পারবে– এ কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায় না। যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.) স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা এরূপ করিও না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এর অধিক কিছু ঘটার সম্ভাবনাই ছিল না।

রোজা অবস্থায় চুম্বনের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা কিংবা শারীরিক স্পর্শ করা জায়েজ কিনা, এ ব্যাপারে সাহাবী ও ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

১. ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, যুবকদের জন্যে এমনটি করা মাকরুহ এবং বৃদ্ধদের জন্যে জায়েজ।
২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কামপ্রবৃত্তি জাগ্রত না হলে রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করায় কোনো দোষ নেই।
৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, চুম্বনের ফলে কামবাসনা উজ্জীবিত হওয়া এবং লিঙ্গ হতে পানি [মযী) বের হয়ে পড়লেও রোজা নষ্ট হবে না।
৪. ইমাম মালেক (র.) বলেন, চুম্বন করা জায়েজ হলেও কামবাসনা উজ্জীবিত হওয়া ও পানি বের হওয়ার ফলে রোজা নষ্ট হয়ে যায় এবং কাজা ওয়াজিব হয়।
৫. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রোজা অবস্থায় চুম্বন করা সাধারণত মাকরুহ। এরূপ কর্মে ফিতনায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান।
৬. ইমাম আহমদ (র.) বলেন, এরূপ করলে রোজা নষ্ট হয়।
৭. শরহে সুন্নায় বলা হয়েছে, হযরত ওমর, আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) বলেন, রোজা অবস্থায় চুম্বন করার এখতিয়ার আছে।

মোটকথা, রোজা অবস্থায় চুম্বন এবং স্পর্শ করায় দোষ নেই, তবে চুম্বনের ফলে কখনো বীর্যপাত ঘটলে সকলের ঐকমত্যে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

لِأَرْبِهِ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য : لِأَرْبِهِ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন–

১. শরহে সুন্নায় বলা হয়েছে– শব্দটির অর্থ– প্রয়োজন, জ্ঞান, অঙ্গ। হাদীসে শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
২. জনৈক ভাষা বিজ্ঞানী বলেন, لِأَرْبِهِ অর্থ– যৌন অভিপ্রায়, যৌন কামনা-বাসনা।
৩. ইবনে মালেক (র.) বলেছেন, শব্দটি দ্বারা যৌন আবেগ ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে বুঝানো হয়েছে।
৪. আল্লামা তুরপুশতী (র.)-এর মতে, এর দ্বারা হযরত আয়েশা (রা.) যৌন সম্ভোগের কথা বুঝিয়েছেন। এ শব্দটি যৌন সম্ভোগের ইঙ্গিতসূচক শব্দ।
৫. কারো মতে, এর দ্বারা নফসের বৃত্তি নিচয়ের কথা বুঝানো হয়েছে ইত্যাদি।

مُبَاشَر-এর অর্থ এবং এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য : مُبَاشَرَةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার। এটা بَشَرٌ ধাতু থেকে নির্গত; যার অর্থ– চামড়া। আর مُبَاشَرَة অর্থ –اِلْتِقَاءُ الْبَشَرَتَيْنِ অর্থাৎ চামড়ার সাথে চামড়া মিলানো। শব্দটি جِمَاع বা সহবাস অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আলোচ্য হাদীসে مُبَاشَرَة দ্বারা সহবাস নয়; বরং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে মালেক (র.) বলেন, এখানে স্ত্রীকে হাত দ্বারা স্পর্শ করা বোঝানো হয়েছে।

وَعَنْهَا ١٩٠٤ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِىْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯০৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজান মাসে কখনও নাপাক অবস্থায় সকাল করে ফেলতেন। আর নাপাকী স্বপ্ন দোষের কারণে ছিল না, অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং রোজা [অব্যাহত] রাখতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নাপাকী অবস্থায় রোজাদারের সকাল হওয়ার হুকুম : রোজাদার ব্যক্তি নাপাকী অবস্থায় সকাল করলে রোজা হবে কি হবে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। যেমন–

১. তাহাবী শরীফের বর্ণনা মতে, কতিপয় তাবেয়ী (র.) বলেন, যদি কোনো রোজাদারের নাপাক অবস্থায় সকাল হয়ে যায়, তবে উক্ত রোজার কাজা করতে হবে।
দলিল : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলতেন– "যে ব্যক্তি নাপাকী অবস্থায় সকাল করল অথচ সে রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছে, এমতাবস্থায় তার রোজা নেই; বরং সে ইফতার করবে।"
২. ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর ঐকমত্যে, যদি নাপাকী অবস্থায় ভোর হয়ে যায় তবে রোজা শুদ্ধ হবে, কাজা করার কোনো প্রয়োজন নেই।
দলিল :
১. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَبَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ .
২. كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ الخ -

ইমাম তাহাবী (র.) প্রদত্ত দলিলের জবাব : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, উক্ত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাতে রোজাদারের জন্যে সহবাসও নিষিদ্ধ ছিল।

وَعَنْ ١٩٠٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯০৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা নিয়েছেন এবং তিনি রোজা অবস্থায়ও শিঙ্গা নিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রোজাদারের জন্যে রোজা অবস্থায় শিঙ্গা নেওয়া সম্পর্কে মতভেদ :

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَ دَاوٗدَ ظَاهِرِيْ وَاَوْزَاعِيْ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আহমাদ (র.), ইসহাক (র.), দাউদ যাহেরী ও আওযায়ী (র.)-এর মতে শিঙ্গা লাগানো দ্বারা শিঙ্গাদাতা ও শিঙ্গা গ্রহণকারী উভয়েরই রোজা নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত ১৯১৬ নং হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। এছাড়া হযরত ছওবান (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, শিঙ্গাদাতা ও শিঙ্গা গ্রহণকারী রোজা ভঙ্গ করেছে। –[আবূ দাউদ]

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَشَافِعِيْ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা ও শাফিয়ী (র.)-এর মতে, শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না, মাকরূহও হবে না। তাঁদের দলিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস। এতে বলা হয়েছে যে, নবী কারীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় এবং রোজা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন, এতদ্ব্যতীত তৃতীয় অনুচ্ছেদে হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, শিঙ্গা, বমি ও স্বপ্নদোষে রোজাদারের রোজা ভঙ্গ হয় না।

এখানে যে দু'ধরনের হাদীস রয়েছে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ইমাম মালেক (র.), শাফেয়ী (র.) ও ছাওরী (র.) বলেছেন– রোজাদারের জন্যে শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ। তাঁরা নিষেধাজ্ঞাকে মাকরূহ অর্থে ব্যবহার করেন। এটা ইমাম মালেক (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর অপ্রসিদ্ধ মত।

আইনী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র.)-ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (র.) ব্যতীত জমহূর ওলামায়ে কেরামের মাযহাবে বলা হয়েছে যে, শিঙ্গা লাগানো দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না।

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাব : ইমাম বাগবী (র.) বলেছেন, শাদ্দাদ ইবনে আওসের হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে– তাঁরা উভয়ে রোজা ভঙ্গের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। কেননা, শিঙ্গা গ্রহণকারী দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সম্ভবত শিঙ্গাদাতার পেটে শিঙ্গা চোষার সময় রক্ত প্রবেশ করবে।

- অথবা এটাও হতে পারে যে, কঠোরতার জন্যে এরূপ বলা হয়েছে, প্রকৃতই রোজা ভঙ্গের আদেশ প্রকাশের উদ্দেশ্য নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এক যুগ [একাধারে] রোজা রাখল সে রোজা রাখল না; ভাঙ্গলও না।"
- তাহাবী বলেন, এ হাদীস এ দু'ব্যক্তির জন্যে সুনির্দিষ্ট। কেননা, তারা উভয়ে শিংগা লাগানোর সময় অন্য লোকের গিবত [পরোক্ষ নিন্দাবাদ] করেছিল। আর ইফতার বা রোজা ভঙ্গ দ্বারা রোজার ছওয়াবের ঘাটতি বুঝিয়েছেন।
- কেউ কেউ বলেন, রোজা মাকরূহ হয় ফলে ছওয়াবও কম হয়। এ কারণে রূপক হিসেবে ইফতার বলা হয়েছে।
- আবার কারো মতে, অত্র হাদীসের হুকুম প্রথম যুগে ছিল, পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

وَعَنْ ١٩٠٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهٗ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে রোজা অবস্থায় ভুল করে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রোজা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : শাফেয়ী ও হাম্বলী ইমামগণ বলেন, যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় ভুলবশত কিছু পানাহার করে অথবা সহবাস করে, তার রোজা নষ্ট হবে না। ফলে কাজা বা কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। অত্র হাদীসের বাক্য– فَلْيُتِمَّ صَوْمَهٗ দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রোজা ফরজ হোক বা নফল কোনো রোজাই কাজা করতে হবে না।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, ফরজ রোজা বাতিল হয়ে যাবে এবং তা কাজা করতে হবে, কিন্তু নফল রোজা বাতিল হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা ও জমহুরে ওলামা (র.)-এর প্রসিদ্ধ দলিল– قَوْلُهٗ ﷺ رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত হতে ভুল-ভ্রান্তির গুনাহ তুলে নেওয়া হয়েছে। কাজেই ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেললে তার রোজা নষ্ট হবে না এবং তাকে কাজাও করতে হবে না।

وَعَنْهُ ١٩٠٧ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَأَتِىْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ اِجْلِسْ وَمَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ الرَّجُلُ

১৯০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি ধ্বংস হয়েছি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাসে নিপতিত হয়েছি, তখন আমি রোজাদার ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার কি এমন কোনো দাস আছে যা তুমি [এ গুনাহর কাফ্ফারায়] মুক্ত করে দিতে পার? সে বলল, জি না। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, তবে তুমি কি একাধারে দুই মাস রোজা রাখার শক্তি রাখ? সে বলল, জি না। এবার রাসূল ﷺ বললেন, তোমার কি এমন সামর্থ্য আছে যে, তুমি ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পার? এবারও লোকটি বলল, না। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি বস। আর রাসূল করীম ﷺ অপেক্ষা করে রইলেন। [রাবী বলেন,] আমরাও ঐ অবস্থায়ই ছিলাম। এমন সময় নবী করীম ﷺ -এর দরবারে খেজুর পূর্ণ একটি ঝুড়ি হাদিয়া নিয়ে আসা হলো। তাতে প্রচুর খেজুর ছিল। আর ঝুড়ি হলো বড় ভাণ্ড। রাসূল ﷺ বললেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, এই যে আমি। রাসূল

اَعَلٰى اَفْقَرَ مِنِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَ اللّٰهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهٗ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ﷺ বললেন, এটা নাও এবং সদকা করে দাও। তখন লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার চেয়ে গরিবকে দেব? আল্লাহর কসম! মদীনায় এ দু' প্রস্তরময় পাহাড়ের মাঝখানে আমার পরিবারের চেয়ে অধিকতর গরীব পরিবার আর নেই। এটা শুনে নবী করীম ﷺ হেসে দিলেন; যাতে তাঁর সম্মুখের দাঁতসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, এটা তোমার নিজের পরিবারের লোকজনকে খাওয়াও। — [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আগন্তুক ব্যক্তি কে? : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে যে লোকটি আগমন করেছে তার পরিবার সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়–

১. আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, ব্যক্তিটির নাম সালামা ইবনে সাখরাহ আল-বায়াযী আল-আনসারী।

২. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তার নাম সালমান।

৩. কারো মতে, তার নাম আউস ইবনে সামেত।

রোজার কাফফারায় নিজ পরিবারকে খাবার খাওয়ানো জায়েজ আছে কি? : ইমামগণ এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির উপর কাফফারা ওয়াজিব হলে, ঐ কাফফারার বস্তু তার পরিবারের লোকদের খাওয়ানো জায়েজ নেই। তবে উক্ত ব্যক্তি যদি গরিব হয় এবং কাফফারা আদায় করার মতো সম্পদ তার হস্তগত হয়, তাহলে তা স্বীয় পরিবারের জন্যে ব্যয় করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত নিম্নরূপ–

১. ইমাম আহমদ ও আওযায়ী (র.) বলেন– يَجُوْزُ اِطْعَامُ الرَّجُلِ اَهْلَهٗ مِنْ كَفَّارَتِهٖ

অর্থাৎ অস্বচ্ছল ব্যক্তি তার কাফফারার বস্তু স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে।

দলিল : হাদীস– قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ

২. ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও আহমদ (র.)-এর পরিবর্তিত মতে, لَا يَجُوْزُ اِطْعَامُ الرَّجُلِ اَهْلَهٗ مِنْ كَفَّارَتِهٖ

অর্থাৎ অসচ্ছল ব্যক্তিও তার কাফফারার বস্তু আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে না।

দলিল : তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে আলোচ্য হাদীসটিকেই দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন– اِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ ـ

কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট কিনা : রোজার কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, রোজার কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট।

দলিল :

فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ "جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اِمْرَأَتِىْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ..... الخ ـ

এ হাদীসে সহবাসের ক্ষেত্রে কাফফারা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

২. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখের মতে, রোজার কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং স্বেচ্ছায় পানাহারকারীর উপরও কাফফারা ওয়াজিব হয়।

দলিল :

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْطَرْتُ فِىْ رَمَضَانَ ـ قَالَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ ـ فَقَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً ـ

২. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِى الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ -
৩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ رَجُلًا اَكَلَ فِىْ رَمَضَانَ اَنْ يُعْتِقَ -

দরিদ্রতার কারণে কাফফারা রহিত হবে কি? : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে, অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হয়ে যায়। আসলে বিষয়টি এমন কিনা, এ মাসআলায় ইমামগণের মতানৈক্য বিদ্যমান। যেমন– জমহুরে ফুকাহা, ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও ছাওরী (র.) বলেন– لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِالْعِجْزِ وَالْعُسْرِ

অর্থাৎ, অক্ষমতা ও অসচ্ছলতার কারণে কাফফারা রহিত হবে না; বরং সক্ষমতা ও সচ্ছলতা লাভের পর অনাদায়ী কাফফারা আদায় করতে হবে।

দলিল : ইমাম যুরকানী (র.) উত্তম মতটি সমর্থন করতে গিয়ে উসুলের একটি নীতি উল্লেখ করেন–

عَدَمُ ذِكْرِ الشَّئِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ ثُبُوْتِهِ -

অর্থাৎ কোনো বস্তুর উল্লেখ না করা সেটি বাস্তবে না হওয়াকে আবশ্যক করে না।

ইমাম আহমদ ও আওযায়ী (র.) বলেন– تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِالْعِجْزِ فَاِنْ جُعِلَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ بَعْدَهُ فَلَا يَجِبُ اَدَائُهَا

অর্থাৎ অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হয়ে যায়। এমনকি পরবর্তিতে আর্থিক সচ্ছলতা আসলেও তাকে আর কাফফারা আদায় করতে হবে না।

দলিল : আলোচ্য হাদীস তথা حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ)

স্ত্রীর উপর কাফফারা ওয়াজিব কিনা? : রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর উপরও কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে–

১. আল্লামা খাত্তাবীসহ অধিকাংশ আলেম বলেন, যদি সহবাসে স্ত্রীরও ইচ্ছা থাকে, তবে রোজা অবস্থায় সহবাস করলে স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর উপরও কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রীকে সহবাসে বাধ্য করা হয়, তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
২. দাঊদ জাহেরীর মতে, স্ত্রীর উপর কোনো অবস্থাতেই কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

রোজার কাফফারা : কোনো ব্যক্তি বিনা ওজরে কিংবা শরিয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া রোজা ভঙ্গ করলে তার উপর কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। রোজার কাফফারা তিনটি পদ্ধতির যে কোনো একটি পদ্ধতিতে আদায় করা যায়। যথা–

ক. গোলাম বা দাস মুক্ত করা। তবে বর্তমানে বিশ্বের কোথাও দাসপ্রথা নেই বিধায় অবশিষ্ট দু'টি পদ্ধতির যে কোনো একটি পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে।
খ. ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোজা রাখা, মাঝখানে একটি মাত্র রোজা ভাঙ্গলেও পুনরায় ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোজা রাখতে হবে। পূর্বেরগুলো গণনা করা যাবে না।
গ. ষাটজন মিসকিনকে মধ্যম পর্যায়ের দুই ওয়াক্ত খানা খাওয়ানো। অথবা একজন মিসকিনকে দুই ওয়াক্ত করে ষাট দিন খানা খাওয়ানো।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٠٨ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৯০৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম ﷺ রোজা অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর জিহ্বা চুষতেন। —[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রোজা অবস্থায় চুম্বন ও শরীর মিলানোর হুকুম : রোজা অবস্থায় চুম্বন ও মেলামেশা [শৃঙ্গার] সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। মেলামেশার মূলে মুবাশারাত (مُبَاشَرَةٌ) শব্দটি রয়েছে। তার প্রকৃত অর্থ হলো দেহদ্বয় পরস্পরে মিশানো, যৌন কেলি বা শৃঙ্গার করা। এটা সহবাস বা সঙ্গম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে সহবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

ইবনুল মুনযির একদল [আলিম] হতে বর্ণনা করেছেন যে, রোজাদারের জন্যে দৈহিক মেলামেশা হারাম। কেননা, আল্লাহ বলেছেন– فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ الاية তাহলে দেখা যায় যে, এ আয়াতে দিনের বেলা মুবাশারাত নিষেধ করেছেন। সুতরাং তা হারাম হবে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত এই যে, রোজাদারের জন্যে চুম্বন ও মেলামেশা মাকরূহ। ইবনে আবূ শাইবা সহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রোজা অবস্থায় চুম্বন ও মেলামেশাকে মাকরূহ জানতেন।

ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফেয়ী ও সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে রোজাদার যদি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে তবে চুম্বন জাতীয় কার্যকলাপ করতে পারে আর তা না হলে করতে পারে না। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে– তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রোজা অবস্থায় চুম্বন করতেন, রোজা অবস্থায় মেলামেশা করতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের তুলনায় নিজের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অধিক সক্ষম ছিলেন। –[আবূ দাউদ]

দুররুল মুখতার গ্রন্থে হানাফীদের মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে যে, বীর্যপাত বা সহবাসের বিপর্যয় হতে যদি বেঁচে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় না থাকে, তবে চুম্বন, স্পর্শ, কোলাকোলি ও যৌনকেলি দূষণীয়। বেঁচে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় থাকলে কোনো দোষ নেই।

আল্লামা ইবনে আবেদীন (র.) বলেন, কুবলায়ে ফাহেশা বা যৌন উত্তেজনামূলক ঠোঁটে ঠোঁটে **চুম্বন সাধারণভাবেই মাকরূহ,** চাই নিরাপত্তার সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক।

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাব : তাঁরা যে আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তার জবাব এই যে, রাসূল ﷺ -ই কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যাকার। যেহেতু রোজা অবস্থায় দিনের বেলা রাসূল ﷺ কর্তৃক মেলামেশা প্রমাণিত রয়েছে, অতএব তা হারাম নয়।

وَعَنْ ١٩٠٩ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَتَاهُ أٰخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَاِذَا الَّذِىْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَاِذَا الَّذِىْ نَهَاهُ شَابٌّ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৯০৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে রোজাদারের তার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মেলামেশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তখন রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আসল এবং তাঁকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তিনি তাকে নিষেধ করলেন। যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সে বৃদ্ধ ছিল, আর যাকে নিষেধ করা হয়েছিল সে যুবক ছিল। — [আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান : পবিত্র কুরআনে এসেছে– فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ الاية অর্থ– 'এখন তোমরা তাদের [স্ত্রীদের] সাথে মেলামেশা করতে পার।' অত্র আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রোজা অবস্থায় দিনের বেলায় স্ত্রীদের সাথে 'মুবাশিরাত' করা তথা গায়ে গায়ে মেশা হারাম। হ্যাঁ, ইফতারের পর হতে তা উপভোগ করার পূর্ণ অনুমতি আছে। আর অত্র হাদীসে নবী ﷺ রোজা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে মোবাশিরাতের অনুমতি দিয়েছেন। এতে উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, কুরআনে বর্ণিত بَاشِرُوْهُنَّ দ্বারা 'সহবাস' অর্থ বুঝানো হয়েছে। এছাড়া নবী ﷺ নিজেই হলেন কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী। যেহেতু রোজা অবস্থায় দিনের বেলায় তিনি স্ত্রীদের চুম্বন মেলামেশা করেছেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসে বর্ণিত মুবাশিরাত হারাম নয় এবং দু' জায়গায় দু' অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

যাকে নিষেধ করেছেন সে ছিল যুবক : নবী ﷺ উভয়জনকে যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্তর দিয়েছেন। পরিণত বয়সে মানুষের কাম প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সুতরাং তার দ্বারা রোজা ভঙ্গের আশঙ্কা কম। কিন্তু যুবকের ব্যাপারটি এর বিপরীত يُوْشِكُ اَنْ يُّوْقِعَ فِيْهِ এ আশঙ্কায় যুবককে রোজা অবস্থায় মুবাশিরাত করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْهُ ١٩١٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيُّ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عِيْسٰى بْنِ يُوْنُسَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ لَا اُرَاهُ مَحْفُوْظًا -

১৯১০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রোজা অবস্থায় যার বমি হয়েছে তার উপরে কাজা আবশ্যক নয়। আর যে ইচ্ছাকৃত বমি করেছে সে যেন তা কাজা করে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। ঈসা ইবনে ইউনুস ব্যতীত অপর কোনো সূত্র হতে আমরা তা জানিনি। ইমাম মুহাম্মদ বুখারী (র.) বলেছেন, আমি এ হাদীসটিকে মাহফূয এবং সংরক্ষিত মনে করি না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রোজা অবস্থায় বমির বিধান : রোজা অবস্থায় যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি এসে পড়ে চাই তা অল্প হোক বা বেশি হোক ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত রায় হলো যে, রোজা বিনষ্ট হবে না-

যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তবে দু'টি অবস্থা হবে-

১. যদি বেশি পরিমাণে অর্থাৎ মুখ ভরে বমি করে তবে ইমামগণের ঐকমত্যে রোজা নষ্ট হবে, কিন্তু কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না- শুধু কাজা করলেই চলবে।

২. যদি কম পরিমাণে অর্থাৎ মুখ ভরে বমি না করে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, রোজা নষ্ট হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর যাহিরী মতে, রোজা নষ্ট হবে এবং কাজা করতে হবে।

আর যদি এ বমি গলার মধ্যে চলে যায় তবে চারটি অবস্থা হবে। চাই বমি বেশি হোক বা কম হোক, ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক।

১. যদি বেশি পরিমাণে বমি ইচ্ছাকৃতভাবে গলার মধ্যে চলে যায় তবে ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে রোজা নষ্ট হবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। তবে কাফফারা আদায়ের দরকার হবে না।

২. যদি বেশি পরিমাণে বমি অনিচ্ছাকৃতভাবে কণ্ঠনালির ভিতর চলে যায় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, রোজা নষ্ট হবে; ইমাম মুহাম্মদের (র.)-এর মতে, রোজা নষ্ট হবে না। শেষোক্ত মতই বিশুদ্ধ।

৩. অল্প পরিমাণ বমি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কণ্ঠনালির ভিতর নিয়ে যায় তবে ইমাম মুহাম্মদের মতে রোজা বিনষ্ট হবে, ইমাম আবূ ইউসুফের মতে বিনষ্ট হবে না। শেষোক্ত মতের উপরেই ফতওয়া।

৪. অল্প পরিমাণ বমি যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কণ্ঠনালির ভিতর চলে যায় তবে ইমামগণের ঐকমত্যে রোজা বিনষ্ট হবে না।

وَعَنْ ١٩١١ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَاَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

১৯১১. অনুবাদ : হযরত মা'দান ইবনে তালহা (র.) তাবিয়ী হতে বর্ণিত। হযরত আবুদ দারদা (রা.) তাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করলেন এবং রোজা ভেঙ্গে ফেললেন। রাবী মা'দান বলেন, অতঃপর আমি দামেশকের মসজিদে [রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খাদেম] হযরত ছাওবান (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আবুদ দারদা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করেছিলেন এবং রোজা ছেড়ে দিয়েছিলেন। [এটা শুনে] ছাওবান বললেন, তিনি সত্য বলেছেন, আর তখন আমি তার জন্যে অজুর পানি ঢেলেছিলাম। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বমি হলে অজুর হুকুম : বমি হলে অজু বিনষ্ট হবে কিনা এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ : ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ (র.) বলেন, বমি করলে অজু নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা বলেন, শরীর হতে যে কোনো নাপাক জিনিস যে কোনো স্থান হতে বের হলে অজু নষ্ট হয়। আর বমি হলো নাপাক বস্তু তাই এতে অজু নষ্ট হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বমি দ্বারা অজু নষ্ট হয় না। কেননা, তাঁর মতে مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ فَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوْءِ অর্থাৎ প্রস্রাব ও পায়খানার দ্বার দিয়ে যা কিছু বের হবে কেবল তাতেই অজু নষ্ট হয়। আর বমি উক্ত দ্বারপথে নির্গত হয়নি। কাজেই এর অজু নষ্ট হবে না। তিনি বলেন অত্র হাদীসে 'অজু' অর্থ– শরিয়তের নির্দেশিত অজু নয়; বরং হাত মুখ ইত্যাদি ধৌত করা।

وَعَنْ ١٩١٢ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا اُحْصِيْ يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১৯১২. **অনুবাদ :** হযরত আমের ইবনে রাবী'আ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রোজা অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখছি। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করার বিধান : সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে– 'রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের [কস্তূরীর] সুগন্ধ হতেও অধিক সুগন্ধময়।' এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েজ কিনা? আবার এ প্রশ্নও উঠে যদি জায়েজই হয়, তবে দিনের প্রথম ভাগে নাকি শেষভাগেও জায়েজ আছে? আবার এই প্রশ্ন থাকে যে, মিসওয়াকটি কি শুকনা হতে হবে নাকি তাজা ও কাঁচা ডালার দ্বারাও মিসওয়াক করা যাবে ইত্যাদি। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হচ্ছে–

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ (رض) : ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, রোজাদারের পক্ষে সকাল বা সন্ধ্যা যে কোনো সময় মিসওয়াক করা জায়েজ। তাঁরা অত্র হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। এছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রোজাদারের উত্তম অভ্যাসের মধ্যে মিসওয়াক অন্যতম। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে, মিসওয়াক শুষ্ক হোক বা তাজা হোক তাতে হুকুমের কোনো তারতম্য নেই।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (رح) : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) এর মতে, যে কোনো প্রকার মিসওয়াক দ্বারা দ্বিপ্রহরের পরে মিসওয়াক করা মাকরূহ। তাঁরা তাবরানী বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা রোজা রাখবে সকালের দিকে মিসওয়াক করবে, বিকালের দিকে করবে না। কেননা, রোজাদার اِذَا يَبِسَتْ شَفَتَاهُ كَانَ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ; মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ হাদীসটি য'ঈফ।

এছাড়া তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন– "রোজাদারের মুখের গন্ধ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের সুগন্ধি হতেও সুগন্ধময়।" আর মিসওয়াকের দ্বারা তো মুখের সুগন্ধি দূর হয়ে যায়।

তাদের জবাবে আমরা বলি যে, মিসওয়াকের দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, রোজাজনিত সুগন্ধি দূর হয় না; বরং সুগন্ধি আরো বৃদ্ধি পায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে গানাম হযরত মু'আয (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, রোজা অবস্থায় আমি কি মিসওয়াক করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, দিনের কোন সময় মিসওয়াক করব? তিনি বললেন, সকালে বা বিকেলে তুমি যে কোনো সময় ইচ্ছা করতে পার। [রাবী বলেন] আমি বললাম, লোকেরা বিকালে মিসওয়াক করাকে মাকরূহ ভাবেন। তারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের সুগন্ধি হতেও সুগন্ধময়। এটা শুনে হযরত মু'আয বললেন, সুবহানাল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে মিসওয়াক করতে আদেশ করেছেন। আর তিনি জানেন যে, মিসওয়াক করলেও রোজাদারের মুখের গন্ধ অবশ্যই বাকি থাকে।

অনুরূপভাবে 'আছেমিল আহওলি' এর কাছে কেউ জিজ্ঞেস করল, রোজাদার কি তাজা মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা পানির দ্বারা তার সতেজতা রক্ষা করেছেন। প্রশ্নকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, দিনের প্রথম ভাগে ও শেষভাগে পারব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এছাড়া হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনের শেষ ভাগে মিসওয়াক করতেন।

وَعَنْ ١٩١٣ اَنَسٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِشْتَكَيْتُ عَيْنَيَّ اَفَاَكْتَحِلُ وَاَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَاَبُوْ عَاتِكَةَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ)

১৯১৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে বলল, হুযূর! আমার দু'চোখ ব্যথা করে, আমি কি রোজা অবস্থায় সুরমা লাগাতে পারি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। —[তিরমিযী]

তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসের সনদ সবল নয়। অন্যতম রাবী আবূ আতেকাহকে দুর্বল বলে আখ্যয়িত করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

যে বস্তু পাকস্থলীতে পৌঁছে কিংবা এর দ্বারা শরীরে শক্তি সঞ্চয় হয়, রোজা অবস্থায় এ জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা জায়েজ নেই। চাই তা খাদ্য বা পানীয় জিনিস হোক অথবা অন্য কোনোভাবে ব্যবহারিক জিনিস হোক। সুরমা, আতর, তৈল ইত্যাদি ব্যবহারে উপরে বর্ণিত কোনোটিই সংঘটিত হয় না। তাই ইমাম আবূ হানীফা বলেন, রোজাদারের সুরমা ব্যবহারে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, কোনো ওজর ব্যতীত রোজা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা মাকরূহ।

وَعَنْ ١٩١٤ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১৯১৪. অনুবাদ : নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের কোনো একজন হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী কারীম ﷺ-কে 'আরজ' নামক স্থানে পিপাসার কারণে অথবা গরমের কারণে নিজ মাথায় পানি ঢালতে দেখলাম। তখন তিনি রোজাদার ছিলেন। –[মালিক ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রোজাদারের মাথায় পানি ঢালার হুকুম :

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন– যদি স্বাভাবিক প্রয়োজনে রোজাদার গায়ে মাথায় পানি ঢালে, এতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন– রোজাদার গরমের দরুন রোদ হতে বাঁচার জন্যে গাছের বা অন্য কিছুর ছায়ার আশ্রয় গ্রহণে কোনো দোষ নেই। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রোজা অবস্থায় ভিজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখতেন; কিন্তু যদি রোজাদারের আচরণে এটা বুঝা যায় যে, সে রোজার ক্লেশে অস্থির হয়ে গায়ে-মাথায় পানি ঢালছে, তখন বুঝতে হবে যে, সে ইবাদতের কষ্টকে অসহ্য ধারণা করে এরূপ করছে, তখন এটা করা মাকরূহ হবে। আর নবী ﷺ যে মাথায় পানি ঢেলেছেন সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, প্রচণ্ড গরমের দরুন রোজা ভেঙ্গে ফেলার অবস্থায় তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন তাই এ বিশেষ অবস্থায় মাথায় পানি ঢেলেছেন।

ফতোয়ার কিতাব 'দুররে মুখতারে' উল্লেখ আছে– রোজা অবস্থায় শীতলতা হাসিলের জন্যে ভেজা কাপড় গায়ে জড়ানো, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া বা গোসল করা মাকরূহ নয়।

وَعَنْ ١٩١٥ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى رَجُلًا بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِيْ لِثَمَانِيَ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ مُحْيِ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَتَاَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ اَيْ تَعَرَّضَا لِلْاِفْطَارِ الْمَحْجُوْمُ لِلضُّعْفِ وَالْحَاجِمُ لِاَنَّهُ لَا يَاْمَنُ مِنْ اَنْ يَصِلَ شَيْءٌ اِلٰى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمَلَازِمِ ـ

১৯১৫. অনুবাদ : হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল ﷺ রমজান মাসের আঠার তারিখ অতিক্রান্ত হলে আমার হাত ধরে [জান্নাতুল] "বাকী" [মদীনার গোরস্থান] নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট আসলেন। তখন সে শিঙ্গা নিচ্ছিল। এটা দেখে রাসূল ﷺ বললেন, শিঙ্গাদাতা ও শিঙ্গা গ্রহণকারী উভয়ের রোজা ভেঙ্গে গেছে। –[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

শায়খুল ইমাম মুহিউস সুন্নাহ (র.) বলেন, যারা রোজা অবস্থায় শিঙ্গা নেওয়াতে অনুমতি আছে বলে মনে করেন, তাদের মতে "রোজা ভেঙ্গে গেছে" অর্থ রোজা ভাঙ্গার দিকে অগ্রসর হলো। শিঙ্গা গ্রহণকারী দুর্বলতার কারণে এবং শিঙ্গাদাতা এ কারণে যে, শিঙ্গা টানার সময় কিছু বস্তু তার পেটে প্রবেশ করার ঝুঁকি হতে সে নিরাপদ নয়।

وَعَنْ ١٩١٦ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَرْجُمَةِ بَابٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُوْلُ اَبُو الْمُطَوِّسِ الرَّاوِيْ لَا اَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ)

১৯১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের এক দিনের রোজা কোনো ওজর বা রোগ ব্যতীত ভাঙ্গবে সারা জীবনের রোজায় তার ক্ষতিপূরণ হবে না, যদিও সে সারা জীবন রোজা রাখে।

–[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারিমী এবং বুখারী তাঁর 'তরজামাতুল বাবে' হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী (র.) বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, আবুল মুতাব্বিস রাবীর এ হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস আছে বলে আমার জানা নেই।]

وَعَنْهُ ١٩١٧ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الظَّمَاُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهَرُ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَذُكِرَ حَدِيْثُ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ فِيْ بَابِ سُنَنِ الْوُضُوْءِ ـ

১৯১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এমন অনেক রোজাদার আছে তাদের রোজা দ্বারা শুধু পিপাসাই লাভ হয়, আর কতক এমন নামাজি আছে যারা সারারাত জেগে নফল নামাজ আদায় করে ঠিকই; কিন্তু তাদের নামাজ পড়া দ্বারা শুধু রাত জাগরণই হয়। –[দারিমী]

এ প্রসঙ্গে লাকীত ইবনে সাবিরাহ-এর হাদীস 'সুনানিল অজু' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِلَّا الظَّمَأُ -এর ব্যাখ্যা : রোজা অবস্থায় ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়টিই রোজাদারকে অস্থির ও কাতর করে তোলে। এতে সন্দেহ নেই। তবে ক্ষুধার তুলনায় মানুষ পিপাসায় অধিক কাতর হয়ে পড়ে। মূলত পানির মধ্যে খাদ্যের কিছু অংশ নিহিত আছে, তাই এখানে বিশেষভাবে পিপাসার কথাটি বলা হয়েছে। আর রোজার অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্য হলো যাবতীয় অশ্লীলতা বর্জন করা, মিথ্যা বলা হতে বেঁচে থাকা, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো এবং গিবত-শেকায়েত করা হতে দূরে থেকে কৃচ্ছ্রতা অর্জন করা ও সর্বোপরি স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। সুতরাং যদি কেউ রোজা রেখে এসব গুণাবলি অর্জন করতে সচেষ্ট না হয়ে উপরন্তু সেসব মন্দের মধ্যে লিপ্ত থাকে, তাহলে সে রোজা রেখেও সত্যিকার অর্থে রোজাদার হতে পারেনি; বরং সারা দিন পিপাসায়ই কষ্ট করল এবং রোজার ফলাফল হতে বঞ্চিত রইল। আমাদের সমাজে এমন বহু লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এসব কর্ম হতে আমাদের বেঁচে থাকা আবশ্যক।

اِلَّا السَّهَرُ -এর ব্যাখ্যা : নামাজের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ ও তাঁর বান্দার হক আদায় করার উপযোগী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদি কেউ এ উদ্দেশ্য ছাড়া নামাজ আদায় করে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া নামাজ পড়ে, সারারাত নফল পড়ে ফজরের নামাজ কাজা করে এবং নফল নামাজে মত্ত থেকে বিবির হক আদায় না করে তবে তার এ নামাজ পড়া দ্বারা শুধু রাত্রি জাগরণই হবে, নামাজের আসল উদ্দেশ্য লাভ হবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩١٨ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْئُ وَالْاِحْتِلَامُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ)

১৯১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন জিনিস রোজাদারের রোজাকে ভঙ্গ করে না। শিঙ্গা নেওয়া, বমি করা এবং স্বপ্নদোষ। -[তিরমিযী]

তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গায়রে মাহফূয অর্থাৎ শায। হাদীসের অন্যতম রাবী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদকে জয়ীফ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি বস্তু রোজাদারের রোজাকে ভঙ্গ করে না। ক. শিঙ্গা নেওয়া, খ. বমি করা এবং গ. স্বপ্নদোষ। শিঙ্গা নেওয়া ও বমি করার বিধান ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু স্বপ্নদোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আর তা হলো এই যে, যদি রোজাদার ব্যক্তি দিনের বেলায় ঘুমায় এবং জাগ্রত হয়ে বীর্য দেখে তবে তার রোজা বিনষ্ট হবে না। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বপ্নদোষ স্ত্রী সহবাসের সমতুল্য। কিন্তু যেহেতু এ কাজটি তার এখতিয়ারের বহির্ভূত, তাই রোজা নষ্ট হবে না। এটাই ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

وَعَنْ ١٩١٩ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ كُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا اِلَّا مِنْ اَجْلِ الضَّعْفِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৯১৯. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত ছাবিত আল বুনানী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় কি রোজাদারের শিঙ্গা নেওয়াকে অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, না। তবে এ জন্যে যে, তা দুর্বলতার কারণ। -[বুখারী]

وَعَنْ ١٩٢٠ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ -

১৯২০. অনুবাদ : ইমাম বুখারী হতে তা'লীকরূপে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রথমে রোজা অবস্থায় শিঙ্গা নিতেন। পরে তিনি তা ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর তিনি রাতেই শিঙ্গা নিতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তা'লীকের পরিচয় : তা'লীক– যে সকল হাদীসের মধ্যে রাবীদের সিলসিলা বর্ণনা করা হয় না। তাকে তা'লীক বলা হয়। যেমন মিশকাতের হাদীসসমূহ। শুধু প্রথম বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ আছে, পরবর্তী কোনো রাবীর নাম উল্লেখ নেই। ইমাম বুখারী (র.) কর্তৃক সংকলিত 'বুখারী শরীফে' এরূপ তা'লীক হিসেবে বহু হাদীস বিদ্যমান আছে। সেগুলোও সম্পূর্ণ সহীহ হাদীস। মুহাদ্দিসীনে কেরামের পরিভাষায় সেগুলো 'তা'লীকাতে বুখারী' নামে প্রসিদ্ধ। বুখারী শরীফে তিনি যে সকল হাদীস তা'লীক করেছেন, তিনি পূর্ণ সনদসহ স্বতন্ত্র একটি কিতাবে সেগুলো একত্র করেছেন। ফলে তা مُتَّصِلْ হবার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকল না।

فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ **-এর মর্মার্থ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) রোজার সময় রাতেই শিঙ্গা নিতেন। এটা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, রোজা অবস্থায় দিনের বেলা শিঙ্গা নেওয়া বৈধ নয়; বরং তিনি আশঙ্কা করতেন যে, শিঙ্গা নেওয়ার কারণে হয়তোবা দুর্বল হয়ে পড়বেন, যা তার রোজা ভাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাই তিনি দিনের স্থলে রাতেই শিঙ্গা নিতেন।

وَعَنْ ١٩٢١ عَطَاءٍ قَالَ اِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ اَفْرَغَ مَا فِىْ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيْرُهُ اَنْ يَزْدَرِدَ رِيْقَهُ وَمَا بَقِىَ فِىْ فِيْهِ وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَاِنْ اَزْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكِ لَا اَقُوْلُ اِنَّهُ يُفْطِرُ وَلٰكِنْ يَنْهٰى عَنْهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِىْ تَرْجَمَةِ بَابٍ)

১৯২১. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– যদি কেউ [রোজা অবস্থায়] কুল্লি করে অতঃপর মুখের সম্পূর্ণ পানি ফেলে দেয়, সে নিজের থুথু বা মুখে যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা গিলে ফেললে তার কোনো ক্ষতি হবে না। ইলককে চিবাবে না, যদি ইলক [আঠাজাতীয় বস্তু যা চিবানো যায়] মিশ্রিত থুথু গিলে ফেলে তবে আমি এ কথা বলব না যে, তার রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে; তবে এরূপ করা নিষেধ [মাকরুহ]। –[বুখারী তরজমাতুল বাব গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عِلْكٌ **-এর পরিচয় :** ইলক হলো দাঁতের গোড়া শক্ত রাখার জন্যে এক প্রকার আঠাল বস্তু বিশেষ। ইউনানী শাস্ত্রের পরিভাষায় একে তালমাখনা বলা হয়। রোজা অবস্থায় এসব বস্তু চিবানো মাকরুহ।

بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ
পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের রোজা

ইসলাম একটি সহজ সরল জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বান্দার উপর কোনো কঠিন বিধান আরোপ করে বান্দাকে কষ্টের মধ্যে ফেলতে চান না; বরং বান্দার জন্যে যা সহজ তাই আল্লাহ চান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আর এ জন্যেই মহান রাব্বুল আলামীন মুসাফিরের জন্যে শরয়ী বিধান পালন করার ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদান করেছেন। যেমন- নামাজ কসর করা, রোজা নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে অন্য সময়ে আদায় করার সুবিধা। আলোচ্য পরিচ্ছেদে মুসাফিরের জন্যে রোজা রাখা বা না রাখা এবং এ দুয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٢٢ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَصُوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯২২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী (রা.) একবার নবী কারীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি সফরে থাকাকালে রোজা রাখব? আর তিনি বেশি বেশি রোজা রাখতেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যদি চাও তবে রোজা রাখতে পার, আর যদি চাও তবে রোজা ভাঙতেও পার।-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সফর অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম না কি ভাঙ্গা উত্তম এবং এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ : সফর একটা কষ্টকর অবস্থা। এ অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম না ভেঙ্গে ফেলা উত্তম এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَسٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ خُدْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ : হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) প্রমুখ, তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আতা, হাসান ও ইব্রাহীম নাখয়ী (রা.) প্রমুখের মতে মুসাফিরের এখতিয়ার থাকবে। চাই সে রোজা রাখুক বা না রাখুক। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয ও ইবনে মুনযির (র.)-এর মতে, রোজা রাখা ও ভাঙ্গার মধ্যে যেটা তার জন্যে সহজ সেটাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করতে চান, কোনো কিছুই কঠিন করতে চান না'।

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَاَوْزَاعِىِّ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও আওযায়ী (র.)-এর মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এক অভিমতে রোজা ভাঙ্গাই উত্তম। যেহেতু অনুমতি প্রদান করা হয়েছে আর অনুমতির উপরে আমল করা অর্থাৎ রোজা ভাঙ্গাই বাঞ্ছনীয়।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَشَافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সফর অবস্থায় রোজা রাখাই উত্তম। যেমন, ইমাম আবূ বকর রাযী (র.) বলেছেন, কুরআন মাজীদে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ....الاية আয়াতে রোগ-ব্যাধি ও সফরের আলোচনার পরেই বলা হয়েছে- اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ অর্থাৎ "যদি তোমরা রোজা রাখ তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম হবে"।

مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ : আহলে যাওয়াহেরদের মতে, সফর অবস্থায় রোজা না রাখাই উত্তম। তাঁদের দলিল হলো–

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ .

٢. قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) لِرَجُلٍ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللّٰهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ جَبَلِ عَرَفَةَ .

পাপ কাজের উদ্দেশ্যে সফরকারীর রোজার বিধান : পাপ কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়া সফরে রোজা না রাখার সুযোগ পাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমাম আযম ও শাফেয়ী (র.)-এর মতামত নিম্নরূপ–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, ন্যায়-অন্যায়, যে কোনো সফরেই সফরকারী এ রুখসত পাবে। তবে অন্যায় কাজের জন্যে ভিন্ন গুনাহ হবে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, অন্যায় সফরে রুখসতের বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা, এটি আল্লাহর করুণা মাত্র. অপরাধী ব্যক্তি আল্লাহর করুণার পাত্র নয়।

পরিশেষে বলা যায়, যে কোনো প্রকার সফরেই সফরকারীর জন্যে রোজা রাখা কিংবা না রাখার এখতিয়ার থাকবে।

وَعَنْ ١٩٢٣ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ اَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯২৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রমজানের ষোল তারিখ অন্তে রাসূলুল্লাহ সহকারে জিহাদে লিপ্ত ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোজা রেখেছিল আর কেউ কেউ রোজা ভেঙ্গেছিল। কিন্তু রোজাদার বে-রোজাদারের উপরে এবং বে-রোজাদার রোজাদারের উপরে কোনো দোষারোপ করেনি। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٩٢٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَ رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ – (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯২৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে [এক স্থানে] লোকের ভিড় দেখতে পেলেন এবং দেখলেন এক ব্যক্তির উপরে ছায়া দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? লোকেরা বলল, এক রোজাদার ব্যক্তি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সফরে রোজা রাখা পুণ্যের কাজ নয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সফর অবস্থায় রোজা না রাখার অনুমতি থাকলেও রোজা রাখাই উত্তম। আল্লাহর কালামেও এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ অথচ অত্র হাদীসে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সফর অবস্থায় রোজা রাখা পুণ্যের কাজ নয়। সুতরাং এ বাক্যটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে আর তা হলো, যদি সফর অবস্থায় রোজা রাখাতে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন রোজা রাখাতে ছওয়াব নয়; বরং উল্টো পাপই হবে। যেমন এ হাদীসের ঘটনায় দেখা যায় যে, সফরে রোজা রাখার দরুন লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, তবুও সে রোজা ছাড়েনি। তাই নবী ﷺ এমন সব লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, সফরে রোজা রাখা নেকীর কাজ নয়। বস্তুত শরিয়তের দৃষ্টিতে 'রোখসতের' বিধান তখনই কার্যকর হয়, যখন 'আযীমতের' উপর আমল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে ব্যক্তি আযীমতের উপর বহাল থাকে, তখন তা পুণ্য বলে বিবেচিত হবে না। অথবা এ কথাও বলা যায় যে, ঐ ব্যক্তি এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরও 'রোখসত' গ্রহণ না করার কারণে কঠোরতার জন্যে নবী ﷺ এরূপ বলেছেন। মূল কথা– সফরে রোজা রাখা নেকীর কাজ নয়, হাদীসের এ মর্মবাণী সর্বাবস্থায় সকল ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়; বরং বিশেষ ঘটনায় বিশেষ ব্যক্তির উপরে প্রযোজ্য হবে।

وَعَنْ ١٩٢٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَّامُوْنَ وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوْا الْاَبْنِيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯২৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে সফরে ছিলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক রোজাদার ছিল এবং কিছু লোক বে-রোজাদার ছিল। এক [প্রচণ্ড] গরমের দিনে আমরা এক মানজিলে অবতরণ করলাম। তখন রোজাদারগণ পড়ে রইলেন ও বে-রোজাদারগণ উঠে তাঁবু খাটালেন এবং বাহনের পশুগুলোকে পানি পান করালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আজ সব ছওয়াব বে-রোজাদারগণই নিয়ে গেল। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ -এর মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আজ সব ছওয়াব বে-রোজাদারগণই নিয়ে গেল। এখানে اَلْيَوْمَ [আজ] শব্দটি দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রোজা না রাখার বিধানটি সাধারণ নয়; বরং রোজা রাখাই উত্তম কাজ। তবে কোনো কোনো সময় বিশেষক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র কাজ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, ব্যক্তিগতভাবে দীন পালন করার চেয়ে সামাজিকভাবে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা উত্তম কাজ। সে দিনের সফরে রোজা না রাখাই তাঁদের পক্ষে উত্তম ছিল। কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে দীন পালন করতে গিয়ে সামাজিক কাজ তথা তাঁবু খাটানো এবং বাহন পশুগুলোকে পানি পান করানো ইত্যাদি করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ এ কাজগুলো সে দিনের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আজ সব ছওয়াব বে-রোজাদারগণই নিয়ে গেল। অর্থাৎ, ব্যক্তিগতভাবে দীন পালন করতে গিয়ে তারা এ কাজগুলোর ছওয়াব হতে বঞ্চিত হয়েছে।

وَعَنْ ١٩٢٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَاَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ وَ ذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ)

১৯২৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [মক্কা বিজয়ের বছর রমজান মাসে] মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং ওস্ফান নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত রোজা রাখলেন। অতঃপর তথায় পানি আনালেন এবং লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আপন হাতের সীমা পর্যন্ত উপরে উঠালেন এবং পানি পান করে রোজা ভাঙ্গলেন। মক্কায় এসে পৌঁছা পর্যন্ত রোজা ভাঙ্গতে থাকলেন। এটা ছিল রমজান মাসের ঘটনা।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [সফরে] রোজা রেখেও ছিলেন, ভেঙ্গেও ছিলেন। সুতরাং যে চায় রোজা রাখতে পারে এবং যে চায় ভাঙ্গতেও পারে। -[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি সেই দিন আসরের পরে [পানি] পান করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عُسْفَانَ -এর পরিচয় : জায়গাটির নাম হাদীসে 'ওসফান' বলা হলেও বর্তমানে এটা 'কোরাঈদ' আবার কারো নিকট 'কোরাউল গামীম' নামে পরিচিত। যেমন ঐতিহাসিক স্থান 'যুল হুলাইফা' বর্তমানে 'বীরে আলী' বা 'আব্ইয়ারে আলী' নামে

প্রসিদ্ধ এবং 'তানঈম' স্থানটি 'মসজিদে আয়েশা' বা 'ওমরায়ে সোগরা' নামে পরিচিত। সে যাই হোক 'ওসফান' নামক স্থানটি মদীনা হতে খুব একটা নিকটেও নয়। সুতরাং স্থান সম্পর্কে একাধিক অভিমত থাকলেও সংশ্লিষ্ট ঘটনার ব্যাপারে কারো মতানৈক্য নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٢٧ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْكَعْبِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلٰى - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৯২৭. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক কা'বী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুসাফির হতে অর্ধেক নামাজ এবং মুসাফির স্তন্যদায়িনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হতে রোজা প্রত্যাহার করেছেন। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

স্তন্যদানকারিণী ও গর্ভবতীর রোজার বিধান : স্তন্যদানকারিণী স্তন্যদানকালে এবং গর্ভবতী মহিলা গর্ভধারণকালে যদি তাদের সন্তানের কিংবা নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশঙ্কা করে তখন সেই সময়কালের জন্যে রোজা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে, এটাই সমস্ত ইমামের ঐকমত্য। তবে রোজা পরে কাজা করা ওয়াজিব হবে; এতে কাফফারা বা ফিদিয়া দিতে হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্তন্যদানকারিণী মাতা কাজা করবে এবং ফিদিয়াও আদায় করবে।

'মুসাফিরের অর্ধেক নামাজ মাফ'-এর অর্থ : মুসাফির হতে অর্ধেক নামাজ বলতে, চার রাক'আত বিশিষ্ট প্রত্যেক ফরজ নামাজের দু'রাক'আত চিরতরে মাফ করা হয়েছে। যেমন– জোহর, আসর ও ইশা। ফজর ও মাগরিব যথাক্রমে দুই ও তিন রাকাত পূর্ণ পড়তে হবে। অনুরূপভাবে সুন্নত এবং নফলও পূর্ণ পড়তে হবে।

বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

আনাস ইবনে মালেক আল কা'বী : ইনি আনাস ইবনে মালেক আল-কা'বী। তিনি নবী ﷺ -এর প্রসিদ্ধ সাহাবী ও বিশিষ্ট খাদেম আনাস নন। সেই আনাসের কুনিয়ত ছিল আবূ হামযা, বংশধর হিসেবে আনসারী, নাজ্জারী, খাযরাজী। তিনি নবী ﷺ হতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর এ কা'ব বংশীয় আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর কুনিয়ত হলো– আবূ উমামা। তাঁকে উকাইনী আমিরীও বলা হতো। এ আনাস হতে এ একটি মাত্র হাদীস صَوْمُ الْمُسَافِرِ বর্ণিত আছে। ইনি বসরাতেই বসবাস করতেন। নামের মিলের কারণে ভ্রমবশত এ 'আনাসকে' অনেকে নবী ﷺ -এর বিশিষ্ট খাদেম 'আনাসই' ধারণা করে থাকেন। তাই তাঁর নামের শেষে কা'বীও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

١٩٢٨ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُوْلَةٌ تَاْوِيْ اِلٰى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدْرَكَهُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

১৯২৮. অনুবাদ : হযরত সালামা ইবনে মুহাব্বাক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার এমন বাহন রয়েছে যাকে তা নিরাপদ ঘরে পৌঁছিয়ে দেবে, সে যেন রমজানের রোজা রাখে যেখানেই সে রোজা পায়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাধারণত ভ্রমণ হলো কষ্টদায়ক। প্রবাদ রয়েছে- اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ সফর বা ভ্রমণ হলো জাহান্নামের একটা অংশ। তবে আধুনিক যুগে অনেকের জন্যে ভ্রমণ সামান্যতমকষ্টদায়ক নয়; বরং আরামদায়ক। এ হাদীস পাঠে বুঝা যায় যে, ভ্রমণে রোজা ভাঙ্গার অনুমতির জন্যে কষ্ট হওয়া পূর্বশর্ত। পর্যটক, মুসাফিরের ভ্রমণ যেভাবেই হোক না কেন, রোজা ভাঙ্গার অনুমতি আছে বটে, তবে যে ভ্রমণ আরামদায়ক সে ভ্রমণে রোজা রাখা উত্তম। অবশ্য এখানে اَمْر টি نُدُبْ তথা মোস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩٢٩ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ اِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ اِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ اُولٰئِكَ الْعُصَاةُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯২৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর রমজান মাসে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌছা পর্যন্ত [পথে] রোজা রাখলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে রোজা রাখল। অতঃপর তিনি এক পেয়ালা পানি চেয়ে নিলেন এবং তা এতটা উপরে উঠালেন যাতে মানুষ তা দেখতে পায়। অতঃপর পানি পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বলা হলো যে, কিছু কিছু লোক রোজা রেখেছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এরা হলো পাপী। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনাটি ইতঃপূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ এ সফরের প্রথম দিকে নিজেই রোজা রেখেছিলেন, তবুও যারা রোজা ভাঙ্গেনি, তাদেরকে গুনাগহগার বা পাপী বলার কারণ এ নয় যে, সফরে রোজা রাখা জায়েজ নয়; বরং নবী করীম ﷺ -এর কাজের অনুসরণ না করা এবং তার বিপরীত কাজ করার কারণেই তিনি তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন।

বস্তুত রাসূল ﷺ এ সফরের প্রথম দিকে রোজা রেখেছিলেন, পরে রুখসতের উপর আমল করার ভিত্তিতে ছেড়ে দিয়েছেন। আসলে আল্লাহর রাসূল যখন আল্লাহপ্রদত্ত 'রুখ্সতের' উপর আমল করেছেন, লোকদেরও তা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কেননা, প্রয়োজনে 'রুখসতের' উপর আমল করা জরুরি, যেমন প্রথমে 'রাসূল ﷺ আযীমতের' উপর আমল করেছিলেন।

وَعَنْ ١٩٣٠ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَائِمُ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৯৩০. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সফরে রমজানের রোজাদার বাসস্থানে বে-রোজাদারের মতো। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিরোধযুক্ত দু'টি হাদীসের মধ্যকার সমাধান : এ পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লিখিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সফরে রোজা রাখা বৈধ। অন্যদিকে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সফরে রোজা রাখা বৈধ নয়। তাই হাদীসদ্বয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব বিরাজমান। এর সমাধান নিম্নরূপ-

১. ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর (রা.) ও দাউদে যাহেরী (র.)-এর মতে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি মানসূখ আর আব্দুর রহমান (রা.)-এর হাদীসটি নাসিখ। সুতরাং সফরে রোজা রাখা হারাম। কেননা, কুরআন ও অন্য হাদীসে এসেছে–

١. اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (الاية)

٢. لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ (اَلْحَدِيْثُ)

২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণিত হাদীসটি ঐ সকল লোকের জন্যে প্রযোজ্য যাদের সফরে রোজা রাখলে জীবননাশের আশঙ্কা রয়েছে। আর যাদের বেলায় এ আশঙ্কা নেই তাদের জন্যে আরো কল্যাণকর হবে। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহে বলা হয়েছে–

١. وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ . (اَلْقُرْاٰنُ)

٢. هِىَ رُخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ فَمَنْ اَخَذَهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ . (اَلْمُسْلِمُ)

৩. অথবা বলা যায়, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণিত হাদীস কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এর ব্যাপক ব্যবহার সমীচীন নয়।

৪. মিশকাত শরীফের হাশিয়ায় দ্বিতীয় হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা রাসূল ﷺ সফর অবস্থায় রোজার ব্যাপারে মুবালাগা করেছেন। মূলত ঐ নিষেধাজ্ঞা ছিল মাজুর ব্যক্তিদের জন্যে।

অত্র হাদীসের বোঝা যায় যে, মুকীম অবস্থায় কেউ রমজানের রোজা না রাখলে যে অপরাধ করে সফর অবস্থায় রোজা রাখলে সে সমান অপরাধ করে।

অপরদিকে ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত সালামা ইবনে মুহাব্বাক (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, যার এমন বাহন রয়েছে যা তাকে নির্বিঘ্নে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয় সে যেন রমজানের রোজা রাখে যেখানেই রোজা পায়। এতদ্ব্যতীত রাসূল ﷺ মক্কা অভিমুখে সফরের প্রথম দিকে নিজেই সাহাবীগণ সহ রমজানের রোজা রেখেছিলেন। উভয় বর্ণনায় সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে।

সমাধান : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি তাদের জন্যেই প্রযোজ্য, যারা সফরে রোজা রাখলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে ক্লান্তি পরবর্তীকালে জীবননাশের কারণ হয়ে পড়ে অথবা সফরের মূল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে ফেলে। আর হযরত সালামা (রা.)-এর হাদীস সুস্থ ও সামর্থ্যবান লোকদের জন্যে প্রযোজ্য।

وَعَنْ ١٩٣١ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَسْلَمِىِّ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ بِىْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ قَالَ هِىَ رُخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ اَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৩১. অনুবাদ : হযরত হামযা ইবনে আমর আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সফর অবস্থায় রোজা রাখার মতো শক্তি রাখি। রোজা রাখলে আমার পাপ হবে কি? রাসূল ﷺ বললেন, এটা আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ানের পক্ষ হতে অনুমতি। সুতরাং যে তাকে গ্রহণ করবে ভাল করবে, আর যে রোজা রাখতে পছন্দ করবে তার উপরে কোনো গুনাহ বর্তাবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে মোটামুটিভাবে তিনটি জিনিস স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে আর তা হলো–

১. সফরে রোজা রাখা বা না রাখার এখ্তিয়ার আছে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে একটি বিশেষ অনুদান বা অনুমতি। ফলে তাঁর অনুদান গ্রহণ করা উত্তম কাজ হবে এবং দাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

২. রোজা না রাখাকে 'হাসান' অর্থাৎ উত্তম কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই রোজা না রাখাই ভাল।

৩. যারা সফরে রোজা রাখে, তারা কোনো অবৈধ বা গুনাহের কাজ করে না। বস্তুত এ কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যারা সফররত অবস্থায় রোজা রাখাকে গুনাহ বলে ধারণা করতেন। অত্র হাদীসের দ্বারা সে ভুল ধারণার অবসান হয়ে গেল।

بَابُ الْقَضَاءِ
পরিচ্ছেদ : রোজার কাযা

اَلْقَضَاءُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– আদায় করা, সম্পাদন করা, পরিশোধ করা বা পূর্ণ করা। আর এখানে ছেড়ে দেওয়া রোজা ভেঙ্গে ফেললে বা রাখতে সক্ষম না হলে সমপরিমাণ রোজা পরবর্তীতে আদায় করে দিলেই চলে, কিন্তু বিনা কারণে রোজা ভঙ্গ করে ফেললে, কিংবা না রাখলে তার কাফফারা ও কাজা উভয়টি আদায় করতে হবে। অন্যথায় কঠিন গুনাহগার হবে। কিন্তু ভুলবশত রোজা ভঙ্গ করে ফেললে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যেতে হবে। আর এর জন্যে কাজা কাফফারা কিছুই দিতে হবে না। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٣٢ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ يَكُوْنُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِىَ اِلَّا فِىْ شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ تَعْنِى الشُّغْلَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ بِالنَّبِىِّ ﷺ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৩২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার উপরে রমজানের রোজার কাজা আবশ্যক হতো আমি তা [পরবর্তী] শা'বান মাস ছাড়া পূর্ণ করতে সক্ষম হতাম না। রাবী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, এর দ্বারা তিনি তাঁর সাথে নবী করীম ﷺ -এর কাজ অথবা নবী করীম ﷺ -এর সাথে তাঁর কাজ থাকার কথা বুঝিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلشُّغْلُ -এর অর্থ : এখানে شُغُلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বামী স্ত্রীর মেলামেশা। অর্থাৎ নবী ﷺ এ মাসের অধিকাংশ দিন রোজা রাখতেন।

রমজানের কাজা রোজা আদায়ে দেরি করার হুকুম : স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যে রমজানের কাজা রোজা বৎসরের শেষ মাস পর্যন্ত পিছানো যেতে পারে। তবে পরবর্তী রমজান মাস আসার পূর্বেই তা আদায় করতে হবে। হযরত আয়েশার নিজস্ব নীতিই এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। পরবর্তী রমজানের পরও তা পিছানোর ব্যাপারে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, কাজার সাথে কাফফারাও দিতে হবে। এ কাফফারা বা ফিদিয়া হলো, প্রতিটি রোজার জন্য এক মুদ [প্রায় এক পাউন্ড] গম। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিদিয়া দেওয়া আবশ্যক বলে মনে করেন না। তবে এতটা পিছানোকে তিনি অনুচিত বলে মনে করেন।

١٩٣٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا تَاْذَنَ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে তার স্বামীর [বাড়িতে] উপস্থিত থাকাকালে তার অনুমতি ব্যতীত [নফল] রোজা রাখা বৈধ নয় এবং স্বামীর ঘরে কাউকে তার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া জায়েজ নেই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল রোজা রাখার বিধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় অনুমতি [চাই তা কথার দ্বারা হোক কিংবা কাজের দ্বারা] ব্যতীত স্ত্রীর পক্ষে নফল রোজা রাখা জায়েজ নেই। তবে যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোজা রেখে বসে, তখন তার দুই অবস্থা হতে পারে–

১. স্বামী পরে অনুমতি প্রদান করেছে, এমতাবস্থায় সে রোজা পূর্ণ করবে।

২. আর যদি সে রোজা ভাঙ্গতে নির্দেশ দেয়, তখনই তা ভেঙ্গে ফেলবে এবং স্বামীর অনুসরণ করবে। এ ভাঙ্গা রোজা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ আছে।

নফল রোজা ভাঙ্গলে তার বিধান : নফল রোজা ভঙ্গ করে ফেললে এর বিধান কি হবে এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, স্বামীর নির্দেশে স্ত্রী যদি রোজা ভেঙ্গে ফেলে, স্ত্রীর পরে তা কাজা করতে হবে। কেননা, নিয়ত করার কারণে উক্ত নফল রোজা পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সে যদি কাজা না করে, তবে আল্লাহর বাণী– لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কাজা করা ওয়াজিব নয়। কেননা, স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোজা রাখা শুরু করলেও প্রকৃতপক্ষে তা রোজা বলে গণ্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্যের জবাবে হানাফীগণ বলেন, স্বামীর অনুমতি নেওয়া রোজার শর্ত বা রুকন নয়; বরং এটা একটি অতিরিক্ত সংযোজিত বিষয়। মূল রোজার মধ্যে এর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। যেমন, জুমার আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে, তবে মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার কারণে সে অপরাধী হবে। কিন্তু যদি মসজিদের দিকে যাওয়া অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপভাবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোজা রাখলে মূল রোজার মধ্যে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হবে না, ভঙ্গ করলে তার কাজা করতে হবে।

وَلَا تَأْذَنَ فِىْ بَيْتِهِ-এর অর্থ : এখানে 'অন্য লোক' দ্বারা 'গায়রে মুহরিমকে বুঝানো হয়েছে। তবে মুহরিম ব্যক্তির আসা কিংবা অনুমতি দেওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। অবশ্য কোনো মুহরিম সম্পর্কে স্বামীর আপত্তি থাকলে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের বর্তমান সমাজে রাসূলের এ হাদীসটি সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষিত হয়ে আছে। ফলে এর বিষফল গোটা সমাজকে কলুষিত করে রেখেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার দরুন সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং পারিবারিক কলহ প্রায়ই দেখা যায়।

وَعَنْ ١٩٣٤ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ يُصِيْبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৩৪. অনুবাদ : মহিলা তাবিয়ী হযরত মুয়াযা আদাভিয়া (র.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণ যে, ঋতুবতী স্ত্রীলোক রোজার কাজা করে আর নামাজের কাজা করে না? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাদেরও এটা [ঋতুস্রাব] হতো, তখন আমাদেরকে রোজার কাজা করতে আদেশ করা হতো এবং নামাজের কাজা করতে আদেশ করা হতো না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রশ্নের সাথে উত্তরের যুক্তিকতা : সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম কি তাই জানতে চাইতেন, হুকুমের কারণ বা যৌক্তিকতা জানতে চাইতেন না। অত্র হাদীস তারই প্রমাণ বহন করে। হযরত মুয়াযা বিবি আয়েশা (রা.)-কে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি সংক্ষেপে এ কথাই ব্যক্ত করেন যে, আমাদেরকে যেরূপ আদেশ করা হতো আমরা সেরূপই করতাম এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করতাম না। অথচ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

এর কারণ হলো, কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে দৃঢ় বিশ্বাস করার পর তার আদেশের কারণ জানতে চাওয়া তাকে বিশেষজ্ঞ বলে দৃঢ় বিশ্বাসের পরিপন্থি। যেহেতু সাহাবীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে দৃঢ় প্রত্যয়ের পর তাদের আদেশের কারণ জানতে চাওয়ার প্রশ্নই আসত না। এতদ্ব্যতীত আদেশ পালন আদেশের যৌক্তিকতা জানার উপর নির্ভরও করে না। বিশেষজ্ঞ বা মনিবের আদেশ নিঃশর্তে পালন করাই প্রকৃত কাজ।

এছাড়াও শরিয়তের প্রতিটি কাজের পেছনে যথাযথ কারণ ও যৌক্তিকতা রয়েছে। অনেক কারণ ও যুক্তি মানুষের কাছে বোধগম্য, যা বুদ্ধিমান লোকেরা গবেষণা করলেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। আবার অনেক কারণ ও যুক্তি মানুষের কাছে এত সূক্ষ্ম যে, যা আল্লাহর রাসূল ব্যতীত কেউ বুঝতে পারে না।

ঋতুমতীর ক্ষেত্রেও রোজা পরে কাজা করা এবং নামাজ পরে কাজা না করার কারণ গভীরভাবে চিন্তা করলেও কদাচিৎ উপলব্ধি করা যায়। ইসলামি শরিয়তে কোনো বিধানই বান্দার জন্যে কঠিন করা হয়নি; বরং মধ্যমপন্থা অনুসরণ করা হয়েছে এবং বান্দার সাধ্য-সীমার মধ্যেই তাকে সহজ করা হয়েছে। স্ত্রী লোকের ঋতুস্রাব হয় বছরে বারবার, আর একবারের ঋতুস্রাব দশদিনও স্থায়ী হতে পারে। যাতে স্ত্রী লোকটিকে এক সাথে (৫ × ১০) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ কাজা আদায় করতে হবে। এটা বান্দার পক্ষে বহু কষ্টসাধ্য বলে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রোজা আসে বছরে একবার। এ সময়ের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকের একবার বা একাধিক বারের ঋতুস্রাবে সর্বোচ্চ দশদিন রোজা কাজা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তা পূর্ণ করা কষ্টকর নয়। কোন কাজ বান্দার পক্ষে কষ্টসাধ্য আর কোন কাজ কষ্টসাধ্য নয়, তা বিচার করার দায়িত্ব তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই উপর; বান্দার উপর নয়।

ঋতুমতীর নামাজ ও রোজার বিধানে পার্থক্যের কারণ : শরিয়তের বিধানসমূহ যুক্তিভিত্তিক। এর কোনোটিও অযৌক্তিক নয়, যদি এমনটি হতো তবে চিন্তা, গবেষণা ও ফিক্‌র করার নির্দেশ কুরআনে দেওয়া হতো না। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, অনেক কারণ ও যুক্তি মানুষের জ্ঞানের বাইরে যা বুদ্ধির আওতায় আসে না। সুতরাং এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণই ভালভাবে জ্ঞাত ছিলেন ও আছেন। ঋতুমতী নারীর নামাজ-রোজা কাজা করার ব্যাপারে পার্থক্য হওয়ার কারণ ইসলামি চিন্তাবিদগণ এটাই নির্ণয় করেছেন যে, ইসলামী শরিয়তের কোনো বিধানই আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর অযৌক্তিকভাবে বোঝা স্বরূপ কঠিন করে চাপিয়ে দেন না; বরং বান্দার সাধ্য-সীমায় সহজই করেছেন।

স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় বৎসরে বারো বার। একবারের স্রাব দশ দিনও দীর্ঘায়িত হতে পারে, ফলে তাকে প্রাত্যহিক নামাজের উপরে আরো ৫০ ওয়াক্ত নামাজ অতিরিক্ত আদায় করতে হবে। তদুপরি পারিবারিক ও বৈষয়িক নিত্য দিনের কাজ-কর্ম তো আছেই। কাজেই এ বর্ধিত নামাজ তার জন্যে কষ্টসাধ্য হবেই। তাই এটা মাফ করে দেওয়া হয়েছে। আর রোজা আসে বৎসরে একবার। এ সময়ের মধ্যে ঊর্ধ্বে দশ দিনের রোজা কাজা হতে পারে। কিন্তু এগার মাসের মধ্যে এ দশ দিনের দশটি রোজা আদায় করা সহজ-সাধ্য। এটাই পার্থক্যের কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি কোন কাজ বান্দার পক্ষে কঠিন আর কোনটি সহজ, এর ফয়সালা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই ভাল জানেন।

وَعَنْ ١٩٣٥ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৩৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে অথচ তার জিম্মায় [ফরজ] রোজা রয়েছে, তার পক্ষে তার অলি [অভিভাবক] রোজা রাখবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একজনের পক্ষ হতে রোজা রাখার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে আর তার জিম্মায় ফরজ রোজা অবশিষ্ট থেকে যায় তবে তার হুকুম কি হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاَهْلِ الْحَدِيْثِ وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম আহমদ (র.), আহলে হাদীস ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম মতানুসারে সেই মৃতের পক্ষ হতে তার অলি রোজা রাখবে। তারা অত্র হাদীস এবং নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। "একজন মহিলা নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আমার মা মারা গিয়েছেন অথচ তার জিম্মায় রোজা বাকি রয়েছে, আমি কি তার পক্ষ হতে রোজা রাখব? নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ হতে রোজা রাখবে।"

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِىِّ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় মতানুসারে মৃতের পক্ষ হতে তার অলি রোজা রাখবে না। যদি সে অসিয়ত করে যায় তবে অলি মৃতের পক্ষ হতে খাদ্য খাওয়াবে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ হতে রোজা রাখবে না, বরং তার পক্ষ হতে মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। –[নাসায়ী]

২. হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে আর তার জিম্মায় রমজান মাসের রোজা বাকি থাকবে, তবে যেন তার পক্ষ হতে প্রত্যেক দিনের রোজার স্থলে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো হয়।"

৩. ইমাম মালেক (র.) এর কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হতো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ হতে রোজা রাখতে পারবে কি? অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ হতে নামাজ পড়তে পারবে কি? তখন তিনি বলতেন, না, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ হতে রোজা রাখবে না এবং নামাজও পড়বে না। –[মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক]

দলিলের জবাব :

১. যারা রোজার প্রতিনিধিত্ব জায়েজ বলার পক্ষপাতী তাদের প্রথম দলিলের জবাবে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং ইমাম আহমদ (র.)-ই হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসকে গায়রে মাহফূয বলেছেন। কেননা, উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ জাফর অনির্ভরযোগ্য (مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ) ছিলেন।

২. এতদ্ব্যতীত হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়াতের বিপরীতে তার নিজস্ব ফতোয়া لَا تَصُوْمُوْا عَنْ مَوْتَاكُمْ [তোমাদের মৃতদের পক্ষে রোজা রাখবে না] রয়েছে। এ জন্যেই ইমাম বায়হাকী (র.) বলেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি দ্বা'ঈফ। কেননা, আল্লামা আইনীর মতে, যদি রাবী নিজের রিওয়ায়াতের বিপরীত ফতোয়া প্রদান করেন, তবে রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য না; বরং ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. ইমাম মাওয়ারদী (র.) বলেন– صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ-এর অর্থ হবে فَعَلَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا يَقُوْمُ مَقَامَ الصَّوْمِ وَهُوَ الْاِطْعَامُ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত যে মিসকিনকে খানা খাওয়ানো বাকি রয়েছে অলি তা আদায় করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٣٦ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ)

১৯৩৬. অনুবাদ : হযরত নাফে' (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার জিম্মায় রমজান মাসের রোজা বাকি রয়েছে তবে যেন তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো হয়। –[তিরমিযী]

তিরমিযী (র.) বলেছেন, এটাই সঠিক যে, হাদীসটি ইবনে ওমর (রা.) পর্যন্ত মওকূফ অর্থাৎ এটা ইবনে ওমরের কথা; রাসূল ﷺ -এর বাণী নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِقَوْلِهِ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا-এর মর্মার্থ : হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ মৃতের পক্ষ হতে তার অভিভাবক রোজা রাখবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ বলেছেন, এখানে রোজা রাখবে অর্থ, ফিদিয়া দেবে। অর্থাৎ প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। মহানবী ﷺ -এর উপরোক্ত উক্তিটি এ কথারই সমর্থন করে।

قَوْلُهُ إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ -এর **মর্মার্থ** : ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, সঠিক কথা হলো, হাদীসটি ইবনে ওমর পর্যন্ত মওকূফ। অর্থাৎ এটা ইবনে ওমরের মুখনিঃসৃত বাণী, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী নয়। তবে হাদীস বিজ্ঞানের একটি সূত্র রয়েছে যে, সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত কোনো শরয়ী বিধান যদি বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি বহির্ভূত হয়, তখন মনে করতে হবে যে, তা তার [সাহাবীর] মুখনিঃসৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ -এরই কথা। এ হিসেবে হাদীসটি মারফূ' হাদীসেরই অন্তর্ভুক্ত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩٣٧ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رضـ) كَانَ يَسْئَلُ هَلْ يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ اَوْ يُصَلِّىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ فَقَالَ لاَ يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلَيُصَلِّىْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ - (رَوَاهُ فِى الْمُؤَطَّاِ)

১৯৩৭. **অনুবাদ** : ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁর কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ হতে রোজা রাখতে পারে কি? অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ হতে নামাজ আদায় করতে পারে কি? উত্তরে তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ হতে রোজা রাখতে পারে না, নামাজও আদায় করতে পারে না। –[মুয়াত্তা]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর অভিমত জানা গেল যে, শারীরিক ইবাদতে অন্যের প্রতিনিধিত্ব জায়েজ নেই। অনুরূপ অভিমত হযরত ইবনে আব্বাসেরও ছিল। যদিও তাঁর বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে তার মায়ের পক্ষ হতে রোজা রাখতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

তবে প্রকৃত কথা হলো, অনুমতির হাদীস যে রহিত তথা মানসূখ হয়ে গেছে এ কথা তারা উভয়েই অবগত ছিলেন, অন্যথায় হাদীসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

পরিচ্ছেদ : নফল রোজা

اَلتَّطَوُّعُ শব্দটি বাবে تَفَعُّلْ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– নফল বা অতিরিক্ত। অর্থাৎ কোনো রকম বাধ্যবাধকতা ব্যতীত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কোনো আমল করাকে اَلتَّطَوُّعُ বলে। যেমন– প্রত্যেক চাঁদের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ রোজা রাখা। একে আইয়্যামে বীজও বলা হয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে নফল রোজা সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْهُ شَيْئًا فِيْ شَعْبَانَ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلَّا قَلِيْلًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোজা রাখতে থাকতেন যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি [এ মাসে] আর রোজা ছাড়বেন না, আবার তিনি রোজা ভাঙ্গতে শুরু করতেন যাতে আমরা বলতাম যে, তিনি [এ মাসে] আর রোজা রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রমজান মাস ছাড়া আর কখনো পূর্ণ মাস রোজা রাখতে দেখিনি। আর তাঁকে শা'বান মাস ব্যতীত কোনো মাসে এত বেশি রোজা রাখতেও দেখিনি।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি [আয়েশা] বলেছেন, রাসূল ﷺ শা'বানের পূর্ণ মাসই রোজা রাখতেন। তিনি শা'বানের রোজা রাখতেন তবে অল্প কিছুদিন [রাখতেন না]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلَّا قَلِيْلًا -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ–

- ইমাম নববী (র.) বলেন, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটির ব্যাখ্যা كُلَّهُ অর্থ غَلَبَهُ অর্থাৎ অধিকাংশ দিনই তিনি রোজা রাখতেন।
- কারো মতে, বাক্য দু'টির ব্যাখ্যা এভাবে হবে যে, কোনো কোনো বছর রাসূল ﷺ পূর্ণ মাস রোজা রাখতেন এবং কোনো কোনো বছর অধিকাংশ দিন রোজা রাখতেন।

  তবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, রাসূল ﷺ এ মাসে এত অধিক রোজা রাখতেন কেন? হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এর কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দিয়েছেন, এর মধ্যে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

  কারো মতে, রমজান মাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এর প্রস্তুতি হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি এ মাসে রোজা রাখতেন, যাতে রমজানের রোজার জন্যে অভ্যাস সৃষ্টি হয়।
- কেউ কেউ বলেন, নবী করীম ﷺ -এর যেসব স্ত্রীর রমজান মাসের রোজা ছুটে যেত, তা তাঁরা সারা বছরে কাজা করার সুযোগ পেতেন না এবং শা'বান মাসেই কাজা করতেন। মহানবী ﷺ-ও তাঁদের সাথে রোজা রেখেই মাসটি অতিবাহিত করতেন।

তবে নাসায়ী ও আবূ দাঊদ শরীফে হযরত উসামা ইবনে যায়েদের সূত্রে এ সম্পর্কে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তা-ই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। হযরত উসামা (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ -কে এ মাসে [শা'বান মাসে] বেশি বেশি করে রোজা রাখার

কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, লোকেরা রজব ও রমজান এ দু'মাসের খুবই গুরুত্ব দেয় এবং রোজাও রাখে; কিন্তু মধ্যবর্তী এ মাসটিকে [শা'বানকে] উপেক্ষা করে চলে। অথচ এ মাসেই বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হয়। আর আমার কামনা হলো, আমার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করার সময় আমি রোজা অবস্থায় থাকি। এ কারণেই আমি শা'বান মাসে বেশি বেশি রোজা রাখি।

وَعَنْ ١٩٣٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ (رض) قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتّٰى يَصُوْمَ مِنْهُ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৩৯. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম ﷺ কি কোনো মাস পুরোপুরিই [নফল] রোজা রাখতেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর সম্বন্ধে জানি না যে, তিনি রমজান ব্যতীত আর কোনো মাসের পুরাটা রোজা রেখেছেন এবং কিছু রোজা না রেখে কোনো পুরা মাস রোজা ছেড়েছেন যে পর্যন্ত না তিনি ইহলোক ছেড়ে গেছেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٩٤٠ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৪০. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন অথবা কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আর ইমরান তা শুনেছিলেন [রাবীর সন্দেহ]। রাসূল ﷺ বলেছেন– হে অমুকের বাপ! তুমি কি [এ বছর] শা'বানের শেষের দিকে রোজা রাখনি? তিনি বললেন, জি না। রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে যখন তুমি [রমজানের রোজা সম্পন্ন করে] রোজা ছাড়বে তখন দু'দিন রোজা রাখবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সারার (سَرَرٌ) শব্দের অর্থ : سَرَرٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে মতামতসমূহ নিম্নরূপ–

- ইমাম আবূ দাউদ (র.) কোনো কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, মাসের মাঝের দিককে 'সারার' বলা হয়। কারণ (سَرَرٌ) 'সারার' سُرَّةٌ সুররাতুন-এর বহুবচন। কোনো বস্তুর সুররাহ (سُرَّةُ الشَّيْءِ) তার মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয়। আইয়ামে বীজের নফল রোজার বিষয়টি এ মতের সহায়তা করেছে। যেহেতু আইয়ামে বীজ মাসের মধ্যবর্তী সময়।
- ইমাম আবূ দাউদ (র.) আওযায়ী ও সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, কোনো বস্তুর সারার তার প্রথম অংশকে বলা হয়।
- আর আবূ ওবাইদ ও জমহূর ওলামায়ে কেরাম বলেন, এখানে 'সারার' শব্দ দ্বারা মাসের শেষের দিককে বুঝানো হয়েছে। কেননা, ফাররা বলেন, 'সারার' سَرَرٌ শব্দটি ইস্তিস্রার اِسْتِسْرَارٌ হতে নেওয়া হয়েছে। ইস্তিস্রার অর্থ বিলুপ্ত থাকা বা বিলুপ্ত হওয়া, আর মাসের শেষের দিকেই চন্দ্র বিলুপ্ত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে চান্দ্র মাসের আটাশ, উনত্রিশ ও ত্রিশ তারিখের রাতকে ইস্তিস্রার বলা হয়।

দুই হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও এর সমাধান : সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রমজানের অব্যবহিত পূর্বে দু'একদিন নফল রোজা রাখা নিষেধ। অথচ আলোচ্য হাদীসে সে দিনগুলোতে রোজা রাখার নির্দেশ পাওয়া যায়। এর জবাবে বলা যায় যে, ঐ দিনগুলোতে নফল রোজা রাখা নিষেধ বটে, কিন্তু যে ব্যক্তির এ অভ্যাস চলে আসছে যে, সে প্রতি সপ্তাহের নির্ধারিত এক দু'দিন রোজা রাখে, অথবা তার কোনো মান্নতের রোজা আদায় করা ওয়াজিব ছিল। এ দু'প্রকারের রোজা শা'বানের শেষভাগে

রাখতে নিষেধ নেই। সম্ভবত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে মাসের শেষে রোজা রাখতেন, নবী করীম ﷺ তা জানতেন না। আর লোকটি জেনে নিলেন যে, নবী করীম ﷺ রমজানের এক দু'দিন পরে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন, তাই তিনি নিজের অভ্যাসগত রোজা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে হুযূর ﷺ তাকে বললেন, রমজানের শেষে তোমার ঐ রোজা আদায় করে নেবে। যেহেতু অভ্যাসের ও মান্নতের রোজা শা'বানের শেষ দু দিন রাখা নিষেধ নয়।

وَعَنْ ١٨٤١ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– রমজানের পরে আল্লাহর মাস মহররমের রোজাই হলো শ্রেষ্ঠ রোজা এবং ফরজ নামাজের পরে রাতের নামাজই হল সর্বোত্তম নামাজ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ-এর ব্যাখ্যা : উপরের হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ সাধারণত শা'বান মাসেই খুব বেশি নফল রোজা রাখতেন। আর অত্র হাদীসে নফল রোজার জন্য মহররম মাসকেই সর্বোত্তম বলা হয়েছে। মূলকথা হলো নবী করীম ﷺ শা'বানে অধিক নফল রোজা রাখতেন। এর কারণ কি? এর জবাবে বলা হয় যে, বিভিন্ন কারণে মহররম মাসের ফজিলতের কথা বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে– এ মাসে সর্বপ্রথম রহমতের বৃষ্টি পৃথিবীতে বর্ষিত হয়েছে। হযরত নূহের নৌকা মাটি তথা পাহাড়ের সাথে ঠেকেছে। হযরত আইয়ূব (আ.) দীর্ঘ কয়েক বৎসর রোগাক্রান্ত থাকার পর আরোগ্য লাভ করেছেন। হযরত মূসা (আ.) ফিরাউনের কবল হতে সদলবলে মুক্তি লাভ করেছেন। ঐ তারিখেই কিয়ামত হবে। এ কারণেই অত্র মাসের মর্যাদা সব চেয়ে বেশি। আর নবী করীম ﷺ যে কারণে শা'বান মাসে অধিক নফল রোজা রাখতেন, ইতঃপূর্বে যথাস্থানে তা আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ণ মাস না শুধু আশূরার দিবস উদ্দেশ্য : এখানে كُلٌّ 'পূর্ণ' বলে جُزْءٌ 'অংশ' বুঝানো হয়েছে। এ দিনের ফজিলত পূর্ব থেকেই ছিল। তবে রাসূলে করীম ﷺ তাঁর জীবনের শেষলগ্নে অবগত হয়েছেন যে, মহররমের পূর্ণ মাসটিই নফল রোজার জন্যে উত্তম। ন্যূনতম আশূরার তিনটি রোজা রাখা সকলের জন্যে একান্ত কর্তব্য।

صَلٰوةُ اللَّيْلِ-এর ব্যাখ্যা : রাতের নামাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাহাজ্জুদ নামাজ। অত্র হাদীসে দেখা যায় যে, তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নতসমূহ হতেও উত্তম। কারণ, এতে অধিক ধৈর্য ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আবার কোনো কোনো হাদীস বিশারদের মতে, রাতের নামাজ বলে এখানে বিতর নামাজকেই বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ١٩٤٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَحَرّٰى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِىْ شَهْرَ رَمَضَانَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৪২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ আশূরার দিন এবং এ রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোনো দিনের রোজা রাখাকে এত অধিক ছওয়াবের বলে ধারণা করতে এবং অপরাপর দিনসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে দেখিনি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আশুরার দিনের রোজার হুকুম : আশুরার দিনের রোজার হুকুম সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে, যা নিম্নরূপ–

- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– صُوْمُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ 'তোমরা [মহররমের] নবম ও দশম তারিখে রোজা রাখ এবং ইহুদিদের বিপরীত কর'। এ হাদীসটির ভিত্তিতে শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় আলেম বলেন, নবম ও দশম তারিখ মোট দু'দিন রোজা রাখা মোস্তাহাব।

- শাফেয়ী মাযহাবের অপর কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, শুধু নবম তারিখ রোজা রাখা মোস্তাহাব। তারা নিজেদের পক্ষে দলিল হিসেবে মহানবী ﷺ -এর বাণী– لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ উপস্থাপন করেন। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, দশম তারিখে এবং তার আগের দিন বা পরের দিন অর্থাৎ মোট দু' দিন রোজা রাখা মোস্তাহাব। শুধু একদিন রোজা রাখা মাকরুহ। কেননা, এতে ইহুদি ও নাসারাদের সামঞ্জস্য করা হয়। তারা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করেন–
- ইমাম আহমাদ (র.) বর্ণনা করেন– صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا এখানে وَبَعْدَهُ -এর "و" বর্ণটি او অর্থাৎ অথবা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, আগের দিন বা পরের দিন, যে কোনো একদিন রোজা রাখলেই তাদের বিরোধিতা প্রমাণিত হবে।

অবশ্য কারো মতে, হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ হলো যে, দশম তারিখে এবং তার আগে একদিন ও পরে একদিন অর্থাৎ নবম, দশম ও একাদশ এ তিন দিন রোজা রাখা মোস্তাহাব।

আশুরার দিনের রোজার ফজিলত : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– আশূরার রোজায় এক বছরের [সগীরা] গুনাহর কাফফারা হয়। আর আরাফার দিনের রোজায় দু'বছরের সগীরা গুনাহের কাফফারা হয়। এতে বুঝা যায় যে, আশূরার দিনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অত্র হাদীসে বর্ণিত ধারণা হযরত ইবনে আব্বাসেরই, এটা রাসূল ﷺ -এর কোনো ধারণা বা অভিমত নয়। কেননা, কাতাদাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসে বুঝা যাচ্ছে যে, আশূরার দিন অপেক্ষা আরাফার দিনই শ্রেষ্ঠ। তবে এ কথা বাস্তব যে, অন্যান্য দিনের তুলনায় আশুরার দিনের গুরুত্ব বেশি।

١٩٤٣ - وَعَنْهُ (رضـ) قَالَ حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৪৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিনের রোজা রাখলেন এবং সাহাবীদেরকে রোজা রাখার জন্য আদেশ করলেন। তখন সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এমন একটি দিন যাকে ইহুদি ও নাসারাগণ সম্মান প্রদর্শন করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে অবশ্যই নবম তারিখেও রোজা রাখব। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَاَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ -এর ব্যাখ্যা : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিনের রোজা রাখলেন এবং তাতে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এমন একটি দিন যাকে ইহুদি ও নাসারারা সম্মান প্রদর্শন করে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরিউক্ত উক্তি করলেন, অর্থাৎ আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই নবম তারিখে রোজা রাখব।

এখন প্রশ্ন হয় যে, রাসূল ﷺ নবম তারিখে রোজা রাখার অঙ্গীকার করলেন কেন? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

মহানবী ﷺ নবম তারিখে রোজা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন, ইহুদি ও নাসারাদের সাথে সামঞ্জস্য পরিহার করার লক্ষ্যে। কেননা, তারা মহররমের দশ তারিখে রোজা রাখত। ঐ দিন রোজা রাখার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ঐ দিনের সম্মান প্রদর্শন করা। আর ঐ দিন তারা ফিরআউনের কবল হতে মুক্তি পেয়েছিল, তাই এর শুকরিয়া আদায় করার উদ্দেশ্যে ঐ দিন রোজা রাখত। আর শুকরিয়ার রোজা নির্ধারিত তারিখ হতে এগিয়ে বা পিছিয়ে রাখা জায়েজ আছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, যদিও পরবর্তী মহররমের পূর্বেই রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি মহররমের নবম তারিখে রোজা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন, তাই ঐ তারিখে রোজা রাখা সুন্নত।

▮ অথবা রাসূল ﷺ -এর অত্র বক্তব্যের মর্ম হলো এই যে, আগামী বছর নবম ও দশম দু' দিনই রোজা রাখব। এতেও তাদের সাথে সামঞ্জস্য পরিহার করা হবে।

মহানবী ﷺ -এর যদি উদ্দেশ্য হতো তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত করা তবে তিনি রোজা রাখাই বর্জন করতেন। বুঝা গেল যে, শুধু সাদৃশ্য হওয়ারই বিপরীত করতে সংকল্প করেছিলেন, অন্য কিছু নয়।

وَعَنْ ١٩٤٤ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ (رضـ) أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৪৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাতা উম্মুল ফজল বিনতে হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার আরাফার দিনে তার কাছে কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোজা রাখা সম্পর্কে পরস্পরে বিতর্ক করতে লাগল তাদের কেউ কেউ বলল, তিনি রোজাদার। অবার কেউ কেউ বলল– তিনি রোজাদার নন। তখন [বিতর্কের মীমাংসার জন্যে] আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম। এ সময় রাসূল ﷺ আরাফার প্রান্তরে স্বীয় উটের পিঠে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি তা পান করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আরাফার দিন রোজা রাখার বিধান : বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-ও আরাফার দিনে অর্থাৎ জিলহজ মাসের নয় তারিখে আরাফার মাঠে রোজা রাখেননি। অতএব, হাজীদের জন্যে এ তারিখে নফল রোজা না রাখাই উত্তম এবং যারা হজে উপস্থিত হননি তাদের জন্যে এ তারিখে রোজা রাখাই শ্রেয়।

وَعَنْ ١٩٤٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَائِمًا فِى الْعَشْرِ قَطُّ . (رواه مسلم)

১৯৪৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনো জিলহজের প্রথম দশ দিন রোজা রাখতে দেখিনি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বন্দ্বের সমাধান : মাশহূর হাদীস হতে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর ইবাদতের জন্য জিলহজ মাসের প্রথম দশদিন হতে অধিক পছন্দনীয় আর কোনো দিন নেই। এ দিনগুলোর এক এক দিনের রোজা এক বছরের রোজার সমতুল্য এবং তার প্রত্যেক রাতের নামাজ কদরের রাতের নামাজের সমতুল্য। এছাড়া জিলহজের প্রথম দিকের নয় দিনের রোজা রাখা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত। তবে কিভাবে এ কথা বলা চলে যে, রাসূল ﷺ কখনো জিলহজের প্রথম দশদিন রোজা রাখেননি? যেমন– অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর সমাধান নিম্নরূপ–

▮ রাসূল ﷺ জিলহজের প্রথম দশদিন যে রোজা রেখেছিলেন সম্ভবত বিবি আয়েশা (রা.) তা জানতে বা দেখতে পাননি। কেননা, রাসূল ﷺ সকল দিন তাঁর ঘরে কাটাননি, অন্যান্য বিবিদের ঘরে বা সফরে কাটিয়েছেন। সুতরাং তাঁর হাদীসটিতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতই প্রকাশিত হয়েছে, প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হয়নি। কাজেই তা অন্যান্য হাদীসের বিপরীত নয়। আর যদি বিপরীতই মেনে নেওয়া হয় তবে তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, হ্যাঁ-বাচক (اِثْبَاتٌ) ও না-বাচক (نَفِيْ) উভয় প্রমাণ একত্র হলে হ্যাঁ বাচক প্রমাণকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অথবা এ হাদীসের অর্থ হতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ -কে একাধারে রোজা রাখতে দেখেননি। এতদসত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ -এর রোজা না রাখা উক্ত রোজা সুন্নত হওয়াতে বাধা সৃষ্টি করে না। কারণ রাসূল ﷺ -এর কথা ও কাজে তা সুন্নত বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ তার ছওয়াব সম্পর্কে যা বলেছেন

তাতেই বুঝা যায় যে, এ দিনগুলোতে রোজা রাখার প্রতি তাঁর অত্যধিক আগ্রহ ছিল। আবার ঐ দিনগুলোতে রোজা ছেড়ে দেওয়ারও যে এখতিয়ার আছে তা তিনি নিজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। তিনি একদিন রোজা রেখেছেন আবার একদিন রোজা ছেড়েছেন এবং বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজা অধিক পছন্দনীয়। অর্থাৎ একদিন পরপর রোজা রাখাই হযরত দাউদ (আ.)-এর সুন্নত ছিল।

وَعَنْ ١٩٤٦ أَبِيْ قَتَادَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هٰذَا الْكَلَامَ حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ اَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذٰلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّيْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ رَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَسَنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৪৬. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিভাবে রোজা রাখেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথায় রাগ হলেন। যখন হযরত ওমর (রা.) তাঁর রাগ দেখলেন, তখন বললেন, আমরা আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, ইসলামকে জীবন বিধানরূপে এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে নবীরূপে পেয়ে খুশি হয়েছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আল্লাহর ক্রোধ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ওমর (রা.) এ কথাগুলো বারবার বলতে থাকলেন যাতে তাঁর রাগ প্রশমিত হলো। তখন হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি সারা বছর রোজা রাখে তার কাজ কিরূপ? রাসূল ﷺ বললেন, সে না রোজা রাখে, না রোজা ছাড়ে। অথবা তিনি বলেছেন, সে রোজা রাখেনি, রোজা ভাঙ্গেওনি। তিনি [পুনরায়] জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি দু'দিন রোজা রাখে আর একদিন রোজা ছাড়ে তার রোজা কিরূপ? রাসূল ﷺ বললেন, এরূপ কি কেউ রাখতে পারে? অতঃপর হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি একদিন রোজা রাখে এবং একদিন রোজা ছাড়ে তার কাজ কিরূপ? রাসূল ﷺ বললেন, এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজা। এবারও হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি একদিন রোজা রাখে এবং দু'দিন রোজা ভাঙ্গে তার কাজ কিরূপ? রাসূল ﷺ বললেন, আমি কামনা করি যে, আমাকে এরূপ করার শক্তি দেওয়া হোক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোজা এবং রমজানের রোজা পরের রমজান পর্যন্ত– এটাই হলো সারা বছরের রোজা। আরাফার দিনের রোজা– আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি যে, তা পূর্বের এক বছরের এবং পরের এক বছরে গুনাহ মুছে দেবে। আর আশূরার দিনের রোজা– আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তা পূর্বের এক বছরের গুনাহ মুছে দিবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا صَامَ وَلَا اَفْطَرَ -এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ "সে না রোজা রাখে না রোজা ছাড়ে"। এটা রাসূল ﷺ এ জন্যে বললেন যে, সে সুন্নতের বরখেলাফ করল। ফলে সে রোজা রাখা সত্ত্বেও রোজার ছওয়াব পেল না অথবা নিষিদ্ধ তারিখও বাদ না দিয়ে সারা বছর রোজা রেখেছে। ফলে তার ছওয়াব ও গুনাহ উভয়ই হয়েছে। ছওয়াব গুনাহ দ্বারা কর্তিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার রোজা ফলাফলের দিক দিয়ে বে-রোজার সমান। আপত দৃষ্টিতে যদিও সে রোজা ছাড়েনি প্রকৃতপক্ষে সে ঐ রোজার ফল লাভ করেনি। এ অর্থে সে রোজা রাখেনি। অথবা এটাও হতে পারে যে, রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো শারীরিক কষ্ট ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। একাধারে রোজা রাখলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা আর থাকে না এভাবে রোজার মূল উদ্দেশ্য কষ্ট ও ধৈর্যের পরীক্ষা ব্যাহত হয়। এ জন্যেই বলা হয়েছে যে, সে রোজা রাখেনি, ভাঙ্গেওনি অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে সে পানাহার ত্যাগ করেছে, তাই সে রোজা ভাঙ্গেনি। আর যেহেতু তার এ রোজার মূল উদ্দেশ্য সফল হয়নি তাই বলা হয়েছে যে, সে রোজা রাখেনি।

এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজা : হযরত দাউদ (আ.) যে নিয়মে রোজা রাখতেন তা অবশ্যই উত্তম পদ্ধতি। তিনি একদিন পর একদিন রোজা রাখতেন, ফলে ছয় মাস রোজা ও ছয় মাস ইফতার হয়ে যেত। কিন্তু এটা অপেক্ষা অধিক উত্তম হলো প্রতি দু'দিন পর একদিন রোযা রাখা। তবে আল্লাহর একজন নবীর সুন্নত হিসেবে একদিন পর একদিন রোজা উত্তম। আর স্বাস্থ্য ও শরীরের হক আদায় করার প্রেক্ষিতে দু' দিন পর একদিন রোজা রাখা অধিক উত্তম।

সারা বৎসর রোজার বিধান : সারা বৎসর রোজা রাখার ব্যাপারে নবী ﷺ হতে নিষেধ বাণী থাকা সত্ত্বেও ওলামায়ে কেরাম বলেন, নিজের শরীরের হক, স্ত্রীসহ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের হক সম্পর্কে ত্রুটি না করে এবং প্রয়োজনে জিহাদের ক্ষমতা বজায় রেখে কেউ যদি নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত সারা বছর রোজা রাখতে চায় তবে নবী করীম ﷺ হতে কোনো প্রকার নিষেধ আছে বলে আমরা মনে করি না। সারা বছর রোজা রাখা তাদের জন্যেই নিষেধ যারা উল্লিখিত শর্ত পালনে সক্ষম নয়।

আরাফাতের দিনের রোজা ও আশুরার রোজার পার্থক্য : এ দু'দিন রোজা রাখার মধ্যে যে বিরাট ছওয়াব রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবুও উভয় দিনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আরাফার দিনের ফজিলত যা আমাদের শরিয়তের তথা শরিয়তে মুহাম্মদী ﷺ -এর পক্ষ হতে এবং আশুরার দিনের ফজিলত হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের পক্ষ সাব্যস্ত হয়েছে।

وَعَنْهُ ١٩٤٧ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُّ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৪৭. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, এ দিনেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনেই আমার উপরে প্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٩٤٨ مُعَاذَةَ الْاَدَوِيَّةِ اَنَّهَا سَالَتْ عَائِشَةَ (رضـ) اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ اَيِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِيْ مِنْ اَيِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوْمُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৪৮. অনুবাদ : মহিলা তাবেয়ী হযরত মু'আযা আদাভিয়া (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদা হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোজা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মু'আযা বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোনদিন হতে তিনি রোজা রাখতেন? তিনি বললেন, তিনি মাসের যে কোনো দিন রোজা রাখতে পরোয়া করতেন না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস হতে যদিও এটা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ মাসে তিনদিন নফল রোজা রাখতেন, কিন্তু কোনোদিন তারিখ নির্দিষ্ট ছিল না বা করতেন না। অথচ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোজা রাখতেন এবং এর ফজিলতের কথাও উল্লেখ রয়েছে। উক্ত তিন দিনকে اَيَّامُ الْبِيْضِ 'আইয়্যামে বীজ' বলা হয়।

وَعَنْ ١٩٤٩ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ (رض) أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৪৯. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখবে অতঃপর রমজানের অব্যবহিত পরেই শাওয়াল মাসের ছয়দিন রোজা রাখবে, এটা তার পূর্ণ বছরের রোজার সমতুল্য হবে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পবিত্র কুরআনে এসেছে, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا অর্থাৎ, যে একটি পুণ্য কাজ করে তার জন্য এর দশ গুণ ছওয়াব রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য হাদীসেও নেক কাজের ছওয়াব দশ হতে সাতশগুণ পর্যন্ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সর্বনিম্ন ছওয়াব দশ গুণ ধরলেও ৩০ রোজায় [৩০ × ১০] = ৩০০ দিনের এবং ৬ রোজায় [৬ × ১০] = ৬০ দিনের মোট ৩৬০ দিনের অর্থাৎ প্রায় এক বছরের সমান হবে।

ছয় রোজা একত্রে না ভিন্ন ভিন্ন করতে হবে এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ :

- ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও দাউদে যাহেরী (র.) বলেন, শাওয়াল মাসের প্রথম ভাগে পর পর একসাথে রাখাই মোস্তাহাব। কেননা, হাদীসে فَأَتْبَعَهُ سِتًّا বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রমজানের পরেই ছয় রোজা রাখা উচিত।
- ইমাম মালেক (র.) বলেন, একত্রে ছয় রোজা রাখা মাকরূহ; বরং ভিন্ন ভিন্ন রাখা উচিত। কেননা, আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারারা এ রোজাগুলো এক সাথেই রাখতো। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এর কোনোটিই নির্দিষ্ট নয়; বরং মাসের প্রথমে কিংবা শেষের দিকে একসাথে বা ভিন্ন ভিন্ন যেভাবেই সম্ভব আদায় করা যাবে এবং পূর্ণ ছওয়াব অর্জিত হবে। কেননা, একেও 'রমজানের পর' বলা যায়।

وَعَنْ ١٩٥٠ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানির ঈদের দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ١٩٥١ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَوْمَ فِىْ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন− দু'দিন কোনো রোজা নেই। ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٩٥٢ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَ ذِكْرِ اللّٰهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৫২. অনুবাদ : হযরত নুবাইশা হুযালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আইয়্যামে তাশরীক হলো পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণের দিন। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْق শব্দের অর্থ– শুকানো। কুরবানির ঈদের পরের তিনদিন আরবগণ তাদের কুরবানির গোশত হাড়িতে চুলার উপর রেখে অথবা রৌদ্রে রেখে শুকাত [তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, রৌদ্রে গোশত না শুকানো পর্যন্ত কুরবানি কবুল হয় না]। ঈদুল আযহার পরের তিনদিন অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ তারিখকে গোশত শুকানোর দিন বলে পরবর্তীকালেও আইয়্যামে তাশরীকই বলে হয়েছে। আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোও ঈদের দিনগুলোর মতো আল্লাহ তা'আলার জিয়াফতের দিন। এতে রোজা রাখা জায়েজ নেই।

وَعَنْ ١٩٥٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَصُوْمُ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا اَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهٗ اَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهٗ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমার দিনে রোজা না রাখে, তার আগে বা পরে রোজা রাখা ব্যতীত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَسْئَلَةُ فِى الصَّوْمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ **জুমার দিনে রোজা রাখা সম্পর্কে মাসআলা :** এককভাবে জুমার দিনে রোজা রাখায় যে নিষেধ করা হয়েছে তাতে কি গূঢ়তত্ত্ব রয়েছে, এ বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়–

১. ইমাম নববী (র.) বলেছেন, জুমার দিন দোয়া, জিকির, গোসল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার দিন। এ জন্যে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, রোজা রাখলে এ সকল ইবাদত ও কার্যকলাপগুলো করতে সহজ হয়। যেমন– আরাফার দিনে রোজা না রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, যদি রোজা না রাখতে আদেশ করা হয়ে থাকে তবে জুমার পূর্বের দিন বা পরের দিনের সাথে মিলিয়ে রোজা রাখার আদেশ কিভাবে দেওয়া হতে পারে?

২. অথবা, এটাও হতে পারে যে, যেহেতু জুমা ও ঈদের দিন মুসলমানদের উৎসবের দিন। যথা– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيْدٍ فَلَا تَجْعَلُوْا يَوْمَ عِيْدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ অর্থাৎ 'জুমার দিন ঈদের দিন সুতরাং তোমরা তোমাদের ঈদের দিনকে তোমাদের রোজার দিনে পরিণত করো না।'

৩. অথবা, এ জন্যে জুমার দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে মানুষ ঐ দিনের সম্মান করার ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত না হয়। যেমন ইহুদিরা শনিবারের এবং খ্রিস্টানরা রবিবারের এত বেশি সম্মান করে যে, শেষ পর্যন্ত তারা বিপর্যয়ে পতিত হয় আর ঐ দিনই তারা সুনির্দিষ্ট রোজা রাখে।

৪. অথবা লোকেরা শুক্রবারে রোজা রাখাকে ওয়াজিব বলে মনে করতে পারে, এ বিশ্বাসকে প্রতিহত করার জন্যেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

৫. অথবা, খ্রিস্টানরা এ দিনে রোজা রাখতো তাই তাদের বিরোধিতার জন্যে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

জুমার দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : জুমার দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে কিছুটা মতভেদ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَقَوْلُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) : ইমাম আহমাদ (র.) ও ইসহাক (র.)-এর মতে এবং শাফেয়ী (র.)-এর এক অভিমতে জুমার দিনে রোজা রাখা সাধারণত মাকরূহ। তারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীস দ্বারাই দলিল পেশ করেন–

مَذْهَبُ اَبِىْ يُوْسُفَ وَابْنِ سِيْرِيْنَ وَطَاوُسْ (رحـ) : ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও তাউস (র.)-এর মতে, এককভাবে জুমা'র দিনের রোজা মাকরূহ। যদি তার আগে বা পরে এক একদিন রোজা রাখে তবে মাকরূহ নয়। তারাও অত্র আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَمُحَمَّدٍ (رحـ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, জুমার দিনের রোজা মাকরুহ ছাড়াই জায়েজ আছে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এক অভিমত। তারা হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। "রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোজা রাখতেন, খুব কমই তিনি জুমার দিনে রোজা ছাড়তেন"। -[তিরমিযী]

وَعَنْـ ١٩٥٤ ـهُ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ وَلَا تَخْتَصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْاَيَّامِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৫৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রাতসমূহের মধ্যে একমাত্র জুমা'র রাতকে নফল নামাজের জন্যে নির্দিষ্ট করো না এবং দিনসমূহের মধ্যে একমাত্র জুমার দিনকে রোজা রাখার জন্যে নির্দিষ্ট করো না। তবে জুমার দিন যদি তোমাদের কারো রোজা রাখার দিনের মধ্যে এসে পড়ে [তাহলে আপত্তি নেই]। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবাদতের জন্যে কোনো একটি দিনকে বা রাতকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া মাকরুহ, তবে জুমার দিন যদি কারো রোজা রাখার দিনের মধ্যে এসে তবে তাতে কোনো আপত্তি নেই।

وَعَنْ ١٩٥٥ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় [আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে] একদিন রোজা রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন।

-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا-**এর ব্যাখ্যা :** আরবি ঋতুসমূহের একটি হলো- اَلْخَرِيْفُ তবে এখানে اَلْخَرِيْفُ বলে اَلسَّنَةُ বা বছর উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, একটি রোজার প্রতিদান যদি এই হয়, তাহলে পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্যে কি এ একটি রোজাই যথেষ্ট হবে? তার উত্তর হলো, এখানে রোজা রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং নিষ্ঠার সাথে যে রোজা রাখা হয়, তার প্রতিদান কি হবে তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٩٥٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَاقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوٗدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَاِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَأْ فِىْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫৬. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! আমাকে কি খবর দেওয়া হয়নি যে, তুমি সারাদিন রোজা রাখ এবং সারারাত নামাজ পড়! তখন আমি বললাম, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এরূপ করো না। [বরং] রোজা রাখ, রোজা ছেড়েও দিও। নামাজও পড়বে এবং ঘুমাবেও। কেননা, তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে। যে সারা বছর রোজা রেখেছে সে [মূলত] রোজাই রাখেনি। প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজাই সারা বছরের রোজা। অতএব প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখ এবং প্রত্যেক মাসে একবার কুরআন খতম কর। তখন আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, তবে তুমি উত্তম নিয়মের রোজা রাখবে, যা দাঊদ (আ.)-এর রোজা– তা একদিন রোজা রাখা এবং একদিন রোজা না রাখা। আর প্রত্যেক সাত দিনে একবার কুরআন খতম করবে এর বেশি করবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ঐতিহাসিক পটভূমি : হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন মিশর-বিজেতা আমর ইবনুল আ'সের পুত্র। তিনি কুরাইশ বংশের সাহম গোত্রীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ আলেম ও কুরআনের হাফেজ। তিনি দিন রাত ইবাদতে রত থাকতেন। দিনভর রোজা রাখতেন এবং রাতভর নামাজ পড়তেন। পার্থিব জীবনের প্রতি ছিলেন অনাসক্ত। রাসূল ﷺ তাঁকে বিবাহ করিয়ে দিলেন। বিবাহের পরেও তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। নববধূর সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক হলো না। অবশেষে এ খবর মহানবী ﷺ -এর কাছে এসে পৌঁছল। তিনি আবদুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন এবং উপরিউক্ত কথাগুলো শুনিয়ে দিলেন।

হাদীসটির শিক্ষণীয় বিষয় : ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই উচিত। বর্ণিত আছে যে, عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ وَلَا تُشَدِّدُوْا فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ শেষ জীবনে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, ইবাদত করতে পারতেন না। তখন তিনি এ বলে আক্ষেপ করতেন يَا لَيْتَنِىْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِىِّ আহা! কতইনা না উত্তম হতো যদি আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর দেওয়া অবকাশ গ্রহণ করতাম। এ জন্যে সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩٥٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

১৯৫৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোজা রাখতেন। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٩٥٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُّعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৯৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সোমবার ও বৃহস্পতিবার [বান্দার] আমলসমূহ [আল্লাহর দরবারে] পেশ করা হয়। সুতরাং আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার আমল পেশ করা হোক যখন আমি রোজাদার থাকি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বন্দ্বমুখর দু'টি হাদীসের মধ্যে সমাধান : অত্র হাদীসে দেখা যায়– সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। অথচ অপর এক হাদীসে এসেছে যে, দিনের আমল শুরু হওয়ার পূর্বে রাতের আমল এবং রাতের আমল শুরু হওয়ার পূর্বে দিনের আমল উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে এ দুই হাদীসে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে–

এর জবাবে বলা হয়– প্রকৃতপক্ষে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, অত্র হাদীসে বলা হয়েছে تُعْرَضُ অর্থাৎ 'পেশ করা হয়'। আর অপর হাদীসটিকে বলা হয়েছে تُرْفَعُ অর্থাৎ 'তুলে নেওয়া হয়'। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, প্রত্যহ সকাল-বিকালে বান্দার আমলসমূহ পেশকার ফেরেশতার কাছে তুলে নিয়ে একত্র করা হয় এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয় আর বৎসর শেষে শা'বান মাসে পূর্ণ বৎসরের আমল একত্রে পেশ করা হয়। আবার কারো মতে– প্রত্যহ সকাল-বিকাল পৃথক পৃথক পেশ করা হয় এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবারে একসাথে পেশ করা হয় এবং আমলসমূহের চূড়ান্ত ফলাফল বৎসর শেষে শা'বান মাসে উপস্থাপিত করা হয়।

وَعَنْ ١٩٥٩ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَصُمْ ثَلٰثَ عَشَرَةَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

১৯৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– হে আবূ যর! যখন তুমি মাসের মধ্যে তিনদিন রোজা রাখবে তবে মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোজা রাখবে। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٩٦٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ اِلٰى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ)

১৯৬০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মাসের গোড়ার দিকে তিনদিন রোজা রাখতেন এবং তিনি জুমার দিনে খুব কমই রোজা ছাড়তেন। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ শব্দ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ-এর মর্মার্থ : কোনো বস্তুর প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বলা হয় غُرَّةٌ [গুররাতুন]। প্রত্যেক মাসের প্রাথমিক তিন দিনকে বলা হয় "غُرَّةٌ" - আরবগণ প্রত্যেক মাসকে তিন তিন দিন করে মোট দশটি ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। উক্ত দশটি ভাগের পর্যায়ক্রমিক নাম হলো– ১. غُرَرٌ [গুরার], ২. نُفَلٌ [নুফাল] ৩. تُسَعٌ [তুসা'] ৪. عُشَرٌ [উসার] ৫. بِيْضٌ [বীদ] ৬. دُرَعٌ [দুরা'] ৭. ظُلَمٌ [যুলাম] ৮. حَنَادِسُ [হানাদিস] ৯. وَادِئٌ [ওয়াদী] ১০. مَحَاقٌ [মাহাক]। তবে এখানে غُرَّةٌ বলে মাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তারিখকে বুঝান হয়নি; বরং মাসের প্রথমার্ধকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ। রাসূল ﷺ প্রত্যেক মাসের প্রথম ভাগে তিন দিন অর্থাৎ তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোজা রাখতেন।

অথবা এর মর্ম এই যে, ইবনে মাসউদ তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। হয়তোবা ইবনে মাসউদ (রা.) কখনো রাসূল ﷺ -কে মাসের প্রথম তিন দিন রোজা রাখতে দেখেছেন এবং সে অনুযায়ী তিনি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ١٩٦١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْاِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاٰخَرِ الثُّلٰثَاءَ وَالْاَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৯৬১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাসের শনিবার, রবিবার ও সোমবার রোজা রাখতেন এবং পরের মাসের মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٩٦٢ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنِيْ اَنْ اَصُوْمَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلُهَا الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৯৬২. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোজা রাখতে আদেশ করতেন। তন্মধ্যে প্রথম দিন যেন সোমবার ও বৃহস্পতিবার হয়। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٩٦٣ مُسْلِمِ الْقُرَشِيِّ (رضـ) قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ اِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ وَكُلَّ اَرْبِعَاءَ وَخَمِيْسٍ فَاِذَا اَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১৯৬৩. অনুবাদ : হযরত মুসলিম কারশী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম অথবা [রাবীর সন্দেহ] তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সারা বছর রোজা রাখা সম্পর্কে [কি হুকুম]। জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, তোমার উপর তোমার পরিবার-পরিজনের হক রয়েছে, অতএব, তুমি রমজান মাস ও এর আগে যে মাস [অর্থাৎ, শাওয়াল] তাতে রোজা রাখবে এবং প্রত্যেক বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখবে। আর যখনই এরূপ করলে, যেন সারা বছর রোজা রাখলে। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

وَعَنْ ١٩٦٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৯৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফার দিনে [জিলহজের নবম তারিখে] আরাফার মাঠে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٩٦٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ اُخْتِهِ الصَّمَّاءِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ اِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ اَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৯৬৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র 'তার ভগ্নি সাম্মা' হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের উপরে যে রোজা ফরজ করা হয়েছে তা ছাড়া তোমরা শনিবারে রোজা রাখবে না। যদি তোমাদের কেউ [রোজা ভাঙ্গার জন্যে] আঙ্গুর গাছের ছাল অথবা কোনো গাছের লাকড়ি ব্যতীত কিছু না পায় তবে সে যেন তাই চিবায়। [তবু ঐ দিন রোজা রাখা উচিত নয়]। –[আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারিমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ ও এর সমাধান : পূর্বোল্লিখিত উম্মে সালামার হাদীস দ্বারা জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তাহের অপর দিনসমূহে রোজা রাখা অপেক্ষা শনি ও রবিবারেই অধিক রোজা রাখতেন এবং বলতেন, এ দু'দিন মুশরিকদের খুশির [পানাহারের] দিন। অতএব, এ ব্যাপারে আমি তাদের বিপরীত করাকে পছন্দ করি।

অপর আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টভাবে শনিবারে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে অথচ হযরত উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শনিবার নফল রোজা রাখা মোস্তাহাব। ফলে উভয় হাদীসে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এ দ্বন্দ্ব নিরসনে হাদীস বিশারদগণের পক্ষ হতে নিম্নরূপ সমাধান পাওয়া যায়–

১. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, প্রথম হাদীসে নিষেধাজ্ঞাটি উম্মতের বেলায় প্রযোজ্য। আর উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীসের বিধান বিশেষভাবে নবী করীম ﷺ -এর জন্যে নির্দিষ্ট।
২. অথবা, এ কথাও বলা যায় যে, শনিবার রবিবারে পৃথক পৃথকভাবে বিরতি করে রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু একসাথে বিরতিহীনভাবে ঐ দু'দিন রোজা রাখা নাজায়েজ নয়; বরং মোস্তাহাব।
৩. অথবা, এটাও হতে পারে যে, শনিবার যেহেতু ইহুদিদের খুশির দিন এবং উত্তম খানাপিনার দিন। অতএব, ঐ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার জন্যেই ঐ দিন রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। আর ঐ দিন রোজা রাখা তাদের বিপরীত আচরণ প্রদর্শনের জন্যেই হয়েছে।
৪. অথবা, এটাও বলা যায় যে, আলোচ্য হাদীসের বিধান উম্মে সালামা হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং শনি ও রবিবারে রোজা রাখা সুন্নত।

إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ -এর ব্যাখ্যা : এখানে ফরজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– রমজানের ফরজ রোজা, নযর-মানতের রোজা, রমজানের কাজা রোজা এবং কাফফারার রোজা ইত্যাদি। অর্থাৎ এ সমস্তের রোজা রাখা জায়েজ আছে, কিন্তু সাধারণভাবে নফলের নিয়তে শনিবার রোজা রাখা নিষেধ, তবে হ্যাঁ, দু'দিন অর্থাৎ শনি ও রবিবার একসাথে রোজা রাখা মোস্তাহাব। ফলকথা, ঐ দিনে রোজ রাখাকে ফরজ ওয়াজিবের মতো গুরুত্ব দিয়ে রোজা রাখা হারাম।

وَعَنْ ١٩٦٦ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৯৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে ও জাহান্নামের মধ্যে আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান পরিখা স্থাপন করবেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"আল্লাহর রাস্তায়" কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। যেমন– জিহাদ, হজ ও ওমরার পথে দীনি ইল্ম শিক্ষার বা অন্বেষণের পথে রোজা রাখা অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে রোজা রাখা। মূলকথা হলো এখানে একটি 'মক্‌বুল নফল রোজার' ফজিলতের কথা বলা হয়েছে। আর আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানটি একটি রূপক দৃষ্টান্ত। প্রকৃত কথা হলো দূরত্বের ব্যবধান অনেক বেশি।

وَعَنْ ١٩٦٧ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِى الشِّتَاءِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ وَ ذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ فِىْ بَابِ الْاُضْحِيَّةِ -

১৯৬৭. অনুবাদ : হযরত আমির ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– শীতকালের রোজা একটি সহজলব্ধ গণিমত। –[আহমদ ও তিরমিযী]

তিরমিযী বলেন, হাদীসটি মুরসাল। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে হাদীস– "مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ" কুরবানি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শীত ঋতুতে রাতের অপেক্ষা দিন বহু ছোট। আবার রোজাদার ক্ষুধা অপেক্ষা পানির পিপাসায় অস্থির ও কাতর হয়ে পড়ে খুব বেশি। গ্রীষ্মের ঋতুতে পিপাসায় যে পরিমাণ দুর্বল হয়ে পড়ে শীত ঋতুতে তেমন হয় না। অথচ এক একটি রোজার ছওয়াব উভয় ঋতুতে একই সমান। ফলে শীত ঋতুতে অল্প বা বিনা পরিশ্রমে অনেক বেশি নিয়ামত তথা ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। তাই একে সহজলব্ধ গণিমত বলা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১৯৬৮ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ تَصُوْمُوْنَهُ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ اَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৬৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন [হিজরত করে] মদীনায় আগমন করলেন, দেখতে পেলেন যে, ইহুদিরা আশুরার দিন রোজা রাখছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ দিন কেন রোজা রাখছ? তারা জবাবে বলল, এ দিনটি একটি মহান দিন। এ দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়কে মুক্তি দিলেন এবং ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছেন। সুতরাং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হযরত মূসা (আ.) এ দিনে রোজা রেখেছিলেন। তাই আমরাও এ দিনে রোজা রাখি। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা তোমাদের চেয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার বেশি হকদার ও বেশি যোগ্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দিন নিজে রোজা রাখলেন এবং [আমাদেরকেও] রোজা রাখার আদেশ করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ-এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ বলেছেন "فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ" আমরাই মূসা (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের থেকে বেশি হকদার ও বেশি যোগ্য। এ কথাটি বলার কয়েকটি কারণ হতে পারে। যথা–

১. হযরত মূসা (আ.) যেমন নবী ছিলেন, রাসূল ﷺ ও তেমনি নবী, সুতরাং এক নবী অপর নবীর উত্তরসূরী হিসেবে একে অপরের অনুসরণ করার ব্যাপারে অধিকতর হকদার ও বেশি যোগ্য।

২. অথবা, ইহুদিদের হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবি ছিল মৌখিক। বাস্তবে তারা তাঁর আনীত দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আর আমরা তাঁর দীন ও শরিয়ত সত্যায়ন ও স্বীকার করি। তাই نَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ

৩. রাসূল ﷺ দেখলেন যে, ইহুদিরা মূসা (আ.)-এর দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনুসরণে আশুরার দিন রোজা রাখে। আর আমরা তো মূসা (আ.)-এর দীনকে সত্যায়ন করি। সুতরাং তাদের তুলনায় আমরাই মূসা (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার বেশি হকদার। কাজেই এ দিনে আমাদের রোজা রাখা উচিত।

৪. অথবা, ইহুদিরা হযরত মূসা (আ.)-এর পর ওজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে শিরক করেছে। আর আমরা শিরক বরদাস্ত করি না; বরং আমরা মূসা (আ.)-এর শিরক বিরোধী মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই নবীজী বলেছেন–

نَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ

রাসূল ﷺ কি ইহুদিদের অনুসরণ করেছেন? : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ নিজেই ইহুদিদের অনুসরণ করেছেন এবং অন্যদেরকে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এমনটি সঙ্গত নয়। হাদীস বিশারদগণ এর নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন। যেমন–

১. সকল কাজেই ইহুদিদের বিরোধিতা প্রযোজ্য নয়, বরং যা শরিয়তে মুহাম্মদীর পরিপন্থি, তারই বিরোধিতা করতে হবে।

২. অথবা, এটা দাওয়াতের একটা পদ্ধতি। তাদের অনুসরণ দ্বারা প্রাথমিকভাবে তাদের মনোরঞ্জন ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা ছিল উদ্দেশ্য।

৩. অথবা, এ ব্যাপারে তিনি মূসা (আ.)-এর অনুসরণ করেছিলেন, ইহুদিদের নয়।

৪. অথবা, মদিনায় ইহুদীদের অনুসরণে রাসূল ﷺ আশুরার রোজা রাখা শুরু করেননি; বরং মক্কায় তিনি এ রোজা রাখতেন।

৫. অথবা, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়েই রাসূল ﷺ তা পালন করেছিলেন।

وَعَنْ ١٩٦٩ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْاَحَدِ اَكْثَرَ مَا يَصُوْمُ مِنَ الْاَيَّامِ وَيَقُوْلُ اِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اُخَالِفَهُمْ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৯৬৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনসমূহের মধ্যে শনিবার ও রবিবারেই অধিক রোজা রাখতেন এবং বলতেন; এ দু'দিন মুশরিকদের ঈদের দিন। অতএব, আমি তাদের বিপরীত কাজ করাকে পছন্দ করি। –[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শনি ও রবিবার ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উৎসবের দিন। শনিবার ইহুদিদের উৎসবের দিন এবং রবিবার খ্রিস্টানদের। এ দু' দিন তারা রোজা রাখে না; বরং জাঁকজমক ও মহাসমারোহের সাথে পানাহার করে থাকে। তাই রাসূল ﷺ তার বিরোধিতা করার জন্যে অন্যান্য দিনের তুলনায় এ দু'দিন [শনি ও রবিবার] অধিক রোজা রাখতেন এবং বলতেন, এ দু' দিন মুশরিকদের ঈদের দিন। অতএব, আমি তাদের বিপরীত কাজ করাকে ভালবাসি।

اَلْمُشْرِكِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত হাদীসে اَلْمُشْرِكِيْنَ বলতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, ইহুদিরা ওজাইর নবীকে এবং খ্রিস্টানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে শিরক করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এখানে মুশরিক দ্বারা সাধারণভাবে কাফের বুঝানো হয়েছে। আবার আহলে কিতাবের মুকাবিলায়ও মুশরিক শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে সঠিক কথা এই যে, এখানে মুশরিক বলতে মু'মিনের বিপরীত বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ١٩٧٠ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৭০. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আশুরার দিনে রোজা রাখতে আদেশ করতেন, তার জন্যে আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন [আমরা রোজা রেখেছি কিনা জানতেন] অতঃপর যখন রমজানের রোজা ফরজ করা হলো তখন তিনি তার জন্যে আমাদেরকে আর আদেশ করতেন না, তা হতে নিষেধও করতেন না এবং ঐ সময় আসলে খোঁজ খবরও নিতেন না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আশুরার রোজার হুকুম : আশুরার দিনে রোজা রাখার হুকুম কি? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

১. আহনাফের মতে, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোজা ফরজ ছিল। অতঃপর রমজানের রোজা তাকে রহিত করে দিয়েছে। এখন এ রোজা পালন করা সুন্নত।

২. ইমাম মুহাম্মদ-এর মতে, রমজানের রোজা আশুরার রোজার فَرْضِيَّتْ-কে রহিত করে দেওয়ার পর এখন তা নফলের পর্যায়ে রয়েছে।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। যেমন–

ক. আশুরার রোজা প্রথম থেকেই সুন্নত ছিল। বর্তমানেও তা সুন্নত হিসেবেই রয়েছে।

খ. পূর্বে তা ফরজ ছিল বর্তমানে সুন্নতের পর্যায়ে রয়েছে।

وَعَنْ ١٩٧١ حَفْصَةَ (رض) قَالَتْ اَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১৯৭১. অনুবাদ : হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি বিষয় কখনো ছাড়তেন না। আশুরার দিনের রোজা, যিলহজ্জের প্রথম দশকের রোজা, প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকআত [সুন্নত] নামাজ। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে জিলহজের প্রথম দশক বলতে আরাফার দিন পর্যন্ত নয় দিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, দশই জিলহজ ঈদুল আযহা তথা কুরবানির দিন। আর সেই দিন রোজা রাখা সম্পূর্ণ নিষেধ।

وَعَنْ ١٩٧٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ اَيَّامَ الْبِيْضِ فِىْ حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১৯৭২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বা নিজের আবাসে আইয়্যামে বীযের রোজা ছাড়তেন না। –[নাসায়ী]

وَعَنْ ١٩٧٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ شَىْءٍ زَكٰوةٌ وَ زَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৯৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক বস্তুরই জাকাত রয়েছে। আর শরীরের জাকাত হলো রোজা। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْهُ ١٩٧٤ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ تَصُوْمُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللّٰهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا ذَا هَاجِرَيْنِ يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا -

১৯৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখেন? তখন জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার এমন দিন যাতে পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তিদ্বয় ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে ক্ষমা করেন। [আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারীদ্বয় সম্পর্কে] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা পরস্পর মীমাংসা করা পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দাও।" -[আহমাদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ঐ দিনগুলোতে রোজা রাখলেও আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন না। আমরা পূর্বেই এক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছি এ দু'টি দিন অতীব মর্যাদাসম্পন্ন। সোমবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন আর বৃহস্পতিবার আমল পেশ হওয়ার দিন।

وَعَنْهُ ١٩٧٥ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ بَعَّدَهُ اللّٰهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ حَتّٰى مَاتَ هَرِمًا - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ)

১৯৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোজা রাখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম হতে এতটুকু দূরে রাখবেন যতটুকু দূর একটি কাঁক বাচ্চা হতে বৃদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে [অর্থাৎ বহুদূর]।

-[আহমাদ এবং বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে সালামা ইবনে কায়স হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসে কাঁকের সাথে তুলনা করার কারণ হলো, কাঁক নিজ এলাকা ছেড়ে বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত উড়ে চলে যায়, তার নিজ এলাকার প্রতি তত আকর্ষণ থাকে না, অথচ অন্য সকল পাখিই নিজ এলাকার আশ-পাশে ঘুরে বেড়ায়।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ : নফল রোজা ভঙ্গ করা

আলোচ্য পরিচ্ছেদটি পূর্বে বর্ণিত পরিচ্ছেদের একটি অংশ বা উপসংহার পর্যায়ে হওয়ায় পৃথক কোনো শিরোনাম প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। তবে এখানকার সকল হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে নফল রোজা ভঙ্গ করা এবং তার বিধান সম্পর্কীয় বর্ণনা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১৯৭৬ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّيْ إِذًا صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৭৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট (খাওয়ার মতো) কিছু আছে কি? আমরা বললাম, জি না। রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে আমি রোজা রাখলাম। অতঃপর তিনি আরেকদিন আমাদের নিকট আসলেন তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাদেরকে 'হাইস' উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে তা দেখাও। আমি তো রোজাদার হিসেবে সকাল কাটালাম। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অতঃপর নবীজী তা খেলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَيْس-এর পরিচয় : 'হাইস' একটা উত্তম খাবার যাকে হালুয়া বা মত্ত বলা যেতে পারে এটা খেজুর, পনির ও আটা মিশিয়ে তৈরি করা হয়।

নফল রোজা ভঙ্গ করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ (رح) وَغَيْرِهِمْ : শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আতা, মুজাহিদ ছাওরী (র.) প্রমুখের মতে, নফল রোজাদার ওজর কিংবা ওজর ব্যতীত রোজা ভেঙ্গে ফেললে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না। তাঁদের দলিল হলো-

حَدِيْثُ أُمِّ هَانِيٍ (رض) أَنَّهُ ﷺ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ فَقَالَتْ إِنِّيْ صَائِمَةٌ وَلٰكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِيْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيْ وَإِنْ شِئْتِ لَا تَقْضِيْ. (اَلطَّحَاوِيُّ)

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْنِ وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও সাহেবাঈন (র.) প্রমুখের মতে, নফল রোজাদার যদি ওযর ব্যতীত রোজা ভাঙ্গে তাহলে কাজা করতে হবে। এটা করা তার উপর ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হলো-

١. قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ.

٢. قَوْلُهُ تَعَالٰى وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাব : হানাফীদের পক্ষ হতে হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা হয়েছে যে, নফল রোজা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার রয়েছে। অথবা অর্থ এ হতে পারে যে, নফল রোজা শুরু করলে এ অনুমতি আছে যে, পূর্ণ করবে অথবা কোনো ওজরের কারণে রোজা ভাঙ্গবে। তাতে কাজা ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কোনো উল্লেখ নেই। অতএব, তা কাজা ওয়াজিব না হওয়ার পক্ষে দলিল হতে পারে না।

وَعَنْ ١٩٧٧ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى أُمِّ سُلَيْمٍ فَاَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ اَعِيْدُوا سَمْنَكُمْ فِيْ سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِيْ وِعَائِهِ فَاِنِّيْ صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى غَيْرَ الْمَكْتُوْبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَاَهْلِ بَيْتِهَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৯৭৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ হযরত উম্মে সুলাইমের নিকট প্রবেশ করলেন। উম্মে সুলাইম তাঁর জন্যে কিছু খেজুর ও ঘি হাজির করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের ঘি তার মশকে এবং তোমাদের খেজুর তার পাত্রে রেখে দাও। কেননা, আমি রোজাদার। অতঃপর তিনি উঠে ঘরের এক কোণে গেলেন এবং কিছু নফল নামাজ পড়লেন; আর উম্মে সুলাইম ও তার ঘরের লোকদের জন্য দোয়া করলেন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত হাদীস হতে নির্গত মাসআলাসমূহ : উল্লিখিত হাদীসটি হতে নিম্নোক্ত মাসআলাসমূহ নির্গত হয়−

ক. মেহমান আসলে সামর্থ্য অনুযায়ী আপ্যায়ন করা।
খ. মেজবানের দেওয়া খানা মেহমানের গ্রহণ করা− না করার অধিকার থাকবে।
গ. গ্রহণ না করা অবস্থায় তার কারণ বর্ণনা করতে হবে। নতুবা মেজবান মনঃক্ষুণ্ন হতে পারে।
ঘ. বিনা ওজরে নফল রোজা ভাঙ্গা উচিত নয়।
ঙ. রোজাদার ব্যক্তি কারো বাড়িতে গেলে নফল নামাজ পড়ে গৃহবাসীর জন্যে দোয়া করা সুন্নত। রাসূল ﷺ বলেছেন− اِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ دُعَاءَ الصَّائِمِ -

---

وَعَنْ ١٩٧٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন− যখন তোমাদের কেউ খানার দিকে আহূত হয় আর তখন সে রোজাদার থাকে তবে সে যেন বলে 'আমি রোজাদার।' অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ বললেন, যখন তোমাদের কেউ খানার প্রতি আহূত হয় তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয় [দাওয়াত গ্রহণ করে]। যদি সে রোজাদার হয় তবে যেন দোয়া করে আর বে-রোজাদার হলে যেন খানা খায়। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ-এর ব্যাখ্যা : আহূত ব্যক্তি যদি কোনো কারণে খানা খেতে অনিচ্ছুক হয়, তবে স্পষ্টভাবে না খাওয়ার কারণ তথা ওজর পেশ করে খানা হতে বিরত থাকবে। তবে নফল ইবাদত গোপন রাখা উত্তম, কিন্তু প্রয়োজনে তা প্রকাশ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, খানা না খাওয়ার দরুন যদি গৃহবাসীর মনে ব্যথা লাগে, অথবা উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণ হয়, তখন নফল রোজা ভেঙ্গে ফেলা উত্তম; অন্যথা উচিত নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩٧٩ أُمِّ هَانِئٍ (رض) قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلَى يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِيْنِهِ فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِإِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا اَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد وَالتِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِىِّ نَحْوُهُ وَفِيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا اِنِّىْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْرُ نَفْسِهِ اِنْ شَاءَ صَامَ وَاِنْ شَاءَ اَفْطَرَ -

১৯৭৯. অনুবাদ : [হযরত আলীর ভগ্নী] হযরত উম্মে হানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ফাতেমা (রা.) আসলেন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বামদিকে বসলেন আর আমি উম্মে হানীর ডান দিকে বসলাম। তখন একটি বালিকা এক পাত্র পানীয় নিয়ে আসল, সে তা রাসূল ﷺ-এর হাতে দিল। তিনি তা হতে পান করলেন। অতঃপর তিনি তা উম্মে হানীর হাতে দিলেন। উম্মে হানীও তা হতে পান করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি যে রোজা ভেঙ্গে ফেললাম অথচ আমি রোজা ছিলাম। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি কোন কাজা রোজা রাখছিলে? তিনি বললেন, না। হুযূর ﷺ বললেন, যদি নফল রোজা হয় তবে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারিমী]

আহমদ ও তিরমিযীর অপর এক বর্ণনা এরই অনুরূপ। তাতে রয়েছে, হযরত উম্মে হানী (রা.) বলেছেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো রোজা ছিলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, নফল রোজাদার নিজের প্রবৃত্তির কর্তা, যদি সে চায় তার রোজা রাখবে আর ইচ্ছা করলে ভাঙ্গবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসটি সম্পর্কে ইমামগণের মতামত : ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটির সনদে অভিযোগ রয়েছে। মুনযিরী (র.) বলেছেন, হাদীসটি প্রমাণযোগ্য নয়।

আলোচ্য হাদীসে মক্কা বিজয়কালের কথা এবং উম্মে হানীর নফল রোজার কথা বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, রাসূল ﷺ ৮ম হিজরির রমজান মাসের ১০ তারিখে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন এবং বিশ তারিখে মক্কায় পৌঁছেন। বিজয়ের পরও তিনি তথায় দশ দিনের কিছু বেশি সময় অবস্থান করেন। এ বাড়তি সময়ে সম্ভবত শাওয়াল মাস এসেছিল এবং উম্মে হানীর ঘটনাটি শাওয়াল মাসেই ঘটেছিল। কেননা, রমজান মাসে নফল রোজা রাখার প্রশ্নই আসতে পারে না।

اَلْمُتَطَوِّعُ اَمِيْرُ نَفْسِهِ-এ হাদীসাংশ নিয়ে ইমামগণের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বিনা ওজরে নফল রোজা ভাঙ্গা জায়েজ নেই। ভাঙ্গলে কাজা করা ওয়াজিব হবে। যেসব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ নফল রোজা রেখে ভেঙ্গেছেন তাতে বলা হয় যে, তিনি সম্ভবত কোনো ওজরের দরুনই ভেঙ্গেছিলেন। তবে তিনি এটা পরে কাজা করেননি, এমন কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নফল রোজার কাজা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেক (র.) বলেন, বিনা ওজরে ভাঙ্গলে কাজা ওয়াজিব হবে; অন্যথা ওয়াজিব হবে না। তাঁদের দলিল হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, "নফল রোজাদার নিজের ইচ্ছার অধিকারী....।"

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কুরআনের নির্দেশ- فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا এবং لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ এ আয়াত দু'টি ঐ সমস্ত লোকদের তিরস্কারার্থে বর্ণিত হয়েছে যারা ফরজ নয় এমন কাজ ছওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে শুরু করে পরিপূর্ণ করে। অথচ এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব তথা অপরিহার্য ছিল। সুতরাং এটা কাজা করা ওয়াজবি হবে, অন্যথা আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা তথা ধৃষ্টতা প্রকাশ পাবে। আর এটাও অনস্বীকার্য যে, নফল রোজাটা নফল হজ ও ওমরার মতো। উক্ত কাজ দু'টি নফল নিয়তে শুরু করে ভঙ্গ করলে কাজা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং এটাও তদ্রূপ। হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে- اِقْضِيَا يَوْمًا اٰخَرَ مَكَانَهُ এসব প্রমাণে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নফল রোজার স্থলে সমসংখ্যক রোজা অন্যদিনে কাজা করতে হবে।

বিপরীত মত পোষণকারীদের দলিলের জবাব : 'নফল রোজাদার নিজের ইচ্ছার আমীর বা অধিকারী' এর অর্থ হলো- কোনো নফল কাজ শুরু করা বা না করার মধ্যে তার স্বাধীনতা রয়েছে; কিন্তু শুরু করলে আর স্বাধীনতা থাকে না, পূর্বের আলোচনা হতে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। নবী করীম ﷺ উম্মে হানীকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন- তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। এর মানে হলো তোমাকে 'কাফ্ফারা' আদায় করতে হবে না। "কিন্তু সমপরিমাণ কাজাও আদায় করতে হবে না"। এমন কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

وَعَنْ ١٩٨٠ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اِقْضِيَا يَوْمًا اٰخَرَ مَكَانَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

وَ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ رَوَوْا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهٰذَا اَصَحُّ . (وَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ)

১৯৮০. অনুবাদ : যুহরী (র.) হযরত ওরওয়াহ (র.) হতে এবং ওরওয়াহ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন- একদা আমি ও বিবি হাফসা (রা.) দু'জনেই রোজা রেখেছিলাম। আমাদের নিকটে এমন একজাতীয় খানা হাজির করা হলো যা আমরা খুব পছন্দ করি। সুতরাং আমরা তা হতে খেলাম। তখন বিবি হাফসা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা দু'জনেই রোজাদার ছিলাম। এ অবস্থায় আমাদের কাছে এমন কিছু খানা উপস্থিত করা হলো যা আমরা খুব পছন্দ করি। অতএব, আমরা তা হতে খেয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, তার স্থলে অপর একদিন কাজা রেখো। -[তিরমিযী]

তিরমিযী (র.) এখানে একদল হাদীসের হাফেজের নাম উল্লেখ করেছেন যারা তাকে যুহরী (র.) হতে এবং যুহরী হযরত আয়েশা (রা.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অথচ তারা তাতে ওরওয়ার নাম উল্লেখ করেননি। (এ হিসেবে হাদীসটি মুনকাতি') আর এ মতই বিশুদ্ধ। আবূ দাউদ তাকে ওরওয়ার মুক্ত করা দাস যুমাইল হতে যুমাইল ওরওয়াহ হতে এবং ওরওয়াহ হযরত আয়েশা (রা.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন। [এ হিসেবে হাদীসটি মুত্তাসিল]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসটি مُرْسَلٌ না مُنْقَطِعٌ : হাদীসটিকে 'মুনক্বাতি' বলা হলেও ইবনে হাব্বান তাঁর 'সহীহ গ্রন্থে' ইবনে আবূ শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফে' এবং তাবারানী তাঁর মু'জামে অত্র হাদীসটিকে অপর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া অপর মুত্তাসিল হাদীসে হযরত আয়েশা বিনতে তালহা হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহে উপস্থিত হলেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্যে হাইস্ [খেজুর, পনির ও আটা দ্বারা

তৈরিকৃত হালুয়া] রেখেছি। তিনি বললেন, আমি তো রোজা রেখেছি। আচ্ছা নিয়ে এসো দেখি। তিনি তা খেলেন এবং বললেন, পরে এর পরিবর্তে একদিন রোজা রাখবে। ফলকথা, হাদীসটি সহীহ এবং নফল রোজা ইত্যাদি ভাঙ্গলে কাজা আদায় করতে হবে।

وَعَنْ ١٩٨١ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِيْ فَقَالَتْ اِنِّيْ صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الصَّائِمَ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يَفْرُغُوْا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৯৮১. অনুবাদ : হযরত উম্মে ওমারা বিনতে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর নিকটে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁর [রাসূলের] জন্যে খানা আনালেন। রাসূল ﷺ উম্মে ওমারাকে বললেন, তুমিও খাও। তিনি বললেন, আমি রোজাদার। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, যখন রোজাদারের নিকটে খানা খাওয়া হয় [আর রোজাদার ধৈর্যধারণ করে] যতক্ষণ পর্যন্ত তারা খানা হতে অবসর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্যে শান্তি বর্ষণের দোয়া করতে থাকে।

–[আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩٨٢ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ دَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَدَاءَ يَا بِلَالُ قَالَ اِنِّيْ صَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاْكُلُ رِزْقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ اَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ اَنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلٰئِكَةُ مَا اُكِلَ عِنْدَهُ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৯৮২. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত বিলাল (রা.) রাসূল ﷺ-এর দরবারে আসলেন এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালের নাশতা খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বিলাল! নাশ্তা খাও। বিলাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি তো রোজাদার। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা আমাদের রিজিক খাচ্ছি,আর বিলালের উত্তম রিজিক জান্নাতে উদ্বৃত্ত থাকছে। বিলাল! তুমি কি জান? রোজাদারের হাড়সমূহ আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট খানা খাওয়া হতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্যে (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
পরিচ্ছেদ : কদরের রাত

لَيْلَة শব্দের অর্থ হলো রাত বা রজনী। আর قَدْرٌ অর্থ– পরিমাণ, পরিমাপ, নিয়তি, ভাগ্য অদৃষ্ট ইত্যাদি। এ রাতে সমস্ত সৃষ্টিজগতের আগামী এক বছরের রুজি-রিজিক, হায়াত-মওত ও বিধি-বিধান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

১. تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ

২. فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ

লাইলাতুল কদরের ফজিলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ; এর মর্যাদা সম্পর্কেও বিভিন্ন হাদীস এসেছে–

কিছু সংখ্যকের মতে, কদর অর্থ বৃহৎ, বড়। এ রাতের মর্যাদা অতি মহান তাই একে কদর হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

আবার কারো মতে, যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদত করতে মশগুল হবে সে মর্যাদাসম্পন্ন হবে তাই একে কদর নামে নামকরণ করা হয়েছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩٨٣ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৯৮৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে শবে কদর তালাশ করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

লাইলাতুল কদর নির্ধারণ নিয়ে ইমামগণের মতভেদ : লাইলাতুল কদর কোন রাতে সে সম্পর্কে কুরআন হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। এ কারণে এ রাতটি নির্ধারণে ইমামগণ হতে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। এ বিষয়ে চল্লিশেরও বেশি অভিমত পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–

১ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেছেন, লাইলাতুল কদর দু'টি। তার একটি হচ্ছে শাবান মাসের পনের তারিখ। এ রাতে বান্দার আগত বছরের ভাগ্যলিপি লেখা হয়। এটাকে লাইলাতুল বরাতও বলা হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় রাতটি হচ্ছে রমজান মাসের শেষ দশদিনের কোনো এক রাত। এ রাতের মর্যাদা অনেক গুণ বেশি। এ রাতে বান্দার প্রতি আল্লাহর নূর বর্ষিত হয়। ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈল (আ.) এ রাতে জমিনে অবতরণ করেন।

২. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.) ও আকরাম প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, কদরের রাত সারা বছরের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফিকহবিদ কাযীখান গ্রন্থকার আল্লামা ফখরুদ্দীন আবুল মুফাখির আল-কারিগিনী ও আবূ বকর (র.) বলেছেন, এটাই হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, কদরের রাত রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত। তবে রমজানের সারা মাসেই তা পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেছেন, তা রমজানের ১৭ তারিখের রাতে হয়। ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাসঊদ (রা.) হতেও এরূপ অভিমত বর্ণনা করেছেন।

৫. কোনো কোনো শাফেয়ীপন্থী বলেছেন, রমজানের শেষ দশকের প্রথম রাতই কদরের রাত। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মতটিকেই সমর্থন করেছেন।

৬. অথবা লাইলাতুল কদর রমজানের ত্রয়োবিংশতম রাতে হয়। তেইশ তারিখের রাত সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াতও রয়েছে যেমন– ইবনে আবূ শাইবা সহীহ সনদ সূত্রে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– কদরের রাত হলো রমজানের ত্রয়োবিংশতম (২৩ তম) রাত।

৭. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) ও কাতাদা, শা'বী, হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, লাইলাতুল কদর চব্বিশ তারিখ রাত্রিতে হয়।

৮. অথবা, তা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে হয়ে থাকে। আলোচ্য হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসই তার প্রমাণ। অধিকাংশ আলেমের এটাই অভিমত।

৯. ইমাম আহমাদ, আবূ হানীফা (র.) ও উবাই ইবনে কা'ব প্রমুখের মতে, রমজানের সাতাশ তারিখের রাত্রিই লাইলাতুর কদর। অধিকাংশ বুজুর্গানে দীন এ রাতকেই লাইলাতুল কদররূপে নির্ধারণ করেছেন। যুক্তিস্বরূপ তারা বলেন যে, সূরা কদরে আল্লাহ তা'আলা 'লাইলাতুল কদর' কথাটি তিনবার উল্লেখ করেছেন। সেখানে لَيْلَةُ الْقَدْرِ [লাইলাতুল কদর] লিখতে হরফের সংখ্যা মোট নয়টি। নয়কে তিন দ্বারা গুণ করলে সাতাইশ হয়। সুতরাং সাতাইশ তারিখের রাতই হবে লাইলাতুর কদর।

১০. কারো মতে লাইলাতুল কদর রমজানের ২৫ তারিখ কিংবা ২৯ তারিখেও হতে পারে। তবে প্রত্যেক বৎসর যে একই রাতে হয় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

وَعَنْ ١٩٨٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اِنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاَتْ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৮৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখান হলো যে, কদরের রাত [রমজানের] শেষের সাত রাতের মধ্যে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের স্বপ্নসমূহ একই রকম শেষ সাত রাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখছি। সুতরাং যে তা তালাশ করে সে যেন শেষ সাত রাতে তালাশ করে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٩٨٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِىْ تَاسِعَةٍ تَبْقٰى فِىْ سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِىْ خَامِسَةٍ تَبْقٰى - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৯৮৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, লাইলাতুল কদরকে তোমরা রমজানের শেষ দশকে– মাসের নয় দিন বাকি থাকতে, সাত দিন বাকি থাকতে এবং পাঁচদিন বাকি থাকতে তালাশ করবে। –[বুখারী]

وَعَنْ ١٩٨٦ اَبِىْ سَعِيْدِ ِنْ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِىْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ثُمَّ اَطْلَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَّلَ اَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ اُتِيْتُ فَقِيْلَ لِىْ اِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيْحَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ قَالَ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى جَبْهَتِهٖ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِى الْمَعْنٰى) وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ اِلٰى قَوْلِهٖ فَقِيْلَ لِىْ اِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْبَاقِىْ لِلْبُخَارِىِّ وَفِىْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ قَالَ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানের প্রথম দশক ই'তিকাফ করলেন। অতঃপর তিনি মধ্যম দশকও একটি তুর্কী তাঁবুতে ই'তিকাফ করলেন। তারপর তিনি নিজের পবিত্র শির বের করে বললেন, আমি এ রাত (লাইলাতুল কদর) তালাশ করতে প্রথম দশক ই'তিকাফ করলাম। অতঃপর মধ্যম দশকও ই'তিকাফ করলাম। তারপর স্বপ্নযোগে আমার কাছে কারো (ফেরেশ্তার) আগমন হলো এবং আমাকে বলা হলো, শেষ দশকে এটা (লাইলাতুল কদর) রয়েছে। সুতরাং যে আমার সাথে ই'তিকাফ করতে চায় সে যেন শেষ দশকে ই'তিকাফ করে। আমাকে এ রাত স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। অতঃপর ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আমাকে দেখলাম ঐ রাতের ফজরে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করছি। সুতরাং তোমরা তাকে (রমজানের) শেষ দশকে এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ করবে। রাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, ঐ রাতেই আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করল, মসজিদের ছাদে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল। অতএব ছাদ হতে মসজিদে পানি পড়ল। আমার দু'চোখ একুশ তারিখ সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখতে পেল। −(বুখারী ও মুসলিম)

فَقِيْلَ لِىْ اِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ পর্যন্ত মুসলিমের পাঠ, অবশিষ্ট পাঠ বুখারীর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের বর্ণনায় রয়েছে তেইশ তারিখের রাত। −[মুসলিম]

وَعَنْ ١٩٨٧ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِى رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ تَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ اَوْ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৮৭. অনুবাদ : তাবিয়ী হযরত যির ইবনে হুবাইশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বললাম, আপনার ভাই ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, যে সারা বছর রাত জেগে ইবাদত করবে সে কদরের রাত পাবে। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। তিনি এর দ্বারা ইচ্ছা করেছেন যে, লোকজন যেন তার উপরে নির্ভর করে না থাকে। অবশ্যই তিনি জেনেছেন যে, তা রমজান মাসে এবং তা রমজানের শেষ দশকে আর তা সাতাশতম রাতে। অতঃপর তিনি ইনশআল্লাহ্ না বলে দৃঢ়ভাবে শপথ করে বললেন যে, নিশ্চয় তা রমজানের সাতাশ তারিখে। তখন আমি বললাম, হে আবূ মুনযির! আপনি কিসের ভিত্তিতে এ কথা বলেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যে চিহ্ন বা নিদর্শন বলে দিয়েছেন তার ভিত্তিতে [তা এই যে,] ঐ দিন [রাতের পর প্রভাতে] সূর্যোদয় হবে তবে তার কিরণ থাকবে না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ-এর ব্যাখ্যা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) নিজেও খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন যে, 'শবে কদর' রমজানের সাতাশ তারিখের রাতে হয়। এরপরও তিনি বলেছেন, শবে কদর সারা বছরের যে কোনো রাত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল- যদি তাকে রমজানের সাতাশ তারিখ রাতের সাথেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তখন লোকেরা সে এক রাতের অপেক্ষায় সারা বছর রাত জাগরণ তথা ইবাদত পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। এ জন্যে তিনি সারা বছরের যে কোনো সময়ে হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

লাইলাতুল কদরের নিদর্শন :

১. কারো মতে, অধিক সংখ্যক ফেরেশতার আগমন ও প্রত্যাবর্তন বারংবার অবতরণ ও আরোহণের কারণে সূর্য তাদের পাখার আড়ালে থেকে যায় এ জন্যে সূর্যের কিরণ থাকে না বলা হয়েছে।

২. অথবা, ঐ রাতের আলোক ঔজ্জ্বল্য প্রকৃতপক্ষে সূর্যের আলোর চেয়েও শক্তিশালী হবে।

৩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)বলেন, ঐ রাতের একটি আলামত এই যে, প্রত্যেক বস্তুকে সিজদারত অবস্থায় দেখা যাবে।

৪. অথবা, প্রতিটি স্থান এমনকি অন্ধকার স্থানগুলোকেও মনে হবে যেন স্বর্গীয় আলোতে আলোকিত।

৫. অথবা, ঐ রাতে ফেরেশতাদের সালাম শুনতে পাওয়া যাবে।

৬. অথবা, ঐ রাতের আলামত দোয়া কবুল হওয়া।

৭. আর সবচেয়ে সুস্পষ্ট নিদর্শন এই যে, ঐ রাতের ইবাদতে অন্তরে একটা ভিন্ন ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যাবে। বিশেষভাবে কুরআন তেলাওয়াতে খুব আনন্দবোধ হবে। কিন্তু মুহেবব তিব্‌রী বলেছেন, কদরের রাত হওয়ার জন্যে কোনো প্রকার নিদর্শন আবশ্যক নয়।

وَعَنْ ١٩٨٨ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৯৮৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানের শেষ দশ দিন ইবাদতে এত অধিক প্রচেষ্টা-পরিশ্রম করতেন, যে প্রচেষ্টা-পরিশ্রম এতদ্ব্যতীত অন্যদিনে করতেন না। -[মুসলিম]

وَعَنْهَا ١٩٨٩ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاَحْيٰى لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৮৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমজানের শেষ দশক আসত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদতের জন্য লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে ফেলতেন, তিনি সারারাত জেগে ইবাদত করতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনকেও জাগাতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَدَّ مِئْزَرَهُ **-এর মর্মার্থ :** شَدَّ শব্দের অর্থ- মজবুতভাবে বাঁধা। আর مِئْزَر শব্দের অর্থ- إِزَار লুঙ্গি। যখন রমজানের শেষ দশক আসত, তখন রাসূল ﷺ তাঁর লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে ফেলতেন। এখানে شَدَّ مِئْزَرَهُ তিনি কোমরে কাপড় বেঁধে নিতেন) বাক্যটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম নববী (র.) বলেন- কারো কারো মতে, বাক্যটির অর্থ হচ্ছে- অন্যান্য সময়ের তুলনায় এ সময়ই রাসূল ﷺ ইবাদতে বেশি মগ্ন থাকতেন। আরেক দলের মতে, তার অর্থ এই যে, রমজানের শেষ দশকে রাসূল ﷺ বিবিদের সাথে সহবাস করা হতে বিরত থাকতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩٩٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ اَىَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَصَحَّحَهُ)

১৯৯০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলে দিন যদি আমি জানতে পারি যে, শবে কদর কোন রাতে হবে, তাতে আমি কি বলব? রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর। -[আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন]।

وَعَنْ ١٩٩١ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِلْتَمِسُوْهَا يَعْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِىْ تِسْعٍ يَبْقِيْنَ اَوْ فِىْ سَبْعٍ يَبْقِيْنَ اَوْ فِىْ خَمْسٍ يَبْقِيْنَ اَوْ ثَلٰثٍ اَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ - (رواه التِّرْمِذِىُّ)

১৯৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি- তোমরা তাকে অর্থাৎ শবে কদরকে রমজানের নয় রাত বাকি থাকতে, অথবা রমজানের সাত রাত বাকি থাকতে, অথবা পাঁচ রাত বাকি থাকতে, অথবা তিন রাত বাকি থাকতে, অথবা রমজানের শেষ রাতে [অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ বা ২৯ শে রমজানের রাতে] তালাশ করবে। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٩٩٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ مَوْقُوْفًا عَلٰى ابْنِ عُمَرَ)

১৯৯২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কদরের রাত্রি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তা প্রত্যেক রমজানেই রয়েছে। -[আবূ দাঊদ]

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেছেন, সুফিয়ান ছাওরী ও শো'বা (র.) তাকে তাবেয়ী আবূ ইসহাক হতে ইবনে ওমর পর্যন্ত মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এরই বাণী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ -এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যটি দু'টি অর্থ রাখে। যথা-

১. শবে কদর গোটা রমজান মাসের মধ্যেই রয়েছে। মোটকথা, রমজানের শেষ দশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং ১লা রমজান হতে ২৯শে রমজান পর্যন্ত যে কোনো এক রাতে 'শবে কদর'।

২. প্রত্যেক রমজানেই 'শবে কদর' আছে। কোনো রমজান মাসই শবে কদর হতে খালি নয় বা রমজানের বাইরে শবে কদর নেই। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কথার সমর্থন যে, 'শবে কদর' রমজানের বাইরে নেই।

وَعَنْ ١٩٩٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ بَادِيَةً اَكُوْنُ فِيْهَا وَاَنَا اُصَلِّىْ فِيْهَا بِحَمْدِ اللّٰهِ فَمُرْنِىْ بِلَيْلَةٍ اَنْزِلُهَا فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَنْزِلْ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ قِيْلَ لِابْنِهٖ كَيْفَ كَانَ اَبُوْكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اِذَا

১৯৯৩. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার বাড়ি গ্রামে। আমি তথায় বসবাস করি। আল্লাহর প্রশংসা! আমি সেখানেই নামাজ পড়ি। আপনি আমাকে রমজানের একটি রাতের জন্যে আদেশ করুন, যে রাতে আমি এ মসজিদে আসতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ২৩শে রমজান রজনীতে আসবে। [রাবী বলেন] পরে তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার পিতা কিভাবে কি

صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

করতেন? সে জবাবে বলল, যখন আসর নামাজ পড়তেন আমার পিতা মসজিদে প্রবেশ করতেন, কোনো কাজের তাগিদে তিনি মসজিদ হতে বের হতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ফজর নামাজ না পড়তেন। যখন তিনি ফজর নামাজ সম্পন্ন করতেন, নিজের সওয়ারি পশুটি মসজিদের দরজায় তৈরি পেতেন, তখন তাতে চড়তেন এবং নিজের পল্লীগ্রামের বাড়িতে গিয়ে মিলিত হতেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) আসরের সময় মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং মানবীয় হাজত ব্যতীত বের হতেন না। আর ফজর পর্যন্ত ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করতেন। সম্ভবত ঐ বছর ২৩ তারিখের রাতেই শবে কদর হয়েছিল, এ জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ কথা বলেছিলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٩٩٤ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسٰى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৯৯৪. অনুবাদ : হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হলেন। এ সময় [পথিমধ্যে] মুসলমানদের দু'ব্যক্তি পরস্পরে ঝগড়া করছিল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে 'লাইলাতুল কদর' সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য। অমুক, অমুক পরস্পরে ঝগড়া করছিল ফলে তার পরিচিতি [আমার অন্তর হতে] উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এটা তোমাদের জন্যে ভাল হয়েছে। সুতরাং [এখন] তোমরা তাকে উনত্রিশ, সাতাশ ও পঁচিশ তারিখের রাতে তালাশ কর। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঝগড়ায় লিপ্ত ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় : বর্ণিত আছে, যে দু'ব্যক্তি পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন তারা হলেন, রাসূল ﷺ -এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী হাদরাদ (عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ حَدْرَدْ) ও কা'ব ইবনে মালেক (র.) (كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ)। ঘটনাটি এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবী হাদরাদ (রা.)-এর নিকট হতে কা'ব ইবনে মালেক (রা.) কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক না কেন তিনি তা পরিশোধ করতে দেরি করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। ঘটনা শ্রবণে মহানবী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে আবী হাদরাদকে ঋণের কিছু অংশ ক্ষমা করার নির্দেশ দিলেন। রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাই করলেন।

فَرُفِعَتْ -এর মর্মার্থ : "ফলে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।" অর্থাৎ দু'ব্যক্তির পরস্পর ঝগড়া করার কারণে রাসূল ﷺ -এর অন্তর হতে লাইলাতুল কদরের পরিচিতি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, মূল লাইলাতুল-কদরকেই উঠিয়ে

নেওয়া হয়েছে। শিয়া মতাবলম্বী কিছু লোকের বক্তব্য হলো, মূল লাইলাতুল কদরকেই উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের এ বক্তব্য মহানবী ﷺ -এর বাণী- فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ [সুতরাং তোমরা তাকে ঊনত্রিশ, সাতাশ ও পঁচিশ তারিখের রাতে তালাশ কর।]-এর স্পষ্ট বিরোধী। কেননা, যদি মূল লাইলাতুল কদরকে উঠিয়ে নেওয়া হতো তাহলে রাসূল ﷺ তাকে তালাশ করার নির্দেশ দিতেন না। সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে فَرُفِعَتْ -এর মর্মার্থ হলো فَرُفِعَتْ مَعْرِفَتُهَا অর্থাৎ তার পরিচিতি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। বহুসংখ্যক হাদীস এ কথারই সমর্থন করে।

عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ -এর মর্মার্থ : নবী করীম ﷺ বললেন, সম্ভবত এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হয়েছে। অর্থাৎ লাইলাতুল কদরের পরিচিতি উঠিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্যে ভাল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যদি সে দিন লাইলাতুল-কদরের পরিচিতি তথা নির্দিষ্ট তারিখ মানুষের নিকট প্রকাশ করে দিতেন, মানুষ শুধু সে রাত্রিটিই ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিত এবং রমজানের অবশিষ্ট রাতগুলোতে ইবাদত করা হতে বিরত থাকত। ফলে গোটা রমজান মাসের ইবাদতের কল্যাণ হতে তারা বঞ্চিত থেকে যেত। না বলার কারণে অনির্দিষ্টভাবে তারা উক্ত রাতটি তালাশ করতে থাকবে। ফলে বহু রাতে ইবাদত করার কল্যাণ লাভ করতে পারবে। আর এ জন্যেই রাসূল ﷺ বলেছেন, সম্ভবত এটা তোমাদের জন্যে ভাল হয়েছে।

وَعَنْ ١٩٩٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلٰئِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلٰئِكَتِىْ مَا جَزَاءُ اَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلَهُ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهُ اَنْ يُوَفّٰى اَجْرَهُ قَالَ مَلٰئِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَائِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَاُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَهُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১৯৯৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কদরের রাত হয় তখন জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের দলসহ [দুনিয়াতে] অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহর এমন প্রত্যেক বান্দার জন্যে দোয়া করেন যারা দাঁড়িয়ে বা বসে আল্লাহর জিকির করতে থাকেন। যখন তাদের ঈদের দিন অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন উপস্থিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! যে শ্রমিক তার কার্য সম্পন্ন করেছে তার প্রতিদান কি হতে পারে? ফেরেশতাগণ জবাবে বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তার পারিশ্রমিক পুরোপুরি দেওয়া হচ্ছে তার প্রতিদান। তখন আল্লাহ বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার যে বান্দা-বান্দীগণ তাদের উপর অর্পিত আমার ফরজ যথাযথরূপে পালন করেছে অতঃপর তারা [নিজের ঘর হতে ঈদগাহের দিকে] উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করতে করতে বের হয়েছে- আমার ইজ্জত ও সম্মানের কসম, আমি নিশ্চয় তাদের দোয়া কবুল করব। তারপর তিনি বলেন, [হে বান্দাগণ!] তোমরা ফিরে যাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দিলাম। রাসূল ﷺ বলেন, তখন তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে।

-[হাদীসটি বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَاهٰى بِهِمْ مَلَائِكَتَهٗ-**এর ব্যাখ্যা :** মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে এ পৃথিবীতে জিন জাতি বসবাস করত। তারা নানা রকম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে এক অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। পরে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে আদম তথা মানব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলেন। এতে ফেরেশতারা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ বলে আপত্তি করলেন যে, اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ [অপনি কি পৃথিবীতে জিন জাতির ন্যায় আবার এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা পৃথিবীতে আসার পর বিপর্যয় ও রক্তারক্তি করবে] কিন্তু ব্যাপারটি যখন বিপরীত হয়ে গেল– পৃথিবীতে আসার পর মানুষ বিপর্যয় ও রক্তারক্তি সৃষ্টির পরিবর্তে আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয়ে তাঁর ইবাদত ও মাহাত্ম্য প্রকাশে নিজেদেরকে নিয়োজিত করল, তখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব প্রকাশ করলেন।

وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ-**এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো– তোমাদের আমলনামায় যেসব পাপ লিপিবদ্ধ ছিল, এখন তার স্থলে নেকী দিয়ে দেওয়া হলো। সম্ভবত এ অনুকম্পার মধ্যে সমস্ত রোজাদার এবং গুনাহ হতে তওবাকারী, আল্লাহর হুকুমের অনুগত সমস্ত মানুষই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী রয়েছে যে– اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ - মোটকথা, অত্র হাদীসে বান্দার প্রতি আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ও বিরাট সুসংবাদের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। পরিশেষে আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নেবেন।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ
পরিচ্ছেদ : ই'তিকাফ

ই'তিকাফ রমজানের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর রমজানের অন্যান্য করণীয় ইবাদত শেষে একজন রোজাদারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ই'তিকাফ করা। তাই صَوْم বা রোজা অধ্যায়ের পর্যায়ক্রমে সর্বশেষ পরিচ্ছেদে আনয়ন করা হয়েছে ই'তিকাফের আলোচনা। সিয়াম সাধনা মানুষকে ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের শিক্ষা দেয়। আর ই'তিকাফ দুনিয়া ত্যাগের প্রবণতা শিক্ষা দেয় আর আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে দেয়। ফলে মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভালবাসার সৃষ্টি হয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে ই'তিকাফ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১৯৯৬ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهٗ مِنْ بَعْدِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৯৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমজানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন যাবৎ না আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠিয়ে নিলেন। তাঁর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ই'তিকাফের পরিচয় : مَعْنَى الْاِعْتِكَافِ لُغَةً : اِعْتِكَاف শব্দটি عَكْفٌ ধাতু থেকে বাবে اِفْتِعَال-এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْاِقَامَةُ বা অবস্থান করা। ৩. কোনো বিষয়কে বাধ্যতামূলকভাবে ধরে রাখা।

২. اَلْحَبْسُ বা আটকিয়ে রাখা। ৪. মসজিদে অবস্থান করা।

৫. নির্দিষ্ট পরিগণ্ডিতে নিজেকে আটকিয়ে রাখা ইত্যাদি।

যেমনি পবিত্র কুরআনে এসেছে–

١. وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ

٢. اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ

٣. وَهُمْ يَعْكِفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَهُمْ

ই'তিকাফের পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় ই'তিকাফের সংজ্ঞা হলো–

১. আল্লামা ইমাম কুদূরী (র.) বলেন– هُوَ اللُّبْثُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ

অর্থাৎ নিজেকে আটকিয়ে রাখার নিয়তে রোজার সাথে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে।

২. কারো মতে, اَلْاِعْتِكَافُ هُوَ الْاِقَامَةُ فِى الْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى سَاعَةً فَمَا فَوْقَهَا

৩. কারো মতে, اَلْقِيَامُ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوْصٍ عَلٰى صِفَةٍ مَخْصُوْصَةٍ (تُحْفَةُ الْاَحْوَذِىْ)

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন– اِعْتِكَافٌ শব্দের অর্থ হলো– اَللُّبْثُ مُطْلَقًا শুধু অবস্থান করা, যে লোক মসজিদে অবস্থান করছে তাকে বলা হয় مُعْتَكِفٌ বা عَاكِفٌ

ই'তিকাফের প্রকারভেদ : ইসলামি শরিয়াতে ই'তিকাফ তিন প্রকার। যথা–

১. ওয়াজিব ই'তিকাফ। যেমন– মান্নতের ই'তিকাফ। কেউ যদি ই'তিকাফ করার মানত করে তবে তার উপর ই'তিকাফ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. সুন্নত ই'তিকাফ। যেমন রমজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদায়ে কিফায়া। হাদীসে এসেছে–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ - ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ هٰذِهٖ

৩. মোস্তাহাব ই'তিকাফ। এটা হচ্ছে উল্লিখিত দু'প্রকার ই'তিকাফ ছাড়া অন্যান্য ই'তিকাফ।

ই'তিকাফের সময় : বিভিন্ন ই'তিকাফের মুদ্দতও বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে।

ওয়াজিব ই'তিকাফের সময় : ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। যে কয়দিন ই'তিকাফ করার মানত করা হয়, সে কয়দিনই পালন করতে হয়।

সুন্নত ই'তিকাফের সময় : সুন্নত ই'তিকাফের সময় হলো রমজানের শেষ দশদিন। অর্থাৎ রমজানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করতে হয় এবং রমজানের শেষ তারিখে সূর্যাস্তের পর মসজিদ হতে বের হতে হয়।

মোস্তাহাব ই'তিকাফের সময় : মোস্তাহাব ই'তিকাফের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই; কিন্তু তার নিম্নতম সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, নিম্নতম সময় এক ঘণ্টা, রাত্রে হোক বা দিনে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতেও অনুরূপ একটি অভিমত পাওয়া যায়। এ মতের উপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অন্য মতানুযায়ী মোস্তাহাব ই'তিকাফের নিম্নতম সময় একদিন একরাত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, দিনের বেশির ভাগ সময় হলো, নিম্নতম সময়।

حكم الاعتكاف **ই'তিকাফের হুকুম :** বিভিন্ন ই'তিকাফের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন, যা নিম্নরূপ–

১. মানতের ই'তিকাফ আদায় করা ওয়াজিব।

২. রমজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদায়ে কিফায়া। মসজিদের পার্শ্ববর্তী লোকদের মধ্য থেকে কেউ ই'তিকাফ করলেই সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে।

৩. এ ছাড়া অন্যান্য ই'তিকাফ মোস্তাহাব।

▮ শায়খাইনের মতে, ই'তিকাফের জন্য রোজা শর্ত। তাই একদিনের কমে ই'তিকাফ হবে না।

▮ রমজানের ই'তিকাফের জন্য মসজিদ শর্ত, কেননা এ ব্যাপারে বলা হয়েছে– لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ

▮ ই'তিকাফের জন্য রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বিশ তারিখ আসরের পর মাগরিবের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। আর ঈদের চাঁদ দেখার পর মসজিদ ত্যাগ করতে হয়।

ই'তিকাফের জন্যে রোজা শর্ত কি? : সুন্নতে মুয়াক্কাদা ই'তিকাফের জন্যে রোজা শর্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। কেননা, তা রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে রমজানের রোজাসহ করতে হয়। তবে ওয়াজিব ও মোস্তাহাব ই'তিকাফের জন্যে রোজা শর্ত কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক ও ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) প্রমুখের মতে, ই'তিকাফের জন্যে রোজা শর্ত নয়। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ উপস্থাপন করেছেন–

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ عُمَرَ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ اَنْ اِعْتَكِفْ لَيْلَةً

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর (রা.)-কে রাতে তার মানত ই'তিকাফ পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, ই'তিকাফের জন্যে রোজা শর্ত নয়। কেননা, রাত রোজার আধার নয়।

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالْاَوْزَاعِيِّ وَاِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আযম, মালেক, আওযায়ী, মুজাহিদ, ইব্রাহীম নখয়ী ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখের মতে, ই'তিকাফের জন্যে রোজা শর্ত নয়।

তাঁরা নিজেদের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেন–

١. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِعْتَكِفْ وَصُمْ (اَبُوْ دَاوُدَ ، نَسَائِيْ)

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِالصَّوْمِ (اَلدَّارَ قُطْنِيْ ، بَيْهَقِيْ)

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُمَا قَالَا اَلْمُعْتَكِفُ يَصُوْمُ (بَيْهَقِيْ)

প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর :

প্রথম হাদীসের উত্তর : তারা যে ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তার উত্তর হলো–

ক. উক্ত হাদীসে যে لَيْلَةً শব্দ রয়েছে, তা দ্বারা রাত ও দিন উভয়কে বুঝানো হয়েছে, শুধু রাত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা, আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফের বর্ণনা এসেছে এভাবে–

اِنَّ عُمَرَ (رضـ) جَعَلَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً اَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَاَلَ النَّبِيَّ فَقَالَ اِعْتَكِفْهُ وَصُمْ .

দারে কুতনীর মধ্যে বর্ণনা রয়েছে এভাবে– فَاَمَرَهٗ اَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُوْمَ

ইবনে বাত্তাল (র.) বলেন, মূল হাদীস ছিল এরূপ– قَالَ عُمَرُ (رضـ) اِنِّيْ نَذَرْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ يَوْمًا وَلَيْلَةً

বর্ণনাকারী يَوْمًا শব্দের উল্লেখ করেননি।

খ. অথবা জবাব এই যে, ওমর (রা.)-এর মানত জাহিলিয়া যুগের মানত হওয়ার কারণে তা পূর্ণ করার নির্দেশ ছিল, মোস্তাহাব হিসেবে নয়। আর মোস্তাহাব ই'তিকাফের জন্যে রোযা শর্ত নয়।

দ্বিতীয় হাদীসের জবাব : দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর এই যে, উক্ত হাদীসটি শুধুমাত্র আবূ বকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, নতুবা সব মুহাদ্দিস তাকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং উক্ত হাদীস দলিল হতে পারে না। কাজেই হানাফীদের মতামতই বিশুদ্ধ।

وَعَنْ ١٩٩٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ كَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِىْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দানের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার ছিলেন। তিনি রমজান মাসে আরও অধিক উদার হতেন। জিবরাঈল (আ.) রমজানের প্রত্যেক রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর সম্মুখে নবী করীম ﷺ কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। যখনই জিবরাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তাঁর দান উদারতা-বর্ষণকারী বাতাস হতেও বেড়ে যেত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جُوْد ও سَخَاوَة-এর মধ্যে পার্থক্য :

১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, جُوْد হচ্ছে عَام আর سَخَاوَة হচ্ছে খাস। কেননা, سَخَاوَة ফলের সাথে নির্দিষ্ট আর جُوْد মাল-সম্পদ, জ্ঞান সবকিছুকে বুঝায়। এ জন্যে নবী ﷺ -কে سَخِىٌّ না বলে اَجْوَدُ বলা হয়।

২. جُوْد শব্দটি আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়, আর سَخَاوَة শুধু বান্দার জন্যে নির্দিষ্ট।

৩. কারো মতে, جُوْد হলো খোদাপ্রদত্ত আর سخاوة হলো كَسْبِى বা চেষ্টাগত।

৪. আরেক দলের মতে উভয়টি مُرَادِفٌ তথা সমার্থবোধক।

وَعَنْ ١٩٩٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ الْقُرْاٰنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِى الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِى الْعَامِ الَّذِىْ قُبِضَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৯৯৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট প্রত্যেক বছর [রমজানে] একবার কুরআন পাঠ করা হতো। যে বছর তাঁকে তুলে নেওয়া হলো সে বছর [রমজানে] তাঁর নিকট দু'বার পাঠ করা হয়েছিল। রাসূল ﷺ প্রত্যেক বছর দশ দিন ই'তিকাফ করতেন, যে বছর তাকে উঠিয়ে নেওয়া হলো সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিশ দিন ই'তিকাফ করার কারণ : যে বছর রাসূল ﷺ ইহধাম ত্যাগ করলেন সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১. ইহধাম হতে যে রাসূল ﷺ -এর বিদায়কাল সমাগত তা তিনি জানতেন, এ জন্যে তিনি নেক কাজ বেশি বেশি করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, যাতে উম্মতগণ তা হতে শিক্ষা লাভ করে।

২. জিবরাঈল (আ.) প্রত্যেক বছর একবার পূর্ণ কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন; কিন্তু ঐ বছর দু'বার করেছিলেন, এ জন্যে রাসূল ﷺ বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন।

৩. ইবনে আরাবী (র.) বলেছেন, একবার নবী করীম ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতিবন্ধকতার কারণে রমজানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ ছেড়ে দিয়েছিলেন, এ জন্যে ঐ বছর দশ দিনের সাথে অতিরিক্ত দশ দিন যোগ হয়ে ই'তিকাফ বিশ দিন হয়েছিল।

৪. অথবা এটাও হতে পারে যে, যে বছর রাসূল ﷺ বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন তার পূর্ববর্তী বছর রমজানের শেষ দশ দিন মুসাফির অবস্থায় ছিলেন। ফলে ই'তিকাফ করতে পারেননি, এ জন্যে পরের বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন। নিম্নোক্ত হাদীসই তার প্রমাণ– হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। এক বছর তিনি সফরে ছিলেন, এ জন্যে ই'তিকাফ করতে পারলেন না, পরের বছর তিনি শেষ বিশ দিন ই'তিকাফ করলেন।

وَعَنْ ١٩٩٩ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ اَدْنٰى اِلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৯৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ই'তিকাফ করতেন তিনি মসজিদে থেকে তাঁর শির মোবারক আমার দিকে এগিয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত কখনো ঘরে ঢুকতেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ই'তিকাফকারীর মসজিদ হতে কোনো অঙ্গ বের করা : রাসূল ﷺ -এর ঘর মসজিদের সাথেই ছিল। অত্র হাদীস হতে বুঝা যায় যে, ই'তিকাফকারীর পক্ষে নিজের হাত, পা বা মাথা মসজিদের বাইরে বের করা ক্ষতিকর নয়।

এ সূত্র ধরে ফকীহগণ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বলে– إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الْبَيْتِ فَاَنْتِ طَالِقٌ অর্থাৎ যদি ঘর হতে বের হও তবে তুমি তালাক। সুতরাং সে যদি ঘরের ভেতরে থেকে হাত, পা, কিংবা মাথা বের করে দেয়, তখন তালাক হবে না। কেননা, শরীরের কোনো অঙ্গ বের করা দ্বারা তার বের হওয়া বুঝায় না। তদ্রূপ এখানেও মসজিদ হতে মাথা বের করে দেওয়া দ্বারা তাঁর বের হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

وَعَنْ ٢٠٠٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ عُمَرَ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০০০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। একদা হযরত ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, বললেন– আমি জাহিলিয়া যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জাহেলী যুগের মান্নত পূর্ণ করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : জাহেলী যুগের মান্নত সহীহ কিনা, বা পূর্ণ করার ওয়াজিব কিনা; এই বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জাহেলিয়াত যুগের মানত যদি শরিয়ত সম্মত হয়, তবে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। অত্র হাদীসই তার স্পষ্ট দলিল– এখানে নবী ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে তা পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, অমুসলমানের মানতই শুদ্ধ নয়। কেননা, কাফের মানত করার উপযোগী নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) উপস্থাপিত হাদীসের জবাবে তিনি বলেন, এখানে 'পূর্ণ করার নির্দেশ' ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং মোস্তাহাব হিসেবে। কেননা, যদি তা পূর্ণ করতে হুযূর ﷺ নিষেধ করতেন, তবে ওমরের মনে ব্যথা লাগত এবং তার মনে একটা ওয়াস-ওয়াসা থেকে যেত। যেমন– মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে ওবাইর জানাজা নবী ﷺ পড়িয়েছেন, হযরত ওমর (রা.) বাধা দিলেও নবী ﷺ বাধা উপেক্ষা করে পড়িয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন– "আমি যদি সত্তর বারও তার জন্যে মাগফেরাত কামনা করি তার পক্ষে আমার দোয়া কবুল হবে না।" কিন্তু যদি আমি জানাজা না পড়াই তবে তার পুত্র আবদুল্লাহ [একজন খাঁটি ঈমানদার সাহাবী] তার মনঃকষ্ট হবে।" এখানে হযরত ওমর (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়াও তদ্রূপ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٠٠١ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ)

২০০১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। এক বছর তিনি ই'তিকাফ করতে পারলেন না। অতঃপর যখন পরবর্তী বছর আসল তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করলেন। -[তিরমিযী]

আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন।

وَعَنْ ٢٠٠٢ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِىْ مُعْتَكِفِهٖ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২০০২. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের নামাজ পড়তেন, তারপর আপন ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ই'তিকাফ শুরু করার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : কোন সময় হতে ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতে হবে, এতে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে-

সুফিয়ান ছাওরী, আওযায়ী ও লাইস (র.) অত্র হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, ২০শে রমজানের সকাল বেলা দিনের পূর্বাহ্নে উক্ত স্থানে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু চার ইমামের মতে, ২১শে রমজান রাতের পূর্বে অর্থাৎ বিশ তারিখের দিনের শেষে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করতে হবে। হযরত ইবনে ওমরের হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে।

অত্র হাদীসের জবাবে তাঁরা বলেন, এখানে প্রবেশ দ্বারা ই'তিকাফ শুদ্ধ করা নয়। কেননা, হাদীসের শব্দ হলো 'যখন ইরাদা বা ইচ্ছা করতেন'। এটা সুস্পষ্ট কথা যে, কোনো কাজের ইচ্ছা করা আর কাজ শুরু করা উভয়টি এক নয়। অর্থাৎ ইচ্ছা নিয়ে প্রবেশ করতেন এবং রাত হতে শুরু করতেন। তাই কাজী আবূ ইয়া'লা বলেছেন, বিশ তারিখের ফজরের পর প্রবেশ করতেন যেন শেষ দশকের সময় কিছুটা বাড়তি হয়। তবে সেই বাড়তি সময়টি ই'তিকাফের মধ্যে গণ্য নয়।

তবে সর্বাপেক্ষা উত্তম জবাব হলো- বিশ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং সারা রাত মসজিদে থাকতেন আর সে রাত শেষে একুশ তারিখে ফজরের পরে ই'তিকাফের জন্যে মসজিদে যে স্থানটি ঘেরাও করে নিতেন সেখানে প্রবেশ করতেন। আর এ অর্থ বা ব্যাখ্যা এ জন্যে নেওয়া যায় যে, তিনি কোন তারিখের ফজরের পরে উক্ত স্থানে প্রবেশ করতেন- হাদীসে সে তারিখ উল্লেখ নেই। ফলে বিশও হতে পারে এবং একুশও হতে পারে। তবে একুশের ফজর হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْهَا ٢٠٠٣ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْاَلُ عَنْهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২০০৩. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় রোগী পরিদর্শন করতেন, তিনি হাঁটতে পথের এদিক-ওদিক না গিয়ে ও না থেমে রোগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে চার ইমাম এ মাস'আলা বের করেছেন যে, ই'তিকাফকারী মানবীয় প্রয়োজনে মসজিদ হতে বের হয়ে আসলে এদিক- সে দিক না গিয়ে কোথাও না থেমে রোগীর কাছে যাওয়া এবং তার অবস্থাদি জিজ্ঞাসাবাদ করা, কিংবা জানাজা শুরু হয়েছে দেখলে তাতে শরিক হওয়া জায়েজ আছে।

وَعَنْهَا ٢٠٠٤ (رض) قَالَتْ اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لَا يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২০০৪. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর পক্ষে এ সুন্নত পালন করা আবশ্যক- সে কোনো রোগীকে দেখতে যাবে না, জানাজার নামাজে হাজির হবে না, স্ত্রী সহবাস করবে না এবং তার সাথে মেলামেশাও করবে না, যা না হলেই নয়, এমন প্রয়োজন ব্যতীত কোনো প্রয়োজনে বের হবে না। রোজা ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না এবং জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ই'তিকাফের স্থান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ই'তিকাফ কোন স্থানে করলে বিশুদ্ধ হবে আর কোন স্থানে করলে বিশুদ্ধ হবে না, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

مَذْهَبُ حَسَنْ بَصْرِى وَ زُهْرِى وَعُرْوَةَ وَعَطَاءٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَلِيِّ (رض) : হাসান বসরী, যুহরী, আতা, ওরওয়া, ইবনে মাসউদ ও আলী (রা.)-এর মতে- যে মসজিদে জুমা'র নামাজ হয় এমন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। কারণ, জামে মসজিদ না হলে জুমা'র নামাজের জন্য বের হতে হবে। এটা ইমাম মালিক (র.)-এরও এক অভিমত।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَثَوْرِىْ وَقَوْلُ جَدِيْدُ الشَّافِعِىْ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, আহ্মাদ, ইসহাক ও ছাওরী (র.) প্রমুখের মতে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নতুন মতানুযায়ী, ই'তিকাফ যে কোনো মসজিদেই শুদ্ধ হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ অর্থাৎ "মসজিদে ই'তিকাফের অবস্থায় তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না।" এখানে মসজিদ শব্দটি বহুবচন এবং সাধারণ (আ'ম)। সুতরাং সকল মসজিদেই ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে। কুরআনের সুস্পষ্ট নসের মুকাবিলায় প্রথমোক্ত দলের কিয়াস অসামঞ্জস্যশীল। বিদায়া গ্রন্থে আছে, যে মসজিদে জামাআতে নামাজ হয় না সে মসজিদে ই'তিকাফ সহীহ্ হবে না। কারণ, হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, "যে মসজিদে জামাআতে নামাজ হয় না এমন মসজিদে ই'তিকাফ হয় না" [তাবরানী]। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, যে মসজিদে পাঞ্জেগানা নামাজ হয় না এমন মসজিদে ই'তিকাফ শুদ্ধ নয়। কেননা, ই'তিকাফ নামাজের জন্যে অপেক্ষমাণ থাকার সমতূল্য ইবাদত। সুতরাং যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হবে তার সাথেই ই'তিকাফ নির্দিষ্ট হবে। -[আইনী, হিদায়া, তা'লীক]

মহিলাদের ই'তিকাফের স্থান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ইমাম নববী (র.) বলেছেন, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবূ দাউদ (র.) প্রমুখের মতে, ই'তিকাফকারী পুরুষ হোক কিংবা মহিলা প্রত্যেকের জন্যেই মসজিদে হওয়া শর্ত। মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ শুদ্ধ হবে না। তাঁরা নিম্নোক্ত হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন, "নবী করীম ﷺ রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বিবিগণ ই'তিকাফ করেছেন।" -[মুসলিম]

এ ধরনের হাদীসসমূহের ভিত্তিতে ইমাম নববী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ ও তাঁর বিবিগণ অনেক কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মসজিদেই ই'তিকাফ করতেন। যদি বাসগৃহে জায়েজ হতো কমপক্ষে একবার হলেও বসত ঘরে ই'তিকাফ করতেন।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফী মাযহাব মতে, মহিলাগণ নিজেদের বাড়ির মসজিদে ই'তিকাফ করবে। পাঞ্জেগানা জামাআত হয় এমন মসজিদে ই'তিকাফ করলেও জায়েজ হবে। মহিলাদের জন্যে বড় মসজিদের তুলনায় পাঞ্জেগানা মসজিদ উত্তম, আবার পাঞ্জেগানা মসজিদের তুলনায় নিজের ঘরের মসজিদ সবচেয়ে উত্তম।

১. মারফূ হাদীসে আছে, মহিলাদের আপন বাড়ির নামাজ মসজিদের নামাজ অপেক্ষা উত্তম, তাদের নিজের ঘরের নামাজ নিজের বাড়ির নামাজ অপেক্ষা উত্তম এবং নিজের হুজরার নামাজ তার ঘরের নামাজ অপেক্ষা উত্তম। যখন মসজিদের নামাজ হতে ঘরের নামাজ উত্তম বলে প্রমাণিত হলো তখন ঘরের ই'তিকাফও মসজিদের ই'তিকাফ হতে অবশ্যই উত্তম হবে। শেখ আবূ বকর রাযী (র.)-এর অভিমতও এটাই।

২. এছাড়া মহিলাগণ যদি মসজিদে ই'তিকাফ করতে যায় তবে পুরুষদের সাথে মিশতে হবে। আর ই'তিকাফ অবস্থায় হোক বা ই'তিকাফবিহীন হোক পুরুষদের সাথে মেলামেশা মহিলাদের পক্ষে মাকরূহ।

৩. যখন ফিকহবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে মহিলাদের জন্যে ই'তিকাফ জায়েজ, তাহলে তা নিজ ঘরেই হওয়া উচিত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ অর্থাৎ তাদের গৃহই তাদের জন্যে উত্তম স্থান।

উল্লেখ্য যে, পুরুষদের জন্যে জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদে ওয়াজিব ও সুন্নত ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হবে না। এটাই হানাফীদের অভিমত। কিছুসংখ্যক আলেম মোস্তাহাব ই'তিকাফের জন্যেও জামে' মসজিদ হওয়াকে পূর্বশর্তরূপে গণ্য করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٠٠٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ اَوْ يُوْضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ اُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২০০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম ﷺ যখন ই'তিকাফ করতেন, মসজিদে তাঁর জন্যে বিছানা পাতা হতো অথবা তওবার খুঁটির পেছনে তাঁর জন্যে খাটিয়া স্থাপন করা হয়। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী ﷺ -এর সময়ে মসজিদে নববীর ভিটি ছিল কাঁচা। ঘরের মেঝে সমতল না থাকায় খাটিয়া পাতার আবশ্যক হতো। সাহাবী হযরত লুবাবা অলসতাবশত নবম হিজরিতে তাবুকের যুদ্ধে নবী ﷺ -এর সাথে শরিক হননি। তাই লোকেরা তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল। এ অপরাধে অনুতপ্ত হয়ে তিনি নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে আল্লাহর কাছে কাঁদতেন। নামাজের সময় তাঁর ছোট একটি কন্যা এসে তাঁকে খুলে দিত আবার নামাজ শেষে পূর্ববৎ বেঁধে দিত। যে পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর ক্ষমার ঘোষণা নাজিল হলো। পরবর্তীকালে উক্ত খুঁটিকেই 'উস্তুয়ানায়ে তওবা' তথা অনুতাপের খুঁটি বলা হয়।

وَعَنْ ٢٠٠٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْزٰى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

২০০৬. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে ব্যক্তি গুনাহসমূহ হতে বিরত থাকে এবং তার জন্যে নেকীসমূহ লেখা হয় ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে বাইরে থেকে যাবতীয় নেক কাজ করে। -[ইবনে মাজাহ]

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْانِ
অধ্যায় : কুরআনের মর্যাদা

فَضَائِلُ-এর আভিধানিক অর্থ : এ শব্দটি فَضِيْلَةٌ-এর বহুবচন فَضْل মূলধাতু হতে নির্গত; এটি نَقْص-এর বিপরীত শব্দ। অর্থ হলো– মর্যাদা, সম্মান, মহত্ত্ব ইত্যাদি।

اَلْقُرْاٰنُ-এর পরিচিতি : اَلْقُرْاٰنُ শব্দটির মূল উৎস সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি قَرْأٌ মূলধাতু হতে উদ্গত, যার অর্থ হলো– একত্র করা। কেননা অত্র কিতাব اَمْر , نَهِىْ , قِصَص , وَعْد , وَعِيْد-সহ যাবতীয় বিষয়াবলিকে একত্র করেছে এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের মূল বিষয় সন্নিবেশ করেছে। এর মধ্যে অবতারিত আয়াত ও সূরাসমূহ একত্র হয়ে আছে এবং এ গ্রন্থই সকল গোমরাহ জাতি-গোষ্ঠীকে একই অবস্থানে সমবেত করে। এ কারণেই এ মহাকিতাবকে اَلْقُرْاٰنُ বলা হয়।

২. অথবা, শব্দটি قِرَاءَةٌ হতে গৃহীত। এর অর্থ হলো– مَقْرُوْءٌ বা পঠিত বিষয়। যেহেতু অত্র কিতাব হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী ﷺ -কে পাঠ করে শুনিয়েছেন, আর নবী করীম ﷺ -ও তা পাঠ করে সাহাবীগণকে বুঝিয়েছেন, তাঁরা তাবেয়ীদেরকে, তাঁরা তাবে-তাবেয়ীনদেরকে এভাবে অদ্যাবধি তা পাঠ করার মাধ্যমেই শিখানো ও বুঝানো হচ্ছে। অথবা পৃথিবীতে এটাই একমাত্র কিতাব যা সর্বাধিক পঠিত হয়ে থাকে, যার সাক্ষ্য বিরুদ্ধবাদীরাও দিয়ে থাকে, এজন্য একে اَلْقُرْاٰنُ বলা হয়ে থাকে।

৩. অথবা, শব্দটি قَرْنٌ হতে সংগৃহীত। এর অর্থ হলো– জোড়া দেওয়া, মিলানো, বাঁধা বা সাথে থাকা। কেননা حَقٌّ ও هِدَايَةٌ অত্র কিতাব নিজ সাথে রাখে। এর প্রত্যেকটি আয়াত ও সূরা [অর্থগতভাবে] একটি অপরটির সাথে মিলিত। পরস্পরে কোনোরূপ বৈপরীত্য নেই। এ কারণেই একে اَلْقُرْاٰنُ বলা হয়।

কারো কারো মতে এর মূল হলো قُرْاٰنٌ মাসদার যা قَرَأَ يَقْرَأُ হতে গৃহীত। এর অর্থ– পড়া, পাঠ করা।

اَهَمِّيَّةُ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ কুরআন তেলাওয়াত করার গুরুত্ব : মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন এজন্য নাজিল করেছেন যে, তাঁর বান্দাগণ নিয়মিত তেলাওয়াত করে এর অর্থ অনুধাবন করে এর বিধিবিধানের উপর আমল করবে। তাতে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং ব্যক্তি তার ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কীয় বিষয়াবলির সঠিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবে।

বস্তুত কুরআন তেলাওয়াত করা এমন একটা আমল যা ব্যক্তিকে দীন ও পরকালমুখী করে দেয়। ইহকালীন জীবনে সফলতার পথ দেখায় এবং মহান আল্লাহর বিধিবিধান খুব ভালোভাবে বুঝার সুযোগ করে দেয়।

এজন্য আলেমগণ লিখেছেন যে, কুরআন তেলাওয়াতকে জীবনের একটা অংশ বানানো আবশ্যক। প্রত্যেকবার পড়ার সময় গভীর দৃষ্টি দান করা একান্ত জরুরি। কুরআন তেলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর কালামের প্রতি সুগভীর চিন্তা-গবেষণা করা, দীন ও আখিরাতের রহস্যাবলি অনুধাবন করা, আল্লাহর বিধিবিধানসমূহ অবহিত হয়ে তদনুযায়ী আমল করা এবং ঘটনাবলি হতে শিক্ষা গ্রহণ করা; শুধু হরফ ও শব্দ উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়।

এ কথা স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে অথচ সে অনুযায়ী আমল করে না– এরূপ ব্যক্তির জন্য কুরআন শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে– رُبَّ تَالِ الْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ অর্থাৎ 'এমন কিছু কুরআন পাঠকারী আছে যাকে কুরআন অভিসম্পাত করে থাকে।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শুধু শাব্দিক কুরআন পড়া নয়; বরং তেলাওয়াতের মাধ্যমে তার উপর আমল করা জরুরি।

বস্তুত যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল অথচ সে অনুযায়ী কাজ করল না, সে যেন কুরআনকে লাঞ্ছিত করল। তাই সকলেরই উচিত কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

اٰدَابُ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ **কুরআন তেলাওয়াতের নিয়ম :** মিসওয়াকের সাথে অজু করে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে করে নম্র ভদ্র হয়ে এবং মন ও অন্তরকে একনিষ্ঠ করে কেবলামুখী হয়ে বসবে। আর মনে করবে যে, আমি মহান আল্লাহর সম্মুখে বসেছি এবং কোনো মাধ্যম ছাড়াই তাঁর কালাম শুনছি তারপর بِسْمِ اللّٰهِ ও اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়ে ধীরে ধীরে তথা তারতীলের সাথে বুঝেশুনে পড়া শুরু করবে।

কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে এই দোয়া পড়া উচিত–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّ هٰذَا كِتَابُكَ الْمُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِكَ عَلٰى رَسُوْلِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَكَلَامُكَ النَّاطِقُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكَ جَعَلْتَهٗ هَادِيًا مِّنْكَ لِخَلْقِكَ وَحَبْلًا مُّتَّصِلًا فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِكَ ـ اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ نَظَرِىْ فِيْهِ عِبَادَةً وَّقِرَاءَتِىْ فِكْرًا وَّفِكْرِىْ فِيْهِ اِعْتِبَارًا اِنَّكَ اَنْتَ الرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

অত্র দোয়ার পর قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ পড়া, তারপর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে তেলাওয়াত শুরু করা–

اَللّٰهُمَّ بِالْحَقِّ اَنْزَلْتَهٗ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ رَغْبَتِىْ فِيْهِ وَاجْعَلْهُ نُوْرًا لِّبَصَرِىْ وَشِفَاءً لِّصَدْرِىْ وَذِهَابًا لِهَمِّىْ وَحُزْنِىْ وَبَيِّضْ بِهٖ وَجْهِىْ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ وَفَهْمَ مَعَانِيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

▮ কুরআন পাঠের সময় কোনো নিরিবিলি পরিবেশ বেছে নেওয়া উত্তম। হট্টগোলযুক্ত স্থানে না পড়াই উত্তম। পড়তে চাইলে অনুচ্চ আওয়াজে পড়বে, তবে শ্রোতা যদি আগ্রহী হয় তবে শুনিয়ে পড়বে। এতে তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ে ছওয়াবের অংশীদার হবে। এমনিভাবে মুখস্থ পড়ার চেয়ে দেখে পড়া উত্তম। কেননা এর ফলে حُضُوْرِىْ قَلْبٌ সৃষ্টি হয় এবং চোখসহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইবাদতে অংশীদার হয়।

▮ কুরআন তেলাওয়াতের সময় যখন বান্দার জন্য رَحْمَةٌ ও وَعْدَةٌ -এর কোনো আয়াত আসে তখন প্রফুল্ল মনে আল্লাহর নিকট নিজের জন্য ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা।

যখন عَذَابٌ ও وَعِيْدٌ সম্পর্কীয় কোনো আয়াত আসে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

▮ মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব সম্পর্কীয় আয়াত আসলে تَسْبِيْح পাঠ করা এবং আওয়াজ একটু উঁচু করা এবং অন্তরের মধ্যে আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

▮ কুরআন পাঠের মাঝে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে কুরআন বন্ধ করে তা সামাধা করা, এরপর পুনরায় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ও بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে পাঠ শুরু করা। ভুল উচ্চারণ করা এবং ভুল পদ্ধতিতে আওয়াজ দীর্ঘায়িত করা পরিত্যাজ্য। কুরআন সাধারণত বসে পড়া উত্তম, তবে রাস্তায় চলাচলের অবস্থায়ও পড়া জায়েজ। জঙ্গলের মধ্যে আওয়াজ উঁচু করে পড়া উত্তম। অপবিত্র স্থানে পড়া মাকরূহ। কুরআন মাজীদকে পারায় পারায় কেটে ভাগ করা জায়েজ নেই, তবে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার সুবিধার্থে এমনটি করা জায়েজ।

■ ফিকহের কিতাবে উল্লিখিত আছে যে, কুরআনের হক আদায়ের লক্ষ্যে চল্লিশ দিনে এক খতম করতে হবে, তবে এক বৎসরে খতম করাও চলে। ইবাদতের [তারাবীহ্ ইত্যাদিতে] লক্ষ্যে সাত দিনেও খতম করা যায়।..

কুরআনের এ পরিমাণ আয়াত মুখস্থ করা সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন যার দ্বারা নামাজ পড়া যথেষ্ট হবে। আর পুরো কুরআন মুখস্থ করা ফরজে কেফায়া। ফকীহগণ বলেছেন যে, সূরা ফাতেহাসহ অন্য যে কোনো সূরা মুখস্থ করা সকলের উপর ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট কুরআন মুখস্থ করা এবং হুকুম জানা নফল নামাজ হতে উত্তম।

কুরআন খতমের দোয়া : কুরআন খতমের সময় মুরব্বিজনদেরকে একত্র করে সকলে মিলে দোয়া করা উত্তম। কুরআন খতমের পর সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাকারার প্রথম হতে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়ে কুরআন মাজীদ বন্ধ করা উত্তম। ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে شُعَبُ الْاِيْمَانِ-এ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ যখন কুরআন খতম করতেন, তখন দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَذَبَ الْعَادِلُوْنَ بِاللّٰهِ وَضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَذَبَ الْمُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْمَجُوْسِ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ وَمَنْ دَعَا لِلّٰهِ وَلَدًا وَصَاحِبَةً اَوْ نِدًّا اَوْ شَبَهًا اَوْ مِثْلًا اَوْ سَمِيًّا اَوْ عَدْلًا فَاَنْتَ رَبَّنَا اَعْظَمُ مِنْ اَنْ نَتَّخِذَ فِيْمَا خُلِقَتْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ـ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِاٰبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ بَلِ اللّٰهُ خَيْرٌ وَاَبْقٰى وَاَحْكَمُ وَاَكْرَمُ وَاَعْظَمُ مِمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْمَلُوْنَ ـ صَدَّقَ اللّٰهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ الْكِرَامُ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْمَلٰئِكَةِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَارْحَمْ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِمْ لَنَا بِخَيْرٍ وَافْتَحْ لَنَا بِخَيْرٍ وَبَارِكْ لَنَا فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَانْفَعْنَا بِالْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

এ ছাড়া প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াতের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে প্রার্থনা করা উত্তম–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ لَنَا فِى الدُّنْيَا قَرِيْنًا وَفِى الْاٰخِرَةِ شَافِعًا وَفِى الْقَبْرِ مُوْنِسًا وَفِى الْقِيَامَةِ صَاحِبًا وَعَلَى الصِّرَاطِ نُوْرًا وَفِى الْجَنَّةِ رَفِيْقًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا ـ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٠٠٧ عُثْمَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২০০৭. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং [অপরকে] শিক্ষা দেয়। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : تَعَلَّمَ - যে শিক্ষা গ্রহণ করে। عَلَّمَهٗ - যে তা শিক্ষা প্রদান করে।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয় সে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। কেননা মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং এর জ্ঞান পৃথিবীর সকল গ্রন্থ ও সেগুলোর জ্ঞান হতে উঁচু ও উত্তম। অতএব, কুরআনের ইলম বা বিদ্যা অর্জনকারীও দুনিয়ার সকল হতে মর্যাদাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। আর কুরআন শিক্ষা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর বিষয়াবলি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-গবেষণা করা এবং কুরআনের বিধিবিধান, অর্থ এবং কঠিন ও জটিল বিষয়াবলি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হওয়া।

وَعَنْ ٢٠٠٨ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ اِلٰى بُطْحَانَ اَوْ الْعَقِيْقِ فَيَأْتِىْ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِىْ غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّنَا نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ اَفَلَا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ اَوْ يَقْرَأُ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلٰثٌ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ ثَلٰثٍ وَاَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০০৮. **অনুবাদ :** হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহিরে বের হয়ে আসলেন, তখন আমরা 'সুফফা'র মধ্যে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি কি এটা পছন্দ করবে যে, সে প্রতিদিন বুতহান অথবা আকীক নামক স্থানে গমন করে কোনোরূপ অন্যায় বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত বড় ঝুঁটিবিশিষ্ট দুটি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে? জবাবে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের প্রত্যেকেই এটা করাকে পছন্দ করবে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তবে মনে রেখ তোমাদের কেউ মসজিদে গমন করে আল্লাহর কিতাব হতে দুটি আয়াত কাউকে শিক্ষা দেওয়া অথবা নিজে পাঠ করা এ দুই উষ্ট্রী হতে উত্তম। তিন আয়াত তিনটি উষ্ট্রী হতে এবং চার আয়াত চারটি উষ্ট্রী হতে উত্তম। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা হতে তার জন্য উত্তম হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : يُحِبُّ-সে পছন্দ করে বা ভালোবাসে। كُوْمَاوَيْنِ- উঁচু বা ঝুঁটিবিশিষ্ট উষ্ট্রীদ্বয়। غَيْرَ اِثْمٍ-অন্যায়ভাবে তথা চুরি বা ডাকাতি ব্যতীত। يَغْدُوْ-সে গমন করে, সাধারণত এ শব্দটি ভোরে যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। بُطْحَانَ - মদিনার একটি নালার নাম। عَقِيْق - মদিনার একটি প্রসিদ্ধ বাজারের নাম। يُعَلِّمُ-শিক্ষা দেয়। اَعْدَادٌ - সংখ্যা। اِبِلٌ - উট। نَاقَةٌ - উষ্ট্রী।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ সাহাবীগণকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও পাঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন, এর একটি আয়াত পাঠ করা বা শিক্ষা দেওয়া একটি মোটাতাজা উট হতে, দুটি আয়াত দুটি উট হতে, তিনটি আয়াত তিনটি উট হতে উত্তম। এভাবে চারটি আয়াত চারটি উট হতে এবং পাঁচটি আয়াত পাঁচটি উট হতে উত্তম। মসজিদ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান হিসেবে রাসূল ﷺ মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত কুরআন যে কোনো স্থানেই শিক্ষা দেওয়া হোক বা পড়া হোক এর মর্যাদা ও ছওয়াবের কোনো তারতম্য হবে না।

اَلصُّفَّةُ **-এর পরিচয় :** মাযাহেরে হক গ্রন্থকারের মতে, اَلصُّفَّةُ হলো মসজিদে নববীর সম্মুখে অবস্থিত ছায়াযুক্ত একটি স্থান আর তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকারের মতে, মসজিদে নববীর মধ্যস্থিত ছায়াযুক্ত একটি স্থানই اَلصُّفَّةُ; এস্থানে সাধারণত স্বজনহারা, গৃহহীন ও অর্থসম্পদহীন নিঃস্ব সাহাবীগণ অবস্থান করতেন। হিজরতের পর এটাই হলো ইসলামের প্রথম তালিম-তরবিয়তের স্থান।

اَهْلُ الصُّفَّةِ-এর অধিবাসীগণ সর্বদা ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত থাকতেন এবং রাসূলের নিকট দীনের জ্ঞান অন্বেষণে নিমজ্জিত থাকতেন।

اٰيَةٌ **-কে উটের সাথে তুলনা করার কারণ :** বস্তুত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি আয়াত দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হতে উত্তম, তারপরও মহানবী ﷺ তাকে ক্ষণস্থায়ী উটের সাথে তুলনা দেওয়ার কারণ হলো–

১. সাহাবীগণকে বুঝাবার জন্য উদাহরণস্বরূপ উটের কথা উল্লেখ করেছেন।
২. অথবা, মোটাতাজা উঁচু ঝুঁটিবিশিষ্ট উট আরবদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল, তাই তিনি উটের সাথে তুলনা প্রদান করেছেন।
৩. অথবা, উট ক্ষণস্থায়ী বস্তু আর কুরআন হলো চিরস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ীর প্রতি অনীহা এবং কুরআনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্ট করার জন্য রাসূল ﷺ উটের কথা উল্লেখ করেছেন।
৪. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং দীনি কাজে ব্যস্ত থাকার মাধ্যমে দুনিয়াবি কাজকর্মেও বরকত অর্জিত হয়। যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

عَقِيْقٌ ও بُطْحَانٌ **-এর পরিচয় :** بُطْحَانَ মদিনা শরীফের নিকটবর্তী একটি নালার নাম, এমনিভাবে عَقِيْقٌও মদিনা হতে তিন/ চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। সে যুগে এ উভয় স্থানে বাজার বসত; বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীসহ উটও সেখানে ক্রয়বিক্রয় হতো।

وَعَنْ ٢٠٠٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ اَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلٰثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلٰثُ اٰيَاتٍ يَقْرَؤُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ ثَلٰثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০০৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে না যে, সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে সেখানে হৃষ্টপুষ্ট, বড়, গর্ভবতী তিনটি উষ্ট্রী পেতে? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো স্বীয় নামাজে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা তিনটি মোটাতাজা বড় উষ্ট্রী হতে অতি উত্তম। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : رَجَعَ - সে ফিরে আসে। اَهْلٌ - পরিবার-পরিজন। يَجِدُ - সে পায়। خَلِفَاتٍ - গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ। عِظَامٍ - বড়। سِمَانٍ - মোটাতাজা, হৃষ্টপুষ্ট। خَيْرٌ - তার জন্য উত্তম।

اَهْلَهٗ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, فِىْ مَحَلِّهِمْ 'তাদের নিজ নিজ আবাসস্থলে।'

عِظَامٌ হলো فِى الْكَمِّيَّةِ وَالْمَاهِيَةِ

سِمَانٌ হলো فِى الْكَيْفِيَّةِ وَالْحَالِيَةِ –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬১৬]

وَعَنْ ٢٠١٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০১০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন, আর যে কুরআন পাঠ করে এবং তাতে আটকে যায় এবং কুরআন তার উপর কষ্টদায়ক হয় তবে তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَلْمَاهِرُ - দক্ষ, অথবা বিশুদ্ধ উচ্চারণকারী, অথবা ভালো মতে, মুখস্থকারী। اَلسَّفَرَةُ - লেখকগণ। اَلْبَرَرَةُ - পবিত্র। يَتَتَعْتَعُ - আটকে যায়।

اَلْمُرَادُ بِالْمَاهِرِ بِالْقُرْاٰنِ **'কুরআন পাঠে দক্ষ' ব্যক্তি, দ্বারা উদ্দেশ্য :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পরিপূর্ণ হেফজ এবং যথাযথ উচ্চারণকারী। ইমাম তীবী (র.) বলেন, اَلْحَاذِقُ হলো যার কুরআন হেফজের মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় নেই। ইমাম জা'বারী (র.) বলেন, এটা اَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ-এর গুণ। -[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬১৬]

اَلْمُرَادُ بِالسَّفَرَةِ : এ শব্দটি বহুবচন, একবচনে سَافِرٌ ; এর দ্বারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য হতে পারে-

১. কারো কারো মতে, তারা হলেন মানুষের নিকট প্রেরিত রাসূলগণ।

২. ইমাম তীবী (র.) বলেন, তারা হলেন اَلْكَتَبَةُ বা লেখকগণ।

৩. ইমাম মীরক (র.) বলেন, এর অর্থ হলো- اَلْكَشْفُ বা প্রকাশ করা, খোলা । কেননা فَاِنَّ الْكِتَابَ بَيْنَ مَا يُكْتَبُ لِاَنَّهُ يَكْشِفُ الْحَقَائِقَ وَيَسْفُرُ عَنْهَا -এর থেকেই كِتَابٌ- কে- سَفْر (بِكَسْرِ السِّيْنِ) বলা হয়- وَيُوْضِحُهُ অতএব, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লাওহে মাহফূয বহনকারী ফেরেশতাগণ। যেমন কুরআনে এসেছে- بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ যেহেতু তারা অবতীর্ণ কিতাবকে নবীদের নিকট স্থানান্তর করে, এজন্য তাদেরকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

৪. ইবনুল মালেক (র.) বলেন- اَلْجَامِعُ بَيْنَهُمْ كَوْنُهُ مِنْ خَزَنَةِ الْوَحْىِ وَاُمَنَاءِ الْكُتُبِ

৫. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবী করীম ﷺ -এর সাথীবর্গ। কেননা তাঁরা সর্বপ্রথম কুরআনকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৬. কারো মতে, সেসব ফেরেশতাগণই উদ্দেশ্য যারা বান্দার আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন।

৭. অথবা, এখানে اَلسَّفَرَةُ শব্দটি اَلسَّفَارُ তথা اَلْاِصْلَاحُ অর্থে ব্যবহৃত, তখন উদ্দেশ্য হবে সেসব ফেরেশতাগণ যারা বান্দাকে বিপর্যয় হতে হেফাজতকারী বিষয়াবলি নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাদের অন্তরে তা ঢেলে দেন।

৮. কাজি আয়ায (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি পরকালে এমন মর্যাদা পাবে যার ফলে সে ফেরেশতাদের সাথী হবে। -[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬১৭]

قَوْلُهُ لَهُ اَجْرَانِ **-এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি ঠেকে ঠেকে কুরআন পাঠ করে তার জন্য দুটি ছওয়াব- একটি হলো তার পড়ার জন্য, দ্বিতীয়টি হলো কষ্ট স্বীকার করার জন্য। এটি কুরআন পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, সে কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি হতেও বেশি ছওয়াবের অধিকারী হবে; বরং কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি তার থেকে অধিক ছওয়াব পাবে। সে কাতেব ফেরেশতাগণ, অথবা নবী-রাসূলগণ, কিংবা নিকটবর্তী সাহাবীগণের সাথী হবে।

-[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬১৮]

وَعَنْ ٢٠١١ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا عَلٰى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০১১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন পড়ে। অপর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন দান করেছেন, আর সে তা হতে রাতদিন দান করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اٰنَاءَ এটি اِنًى-এর বহুবচন। অর্থ– সময়।

قَوْلُهُ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন তেলাওয়াত করা, হেফজ করা, অথবা এর বিধিবিধানের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করা, অথবা এর আদেশ ও নিষেধসমূহ যথাযথভাবে পালন করা, অথবা কুরআনের দ্বারা বেশি বেশি নামাজ পড়া এবং তার গুণে গুণান্বিত হওয়া। –[মেরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬১৮]

اَلْحَسَدُ **শব্দের বিশ্লেষণ :** حَسَدْ বা হিংসা দুভাগে বিভক্ত– ১. حَقِيْقِىْ ২. مَجَازِىْ

১. حَقِيْقِىْ বলা হয়– تَمَنِّىْ زَوَالُ النِّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا – অন্যের ভালো বিষয়টি দূরীভূত হওয়ার কামনা করা, এটা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

২. مَجَازِىْ : একে غِبْطَه বলা হয়। এর অর্থ হলো– تَمَنِّىْ مِثْلِ النِّعْمَةِ الَّتِىْ عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ تَمَنِّىْ زَوَالِ عَنْ صَاحِبِهَا 'অন্যের ভালো বস্তুটি দূরীভূত হওয়া কামনা না করে নিজের জন্য তা আকাঙ্ক্ষা করা।' এটা যদি পার্থিব বিষয়াবলির ক্ষেত্রে হয় তবে তা মুবাহ বা বৈধ। আর যদি তা পরকালীন বিষয়াবলির ক্ষেত্রে হয় তবে তা মোস্তাহাব। যেমন– কারো মসজিদ নির্মাণ করা দেখে নিজে তা নির্মাণের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬১৮, মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১০]

وَعَنْ ٢٠١٢ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهٖ كَالْاُتْرُجَّةِ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهٖ كَالتَّمْرَةِ -

২০১২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে মু'মিনের উপমা– যে কুরআন পড়ে, যেন তুরঞ্জ ফল, যার গন্ধ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম; আর সে মু'মিনের উপমা– যে কুরআন পড়ে না, যেন খেজুর যার কোনো গন্ধ নেই, তবে এর স্বাদ উত্তম। আর সেই মুনাফিকের উপমা– যে কুরআন পড়ে না, যেন তিতফল, যার কোনো গন্ধ নেই অথচ এর স্বাদও কটু এবং সেই মুনাফিকের উপমা– যে কুরআন পড়ে, যেন সেই ফুল, যার গন্ধ আছে অথচ এর স্বাদ কটু।

–[বুখারী ও মুসলিম]

অপর বর্ণনায় আছে, সে মু'মিন– যে কুরআন পড়ে এবং একে কার্যকরী করে, সে তুরঞ্জ ফলের ন্যায়, আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না; কিন্তু একে কার্যকরী করে সে খেজুর ফলের ন্যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীসে যে উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে তা মূলত বুদ্ধিভিত্তিক, এটা অনুভবের বিষয়। বস্তুত মহান আল্লাহর কালামের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুটি প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। অত মানুষও এ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। এদের মধ্যে কারো জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ অংশ আর তারা হলেন প্রকৃত পাঠকারী মু'মিন। আরেকদলের জন্য কোনো অংশ নেই, তারা হলো প্রকৃত মুনাফিক। আরেক দলের জন্য রয়েছে বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া. আর তারা হলো লোক দেখানো পাঠকারী। অথবা এর বিপরীত। -[মিরকাত]

أُتْرُجَّةَ -এর পরিচয় : (بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُوْنِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ) وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىْ بِنُوْنٍ سَاكِنَةٍ بَيْنَ الرَّاءِ وَالْجِيْمِ الْمُخَفَّفَةِ.

কামূস গ্রন্থে আছে- اَلْاُتْرُجُّ وَالْاُتْرُجَّةُ وَالتُّرُنْجُ وَالتُّرُنْجَةُ এটি একটি প্রসিদ্ধ ফল, দেখতে এটি অত্যধিক মনোরম বিধায় আরবদের নিকট অতিপ্রিয়। এটি আমাদের নিকট লেবু হিসেবে পরিচিত। এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন- قِيْلَ لَا يَدْخُلُ الْجِنُّ بَيْتًا فِيْهِ اُتْرُجٌ -[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٠١٣ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০১৩. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- এ কিতাব দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো জাতিকে উন্নত করেন এবং অন্যদেরকে অবনত করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন, তার মর্যাদা প্রদান এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করার কারণে কোনো কোনো সম্প্রদায়কে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা প্রদান করেছেন-

بِاَنْ يُحْيِيَهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً فِى الدُّنْيَا وَيَجْعَلَهُمْ مِنَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فِى الْعُقْبٰى.

আর এর বিপরীত দলকে সর্বনিম্ন করেছেন। ইমাম তীবী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং যথাযথভাবে আমল করে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করেন। আর যে আমলবিহীন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে পড়ে আল্লাহ তাকে নিচু করেন। -[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٠١٤ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطَةٌ عِنْدَهُ اِذَا جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتْ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاَشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهُ وَلَمَّا اَخَّرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى

২০১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, সাহাবী উসাইদ ইবনে হুযাইর এক রাতে সূরা বাকারা পড়ছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়া তাঁর নিকটে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি থেমে গেলেন, ঘোড়া শান্ত হলো। আবার তিনি পড়তে লাগলেন, আবার ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি চুপ করলেন, ফলে ঘোড়া শান্ত হলো। পুনরায় তিনি পড়া শুরু করলেন, পুনরায় ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। এবার তিনি ক্ষান্ত দিলেন। কেননা তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া তাঁর নিকটে শোয়া ছিল। তিনি আশঙ্কা করলেন পাছে তার কোনো বিপদ হয়। যখন তিনি তাকে দূরে সরিয়ে আকাশের দিকে মাথা

السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اِقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَاَشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ تَطَأَ يَحْيٰى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانْصَرَفْتُ اِلَيْهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِىْ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجْتُ حَتّٰى لَا اَرَاهَا قَالَ وَتَدْرِىْ مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَاَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا لَا تَتَوَارٰى مِنْهُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِىْ وَفِىْ مُسْلِمٍ عَرَجَتْ فِى الْجَوِّ بَدَلَ فَخَرَجْتُ عَلٰى صِيْغَةِ الْمُتَكَلِّمِ .

উঠালেন, তখন দেখলেন– সামিয়ানার মতো, তাতে বাতিসমূহের মতো রয়েছে। যখন তিনি ভোরে উঠলেন, নবী করীম ﷺ -কে এ খবর জানালেন। তিনি শুনে বললেন, তুমি পড়তে থাকলে না কেন ইবনে হুযাইর! পড়তে থাকলে না কেন ইবনে হুযাইর! ইবনে হুযাইর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আশঙ্কা করলাম পাছে ঘোড়া ইয়াহইয়াকে না মাড়ায়, আর সে ছিল ঘোড়ার নিকটে। অতএব, আমি ক্ষান্ত দিয়ে তার নিকটে গেলাম এবং আকাশের দিকে মাথা উঠালাম, দেখি– সামিয়ানার মতো, তাতে বাতিসমূহের মতো রয়েছে। অতঃপর আমি সেখান থেকে বের হলাম আর দেখতে দেখতে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা কি ছিল জান? উসাইদ বললেন, জি-না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা ছিল ফেরেশতাদের দল, তোমার স্বর শুনে তাঁরা এসেছিলেন। যদি তুমি পড়তে থাকতে তবে তাঁরা ভোর পর্যন্ত থাকতেন, আর মানুষ তাঁদের দেখতে পেত, তাঁরা মানুষ হতে অদৃশ্য হতেন না। –[বুখারী ও মুসলিম] তবে পাঠ বুখারীর। "আমি বের হলাম"-এর স্থলে মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, "সামিয়ানা শূন্যে উঠে গেল"।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ অত্র বাক্যটি তাকিদের জন্য দুবার বলেছেন। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, হে ইবনে হুযাইর! তুমি উক্ত সূরা বাকারাটি সর্বদা পড়তে থাকবে। কেননা অত্র সূরাটি আশ্চর্য ধরনের ঘটনার কারণ। ভবিষ্যতে যদি কখনো এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে তবে তুমি কখনো পড়া পরিত্যাগ করবে না; বরং পড়তে থাকবে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা অতীতের পড়ার প্রতি উৎসহ প্রধান ও অধিক পড়ার কামনা করা হয়েছিল। কেননা উক্ত আশ্চর্যজনক ঘটনাটি যেন রাসূল ﷺ -এর সম্মুখে ভাসছে, ফলে তিনি উক্ত কথাটি বলেছেন।

–[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬২২, মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ১২]

قَوْلُهُ مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ **-এর ব্যাখ্যা :** ফেরেশতাগণ কুরআন শুনার জন্য এমন ভিড় করছিল যে, তাদেরকে মনে হয়েছে একটা ঝুলন্ত সামিয়ানা। আর তাতে যে আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছিল তা ছিল মূলত ফেরেশতাদের চেহারাসমূহ। যেগুলো আলোর মতো ঝলমল করছিল। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, ১২ পৃষ্ঠা]

وَعَنْ ٢٠١٥ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَاِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَتَدْنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০১৫. অনুবাদ : হযরত বারা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল আর তার পার্শ্বে তার ঘোড়া দুটি রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এ সময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে ফেলল এবং তার নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন ভোরে উঠল, তখন নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে উক্ত ঘটনার উল্লেখ করল। তিনি বললেন, এটা ছিল রহমত- কুরআনের কারণে নেমে এসেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : حِصَانٌ - ঘোড়া। شَطَنَيْنِ - মজবুত ও দীর্ঘ রশি। يَنْفِرُ - পলায়ন করতে উদ্যত হলো, লাফাতে লাগল, ছুটাছুটি করছিল। اَلسَّكِيْنَةُ - প্রশান্তি, রহমত। تَدْنُوْ - নিকটবর্তী হলো।

اَلسَّكِيْنَةُ-এর অর্থ : اَلسَّكِيْنَةُ শব্দের অর্থ হলো- প্রশান্তি, অন্তরের স্থিরতা যার ফলে ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়। ইমাম তীবী (র.) বলেন, এ রকম প্রকাশ্য নিদর্শনাবলির মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তির অন্তরের প্রশান্তি বেড়ে যায়।

- কারো মতে, سَكِيْنَةٌ হলো اَلرَّحْمَةُ 'রহমত'।
- কারো মতে, اَلْوَقَارُ বা সম্মান।
- কারো মতে, রহমতের ফেরেশতা।
- হাফেজ ইবনে হাজার (র.)-এর মতে, ফেরেশতাকুল। -[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬২৩]

وَعَنْ ٢٠١٦ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى (رض) قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ اُجِبْهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২০১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ ইবনে মু'আল্লা (রা.) বলেন, আমি মসজিদে নামাজ পড়ছিলাম, এমন সময় নবী করীম ﷺ আমাকে ডাকলেন, আমি কোনো জবাব দিলাম না যে পর্যন্ত না নামাজ শেষ করলাম। অতঃপর তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামাজ পড়ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেননি যে, "আল্লাহ এবং রাসূলের জবাব দাও, যখন তাঁরা ডাকেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি মসজিদ হতে বের হবার পূর্বে কুরআনের শ্রেষ্ঠতর সূরা তোমাকে শিখাব না। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তৎপর যখন আমরা বের হতে ইচ্ছা করলাম, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি না বলেছিলেন, আমি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতর সূরা শিখাব? তখন তিনি বললেন, তা হলো সূরা "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" এটাই হলো সে সাতটি পুনরাবৃত্ত আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اِسْتَجِيْبُوْا - তোমরা সাড়া দাও। اَعْظَمُ - শ্রেষ্ঠ। لَاُعَلِّمَنَّكَ - অবশ্যই আমি তোমাকে শিখাব।

قَوْلُهُ اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ **-এর ব্যাখ্যা :** নামাজরত অবস্থায় রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

১. কিছু সংখ্যকের মতে, নামাজরত অবস্থায় রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়াতে নামাজ ভেঙ্গে যাবে না। কেননা নামাজই তো আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া।

২. কারো মতে, রাসূল ﷺ -এর আহ্বান এমন বিষয়ের ছিল যা দেরি করার সম্ভাবনা রাখে না। কাজেই এমতাবস্থায় মুসল্লির নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ। –[তা'লীক, বায়যাভী]

قَوْلُهُ اَعْظَمُ سُوْرَةٍ **-এর ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ সূরা ফাতেহাকে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সূরা বলেছেন। কেননা অত্র সূরায় পবিত্র কুরআনের মূল নির্যাস তথা মহান আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা রয়েছে। ইবাদতের ব্যাপারে আদেশ-নিষেধ, ভয় প্রদর্শন ও প্রতিশ্রুতি, আল্লাহর আধিপত্য, একমাত্র তাঁরই ইবাদত, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগা ব্যক্তিদের বর্ণনা ইত্যাদি ব্যাপক বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। ফলে এটি পরিমাণে ছোট হলেও অবস্থানের দিক থেকে বড়।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র সূরার বিশেষ মর্যাদা, একক বৈশিষ্ট্য, স্বল্প আয়াতে ব্যাপক অর্থ ও উপকারিতা থাকার কারণে একে মর্যাদাসম্পন্ন সূরা বলা হয়েছে। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬২৫]

কিছু সংখ্যক আরীফ বলেন, পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের মূল নির্যাস পবিত্র কুরআন আর কুরআনের মূল কথা সূরা ফাতেহায় আর ফাতেহার মূল নির্যাস বিসমিল্লাহতে আর বিসমিল্লাহর নির্যাস "بَاء" হরফের মধ্যে রয়েছে। কেননা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সাথে বান্দার মিলন, আর অত্র "بَاء" টি হলো اِلْصَاقٌ -এর, ফলে এটা বান্দাকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেয়।

পুনরায় এসব কিছুর মূল "بَاءٌ" -এর نُقْطَةٌ- তে নিহিত রয়েছে সম্ভবত এটা একত্ববাদের রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে। –[ইমাম রাযী, তা'লীক, বায়যাভী]

قَوْلُهُ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ -এর ব্যাখ্যা : এখানে اَلِفْ لَامْ টি عَهْدِيْ ; কেননা পবিত্র কুরআনে এসেছে– وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ তবে এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ–

১. এতে সর্বসম্মতিক্রমে ৭টি আয়াত রয়েছে। ফলে একে سَبْعِ مَثَانِيْ বলা হয়েছে।

২. কারো মতে, এতে সাতটি اٰدَابْ রয়েছে।

৩. কেউ বলেন, অত্র সূরায়– ث , ج , خ , ز , ش , ظ এবং ف এ সাতটি অক্ষর নেই, তবে এ মতটিতে কিছুটা কথা রয়েছে।

৪. অথবা, অত্র সূরা নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পড়া হয়, বিধায় এক مَثَانِيْ বলা হয়।

৫. অথবা, অত্র সূরা মক্কায় নাজিল হবার পর পুনঃ মদিনায় নাজিল হয়েছে তার অধিক মর্যাদার কারণে।

৬. কারো মতে, এ রকম প্রশংসা সংবলিত সূরা এর পূর্বে নাজিল হয়নি ইত্যাদি। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬২৫]

২০১৭ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ يَقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থানে পরিণত করো না। [তাতে কুরআন পড়িও]। কেননা শয়তান সে ঘর হতে পলায়ন করে যাতে সূরা বাকারা পড়া হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : مَقَابِرُ - কবর, সমাধি। يَنْفِرُ - পলায়ন করে।

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ **-এর ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ ঘরসমূহকে কবর বানাতে নিষেধ করেছেন, এর অর্থ হলো– কবর যেমন আল্লাহর জিকির, নামাজ, ইবাদত-বন্দেগি, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি হতে মুক্ত নির্জন স্থান ঘরবাড়িসমূহও এসব

ইবাদত-বন্দেগি হতে মুক্ত রাখবে না। কেননা এতে নিজ নিজ গৃহসমূহ কবরের মতো ইবাদতশূন্য হয়ে যাবে; বরং সর্বদা তাতে নামাজ, আল্লাহর জিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আবাদ রাখবে এতে ঘরে অবস্থানকারী সকলের উপকার অর্জিত হবে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৪]

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ-কে নির্দিষ্টকরণের কারণ : মূলত ঘরবাড়িতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করাই মূল উদ্দেশ্য, তবে এখানে অত্র হাদীসে সূরা বাকারাকে নির্দিষ্টকরণের কারণ হলো–

১. অত্র সূরা পবিত্র কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা। এতে আল্লাহর নামের আধিক্য এবং অনেক বিধিবিধান রয়েছে।

২. কারো মতে, এতে একশত আদেশ, একশত নিষেধ, একশত হুকুম এবং একশত খবর রয়েছে। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬২৬]

وَعَنْ ٢٠١٨ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَايَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন পড়বে। কেননা এটা কিয়ামতের দিন এর পাঠকদের জন্য সুপরিশকারীরূপে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল আলোদ্বয়– সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়বে। কেননা কিয়ামতের দিন এতে দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি সামিয়ানা অথবা দুটি পক্ষ প্রসারিত পক্ষী-ঝাঁকরূপে আসবে এবং তাদের পাঠকদের জন্য আল্লাহর নিকট ঝগড়া করবে। বিশেষ করে তোমরা সূরা বাকারা পড়বে। কারণ এর অর্জন হচ্ছে বরকত এবং বর্জন হচ্ছে আক্ষেপ। অলস ব্যক্তিবর্গ এটা পড়তে পারবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : شَفِيْعًا - সুপারিশকারী। اَلزَّهْرَاوَيْنِ - উজ্জ্বল আলোদ্বয়। غَمَامَتَانِ - খণ্ড মেঘদ্বয় فِرْقَانِ - দুটি দল। صَوَافَّ - কাতারসমূহ। تُحَاجَّانِ - তারা উভয়ে ঝগড়া করে। حَسْرَةٌ - লজ্জা। اَلْبَطَلَةُ - অলস, কুঁড়ে।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান অন্যান্য সূরার তুলনায় চন্দ্র স্বরূপ আর অন্যান্যগুলো তারকা সদৃশ তাই এদের মর্যাদা অনেক বেশি। কিয়ামত দিবসে অত্র সূরাদ্বয় তাদের পাঠকারীদের মেঘ সদৃশ হয়ে কঠোর সূর্যতাপ হতে রক্ষা করবে। অথবা অন্য কোনো কিছুর আকৃতি ধারণ করে অতি নিকটে অবস্থান করে ছায়া দেবে এবং তাতে আলোও থাকবে কিংবা পাখি সদৃশ দুটি দল হবে যারা তাকে ছায়া দান করবে এবং আল্লাহর নিকট তার জন্য সুপারিশ করবে। –[মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ১৫]

تَوْضِيْحُ قَوْلِهٖ اَوْ [হাদীসে উল্লিখিত اَوْ-এর বিশ্লেষণ] : ইমাম তীবী (র.) বলেন, এখানে اَوْ টি تَنْوِيْع বা প্রকার বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ–

১. যে ব্যক্তি এ উভয় সূরা পড়ে ঠিকই; কিন্তু এর মর্ম বুঝে না, তার জন্য মেঘ হয়ে ছায়া দেবে।

২. দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি এগুলো মর্ম বুঝে পড়ে তার জন্য রাজার মতো অতি নিকটবর্তী ছায়া হয়ে আসবে এবং তাতে আলোও থাকবে।

৩. তৃতীয়ত যে এ উভয়টির সাথে পড়বে এবং অপরকে শিক্ষা দেবে তবে তার জন্য সূরাদ্বয় পাখি সদৃশ কাতারবন্দী হয়ে ছায়া দেবে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার মুক্তির জন্য ঝগড়া করবে। –[মেরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬২৭]

২০১৯. وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُؤْتٰى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَهْلَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০১৯. **অনুবাদ :** হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন কুরআন এবং তার পাঠকদের উপস্থিত করা হবে যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করত। তাদের আগে থাকবে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান, যেন তারা দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি কালো ছায়া, যার মধ্যস্থলে দীপ্তি বা আলো থাকবে, অথবা ডানা প্রসারিত পাখির ঝাঁক। তারা আল্লাহর দরবারে তাদের পাঠকদের মুক্তির জন্য অনুযোগ বা ঝগড়া করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : تَقْدُمُ - সম্মুখ। غَمَامَتَانِ - দুটি মেঘখণ্ড। سَوْدَاوَانِ - কালো। شَرْقٌ - আলো। فِرْقَانِ - দুটি দল।

اَلْمُرَادُ بِاَهْلِهٖ **[কুরআনের আহল দ্বারা উদ্দেশ্য] :** অত্র হাদীসে কুরআনের আহলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, اَلَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ 'যারা কুরআনের প্রতি আমল করে।' এর দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে কিন্তু তার প্রতি আমল করে না, সে কুরআনের আহল হতে পারে না এবং উক্ত ব্যক্তির জন্য কুরআন কোনো সুপরিশ করবে না; বরং তার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। −[মিরকাত ও মাযাহেরে হক, ৪র্থ ও ৩য় খণ্ড]

قَوْلُهٗ تَقْدُمُهٗ**-এর ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের ছওয়াব পূর্ণ কুরআনের পূর্বে দেওয়া হবে। কারো মতে, কিয়ামতের দিন পুরো কুরআনকে বাহ্যিক আকৃতি প্রদান করা হবে যাতে সমস্ত মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে, যেমন অন্যান্য আমলগুলোকে আকৃতি দেওয়া হবে। −[মিরকাত ও মাযাহেরে হক]

২০২০. وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِيْ اَيُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِيْ اَيُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَعَكَ اَعْظَمُ قُلْتُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০২০. **অনুবাদ :** হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আবুল মুনযির, বলতে পার কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি বলতে পার কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? এবার আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যূম।" উবাই বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সিনায় হাত মেরে বললেন, তোমার জন্য জ্ঞান মোবারাক হোক হে আবুল মুনযির! − [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَعْظَمُ-বড়; এখানে ছওয়াবের দিক থেকে বড় বুঝানো হয়েছে। صَدْرٌ - বক্ষ। لِيَهْنِكَ - কোনো বর্ণনায় لِيَهْنِئْكَ রয়েছে, অর্থ− মঙ্গল, কল্যাণ। كُلُّ اَمْرٍ اَتَاكَ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ فَهُوَ هَنِيْئٌ

سَبَبُ عَظِيْمِ اٰيَةِ الْكُرْسِيِّ : আয়াতুল কুরসী মহান আল্লাহর একত্ববাদ, সম্মান, মর্যাদা, সুন্দর নামসমূহ এবং অতিউত্তম গুণাবলি সংবলিত বিধায় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও তাতে মহান আল্লাহর জিকিরসমূহ রয়েছে যা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য সহায়ক। −[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬২৯]

وَعَنْ ٢٠٢١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكٰوةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ وَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ وَلِىْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكٰى حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ اَمَا اِنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهٗ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهٗ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِىْ فَاِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ لَا اَعُوْدُ فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكٰى حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ فَقَالَ اَمَا اِنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهٗ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهٗ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ

২০২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ফিতরার মাল পাহারায় নিযুক্ত করলেন। এ সময় আমার নিকট এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভরে খাদ্যশস্য নিতে লাগল আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, তোমাকে আমি রাসূলাল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আমার বহু পোষ্য রয়েছে এবং আমার অভাবও নিদারুণ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম যখন ভোরে গেলাম, নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, আবূ হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর কি হলো? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল ; তাই আমি তার প্রতি দয়া করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুন, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। [হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,] আমি নিশ্চিত রকমে বুঝলাম যে, সে আবার আসবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বলার কারণে– "সে আবার আসবে।" অতএব আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্যশস্য নিতে লাগল। এ সময় আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, এবারও আমাকে ছাড়, আমি বড় অভাবগ্রস্ত এবং আমার বহু পোষ্য রয়েছে; আমি আর আসব না। [হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,] এবারও আমি তার প্রতি দয়া করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন আমি ভোরে উঠলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আবূ হুরায়রা! তোমার বন্দীর কি হলো? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল, তাই আমি তার প্রতি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুন, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে, সে আবারও আসবে। [হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,] আমি বুঝতে পারলাম যে, সে আবার আসবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "সে আবার আসবে।" সুতরাং আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে

اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلٰثِ مَرَّاتٍ اِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ قُلْتُ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِىْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِىَ اللّٰهُ بِهَا قَالَ اَمَا اِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلٰثِ لَيَالٍ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

যাব, এটা তিনবারের শেষবার, তুমি ওয়াদা করেছিলে তুমি আর আসবে না অথচ তুমি এসেছ। সে বলল, এবারও আমাকে ছাড়, আমি তোমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখাব, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তা হলো, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে তখন 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে : "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূম"– আয়াতের শেষ পর্যন্ত, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং শয়তান তোমার নিকট আসতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তুমি ভোরে উঠ। এবারও আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোরে উঠলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার বন্দীর কি হলো? আমি বললাম, [হুজুর!] সে বলল, সে আমাকে এমন কয়টি কথা শিখাবে, যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুন, সে এবার তোমাকে সত্য বলেছে অথচ সে ডাহা মিথ্যুক। তুমি কি জান– তুমি তিন রাত যাবৎ কার সাথে কথা বলছ? আমি বললাম, জি না। তিনি বললেন, সে ছিল একটা শয়তান। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : يَحْثُوْ - উভয় অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করেছে। لَاَرْفَعَنَّكَ - অবশ্যই আমি তোমাকে নিয়ে যাব। مُحْتَاجٌ - দরিদ্র। خَلَّيْتُ - আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। اَلْبَارِحَةَ - গত রাত। اَسِيْرٌ - বন্দী। رَصَدْتُهُ - আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। شَكَا - অভিযোগ করল। عِيَالاً - অনেক পোষ্য। تَزْعُمُ - তুমি ধারণা করছ বা মনে করছ। اَوَيْتَ - তুমি ইচ্ছা করবে। تُخَاطِبُ - তুমি কথা বলছ। دَعْنِىْ - আমাকে ছেড়ে দাও।

حَلُّ التَّعَارُضِ **দ্বন্দ্বের সমাধান :** রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সুলাইমান (আ.)-এর ক্ষমতার সাথে সদৃশ হয়ে যাবে বিধায় শয়তানকে বাঁধেননি। অথচ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) শয়তানকে বেঁধে ফেললেন এতে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সাথে مُشَابَهَةٌ হয়ে যায়। এর সমাধান নিম্নরূপ–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ যে শয়তানকে বাঁধার ইচ্ছা করেছিলেন সে ছিল শয়তানদের সর্দার। তাকে আটকানোর অর্থ হলো সকল শয়তানের উপর ক্ষমতাবান হওয়া যা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ক্ষমতার সাথে মিলে যায়; আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কোনো বিশেষ শয়তানকে বেঁধেছিলেন, আর এতে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্য হয় না।

২. অথবা, রাসূল ﷺ -এর নিকট শয়তান তার নিজস্ব আকৃতিতে এসেছে, যে রকম হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিকট আসত, আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট মানুষের আকৃতিতে এসেছে, ফলে তাকে বাঁধার কারণে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সাথে সামঞ্জস্য আবশ্যক হয় না। –[তা'লীক– খ. ৩, পৃ. ১১]

উল্লেখ্য যে, ইবনুল মালিক (র.) বলেন, অত্র হাদীস এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যে ব্যক্তি তার উপদেশ অনুযায়ী আমল করে না তার থেকেও জ্ঞান অর্জন করা জায়েজ। তবে জ্ঞান অর্জনকারীর অর্জিত বিষয়টি যে উত্তম বা ভালো তা জানা থাকতে হবে, আর অর্জিত বিষয়টি ভালো না মন্দ তা জানা না থাকলে এরূপ ব্যক্তি হতে জ্ঞান অর্জন করা জায়েজ হবে না। এ অবস্থায়ও তার আমানতদারি ও দীনদারি জানা থাকলে জায়েজ হবে। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৩৩]

وَعَنْ ٢٠٢٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بَيْنَمَا جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا اِلَّا اَعْطَيْتَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০২২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এক সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হতে একটি দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপর দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন, আসমানের এই যে দরজাটি আজ খোলা হলো এটা আজকের পূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। [রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,] এটা হতে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এই যে ফেরেশতা জমিনে নামলেন, ইনি আজকের এইদিন ছাড়া ইতঃপূর্বে আর কখনো জমিনে আসেননি। [রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,] তিনি সালাম করলেন, অতঃপর আমাকে বললেন, দুটি নূরের [জ্যোতির] সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেওয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি– সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনি এদের যে কোনো বাক্যই পড়ুন না কেন, নিশ্চয় আপনাকে তা দেওয়া হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : نَقِيْضًا - কঠিন আওয়াজ। رَفَعَ - তিনি উঁচু করলেন। قَطُّ - কখনো। اَبْشِرْ - আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। بِنُوْرَيْنِ - দুটি নূর, জ্যোতিদ্বয়।

بِنُوْرَيْنِ**-এর বিশ্লেষণ :** সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশকে দুটি নূর বলার কারণ নিম্নরূপ–

১. এ উভয়টি তার পাঠকারীর জন্য নূর হবে তথা কিয়ামতের ময়দানে এগুলো নূর হয়ে তার সম্মুখে চলবে।

২. অথবা, এ উভয়টি পাঠককে সরল-সঠিক পথের সন্ধান দেবে, যদি এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। –[মিরকাত- খ. ৪. পৃ. ৬৩৪]

اِخْتِلَافٌ فِيْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ **সূরা বাকারার শেষাংশের ব্যাপারে মতানৈক্য :** কিছু সংখ্যকের মতে সূরা বাকারার শেষাংশের শুরু হলো اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হতে।

আর হযরত কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তা হলো لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ الخ থেকে। এ মতটিই সর্বজন স্বীকৃত।
–[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৩৪]

وَعَنْ ٢٠٢٣ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০২৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত– যে তা রাতে পড়বে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَفَتَاهُ**-এর ব্যাখ্যা :** 'সূরা বাকারার শেষ আয়াতদ্বয় রাতের বেলায় পাঠকারীর জন্য যথেষ্ট হবে'–এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. অত্র আয়াতদ্বয় পাঠ করার কারণে জিন ও ইনসানের ক্ষতি হতে সে রক্ষা পায়।

২. অথবা, রাতের ইবাদতের জন্য যথেষ্ট হয়।

৩. অথবা, রাত জাগরণ করে সব রকমের ইবাদত-বন্দেগির স্থলাভিষিক্ত হয়।
৪. রাতের বেলায় কুরআন পড়ার স্থলাভিষিক্ত হয়।
৫. হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, ঈমানকে নতুন করার জন্য যথেষ্ট হয়। -[মিরকাত- খ. ৪, পৃ. ৬৩৫]

وَعَنْ ٢٠٢٤ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَفِظَ عَشَرَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عَصَمَ مِنَ الدَّجَّالِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০২৪. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদ রাখা হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَصَمَ مِنَ الدَّجَّالِ **-এর ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের খপ্পর হতে রক্ষা পাবে। অর্থাৎ তার অমঙ্গল ও ফিতনা হতে মুক্ত থাকবে। বস্তুত দাজ্জালের ফিতনা হলো সবচেয়ে বড় সংকটময়। সে এমন আশ্চর্যজনক কাজ করবে যাতে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঈমান হারিয়ে ফেলবে। এমনকি প্রত্যেক নবীই তার ফিতনা হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রর্থনা করেছেন। এজন্য আমাদেরও তার ফিতনা হতে বাঁচার জন্য সূরা কাহফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ করা সহ এ লক্ষ্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে।

حَلُّ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ নিরসন :** অত্র হাদীসে এসেছে ১০ আয়াত মুখস্থ করার কথা আর তিরমিযীর এক হাদীসে এসেছে তিন আয়াত মুখস্থ করার কথা। ফলে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ-

১. কারো মতে, ১০ আয়াতের হাদীস পরের আর তিন আয়াতের হাদীস পূর্বের, অতএব পরের হাদীসই আমলযোগ্য যার ফলে উভয়ের উপর আমল হয়ে যাবে।
২. কেউ বলেন, তিন আয়াতের হাদীস পরের কাজেই তিন আয়াত পড়ার ফলে দাজ্জালের ফেতনা হতে মুক্তি পাওয়া যাবে; এজন্য ১০ আয়াতের প্রয়োজন নেই।
৩. কারো মতে, ১০ আয়াতের হাদীস হলো মুখস্থকরণ সংক্রান্ত আর তিন আয়াতের হাদীস হলো পড়া সংক্রান্ত। অতএব যে দশ আয়াত মুখস্থ করে এবং তিন আয়াত পড়ে সে দাজ্জালের খপ্পর হতে মুক্ত থাকবে।
৪. কেউ বলেন, যে ১০ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের সাক্ষাতে তার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে, আর যে তিন আয়াত পড়বে সে তার সাক্ষাৎবিহীন অবস্থায় মুক্ত থাকবে। -[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৩৬]

وَعَنْهُ ٢٠٢٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ فِىْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ)

২০২৫. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? সাহাবীগণ উত্তর করলেন, হুযূর! কি করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বলেন, সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। -[মুসলিম] কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) হাদীসটি আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ **-এর বিশ্লেষণ :** নবী করীম ﷺ সূরা اِخْلَاصْ-কে ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ তথা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলার কারণ নিম্নরূপ-

১. অর্থের দিক থেকে এটি ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ ; কেননা পরিপূর্ণ কুরআনের মূল বক্তব্য হলো তিনটি। সেগুলো হলো اَخْبَارْ - اَحْكَامْ ও تَوْحِيْد আর সূরা اِخْلَاصْ টি তৃতীয় প্রকার তথা تَوْحِيْد -কে শামিল করে। তাই এটি ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ ; এ প্রসঙ্গে হাদীসেও এসেছে–

مَا اَخْرَجَهُ اَبُوْ عُبَيْدٍ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ جَزَأَ النَّبِيُّ (ص) اَلْقُرْاٰنَ ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ جُزْءًا مِنْ اَجْزَاءِ الْقُرْاٰنِ ـ

২. অথবা, ছওয়াবের দিক থেকে তথা যে ব্যক্তি সূরা اِخْلَاصْ পাঠ করে তাকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের ছওয়াব প্রদান করা হয়। যেমন হাদীসে এসেছে– مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَكَاَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ

৩. অথবা, পবিত্র কুরআন হচ্ছে– خَبَرْ অথবা اِنْشَاءْ - আর ইনশা হলো اَمْرْ ـ نَهِىْ ـ اِبَاحَتْ এবং خَبَرْ হলো خَبَرٌ عَنِ الْخَالِقِ এবং خَبَرٌ عَنِ الْمَخْلُوْقِ আর সূরা اِخْلَاصْ -এর মধ্যে خَالِقْ -এর ذَاتْ তথা تَوْحِيْد সাব্যস্ত এবং خَالِقْ-এর জন্য যা একান্ত আবশ্যক তথা اَلصَّمَدُ সাব্যস্ত এবং সমকক্ষতা, পিতা, পুত্র হতে মুক্ততা রয়েছে। এ হিসেবে এটা ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ

৪. অথবা, সূরা اِخْلَاصْ টি تَوْحِيْد বা একত্ববাদকে পূর্ণভাবে বুঝায় কাজেই যে ব্যক্তি এসব কিছুর উপর আমল করবে, সে যেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠকারীর ন্যায় হলো।

৫. আল্লামা যারকানী (র.) বলেন, এ রকম বিষয়ে চুপ থাকাই উত্তম। ইমাম সুয়ূতী, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম ইসহাক (র.)-এর অভিমত হলো, এ হাদীসটি مُتَشَابِهْ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। তাদের থেকে এ কথাটিও বর্ণিত আছে অত্র সূরাটি শিক্ষা করার জন্যই এরূপ কথা বলা হয়েছে। আর এ সূরাটি তিনবার পাঠ করাও পুরো কুরআন পড়ার সমকক্ষ নয়। –[ফাতহুল মুলহিম, তা'লীকুস সবীহ]

তবে হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, অত্র সূরাটি সেই ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ -এরই সমকক্ষ যেখানে سُوْرَةُ اِخْلَاصْ নেই।

وَعَنْ ٢٠٢٦ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَىِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সাথীদের নামাজ পড়াত এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দ্বারা [কেরাত] শেষ করত। যখন তারা মদিনায় ফিরে আসল, তখন নবী করীম ﷺ -এর নিকট এর উল্লেখ করলে তিনি বললেন– তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি কারণে এরূপ করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, কারণ এতে আল্লাহর গুণাবলি রয়েছে, আর আমি আল্লাহর গুণাবলি পাঠ করতে ভালোবাসি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে অবহিত কর যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : يَقْرَأُ - পড়তেন তথা ইমামতি করতেন। سَرِيَّةٌ - ছোট সেনাদল। رَجَعُوْا - ফিরে আসল। يَخْتِمُ - তিনি শেষ করতেন। يَصْنَعُ - সে করে।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ -এর 'আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন' এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়–

১. ইমাম মাজেরী (র.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন' এর অর্থ হলো– তাদেরকে ছওয়াব দান এবং নিয়ামত তথা অনুগ্রহ প্রদান করার ইচ্ছা করা।

২. কারো মতে, শুধু ছওয়াব ও নিয়ামত দান। ثَوَابْ হলো ذَاتْ -এর صِفَةْ আর تَنْعِيْم হলো فِعْل -এর صِفَةْ -

৩. ইমাম তীবী (র.) বলেন, مُحَبَّةُ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো– ثَوَابْ প্রদানের ইচ্ছা অথবা ছওয়াব দান করা। কেননা আল্লাহর জাতের পক্ষে কাউকে ভালোবাসা অসম্ভব। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৩৮]

وَعَنْ ٢٠٢٧ اَنَسٍ (رض) قَالَ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ اِنَّ حُبَّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ)

২০২৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ সূরা তথা 'কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ'কে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার একে ভালোবাসা তোমাকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেবে। -[তিরমিযী] আর বুখারী এর সমার্থ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْمُ الرَّجُلِ উক্ত ব্যক্তির নাম ইমাম মীরক বলেন, উক্ত ব্যক্তির নাম হলো كُلْثُوْم কারো মতে كُرْزٌ তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

وَعَنْ ٢٠٢٨ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২০২৮. **অনুবাদ :** হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আশ্চর্য, আজ রাতে এমন কতগুলো আয়াত নাজিল হয়েছে, যার পূর্বে এর অনুরূপ কোনো আয়াত দেখা যায়নি- 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস'। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَضِيْلَةُ السُّوْرَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ উল্লিখিত সূরাদ্বয়ের ফজিলত : পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে অত্র সূরাদ্বয় তাবিজস্বরূপ, পাঠককে যাবতীয় মন্দ হতে রক্ষা করে।

বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ জিন এবং ইনসানের বদনজর হতে রক্ষার জন্য অত্র সূরাদ্বয়কে তাবিজ রূপে গ্রহণ করেন এবং অন্যগুলো পরিত্যাগ করেন। নবী করীম ﷺ যাদুতে আক্রান্ত হলে উক্ত সূরাদ্বয় দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন।

-[মিরকাত- খ. ৪, পৃ. ৬৪০]

وَعَنْ ٢٠٢٩ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَمَّا اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَابِ الْمِعْرَاجِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

২০২৯. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন দু হাতের তালু একত্র করতেন, অতঃপর তাতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস' পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর এ হাতদ্বয় দ্বারা আপন শরীরের যতটুকু সম্ভব হতো মুছে নিতেন। শুরু করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সম্মুখভাগ হতে। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম] আর হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস لَمَّا اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ 'মি'রাজ পরিচ্ছেদে' আমরা অচিরেই বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : أَوَى - আসতেন এবং স্থির হতেন। كَفَّ - হাতের তালু। نَفَثَ - ফুঁ দিতেন। يَمْسَحُ - তিনি মাসাহ করতেন। مَا اسْتَطَاعَ - যতটুকু সম্ভব হতো।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** ইমাম তীবী (র.) বলেন, হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ফুঁক হলো পড়ার পূর্বে। এর অর্থ হলো– তিনি ফুঁক দেওয়ার ইচ্ছা করে তারপর পড়তেন।

সহীহ বুখারীতে فَاءٌ -এর পরিবর্তে وَاوٌ-সহ উল্লিখিত হয়েছে, কেননা পড়ার পূর্বে ফুঁক দেওয়ার কথা কেউই বলেননি। আর এটা وَاوٌ -এর মাধ্যমে হয় না; বরং فَاءٌ -এর দ্বারা হয়। সম্ভবত এখানে فَاءٌ টি লেখক অথবা বর্ণনাকারীর ভুল।

ইবনুল মালেক বলেন, এখানে فَاءٌ -কে কুরআনের فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ এবং فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا আয়াতদ্বয়ের উপর কিয়াস করলেই সকল ঝামেলা চুকে যায়। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৪০]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٣٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهٗ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِيْ اَلَا مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২০৩০. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিস কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে থাকবে। ১. কুরআন– এটা বান্দাদের [পক্ষে বা বিপক্ষে] আর্জি পেশ করবে। এর বাহির ও ভিতর দুটি রয়েছে। ২. আমানত এবং ৩. আত্মীয়তার বন্ধন। [এদের প্রত্যেকে] ফরিয়াদ করবে– ওহে! যে আমাকে রক্ষা করেছে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন এবং যে আমাকে ছিন্ন করেছে, আল্লাহ তাকে ছিন্ন করুন! –[বাগাবী- শরহুস সুন্নায়]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : يُحَاجُّ - ঝগড়া করবে, অভিযোগ পেশ করবে। ظَهْرٌ - প্রকাশ্য। بَطْنٌ - অপ্রকাশ্য তথা যার অর্থ تَاوِيْل -এর মাধ্যমে বুঝা যাবে। اَلْاَمَانَةُ - আমানত। اَلرَّحِمُ - আত্মীয়তার সম্পর্ক। تُنَادِيْ - সে ডাক দেবে।

قَوْلُهٗ ثَلٰثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ **-এর ব্যাখ্যা :** তিনটি বিষয় কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশের নীচে থাকবে। এর অর্থ হলো, কিয়ামত দিবসে এ তিন শ্রেণির লোক আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিদানকে বিনষ্ট করবেন না। –[মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ২২]

অথবা, তাদের অবস্থান হবে বাদশাহদের নিকতম ব্যক্তিদের মতো, যাদের সুপারিশ, কৃতজ্ঞতা, অভিযোগ ইত্যাদি বাদশাহর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৪৩]

لِمَاذَا خُصَّ هٰذِهِ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ **তিনটি জিনিসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ :** এ তিন শ্রেণিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, বান্দা যে চেষ্টা-সাধনা করে তা হয়তো তার ও আল্লাহর মাঝের বিষয় হবে, অথবা তার মাঝের ও ব্যাপক জনগণের মধ্যকার হবে, কিংবা পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে হবে।

অতএব কুরআন হলো মহান প্রভুর প্রভুত্বের হক আদায় করার মাধ্যম। আর আমানত সকল জনগণের জন্য ব্যাপক। কেননা তাদের সম্পদ, ইজ্জত এবং অন্যান্য অধিকারসমূহ পরস্পরের জন্য আমানতস্বরূপ। যে এটা প্রতিষ্ঠা করল সে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে।

আর তৃতীয় পর্যায়ে হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। এর মূল হলো তাদের থেকে ভয়ভীতি দূর করা এবং দীন ও দুনিয়ার সার্বিক বিষয়ে অনুগ্রহ করা।

উল্লেখ্য যে, এখানে কুরআনকে প্রথমে এনেছেন এজন্য যে, আল্লাহর হক হলো সবচেয়ে বড়। এটা আদায়ের ফলে অন্যগুলো সহীহ হয়ে যায়। আর এর পরপরই আমানতের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা এটা দয়া-অনুগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এটা আত্মীয়তার সম্পর্ককেও অন্তর্ভুক্ত করে।

আর উল্লিখিত দুটির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কে শামিল হওয়া সত্ত্বেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, এটাই হলো বান্দার হকের মধ্যকার সবচেয়ে বড় হক। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৪৩]

قَوْلُهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ -এর ব্যাখ্যা : এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনেক মতামত পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ–

১. ظَهْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা প্রকাশ্য আর بَطْنٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা বুঝার জন্য تَفْسِيْر -এর প্রয়োজন।

২. অথবা, ظَهْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে পাঠ করা, আর بَطْنٌ হলো এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা।

৩. অথবা, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাপাচারিতার কারণে যেসব আজাব ও গজব নাজিল করেছেন সেসব সংবাদ এবং ঘটনাকে ظَهْرٌ বলে, আর পাঠক তা হতে যে শিক্ষা অর্জন করে তাকে بَطْنٌ বলে।

৪. অথবা, আজ্ঞাপ্রাপ্তগণ কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার সমন্বয়কে ظَهْرٌ বলে আর তা পর্যায়ক্রমে অনুধাবন করাকে بَطْنٌ বলে। –[আশিয়্যাতুল লুম'আত, তা'লীক]

وَعَنْ ٢٠٣١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২০৩১. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– [কিয়ামতের দিন] কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক! অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে করতে! কেননা তোমার স্থান শেষ আয়াতের নিকটে, যা তুমি পাঠ করবে। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ - যে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। وَارْتَقِ - তুমি উঠ। رَتِّلْ - ধীরে সুস্থে পড়। مَنْزِلَكَ - তোমার অবস্থানস্থল।

اَلْمُرَادُ بِالصَّاحِبِ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ দ্বারা উদ্দেশ্য : صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যিনি সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং কুরআনের উপর যথাযথ আমল করেন। ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয় যে কুরআন তেলাওয়াত করে; কিন্তু তার উপর যথাযথ আমল করে না। এরূপ ব্যক্তি কোনোরূপ ছওয়াবের উপযোগী হবে না; বরং এরূপ ব্যক্তির প্রতি কুরআন অভিসম্পাত করে, এর সমর্থনে একটি অভিমত পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কুরআনের উপর আমল করে সে যেন সর্বদা কুরআন পাঠ করে যদিও সে তা দৈনিক পাঠ করে না। আর যে এর উপর আমল করে না, সে নিয়মিত কুরআন পাঠ করলেও যেন তা পাঠ করেনি। বস্তুত শুধু কুরআন তেলাওয়াতই যথেষ্ট নয়; বরং তার উপর আমল করাই হলো সর্বোত্তম কাজ।

–[মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ২৩]

قَوْلُهُ فَاِنَّ مَنْزِلَكَ الخ -এর ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতের স্তর পবিত্র কুরআনের আয়াতের সংখ্যার সমান। অপর হাদীসে আছে যে, اَهْلُ الْقُرْاٰنِ -এর উপরে আর কোনো স্তর নেই। ফলে কুরআনের পাঠকগণ তাদের আয়াতের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে উঠবে।

ইমাম দানী (র.) বলেন, ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতের সংখ্যা ছয় হাজার। তবে ছয় হাজার -এর পরের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে–

১. কারো মতে, ২০৪টি।
২. কেউ বলেন, ২১৪টি।
৩. কারো মতে, ২১৯টি।
৪. কারো মতে, ২২৫টি।
৫. আরেক দল বলেন, ২৩৬টি।

দাইলামী হতে বর্ণিত হাদীসে [তার সনদে كذاب রয়েছে] এসেছে যে, জান্নাতের স্তর কুরআনের আয়াতের সংখ্যার অনুরূপ অ'র তা হলো ৬২১৬ টি। প্রত্যেক স্তরের সাথে আসমান ও জমিনের সম পরিমাণ দূরত্ব হবে। –[মিরকাত ৪র্থ খণ্ড, ৬৪৪ পৃষ্ঠা]

وَعَنْ ٢٠٣٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

২০৩২. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে পেটে কুরআনের কিছু নেই, তা শূন্য ঘর তুল্য। –[তিরমিযী ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ-এর ব্যাখ্যা : اَلْخَرِبُ শব্দটির "خ" বর্ণে যবর এবং "ر" বর্ণের নীচে যের সহকারে। অর্থ হলো– বিরান, অনাবাদি।

মূলত মানুষের কলব আবাদ হবে ঈমান এবং কুরআন পাঠের মাধ্যমে এবং অন্তর্জগৎ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় প্রকৃত বিশ্বাস এবং আল্লাহর অনুগ্রহরাজির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঘরবাড়ি যত সুন্দরই হোক না কেন যদি তাতে মনুষ্য বসতি না থাকে তবে তা বিরান বা অনাবাদি হিসেবে পরিগণিত হয় এবং এর মূল্যায়ন জনগণের নিকট থাকে না। এরূপই মানুষের বিষয়াবলি। যদি তাদের অন্তর ঈমান এবং কুরআন হতে খালি হয় তবে তার কোনো গুরুত্ব নেই।

অতএব উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন পড়তে জানে না এবং এর উপর ঈমানও রাখে না এমনিভাবে যে কুরআন পড়তে জানে; কিন্তু এর উপর ঈমান রাখে না– এরা উভয়ে বিরান গৃহের ন্যায়; এদের কোনো মূল্য নেই। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ জানে এবং তা পাঠ করে ও যথাযথভাবে তার উপর ঈমানও রাখে, তার অন্তর্জগৎ ঈমানের আলোতে আলোকিত। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, অল্প পরিমাণ কুরআন জানে আর তার কলবও স্বল্প পরিমাণ ঈমানের নূরে আলোকিত হয়; আর যে বেশি জানে তার কলব বেশি আলোকিত হয়। –[মাযাহেরে হক– খ. ৩. পৃ. ২৪]

وَعَنْ ٢٠٣٣ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَمَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২০৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, কুরআন যাকে আমার জিকির ও আমার নিকট প্রার্থনা করা হতে বিরত রেখেছে, আমি তাকে দান করব প্রার্থনাকারীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। [হুজুর ﷺ বলেন,] কেননা আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব অপর সকল কালামের উপর, যেমন– আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সকল সৃষ্টির উপর। –[তিরমিযী ও দারেমী। আর বায়হাকী শুআবুল ঈমানে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : ذِكْرِىْ - আমার স্মরণ। مَسْئَلَتِىْ - আমার নিকট প্রার্থনা। اَعْطَيْتُهُ - আমি তাকে দান করব। فَضْلُ - মর্যাদা। خَلْقٌ - সৃষ্টিজগৎ।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মহান আল্লাহর উক্ত ঘোষণার মর্মার্থ হলো, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করা, তার মর্ম অনুধাবন করা এবং কুরআনের বিধিবিধানের উপর আমল করতে ব্যস্ত থাকার কারণে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা ও তাঁকে স্মরণ করা হতে বিরত থাকে এতে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রার্থনাকারী থেকেও বেশি প্রদান করবেন। কেননা যে ব্যক্তি তার জীবনকে কুরআনের সাথে জুড়ে দিয়েছে, সে প্রকৃতই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কাজেই তার সকল বিষয়ে মহান আল্লাহই যথেষ্ট। −[মাযাহেরে হক− খ. ৩, পৃ. ২৪]

وَعَنْ ٢٠٣٤ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا .

২০৩৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− যে আল্লাহর কিতাবের কোনো একটি অক্ষর পাঠ করেছে, এতে তার জন্য নেকি মিলবে আর নেকি হচ্ছে আমলের দশ গুণ। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' (الم) একটি অক্ষর; বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। [সুতরাং আলিফ, লাম, মীম, বললেই ত্রিশটি নেকি পাবে।] −[তিরমিযী ও দারেমী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ; কিন্তু সনদের দিক হতে গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : كِتَابٌ - আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন। حَسَنَةٌ - নেকি, ছওয়াব। اَمْثَالٌ - অনুরূপ।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** পবিত্র কুরআনুল কারীম যে কোনোভাবেই পাঠ করুক না কেন তাতে ছওয়াব মিলবে, এমনকি একটি حَرْف -এর জন্যও ছওয়াব পাওয়া যাবে। আর এ ছওয়াবকে দশগুণ করে বৃদ্ধি করা হবে। الٓمٓ এটি সূরা বাকারার শুরু অংশ। এটা পাঠ করলে ৯০ নেকি পাওয়া যাবে, কেননা مِيْم - لَامْ - اَلِفْ মোট নয়টি অক্ষর রয়েছে আর সূরা اَلْفِيْلُ -এর শুরু اَلَمْ পড়লে ত্রিশ নেকি পাওয়া যাবে।

وَعَنْ ٢٠٣٥ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ قَالَ مَرَرْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ يَخُوْضُوْنَ فِى الْاَحَادِيْثِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَوَ قَدْ فَعَلُوْهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا

২০৩৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হারেছ আ'ওয়ার (র.) বলেন, আমি [কুফার] মসজিদে পৌঁছে দেখলাম লোকেরা বাজে কথায় মশগুল। অতঃপর আমি হযরত আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তারা কি এরূপ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শুন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সাবধান! শীঘ্রই দুনিয়াতে ফাসাদ [বিপর্যয়] শুরু হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা হতে বাঁচবার উপায় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, এতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের খবর এবং তোমাদের

بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِيْ غَيْرِهٖ اَضَلَّهُ اللّٰهُ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِيْ لَا تَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِيْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذَا سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ وَهُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ مَجْهُوْلٌ وَفِي الْحَارِثِ مَقَالٌ .

মধ্যকার বিতর্কের মীমাংসা রয়েছে। এটা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী এবং নিরর্থক নয়। যে অহংকারী একে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তার অহংকার চূর্ণ করবেন; যে এর বাইরে হেদায়েত তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে গোমরাহ করবেন। এটা হলো আল্লাহর মজবুত রজ্জু, প্রজ্ঞাময় জিকর এবং সত্য-সরল পথ। এর অবলম্বনে প্রবৃত্তি বিপথগামী হয় না, জবানের কষ্ট হয় না। এটা হতে জ্ঞানীগণ বিতৃষ্ণ হয় না। এটা বার বার পাঠে পুরাতন হয় না। এর তথ্যসমূহ বিস্ময়কর। এটা শুনে জিনরা স্থির থাকতে পারে না। এমনকি তারা বলে উঠেছে– 'আমরা এমন এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি– যা সৎপথের সন্ধান দেয়। অতএব আমরা তার উপর ঈমান এনেছি।' যে এটা বলে– সত্য বলে, যে এর সাথে আমল করে– পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়, যে এর দ্বারা বিচার করে– ন্যায় করে এবং যে এর দিকে ডাকে– সত্য-সরল পথের দিকে ডাকে। [সুতরাং তারা এরূপ কুরআন ছেড়ে অন্যান্য আলোচনায় কেন মশগুল হয়েছে?] –[তিরমিযী ও দারেমী]; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এর সনদ মজহুল। আর হারেছ আ'ওয়ার সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। [হাদীসটির বর্ণনাভঙ্গিই তার দুর্বলতার সাক্ষ্য। তবে এর মর্ম সত্য।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : يَخُوْضُوْنَ - তারা ব্যস্ত থাকে, লিপ্ত হয়ে পড়ে। فِتْنَةٌ - বিপর্যয়, ফিতনা। اَلْمَخْرَجُ - বের হবার পথ। نَبَأٌ - সংবাদ। حُكْمٌ - মীমাংসা। اَلْفِعْلُ - পার্থক্যকারী। اَلْهَزْلُ - অনর্থক। جَبَّارٌ - অহংকারী। قَصَمَ - চূর্ণ করবেন, ধ্বংস করবেন। لَا تُزِيْغُ - বিপথগামী হয় না। اَلْاَهْوَاءُ - প্রবৃত্তি। لَا تَلْتَبِسُ - কষ্টকর হয় না। وَلَا يَشْبَعُ - বিতৃষ্ণা হয় না। لَمْ تَنْتَهِ - পুরাতন হয় না। كَثْرَةُ الرَّدِّ - বারবার পাঠে। لَا يَنْقَضُ - শেষ হয় না। عَجَائِبُهُ - বিস্ময়কর বিষয়াবলি। يَخْلَقُ - স্থির থাকতে পারে না। اَلرُّشْدُ - সরল-সঠিক পথ। صَدَقَ - সত্য বলে। اُجِرَ - ছওয়াব প্রাপ্ত হয়।

قَوْلُهُ يَخُوْضُوْنَ فِي الْاَحَادِيْثِ**-এর ব্যাখ্যা :** হযরত হারেছ আনওয়ার-এর আলোচ্য অংশের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. জনগণ মসজিদের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত, যিকির-আযকার পরিত্যাগ করে বিভিন্ন রকম গল্প-গুজব, কিচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদি বাজে কথায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

২. হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো, হাদীসে নববীর আলোচনায় জনগণ মশগুল হয়ে পড়েছে; কিন্তু এর সংশ্লিষ্ট আয়াতকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

৩. ইমাম তীবী (র.) বলেন, اَلْخَوْضُ-এর মূল হলো পানির রাস্তা এবং তাতে গমন। শরিয়তে এটা اِسْتِعَارَةٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনে যে বিষয়াবলির ভর্ৎসনা করেছে বা মন্দ বলেছে, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া।

قَوْلُهُ مِنْ جَبَّارٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে جَبَّارٌ তথা مُتَكَبِّرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُنْكِرُ قُرْاٰنٍ তথা কুরআন অস্বীকারকারী,অর্থাৎ সে ব্যক্তিই কুরআন অস্বীকারকারী যে কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করে না এবং তার উপর আমল করে না। বস্তুত এসব ব্যক্তিদের অন্তরে ধোঁকা, হিংসা, অহংকার এবং হিংসার রোগ রয়েছে। এরূপ ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্ নিজের রহমত হতে দূরে সরিয়ে রাখবেন, তাদের প্রতি কোনোরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন না।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত কোনো আয়াতের উপর আমল করে না এবং পড়ে না, যা করা ওয়াজিব, এর ফলে সে কাফের হয়ে যাবে। তবে কেউ অলসতা, দুর্বলতা বা অক্ষমতার কারণে যদি উক্ত আয়াত তেলায়াত না করে; কিন্তু তার অন্তরে এর মহত্ত্ব দৃঢ় থাকে তবে তার কোনো পাপ হবে না, শুধু সে ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবে।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৭]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ-এর ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআন এমন একটি মহাগ্রন্থ যা বারবার পাঠ করা এবং তার মধ্যকার বিভিন্ন বিষয়াবলি ও বিধিবিধান শুনার ফলে কখনো পুরাতন হয় না; বরং যতই সে শুনে ততই শুনতে মন চায় এবং যতই পড়ে ততই নতুন মনে হয়। অর্থ এবং উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম না হলেও এর পড়া ও শুনার শব্দ কখনো কমে না এবং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

وَعَنْ ٢٠٣٦ مُعَاذِ بْنِ الْجُهَنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِيْ عَمِلَ بِهٰذَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২০৩৬. অনুবাদ : হযরত মু'আয জুহানী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে তার সাথে আমল করেছে, তার মাতাপিতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি তাজ পরানো হবে, যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে, যদি সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে তোমার মধ্যে থাকত। এখন তার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যে এর সাথে আমল করেছে? –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে কুরআন পাঠ করে' [ইমাম আতা তীবী (র.)-এর মতে এখানে হাফেজে কুরআন উদ্দেশ্য] কিয়ামতের ময়দানে তার পিতাকে এমন আলোকোজ্জ্বল টুপি পরানো হবে যে, যার আলো সূর্যের চেয়েও বেশি হবে। হাদীসের শেষাংশ দ্বারা রাসূল ﷺ এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কুরআন পাঠকারীর পিতার যদি এ মর্যাদা হয় তবে যে ব্যক্তি নিজে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তবে তার মর্যাদা আরো অনেক বেশি হবে।

–[মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ২৯]

وَعَنْ ٢٠٣٧ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْاٰنُ فِيْ اِهَابٍ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২০৩৭. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন যদি চামড়ায় রাখা হয়, অতঃপর একে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তবে তা কখনো পুড়বে না। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اِهَابٌ - চামড়া, সাধারণত যে চামড়া পাকানো হয়নি তাকে اِهَابٌ বলে, এখানে مُطْلَقٌ চামড়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ-এর ব্যাখ্যা : 'পবিত্র কুরআনকে চামড়ায় রেখে আগুনে ফেললে তা জ্বলবে না'– এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়–

১. কিছু সংখ্যকের মতে, এ হুকুমটি নবী করীম ﷺ -এর যুগে ছিল, অর্থাৎ কুরআনকে কাঁচা চামড়ায় রেখে আগুনে ফেললে তা জ্বলবে না। এটা নবী করীম ﷺ -এর অন্যান্য মু'জিযার মধ্য হতে এটিও একটি।

২. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে সে কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না এবং জাহান্নামের আগুন তাকে কখনো জ্বালাতে পারবে না। যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন- مَنْ كَانَ الْقُرْآنُ فِيْ قَلْبِهِ لَا تَحْرِقُهُ

৩. অথবা, পবিত্র কুরআনের মহত্ত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করার লক্ষ্যে অত্র কথাটি বলা হয়েছে। যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ الخ

৪. হাফেজ তুরপুশতী (র.) বলেন, কুরআনকে কাঁচা চামড়ায় রেখে আগুনে রাখলে কুরআনের বরকতে উক্ত চামড়া জ্বলবে না। অতএব যে ব্যক্তি রাতদিন কুরআন পাঠ করে এবং যথাযথ আমল করে তবে তার মর্যাদা কেমন হবে, তা বলা বাহুল্য। উল্লেখ্য যে, غَيْر مَدْبُوْغ তথা কাঁচা চামড়া আগুনে তাড়াতাড়ি জ্বলে এজন্য مُبَالَغَة হিসেবে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। -[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৫৫]

وَعَنْ ٢٠٣٨ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاوِيْ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ .

২০৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে কুরআন পড়েছে এবং তা মুখস্থ রেখেছে, অতঃপর এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনেছে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপরিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য দোজখ অবধারিত হয়েছিল। -[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব এবং এর রাবী হাফস ইবনে সুলায়মান হাদীস বর্ণনায় সবল নন; বরং দুর্বল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اِسْتَظْهَرَ - সে মুখস্থ করল। (حَفِظَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ) -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন মুখস্থ করল এবং এর মাধ্যমে দীনের ব্যাপারে সাহায্য ও শক্তি কামনা করল। شَفَّعَهُ - তার সুপরিশ কবুল করল।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করবে এবং এর বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার বংশধর হতে এমন দশ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের ব্যাপারে জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীস ঐসব সত্যবলম্বীদের জন্য প্রতিউত্তর হয়েছে, যারা মনে করেন সুপারিশ শুধু মর্যাদা উঁচুর জন্য হবে; পাপ মোচনের জন্য নয়। -[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٠٣٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلٰوةِ فَقَرَأَ اُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا اُنْزِلَتْ فِي التَّوْرٰةِ وَلَا فِيْ

২০৩৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা হযরত উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপে নামাজে কুরআন পড়? তিনি সূরা ফাতেহা পড়ে শুনালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই আল্লাহর শপথ- যাঁর হাতে আমার জীবন! এর ন্যায় কোনো সূরা না

الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا وَاِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ اَعْطَيْتُهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَرَوَى الدَّارِمِيُّ مِنْ قَوْلِهِ مَا اُنْزِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

তওরাতে নাজিল হয়েছে, না ইঞ্জিলে, না যাবূরে আর না এ কুরআনে। এটা হলো পুনরাবৃত্ত সপ্ত আয়াত এবং মহান কুরআন, যা আমাকে দেওয়া হয়েছে। –তিরমিযী এটা বর্ণনা করছেন। আর দারেমী বর্ণনা করেছেন, "এর ন্যায় কোনো সূরা নাজিল হয়নি" পর্যন্ত। এতে তিনি শেষের দিক এবং উবাইয়ের ঘটনা বর্ণনা করেননি। আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, অত্র হাদীস হাসান, সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اُمُّ الْقُرْاٰنِ -এর ব্যাখ্যা : এখানে اُمُّ الْقُرْاٰنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "سُوْرَةُ فَاتِحَةٌ" আর একে اُمُّ الْقُرْاٰنِ বলার কারণ হলো–

১. অত্র সূরা সংক্ষিপ্তভাবে পবিত্র কুরআনের মূল কথাকে একীভূত করেছে।

২. অথবা, اُمٌّ-এর অর্থ হলো اَصْلٌ বা মূল, তথা অত্র সূরা কুরআনের নিয়মনীতির মূল এবং এর উপরই ঈমানের বিধিবিধান নির্ভরশীল। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৫৬]

وَعَنْ ٢٠٤٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ فَاقْرَءُوْهُ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوْحُ رِيْحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِيَ عَلٰى مِسْكٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২০৪০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়তে থাক। আর কুরআনের উপমা হলো অর্থাৎ যে তা শিক্ষা করে, পড়ে এবং তা নিয়ে রাতে নামাজে দাঁড়ায় তার উপমা মেশক ভর্তি পাত্রের ন্যায়, যা চারদিকে সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে তা শিক্ষা করে এবং তা পেটে নিয়ে রাতে ঘুমায়, তার উপমা মেশক ভর্তি থলির ন্যায়– যার মুখ ঢাকনি দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে। –[তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : جِرَابٌ - পাত্র, ভাণ্ড, মেশকের পাত্রকে সাধারণত جِرَابٌ - বলা হয়। مَحْشُوٌّ - একেবারে পরিপূর্ণ যাতে অন্য কিছু রাখার মতো ফাঁক বা খালি জায়গা নেই। تَفُوْحُ - ছড়ায়, বা বিস্তৃত করে। رَقَدَ - সে ঘুমাল। اُوْكِيَ - ছিপি লাগানো হলো। جَوْفٌ - খালি জায়গা, পেট, অন্তর।

قَوْلُهُ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ-এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো– কুরআনের শব্দ ও অর্থ শিক্ষা করা। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যথা–

১. ইমাম আবূ মুহাম্মদ আল জুওয়াইনী (র.) বলেন, কুরআন শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া হলো ফরযে কেফায়া, যাতে এর ধারা বিচ্ছিন্ন না হয় এবং تَبْدِيْل ও تَحْرِيْف-এর সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

২. ইমাম যারকাশী (র.) বলেন, যদি কোনো শহর বা গ্রামে কুরআন তেলাওয়াতকারী না থাকে তবে উক্ত গ্রাম বা শহরের সকলেই পাপের ভাগী হবে।

৩. ইবনে হাজার (র.) বলেন, উক্ত কথাটির দ্বারা সকল উম্মত সম্বোধিত, অতএব তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক হাফেজ থাকলে কেউই পাপী হবে না। –[মেরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৫৬]

وَعَنْهُ ٢٠٤١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرأَ حٰـمَ الْمُؤْمِنَ اِلٰى اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَاٰيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرأَ بِهِمَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُصْبِحَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২০৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা হা-মীম আল-মু'মিন 'ইলাইহিল মাসীর' পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে, এর দ্বারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে হেফাজতে রাখা হবে। আর যে এটা সন্ধ্যায় পড়বে, এর দ্বারা সকাল পর্যন্ত তাকে হেফাজতে রাখা হবে। -[তিরমিযী ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মহানবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে-

حٰمٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে, মহান আল্লাহ তাকে সন্ধা পর্যন্ত হেফাজত করবেন আর সন্ধায় পড়লে সকাল পর্যন্ত হেফাজত করা হবে।

وَعَنِ ٢٠٤٢ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفَيْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تُقْرَاٰنِ فِيْ دَارٍ ثَلٰثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطٰنُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২০৪২. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, যা হতে [পরে] দুটি আয়াত নাজিল করে তা দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। এমন হতে পারে না যে, কোনো ঘরে তা তিন রাত পড়া হবে আর তারপরও শয়তান এর নিকটে যাবে। -[তিরমিযী ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন :** অত্র হাদীসে দু হাজার বছরের কথা উল্লেখ আছে আর এক হাদীসে এসেছে- اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, আর এর সমাধান নিম্নরূপ-

১. ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র দুই আয়াতও পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু ফেরেশতাদের একদলের নিকট উক্ত আয়াতদ্বয় দুই হাজার বছর পূর্বে প্রকাশ করা হয়; অতএব উপরিউক্ত লিখার অর্থ হলো প্রকাশ করা। কাজেই উভয়ের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

২. অথবা, লাওহে মাহফূযে তাকদীর একসাথে লিখা হয়নি; বরং ধীরে ধীরে লেখা হয়েছে, ফলে পর্যায়ক্রমে অত্র দুই আয়াত দুই হাজার বছর পূর্বে লিখা হয়েছে।

৩. অথবা, অত্র দুই আয়াতসহ সবকিছু পঞ্চাশ হাজার পূর্বেই লিখা হয়েছে; কিন্তু মহান আল্লাহ অত্র দুই আয়াতের স্থানকে দুই হাজার বছর পূর্বে ফেরেশতাদেরকে পৃথক করার নির্দেশ প্রদান করেন। -[তানযীমুল আশতাত, মিরকাত]

وَعَنْ ٢٠٤٣ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২০৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদে রাখা হবে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

বি. দ্র. অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

وَعَنْ ٢٠٤٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ وَمَنْ قَرَأَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২০৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রত্যেক জিনিসের একটি কলব [হৃদয়] রয়েছে, আর কুরআনের কলব হলো 'সূরা ইয়াসীন।' যে এটা একবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা এর দরুন তার জন্য দশবার কুরআন পড়ার ছওয়াব নির্ধারণ করবেন। –[তিরমিযী ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ قَلْبُ الْقُرْاٰنِ-এর বিশ্লেষণ : সূরা ইয়াসীনকে قَلْبُ الْقُرْاٰنِ বলার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে যা নিম্নরূপ–

১. অত্র সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা এবং পরিণাম উল্লিখিত হয়েছে, অন্য কোনো সূরায় এরূপ নেই, এজন্যই মৃত্যের জন্য এটা পড়াকে বিশেষিত করেছেন।

২. অথবা, এর পাঠের মাধ্যমে জীবিত ও মৃত অন্তরকে উজ্জীবত করে এবং অমনোযোগী অন্তরকে আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়।

৩. ইবনুল মালেক (র.) বলেন, কুরআনের যদি قَلْبٌ হওয়া সম্ভব হতো তবে সূরা يٰسٓ কলব হতো। মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, আমি বলি– এটা আল্লাহর কালামের অন্তর।

৪. ইমাম তীবী (র.) বলেন, সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ, অকাট্য আয়াত, উত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞান, সূক্ষ্ম অর্থ, পরিপূর্ণ ওয়াদা এবং পূর্ণ হুমকি-ধমকি এতে একত্র হবার কারণে এটি কুরআনের কলব সাব্যস্ত হয়েছে।

৫. ইমাম গাযালী (র.) বলেন, ঈমান বিশুদ্ধ হয় نَشْر ও حَشْر -কে স্বীকার করার মাধ্যমে। আর অত্র সূরায় এ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ কারণে এটা কুরআনের কলব হয়েছে। ইমাম গাযালী (র.)ও এ মতটি পছন্দ করেছেন। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৬০]

وَعَنْ ٢٠٤٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَرَأَ طٰهٰ وَيٰسٓ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلٰئِكَةُ الْقُرْاٰنَ قَالَتْ طُوْبٰى لِاُمَّةٍ يُنْزَلُ هٰذَا عَلَيْهَا وَطُوْبٰى لِاَجْوَافٍ تَحْمِلُ هٰذَا وَطُوْبٰى لِاَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهٰذَا - (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

২০৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা 'ত্বা-হা' ও 'ইয়াসীন' পাঠ করলেন। যখন ফেরেশতাগণ এটা শুনলেন তখন বললেন, ধন্য সেই জাতি যাদের উপর এটা নাজিল হবে, ধন্য সেই পেট যে তা ধারণ করবে এবং ধন্য সেই মুখ যে তা উচ্চারণ করবে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : طُوْبٰى - উত্তম বা ধন্য। اَجْوَافٌ - পেটসমূহ। تَحْمِلُ - বহন করবে। تَتَكَلَّمُ - পড়বে, তেলাওয়াত করবে।

قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَرَأَ **-এর ব্যাখ্যা :** 'মহান আল্লাহ উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করেছেন', এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ−

১. 'উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করেছেন' এর অর্থ হলো, এগুলো পাঠ করা প্রকাশ করেছেন এবং এ উভয় সূরা পাঠের ছওয়াব বর্ণনা করেছেন।

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে অত্র সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেন, যাতে অপরাপর ফেরেশতাকুল এর মর্যাদা অবহিত হন।

৩. অথবা, মহান আল্লাহ তাঁর (كَلَام نَفْسِيْ) নিজ কথাকে ফেরেশতাদেরকে শুনিয়েছেন আর এ শুনানোকে قِرَأةٌ বলা হয়েছে। যেভাবে তাঁর كَلَام نَفْسِيْ-কে قُرْاٰن বলা হয়। −[মিরকাত− খ. ৪, পৃ. ৬৬১]

وَعَنْهُ (٢٠٤٦) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةٍ اَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ اَبِىْ خَثْعَمِ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى الْبُخَارِيَّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ـ

২০৪৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়ে, সে সকালে উঠে আর তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। −[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব। তাছাড়া এর রাবী আমর ইবনে আবূ খাসআম যয়ীফ। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, আমর একজন মুনকার রাবী।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা দুখান পাঠ করে, পাঠ করার পর হতে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সর্বদা এ রকম হতে থাকে, কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাপক।

وَعَنْهُ (٢٠٤٧) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حٰمٓ الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَهِشَامُ اَبُو الْمِقْدَامِ الرَّاوِىْ يُضَعَّفُ ـ

২০৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− যে জুমার রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়বে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।−[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা গরীব। কেননা এর রাবী আবূ মিকদাম হেশামকে যয়ীফ বলা হয়ে থাকে।]

وَعَنِ (٢٠٤٨) الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ مُرْسَلًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ

২০৪৮. **অনুবাদ :** হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ শয়নের পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' পাঠ করতেন এবং বলতেন, ঐ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন কোনো একটি আয়াত রয়েছে, যা হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম। −[তিরমিযী ও আবূ দাউদ এ রাবী হতে এবং দারেমী মুরসালরূপে খালেদ ইবনে মা'দান হতে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব; কিন্তু হাসান।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلْمُسَبِّحَاتُ বলতে ঐসব সূরাকে বুঝানো হয়েছে যাদের শুরুতে سَبَّحَ ، يُسَبِّحُ ، سُبْحَانَ এরূপ রয়েছে, এ রকম সূরা সর্বমোট ৭টি। সেগুলো হলো–

اَلْحَدِيْدُ ، سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى ، اَلتَّغَابُنُ ، اَلْجُمُعَةُ ، اَلصَّفُّ ، اَلْحَشْرُ এবং اَلْاَعْلٰى

قَوْلُهُ اٰيَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ-এর ব্যাখ্যা : অত্র সূরাগুলোতে একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতে উত্তম, এ মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত কোনটি এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ–

১. কারো মতে, এটি হলো সূরা হাশরের لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ الخ আয়াতটি।

২. হাফেজ ইবনে কাছীর (র.)-এর মতে, সেটা হলো– هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

৩. ইমাম তীবী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতটি لَيْلَةُ الْقَدْرِ এবং জুমার দিনের দোয়া কবুলের সময়ের মতো মানুষের নিকট গোপন রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ উক্ত সূরাগুলো যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৬৩]

وَعَنْ ٢٠٤٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْاٰنِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২০৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কুরআন মাজীদে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক।' –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সূরা মুলক অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন সূরা। অত্র সূরা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে। হতে পারে উক্ত লোকটি পূর্বকালের– যে উক্ত সূরার মর্যাদা উপলব্ধি করে পাঠ করেছে। ফলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সূরাটি তার জন্য সুপারিশ করেছে, আর সে আজাব হতে মুক্তি পেয়েছে। রাসূল ﷺ এটা অবগত হয়েছে, অথবা মি'রাজ রজনীতে প্রত্যক্ষ করেছেন।

অথবা এটা ভবিষ্যৎকালের জন্যও হতে পারে অর্থাৎ যে তা পাঠ করবে তা তার জন্য কবরে অথবা কিয়ামত দিবসে সুপারিশ করবে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, এখানে رَجُلٌ শব্দটি تَنْكِيْر নেওয়া হয়েছে, যাতে যে কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য হতে পারে।

অথবা شَفَعَتْ শব্দটি تَشْفَعُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে– وَنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ এবং اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا তথা কোনো ব্যক্তি তা পাঠ করলে তার জন্য উক্ত সূরা সুপারিশ করবে। ফলে এ কথাটি উক্ত সূরা পাঠের জন্য উৎসাহমূলক হয়ে পড়বে। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৬৪]

وَعَنْ ٢٠٥٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ خِبَاءَهٗ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ اَنَّهٗ قَبْرٌ فَاِذَا فِيْهِ اِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتّٰى خَتَمَهَا

২০৫০. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার নবী করীম ﷺ -এর কোনো এক সাহাবী একটি কবরের উপর আপন তাঁবু খাটালেন। তিনি জানতেন না যে, এটা একটি কবর। হঠাৎ তিনি দেখেন– তাতে একটি লোক সূরা 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' পড়ছে, এমনকি তা শেষ করে ফেলেছে। অতঃপর তিনি নবী করীম ﷺ

فَاتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هِىَ الْمَانِعَةُ هِىَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে উক্ত সংবাদ অবহিত করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, এটা হচ্ছে– [আজাব হতে] বাধাদানকারী এবং মুক্তিদানকারী, যা পাঠককে আল্লাহর আজাব হতে মুক্তি দিয়ে থাকে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন যে, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : خِبَاءٌ - তাঁবু, ইমাম তীবী বলেন, এটা আরবদের পশমের তৈরি একপ্রকার ঘর। এতে দুটি অথবা তিনটি খুঁটি থাকে অর্থাৎ ছোট তাঁবু। لَا يَحْسِبُ - ধারণা করেননি। مَانِعَةٌ - প্রতিবন্ধক। اَلْمُنْجِيَةُ - রক্ষাকারী।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কেউ বলেন, অত্র হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তি হতে পারে পূর্বোক্ত ব্যক্তিই হবেন। ইমাম তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো কোনো মৃত ব্যক্তি জীবিতদের মতো তাদের অবস্থা প্রকাশ করতে পারে। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٠٥١ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَكَذَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِى الْمَصَابِيْحِ غَرِيْبٌ .

২০৫১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ 'সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল' ও 'সূরা তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' না পড়ে নিদ্রা যেতেন না। –[আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী।] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। শরহুস সুন্নায়ও এরূপ বলা হয়েছে। আর 'মাসাবীহ' কিতাবে একে গরীব বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٠٥٢ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২০৫২. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'সূরা ইযা যুলযিলাত' [ছওয়াবের ক্ষেত্রে] কুরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল হুওয়াল্লাহ' এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এক-চতুর্থাংশের সমান। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম তীবী (র.) বলেন, কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো اَلْمَبْدَأُ وَالْمَعَادُ তথা ইহকাল ও পরকাল, আর সূরা اِذَا زُلْزِلَتْ -এ কিয়ামত তথা পরকালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসেছে, তাই এটা কুরআনের অর্ধাংশ। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এটা এক-চতুর্থাংশ যেহেতু কুরআনে মোট চারটি বিষয়কে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর তা হলো اَلنُّبُوَّاتُ ، التَّوْحِيْدُ, اَحْكَامُ الْمَعَاشِ এবং اَحْوَالُ الْمَعَادِ ; আর অত্র সূরায় اَحْوَالُ الْمَعَادِ -কে শামিল করা হয়েছে তাই এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। আর قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ সূরাটিতে প্রথম ভাগ তথা اَلتَّوْحِيْدُ অবলম্বন ও শিরক হতে মুক্ত হবার বিষয় এসেছে তাই এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৬৬]

وَعَنْ ٢٠٥٣ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَرَأَ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ مَاتَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِىْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২০৫৩. **অনুবাদ :** হযরত মা'কেল [মা'কাল নয়] ইবনে ইয়াসার (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার বলবে- 'আউযু বিল্লাহিস্ সামীয়িল আলীমি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' অতঃপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন- যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। আর যদি সে এই দিনে মৃত্যুবরণ করে তবে শহীদরূপে মারা যাবে এবং যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে, সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে। -[তিরমিযী ও দারেমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٢٠٥٤ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَىْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مُحِىَ عَنْهُ ذُنُوْبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ) وَفِىْ رِوَايَتِهٖ خَمْسِيْنَ مَرَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ـ

২০৫৪ **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুইশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মুছে দেওয়া হবে যদি তার উপর ঋণের বোঝা না থাকে। -[তিরমিযী ও দারেমী] কিন্তু দারেমীর বর্ণনায় [দুইশতবারের স্থলে] পঞ্চাশবারের কথা রয়েছে এবং তিনি ঋণের কথা উল্লেখ করেননি। [কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারের মতে দুইশতবারের বর্ণনাই সঠিক।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ-এর ব্যাখ্যা : دَيْنٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়-

১. কারো মতে, এখানে دَيْنٌ দ্বারা বান্দার অধিকার হরণের কথা বুঝানো হয়েছে।

২. ইমাম তীবী (র.) বলেন, এখানে دَيْنٌ দ্বারা বিষয়টি ভয়াবহ বুঝাবার জন্য جِنْسُ الذُّنُوْبِ উদ্দেশ্য।

৩. ইবনে হাজার (র.) বলেন, دَيْنٌ দ্বারা আল্লাহর হকও হতে পারে যেমন- জাকাত, কাফফারা। -[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৬৮]

وَعَنْهُ ٢٠٥٥ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنَامَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِىْ اُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২০৫৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন- যে ঘুমাবার ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করবে এবং ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করবে, অতঃপর একশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে- যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন মহাপ্রভু তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার ডানদিকের বেহেশতে প্রবেশ কর। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা হাসান তবে গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ -এর ব্যাখ্যা : এখানে ডানদিকের বেহেশত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত হলো, এখানে জান্নাতের ডানদিকের বাগ-বাগিচা ও প্রাসাদসমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বামদিকের তুলনায় উত্তম। যদিও সেখানে সবই ডানদিক। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, জান্নাতের অধিবাসীগণ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যারা عِلِّيِّيْنَ -এর অধিবাসী।

২. أَبْرَار সৎকর্মশীলগণ যারা أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ

৩. ক্ষমাপ্রাপ্ত বা সুপারিশপ্রাপ্ত বা পবিত্রকৃত পাপীগণ। এরা হবেন أَصْحَابُ الْيَسَارِ –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৬৯]

وَعَنْ ٢٠٥٦ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

২০৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনে বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে। আমি বললাম, হুজুর! কি অবধারিত হয়ে গেছে? তিনি বললেন, বেহেশত। –[মালেক, তিরমিযী ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٢٠٥٧ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَقُوْلُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلٰى فِرَاشِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

২০৫৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] ফারওয়া ইবনে নাওফাল (র.) তাঁর পিতা নাওফাল (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা নাওফাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন যা আমি শয্যা গ্রহণকালে পড়তে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, 'সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরূন' পড়। কেননা এতে শিরক হতে মুক্তি রয়েছে। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারেমী]

وَعَنْ ٢٠٥٨ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذَا غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২০৫৮. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জুহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম। এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ 'সূরা কুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'সূরা কুল আঊযু বিরাব্বিন নাস' দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে ওকবা! এগুলো দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর! কেননা এগুলোর ন্যায় কোনো সূরা দ্বারা কোনো প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেনি। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَلْجُحْفَةُ - এটি شَامٌ দেশের লোকদের মীকাত বর্তমানে একে رَابِغٌ বলা হয়। اَلْأَبْوَاءُ - এটি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি পাহাড়ের নাম, যা اَلْجُحْفَةُ হতে ২০/৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। غَشِيَتْنَا - আমাদেরকে ঢেকে ফেলল। اَلْفَلَقُ - সৃষ্টিজগৎ অথবা জাহান্নামের তলদেশের একটি কূপের নাম। تَعَوَّذْ - আশ্রয় প্রার্থনা কর।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্য হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ শোয়ার সময় অত্র সূরাদ্বয় পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে শরীরের সম্মুখ ভাগ মুছে শরীর বন্ধ করতেন। এ উভয় সূরা সর্বোত্তম তাবিজ। নবী করীম ﷺ -কে যখন ইহুদিরা যাদু করল, তখন তিনি এক বছর পর্যন্ত যাদুগ্রস্ত ছিলেন। অবশেষে মহান আল্লাহ দুজন ফেরেশতা পাঠিয়ে রাসূল ﷺ -কে উক্ত সূরাদ্বয় শিখিয়ে দিলেন এবং এগুলো দ্বারা যাদু হতে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাঁর যাদু দূরীভূত হয়ে গেল।

وَعَنْ ٢٠٥٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا فِيْ لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَادْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ قُلْتُ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِىْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

২০৫৯. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবায়ব (রা.) বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারময় এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালাশে বের হয়ে পড়লাম, অবশেষে তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়! আমি বললাম, কি পড়ব? তিনি বললেন, যখন তুমি সকাল করবে এবং যখন সন্ধ্যা করবে তিনবার পড়বে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আ'ঊযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আ'ঊযু বিরাব্বিন নাস'। এটা প্রত্যেক বস্তুর [বিপদাপদের] মোকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।
–[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ -এর ব্যাখ্যা :

১. ইমাম তীবী (র.) বলেন, তোমার সকল অকল্যাণ এগুলো প্রতিহত করবে, তখন এ "مِنْ" টি زَائِدَةٌ হবে।

২. অথবা, এ "مِنْ" টি "اِبْتِدَاءُ الْغَايَةِ" -এর জন্য হবে। তখন অর্থ হবে– অকল্যাণের প্রথম স্তর হতে শেষ পর্যন্ত তোমার থেকে দূর করবে।

৩. অথবা, تَبْعِيْض -এর জন্য হতে পারে অর্থাৎ কোনো একপ্রকারের সকল অকল্যাণ প্রতিহত করবে। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৭১]

وَعَنْ ٢٠٦٠ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِقْرَأُ سُوْرَةَ هُوْدٍ اَوْ سُوْرَةَ يُوْسُفَ قَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

২০৬০. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [বিপদ হতে রক্ষার ব্যাপারে] আমি কি সূরা হূদ পড়ব, না সূরা ইউসুফ? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে সূরা 'কুল আ'ঊযু বিরাব্বিল ফালাক' অপেক্ষা আল্লাহর নিকট উত্তম কোনো সূরা তুমি কখনো পড়তে পারবে না।
–[আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٠٦١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْرِبُوا الْقُرْاٰنَ وَاتَّبِعُوْا غَرَائِبَهُ وَغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدُوْدُهُ .

২০৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে কুরআন পড় এবং এর 'গারায়েব' -এর অনুসরণ কর, আর এর 'গারায়েব' হলো ফারায়েয ও হুদূদ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَعْرِبُوا - সুস্পষ্টভাবে পাঠ কর। غَرَائِبُ - দুষ্প্রাপ্য বা কঠিন বিষয়াবলি। اَلْفَرَائِضُ - আদিষ্ট বিষয়াবলি। اَلْحُدُوْدُ - নিষিদ্ধ হুকুমসমূহ।

فَرَائِضُ দ্বারা উদ্দেশ্য : فَرَائِضٌ দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে যথা– কুরআনের আদিষ্ট বিষয়াবলি, অথবা উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আয়াতসমূহ এবং শরয়ী বিধানাবলি অথবা কুরআনের مُطْلَقٌ ফরজসমূহ।

حُدُوْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : حُدُوْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্যসমূহ হলো সূক্ষ্ম বিষয়াবলি, কঠিন বিধিবিধান, অস্বাভাবিক অলৌকিকত্বসমূহ, শিষ্টাচার ও চরিত্রের সুন্দর্যাবলি, আশা ও ভয়ের উপদেশাবলি ইত্যাদি। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৭২]

وَعَنْ ٢٠٦٢ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ فِى الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ـ

২০৬২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– নামাজে কুরআন পড়া নামাজের বাইরে কুরআন পড়া অপেক্ষা উত্তম, নামাজের বাইরে কুরআন পড়া তাসবীহ ও তাকবীর পড়া অপেক্ষা উত্তম, তাসবীহ ও তাকবীর পড়া দান করা অপেক্ষা উত্তম, দান করা [নফল] রোজা রাখা অপেক্ষা উত্তম এবং রোজা হচ্ছে দোজখের আগুনের জন্য ঢালস্বরূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অন্যান্য হাদীস অনুসারে ওলামায়ে কেরাম বলেন, "নিজের উপকারের কাজ অপেক্ষা অপরের উপকারের কাজই উত্তম।" সুতরাং হাদীসটি সহীহ হলে 'তাসবীহ ও তাকবীর' অর্থে এখানে নামাজের মধ্যকার তাসবীহ ও তাকবীরকেই বুঝাবে। অর্থাৎ নামাজের তাসবীহ ও তাকবীর দান অপেক্ষা উত্তম। 'তাসবীহ' অর্থ– 'সুবহানাকা' বা 'সুবহানাল্লাহ' বলা, 'তাকবীর' অর্থ– আল্লাহু আকবার বলা।

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন :** অপর এক হাদীসে এসেছে– اِنَّ كُلَّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلَّا الصَّوْمَ এতে বুঝা যায় যে, রোজাই হলো সর্বোত্তম ইবাদত। আর অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রোজার তুলনায় অন্যান্য ইবাদত উত্তম।

সমাধান : এর সমাধানে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, যদি আমরা মূল ইবাদতের দিকে তাকাই তবে আমরা দেখতে পাব যে, নামাজ صَدَقَةٌ হতে আর সদকা صَوْمٌ হতে উত্তম। আর যদি রোজার বিশেষত্বের দিকে তাকাই তাহলে রোজাই উত্তম দেখতে পাই। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৭৩]

وَعَنْ ٢٠٦٣ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْاٰنَ فِىْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتُهٗ فِى الْمُصْحَفِ تُضَعَّفُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلٰى اَلْفَىْ دَرَجَةٍ ـ

২০৬৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওস সাকাফী (র.) তাঁর দাদা সাহাবী হযরত আওস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো ব্যক্তির মাসহাফ ব্যতীত মুখস্থ কুরআন পড়া এক হাজার মর্যাদা রাখে, আর তা মাসহাফে পড়া মুখস্থ পড়ার দুই গুণ তথা দুই হাজার পর্যন্ত মর্যাদা রাখে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُصْحَفُ-এর পরিচয় : মাসহাফ– যাতে কুরআন লেখা হয়েছে। কাগজে লেখা কুরআন, যাকে আমরা কুরআন বলি, আরব জাহানে একে 'মাসহাফ' বলে। এতে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরেই যে কুরআন মাজীদ 'মাসহাফ' রূপ ধারণ করবে তা তাঁকে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই অবহিত করেছেন। তাঁর জমানায় কুরআন অনবরত নাজিল হতে থাকায় তা সম্ভবপর হয়নি।

قَوْلُهُ اِلَى اَلْفَىْ دَرَجَةٍ-এর ব্যাখ্যা : এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম তীবী (র.) বলেন, লিখিত কুরআনের প্রতি দেখাটা তা বহন ও স্পর্শ করা এবং এর বিষয়াবলি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ইত্যাদি কারণে মুখস্থ পড়ার চেয়ে এর মর্যাদা বেশি। অন্যথায় মুখস্থ পড়াই হলো উত্তম।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এখানে اِلَى টি غَايَةُ الْاِنْتِهَاءِ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে দুইশত গুণ হবার কারণ হলো পড়ার ইবাদত এবং কুরআন দেখে পড়ার ইবাদতের জন্য।

অপর একদল বলেন, বরং না দেখে পড়াই উত্তম, সম্ভবত নবী করীম ﷺ বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ করার জন্য এটা বলেছেন। তবে যেভাবে পড়লে ভয়-ভীতি, চিন্তা-গবেষণা এবং একনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়, তাই উত্তম; অন্যথায় দেখে পড়াই উত্তম। কেননা না দেখে পড়ার চেয়ে দেখে পড়াতে চিন্তা-গবেষণা অধিক সৃষ্টি হয়। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৭৪]

وَعَنْ ٢٠٦٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جَلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ . (رَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২০৬৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে, যখন তাতে পানি লাগে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর পরিষ্কারকরণ কি? রাসূল ﷺ বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন তেলাওয়াত করা। –উপরিউক্ত চারটি হাদীস ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : تَصْدَأُ - ময়লা-আবর্জনা মিলিত হওয়া। جَلَاءٌ - পরিষ্কারের যন্ত্র। اَلْحَدِيْدُ - লোহা।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, মানুষের অন্তর কখনো উর্ধ্বমুখী হয় আবার কখনো নিম্নমুখী হয়। এটা শরীরের জন্য বাদশাহর ন্যায়। এটা যখন পরিশুদ্ধ হবে তখন তার পুরো শরীরও পরিশুদ্ধ হবে। আর এর মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হলে সর্ব শরীরে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। কাজেই মৃত্যুর স্মরণ এবং বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ কলবকে উজ্জীবিত রাখতে হবে।

وَعَنْ ٢٠٦٥ اَيْفَعَ بْنِ عَبْدِ الْكَلَاعِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ سُوْرَةِ الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ قَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ فَاَىُّ اٰيَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ اَعْظَمُ قَالَ اٰيَةُ الْكُرْسِىِّ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَاَىُّ اٰيَةٍ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ

২০৬৫. **অনুবাদ :** হযরত আইফা' ইবনে আবদুল কালায়ী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআনের কোন সূরা অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ।' সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, কুরআনের কোন আয়াত অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী– "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল

تُحِبُّ اَنْ تُصِيْبَكَ وَاُمَّتَكَ قَالَ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهٖ اَعْطَاهَا هٰذِهِ الْاُمَّةَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

কাইয়্যুম।" সে আবার জিজ্ঞাসা করল! ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! কুরআনের কোন আয়াত এমন, যার বরকত আপনার এবং আপনার উম্মতের প্রতি পৌঁছাতে আপনি ভালোবাসেন? তিনি বললেন, সূরা বাকারার শেষের দিক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে তা এ উম্মতকে দান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোনো কল্যাণ নেই যা এতে নেই। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : সূরা ফাতেহা কুরআনের মূল উদ্দেশ্যকে একত্র করা এবং নামাজে পাঠ করা ওয়াজিব হিসেবে মর্যাদাবান। আর সূরা ইখলাস মহান আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা করার দিক থেকে উত্তম। আয়াতুল কুরসী আল্লাহর জন্য উপযুক্ত গুণকে শামিল করা এবং অনুপযুক্তগুলোকে বিদূরিতকরণ ও তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনার দিক থেকে মর্যাদাবান। আর সূরা বাকারার শেষাংশ ইহকাল ও পরকালের দোয়াসমূহ সন্নিবেশিত করার দিক থেকে উত্তম। –[আশিয়্যাতুল লুমআত]

وَعَنْ ٢٠٦٦ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ - (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২০৬৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আবদুল মালেক ইবনে ওমায়র (র.) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সূরা ফাতেহায় [শারীরিক ও মানসিক] সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে।

–[দারেমী, আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : সূরা ফাতেহা সকল সূরার থেকে মর্যাদাশীল। এর সকল আয়াত এবং কালিমাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এটা দীনি-দুনিয়াবি, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল রোগের ঔষধ স্বরূপ। ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র সূরা অজ্ঞতা, কুফরি, পাপাচারিতা এবং শারীরিক সকল রোগের মহৌষধ। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৭৬]

وَعَنْ ٢٠٦٧ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رضـ) قَالَ مَنْ قَرَأَ اٰخِرَ اٰلِ عِمْرَانَ فِىْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهٗ قِيَامُ لَيْلَةٍ -

২০৬৭. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়বে, তার জন্য পূর্ণ রাত নামাজে কাটানোর ছওয়াব লেখা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এখানে সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক বলতে اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ থেকে শেষ পর্যন্তকে বুঝানো হয়েছে। আর لَيْلَةٌ বলতে রাতের প্রথম বা শেষ যে কোনো অংশ হতে পারে। আর নবী করীম ﷺ হতে এটা প্রমাণিত আছে যে, তিনি যখন সর্বপ্রথম ঘুম হতে জাগ্রত হতেন, তখন এ আয়াতগুলো পড়তেন।

وَعَنْ ٢٠٦٨ مَكْحُوْلٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلٰئِكَةُ اِلَى اللَّيْلِ ـ (رَوَاهُمَا الدَّارِمِيُّ)

২০৬৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মাকহুল (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা আলে ইমরান পড়বে, ফেরেশতাগণ তার জন্য রাত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। –[উক্ত হাদীস দুটি দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন।]

وَعَنْ ٢٠٦٩ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِاٰيَتَيْنِ اَعْطَيْتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَاِنَّهَا صَلٰوةٌ وَقُرْبَانٌ وَدُعَاءٌ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا)

২০৬৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারাকে এমন দুটি আয়াত দ্বারা সমাপ্ত করেছেন, যা আমাকে আল্লাহর আরশের নীচের ভাণ্ডার হতে দান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা এটা শিক্ষা করবে এবং তোমাদের নারীদেরকেও তা শিক্ষা দেবে। কেননা তাতে রয়েছে ক্ষমা-প্রার্থনা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ও দোয়া। –[দারেমী মুরসালরূপে]

وَعَنْ ٢٠٧٠ كَعْبٍ (رض) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ هُوْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২০৭০. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– জুমাবারে সূরা হুদ পড়বে। –[দারেমী]

وَعَنْ ٢٠٧١ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২০৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমাবারে সূরা কাহফ পড়বে, তার [ঈমানের] নূর এ জুমা হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত চমকাতে থাকবে। –[বায়হাকী দা'ওয়াতুল কাবীরে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসে সূরা কাহফের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে, জুমার দিন পড়লে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার জন্য নূর বা আলো হবে। এর অর্থ হলো– তার অন্তরে, অথবা কবরে, কিংবা হাশরের দিন তার জন্য আলো স্বরূপ হবে। পরবর্তী জুমা অর্থ হলো, এ পরিমাণ সময়। এভাবে প্রত্যেক জুমায় পড়লে অনুরূপ আলো হবে। এর ফজিলত সম্পর্কে আরো কতিপয় হাদীস আছে, যা নিম্নরূপ–

* وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مَرْفُوْعًا وَرَوَى الدَّارِمِىُّ مِنْ قَوْلِهِ مَوْقُوْفًا مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَتِيْقِ ـ
* وَرَوَى النَّسَائِىُّ وَالْحَاكِمُ هُمَا مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ سَعِيْدٍ ـ اَللَّفْظُ لِلنَّسَائِىِّ وَقَالَ رَفْعُهُ خَطَأٌ ـ اَلصَّوَابُ اَنَّهُ مَوْقُوْفٌ مَنْ قَرَأَهَا كَمَا اُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُوْرٌ مِنْ مَقَامِهِ اِلٰى مَكَّةَ ـ وَمَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِهَا فَخَرَجَ الرِّجَالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ ـ
* وَرَوَى الطَّبْرَانِىُّ فِى الْاَوْسَطِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاخْتَلَفَ اَيْضًا فِىْ رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِهَا ثُمَّ فَرَجَ الرِّجَالُ لَمْ يَضُرَّهُ ـ
* وَرَوَى الْبَزَّازُ وَغَيْرُهُ مَرْفُوْعًا مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ عِنْدَ مَضْجَعِهِ كَانَ لَهُ نُوْرًا يَتَلَأْلَأُ فِىْ مَضْجَعِهِ اِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ـ حَشْوُ ذٰلِكَ النُّوْرِ مَلَائِكَةٌ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ ـ
* وَفِى الْمَدَارِكِ بِلَفْظِ مَنْ قَرَأَ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ الخ عِنْدَ مَضْجَعِهِ ذِكْرُ نَحْوَهُ ـ –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৭৮]

وَعَنْ ٢٠٧٢ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ اِقْرَءُوا الْمُنْجِيَةَ وَهِيَ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ فَاِنَّهُ بَلَغَنِيْ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَأُهَا مَا يَقْرَأُ شَيْئًا غَيْرَهَا وَكَانَ كَثِيْرَ الْخَطَايَا فَنَشَرَتْ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ قَالَتْ رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ قِرَاءَتِيْ فَشَفَّعَهَا الرَّبُّ تَعَالٰى فِيْهِ وَقَالَ اَكْتُبُوْا لَهُ بِكُلِّ خَطِيْئَةٍ حَسَنَةً وَارْفَعُوْا لَهُ دَرَجَةً وَقَالَ اَيْضًا اِنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْقَبْرِ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَاِنْ لَمْ اَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامْحُنِيْ عَنْهُ وَاِنَّهَا تَكُوْنُ كَالطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَتَشْفَعُ لَهُ فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ فِيْ تَبَارَكَ مِثْلَهُ وَكَانَ خَالِدٌ لَا يَبِيْتُ حَتّٰى يَقْرَأَهُمَا وَقَالَ طَاؤُسٌ فُضِّلَتَا عَلٰى كُلِّ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ بِسِتِّيْنَ حَسَنَةً . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২০৭২. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (র.) বলেন, পড় তোমরা মুক্তিদানকারী সূরা। এটা হলো 'সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল' [অর্থাৎ সূরা সাজদা]। কেননা বিশ্বস্ত সূত্রে আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি এটা পড়ত এবং এটা ছাড়া অপর কিছু পড়ত না। আর সে ছিল বড় গুনাহগার ব্যক্তি। উক্ত সূরা তার উপর ডানা বিস্তার করে এবং বলতে থাকে যে, হে পরওয়ারদেগার তাকে মাফ কর! কেননা সে আমাকে বেশি বেশি পড়ত। সুতরাং মহান আল্লাহ তার সম্পর্কে এর শাফা'আত গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, তার প্রত্যেক গুনাহর স্থলে এক একটি নেকি লিখ এবং তার মর্যাদা উঁচু কর।

তিনি এটাও বলেন যে, উক্ত সূরা কবরে তার পাঠকের জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি, তাহলে তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফা'আত কবুল কর, আর যদি আমি তোমার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি, তবে আমাকে তা হতে মুছে ফেল! [অপর বর্ণনায়] তিনি বলেন, এ সূরা পাখির মতো তার উপর আপন পাখা প্রসার করবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে তাকে কবরের আজাব হতে রক্ষা করবে। তিনি 'সূরা তাবারাকাল্লাযী' সম্পর্কেও এরূপ বলেছেন। [পরবর্তী রাবী বলেন,] খালেদ এ সূরা দুটি না পড়ে শয়ন করতেন না। তাবেয়ী তাউস (র.) বলেন, এ দু সূরাকে কুরআনের প্রত্যেক সূরা অপেক্ষা ষাট গুণ অধিক নেকি লাভের মর্যাদা দান করা হয়েছে। –[দারেমী মুরসালরূপে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَلْمُنْجِيَةُ - রক্ষাকারী। كَثِيْرُ الْخَطَايَا - অনেক পাপ। نَشَرَتْ - প্রসারিত করল। جَنَاحَهَا - তার ডানা। شَفَّعَهَا - তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। اِرْفَعُوْا - উঁচু কর। اِمْحُنِيْ - আমাকে মুছে দাও।

وَعَنْ ٢٠٧٣ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ يٰسٓ فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا)

২০৭৩. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত আতা ইবনে আবূ রাবাহ (র.) বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে একথা পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম দিকে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হবে। –[দারেমী মুরসালরূপে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সূরা ইয়াসীন হলো পবিত্র কুরআনের কলব, একবার পাঠ করলে দশবার কুরআন পাঠ করার ছওয়াব তাকে দেওয়া হয়। অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কেউ সকাল বেলায় পাঠ করলে তার দীনি, দুনিয়াবি, পরকালীন অথবা সব রকমের প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়।

وَعَنْ ٢٠٧٤ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ نِ الْمُزَنِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ يٰسٓ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَءُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২০৭৪. **অনুবাদ :** [সাহাবী] হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার মুযানী (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার পূর্ববর্তী [সগীরা] গুনাহসমূহ মাফ করা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট এ সূরা পড়বে। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاقْرَءُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ সূরা ইয়াসীনকে মৃতদের নিকট পড়তে বলেছেন, অর্থাৎ মৃত্যুগামীর সম্মুখে অথবা মৃতদের কবরে পড়ার জন্য বলেছেন। কেননা তারা ক্ষমার জন্য অধিক মুখাপেক্ষী। অথবা তোমরা মৃত্যুপথযাত্রীদের সম্মুখে পড়বে যাতে তারা তা শুনতে পায় এবং তাদের অন্তরে প্রবেশ করে। যাতে তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করা হয়। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٠٧٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَاِنَّ سَنَامَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا وَاِنَّ لُبَابَ الْقُرْاٰنِ الْمُفَصَّلُ - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২০৭৫. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন– প্রত্যেক জিনিসের একটি চূড়া বা শীর্ষস্থান রয়েছে, আর কুরআনের শীর্ষস্থান হলো সূরা বাকারা এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি সার রয়েছে, আর কুরআনের সার হলো 'মুফাসসাল' সূরাসমূহ। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে সূরা বাকারাকে শীর্ষস্থান বা চূড়া বলা হয়েছে। কারণ সূরা বাকারা হলো সর্ববৃহৎ সূরা। এতে অনেক বিধিবিধান রয়েছে। অথবা এতে জিহাদের হুকুম রয়েছে, এর ফলে এটা অতি উচ্চাসনে আসীন। আর 'মুফাসসাল' সূরাসমূহকে মূল বা নির্যাস বলা হয়েছে। কেননা অত্র সূরাসমূহে কুরআনের মূল বিষয়াবলি একত্রে ও বিস্তারিতভাবে রয়েছে, যা অন্যান্য সূরায় বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সূরা হুজুরাত থেকে পরবর্তী সূরাসমূহকে مُفَصَّلْ বলা হয়।

وَعَنْ ٢٠٧٦ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوْسٌ وَعَرُوْسُ الْقُرْاٰنِ الرَّحْمٰنُ -

২০৭৬. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক জিনিসের একটি সৌন্দর্য বা শোভা রয়েছে, আর কুরআনের শোভা হলো 'সূরা আর রাহমান।'

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে 'সূরা আর রাহমান'কে কুরআনের সৌন্দর্য বলা হয়েছে। কেননা অত্র সূরায় ইহকালীন ও পরকালীন নিয়ামতসমূহ উল্লিখিত হয়েছে এবং জান্নাতের হুরদের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٠٧٧ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ يَقْرَأْنَ بِهَا فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ . (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২০৭৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পড়বে, কখনো সে অভাবে পতিত হবে না। [পরবর্তী রাবী বলেন,] হযরত [আবদুল্লাহ] ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা পড়তে বলতেন। –[উক্ত হাদীস দুটি বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : সূরা ওয়াকেয়া রাতের বেলায় পাঠ করলে কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না। এর মর্মার্থ হলো, দরিদ্রতা তাকে কখনো ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা তাকে উত্তম ধৈর্য ও পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

অথবা তাকে আত্মিক অভাব স্পর্শ করবে না। কেননা তাকে প্রশস্ত অন্তর, আল্লাহর পরিচিতি, আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা ও সমর্পিত অন্তর দেওয়া হয় এবং সকল বিষয় তাঁর দিকে ফিরানোর মতো মন দেওয়া হয়।

وَعَنْ ٢٠٧٨ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২০৭৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরা তথা 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা'কে ভালোবাসতেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : সাধারণত রাসূল ﷺ রাতের বেলায় سَبَّحَاتْ সূরাসমূহ পাঠ করতেন; উপরন্তু তিনি 'সূরা আল আলা'-কে পছন্দ করতেন। এর কারণ হলো, তাতে صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى অংশটি রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিতাবে কি আছে–

رَوَى ابْنُ حَبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَتْ صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَتْ اَمْثَالاً كُلُّهَا اَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبْتَلٰى الْمَغْرُوْرُ . اِنِّىْ لَمْ اَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ . وَلٰكِنْ بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّىْ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ . فَاِنِّىْ لَا اَرُدُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ . وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِهِ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ يُنَاجِىْ فِيْهَا رَبَّهُ ، سَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيْهَا نَفْسَهُ وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيْهَا فِىْ صُنْعِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَاعَةٌ يَخْلُوْ فِيْهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ الخ .

হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাবে কি আছে–

عَنِ ابْنِ ذَرٍّ (رض) قُلْتُ يَا رَسُوْلَ ﷺ فَمَا مَكَانَ فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى؟ قَالَ كَانَتْ عِبَرًا كُلُّهَا عَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يَفْرَحُ، عَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ، عَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْقَدْرِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ، عَجِبْتُ لِمَنْ رَاَى الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِاَهْلِهَا ثُمَّ اطْمَاَنَّ اِلَيْهَا ، عَجِبْتُ لِمَنْ اَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لَا يَعْمَلُ .

–[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৮৩]

وَعَنْ ٢٠٧٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ اَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَقْرِئْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِقْرَأْ ثَلٰثًا مِنْ ذَوَاتِ الرَّا فَقَالَ كَبُرَتْ سِنِّيْ وَاشْتَدَّ قَلْبِيْ وَغَلُظَ لِسَانِيْ قَالَ فَاقْرَأْ ثَلٰثًا مِنْ ذَوَاتِ حٰمٓ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهٖ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرِئْنِيْ سُوْرَةً جَامِعَةً فَاَقْرَأَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا زُلْزِلَتْ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَزِيْدُ عَلَيْهِ اَبَدًا ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ مَرَّتَيْنِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২০৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন! তিনি বললেন, 'আলিফ-লাম-রা' বিশিষ্ট সূরাসমূহ হতে তিনটি পড়! সে বলল, হুজুর! আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং আমার অন্তর কঠিন ও জিহ্বা শক্ত হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, তবে তুমি 'হা-মীম' বিশিষ্ট সূরাসমূহ হতে তিনটি পড়! সে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। অতঃপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ব্যাপক অর্থযুক্ত একটি সূরা শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সূরা 'ইযা যুলযিলাত' শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে দিলেন। এবার সে বলল, সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন– আমি এর উপর কখনো কিছু বৃদ্ধি করব না। অতঃপর সে প্রস্থান করল, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুবার বললেন, লোকটি কৃতকার্য হলো, লোকটি কৃতকার্য হলো। –[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَقْرِئْنِيْ - আমাকে শিখিয়ে দিন। كَبُرَتْ سِنِّيْ - আমার বয়স বেড়ে গেছে তথা আমি বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। اِشْتَدَّ قَلْبِيْ - আমার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে তথা স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। غَلُظَ لِسَانِيْ - জিহ্বা কঠিন হয়ে গেছে। جَامِعَةً - পরিপূর্ণ।

مَعْرِفَةُ سُوْرَةِ ذَوَاتِ الرَّا وَ ذَوَاتِ حٰمٓ 'আলিফ-লাম-রা' ও 'হা-মীম' বিশিষ্ট সূরাসমূহের পরিচয় : পাঁচটি সূরার শুরুতে 'আলিফ-লাম-রা' রয়েছে। সূরাগুলো হলো– সূরা ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, ইবরাহীম ও হিজর। এদেরকে 'যাওয়াতুর রা' বা রা বিশিষ্ট সূরা বলে। আর সাতটি সূরার প্রথমে 'হা-মীম' রয়েছে। সূরাগুলো হলো– সূরা গাফের, ফুসসিলাত, শূরা, যুখরুফ, দুখান, জাসিয়া ও আহকাফ। এদেরকে 'যাওয়াতু হা-মীম' বা 'হা-মীম' বিশিষ্ট সূরা বলে।

وَعَنْ ٢٠٨٠ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ اَلْفَ اٰيَةٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَالُوْا وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَقْرَأَ اَلْفَ اٰيَةٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২০৮০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারে না? সাহাবীগণ বললেন, কে প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারবে? তখন তিনি বললেন, তবে কি তোমাদের কেউ প্রত্যহ সূরা 'আলহা-কুমুত্তাকাছুর' পড়তে পারে না? –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সূরা 'তাকাছুর' হলো এক হাজার আয়াতের সমকক্ষ। কেননা এতে দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য এবং পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের উৎসাহ প্রদান রয়েছে। কারো মতে, এর কারণ হলো কুরআনের আয়াত হলো সর্বমোট ছয় হাজার এবং এর কিছু বেশি, আর এক হাজার হলো এর প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ।

ইমাম গাযালী (র.) বলেন, কুরআনের মূল উদ্দেশ্য ছয়টি এর মধ্যে একটি হলো পরকালর পরিচিতি। আর অত্র সূরায় এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে রয়েছে, তাই একে এক হাজার আয়াতের সমতুল্য বলা হয়েছে। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৮২]

وَعَنْ ٢٠٨١ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلٰثِيْنَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلٰثَةُ قُصُوْرٍ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا لَنُكْثِرَنَّ قُصُوْرَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَوْسَعُ مِنْ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২০৮১. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব মুরসালরূপে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে দশবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা [প্রাসাদ] তৈরি করা হবে, যে বিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে দুটি বালাখানা তৈরি করা হবে, আর যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে তিনটি বালাখানা তৈরি করা হবে। এটা শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে তো আমরা বহু বালাখানা লাভ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর রহমত এটা অপেক্ষাও অধিক প্রশস্ত। [এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই হে ওমর!] –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অন্য হাদীসে 'সূরা ইখলাস'-কে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে, আর অত্র হাদীসে এর ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। তথা যত দশবার পড়া হবে ততটি বালাখানা বেহেশতে তৈরি হবে, অতএব আমাদের উচিত বেশি বেশি করে অত্র সূরা পাঠ করা।

وَعَنْ ٢٠٨٢ الْحَسَنِ مُرْسَلًا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْاٰنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَتَيْ اٰيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوْتُ لَيْلَةٍ وَمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ خَمْسَ مِائَةٍ اِلَى الْاَلْفِ اَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْاَجْرِ قَالُوْا وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২০৮২. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত হাসান [বসরী] (র.) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি রাতে একশতটি আয়াত পড়বে, ঐ রাতে কুরআন মাজীদ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে দুশত আয়াত পড়বে তার জন্য এক রাতের ইবাদত লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচশ হতে হাজার আয়াত পর্যন্ত পড়বে, সে ভোরে উঠে এক 'কিন্তার' ছওয়াব দেখবে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! 'কিন্তার' কি? তিনি বললেন, ১২ হাজার [দিনার পরিমাণ ওজন]। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়; বরং এটি দীন ও দুনিয়ার সকল মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখে না কুরআন তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তার উপর অভিসম্পাত করে থাকে। ফলে প্রতি রাতে কমপক্ষে ১০০ আয়াত পাঠ করা একান্ত আবশ্যক, যাতে সে কুরআনের অভিযোগ হতে বাঁচতে পারে এবং কুরআনের অভিযোগ হতে রক্ষা পায়। এখানে সে রাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ রাতের অমনোযোগিতা বা অলসতার বিষয়।

এজন্যই ইমাম তীবী (র.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ করা আবশ্যক। আর যে কুরআন পাঠ করবে না তার জন্য কুরআন অভিযোগ পেশ করবে।

আর যে ব্যক্তি দুশত আয়াত পড়বে, তার জন্য পুরো রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদত করার ছওয়াব দেওয়া হবে। আর ৫০০ আয়াত পড়লে ১২ শত দিনার বা দিরহাম দানের ছওয়াব দেওয়া হবে।

অন্য হাদীসে আছে যে, قِنْطَارٌ হলো ১২ শত اُوْقِيَةٌ [উকিয়া], আর এক উকিয়া হলো আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলের থেকেও বেশি পরিমাণ।

بَابٌ

পরিচ্ছেদ : কুরআনের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং কুরআন পাঠের নিয়মাবলি

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٠٨٣ - عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَاهَدُوْا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : تَعَاهَدُوْا - তোমরা যথাযথভাবে হেফাজত কর তথা সর্বদা তেলাওয়াত কর। اَشَدُّ تَفَصِّيًا - অধিক পলায়নপর। عَقْل - রশি।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম তীবী (র.) বলেন, কুরআন মানুষের অন্তর হতে চলে যাবার কারণ হলো এটা কোনো মানুষের কথা নয়; বরং মহা ক্ষমতাধর আল্লাহর বাণী। যাঁর মাঝে ও মানুষের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা মানুষ হলো حَادِثٌ [ক্ষণস্থায়ী] আর আল্লাহ হলেন قَدِيْمٌ [চিরস্থায়ী]। আর এ কুরআন পাঠ করা বা শিক্ষা গ্রহণ করা হলো মহাপ্রভুর সীমাহীন অনুগ্রহ ও দয়া। তিনি বান্দার প্রতি এ মহা নিয়ামত অনুগ্রহ স্বরূপ দান করেছেন। অতএব পাঠকের উচিত এ কুরআনকে যথাযথভাবে মুখস্থ করা এবং নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৮৯]

٢٠٨٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ مَا لِاَحَدِهِمْ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّىَ وَاسْتَذْكِرُوْا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ بِعُقُلِهَا)

২০৮৪. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারো এরূপ বলা কি জঘন্য কথা যে, "আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি"; বরং সে যেন বলে "তাকে ভুলানো হয়েছে।" তোমরা পুনঃপুন কুরআন স্মরণ করবে। কেননা তা মানুষের অন্তর হতে চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর। –[বুখারী ও মুসলিম; কিন্তু মুসলিম বৃদ্ধি করে বলেছেন, রশিতে বাঁধা চতুষ্পদ জন্তু।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি।' এ কথা বলা বিশুদ্ধ নয়; বরং বলতে হবে 'আমাকে ভুলানো হয়েছে।' যেমন اَلصَّحِيْحَيْنِ -এর মধ্যে আছে– لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَذَا بَلْ هُوَ نُسِّىَ

ইমাম নববী (র.) বলেন, এরূপ বলা মাকরূহ; বরং বলবে– اُنْسِيْتُهَا 'আমাকে ভুলানো হয়েছে।' হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন–

لَا تَقُوْلُ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَذَا لِاَنَّهٗ لَمْ يَنْسَ اَىْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ فِعْلٌ فِى النِّسْيَانِ بِوَجْهٍ مُطْلَقًا الخ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيْحٍ بِاِطْلَاقِهٖ .

ইমাম তীবী (র.) বলেন, بَلْ نُسِّيَ কথাটি তার মুখস্থ শক্তির দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে; কেননা আল্লাহ কোনো কিছু ভুলিয়ে নেন কোনো কল্যাণের কারণে। যেমন আল্লাহর বাণী– مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا الخ অন্য এক ব্যাখ্যাকার বলেন, এ কথাটি রাসূলের মুখের সাথে নির্দিষ্ট হতে পারে। –[মিরকাত]

٢٠٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৮৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– স্মৃতিতে কুরআনের রক্ষকদের উদাহরণ হচ্ছে রশিতে বাঁধা উট রক্ষকের ন্যায়– যদি উটের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখে তবে তাকে আবদ্ধ রাখতে পারে, আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে সে পালিয়ে যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

শব্দার্থ : صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ - হাফেজে কুরআন। اَلْمُعَقَّلَةُ - রশিতে আবদ্ধ। عَاهَدَ - রক্ষণাবেক্ষণ করে, লক্ষ্য রাখে। اَمْسَكَهَا - বেঁধে রাখতে পারে।

٢٠٨٦ - وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৮৬. অনুবাদ : হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কুরআন পড় যতক্ষণ তোমাদের মন তা সানন্দে চায়, আর যখন মনের ভাব অন্যরূপ দেখ, তবে তা ছেড়ে উঠে যাও। –[বুখারী ও মুসলিম]

٢٠٨٧ - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২০৮৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কাতাদা (র.) বলেন, একদা হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, নবী করীম ﷺ -এর কুরআন পঠন কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তা ছিল টানা টানা। অতঃপর হযরত আনাস (রা.) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লেন: 'বিসমিল্লাহ'তে, টানলেন, 'রাহমানি'তে টানলেন এবং 'রাহীম'তেও টানলেন। –[বুখারী]

٢٠٨٨ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা কান পেতে শুনেন না কোনো কথাকে, যতটা না কান পেতে শুনেন কোনো নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আল্লাহর কান পেতে শুনা'– অর্থাৎ পছন্দ করা। 'সুর করে পড়া'– অর্থাৎ তাজবীদের নিয়মানুযায়ী খুব সুন্দর করে পড়া, যাতে মানুষের অন্তর বিগলিত হয় এবং এতে আল্লাহভীতি সঞ্চার হয়। আর এটা হলো আরবদের স্বাভাবিক সুরে পড়া এবং যেখানে জিজ্ঞাসা আছে, সেখানে জিজ্ঞাসার স্বরে, যেখানে আদশ বা নিষেধ আছে, সেখানে

আদেশ বা নিষেধের স্বরে এবং যেখানে ধমক আছে, সেখানে ধমকের স্বরে পড়া। বাজনার তালের সাথে মিল করে পড়া কুরআনকে বিগড়ানোরই নামান্তর। আজকাল কোনো কোনো লোক এভাবে পড়তে শুরু করেছে। মিসরীরাই এ ব্যাপারে অগ্রগামী। আমাদের দেশের লোকেরা– জিজ্ঞাসা, আদেশ-নিষেধ বা ধমকের স্বরের মধ্যে কোনোই পার্থক্য করে না। সকল স্থানেই একটানা সমানভাবে পড়ে যায়। এ উভয় দিকই দূষণীয় এবং বর্জনীয়।

وَعَنْهُ ٢٠٨٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো স্বরকে, যতটা না পছন্দ করেন কোনো নবীর মধুর স্বরে উচ্চৈঃস্বরে [সরবে] কুরআন পড়াকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٢٠٩٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২০৯০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সে আমাদের দলের নয়, যে সুর করে কুরআন পড়ে না [অথবা কুরআন পেয়ে অপর সব হতে বিমুখ হয় না]। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوْضِيْحُ قَوْلِهِ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ : অত্র হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় ফাতহুল বারী গ্রন্থকার (র.) সাতটি মত ব্যক্ত করেন যা নিম্নরূপ–

১. لَمْ يُحَسِّنْ صَوْتَهُ بِهِ - কুরআন উত্তম আওয়াজে পড়ে না।

২. اَوْ لَمْ يَجْهَرْ - অথবা উচ্চৈঃস্বরে পড়ে না।

৩. اَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ - অথবা কুরআন পেয়ে অন্য সব কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

৪. اَوْ لَمْ يَتَرَنَّمْ - অথবা সুর করে পড়ে না।

৫. اَوْ لَمْ يَتَحَزَّنْ - অথবা চিন্তিত হয় না।

৬. اَوْ لَمْ يَطْلُبْ بِهِ غِنَى النَّفْسِ - অথবা কুরআন দ্বারা আত্মার অমুখাপেক্ষিতা চায় না।

৭. اَوْ لَمْ يَرْجُ بِهِ غِنَىَّ الْيَدِ - অথবা এর দ্বারা প্রশস্ততার আশা করে না। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৯৩]

وَعَنْ ٢٠٩١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৯১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে অধিষ্ঠিত অবস্থায় আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পড় [আমি শুনব]। আমি বললাম, হুজুর! আপনার সামনে আমি কুরআন পড়ব, অথচ এ কুরআন আপনার উপরই নাজিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এটা অন্যের মুখে শুনতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম। যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম, "তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনারকে এদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব"–তখন তিনি বললেন, এবার বন্ধ কর! এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ অত্র আয়াত শুনামাত্রই তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। এটা উম্মতের প্রতি দয়াবশতও হতে পারে অথবা মহান আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশের কারণেও হতে পারে।

ইমাম নববী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআন পড়ার সময় অনেক মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেত আর অনেকে মৃত্যুবরণও করত। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৯৫]

وَعَنْ ٢٠٩٢ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ اَللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৯২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে বললেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাতে। হযরত উবাই জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর! আল্লাহ কি আপনাকে আমার নাম করে বলেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এতে তাঁর দুই চক্ষু হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। অপর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার নিকট 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ' সূরা পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন হযরত উবাই বললেন, আল্লাহ আমার নাম নিয়েছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এতে হযরত উবাই কেঁদে ফেললেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوْضِيْحُ قَوْلِهِ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন হযরত উবাইকে কুরআন পাঠ করে শুনান। এটা শুনে হযরত উবাই জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা কি আমার নাম নিয়েছেন? জবাবে হ্যাঁ বললে তিনি আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলেন অথবা, আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে নিজের অক্ষমতার ভয়ে কেঁদে উঠেন। আর হযরত উবাইয়ের এ শান হবার কারণ হলো, তিনি কুরআন বিশুদ্ধ রূপে পড়া এবং হেফজকরণে অধিক চেষ্টা-সাধনা করেন। আর সূরা لَمْ يَكُنْ الخ পড়ে শুনাতে এজন্য বলেছেন যে, এতে আহলে কিতাবদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, আর তিনি ছিলেন ইহুদিদের পাদ্রি। যাতে তিনি এর মাধ্যমে তাদের অবস্থা অবহিত হতে পারেন।

–[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৬৯৫]

وَعَنْ ٢٠٩٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا تُسَافِرُوْا بِالْقُرْاٰنِ فَاِنِّيْ لَا اٰمَنُ اَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ .

২০৯৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করো না। কেননা এটা শত্রুর হাতে পড়ে যাবার সম্পর্কে আমি নিরাপদ মনে করি না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ শত্রুভূমিতে লিখিত কুরআন নিয়ে সফর কতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ হলো–

* নবী করীম ﷺ -এর কুরআন সকল সাহাবীর নিকট ছড়ানো-ছিটানোভাবে সংরক্ষিত ছিল। আর শত্রুভূমিতে অংশবিশেষ হারিয়ে গেলে লিখিত এ অংশটুকু বিনষ্ট হয়ে যাবে। অথচ তখন কুরআন একসাথে সন্নিবেশিত ছিল না।

* ইমাম তীবী (র.) বলেন, এখানে কুরআন দ্বারা রাসূলের যুগে যা লিখিত হয়েছে তা উদ্দেশ্য হতে পারে, অথবা পরবর্তী সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে রাসূল ﷺ এ কথা বলেছেন। কিছু সংখ্যক বলেন, শত্রুদেশে কুরআন বহন করা মাকরূহ।

-[মিরকাত- খ. ৪, পৃ. ৬৯৬]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٩٤ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْىِ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا كُنَّا نَسْتَمِعُ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ اُمِرْتُ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهٖ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهٗ فَقَالَ اَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذٰلِكَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২০৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একদিন আমি দরিদ্র মুহাজিরদের এক দলে বসলাম, তখন তারা একে অন্যের সাথে লেগে বসেছিল নিজের নগ্নতা ঢাকবার উদ্দেশ্যে। এ সময় একজন পাঠক আমাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করছিল, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে পৌঁছলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন, পাঠক চুপ হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের সালাম করলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি করছিলে? তখন আমরা বললাম, আমরা আল্লাহর কিতাব শুনছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাথে আমার নিজেকে শামিল রাখার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে বসে গেলেন যাতে তিনি নিজেকে আমাদের সাথে শামিল করে নেন। অতঃপর আপন হাতের দ্বারা ইশারা করলেন যে, তোমরা বৃত্তাকার হয়ে বস। [রাবী বলেন,] তারা বৃত্তাকার হয়ে বসলেন এবং তাদের চেহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ দিকে হয়ে গেল। এ সময় তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমরা হে গরিব মুহাজির দল, - পূর্ণ নূরের [জ্যোতির] কিয়ামতের দিনে; তোমরা ধনীদের অর্ধ দিন পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর তা হলো পাঁচশত বছর। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : عِصَابَةٌ - দল। ضُعَفَاءُ - দরিদ্র, অসহায়। يَسْتَتِرُ - ঢাকছে। اَلْعُرْى - নগ্নতা। تَصْنَعُوْنَ - তোমার করছ। اَنْ اَصْبِرَ مَعَهُمْ - তাদের সাথে একত্র হওয়া। وَسْطَنَا - আমাদের মধ্যস্থলে। لِيَعْدِلَ - যাতে মিলিয়ে নিতে পারেন। تَحَلَّقُوْا - তোমরা বৃত্তাকারে বস। بَرَزَتْ - প্রকাশিত হলো। صَعَالِيْك - দরিদ্র দল।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** সেসব দরিদ্র সাহাবীগণের সাথে রাসূল ﷺ -কে বসার নির্দেশ দেওয়া হয়, যারা কুরআন শ্রবণে মত্ত। যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ এটা তাদের কাজের শুকরিয়া স্বরূপ এবং কাফেরদের কথার জবাব স্বরূপ। যে রকম তারা বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি এ দরিদ্রদেরকে আপনার দরবার হতে দূরে সরিয়ে দিন যাতে আমরা আপনার সাথে বসতে পারি এবং ঈমান আনয়ন করতে পারি আর দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের অর্ধদিন তথা পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কেননা কিয়ামতের দিবস হবে এক হাজার বছরের সমান। যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৬৯৯]

وَعَنْ ٢٠٩٥ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

২০৯৫. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের [সুমধুর] স্বর দ্বারা কুরআনকে সুন্দর কর। –[আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারতীল, তাজবীদ, কোমল আওয়াজ এবং চিন্তা-গবেষণার দ্বারা সুন্দর কর। গানের সুরে অক্ষর কমবেশি করা নয়, এটা হারাম। এতে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ে পাপী হবে। একে প্রত্যাখ্যান করা একান্ত আবশ্যক, কেননা এটা নিকৃষ্ট বিদআত। তবে নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকিম উল্লিখিত হাদীসে এ অংশটি বর্ধিত করেন– فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْاٰنَ حُسْنًا ইমাম তাবারানী (র.) বর্ণনা করেন যে, حُسْنُ الصَّوْتِ زِيْنَةُ الْقُرْاٰنِ ; আবদুর রাযযাক (র.) বলেন– لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وحلية القران الصوت الحسن এতে বুঝা যায়, বিশুদ্ধতার সাথে সুন্দর আওয়াজে পড়াও উত্তম। –[মেরকাত]

একটি ঘটনা : কুতুবে রাব্বানী হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) তাঁর اَلْغُنْيَةُ الَّذِىْ لِلسَّالِكِيْنَ فِيْهِ الْمُنْيَةُ নামক কিতাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা কুফার এক অঞ্চলের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। আর তার পার্শ্বে একটি গৃহে কিছু সংখ্যক পাপী একত্র হয়ে মদ পান করছে, আর তাদের সাথে "زَاذَانُ" [যাযান] নামক এক গায়ক কাঠের সাহায্যে বাজনা বাজিয়ে সুন্দর সুরে গান করছে। তিনি এটা শুনে বলে উঠলেন–

مَا اَحْسَنَ هٰذَا الصَّوْتِ لَوْ كَانَ بِقِرَاءَةِ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَانَ اَحْسَنَ .

অর্থাৎ "এটা কতইনা সুন্দর সুর যদি তা আল্লাহর কিতাব পড়ায় হতো, তবে কতইনা উত্তম হতো।" এটা বলে তিনি মাথায় চাদর দিয়ে চলে গেলেন। যাযান হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর এ কথা শুনে অত্যন্ত ভীত-কম্পিত হয়ে পড়ল। অবশেষে সে কাঠের বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে গলায় গামছা বেঁধে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর সম্মুখে গিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন ফলে উভয়ে কাঁদতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তাকে কেন ভালোবাসব না যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। অবশেষ সে খাঁটি তওবা করে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর সংস্পর্শে থাকতে লাগল। তাঁর থেকে কুরআন শিখলেন এবং বিশাল জ্ঞানভাণ্ডরের অধিকারী হলেন। এমনকি ইলমের একজন ইমামে পরিণত হলেন।

–[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৭০০]

وَعَنْ ٢٠٩٦ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اِمْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَجْذَمَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

২০৯৬. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে গেছে, কিয়ামতের দিন সে অঙ্গহীনরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। –[আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِالنِّسْيَانِ ভুলে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য : ভুলে যাওয়া দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে–

১. হানাফীদের মতে, দেখে পড়া ভুলে যাওয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এখানে হেফজ ভুলে যাওয়া উদ্দেশ্য।

৩. অথবা, সে কুরআন তেলাওয়াত করা ছেড়ে দিয়েছে। ফলে সে ভুলে গেছে, কিংবা ভুলে যায়নি। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৭০০]

اَلْمُرَادُ بِاَجْذَمَ হাদীসে উল্লিখিত اَجْزَمْ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَجْزَمْ অর্থ– অঙ্গহীন। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামতসমূহ নিম্নরূপ–

১. দাঁতবিহীন ২. অথবা অঙ্গহীন অবস্থায় ৩. অথবা হাতবিহীন ৪. অথবা ভুলে যাবার কারণে কোনো কিছুই ধরে রাখার জন্য পাবে না। ৫. অথবা মহান প্রভুর কালাম ভুলে যাবার লজ্জায় নিজের চেহারাকে পশ্চাত দিকে ফিরেয়ে রাখবে ৬. ইমাম তীবী (র.) বলেন, হাত কাটাকে جَذْم বলে। ৭. কারো মতে, অঙ্গ কর্তিত হয়ে উঠবে ৮. কেউ বলেন, দলিল-প্রমাণবিহীন তথা তার জন্য কোনো প্রমাণ থাকবে না এবং তার জিহ্বাও থাকবে না যে, কথা বলবে, ৯. কারো মতে, মঙ্গল বা কল্যাণশূন্য হাতে উঠবে। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৭০১]

وَعَنْ ٢٠٩٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلِّ مِنْ ثَلٰثٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

২০৯৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে সে কুরআন বুঝেনি। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করলে দ্রুত পড়ার কারণে চিন্তা-গবেষণা করতে পারেনি, বিধায় কুরআন বুঝতে সক্ষম হয়নি।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, কুরআনের জাহেরী অর্থ অনুধাবন করবে না, আর সূক্ষ্ম অর্থ বুঝার তো প্রশ্নই আসে না। আর এখানে না বুঝার অর্থ এই নয় যে, সে ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৭০১]

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম সাধারণত তিন দিনে কুরআন খতম করতেন। এর কমে সমাপ্ত করাকে অপছন্দ করতেন।

ইমাম নববী (র.) বলেন, اَلسَّيِّدُ الْجَلِيْلُ ابْنُ كَاتِبِ الصُّوْفِىْ দিনে চার খতম এবং রাতে চার খতম দিতেন। আর اَلشَّيْخُ مُوْسٰى السَّدْرَانِىْ দিনে ও রাতে ৭০ হাজার খতম দিতেন। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। [আল্লাহই ভালো জানেন]

আর অন্য দল এমনও ছিল, যারা এক দিনে ও রাতে কুরআন খতম করতেন, কেউ কেউ দুই খতম পড়তেন, আবার কেউ তিন খতমও পড়তেন। এ রকম অসংখ্য বুজুর্গ ছিলেন যারা এক রাকাতে এক খতম কুরআন পড়তেন। কেউ কেউ তিন খতম পর্যন্ত পড়তেন।

* একদল প্রতি দুই মাসে এক খতম করতেন।

* আরেক দল প্রতি মাসে এক খতম করতেন।

* কেউ কেউ প্রতি দশ দিনে এক খতম করতেন।

* আর অন্যরা প্রতি সাত দিনে, তবে অধিকাংশ সাহাবী ও ইমামদের অভিমত এই শেষটিই। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৭০১]

وَعَنْ ٢٠٩٨ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২০৯৮. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠক প্রকাশ্যে দানকারীর ন্যায়, আর চুপে কুরআন পাঠক চুপে দানকারীর ন্যায়। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী। তিরমিযী বলে, হাদীসটি হাসান গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** ইমাম তীবী (র.) বলেন, প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয়ভাবে পড়ার ফজিলত সম্পর্কে পৃথক পৃথক হাদীস রয়েছে। উভয়ের মাধ্যকার সমাধান হলো–

কোনো ব্যক্তি যদি স্বরবে পড়লে লোক দেখানোর ভয় করে তবে তার জন্য নীরবে পড়া উত্তম। আর গোপনে পড়লে লোক দেখানোর আশঙ্কা করলে প্রকাশ্যে পড়বে।

তবে স্বরবে পড়ার মাধ্যমে কোনো নামাজি, ঘুমন্ত বা অন্য কাউকে কষ্ট দিতে পারবে না। আর স্বরবে পড়ার মাধ্যমে যদি এ নিয়ত থাকে যে, অন্য কাউকে শুনানো, শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে উপকার প্রদান করবে তবে এটা উত্তম হবে। কেননা এটা হলো দীনের নিদর্শন। আর এটা পাঠকের অন্তর জাগ্রত করে চিন্তাশক্তি একত্র করে, ঘুম দূরীভূত করে এবং অন্যকে ইবাদতে উৎসাহ যোগায়। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٠٩٩ صُهَيْبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ)

২০৯৯. অনুবাদ : হযরত সুহাইব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকে হালাল মনে করেছে, সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। –[তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এর সনদ সবল নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কুরআনের কোনো একটি বিধান অমান্য করা চলবে না। ইমাম তীবী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ যেসব বিষয়াবলি হারাম করেছেন, তার কোনো একটি হালাল মনে করলে সে স্বাভাবিকভাবে কাফের হয়ে যাবে। তবে এখানে মহত্ত্বের কারণে কুরআনকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অথবা এর হুকুম অকাট্য হবার কারণে। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢١٠٠ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

২১০০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত লাইছ ইবনে সা'দ (র.) [তাবেয়ী] ইবনে আবী মুলাইকা (র.) হতে, তিনি [তাবেয়ী] ইয়া'লা ইবনে মামলাক (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, ইয়া'লা একদা হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে নবী করীম ﷺ-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি এটা প্রকাশ করছেন প্রতিটি অক্ষর পৃথক করে।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মহানবী ﷺ পবিত্র কুরআন এমনভাবে পড়তেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর পড়ার কালিমাগুলো গণনা করতে পারত, অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত ধীরস্থিরতার সাথে পড়তেন।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর আলোচ্য হাদীসাংশ দুটি সম্ভাবনা রাখে– হয়তো বা তিনি নবী করীম ﷺ-এর পড়ার ধরন বর্ণনা করেছেন, অথবা নিজে পড়ে শুনিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ এভাবে পড়তেন। -[মাযাহেরে হক- খ. ৩, পৃ. ৬৩]

وَعَنْ ٢١٠١ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَقَالَ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ اللَّيْثَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلٰى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ اَصَحُّ .

২১০১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) [তাবেয়ী] ইবনে আবূ মুলাইকা (র.) হতে, তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাক্যে পূর্ণ ছেদ দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', অতঃপর বিরতি দিতেন। তৎপর বলতেন, 'আররাহমানির রাহীম', অতঃপর বিরতি দিতেন। -[তিরমিযী] তিনি বলেছেন যে, এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা [উপরের হাদীসে] লাইছ একে ইবনে আবি মুলাইকা (র.) হতে এবং তিনি ইয়া'লা ইবনে মামলাক (র.) হতে, আর ইয়া'লা হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। [অথচ এখানে ইয়া'লার উল্লেখ নেই।] সুতরাং উপরের লাইছের বর্ণনাটিই অধিকতর বিশ্বস্ত। [যাতে পূর্ণ ছেদ কথা নেই।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কিছু সংখ্যক আলেমের মতে অত্র হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণও একে গ্রহণ করেননি। কেননা وَقْفٌ تَامٌّ হলো مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর উপর। এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) এ বিষয়ে হযরত লাইছ (রা.)-এর হাদীসকে অধিক বিশুদ্ধ বলেছেন।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে এরূপ যেসব আয়াতের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো وَصْل বা মিলিয়ে পড়া উত্তম। তবে ইমাম জাযরী (র.)-এর মতে মোস্তাহাব। তাঁর দলিল হলো অত্র হাদীস। অন্যান্য শাফেয়ীদেরও এটাই অভিমত। আর জমহুরের পক্ষ হতে অত্র হাদীসের জবাব হলো, নবী করীম ﷺ শ্রোতাদেরকে এ কথা বুঝাবার জন্য ওয়াকফ করেছেন যে, আয়াতের শুরু কোথায়। -[মাযাহের হক- খ. ৩, পৃ. ৬৪]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١٠٢ جَابِرٍ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِىُّ وَالْعَجَمِىُّ فَقَالَ اِقْرَءُوْا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِئُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَهُ وَلَا يَتَاَجَّلُوْنَهُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২১০২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট পৌঁছলেন, তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মধ্যে আরবও ছিল এবং অনারবও ছিল [যারা ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছিল না, তবু] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পড়তে থাক, প্রত্যেকটিই ভালো। শীঘ্রই এমন কিছু সম্প্রদায় আসবে যারা কুরআনের পাঠ ঠিক করবে, যেভাবে তীর ঠিক করা হয়। তারা [দুনিয়াতেই] খুব দ্রুতই এর ফল চাইবে এবং আখিরাতের অপেক্ষা করবে না। -[আবূ দাউদ; আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلَهُ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِيُّ وَالْعَجَمِيُّ -এর ব্যাখ্যা : ইমাম তীবী (র.) বলেন, اَلْاَعْرَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব আরব যারা গ্রামে বসবাস করে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তারা শহরে আসে না। আর عَجَمٌ দ্বারা আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশের লোকেরা যেমন– হযরত সালমান ফারসী, সুহাইব ও বেলাল (রা.) প্রমুখ।

ইমাম তীবী (র.) আরো বলেন, এখানে মোট দুই দল হতে পারে– একদল হলো গ্রাম্য আরব ও আজমীগণ আর অপর দল হলো আরবের শহুরে বাসিন্দা রাসূলের সাথীবর্গ। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৭০৫]

قَوْلَهُ كَمَا يُقَامُ الْقَدَحُ -এর ব্যাখ্যা : তীর ঠিক করার অর্থ হলো পরবর্তী যুগে এমন কিছু লোক আসবে যারা লোক শুনানো, লোক দেখানো এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে কেরাতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো লক্ষ্য থাকবে না। ফলে তারা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেবে। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৭০৫]

وَعَنْ ٢١٠٣ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَاَصْوَاتِهَا وَاِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَسَيَجِئُ بَعْدِىْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَانُهُمْ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَرَزِيْنٌ فِىْ كِتَابِهٖ)

২১০৩. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কুরআন পড় আরবদের স্বরে এবং [আহলে এশক] প্রেমিক ও আহলে কিতাবদের স্বর হতে দূরে থাক। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআন পাঠে গান ও বিলাপের সুর ধরবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না [এবং অন্তরে প্রবেশ করবে না]। তাদের অন্তর হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত এবং অনুরূপভাবে তাদের অন্তরও যারা তাদের পদ্ধতিকে পছন্দ করবে। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে এবং রযীন তাঁর কিতাবে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : لُحُوْنٌ - স্বর বা সুরসমূহ। اَهْلُ الْعِشْقِ তথা اَهْلُ الْفِسْقِ অর্থ– পাপীগণ। اَلْكِتَابَيْنِ - ইহুদি ও নাসারা। تَرْجِيْعٌ - সুর করে পড়া বা স্বরকে উঁচু করা। اَلْغِنَاءُ - গান। اَلنَّوْحُ - বিলাপের সুর। حَنَاجِرُ অর্থ– কণ্ঠনালী। مَفْتُوْنَةٌ - মোহগ্রস্ত। يُعْجِبُ - আনন্দিত বা খুশি হয়।

لُحُوْنُ الْعَرَبِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আরবদের স্বর বলতে এটা বুঝানো হয়েছে যে, কোনো রূপ রং ঢং করে মুখ বাঁকা করে কিংবা স্বর উঠানামা করে না পড়া। –[মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ৬৫]

اَهْلُ الْعِشْقِ وَالْكِتَابَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَهْلُ الْعِشْقِ বলতে প্রেমিক ও গায়কগণ উদ্দেশ্য যারা গান-গজল, কবিতা সুর করে গুন গুনিয়ে গেয়ে থাকে। এমনিভাবে ইহুদি নাসারারাও তাদের কিতাবকে এরূপ পদ্ধতিতে পড়ত। রাসূল ﷺ তাদের পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা অন্য হাদীসে এসেছে– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ –[মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ৬৫]

لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ -এর বিশ্লেষণ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের এ তেলাওয়াত গৃহীত না হওয়া, প্রত্যাখ্যাত হওয়া। ইমাম তীবী (র.) বলেন, তার এ পাঠ আকাশে উঠবে না এবং আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন না। আর তাদের অন্তরেও প্রবেশ করবে না যে, যাতে তারা এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারে। –[মিরকাত– খ. ৩, পৃ. ৭০৬]

وَعَنْ ٢١٠٤ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَسِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْاٰنَ حَسَنًا . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২১০৪. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের স্বরের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুমধুর স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। -[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীসে সৌন্দর্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- তারতীল, নরম ও চিন্তিত মনে সুন্দর করে পড়ার কথা বলা হয়েছে। -[মিরকাত- খ. ৩, পৃ.৭০৭]

وَعَنْ ٢١٠٥ طَاؤُسٍ مُرْسَلًا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ النَّاسِ اَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْاٰنِ وَاَحْسَنُ قِرَاءَةً قَالَ مَنْ اِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ اَرَيْتَ اَنَّهُ يَخْشَى اللّٰهَ قَالَ طَاؤُسٌ وَكَانَ طَلْقٌ كَذٰلِكَ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

২১০৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত তাঊস [ইয়ামানী] (র.) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো হুজুর! কুরআনে স্বর প্রয়োগ ও ভালো তেলাওয়াতের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল ﷺ বললেন, যার কুরআন পাঠ শুনে তোমার কাছে মনে হয় যে, সে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করছে। তাঊস বলেন, [তাবেয়ী] তালক এরূপই ছিলেন। -[দারেমী]

وَعَنْ ٢١٠٦ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ (رض) وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَافْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَا تَعْجَلُوْا ثَوَابَهٗ فَاِنَّ لَهٗ ثَوَابًا . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২১০৬. অনুবাদ : হযরত উবায়দা মুলাইকী (রা.) বলেন, আর তিনি ছিলেন হুজুরের সহচর- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে কুরআনধারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানাবে না; বরং তেলাওয়াত করার মতো তা তেলাওয়াত করবে- রাত ও দিনে এবং একে প্রকাশ করবে ও সুর করে পড়বে; অধিকন্তু তাতে যা আছে সেসব [বিষয়বস্তু] সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং শীঘ্র শীঘ্র [দুনিয়ায়] এর প্রতিফল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবে না। কেননা [আখিরাতে] এর [উত্তম] প্রতিফল রয়েছে। -[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : لَا تَتَوَسَّدُوْا - তোমরা বালিশ বানাবে না। اٰنَاءَ اللَّيْلِ - রাতের অংশে। اَفْشُوْا - তোমরা প্রকাশ কর। تَغَنَّوْا - তোমরা সুর করে পড়। تَدَبَّرُوْا - চিন্তা-গবেষণা কর। وَلَا تَعْجَلُوْا - তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

قَوْلُهٗ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ **-এর ব্যাখ্যা :** ইমাম তীবী (র.)-এর মতে অত্র হাদীসাংশের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে-

১. এর দ্বারা অলসতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তথা তোমরা কুরআনকে বালিশের মতো করে ঘুমিয়ে পড়ো না; বরং রাত ও দিনে এটা তেলাওয়াতে রত থাকবে। যেমনটা পূর্ব হাদীসে এসেছে- فَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ

২. দ্বিতীয়টি হলো, কুরআনের অর্থে চিন্তা-গবেষণা করা এবং এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে অমনোযোগী না হওয়া এবং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা এবং তাতে ঐকান্তিক হওয়া হতে অলসতা করো না। -[মিরকাত- খ. ৩, পৃ. ৭০৮]

حُكْمُ تَوْسِيْدِ الْقُرْاٰنِ কুরআনকে বালিশ বানানোর হুকুম : হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী (র.) বলেন, কুরআনকে বালিশ বানানো, তাঁর উপর টেক দেওয়া, তাঁর দিকে পা মেলে বসা, তাঁর উপর কোনো কিছু রাখা, তাঁকে পেছনে রেখে বসা, পা দিয়ে সরানো, নিক্ষেপ করা, এর শব্দকে تَصْغِيْر তথা হেয় প্রতিপন্ন করা সবই হারাম, তবে চুম্বন করা জায়েজ। আর এর দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা মাকরূহ। কিছু সংখ্যক মালেকীর মতে এটাও হারাম। -[মিরকাত ও মাযাহের হক]

تَوْضِيْحُ قَوْلِهٖ وَافْشُوْهُ-এর বিশ্লেষণ : 'কুরআনকে প্রকাশ কর' এর মর্মার্থ হলো, কুরআন সুউচ্চ স্বরে পড় যাতে অন্যরা শুনে তা পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কুরআন অন্যকে শিক্ষা দাও, কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন কর। কুরআন লিখ এবং তা জনগণের মাঝে প্রসারিত করার জন্য চেষ্টা-সাধনা কর। -[মাযাহেরে হক- খ. ৩, পৃ. ৬৬]

بَابٌ

পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন পাঠে কুরআন পঠন ও সংকলন প্রসঙ্গ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

২১০৭ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَأَنِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهٗ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهٗ بِرِدَائِهٖ فَجِئْتُ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْهُ اِقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهٗ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِيْ اِقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

২১০৭. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি হেশাম ইবনে হাকীম ইবনে হেযামকে সূরা 'ফুরকান' পড়তে শুনলাম আমি যেভাবে তা পড়ি তা হতে ভিন্নতররূপে, অথচ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তা পড়িয়েছেন। অতএব, আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম; কিন্তু [তখন সে নামাজ পড়ছিল। তাই] নামাজ শেষ করা পর্যন্ত তাকে সময় দিলাম। অতঃপর আমি তাকে তার চাদর গলায় পেঁচিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেরূপে আমাকে পড়িয়েছেন, তা হতে ভিন্নতররূপে আমি একে সূরা 'ফুরকান' পড়তে শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং হেশামকে বললেন, হেশাম, তুমি তা পড় তো দেখি! সে সেরূপই পড়ল আমি তাকে যেরূপ পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপেও এটা নাজিল হয়েছে। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি পড় দেখি! সুতরাং আমিও পড়লাম। শুনে তিনি বললেন, এটা এরূপেও নাজিল হয়েছে। বস্তুত এ কুরআন সাত রীতিতে নাজিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের [যার জন্য] যা সহজ হয় তাই পড়বে। -[বুখারী ও মুসলিম; কিন্তু শব্দ মুসলিমের।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : فَكِدْتُ - আমি নিকটবর্তী হলাম। اَعْجَلُ - আক্রমণ করব। اَمْهَلْتُ - আমি ছেড়ে দিলাম। لَبَّبْتُ - আমি বক্ষ পেঁচিয়ে ধরলাম। اَرْسِلْهُ - তুমি তাকে ছেড়ে দাও। سَبْعَةُ اَحْرُفٍ - সাত কেরাতে।

قَوْلُهُ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ -এর ব্যাখ্যা : বর্ণিত আছে যে, প্রথম অবস্থায় কুরআন কুরাইশদের ভাষা অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর যখন এটা অন্যান্যদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ল, তখন আরবের বিখ্যাত সাত গোত্রের ভাষায় পড়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। কোনো কোনো আলেম অত্র হাদীসকে مُتَشَابِهَاتُ -এর মধ্যে গণ্য করেন। আর এ সাত হরফ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ বিষয়ে চল্লিশটির মতো মতামত রয়েছে। এখানে মেরকাত প্রণেতা যে সাতটি মত বর্ণনা করেছেন তা উল্লিখিত হয়েছে–

১. অক্ষরের কমবেশি। যেমন– وَسَارِعُوْا এবং وَنَنْشُزُهَا যথাক্রমে سَارِعُوْا ও نُنْشِزُهَا
২. একবচন বা বহুবচন। যথা– كِتَابِهٖ বা كُتُبِهٖ
৩. مُذَكَّرٌ বা مُؤَنَّثٌ হিসেবে। যথা– يَكُنْ বা تَكُنْ
৪. تَخْفِيْف বা تَشْدِيْد হিসেবে। যথা– يُكَذِّبُوْنَ বা يَكْذِبُوْنَ
৫. فَتْح বা كَسْرَهْ হিসেবে। যথা– يَقْنِطُ - يَقْنَطُ
৬. اِعْرَابٌ হিসেবে। যেমন– ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ এখানে دَالْ অক্ষরে পেশ বা যের দিয়ে।
৭. অক্ষরের বিভিন্নতায়। যথা– لٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ এখানে لٰكِنَّ বা لٰكِنْ পড়া যায়।
৮. لُغَاتٌ -এর বিভিন্নতায়। যেমন– تَفْخِيْم ও اِمَالَهْ –[মিরকাত : খ. ৩, পৃ. ৭১০]

২১০৮ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلَافَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَلَا تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২১০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন পড়তে শুনলাম, অথচ নবী করীম ﷺ -কে এর বিপরীত পড়তে শুনেছি। সুতরাং আমি তাকে নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং তা অবহিত করলাম। তখন আমি তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব প্রত্যক্ষ করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের উভয়ই শুদ্ধ। সুতরাং তোমরা এ বিষয় নিয়ে মতভেদ করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো বিবাদ-বিসম্বাদের লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَلْكَرَاهِيَةُ - বিরক্তি বা অপছন্দনীয়তা। مُحْسِنٌ - সঠিক বা বিশুদ্ধ। فَلَا تَخْتَلِفُوْا - অতএব তোমরা মতভেদ কারো না।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উক্ত সাহাবীকে রাসূল ﷺ -এর নিকট নিয়ে এসেছেন এজন্য যে, তিনি তখনো এটা জানতেন না যে, কুরআন বিভিন্ন কেরাতে পড়া যায়। আর রাসূল ﷺ এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করেছেন যে, তারাও مُتَشَابِهْ বিষয় নিয়ে আহলে কিতাবদের মতো মতভেদ করছে অথচ সকল সাহাবীই বিশ্বস্ত।

আর ইবনুল মালেক (র.) বলেন, বিভিন্ন কেরাতে কুরআন পড়া বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতভেদ করার কারণে বিরক্ত হয়েছেন। কেননা কুরআনের কোনো এক কেরাতকে অস্বীকার করার অর্থ হলো কুরআনকেই অস্বীকার করা, যা জায়েজ নয়। –[মিরকাত– খ. ৩, পৃ. ৭০২]

২১০৯ وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّى فَقَرَأَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهٖ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلٰوةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ هٰذَا قَرَأَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِهٖ فَاَمَرَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَرَأَا فَحَسَّنَ شَانَهُمَا فَسَقَطَ فِىْ نَفْسِىْ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَلَا اِذْ كُنْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِيَنِىْ ضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى اللّٰهِ فَرَقًا فَقَالَ لِىْ يَا اُبَىُّ اُرْسِلَ اِلَىَّ اَنْ اَقْرَأِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ فَرَدَدْتُّ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِىْ فَرَدَّ اِلَىَّ الثَّانِيَةَ اِقْرَأْهُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُّ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِىْ فَرَدَّ اِلَىَّ الثَّالِثَةَ اِقْرَأْهُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيْهَا فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَىَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - (رواه مسلم)

২১০৯. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামাজ পড়তে শুরু করল। সে এমন এক কেরাতে কুরআন পড়ল যা আমার জানা ছিল না [ফলে অপছন্দ করলাম।] অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে প্রথম ব্যক্তি হতে ভিন্নতর পাঠে কেরাত পড়ল যখন আমরা নামাজ শেষ করলাম সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং আমি বললাম, হুজুর! এ ব্যক্তি এমন কেরাতে কুরআন পাঠ করেছে যা আমার জানা নেই। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে এর ভিন্নতর পাঠে কেরাত পড়ল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে পড়তে হুকুম করলেন, তারা উভয়ে কুরআন পড়ল আর তিনি উভয়ের পড়াকেই শুদ্ধ বললেন। এতে আমার মনে হুজুর ﷺ -এর প্রতি এমন এক সন্দেহের সৃষ্টি হলো যা জাহেলিয়াত যুগেও হয়নি। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যা [লজ্জা] আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা লক্ষ্য করলেন– আমার সিনার উপর হাত মারলেন। এতে আমি ঘামে ভেসে গেলাম এবং এতই ভীত হলাম যেন আমি আল্লাহকে দেখছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে উবাই! আমার নিকট ওহী পাঠানো হয়েছিল যে, কুরআন এক পাঠে [বা এক রীতিতে] পড়! কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট আরজ করলাম যে, আপনি আমার উম্মতের প্রতি সহজ করে দিন! আল্লাহ দ্বিতীয়বারে উত্তর দিলেন, তবে দুই রীতিতে পড়! আমি পুনরায় আরজ করলাম, আপনি আমার উম্মেতের প্রতি আরও সহজ করে দিন! তিনি তৃতীয়বারে আমাকে উত্তর করলেন, তবে সাত রীতিতে পড়! কিন্তু তোমার প্রত্যেক আরজের পরিবর্তেই যা তোমাকে আমি দিয়েছি, তা ছাড়াও এক একটি প্রার্থনার অধিকার রইল তা তুমি করতে পার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ, আপনি আমার উম্মতকে মাফ করে দিন! আল্লাহ, আপনি আমার উম্মতকে মাফ করে দিন। আর তৃতীয়টি আমি এমন দিনের জন্য পিছিয়ে রাখলাম, যেদিন সমগ্র সৃষ্টি আমার সুপরিশের দিকে চেয়ে থাকবে। এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ.)-ও। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَنْكَرْتُ - আমি অপছন্দ করলাম। سِوٰى - বিপরীত। فَحَسَّنَ شَانَهُمَا - তাদের উভয়ের পড়াকে শুদ্ধ বলেন। سَقَطَ - সৃষ্টি হলো। اَلتَّكْذِيْبُ - মিথ্যা সন্দেহ। غَشِيَنِىْ - আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। فَفِضْتُ عَرَقًا - আমি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়লাম। فَرَقًا - ভয় বা ভীতি। هَوِّنْ - অর্থ সহজ করুন। فَرَدَّ - তিনি জবাব দিলেন। كُلَّ دَفْعَةٍ - প্রত্যেক বারে। يَرْغَبُ - মুখাপেক্ষী হবে। اَلْخَلْقُ - সৃষ্টিজগৎ।

قَوْلُهُ فَسَقَطَ فِىْ نَفْسِىْ مِنَ التَّكْذِيْبِ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন কেরাতকে বিশুদ্ধ বলায় হযরত উবাই (রা.) -এর অন্তরে খটকা সৃষ্টি হয়। আর এর কারণ হলো, পবিত্র কুরআন হলো মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী, যা একই রকম হওয়া আবশ্যক, সাত কেরাতে যে পড়া অনুমোদিত আছে তা তাঁর জানা ছিল না। আর জাহিলি যুগেও তার এরূপ খটকা সৃষ্টি হয়নি। এর কারণ হলো, জাহিলি যুগে তো তাঁর ঈমানই ছিল না এবং আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। ফলে কোনো খটকাও আসতে পারে না। বস্তুত এটা শয়তানের খোচায়ই সৃষ্টি হয়েছে। মহান রাসূলের বরকতময় হাতের ছোঁয়ায় তা আল্লাহ দূর করেছেন। –[মিরকাত, মাযাহেরে হক]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত মারার কারণ : নবী করীম ﷺ কেন তার বক্ষে হাত রাখলেন এ বিষয়ে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ–

১. لِلتَّادِيْبِ ভদ্রতা বা নম্রতা শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে।
২. اَمَّا لِاِخْرَاجِ الْوَسْوَسَةِ بِبَرْكَةِ يَدِهٖ অথবা তাঁর হাতের স্পর্শে তার অন্তর হতে সংশয় নিরসনকল্পে।
৩. اَمَّا لِلتَّلَطُّفِ অথবা দয়া প্রদর্শনের লক্ষ্যে।
৪. اَمَّا لِاِرَادَةِ الْحِفْظِ অথবা বিষয়টি মুখস্থ রাখার ইচ্ছায়।
৫. اَوْ لِتَذْكُرُ الْقَضِيَّةَ وَعَدَمَ الْعَوْدِ اِلٰى مِثْلِهَا কিংবা উক্ত ঝগড়াটি স্মরণ রেখে অনুরূপ কর্মে যেন কখনো প্রত্যাবর্তিত না হয় তার জন্য। –[মিরকাত ৩য় খণ্ড, ৭১৬ পৃষ্ঠা]

قَوْلُهُ وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ -এর ব্যাখ্যা : আর তৃতীয় আবেদনটি আমি পিছিয়ে দিলাম। এ তৃতীয়টি হলো اَلشَّفْعَةُ الْكُبْرٰى অর্থাৎ বড় সুপারিশ যা কিয়ামতের দিবসে নবী করীম ﷺ -কে প্রদান করা হবে। এর দ্বারা তিনি সৃষ্টিজগতের মধ্য হতে যে কারো জন্য সুপরিশ করতে পারবেন। –[মিরকাত– খ. ৩, পৃ. ৭১৭]

٢١١٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَأَنِىْ جِبْرَئِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيْدُنِىْ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِىْ اَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْاَحْرُفَ اِنَّمَا هِىَ فِى الْاَمْرِ تَكُوْنُ وَاحِدًا لَا تَخْتَلِفُ فِىْ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১১০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে এক রীতিতে কুরআন পড়ালেন, আর আমি তাঁকে ফেরত পাঠালাম এবং আল্লাহর নিকট এর [সংখ্যা] বৃদ্ধিকরণ চাইতে লাগলাম। তিনি আমার জন্য এটা বৃদ্ধি করতে লাগলেন, অবশেষে তা সাত রীতিতে পৌঁছল। রাবী ইবনে শিহাব [যুহরী] (র.) বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমার নিকট এটা পৌঁছেছে যে, এ সাত রীতি অর্থের দিক দিয়ে একই; হালাল-হারামে বিভিন্ন হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : رَاجَعْتُهُ - আমি তাকে বারবার বললাম। اَسْتَزِيْدُهُ - আমি বৃদ্ধিকরণ চাইলাম।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত কেরাতের বিভিন্নতার দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কুরআনে উল্লিখিত বিভিন্ন বিধিবিধানের পরিবর্তন। অর্থাৎ এটা নয় যে, কুরআনের কোনো বিধান কোনো কেরাতে হালাল ছিল, আর অপর কেরাতে তা হারাম সাব্যস্ত হবে; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনের বিধিবিধান ঠিকই থাকবে– শুধু শব্দগত কিছুটা পরিবর্তন হবে। –[মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ৭০]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١١١ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ لَقِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ يَا جِبْرَئِيْلُ اِنِّىْ بُعِثْتُ اِلٰى اُمَّةٍ اُمِّيِّيْنَ مِنْهُمُ الْعَجُوْزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِىْ لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاوُدَ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا اِلَّا شَافٍ كَافٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِىِّ قَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ اَتَيَانِىْ فَقَعَدَ جِبْرَئِيْلُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَمِيْكَائِيْلُ عَنْ يَسَارِىْ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ مِيْكَائِيْلُ اِسْتَزِدْهُ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ .

২১১১. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করে বলেন, হে জিবরাঈল! আমি একটি নিরক্ষর উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, এদের মধ্যে রয়েছে প্রবীণা বৃদ্ধা ও প্রবীণ বৃদ্ধ, কিশোর ও কিশোরী এবং এমন ব্যক্তি যে কখনো কোনো লেখা পড়েনি। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! [ভয় নেই] কুরআন সাত রীতিতে নাজিল করা হলো। –[তিরমিযী] আহমদ ও আবূ দাউদের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, "এদের প্রত্যেক রীতিই [অন্তর রোগের জন্য] আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।"

কিন্তু নাসায়ীর এক বর্ণনায় এর বিস্তারিত বিবরণ এরূপ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) ও মীকাঈল (আ.) আমার নিকট আসলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার ডান দিকে ও হযরত মীকাঈল (আ.) আমার বাম দিকে বসলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি আমার নিকট হতে কুরআন এক রীতিতে পড়েন নি। তখন হযরত মীকাঈল (আ.) বললেন, আপনি তাঁর নিকট বৃদ্ধির আবেদন করুন। [আমি তা করলাম,] অবশেষে তা সাত পর্যন্ত পৌঁছল। সুতরাং এগুলোর প্রত্যেক রীতিই আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اُمِّيِّيْنَ - নিরক্ষর জাতি। اَلْعَجُوْزُ - বৃদ্ধা। اَلشَّيْخُ الْكَبِيْرُ - বৃদ্ধ। اَلْجَارِيَةُ - যুবতী। شَافٍ - রোগমুক্তকারী। كَافٍ - যথেষ্ট। اِسْتَزِدْهُ - বৃদ্ধি করে নিল।

قَوْلُهُ اِلٰى اُمَّةٍ اُمِّيِّيْنَ-এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে নিরক্ষর জাতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমাকে এমন জাতি-গোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে যাদের অধিকাংশই ভালো মতে পড়তে জানে না। আর যদি আমি তাদেরকে নির্দিষ্ট কোনো এক কেরাতে পড়তে বলি তবে তারা তাতে সক্ষম হবে না। কেননা তাদের মধ্যে বয়স্ক এবং অতি কম বয়স্ক নারী পুরুষ রয়েছে, কাজেই তাদের জন্য যা সহজসাধ্য হয় তাই আপনি ব্যবস্থা করে দিন। –[মাযাহের হক]

قَوْلُهُ اِلَّا شَافٍ كَافٍ-এর ব্যাখ্যা : شَافٍ রোগমুক্তি ও كَافٍ যথেষ্ট। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কুরআন না বুঝার যে রোগ রয়েছে তা হতে মুক্তি এবং উত্তমরূপে প্রকাশ করার যে অক্ষমতা তার জন্য যথেষ্ট।

কারো মতে, মু'মিনদের অন্তরের জন্য রোগমুক্তি, যাতে তারা অর্থের ব্যাপারে একমত হতে পারে। আর নবী করীম ﷺ -এর সত্যায়নে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনে যথেষ্ট হবে। –[মিরকাত : খ. ৩, পৃ. ৭২০]

وَعَنْ ٢١١٢ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) أَنَّهُ مَرَّ عَلٰى قَاصٍ يَقْرَأُ ثُمَّ يَسْأَلُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِئُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

২১১২. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি এক ওয়ায়েজ বা গল্পকথকের নিকট পৌঁছে দেখলেন, সে কুরআন পড়ছে আর মানুষের নিকট সওয়াল করছে। তিনি দুঃখে ইন্না লিল্লাহি পড়লেন, অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কুরআন পড়ে সে যেন এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট সওয়াল করে। শীঘ্রই এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআন পড়ে এর বিনিময়ে মানুষের নিকট সওয়াল করবে। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন গল্পকারকে কুরআন পাঠ করে অর্থ চাইতে দেখে ইন্না লিল্লাহ পড়েছেন। কেননা এটা হলো বিদাআত, পাপের বহিঃপ্রকাশ এবং কিয়ামতের আলামত। বস্তুত কুরআন পাঠের বিনিময় একমাত্র আল্লাহর নিকটই চাইবে; অন্য কারো নিকট নয়। চাই দুনিয়াবি হোক বা পরকালীন হোক।

অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রহমতের আয়াত আসলে আল্লাহর নিকট তা চাইবে, আর শাস্তির আয়াত আসলে তা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অথবা পাঠ শেষে দোয়ায়ে মাছূরা দ্বারা আল্লাহর কাছে পরকালীন বিষয়ে প্রার্থনা করা এবং মুসলমানদের ইহকালীন ও পরকালীন বিষয়ে সংশোধনের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা। –[মিরকাত– খ. ৩, পৃ. ৭২১]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١١٣ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২১১৩. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা আসলামী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে কুরআন পড়ে মানুষের নিকট খাবার চাইবে, কিয়ামতে সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় হাড় থাকবে, তবে এর উপর কোনো গোশত থাকবে না। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : يَتَأَكَّلُ - খাবার প্রার্থনা করে। عَظْمٌ - হাড়। لَحْمٌ - গোশত।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মানুষের মুখমণ্ডল হলো সবচেয়ে উত্তম ও সম্মানিত অঙ্গ। আর এ মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গকে যখন কুরআনের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য প্রার্থনা করে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়, তখন মহান আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে উক্ত অঙ্গকে অত্যন্ত খারাপ ও মন্দ অবস্থায় আনয়ন করবেন। এজন্য কোনো আলেম বলেন–

اِسْتِجْرَارُ الْجِيْفَةِ بِالْمَعَازِفِ أَهْوَنُ مِنْ اِسْتِجْرَارِهَا بِالْمَصَاحِفِ .

হাদীসে এসেছে– مَنْ طَلَبَ بِالْعِلْمِ الْمَالَ كَانَ كَمَنْ مَسَحَ أَسْفَلَ مَدَاسَهُ وَنَعْلَهُ بِمَحَاسِنِهِ لِيُنَظِّفَهُ

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন–

اَلْبَهْلَوَانُ الَّذِيْ يَلْعَبُ فَوْقَ الْحِبَالِ أَحْسَنُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِيْ يَمِيْلُوْنَ اِلَى الْمَالِ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ الدُّنْيَا بِالدُّنْيَا ، وَهٰؤُلَاءِ يَأْكُلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ فَيَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ .

–[মিরকাত– খ. ৩, পৃ. ৭২২]

وَعَنْ ٢١١٤ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (رضـ) كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২১১৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাসমূহের মধ্যে পার্থক্য বুঝে উঠতে পারতেন না, যাবৎ না 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নাজিল হতো। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসের আলোকে আমাদের হানাফীগণ বলেন যে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কুরআনের একটি আয়াত, দুটি সূরার মাধ্যখানে পার্থক্য সৃষ্টিকরণের লক্ষ্যে এটা অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীস এবং অত্র পরিচ্ছেদের শেষ দুটি হাদীস প্রকাশ্য দলিল যে, بِسْمِ اللّٰهِ প্রত্যেক সূরার অংশ, যা বারবার অবতীর্ণ হয়েছে।

আর আমরা বলি, এটা শুধু সূরা নামলেরই একটি আয়াত- প্রত্যেক সূরার নয়; বরং দুটি সূরার মধ্যখানে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হিসেবে এটা অবতীর্ণ। -[মিরকাত]

وَعَنْ ٢١١٥ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا هٰكَذَا اُنْزِلَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَرَأْتُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ اِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১১৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আলকামা (র.) বলেন, আমরা হেমস শহরে ছিলাম। এ সময় একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) সূরা ইউসুফ পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, এটা এরূপ নাজিল হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এটা রাসূল ﷺ -এর আমলে [তাঁর দরবারে] পড়েছি আর তিনি বলেছেন, বেশ পড়েছ। আলকামা (র.) বলেন, সে তাঁর সাথে কথা বলার সময় তার মুখ হতে শরাবের গন্ধ পাওয়া গেল। তখন হযরত আবদুল্লাহ বললেন, [পাজি!] শরাব খাও আর আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর? অতঃপর তিনি তাকে [শরাব পানের] শাস্তি দিলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) সম্ভবত কোনো شَاذْ কেরাতে সূরা ইউসুফ পড়েছেন যার ফলে উক্ত কুরআন অস্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি তাকে মুরতাদ হিসেবে শাস্তি প্রদান করেননি; বরং মদ পানের কারণে শাস্তি প্রদান করেছেন।

আর তিনি শুধু মদের গন্ধের উপর নির্ভর করে শাস্তি দিয়েছেন এটা ঠিক নয়; বরং সাক্ষী-প্রমাণ বা তার স্বীকৃতি পেয়ে দিয়েছেন। কেননা গন্ধ পাওয়াটা সন্দেহমূলক যেহেতু অনেক সময় জোর-জবরদস্তিতেও মদ খেয়ে থাকতে পারে। অথবা টক আপেলেও মদের গন্ধ থাকে আর হাদীসে এসেছে- اِدْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ

অথবা, এখানে حَدّ দ্বারা تَعْزِيْر -ও হতে পারে, তবে জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী এটা বুঝা যায় না। -[মিরকাত ও মাযাহেরে হক]

وَعَنْ ٢١١٦ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهٗ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِىْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّىْ اَخْشٰى اِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيْرٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِذٰلِكَ وَرَاَيْتُ فِىْ ذٰلِكَ الَّذِىْ رَاٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِىْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا اَمَرَنِىْ بِهٖ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُوَ اللّٰهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِىْ شَرَحَ لَهٗ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهٗ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهٖ

২১১৬. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, ইয়ামামা যুদ্ধের সময় [অর্থাৎ অব্যবহিত পরে] খলিফা আবূ বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে দেখি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর নিকট বসা। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হযরত ওমর আমার নিকট এসে বলেন, ইয়ামামা যুদ্ধে বহু হাফেজে কুরআন শহীদ হয়েছেন, আমার আশঙ্কা হয়, যদি বিভিন্ন জিহাদে এভাবে হাফেজে কুরআন শহীদ হতে থাকেন, তাহলে কুরআনের অনেকাংশ লোপ পাবে। অতএব, আমি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কুরআনকে [মাসহাফ বা কিতাব আকারে] একত্র করতে নির্দেশ দেবেন। আমি হযরত ওমর (রা.)-কে বললাম, আপনি এমন কাজ কেমন করে করবেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, এটা অতি উত্তম হবে। এ রূপে হযরত ওমর (রা.) আমাকে এটা বারবার বলতে লাগলেন। অবশেষে এর জন্য আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং আমিও সঙ্গত মনে করলাম যা হযরত ওমর সঙ্গত মনে করেছেন।

হযরত যায়েদ বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী জোয়ান পুরুষ, তোমার প্রতি আমরা কোনো সন্দেহ পোষণ করি না। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহীও লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতসমূহ অনুসন্ধান কর এবং তা [মাসহাফ আকারে] একত্র কর। হযরত যায়েদ বলেন, যদি তাঁরা আমাকে পাহাড়সমূহের একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব অর্পণ করতেন, তবে তা আমার পক্ষে কুরআন একত্র করার যে গুরুদায়িত্ব তাঁরা আমার উপর অর্পণ করলেন তা অপেক্ষা অধিকতর কষ্টসাধ্য হতো না। হযরত যায়েদ বলেন, আমি বললাম, আপনারা কেমন করে এমন এক কাজ করবেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, এটা বড় উত্তম কাজ।

মোটকথা, হযরত আবূ বকর (রা.) এভাবে আমাকে পুনঃপুন বলতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ আমার অন্তরকেও প্রশস্ত করে দিলেন, যার জন্য হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তা সংগ্রহ করতে লাগলাম– খেজুর ডালা, সাদা পাথর, পশুর হাড় ও মানুষের [হাফেজদের] অন্তর বা স্মৃতি হতে। অবশেষে

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتّٰى خَاتِمَةَ بَرَاءَةٍ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيٰوتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

সূরা তওবার শেষাংশ– لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত পেলাম আবূ খুযাইমা আনসারীর নিকট। তা আমি তিনি ছাড়া অপর কারো নিকট পাইনি। [যায়েদ বলেন,] এ লিখিত সহীফাগুলো খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট ছিল, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর খলিফা হযরত ওমর ফারূকের নিকট তাঁর জীবনাবধি, অতঃপর তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরআন সংকলনের ইতিহাস تَارِيْخُ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ **:** মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন আল্লাহর নিকট লওহে মাহফূযে এক নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো রয়েছে। তা হতে এ পাক কালাম তেইশ বছরে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর উপর প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। যখনই এর যে আয়াত বা আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে, তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) তা লওহে মাহফূযের তরতীব [ক্রম] অনুসারে কোন সূরায় কোন আয়াতের আগে বা পরে সংযুক্ত হবে তা বলে দিয়েছেন এবং তদনুসারে রাসূল ﷺ সাথে সাথে তা হাড়, চামড়া ও খেজুর ডালা প্রভৃতির উপর লেখিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া তিনি তা সর্বদা নামাজে পড়েছেন এবং প্রত্যেক রমজানের পূর্বে অবতীর্ণ সম্যক কুরআন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে পড়ে শুনিয়েছেন। সাহাবীগণ নামাজে পড়ার এবং আল্লাহর কালামকে রক্ষা করার জন্য কেউ আংশিক আর কেউ পূর্ণ কুরআন সাথে সাথে হেফজ করে নিয়েছেন। মোটকথা, নবী করীম ﷺ আপন জীবনকালেই সমস্ত কুরআন লিখিয়ে নিয়েছেন এবং কোনো কোনো সাহাবীও নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য তা লিখে নিয়েছেন; কিন্তু তাঁর জীবনকালে বরাবর তা অবতীর্ণ হতে থাকায় লিখিত সমস্ত অংশ একত্র করে কিতাব আকারে সাজানো সম্ভব হয়নি।

নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের কিছুকাল পরেই ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে কুরআনের বহু আলেম ও হাফেজ সাহাবী শহীদ হন। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা.) খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে কুরআন মাজীদের লিখিত আয়াতসমূহকে হাফেজদের সাক্ষাতে একত্র করে 'মাসহাফ' বা কিতাবরূপে সাজাতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.) ওহীর লেখক ও কুরআনের হাফেজ এবং কারী সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারী (রা.)-কে হযরত ওমরের সাহযোগিতায় তা সাজানোর ভার দেন। হযরত যায়েদ (রা.) হাড়গোড়ে, কাগজে ও খেজুরের পাতায় লিখিত আয়াতকে অন্তত দুজন সাহাবীর সাক্ষাতে ও তাঁদের উপস্থিতিতে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং সাহাবীদের মধ্যে যাঁদের নিকট যা হেফজ বা লিখিত ছিল, তার সাথেও মিলিয়েও দেখেন।

হযরত ইবনে শাইবা বর্ণনা করেন যে, জনগণ হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর নিকট আসতেন। তিনি দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত কোনো আয়াত লিখতেন না। আর সূরা তাওবা-এর শেষাংশ হযরত খুযাইমা ইবনে ছাবেত (রা.) ব্যতীত আর কারো নিকট পাওয়া গেল না। তখন তাকে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তা তার থেকেই লিখে নাও, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত করেছেন। হযরত ওমর (রা.) رَجْم -এর আয়াত নিয়ে আসলেন; কিন্তু তাঁর পক্ষে কোনো সাক্ষী না থাকাতে তাঁর থেকে তা লিখা হয়নি।

অপর এক হাদীসে এসেছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর ও হযরত যায়েদ (রা.)-কে বললেন যে, তোমরা মসজিদে নববীর দরজায় বসে পড় যে ব্যক্তি দুজন সাক্ষী নিয়ে আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত নিয়ে আসে তবে তোমরা তা লিপিবদ্ধ করবে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এখানে شَاهِدَانِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হেফজ ও লিখিত।

এভাবে কুরআন পাক কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর এর খণ্ডসমূহ খলিফা হযরত আবূ বকর, অতঃপর খলিফা হযরত ওমর, তাঁর পর তাঁর কন্যা ও রাসূল ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত হাফসার নিকট রক্ষিত থাকে এবং তা হতে জনসাধারণ আপন আপন পাঠের জন্য অনুলিপি করতে থাকে; কিন্তু অনুলিপিকালে কেউ কেউ কোনো কোনো শব্দে আপন আপন গোত্রীয় রীতির অনুসরণ করে। আর এ গোত্রীয় রীতিতে কুরআন পাঠের অনুমতি তাদেরকে রাসূল ﷺ -এর জমানায় দেওয়া হয়েছিল। ফলে বিভিন্ন গোত্রে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত হয়ে পড়ে। –[মিরকাত, মাযাহেরে হক]

وَعَنْ ٢١١٧ اَنَسِ بْنِ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلٰى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِىْ اَهْلَ الشَّامِ فِىْ فَتْحِ اَرْمِيْنِيَةَ وَاَذْرَبِيْجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اِخْتِلَافُهُمْ فِى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدْرِكْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَبْلَ اَنْ يَخْتَلِفُوْا فِى الْكِتَابِ اِخْتِلَافَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَاَرْسَلَ عُثْمَانُ اِلٰى حَفْصَةَ اَنْ اَرْسِلِىْ اِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ فَاَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ اِلٰى عُثْمَانَ فَاَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلٰثِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى اِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ اِلٰى حَفْصَةَ وَاَرْسَلَ اِلٰى كُلِّ اُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوْا وَاَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ فِىْ كُلِّ صَحِيْفَةٍ اَوْ مُصْحَفٍ اَنْ يُّحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهٗ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا

২১১৭. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান খলিফা ওসমান গনী (রা.)-এর নিকট মদিনায় আগমন করলেন, আর তখন তিনি [হুযায়ফা] ইরাকীদের সাথে থেকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয় করার জন্য শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। জনগণের বিভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠ হযরত হুযায়ফাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। হযরত হুযায়ফা হযরত ওসমান (রা.)-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহুদি ও নাসারাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাবে বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বে আপনি এ জাতিকে রক্ষা করুন। সুতরাং হযরত ওসমান (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট বলে পাঠালেন যে, আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের সহীফাসমূহ [খণ্ডসমূহ] আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন! আমরা তা বিভিন্ন মাসহাফে [কিতাবে] অনুলিপি করে অতঃপর তা আপনাকে ফিরিয়ে দেব। হযরত হাফসা তা হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন আর হযরত ওসমান (রা.) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, সাঈদ ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে হেশামকে তা অনুলিপি করতে নির্দেশ দিলেন। সে মতে তাঁরা বিভিন্ন মাসহাফে তার অনুলিপি করলেন। সে সময় হযরত ওসমান (রা.) কুরাইশী তিনজনকে বলে দিয়েছেন, যখন কুরআনের কোনো স্থানে যায়েদের সাথে আপনাদের মতভেদ হবে, তখন আপনারা তা কুরাইশদের রীতিতেই লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা কুরআন [মূলত] তাদের রীতিতেই নাজিল হয়েছে। তাঁরা সে মতে কাজ করলেন। অবশেষে যখন তাঁরা সমস্ত সহীফা বিভিন্ন মাসহাফে অনুলিপি করলেন, তখন হযরত ওসমান (রা.) উক্ত সহীফাসমূহ হযরত হাফসার নিকট ফেরত পাঠালেন এবং তাঁরা যা অনুলিপি করেছিলেন এর এক এক কপি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন, আর এটা ব্যতীত যে কোনো সহীফায় বা মাসহাফে লেখা কুরআনকে জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র.) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের পুত্র খারেজা আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তাঁর পিতা হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে বলতে শুনেছেন, আমরা যখন কুরআনের অনুলিপি তৈরি করি, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত পেলাম না, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পড়তে শুনেছি। অতএব, আমরা তা তালাশ করলাম

فَوَجَدْنُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَاَلْحَقْنَاهَا فِىْ سُوْرَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

এবং খুযাইমা ইবনে ছাবেত আনসারীর নিকট তা পেলাম। অতঃপর আমরা একে তার সূরায় মাসহাফে সংযোজন করলাম। তা হচ্ছে مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَفْزَعَ - ভীত হলেন বা উদ্বিগ্ন হলেন। اَدْرِكْ - রক্ষা করুন, তদারকি করুন। نَرُدُّ - আমরা ফিরিয়ে দেব। رَهْطٌ - দল, গোত্র। اُفُقٌ - প্রান্ত বা কিনারা। اِلْتَمَسْنَا - আমরা খুঁজলাম। وَجَدْنَا - আমরা পেলাম। اَلْحَقْنَا - আমরা সংযুক্ত করলাম।

تَارِيْخُ نَسْخِ الْقُرْاٰنِ لِعُثْمَانَ (رض) হযরত ওসমান (রা.) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কুরআনের কপিসমূহের ইতিহাস : খলিফা হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান যুদ্ধ চলা কালে হেজাজ ও শামের বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে কুরআন মাজীদ পাঠের বিভিন্নতা দেখে এবং এর ভাবি পরিণাম চিন্তা করে দূরদর্শী সাহাবী হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং মদিনায় এসে কুরআন মাজীদের একপাঠে সকলকে বাধ্য করার জন্য খলিফাকে অনুরোধ করেন। খলিফা পঞ্চাশ হাজার সাহাবীকে একত্র করে এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত হাফসার নিকট হতে কুরআন মাজীদের সেই আসল কপি তলব করে নেন এবং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনসারীকে তিনজন কুরাইশী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনুল আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারেছ সমভিব্যাহারে এর বিভিন্ন অনুলিপি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন এবং কুরাইশী তিনজনকে বলে দেন যে, 'যখন তোমাদের এবং যায়েদের মধ্যে কোনো শব্দের উচ্চারণ বা বানানে মতভেদ দেখা দেয় তবে তোমরা তা কুরাইশদের রীতিতেই লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কুরআন তাদের ভাষায়, তাদের রীতিতেই নাজিল হয়েছে।"

এরূপে কুরআন মাজীদের ছয় আর কারো মতে সাত কপি অনুলিপি প্রস্তুত হয়। খলিফা এর এক কপি মদিনায় রেখে বাকি কপিসমূহ এক এক কপি মক্কা, শাম, ইয়ামন, বসরা ও কূফায় আর কারো মতে সপ্তম কপি বাহরাইনে প্রেরণ করেন এবং এর হুবহু অনুকরণ করতে লোকদেরকে আদেশ করেন। এটা ছাড়া যার নিকট পূর্বের লিখা কুরআনের যে কপি ছিল তা জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে কুরআন পাঠে মতভেদ হতে চিরতরে রক্ষা করেন। [আল্লাহ তাঁকে ও হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে সমস্ত উম্মতের পক্ষ হতে মহান পুরস্কার দান করুন! আমীন!] এ কারণেই তিনি 'জামেউল কুরআন' বা কুরআন একত্রকারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন– যদিও আসলে তিনি কুরআন একত্রকারী নন; বরং এক পাঠের পক্ষে লোকদেরকে একত্রকারী। এটা ২৫ হিজরি সন অর্থাৎ হযরত ওসমানের খেলাফত লাভের তৃতীয় এবং রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পনেরোতম বৎসরের ঘটনা।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে কুরআন প্রচলিত রয়েছে, তা সেই মাসহাফে ওসমানীরই অবিকল প্রতিকপি। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর উপর যে কুরআন নাজিল হয়েছে অবিকল তাই। একটি মাত্র অক্ষরেরও বেশি-কম নেই। এমনকি তৎকালে আরবি লিপিশিল্প প্রাথমিক স্তরে থাকার কারণে মাসহাফে ওসমানীতে যে কয়টি শব্দ বর্তমান লিপি-পদ্ধতির ব্যতিক্রমে লেখা হয়েছে, অদ্যাবধি তারই অনুকরণ করা হয়েছে, যথা– 'রহমত' শব্দ বর্তমান লিপি-পদ্ধতি অনুসারে গোল 'তা' দ্বারা رَحْمَةٌ লেখা হয়, কিন্তু মাসহাফে ওসমানীতে চার স্থলে লম্বা তা দ্বারা رَحْمَتَ লেখা হয়েছে। এখন আমাদের কুরআনেও এরূপই রয়েছে। এরূপ আরও অনেক শব্দের উদাহরণ রয়েছে। পরে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান [মৃত্যু ৮৬ হি.] কুরআন মাজীদে যের-যবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, যাতে অনারবরা তা ভুল না পড়ে। এতে কোনো শব্দের আকার বা অর্থের পার্থক্য ঘটেনি। –[মিরকাত]

حَالَةُ نَسْخِ اَبِىْ بَكْرٍ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মূল কপির অবস্থা : হযরত ওসমান (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মূল কপি হতে সাতটি কপি করেন, যার মূল কপিটি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকটই সংরক্ষিত ছিল। মারওয়ান ইবনুল হাকাম মদিনার গভর্নর হবার পর তা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর নিকট চাইলেন; কিন্তু হযরত হাফসা (রা.) এর কোনো জবাব দেননি এবং মারওয়নের কাছে পাঠাননি। অতঃপর হযরত হাফসা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর মারওয়ান তাঁর জানাজায় উপস্থিত হন এবং তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট উক্ত কপিটি চাইলেন আর নিজের সংকল্পের উপর অটল থাকলেন। অবশেষে তিনি প্রকাশ হবার ভয়ে উক্ত কপিটি নিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেন। –[মিরকাত– খ. ৪, পৃ. ৭৩৩]

حُكْمُ فِىْ وَرَقِ الْمُصْحَفِ الْبَالِىْ পুরাতন কুরআনের পাতার বিধান : যেসব কুরআন মাজীদ পুরাতন হয়ে গেছে, যা ফেটে-ছিঁড়ে গিয়ে পড়ার অযোগ্য হয়ে পড়েছে এর বিধান সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–

১. প্রথমত ধৌত করে ফেলতে হবে, আর ধৌতকৃত পানি কোনো পবিত্র স্থানে ফেলে দিতে হবে। কেননা পোড়ার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনকে কিছুটা অপদস্থ করা হয়।
২. দ্বিতীয় মত হলো, পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে, কেননা ধৌতকরণের ফলে ধৌতকৃত পানি পায়ে মাড়ানো হয়, যা ঠিক নয়। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, হযরত ওসমান (রা.)-এর কাজের দ্বারা পোড়ানোই অগ্রাধিকার পায়। আর ধৌত করলে সে পানি পান করাই উত্তম। কেননা কুরআন হলো সকল রোগের মহৌষধ এবং অন্তরের ব্যাধির মুক্তি। তবে বর্তমান কালের ছাপার লেখা ধৌতকরণের ফলে মুছে যায় না। তাই উত্তম হলো পুড়িয়ে ফেলা অথবা কবরস্থানে দাফন করা। -[মিরকাত]

لِمَاذَا حَرَّقَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ؟ **হযরত ওসমান (রা.) কেন অন্যান্য কপিগুলো পুড়িয়ে দিলেন?** এর জবাব হলো, তিনি যদি مَصْحَفُ عُثْمَانَ ব্যতীত অন্যান্যগুলো না পোড়াতেন তবে পরবর্তী সময়ে এগুলো জনগণের মাঝে মতভেদ ও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হতো। ফিতনাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্যই তিনি উক্ত কাজ করেছেন।

আর তিনি যে পুড়িয়েছেন এতেও কোনো বিতর্ক সৃষ্টি বা তাঁর প্রতি দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা শরিয়তে এমন কোনো কিছু সাব্যস্ত নেই যে, কুরআন পোড়ানো বেআদবি, কাজেই তার এ কাজও যথার্থ ছিল। -[মাযাহেরে হক- খ. ৩, পৃ. ৭৯]

وَعَنْ ٢١١٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اَنْ عَمَدْتُمْ اِلَى الْاَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيْ وَاِلٰى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنَ الْمِئِيْنَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوْا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يَأْتِيْ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ وَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا فَاِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ فَيَقُوْلُ ضَعُوْا هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ نُزُوْلًا وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ اَكْتُبْ سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২১১৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি একবার খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল যে, আপনারা সূরা 'আনফাল', যা মাছানীর অন্তর্গত ও সূরা 'বারাআত' যা মেয়ীনের অন্তর্গত, উভয়কে এক জায়গায় করে দিলেন, আবার এদের মধ্যখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লাইনও লেখলেন না আর এগুলোকে স্থান দিলেন সাবয়ে তেওয়ালের মধ্যে? কিসে আপনাদেরকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করল? হযরত ওসমান (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থা এই ছিল যে, দীর্ঘদিন এমনি অতিবাহিত হতো [তাঁর উপর কিছু নাজিল হতো না]; আবার কখনো তাঁর উপর বিভিন্ন সূরা নাজিল হতো; যখন তাঁর উপর কুরআনের কোনো কিছু নাজিল হতো তিনি তাঁর কোনো লেখক সাহাবীকে ডেকে বলতেন, এ সকল আয়াতকে অমুক সূরায় রাখ যাতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে, অতঃপর যখন অপর কোনো আয়াত নাজিল হতো তখন বলতেন, এ আয়াতকে অমুক সূরায় রাখ যাতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে। সূরা 'আনফাল' হলো মদিনায় প্রথম অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্তর্গত আর 'বারাআত' হলো অবতীর্ণের দিক দিয়ে শেষ, অথচ এর বিবরণ তার বিবরণেরই অনুরূপ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উঠিয়ে নেওয়া হলো, অথচ তিনি আমাদেরকে বলে যেতে পারলেন না তা আনফালের অন্তর্গত কিনা। এ কারণেই [অর্থাৎ উভয়ের মাদানী হওয়ার ও বিবরণ এক হওয়ার কারণেই] আমি পরস্পরকে মিলিয়ে দিয়েছি এবং বিসমিল্লাহর সতরও লেখিনি এবং একে সাবয়ে তেওয়ালের মধ্যে স্থান দিয়েছি। -[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : مَا حَمَلَكُمْ - কিসে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করল। عَمَدَ - ইচ্ছা, সংকল্প। مَثَانِيْ - যা বারবার পড়া হয়। قَرَنْتُمْ - আপনারা মিলিয়ে দিয়েছেন। ذَوَاتُ الْعَدَدِ - কিছু সংখ্যক। وَضَعْتُمُوْا - আপনারা রেখেছেন। شَيْءٌ - কোন ঘটনা, কাহিনী। ضَعُوْا - তোমরা রাখ। قَرَنْتُ - আমরা মিলিয়েছি।

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ تَرْتِيْبِ السُّوْرَةِ وَالْاٰيَةِ সূরা ও আয়াতের ক্রমবিন্যাসে ওলামায়ে কেরামের অভিমত : আলোচ্য হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ তাঁর ওহী লেখককে বলতেন, "এটা অমুক সূরার অমুক জায়গায় রাখ।" আর রাসূল ﷺ -কে বলে দিতেন স্বয়ং জিবরাঈল (আ.)। মুসনাদে আহমদে আছে, হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বসাছিলাম, এমন সময় তিনি চক্ষু উপরে উঠালেন অতঃপর নীচে নামালেন এবং বললেন, হযরত জিবরাঈল এখন আমার নিকট এসে বললেন, এ আয়াতটি এ সূরার অমুক জায়গায় রাখুন– اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ –[সূরা আল-ইতকান : আয়াত– ৬০] এতে বুঝা গেল যে, আয়াতসমূহের তরতীব [ক্রমবিন্যাস] আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই হয়েছে। এর উপরই সমস্ত মুসলমানদের ইজমা বা মতৈক্য রয়েছে।

আর সূরাসমূহের তরতীব। এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হলো, এটাও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অনুসারেই হয়েছে। সাহাবীদের বিবেচনা অনুসারে হলে মাক্কী মাদানী সূরা বা ছোট-বড় সূরা বা যে যে সূরায় অন্ততঃ যে বিষয়ের বর্ণনা অধিক রয়েছে সে সে সূরা অনুসারে অথবা সূরার প্রারম্ভিক শব্দাবলি অনুসারেই হতো। যেমন, 'হা-মীম'-ওয়ালা ও 'ত্ব-সীন'-ওয়ালা সূরাসমূহে হয়েছে, অথচ মুসাব্বিহাতের তরতীব এ নিয়মে হয়নি। তবে সূরা বারাআত বা তওবা সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ কি ছিল তা জানা যায়নি। সম্ভবত তা সর্বশেষ নাজিল হওয়ার কারণেই।

তবে বলা হয়ে থাকে যে, হযরত আলী (রা.) নাজিল হওয়ার ক্রমানুসারে এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) অপর এক নিয়মে কুরআনের এক একটি তরতীব দিয়েছিলেন, তা সম্ভবত তাঁরা তাঁদের বুঝার সুবিধার জন্যই দিয়েছিলেন। সুতরাং কোনো কোনো পাশ্চাত্য লেখক যে বলেন, "মুহাম্মদের পর তাঁর শিষ্যগণ কুরআনকে যত্রতত্র সাজিয়েছেন, ফলে তা বিষয়ভিত্তিক হয়নি।" এসব কথা তাদের ডাহা মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক কথা। ব্যাপার হলো, কুরআন আসলে কতক খুতবা বা ভাষণের সমষ্টি। ভাষণে যেমন ভাষণদানকারী বক্তব্যের বিষয়কে শ্রোতাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী ও তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য নানা পদ্ধতিতে নানা উপমা-উদাহরণ, নানা গল্প-কাহিনী ও নানা অলঙ্কার ব্যঞ্জনা দ্বারা পুনঃপুন পেশ করেন, কুরআনে ঠিক তেমনই করা হয়েছে। এর এক একটি সূরা এক একটি পূর্বস্থিরীকৃত [লাওহে মাহফূযে স্থিরীকৃত] ভাষণ। এর কোনোটি সম্পূর্ণ একইবারে আর কোনোটি আবশ্যক অনুসারে বিভিন্ন বারে নাজিল হয়েছে। [কিন্তু এর তরতীব আসল অনুসারেই দেওয়া হয়েছে।] এ কারণেই তৎকালের কুরআনের বিরুদ্ধবাদী কবি-সাহিত্যকরা অন্তরে একে ঘায়েল করার সম্পূর্ণ ইচ্ছা রাখা সত্ত্বেও তারা এর উন্নত ভাষা, বর্ণনা বা বিন্যাস সম্পর্কে কোনো আপত্তি উত্থাপন করতে পারেননি। অথচ তাদেরকে এর জন্য বারবার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এর সমকক্ষ কোনো একটি আয়াতও তারা আনতে পারেনি; বরং তারা এর বিমোহনী শক্তির ভয়ে নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধবকে এ মহা আকর্ষণীয় কালাম শুনতে বাধা দিয়েছে। কেননা যে এটা মন দিয়ে শুনত সেই বলে উঠত لَيْسَ هٰذَا كَلَامَ الْبَشَرِ 'এটা কোনো মানুষের বাণী নয়।' –[মিরকাত, আল ইতকান]

اَلسَّبْعُ الطِّوَالُ -এর পরিচয় : ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা একটি সূরা হিসেবে নাজিল হয়েছে এবং এর দ্বারাই اَلسَّبْعُ الطِّوَالُ [বড় সাত] পরিপূর্ণ হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, اَلسَّبْعُ الطِّوَالُ হলো اَلْبَقَرَةُ ও تَوْبَةٌ আর এর মধ্যবর্তী সূরাসমূহ। এটাই হলো প্রসিদ্ধ মত।

তবে ইমাম নাসায়ী ও হাকেম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, اَلسَّبْعُ الطِّوَالُ হলো اَلْبَقَرَةُ ও اَلْاَعْرَافُ আর এদের মধ্যবর্তী সূরাসমূহ। রাবী বলেন, তিনি সপ্তমটির নাম বলেছেন– আমি তা ভুলে গেছি। আর এর ফলে سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ ও এর অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এটা হলো اَلسَّبْعُ الْمَثَانِيْ আর উক্ত সাতটি সূরা اَلْمِئِيْنَ দুইশত আয়াতের স্থলাভিষিক্ত। আর اَنْفَالٌ পৃথকভাবে অথবা تَوْبَةٌ -সহ এর বাইরে হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত ইবনে জুবাইর (রা.) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, সপ্তমটি হলো يُوْنُسُ ; অনুরূপ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বর্ণিত আছে। সম্ভবত اَنْفَالٌ ও تَوْبَةٌ সূরাদ্বয় مَثَانِيْ হবার ব্যাপারে মতভেদ থাকাটাই উভয়টি একটি সূরা নাকি পৃথক পৃথক সূরা এ ব্যাপারে মতভেদের কারণ। –[মিরকাত : খ. ৪, পৃ. ৭৩৭]

كِتَابُ الدَّعَوَاتِ
অধ্যায় : দোয়া

دَعَوَاتٌ শব্দটি دَعْوَةٌ-এর বহুবচন, যার অর্থ–বিনয়ের সাথে সাহায্য কামনা করা। আর এর পারিভাষিক অর্থ হলো, স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর দরবারে ফরিয়াদ করা। ইমাম নববী (র.) বলেন, সর্বযুগে ও সর্বস্থানেই ওলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে যে, আল্লাহর দরবারে দোয়া করা, প্রার্থনা করা মোস্তাহাব। তবে বিপদাপদের সময় দোয়া করা সুন্নত। কেননা সমস্ত নবীগণ থেকে বিপদাপদের সময় দোয়া প্রমাণিত রয়েছে।

কিন্তু দোয়া করা উত্তম নাকি তা না করে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা উত্তম– এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, দোয়া করা উত্তম। কেননা তাও ইবাদত; বরং ইবদতের সারবস্তু। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ তাছাড়া দোয়ার মাধ্যমে স্বীয় দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। আবার কারো নিকট দোয়া না করে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার জিকিরে মশগুল থাকার কারণে দোয়া করতে পারেনি; আমি তাকে দোয়াকারীদের চেয়ে উত্তম বস্তু দান করব।"

আবার কেউ কেউ বলেছেন, মৌখিক দোয়ার পাশাপাশি অন্তরে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এভাবে উভয়টার উপরই আমল হয়ে গেল।

দোয়ার আদবসমূহ :

১. হারাম বস্তু পানাহার থেকে বিরত থাকা।

২. দোয়ার পূর্বে কোনো নেককাজ করা।

৩. একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার সাথে দোয়া করা।

৪. অজু অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে নামাজের সুরতে বসা।

৫. আল্লাহর গুণকীর্তন করার পর শুরুতে ও শেষে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর দরূদ পাঠ করা।

৬. বিনয় ও নম্রতার সাথে হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করা।

৭. আল্লাহর উত্তম নাম ও নবী-রাসূলগণের অসিলা অবলম্বন করা।

৮. অতি নিম্নস্বরে স্বীয় গুনাহের স্বীকার করে কবুল হওয়ার পূর্ণ দৃঢ়তা নিয়ে বারবার দোয়া করতে থাকা। যে কোনো গুনাহ ও অসম্ভব বিষয়ের দোয়া না করা।

–[আত-তা'লীকুস সাবীহ– খ. ৩, পৃ. ৪৪; আশি'য়্যাতুল লুম'আত– খ. ২, পৃ. ১৬৭]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١١٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِىٍّ دَعْوَتَهُ وَاِنِّىْ اِخْتَبَأْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِىِّ اَقْصَرُ مِنْهُ)

২১১৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেক নবীর জন্য একটি কবুলযোগ্য দোয়া রয়েছে। সকল নবীই সেই দোয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছেন; কিন্তু আমি আমার উম্মতের শাফা'আতের উদ্দেশ্যে কিয়ামত পর্যন্ত তা লুকিয়ে রেখেছি। সুতরাং আমার এ দোয়া ইনশাআল্লাহ আমার উম্মতের এমন ব্যক্তির জন্য উপকৃত হবে যে আল্লাহর সাথে শরিক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। –[মুসলিম। বুখারীতে এর চেয়ে সামান্য কম বর্ণিত হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : اِخْتَبَأْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِبَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ب ـ ء) অর্থ– আমি লুকিয়ে রেখেছি।
نَائِلَةٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْمُ فَاعِلٍ বাবে فَتَحَ মূলবর্ণ (ن ـ ى ـ ل) অর্থ– অর্জনকারী।
اُمَّةٌ : এটি একবচন, বহুবচনে اُمَمٌ অর্থ– উম্মত, জাতি, এখানে اُمَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اُمَّةُ الْاِجَابَةِ অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর আহ্বানে সাড়া প্রদানকারীগণ।

قَوْلُهُ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ : 'প্রত্যেক নবীর জন্য রয়েছে একটি কবুলযোগ্য দোয়া' কথাটির তাৎপর্য হলো– মহান রাব্বুল আলামীন সকল নবীকেই নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তোমরা তোমাদের বিরোধীদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া কর। সুতরাং তাদের বদদোয়া অনুযায়ী অনেক জাতিকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গেই নবী করীম ﷺ বলেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তা'আলা দোয়ার যে অধিকার দিয়েছেন নবীগণ সেই অধিকার প্রয়োগে তাড়াহুড়া করেছেন। যেমন– হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক তাঁর উম্মতের ধ্বংসের জন্য বদদোয়ার ফলে সেই উম্মতের অবাধ্যদেরকে তুফান ও প্লাবনে ডুবিয়ে মেরেছেন। অনুরূপভাবে হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় উম্মতের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করেছিলেন, ফলে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এক বিকট চিৎকারে তারা ধ্বংসযজ্ঞের উপত্যকায় চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু আমি সেই দোয়ার অধিকারকে সংরক্ষিত রেখেছি। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেছি, তৎক্ষণাৎ তাদের জন্য বদদোয়া করিনি। কেননা আমি হলাম রহমাতুল লিল আলামীন। আমার জন্য শোভনীয় নয় যে, আমি কারো ধ্বংসের উপকরণ হব, বদদোয়া করে কাউকে ধ্বংস করে দেব; বরং সেই প্রাপ্ত অধিকারকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত রেখেছি। সেই অধিকারকে পার্থিব বদদোয়ায় প্রয়োগ না করে কিয়ামত দিবসে আমার এমন উম্মতের জন্য শাফা'আত করব, এ দুনিয়া হতে যে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে, যদিও সে পাপিষ্ঠ ও গুনাহগার হোক না কেন।

اَقْسَامُ الشَّفَاعَةِ **শাফা'আতের প্রকারভেদ :** উল্লেখ্য যে, শাফা'আত কয়েক প্রকার হবে। কেউ রাসূল ﷺ -এর শাফা'আত বা সুপারিশে জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকেই রেহাই পেয়ে যাবে। কেউ অতি দ্রুত জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। কেউ তো দ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করবে, আবার কারো জান্নাতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। [اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ نَبِيِّنَا ﷺ]

وَعَنْهُ ٢١٢٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلٰوةً وَزَكٰوةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১২০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে একটি অঙ্গীকার পেশ করছি, তুমি আমার সেই অঙ্গীকার [আবেদন] মঞ্জুর কর। কেননা আমি একজন মানুষ। সুতরাং যে মু'মিনকে আমি কষ্ট দিয়েছি, মন্দ বলেছি, অভিসম্পাত করেছি, বেত্রাঘাত করেছি– তুমি এসব কিছুকে কিয়ামত দিবসে ঐ মু'মিনের জন্য দয়া-অনুগ্রহ ও পাপ থেকে মুক্তি ও স্বীয় নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে দাও। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْلَافُ - ن- نُوْن وِقَايَه - ى এবং يَاى مُتَكَلِّمْ مَفْعُوْل بِهٖ অর্থ– আপনি আমার সে অঙ্গীকার বা আবেদন নামঞ্জুর করবেন না!

হাদীসের প্রেক্ষাপট : বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূল ﷺ নামাজের জন্য হুজরা হতে বের হচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল ﷺ -এর জামার প্রান্ত ধরে অনুনয়-বিনয় ও কাতরতার সাথে এ সমস্ত বিষয়ের প্রার্থনা করা শুরু করে দিলেন। এক পর্যায়ে রাসূল ﷺ বিরক্ত হয়ে বললেন– قَطَعَ اللّٰهُ يَدَكِ [আল্লাহ তা'আলা তোমার হস্ত কর্তন করুক]। এ কথায় হযরত আয়েশা (রা.) খুবই মর্মাহত হলেন এবং জামার প্রান্ত ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ন মনে হুজরার কোণে গিয়ে বসে রইলেন। অতঃপর যখন রাসূল ﷺ তার কাছে পুনরায় আসলেন, তখন হযরত আয়েশার এ অবস্থা দেখে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ الخ এ কারণে ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, কেউ যদি কারো জন্য বদদোয়া করে ফেলে তাহলে তার জন্য উচিত হলো ঐ বদদোয়ার পরিবর্তে তার জন্য উপরিউক্ত দোয়া করা।

وَعَنْهُ ٢١٢١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ اُرْزُقْنِىْ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২১২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে তখন এভাবে বলবে না যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা কর, ইচ্ছা হলে আমার প্রতি দয়া কর, ইচ্ছা হলে আমাকে রিজিক প্রদান কর; বরং দোয়া করতে হবে দৃঢ়চিত্তে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। কেউ তাঁকে দিয়ে জোরপূর্বক কোনো কিছু করাতে সক্ষম হবে না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : وَلَا مُكْرِهَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْمُ فَاعِلْ বাবে اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ك . ر . ه) মাসদার اَلْاِكْرَاهُ অর্থ– জোরপূর্বক কিছু করাতে পারবে না।

شَرْحُ الْحَدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হলে দৃঢ়তার সাথেই প্রার্থনা করতে হবে। অর্থাৎ এভাবে বলতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমার অমুক আশা পূর্ণ কর। "যদি তুমি চাও তাহলে আমার আশা পূর্ণ কর"– এরূপ বলা যাবে না। এভাবে বলার দ্বারা দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। অথচ দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা বান্দার দোয়া কবুল করার ব্যাপারে রয়েছে আল্লাহর ওয়াদা বা অঙ্গীকার। আর আল্লাহ তা'আলা কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সত্তা হলেন সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী। কোনো কাজ করা না করার ব্যাপারে তাঁর উপর কোনো প্রকার বল বা জোর প্রয়োগ করা যাবে না। এ কারণেই স্বীয় দোয়ার মধ্যে "তোমার ইচ্ছা হলে" এরূপ বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও অর্থহীন। তাই অর্থহীন কথা বলার কোনোই প্রয়োজন নেই।

وَعَنْهُ ٢١٢٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১২২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে তখন বলবে না, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা করে দাও; বরং সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হয়ে দৃঢ়চিত্তে ও পূর্ণ আগ্রহ সহকারে দোয়া করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য যে কোনো জিনিস দান করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। –[মুসলিম]

শব্দবিশ্লেষণ : لَا يَتَعَاظَمُهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বাবে تَفَاعُلْ মূলবর্ণ (ع ـ ظ ـ م) ه যমীর مَفْعُوْلٌ بِهٖ অর্থ– তাঁর জন্য কোনো জিনিস সুকঠিন নয়। অর্থাৎ কাউকে কোনো কিছু দান করা আল্লাহর জন্য কঠিন ব্যাপার নয়। এক হাদীসে রয়েছে, যদি আদি থেকে অন্তের সকল সৃষ্টজীব একত্র হয়ে আল্লাহর নিকট একযোগে প্রার্থনা করে এবং তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দান করলেও তাঁর ভাণ্ডার থেকে এক বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না।

وَعَنْهُ ٢١٢٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُوْلُ : قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বান্দার দোয়া কবুল করা হয়, যাবৎ না সে গুনাহের কাজের অথবা আত্মীয়তা বন্ধন ছেদের দোয়া করে এবং যাবৎ না সে তাড়াতাড়ি করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাড়াতাড়ি করা কি? তিনি বললেন, এরূপ বলা, যে আমি [এই] দোয়া করেছি, আমি [ঐ] দোয়া করেছি, আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না– অতঃপর সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া ছেড়ে দেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দবিশ্লেষণ : قَطِيْعَةٌ : এটি মাসদার, বাবে فَتَحَ মূলবর্ণ (ق ـ ط ـ ع) অর্থ– সম্পর্ক ছিন্ন করা।

رِحْم - رَحِم : একবচনের শব্দ, বহুবচনে أَرْحَامٌ অর্থ– আত্মীয়তার সম্পর্ক।

يَسْتَحْسِرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বাবে اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْسَارُ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ر) অর্থ– ক্লান্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া।

شُرُوْطُ قَبُوْلِ الدُّعَاءِ দোয়া কবুল হওয়ার শর্তাবলি : দৃঢ়তা ও সন্দেহমুক্তভাবে দোয়া করার পাশাপাশি দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আরো কতিপয় শর্ত হলো–

১. এমন জিনিসের জন্য দোয়া করা যা সাধারণত চাওয়া হয় এবং তা বৈধ জিনিস হতে হবে, কোনো অবৈধ ও হারাম অর্জনের জন্য দোয়া না করা। যেমন বলবে না– اَللّٰهُمَّ قَدِّرْنِيْ عَلٰى قَتْلِ فُلَانٍ ...... أَوْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ الْخَمْرَ ...
   অর্থাৎ 'হে আল্লাহ আমাকে অমুক মুসলমানকে হত্যা করার ক্ষমতা দান কর। হে আল্লাহ আমাকে মদ পান করাও, অথবা অমুক কাফেরকে ক্ষমা করে দাও– অথচ সে কুফরি অবস্থায় মারা গিয়েছে।'

২. অবাস্তব ও অসম্ভব জিনিসের জন্য দোয়া না করা। যেমন– কোনো ব্যক্তি দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়াতেই জাগ্রত অবস্থায় তোমার দীদার বা দর্শন দান কর। এরূপ দোয়া করা মূর্খতারই পরিচায়ক।

৩. দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করা।

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দোয়া না করা। যেমন– হে আল্লাহ! আমার পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার তৌফিক দান কর।

مَعْنَى قَوْلِهِ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ **ক্লান্ত না হতে বলার তাৎপর্য :** মু'মিনের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, দোয়া কবুল হতে কিছুটা বিলম্ব হলে দোয়া করা ছেড়ে দেওয়া। কেননা দোয়াও হলো ইবাদত আর ইবাদতের উপর বিরক্ত হওয়া এবং ইবাদত ছেড়ে দেওয়া কোনোভাবেই মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয়।

وجه تاخير الاجابة **কবুল হওয়ার বিলম্বের কারণ :** মানুষের দোয়া কবুল হতে কখনো বিলম্ব হয়ে থাকে। তার কারণ নিম্নরূপ-

১. দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের তাকদীর বা ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এ দোয়া কবুল হওয়াটাও ভাগ্যের লিখনে না থাকার কারণে বিলম্ব হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে তার প্রতিফল সে পরকালে পেয়ে যাবে।
২. নির্দিষ্ট সময় সাপেক্ষে তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেই নির্ধারিত সময় না আসার প্রেক্ষিতে তা কবুল হতে বিলম্ব হয়ে থাকে।
৩. আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষের ভালোমন্দ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। কোন জিনিস মানুষের জন্য কল্যাণকর তা তিনিই ভালো জানেন। বান্দা যে জন্য দোয়া করেছে তার মধ্যে তার জন্য কল্যাণ নিহিত না থাকা বা অকল্যাণ থাকার কারণেই তার মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন না।
৪. কাতরতা ও বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করাটা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। বান্দার অধিক কাতরতা ও বিনয় পর্যবেক্ষণের জন্যই আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুল করতে বিলম্ব করেন। -[মিরকাত- খ. ৫, পৃ. ১০]

وَعَنْ ٢١٢٤ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১২৪. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার পিছনে যে দোয়া করে, তা কবুল করা হয়। তার শিয়রে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। যখন যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দোয়া করে, নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, আমীন এবং তোমার জন্যও এরূপ হোক। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এখানে বিশেষভাবে কারো অগোচরে তার জন্য কৃত দোয়া কবুল হওয়ার কথা বলা হলেও যদি কেউ কোনো মুসলমানের সম্মুখেই মনে মনে বা আস্তে দোয়া করে সে দোয়াও এ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কেননা অগোচরে দোয়ার মধ্যে যেভাবে একনিষ্ঠতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে, অদ্রূপ তার উপস্থিতিতে মনে মনে বা আস্তে যে দোয়া করা হয় তার মধ্যেও পূর্ণ একনিষ্ঠতা বা ইখলাস থাকে। তাই এক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَكَ بِمِثْلٍ **"তোমার জন্যও তদ্রূপ হোক" একথার তাৎপর্য :** প্রার্থনা বা দোয়াকারীর সাথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। সে যখন অপর ভাইয়ের অগোচরে তার জন্য দোয়া করে তখন ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে বলে, হে আল্লাহ! তুমি তার এ দোয়া কবুল কর। অতঃপর প্রার্থনাকারীকে সম্বোধন করে বলে, তোমার এ দোয়ার বদৌলতে যেভাবে তোমার ভ্রাতা উপকৃত হয়েছে, আল্লাহ তোমাকেও অদ্রূপ উপকৃত করুক। -[মাযাহেরে হক : খ. ২, পৃ. ৪৭০]

وَعَنْ ٢١٢٥ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فِىْ كِتَابِ الزَّكٰوةِ -

২১২৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা বদদোয়া করো না তোমাদের নিজেদের জন্য, বদদোয়া করো না নিজেদের আওলাদের জন্য এবং বদদোয়া করো না নিজেদের মালের জন্য, যাতে তোমরা এমন এক সময়ে না পৌঁছ, যে সময় দোয়া করা হলে তা তোমাদের জন্য কবুল করা হয়। -[মুসলিম] আর হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ জাকাত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দ-বিশ্লেষণ : لَا تُوَافِقُوْا : সীগাহ جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ مَعْرُوْف বহছ نَهِى حَاضِرْ বাবে مُفَاعَلَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ق) মাসদার اَلْمُوَافَقَةُ অর্থ– পাওয়া, উপযুক্ত হওয়া, অনুকূল হওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى قَوْلِهٖ لَا تُوَافِقُوْا الخ "তোমরা যেন এমন সময় পেয়ে না যাও" কথাটির অর্থ : হাদীসের বাক্যগুলোর অর্থ হলো কিছু মুহূর্ত এমন রয়েছে, যখন আল্লাহর দরবারে সকল দোয়াই কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, তোমরা যখন নিজেদের জন্য, নিজেদের সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদের জন্য বদদোয়া করছ; আর সে সময়টা দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত হয়ে পড়ে এবং তোমাদের বদদোয়া কবুল হয়ে যায়, তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে, যা তোমাদের অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বুঝা গেল বিপদের সময় ক্রোধান্বিত হয়ে এসব বিষয়ের জন্য বদদোয়া করা সমীচীন নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢١٢٦ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২১২৬. অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– দোয়া-ই ইবাদত। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন– "এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব।" –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفَ يَكُوْنُ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةَ "দোয়াই একমাত্র ইবাদত" কিভাবে হলো? এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ অতিশায়োক্তিমূলকভাবে বলেছেন যে, দোয়াই ইবাদত। কেননা দোয়া হলো এমন একটি ইবাদত যাতে বান্দা আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ভয় করে একমাত্র আল্লাহকেই, তাঁর কাছেই সবকিছুর আশা পোষণ করে। তদুপরি দোয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে ইখলাস, হামদ, শুকরিয়া, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকার করা হয়, তাঁর সম্মুখে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন ও অক্ষম করে তুলে ধরে পরিপূর্ণ দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। তাঁর নিকট ফরিয়াদ করা হয়, সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এ কারণেই বলা হয়েছে "দোয়াই ইবাদত"। –[মাযাহেরে হক– খ. ২, পৃ. ৪৭০]

مَا وَجْهُ الْاِسْتِدْلَالِ بِالْاٰيَةِ؟ আয়াত দ্বারা দলিল দেওয়ার কারণ কি?

كَيْفَ تَكُوْنُ الْاٰيَةُ دَلِيْلًا عَلٰى ذٰلِكَ আয়াতটি কিভাবে একথার দলিল হলো? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথার স্বপক্ষে এ আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, "দোয়াই হলো ইবাদত"। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ–

১. কেউ বলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দোয়া করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন, আর আল্লাহর নির্দেশই তো ইবাদত।

▮ ইমাম রাগিব (র.) বলেন, দাসত্ব হলো বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। আর দাসত্ব অপেক্ষা উত্তম ইবাদত কিছুই হতে পারে না। কেননা তার মধ্যে রয়েছে বিনয়ের পূর্ণ অংশ। আর পূর্ণ বিনয় পাওয়ার যোগ্য হলেন একমাত্র তিনি যার মধ্যে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর তিনিই হলেন আল্লাহ।

▮ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে ইবাদতের শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। আর তা হলো পূর্ণাঙ্গ বিনয়, হেয় প্রতিপন্নতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ। আর ইবাদতের বিধান কার্যকর করার একমাত্র কারণ এটাই যে, বান্দা তার প্রতিপালকের সম্মুখে বিনয়ী হবে, মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করবে ও নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করবে; দোয়ার মধ্যে যা পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান।

▮ মীরাক শাহ (র.) বলেন, অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন বুঝানোর জন্যই এখানে هُوَ সর্বনাম ও ال দ্বারা حَصْر বা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ দোয়া ইবাদতের একটি বিশেষ অংশ বা অনেক বড় ইবাদত। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلْحَجُّ عَرَفَةُ [হজ হলো আরাফাহ] অর্থাৎ হজের একটি বড় রুকন হলো আরাফায় অবস্থান করা। –[মিরকাত– খ. ৫, পৃ. ১২]

وَعَنْ ٢١٢٧ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১২৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, দোয়া ইবাদতের মগজ বা সারবস্তু। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُخٌّ : এটি একবচন, বহুবচনে مِخَاخٌ অর্থ– মজ্জা, মগজ। কেউ বলেছেন– مُخُّ الشَّيْءِ خَالِصُهُ وَمَا يَقُوْمُ بِهِ অর্থাৎ مُخٌّ -এর অর্থ হলো কোনো জিনিসের সারবস্তু ও যার দ্বারা বস্তুটি স্থির থাকতে পারে। অর্থাৎ ইবাদত দোয়া ব্যতীত স্থির বা দণ্ডায়মান থাকতে পারে না। যেমন মানুষ مُخٌّ তথা মগজ বা মস্তিষ্ক ব্যতীত স্থির থাকতে পারে না। –[মিরকাত– খ. ৫, পৃ. ১৩]

وَعَنْ ٢١٢٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২১২৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নিকট দোয়া অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল আর কিছুই হতে পারে না। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ **কুরআন ও হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব :** কুরআনের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন– إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ 'আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে।' অর্থাৎ মর্যাদাপ্রাপ্তির মাধ্যম হলো আল্লাহভীতি। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে– দোয়াই হচ্ছে মর্যাদাপ্রাপ্তির মাধ্যম।

دَفْعُ التَّعَارُضِ **বিরোধের সমাধান :** রাসূলের বাণী– لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিকির ও ইবাদতের মধ্যে কোনো কিছুই দোয়ার সমকক্ষ হতে পারবে না। –[মিরকাত– খ. ৫, পৃ. ১৩]

وَعَنْ ٢١٢٩ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১২৯. **অনুবাদ :** হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– দোয়া ব্যতীত কোনো কিছুই তাকদীরের লিখনকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং দোয়া ব্যতীত কোনো কিছু মানুষের বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْقَضَاءُ : এটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। অর্থ– ভাগ্য, নিয়তি, তাকদীর, আল্লাহর ফয়সালা।

اَلْبِرُّ : অর্থ– সৎকর্ম, উত্তম আদর্শ, অনুগ্রহ।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ النُّصُوْصِ **নসসমূহের দ্বন্দ্ব :** কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর [ভাগ্য] ও বয়স কখনো পরিবর্তন হয় না। অথচ এ হাদীসে রয়েছে দোয়ার দ্বারা ভাগ্য ও বয়স পরিবর্তন হয়ে যায়।

دَفْعُ التَّعَارُضِ **দ্বন্দ্বের মধ্যকার সমাধান :** এখানে قَضَاءٌ বা তাকদীর রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাকদীর দ্বারা এমন অপছন্দনীয় জিনিস বুঝানো হয়েছে, যা হতে মানুষ ভয় করে। সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে– যখন আল্লাহ কাউকে দোয়া করার তৌফিক দান করেন তখন আল্লাহ তার থেকে এ ধরনের অপছন্দনীয় জিনিস হটিয়ে দেন।

▮ কেউ বলেছেন, তাকদীর দু প্রকার– ১. مُبْرَمٌ - আল্লাহর অটল ফয়সালা যা পরিবর্তনশীল নয়। ২. مُعَلَّقٌ - পরিবর্তনশীল এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা বিভিন্ন নেক আমলের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। এখানে দ্বিতীয় প্রকারই উদ্দেশ্য অর্থাৎ তা তাকদীরেই লেখা রয়েছে যে, দোয়ার দ্বারা এ জিনিস পরিবর্তন হয়ে যাবে।

▮ অথবা বিপদাপদ দূর করার ব্যাপারে দোয়ার যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে সে ব্যাপারে مُبَالَغَةٌ বা অতিশয়োক্তি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দোয়ার প্রভাব এতদূর পর্যন্ত কার্যকরী যে, যদি তা আল্লাহর ফয়সালাকে পরিবর্তন করতে পারত তাহলে তাও করত।

وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ বয়সের হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সমাধান :

▮ কেউ বলেছেন, বস্তুতই বয়স বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেমন কুরআনে রয়েছে–

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ فِىْ عُمُرِهٖ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ.

অন্য আয়াতে রয়েছে– يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ

তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত হয়েছে যে, বয়সের হ্রাস-বৃদ্ধি তাকদীরের লিখন অনুযায়ীই হয়ে থাকে। সেটা এভাবে যে, লাওহে মাহফূযে এভাবে লিখিত হয়েছে যে, উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ব্যক্তি হজ করে অথবা জেহাদ করে তাহলে তার বয়স হবে ৪০ বৎসর। আর যদি হজ ও জেহাদ উভয়টাই করে তাহলে তার বয়স হবে ৬০ বৎসর। সুতরাং সে যদি হজ ও জেহাদ উভয়টাই করে তাহলে তার বয়স হবে ৬০ বৎসর। এভাবে তার বয়স বৃদ্ধি পেয়ে গেল। আর যদি সে কোনো একটি করে তাহলে তার বয়স হবে ৪০ বৎসর। এভাবে তার বয়স হ্রাস পেল। –[মিরকাত– খ. ৫, পৃ. ১৪ ও ১৫]

▮ কেউ বলেছেন, বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ– বরকতপূর্ণ হওয়া। অর্থাৎ দোয়া দ্বারা তার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করা হবে। অতঃপর সে নির্দিষ্ট হায়াতের মধ্যে অধিক পরিমাণ কার্য সমাধান করতে পারবে যা অন্যরা তার চেয়ে অধিক হায়াত পেলেও সেই পরিমাণ করতে সক্ষম হবে না।

وَعَنْ ٢١٣٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২১৩০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা সংঘটিত হয়নি দোয়া ঐ সব কিছুর জন্যই উপকৃত হবে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দোয়ার প্রতি যত্নবান হও। –[তিরমিযী; আর আহমদ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যা সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে দোয়া উপকৃত হওয়ার অর্থ হলো, যে বিপদাপদ অবতীর্ণ হয়ে গেছে তা যদি تَقْدِيْرِ مُعَلَّقٌ সম্পর্কিত হয়, তাহলে দোয়া করার দ্বারা তা প্রতিহত হয়ে যায় এবং ঐ ব্যক্তি বিপদমুক্ত হয়ে যায়। আর যদি তা تَقْدِيْرِ مُبْرَمٌ সম্পর্কিত হয় সেক্ষেত্রে দোয়ার প্রতিফল প্রকাশিত হয়। তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দান করেন, যার ফলশ্রুতিতে বান্দার জন্য বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায় এবং সে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তদুপরি ধৈর্যশক্তি প্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তির ঈমান ও মনোবল এত বেশি দৃঢ় ও মজবুত হয় যে, সে ঐ বিপদে লিপ্ত হওয়া অবস্থায়ও এমন আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করে যেমন দুনিয়াদার লোকেরা মহা সুখে থেকে আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

আর যা সংঘটিত হয়নি তার জন্য দোয়া উপকৃত হওয়ার অর্থ হলো দোয়ার দ্বারা ঐ বিপদ আটকে দেওয়া হয়, যদি তা مُعَلَّقٌ সম্পর্কিত হয়। –[মিরকাত– খ. ৫, পৃ. ১৫]

وَعَنْ ٢١٣١ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا سَأَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১৩১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে-কোনো ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট কোনো দোয়া করলে আল্লাহ হয়তো তার ঐ দোয়া কবুল করেন অথবা তার সমপরিমাণ অনিষ্টতা তার থেকে প্রতিহত করে দেন। যদি সে কোনো পাপের বা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : كَفَّ : সীগাহ বহছ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ إِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوْفْ বাবে نَصَرَ মাসদার كَفًّا وَكِفَافَةً মূলবর্ণ (ك . ف . ف) - كَفَّهُ عَنِ الْاَمْرِ অর্থ– কোনো কাজ হতে বিরত রাখা।

وَعَنْ ٢١٣٢ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُسْأَلَ وَاَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২১৩২. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে প্রার্থনা করাকে পছন্দ করেন। ইবাদতের [দোয়ার] সর্বোত্তম দিক হলো সচ্ছলতার অপেক্ষা করা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلْفَرَجُ : এটি মাসদার, বাবে ضَرَبَ মূলবর্ণ (ف . ر . ج) জিনসে صَحِيْح অর্থ– অনুগ্রহ, দয়া, কল্যাণ।

تَشْرِيْحُ قَوْلِهِ "اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ"-এর ব্যাখ্যা : "সচ্ছলতার অপেক্ষা করা সর্বোত্তম ইবাদত" কথাটির অর্থ হলো– প্রার্থনাকারী ব্যক্তি غَيْرُ اللّٰهِ-এর নিকট অভিযোগ ও নৈরাজ্যের প্রকাশ না করে। সে এ ব্যাপারে আশাবাদী যে, সে যে বিপদ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা হতে অচিরেই মুক্তি পেয়ে যাবে। দোয়া কবুল হতে যতই বিলম্ব হোক না কেন সে আল্লাহর দরবার থেকে কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হতে রাজি নয় এবং কোনো অবস্থাতে সেই দরবার ছেড়ে অন্য দরবারে যেতে রাজি নয়। এভাবে আল্লাহর উপর তার পূর্ণ আস্থা ও ভরসা সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা তার ঈমানের দৃঢ়তারই পরিচায়ক। যার দ্বারা ঈমান দৃঢ় ও মজবুত হলো এবং আল্লাহর উপর আস্থা বৃদ্ধি পেল তা সর্বোত্তম ইবাদত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

وَعَنْ ٢١٣٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। কেননা প্রার্থনা না করা হলো অহংকারীর নিদর্শন। আর আল্লাহর সাথে যে অহংকার করবে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক।

وَعَنْ ٢١٣٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا يَعْنِىْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২১৩৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যার জন্য দোয়ার দরজা খোলা, তার জন্য রহমতের দরজাই খোলা হয়েছে এবং আল্লাহর নিকট কুশল বা নিরাপত্তা অপেক্ষা প্রিয়তর কোনো জিনিসই চাওয়া হয় না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ-বিশ্লেষণ : يَعْنِىْ : উক্ত হাদীসে يَعْنِىْ শব্দটির প্রয়োগ, প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার প্রসঙ্গে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, اَحَبَّ اِلَيْهِ يَعْنِىْ দ্বারা مُقَيَّدٌ -কে- اَحَبَّ اِلَيْهِ বা শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ মূলত তা شَيْئًا -এর- صِفَةٌ হয়েছে। আর এখানে يَعْنِىْ শব্দটা অর্থহীন। কেননা তার ব্যবহাব হয় একমাত্র এমন পরিপূর্ণ বাক্যের (جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ) মধ্যে যেখানে বাক্যের মধ্যে تَقْيِيْد ও অর্থের মধ্যে تَفْسِيْر হওয়ার প্রয়োজন হয়। আর এখানে বাক্যই পূর্ণ হচ্ছে তার পরের বাক্য অর্থাৎ اَحَبَّ দ্বারা। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় অন্যান্য হাদীসের কিতাব দ্বারা। কেননা সেখানে يَعْنِىْ শব্দটির উল্লেখ নেই।

আবার কেউ বলেছেন, اَنْ হলো مَصْدَرِيَّةٌ আর اَحَبَّ اِلَيْهِ হলো مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ তার صِفَةٌ এবং شَيْئًا তখন বাক্যটা হবে এরূপ –مَا سُئِلَ اللّٰهُ سُؤَالًا اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ سُؤَالِ الْعَافِيَةِ অর্থাৎ আরোগ্য কামনার ন্যায় উত্তম প্রার্থনা আর কেউ আল্লাহর নিকট করেনি।

আবার কেউ বলেছেন, شَيْئًا হলো مَفْعُوْلٌ بِهٖ অর্থাৎ مَا سُئِلَ اللّٰهُ مَسْئُوْلًا اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ سُؤَالِ الْعَافِيَةِ

–[মিরকাত– খ. ৫, পৃ. ১৮]

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শেষাংশের অর্থ হলো, আরোগ্য কামনা করা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। عَافِيَةٌ বা আরোগ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইহকালীন ও পরকালীন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অপছন্দনীয় বিষয় যেমন– বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যাদি হতে মুক্ত হওয়া। সুতরাং عَافِيَةٌ বা আরোগ্য হলো দুনিয়া-আখিরাতের সকল কল্যাণের সমষ্টি। যে ব্যক্তি عَافِيَةٌ প্রার্থনা করল সে যেন উভয় জগতের সকল কল্যাণের প্রার্থনা করল। এ কারণেই আল্লাহর নিকট আরোগ্য কামনা অধিক পছন্দনীয়।

وَعَنْ ٢١٣٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২১৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বিপদের সময় দোয়া কবুল হওয়ার দ্বারা আনন্দিত হতে চায় সে যেন সচ্ছলতার সময় অধিক পরিমাণে দোয়া করে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَلْيُكْثِرْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اَمْرْ غَائِبْ مَعْرُوْفْ বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْثَارُ মূলবর্ণ (ك ـ ث ـ ر) অর্থ– তার অধিক করা উচিত।

اَلرَّخَاءُ : এটি মাসদার, বাবে نَصَرَ অর্থ– সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য।

وَعَنْ ٢١٣٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২১৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে দোয়া কর। জেনে রেখ!, আল্লাহ তা'আলা অমনোযোগী ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না। [অর্থাৎ যে ব্যক্তি দোয়া করার সময় অমনোযোগী ও غَيْرُ اللّٰهِ -এর প্রতি নিবিষ্ট থাকে তার দোয়া কবুল করেন না।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসের প্রথম অংশের উদ্দেশ্য হলো দোয়া করার সময় তোমাকে এমন অবস্থায় থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে তুমি দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পার। যেমন– সৎকাজে লিপ্ত থাকা, অসৎকাজ থেকে বিরত থাকা এবং দোয়ার শর্তাবলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

আর হাদীসের শেষাংশের উদ্দেশ্য হলো দোয়া করার সময় এমন দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সীমাহীন ও বিশাল অনুগ্রহের মালিক হওয়ার কারণে তিনি তোমাকে নিরাশ বা বিফল মনোরথে ফেরত দেবেন না এবং তিনি অবশ্যই তোমার দোয়া কবুল করবেন। আর একটি হাদীসে কুদসীতে রয়েছে আল্লাহ তার বান্দার সাথে সেরূপ আচরণ করেন বান্দা তার প্রতি যেরূপ ধারণা রাখে। সুতরাং দোয়ার সময় আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা বাঞ্ছনীয়।

وَعَنْ ٢١٣٧ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْاَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْاَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২১৩৭. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে তখন হাতের তালু দ্বারা করবে, হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা করবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা আল্লাহর নিকট হাতের তালু দ্বারা প্রার্থনা কর, হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা প্রার্থনা করো না, আর প্রার্থনা শেষে উভয় হাতকে মুখমণ্ডলে মুছে ফেল। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ বিশ্লেষণ : اَكُفٌّ : এটি বহুবচন, একবচনে كَفٌّ অর্থ– হাতের তালু।

بُطُوْنٌ : এটি বহুবচন, একবচনে بَطْنٌ অর্থ– উদর, পেট, তালু।

ظُهُوْرٌ : এটি বহুবচন, একবচনে ظَهْرٌ অর্থ– পৃষ্ঠ, পিঠ।

وَجْهُ السُّؤَالِ بِبَطْنِ الْكَفِّ **হাতের তালু দ্বারা প্রার্থনার তাৎপর্য :** আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, হাতের তালু দ্বারা প্রার্থনা করার তাৎপর্য হলো, প্রার্থনাকারীর উচিত হলো দানকারীর দিকে বিনীতভাবে হাতকে প্রসারিত করা, যেন তার প্রচুর দান দ্বারা সে হাত পূর্ণ করতে পারে। আর বিপদ দূর করার নিমিত্ত নিয়ম হলো হাতের পৃষ্ঠকে আকাশের দিকে উত্তোলন করা। রাসূল ﷺ এরূপ করতেন, যা বিপদ প্রতিহত করার প্রতি ইঙ্গিত করে। তবে ইস্তিস্কা বা বৃষ্টি কামনার দোয়া এর পরিপন্থি। সেক্ষেত্রে হাত উল্টিয়েই দোয়া করতে হবে।

وَعَنْ ٢١٣٨ سَلْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُد وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২১৩৮. **অনুবাদ :** হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দয়ালু। বান্দা যখন [প্রার্থনার জন্য] তাঁর প্রতি হস্ত উত্তোলন করে তখন তিনি শূন্যহস্ত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, বায়হাকী]

وَعَنْ ٢١٣٩ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২১৩৯. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দোয়ার জন্য হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন তখন মুখমণ্ডল না মুছে তা নামাতেন না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দ বিশ্লেষণ : لَمْ : সীগাহ বহছ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِىْ جَحَدْ بَلَمْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাবে نَصَرَ মাসদার حَطًّا মূলবর্ণ (ح ـ ط ـ ط) অর্থ– অবতরণ করানো, নামানো।

وَعَنْ ٢١٤٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২১৪০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ দ্বারা দোয়া করতে পছন্দ করতেন এবং এতদ্ভিন্ন অন্য দোয়া পরিহার করতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جَامِعْ বা ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া কি? جَامِعْ দোয়া হলো–

১. যে দোয়াতে সৎ উদ্দেশ্যাবলি, অথবা আল্লাহর অধিক গুণকীর্তন, অথবা দোয়ার আদবসমূহ রক্ষা করা হয়, তাকে جَامِعْ দোয়া বলা হয়।

২. মাযহারে হক প্রণেতার মতে, যার শব্দ কম কিন্তু অর্থ ব্যাপক, তাকে جَامِعْ দোয়া বলা হয়। যেমন–

* رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
* اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .
* اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى . وَغَيْرِ ذٰلِكَ .

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ৯১]

وَعَنْ ٢١٤١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২১৪১. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়া অতি দ্রুত কবুল হয়। –[তিরমিযী] [কেননা এ ধরনের দোয়া সাধারণত লৌকিকতা বহির্ভূত ও একনিষ্ঠতার সাথে হয়ে থাকে।]

وَعَنْ ٢١٤٢ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لِيْ وَقَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَيَّ فِيْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ اَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا تَنْسَنَا)

২১৪২. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট ওমরা করার অনুমতি চাইলাম। রাসূল ﷺ আমাকে অনুমতি প্রদান করে বললেন, হে আমার ছোট ভাই! স্বীয় দোয়ার মধ্যে আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিও এবং আমাদেরকে ভুলে যেয়ো না। হযরত ওমর (র.) বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে এমন কথা ইরশাদ করেছেন যার বিনিময়ে যদি আমাকে সমগ্র পৃথিবীও দেওয়া হয়, তবুও আমি সন্তুষ্ট হব না। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা 'আমাকে ভুলো না' পর্যন্ত শেষ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْتَأْذَنْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বাবে اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِئْذَانُ মূলবর্ণ (ا ـ ذ ـ ن) অর্থ– আমি অনুমতি চাইলাম।

لَا تَنْسَنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ نَهِيْ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে سَمِعَ মাসদার نَسْيًا وَنِسْيَانًا অর্থ –তুমি আমাদেরকে বিস্মৃত হয়ো না।

اَشْرِكْنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِشْرَاكُ অর্থ– আমাদেরকে শরিক কর।

مَا الْكَلِمَةُ الَّتِيْ قَالَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ (رض) **রাসূল ﷺ হযরত ওমরকে কোন বাক্যটি বলেছিলেন?** রাসূল ﷺ -এর ইরশাদকৃত সেই বাক্যটি কি ছিল? যার মূল্য হযরত ওমরের নিকট সমগ্র দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। সে ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. সেই বাক্যটি ছিল পূর্বোক্ত বাক্যগুলোই যা তিনি হযরত ওমরকে বিদায়ের সময় বলেছিলেন যে, "আমাদেরকেও দোয়ার মধ্যে শামিল রেখ, ভুলে যেয়ো না।"

২. সে বাক্য এতদ্ভিন্ন অন্যকোনো বাক্য ছিল যা হযরত ওমরকে ব্যক্তিগতভাবে রাসূল ﷺ বলেছিলেন; কিন্তু হযরত ওমর (রা.) এখানে তার উল্লেখ করেননি।

وَجْهُ طَلَبِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ عُمَرَ (رض) **রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক হযরত ওমরের নিকট দোয়া প্রার্থনা করার কারণ :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল অহংকার ও গর্ববোধ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা।

অথবা, মহৎ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তদপেক্ষা কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট দোয়া করতে বলার শিক্ষা উম্মতকে দান করা।

অথবা, হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা উম্মতের সামনে ফুটিয়ে তোলা।

وَعَنْ ٢١٤٣ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ وَعِزَّتِيْ لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১৪৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রোজাদারের দোয়া যখন সে ইফতার করে, ন্যায়বিচারক শাসকের দোয়া এবং অত্যাচারিতের দোয়া। তার দোয়াকে আল্লাহ তা'আলা মেঘের উপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং পরওয়ারদিগারে আলম বলেন, আমার ইজ্জত-সম্মানের কসম! আমি নিশ্চয় তোমার সাহায্য করব, যদিও কিছু সময় পরে হয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো কোনো সময় কারো দোয়া দেরিতে কবুল হতে পারে। আর তাতেই তার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

وَعَنْهُ ٢١٤٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২১৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তিনটি দোয়া কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও পীড়িতের দোয়া। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পিতার দোয়া মানে হচ্ছে– পিতা যখন নিজ সন্তানের ব্যাপারে সুদোয়া কিংবা বদদোয়া করেন, তখন উভয়টিই তড়িৎ কবুল হয়। আর যেহেতু পিতার দোয়া কবুল হয় তাই মায়ের দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। এখানে হাদীসে যদিও মায়ের কথা উল্লেখ নেই; কিন্তু এটাই যথার্থ। কারণ নিজ সন্তানের প্রতি মা পিতার চেয়েও অধিক স্নেহময়ী হয়ে থাকেন।

মুসাফিরের দোয়ার ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা–

১. যে ব্যক্তি মুসাফিরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করে, তার ব্যাপারে মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুসাফিরকে কষ্ট দেয় এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে মুসাফিরের বদদোয়া কবুল হয়।

২. মুসাফির চাই নিজের জন্য দোয়া করুক কিংবা অন্যের জন্য, তার দোয়া শর্তহীনভাবে কবুল হয়। মজলুম বা পীড়িতের দোয়া মানে হচ্ছে– কোনো ব্যক্তি যদি মজলুমের সাহায্য করে এবং তাকে সান্ত্বনা দেয় আর মজলুম লোকটি উক্ত ব্যক্তির জন্য দোয়া করে, তাহলে তার দোয়া কবুল হয়। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি মজলুমের প্রতি জুলুম করে অথবা জালেমকে সহযোগিতা করে মজলুমের মেধাগত, আত্মিক ও দৈহিক কষ্ট বাড়িয়ে দেয় আর মজলুম উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বদদোয়া করে তাহলে মজলুমের উক্ত বদদোয়া কবুল হয়। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ৯৩]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١٤٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَسْأَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتّٰى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَا انْقَطَعَ زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ مُرْسَلًا حَتّٰى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتّٰى يَسْأَلَهُ شِسْعَهُ اِذَا انْقَطَعَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১৪৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আপন পরওয়ারদিগারের নিকট আপন যাবতীয় আবশ্যক বিষয়াদি প্রার্থনা করে, এমনকি যখন তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তাও যেন তাঁর নিকট চায়। সাবেত বুনানীর মুরসাল বর্ণনায় এ বাক্যটুকু বেশি রয়েছে– এমনকি তাঁর নিকট যেন লবণও ভিক্ষা করে, এমনকি আপন জুতার ফিতাও ভিক্ষা করে, যখন তা ছিঁড়ে যায়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্য রেওয়ায়েতে– حَتّٰى يَسْأَلَهُ شِسْعَهُ الخ [এমনকি আপন জুতার ফিতাও আল্লাহ তা'আলার কাছে চায়] বাক্যটি দুবার উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহর কাছে চাওয়ার বেলায় কোনো ক্ষেত্রেই প্রার্থীর জন্য কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা বা বঞ্চনা নেই। কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। বান্দা যা-ই চায় আল্লাহ

তা তাকে দান করেন। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হচ্ছে তার প্রতিটি প্রয়োজন [চাই তা যত সাধারণ বা ছোটই হোক না কেন,] আল্লাহর সামনে পেশ করা; তাঁর দরবারেই নিজের সকল উদ্দেশ্য কামনা করা এবং একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি পূর্ণাঙ্গ ভরসা করা। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ৯৪]

وَعَنْهُ ٢١٤٦ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

২১৪৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়াতে আপন হাত উঠাতেন, এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখা যেত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বড় ধরনের বালামুসিবতের সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত অধিক উপরে উঠাতেন যাতে বগল দেখা যেতো। কখনো কাঁধ বরাবর এবং সাধারণত সিনা বরাবরই উঠাতেন; কিন্তু ফরজ নামাজের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন বলে কোনো সহীহ হাদীসে নেই। তবে এ বিশেষ ক্ষেত্রে না হলেও রাসূলে কারীম ﷺ দোয়াতে হাত উঠাতেন এ হিসেবে এতেও হাত উঠিয়ে দোয়া করার প্রচলন হয়ে গেছে। কিন্তু মক্কা-মদিনাতে এখনও ফরজ নামাজের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা হয় না। -[আ'যমী]

وَعَنْ ٢١٤٧ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَجْعَلُ اِصْبَعَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُوْ.

২১৪৭. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ আপন দু হাতের অঙ্গুলি কাঁধ বরাবর উঠিয়ে দোয়া করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আঙ্গুলি কাঁধ বরাবর অর্থাৎ হাত সিনা বরাবর রাখতেন যাতে হাতের অঙ্গুলি কাঁধের উপরে উঠত না।

وَعَنْ ٢١٤٨ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ. (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২১৪৮. অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ পিতা ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ যখন হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন, তখন হাত দ্বারা চেহারা মাসাহ করতেন। -[উপরিউক্ত হাদীস তিনটি ইমাম বায়হাকী (র.) দা'আওয়াতুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ হাদীসের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়ার পর শুধুমাত্র তখনই হাত মুখের উপর মুছে নিতেন, যখন দোয়া করার সময় তিনি হাত উঠাতেন। আর নবীজী ﷺ যখন দোয়ার সময় হাত উঠাতেন না, তখন তিনি দোয়া শেষে হাত মুখে মুছতেন না। সুতরাং নামাজের অবস্থায়, তওয়াফ অবস্থায়, ঘুমানোর সময় ও আহারের পর ইত্যাদি অবস্থায় দোয়া করার সময় যেহেতু হাত উঠানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত নেই, তাই এসব অবস্থায় দোয়া করার সময় তিনি হাতগুলো মুখের উপর মুছতেন না।

-[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ৯৫]

وَعَنْ ٢١٤٩ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ الْمَسْئَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ وَالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيْعًا وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ وَالْاِبْتِهَالُ هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُوْرَهُمَا مِمَّا يَلِىْ وَجْهَهٗ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২১৪৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়ার নিয়ম হলো, তুমি তোমার দুই হাত তোমার কাঁধ পর্যন্ত অথবা তার কাছাকাছি উঠাবে; ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার নিয়ম হলো, তুমি তোমার একটি অঙ্গুলি [শাহাদত অঙ্গুলি] দ্বারা ইশারা করবে এবং ফরিয়াদ করার নিয়ম হলো, তুমি তোমার পূর্ণ হাত প্রসারিত করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, ফরিয়াদ করা হলো এরূপ– অতঃপর তিনি আপন দুই হাত উপরের দিকে উঠালেন এবং হাতের ভিতর দিককে আপন চেহারার দিকে রাখলেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَنْ تُشِيْرَ بِاِصْبَعٍ وَاحِدٍ [এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে] এ বাক্যে আঙ্গুল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– سَبَّابَةٌ তথা শাহাদাত অঙ্গুলি [তর্জনী]। আর এ আমলের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে سَبٌّ তথা নফসে আম্মারা ও শয়তানকে তিরস্কার করা এবং এদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। এ আমলের ক্ষেত্রে এক আঙ্গুলের শর্তারোপ করা হয়েছে। কেননা দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা মাকরূহ। বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশরা করতে দেখে তাকে সতর্ক করে বলেছেন, এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা কর, এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা কর! –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ৯৫]

وَعَنْ ٢١٥٠ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّ رَفْعَكُمْ اَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ مَا زَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى هٰذَا يَعْنِىْ اِلَى الصَّدْرِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২১৫০. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, [দোয়াতে সিনার উপরে] তোমাদের হাত উঠানো বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো সিনা বরাবরের অধিক উঠাননি। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'অধিক উঠাননি' অর্থাৎ সাধারণত অধিক উঠাননি। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর অধিক উঠানোর চেষ্টা করা বিদ'আত। রাসূলে কারীম ﷺ আরাফার দিনে সিনা বরাবর হাত জোড় করে দোয়া করেছেন এমনও কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢١٥١ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَ اَحَدًا فَدَعَا لَهٗ بَدَأَ بِنَفْسِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ)

২১৫১. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কাউকে স্মরণ করে দোয়া করতেন, তখন প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতেন। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে উম্মতের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, যখন সে কারো জন্য দোয়া করবে তখন প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া করবে। যেমন এভাবে বলবে- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِفُلَانٍ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা কর। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ৯৬]

وَعَنْ ٢١٥٢ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلَا قَطِيْعَةُ رَحِمٍ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ بِهَا اِحْدٰى ثَلٰثٍ اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهٗ دَعْوَتَهٗ وَاِمَّا اَنْ يَدَّخِرَهَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوْا اِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللّٰهُ اَكْثَرُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২১৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমান যে কোনো দোয়া করে যাতে কোনো গুনাহের কাজ অথবা আত্মীয়তা বন্ধন ছেদের কথা নেই, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। হয়তো তাকে তার চাওয়া বস্তু দুনিয়াতে দান করেন অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন অথবা তার অনুরূপ কোনো অমঙ্গলকে তার থেকে দূরে রাখেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক লাভ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ এটা অপেক্ষাও অধিক দেন। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের ভাষ্য- اَللّٰهُ اَكْثَرُ [আল্লাহ এটা অপেক্ষাও অধিক দেন] -এর মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দোয়ার বদৌলতে তোমাদেরকে যা কিছু দান করেন, এর তুলনায় সেটা কতইনা অধিক, যা তিনি তোমাদের চাওয়া ব্যতীতই স্বীয় দয়া ও করুণাস্বরূপ তোমাদেরকে দান করেন। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ৯৭]

وَعَنْ ٢١٥٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَمْسُ دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حَتّٰى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتّٰى يَصْدُرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتّٰى يَقْعُدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حَتّٰى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْاَخِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَاَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعْوَاتِ اِجَابَةً دَعْوَةُ الْاَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২১৫৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়, উৎপীড়িতের দোয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, হাজীর দোয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বাড়ি ফিরে, জিহাদকারীর দোয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বসে পড়ে, রোগীর দোয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভালো হয় এবং মুসলমান ভাইয়ের দোয়া অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ সকল দোয়ার মধ্যে সত্বর কবুল হয় মুসলমান ভাইয়ের দোয়া অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। -[বায়হাকী দা'আওয়াতুল কাবীরে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে যে তিন ব্যক্তির দোয়ার কথা বলা হয়েছে তা সীমিত করা উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ ঐ তিন ব্যক্তির দোয়াও কবুল করা হয়।

بَابُ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ اِلَيْهِ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা

"ذِكْرُ اللّٰهِ"-এর মধ্যকার "ذِكْرٌ" শব্দের অর্থ হলো– স্মরণ করা, ইবাদত করা। সে হিসেবে "ذِكْرُ اللّٰهِ" -এর অর্থ হলো– আল্লাহর স্মরণ করা, আল্লাহর ইবাদত করা। আর تَقَرُّبُ اِلَى اللّٰهِ -এর অর্থ হলো– আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা।

জিকির দু প্রকার : জিকরে লেসানী বা মৌখিক জিকির এবং জিকরে কালবী বা আন্তরিক জিকির। আন্তরিক জিকির **আবার দু প্রকার :** অন্তরে বা মনে মনে যার শব্দ উচ্চারণ করা হয়, একে জিকরে খফী বলে এবং যার কোনো শব্দ থাকে না; বরং অন্তরে আল্লাহর কুদরত ও সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা থাকে, একে তাফাক্কুর বলে। সূফিয়ায়ে কেরামের মতে, জিকরে লেসানী অপেক্ষা জিকরে কালবীর প্রভাবই অধিক; কিন্তু ফকীহদের মতে কুরআন হাদীসে যে সকল জিকিরের নির্দেশ রয়েছে, সেসব জিকির দ্বারা জিকরে লেসানীকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং নিজের কানে শুনে মতো মুখে উচ্চারণ না করলে জিকির সম্পাদিত হবে না। যেমন সম্পাদিত হয় না নামাজে সুবহানাকা, তাশাহহুদ, দোয়া, রুকু-সেজদার তাসবীহ ও নিঃশব্দ নামাজের কেরাত তার শব্দ আপন কানে না শুনলে।

জিকির আবার দু প্রকার : যার শব্দ অন্যে শুনে, একে জিকরে জেহের বা জলী বলে এবং যার শব্দ অন্যে শুনে না, একে জিকরে খফী বলে। জিকরে জলী করা যায় যদি তা দ্বারা কারো ঘুম, নামাজ বা তেলাওয়াতে ব্যাঘাত না ঘটে। প্রয়োজন বোধে অনেকে একত্রে বসে বা হালকাবন্দী হয়েও জিকির করা চলে; কিন্তু ইমাম মালেক (রা.)-এর মতে, দলবদ্ধ হয়ে জিকিরে জলী করা মাকরূহ। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এরূপ করেননি। এতে কালক্রমে অতিরিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে।

জিকির শুধু তাসবীহ-তাহলীল বা 'আল্লাহ আল্লাহ' করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক কাজে আল্লাহর নির্দেশ পালন করাও আল্লাহর জিকির। কুরআন তেলাওয়াত করা বড় জিকির। কুরআন হাদীস শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়াও জিকির; তাতে চিন্তা-গবেষণা করাও জিকির। ওয়াজ-নসিহত করা এবং তা শুনাও জিকির।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢١٥٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মানব দল আল্লাহর জিকির করতে বসে, নিশ্চয় আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের বেষ্টন করে নেন, তাঁর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। অধিকন্তু আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সম্মুখে তাদের স্মরণ করেন। –[মুসলিম]

٢١٥٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلٰى جَبَلٍ يُقَالُ لَهٗ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيْرُوْا هٰذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার পথে সফরে এক পাহাড়ের নিকট পৌঁছলেন, যার নাম হলো জুমদান। তখন বললেন, চল, চল, এটা জুমদান। আগে আগে চলে গেল মুফাররিদরা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুফাররিদ' কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, যে পুরুষ বা নারী আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করে, তারা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'জুমদান' মদিনা হতে এক রাত্রির পথ পরিমাণ দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়। সেটা আল্লাহর জিকিরকে ভালোবাসে বলে তথায় তিনি জিকির করতে বললেন।

وَعَنْ ٢١٥٦ أَبِيْ مُوْسَى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে স্বীয় প্রতিপালকের স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না, তাদের উদাহরণ যথাক্রমে জীবিত ও মৃতের ন্যায়। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢١٥٧ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৫৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকটে সেরূপ, যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে স্মরণ করে আমাকে তার মনে, স্মরণ করি আমি তাকে আমার মনে, আর যদি সে স্মরণ করে আমাকে মানব দলে, স্মরণ করি আমি তাকে তাদের অপেক্ষা উত্তম দলে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'যেরূপ সে আমাকে ভাবে' অর্থাৎ যে আমার নিকট হতে যেরূপ ব্যবহার পাবে বলে বিশ্বাস করে, আমি তার সাথে সেরূপই করি। ভালোর বিশ্বাস হলে ভালো, আর মন্দের বিশ্বাস হলে মন্দ। সুতরাং বান্দার আল্লাহর প্রতি ভালোর বিশ্বাস রাখাই উচিত এবং ভালো কাজ করতে চেষ্টা করাই উচিত।

وَعَنْ ٢١٥٨ أَبِيْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গেফারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার নিকট একটি ভালো কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তার দশ গুণ পুরস্কার রয়েছে। আমি তার চেয়ে বেশিও দেব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার প্রতিফল তার অনুরূপ এক গুণই রয়েছে অথবা আমি মাফ করে দেব। যে আমার এক বিঘত নিকটে আসে, আমি তার এক হাত নিকটে যাই। আর যে আমার এক হাত নিকটে আসে, আমি তার এক বাঁও নিকট হয়ে যাই। যে আমার নিকট হেঁটে আসে, আমি তার নিকট দৌড়ে যাই এবং যে আমার নিকট পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকেও শরিক না করে, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢١٥٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَأَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنْ اِسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ اَنَا فَاعِلُهٗ تَرَدُّدِىْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهٗ وَلَابُدَّ لَهٗ مِنْهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২১৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার কোনো দোস্তকে দুশমন ভাবে. আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না এমন কোনো জিনিস দ্বারা– যা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে, আমি যা তার প্রতি ফরজ করেছি তা অপেক্ষা এবং আমার বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল ইবাদত দ্বারা। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি, আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, আমি হই তার কান– যা দ্বারা সে শুনে, আমি হই তার চোখ– যা দ্বারা সে দেখে, আমি হই তার হাত– যা দ্বারা সে ধরে এবং আমি হই তার পা– যা দ্বারা সে চলে এবং যখন সে আমার নিকট চায়, আমি তাকে দেই এবং যদি সে আমার আশ্রয় চায় আমি তাকে নিশ্চয় আশ্রয় দেই। আর আমি ইতস্তত করি না– যা আমি করতে চাই, মু'মিনের রূহ কবজ করার ন্যায় ইতস্তত। সে মউতকে অপছন্দ করে আর আমি অপছন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করাকে; কিন্তু মউত তার জন্য আবশ্যক ।[তবেই সে আমার নিকট পৌঁছতে পারবে] –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আমি তার চোখ, কান ও হাত-পা হই অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টিই তার চোখ, কান ও হাত পায়ের কর্ম হয়, অথবা ঐ সকল অঙ্গ দ্বারা সে যা করে আমি তার প্রতি সহজ করে দেই, যেন সে তা আমার সন্তুষ্টির জন্যই করতে পারে।

'অপছন্দ করে' অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে অপছন্দ করে, অন্যাথায় মু'মিনেরা জ্ঞানগতভাবে মউতকে পছন্দই করেন। কেননা মউত হচ্ছে আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য পুলস্বরূপ। যেমন কন্যাকে স্বামীগৃহে প্রেরণকালে পিতামাতার কান্না প্রকৃতিগতভাবে, জ্ঞানগতভাবে তারা আনন্দিতই হয়ে থাকেন।

وَعَنْهُ ٢١٦٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ قَالَ

২১৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহর একদল ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আল্লাহর স্মরণকারীদের তালাশ করে। যখন তাঁরা কোনো দলকে আল্লাহর স্মরণ করতে দেখতে পান, তখন একে অন্যকে বলেন, এসো! তোমাদের কাম্য বস্তু এখানেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর তাঁরা তাদেরকে আপন ডানা দ্বারা ঘিরে নেন এই নিকটতম আসমান পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তাঁদেরকে প্রভু পরওয়ারদিগার জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তাদের অবস্থা অধিক অবগত আছেন, আমার বান্দারা কি বলছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তাঁরা

يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ
وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَأَوْنِيْ قَالَ
فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ كَيْفَ
لَوْ رَأَوْنِيْ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ
عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا
قَالَ فَيَقُوْلُ فَمَا يَسْأَلُوْنَ قَالُوْا يَسْأَلُوْنَكَ
الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ
يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا
قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا
حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ
فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ
فَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا
رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ
لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا
مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ
لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فُلَانٌ
لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ
الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً
فُضُلًا يَبْتَغُوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوْا
مَجْلِسًا فِيْهِ ذِكْرٌ قَعَدُوْا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَأُوْا مَا بَيْنَهُمْ

বলেন, তারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ত্ব ঘোষণা, প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, কসম তোমার, তারা কখনো তোমাকে দেখেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, যদি তারা আমাকে দেখত কেমন হতো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফেরেশতাগণ বলেন, হে আল্লাহ! যদি তারা তোমাকে দেখত, তবে তারা তোমার আরও বেশি ইবাদত করত এবং আরও বেশি মর্যাদা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার নিকট তারা বেহেশত চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি তা দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! তোমার কসম, তারা তাকে কখনো দেখেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হতো যদি তারা তা দেখত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, যদি তারা তা দেখত, নিশ্চয় তারা তার প্রচণ্ড লোভ করত, তার অধিক প্রার্থনা জানাত এবং তার বেশি আগ্রহ প্রকাশ করত। [রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,] তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর দেন, দোজখ হতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, তারা কখনো কি তা দেখেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর করেন, হে রব ! তোমার কসম, তারা তা দেখেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, কেমন হতো যদি তারা তা দেখত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফেরেশতাগণ উত্তর করেন, যদি তারা তা দেখত, তবে তা হতে বেশি পলায়ন এবং তা হতে বেশি ভয় করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাদের একজন বলে উঠেন, তাদের অমুক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো শুধু তার কোনো কাজেই এসেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এমন সভাসদ যাদের কোনো সদস্যই হতভাগ্য হয় না। –[বুখারী]

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলার একদল অতিরিক্ত পর্যটক ফেরেশতা রয়েছেন যারা

وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوْا اِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِحَالِهِمْ بِهِمْ مِنْ اَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِى الْاَرْضِ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيُهَلِّلُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ وَيَسْئَلُوْنَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُوْنِىْ قَالُوْا يَسْئَلُوْنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوا جَنَّتِىْ قَالُوْا لَا اَىْ رَبِّ قَالَ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِىْ قَالُوْا وَيَسْتَجِيْرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّا يَسْتَجِيْرُوْنِىْ قَالُوْا مِنْ نَارِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِىْ قَالُوْا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِىْ قَالُوْا يَسْتَغْفِرُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَاَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوْا وَاَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا قَالَ يَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيْهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ وَاِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُوْلُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ ـ

জিকিরের মজলিস খুঁজে বেড়ান। যখন এমন কোনো মজলিস পান যাতে আল্লাহর জিকির হচ্ছে তাঁরা তাদের সাথে বসে যান এবং একে অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে জিকিরকারীদের হতে নিকটতম আসমান পর্যন্ত সমস্ত স্থানকে ঘিরে নেন। যখন জিকিরকারীগণ মজলিস ত্যাগ করে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন, ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে অতঃপর আরও উপরের দিকে উঠে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি অবগত আছেন, তোমরা কোথা থেকে আসলে? তাঁরা বলেন, আমরা তোমার এমন বান্দাদের নিকট হতে এসেছি যারা জমিনে আছে এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ত্ব ও একত্ব ঘোষণা করছে, প্রশংসা করছে ও তোমার নিকট প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, তারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করছে? ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার জান্নাত প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তাঁরা বলেন, না হে পরওয়ারদিগার! তিনি বলেন, কেমন হতো যদি তারা আমার জান্নাত দেখত? অতঃপর ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমার নিকট পানাহও চাচ্ছে। তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, কোন জিনিস হতে পানাহ চাচ্ছে? তাঁরা বলেন, তোমার দোজখ হতে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি আমার দোজখ দেখেছে? তাঁরা উত্তর করেন, না, হে আল্লাহ! তখন তিনি বলেন, কেমন হতো যদি তারা আমার দোজখ দেখত? অতঃপর তাঁরা বলেন, তারা তোমার নিকট ক্ষমাও চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং দান করলাম যা তারা আমার নিকট চাচ্ছে আর পানাহ দিলাম যা হতে তারা পানাহ চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, প্রভু হে, তাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গুনাহগার বান্দা, সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের সাথে বসে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। তারা এমন দল যাদের সাথী হতভাগ্য হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'নিকটতম আসমান' সম্পর্কে কুরআনে রয়েছে– "আমি নিকটতম আসমানকে বাতিরাজি [নক্ষত্ররাজি] দ্বারা সুশোভিত করেছি।" যাতে বুঝা গেল যে, এ মহাশূন্য, অগণিত নক্ষত্র ও সৌরজগতসমূহ নিকটতম আসমানের মধ্যেই অবস্থিত এবং তা সকলের ঊর্ধ্বে। আধুনিককালের বিজ্ঞানীগণ বলেন, দূরবীক্ষণে আসমান বলে কোনো জিনিস দেখা যায় না। এর জবাবে বলা যায় যে, আসমান তাদের বর্তমান দূরবীক্ষণের নাগালের বাইরে, তা আরো ঊর্ধ্বে বা দূরেও বিদ্যমান নেই, তা কে বলল?

وَعَنْ ٢١٦١ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاُسَيْدِيِّ (رض) قَالَ لَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَأْىُ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هٰذَا فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَأْىُ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِىْ وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِىْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১৬১. অনুবাদ : হযরত হানযালা ইবনে রুবাইয়ে উসাইদী (রা.) বলেন, আমার সাথে হযরত আবূ বকরের সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, কেমন আছ হানযালা? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! এ কি বল হানযালা? আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থাকি, তিনি আমাদের বেহেশত-দোজখ স্মরণ করিয়ে দেন যেন আমরা সেটা চোখে দেখি; কিন্তু আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হতে বের হয়ে আসি এবং বিবি-বাচ্চা ও ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই, তা অনেকটা ভুলে যাই। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমরাও এরূপই অনুভব করি। অতঃপর আমি ও হযরত আবূ বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হানাযালা মুনাফিক হয়ে গেছে ; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কেমন কথা? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট থাকি, আর আপনি আমাদেরকে বেহেশত-দোজখের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যেন তা আমাদের চোখে দেখি; কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট হতে বের হয়ে বিবি-বাচ্চা ও ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই, তখন তা অনেকটা ভুলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁর কসম যাঁর হাতে আমার জান রয়েছে, যদি তোমরা সর্বদা ঐরূপ থাকতে, যেরূপ আমার নিকট থাক এবং সর্বদা জিকির-ফিকিরে থাকতে, নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা [করমর্দন] করতেন; কিন্তু কখনো ঐরূপ আর কখনো এরূপ হবেই হানযালা! এটা তিনি তিনবার বললেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'এরূপ হবেই'- অর্থাৎ সংসার ধর্ম বাকি থাকার জন্য এটা আবশ্যক, ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। সুতরাং এটা ক্ষতিকর নয়। যে হানযালাকে ফেরেশতা গোসল দিয়েছিলেন, ইনি তিনি নন; বরং তিনি হলেন হানযালা ইবনে মালেক।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١٦٢ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ - (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّ مَالِكًا وَقَفَهُ عَلٰى اَبِى الدَّرْدَاءِ)

২১৬২. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে, তোমাদের কার্যসমূহের মধ্যে কোনটি উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকট অধিক পবিত্র ও তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অধিক কার্যকর, সর্বোপরি তোমাদের পক্ষে সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং এ কথা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাদের গর্দান কাটবে, আর তারা তোমাদের গর্দান কাটবে [অর্থাৎ জিহাদ]? তাঁরা উত্তর করলেন, হ্যাঁ বলুন! তখন তিনি বললেন, আল্লাহর জিকির বা স্মরণ। –[মালেক, আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) এটাকে মাওকূফ হাদীস অর্থাৎ আবুদ্দারদার কথা বলে মনে করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সকল আমল বা কাজের মূল হলো অন্তরে আল্লাহর স্মরণ। তাই তা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

وَعَنْ ٢١٦٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رض) قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

২১৬৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) বলেন, একদা এক বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, হুজুর ! সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার জন্যই খুশি যার হায়াত দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল নেক হয়েছে [অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম।] অতঃপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আমল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি দুনিয়া ত্যাগ করবে, আর তখন তোমার মুখে আল্লাহর জিকির থাকবে। –[আহমদ ও তিরমিযী]

وَعَنْ ٢١٦٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২১৬৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে পৌঁছবে, তখন তার ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, বেহেশতের বাগান কি? তিনি বললেন, জিকিরের হালকা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হালকা' অর্থ বৃত্ত। অর্থাৎ মজলিস। 'ফল খাবে' অর্থাৎ তোমরাও কিছু জিকির করবে।

وَعَنْ ٢١٦٥ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةً . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد)

২১৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো স্থানে বসেছে আর তথায় আল্লাহর স্মরণ করেনি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সে বৈঠক তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়েছে। এরূপ যে ব্যক্তি কোনো শয়নস্থলে শুয়েছে অথচ তথায় আল্লাহর স্মরণ করেনি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তা তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْهُ ٢١٦٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِ اِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২১৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে কোনো দল আল্লাহর স্মরণ না করে কোনো মজলিস হতে উঠল, নিশ্চয় তারা গাধার মৃতদেহ খেয়ে উঠল। সে মজলিস তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। –[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

وَعَنْهُ ٢١٦٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১৬৭ অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো দল কোনো মজলিসে বসল অথচ আল্লাহর স্মরণ করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরূদ পাঠাল না, নিশ্চয় তা তাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হলো। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাদের শাস্তিও দিতে পারেন, আর যদি ইচ্ছা করেন মাফও করে দিতে পারেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٢١٦٨ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ كَلَامِ ابْنِ اٰدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ اِلَّا اَمْرٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ اَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২১৬৮. অনুবাদ : হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ হতে নিষেধ অথবা আল্লাহর জিকির ব্যতীত আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার পক্ষে ক্ষতিকর, কল্যাণকর নয়। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এটা গরীব হাদীস]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'ক্ষতিকর' অর্থাৎ লাভের কারণ নয়। সুতরাং মুবাহ কথায় ক্ষতি না হলেও তা লাভের কারণ নয়।

وَعَنْ ٢١٦٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১৬৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি কথা বলো না। কেননা আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি কথা অন্তর শক্ত হওয়ার কারণ, আর শক্ত অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা হতে সর্বাপেক্ষা দূরে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٢١٧٠ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذُهٗ فَقَالَ اَفْضَلُهٗ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى اِيْمَانِهٖ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২১৭০. **অনুবাদ :** হযরত ছাওবান (রা.) বলেন, যখন এ আয়াত নাজিল হলো– 'আর যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে' [শেষ পর্যন্ত] আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। তখন তাঁর কোনো সাহাবী বললেন, এটা তো সোনা-রূপা সম্পর্কে নাজিল হলো। আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা সঞ্চয় করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো আল্লাহর জিকিরকারী রসনা, কৃতজ্ঞ অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তার ঈমানের [দীনের] ব্যাপারে তাকে [স্বামীকে] সহযোগিতা করে।

–[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের বাক্য زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى اِيْمَانِهٖ [ঈমানদার স্ত্রী, যে তার ঈমানের তথা দীনের ব্যাপারে স্বামীকে সহযোগিতা করে] এর মর্মার্থ হলো, উক্ত স্ত্রী ধর্মীয় কার্যক্রম ও দীনি দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে তার স্বামীকে সহযোগিতা করবে। যেমন– নামাজের সময় হলে তার স্বামীকে নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, রমজান মাসে রোজা রাখার ব্যাপারে স্বামীকে সহযোগিতা করবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল ইবাদত-বন্দেগিতেও স্বামীকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে। সে বাড়িতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যাতে স্বামী সারাক্ষণ পুণ্যকর্মে লিপ্ত থাকেন এবং অপকর্ম, অবৈধ উপার্জন ও হারাম পেশা থেকে বিরত থাকেন। এমনকি স্বামী যদি কোনোরূপ মন্দ কর্মে লিপ্ত হন, তাহলে স্ত্রী তাকে সেই মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১১০]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١٧١ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلٰى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ اٰللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ قَالُوْا اٰللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا غَيْرُهٗ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْزِلَتِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّىْ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ هٰهُنَا

২১৭১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একদা আমীরে মুআবিয়া (রা.) মসজিদের এক বৃত্তাকার মজলিসে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে বললেন, আপনারা কি কাজে এখানে বসে আছেন? তাঁরা বললেন, আমরা আল্লাহর জিকির করছি। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলুন, আপনারা এখানে এছাড়া অন্য কোনো কাজে বসেননি তো? তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি আমরা এখানে অন্য কোনো কাজে বসিনি। অতঃপর তিনি বললেন, জেনে রাখুন আমি আপনাদের প্রতি অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাইনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার মতো মর্যাদাবান সাহাবীগণের মধ্যে আমার ন্যায় এত কম হাদীস আর কেউ বর্ণনা করেননি। [শুনুন একটি হাদীস] একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় ঘর হতে বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছলেন এবং বললেন,

قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا قَالَ اٰللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ قَالُوْا اٰللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلَّا ذٰلِكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلٰكِنَّهٗ اَتَانِىْ جِبْرَئِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلٰئِكَةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আপনারা এখানে কি কাজে বসে আছেন? তাঁরা বললেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহর জিকির করছি এবং তিনি যে আমাদেরকে ইসলামের প্রতি হেদায়েত করেছেন ও আমাদের প্রতি ইহসান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আপনারা আল্লাহর শপথ করে বলতে পারেন কি আপনারা এখানে এটা ছাড়া অন্য কোনো কাজে বসেননি? তাঁরা বললেন, আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমরা এটা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নিয়ে বসিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুনুন, আপনাদের প্রতি অবিশ্বাসবশত আমি আপনাদেরকে শপথ করাইনি; বরং ব্যাপার হলো এখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আপনাদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত মুআবিয়া (রা.) জ্ঞানী ব্যক্তি ও ওহীর লেখক ছিলেন। তাঁর ভগ্নি হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন বিধায় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘরে বেশি যাতায়াত করতেন। এটা তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট মর্যাদা লাভের কারণ।

وَعَنْ ٢١٧٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২১৭২ অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের [নফলী] বিধিবিধান আমার উপর অনেক। আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলে দিন, যার উপর আমি সর্বদা অটল থাকতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর জিকিরের সাথে থাকে।

-[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

وَعَنْ ٢١٧٣ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ وَاَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهٖ فِى الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২১৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট বান্দাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাবান হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও নারী। আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী অপেক্ষাও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি সে আপন তরবারি দ্বারা কাফের ও মুশরিকদেরকে কাটে এমনকি, তার তরবারি ভেঙ্গে যায়, আর সে নিজে রক্তাক্ত হয়, তা হতেও আল্লাহর জিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। -[আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ জাতীয় হাদীসসমূহ জিহাদের ফজিলত সম্পর্কীয় সহীহ হাদীসের বিপরীত।

وَعَنْ ٢١٧٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ تَعْلِيْقًا)

২১৭৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– শয়তান আদম সন্তানের অন্তরের উপরে জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর স্মরণ করে তখন শয়তান সরে যায় আর যখন সে গাফেল হয়, সে তার অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। –[বুখারী তা'লীকরূপে]

وَعَنْ ٢١٧٥ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ ذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِّيْنَ وَ ذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ كَغُصْنٍ اَخْضَرَ فِىْ شَجَرٍ يَابِسٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِىْ وَسْطِ الشَّجَرِ وَ ذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِىْ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَ ذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ يُرِيْهِ اللّٰهُ مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَىٌّ وَ ذَاكِرُ اللّٰهِ فِى الْغَافِلِيْنَ يُغْفَرُ لَهٗ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيْحٍ وَاَعْجَمَ وَالْفَصِيْحُ بَنُوْ اٰدَمَ وَالْاَعْجَمُ الْبَهَائِمُ ـ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

২১৭৫. অনুবাদ : ইমাম মালেক (র.) বলেন, আমার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, গাফেলদের মধ্যে জিকিরকারী যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদের সাথে যুদ্ধকারীর মতো, আর গাফেলদের মধ্যে জিকিরকারী শুষ্ক গাছের মধ্যে কাঁচা ডালের মতো। অপর বর্ণনায় আছে, শুষ্ক তরুরাজির মধ্যখানে সবুজ তরুর সদৃশ। গাফেলদের মধ্যে জিকিরকারী যেমন অন্ধকার ঘরে বাতি। গাফেলদের মধ্যে জিকিরকারীদেরকে জীবদ্দশায়ই তার বেহেশতের স্থান দেখানো হবে এবং গাফেলদের মধ্যে জিকিরকারীর গুনাহ মানুষ ও পশুর সংখ্যা পরিমাণ মাফ করে দেওয়া হবে। –[রাযীন]

وَعَنْ ٢١٧٦ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا اَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২১৭৬. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবল (রা.) বলেন, কোনো বান্দা এমন কোনো আমল করতে পারে না যা তাকে আল্লাহর জিকির অপেক্ষা আল্লাহর আজাব হতে অধিক রক্ষা করতে পারে। –[মালেক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢١٧٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২১৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট থাকি, যখন সে আমার জিকির করে এবং আমার জন্য তার ওষ্ঠ নড়ে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٢١٧٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَىْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا مِنْ شَىْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهٖ حَتّٰى يَنْقَطِعَ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২১৭৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– প্রত্যেক জিনিসেরই একটা মাজন রয়েছে, আর অন্তরের মাজন হলো জিকির। আল্লাহর জিকির অপেক্ষা আল্লাহর আজাব হতে অধিক আশ্রয়দাতা আর কোনো জিনিসই নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় তরবারি মারলেও নয় এমনকি [যদি] তা ভেঙ্গেও যায়। –[বায়হাকী দা'আওয়াতুল কাবীরে]

মহান আল্লাহ অসীম তেমনি তাঁর নামও সীমাহীন, কিন্তু আমরা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রায় শতাধিক নাম দেখতে পাই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ 'আল্লাহর কতক উত্তম নামসমূহ রয়েছে, সেগুলো দ্বারা তাঁকে ডাক।' তাঁর নামসমূহ দু শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা–

১. সত্তাবাচক নাম : এটা মাত্র একটি। আর তা হলো "আল্লাহ"।

২. গুণবাচক : اَللّٰهُ ব্যতীত আর সবগুলো হলো গুণবাচক নাম। এগুলো বিভিন্ন দিক থেকে যেমন, صِفَةٌ سَلْبِيَّةٌ যথা– اَلْقُدُّوْسُ، اَلْاَوَّلُ অথবা حَقِيْقَةٌ ثُبُوْتِيَّةٌ যথা– اَلْقَادِرُ، اَلْعَلِيْمُ অথবা اِضَافِيَّةٌ যথা– اَلْحَمِيْدُ، اَلْمَلِيْكُ কিংবা بِاعْتِبَارِ فِعْلٍ مِنْ اَفْعَالِهٖ যথা– اَلْخَالِقُ، اَلرَّازِقُ ইত্যাদি।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আর আশআরীদের মতও হলো, اِسْمٌ কখনো عَيْنُ الْمُسَمّٰى হবে যেমন– اَللّٰهُ কখনো غَيْرُ الْمُسَمّٰى হবে যথা– اَلْخَالِقُ আবার কখনো لَا يَكُوْنُ عَيْنَهٗ وَلَا غَيْرَهٗ হবে যথা– اَلْعَالِمُ কেননা عِلْمٌ-টা তার عَيْنُ ذَاتٍ নয়। কিন্তু মু'তাজেলাগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। –[মিরকাত]

উপকারিতা : আল্লাহর সত্তাবাচক নাম হতে আমাদের উপকার লাভের পন্থা হলো, এর অধিকারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাঁকে সর্বদা স্মরণে রাখা, অন্তরে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং তাঁকে সৃষ্টির মূল ও সর্বগুণের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।

আর গুণবাচক নাম হতে উপকার লাভের পন্থা হলো দু প্রকার– ১. দয়া-দাক্ষিণ্য বা ক্ষমাগুণসূচক নাম হলে তাঁর নিকট হতে তা লাভের আশা রাখা এবং ২. নিজে অন্যের প্রতি তা প্রকাশের চেষ্টা করা। যথা– আল্লাহ দয়াময় ও ক্ষমাশীল বলে তাঁর নিকট হতে দয়া ও ক্ষমার আশা রাখা এবং নিজে অন্যের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করা। একে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া বলে। আর তাঁর রোষ ও শাস্তি প্রদানসূচক নাম হলো– ১. তাঁর রোষ ও শাস্তি হতে আশ্রয় চাওয়া, তাঁর রোষ ও শাস্তির যোগ্য কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং ২. নিজের ব্যাপারে কাউকে শাস্তি দান হতে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন যে অন্যকে ক্ষমা করে। –[আ'যমী]

* জনৈক বুজুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নিকট কেউ বায়'আত গ্রহণ করতে আসলে তাকে প্রথমে অজু করে আসতে বলতেন, তারপর তার সম্মুখে উঁচু আওয়াজে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আল্লাহর নামসমূহ পড়তে শুরু করতেন। যে নামের প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতেন তার তালিম তাকে দিয়ে দিতেন, ফলে সে অতি দ্রুতই আল্লাহমুখী হয়ে যেত। –[মাযাহেরে হক]

এখানে জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর কোনো গুণ মানুষের গুণের মতো নয়, যদিও প্রকাশ্যভাবে এক রকম বলে মনে হয়। যথা– ইলম বা জ্ঞানের গুণ। এ গুণে আল্লাহ গুণান্বিত এবং মানুষও গুণান্বিত, কিন্তু এর মধ্যে পার্থক্য আসমান জমিনের। মানুষের জ্ঞান অপ্রতুল ও ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, আবার তাও ত্রুটিমুক্ত নয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষ কোনো জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় না, আর আল্লাহর জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ নয়।

আল্লাহর নামসমূহ 'তওফিকী' অর্থাৎ কুরআন-হাদীসে তাঁর যে সকল নামের উল্লেখ রয়েছে তাঁর প্রতি কেবল সে সকল নামই প্রয়োগ করা জায়েজ। এর উপর কিয়াস করে কোনো নাম বানিয়ে বলা যায় না। যথা– তিনি 'শাফী' বা আরোগ্যদাতা বলে তাঁকে তবীব বা চিকিৎসক বলা যায় না। –[আযমী]

* উল্লেখ্য যে, মূল কিতাবে অত্রস্থানে "كِتَابُ أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى" রয়েছে অথচ প্রথম পরিচ্ছেদ ব্যতীত পরবর্তী সকল পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহ নাম সম্পর্কিত নয়; বরং দোয়া অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, কাজেই একে অধ্যায় না বলে পরিচ্ছেদ বলাই যুক্তিসঙ্গত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١٧٩ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই– এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে সে বেহেশতে যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বিজোড়, বিজোড়কে ভালোবাসেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَحْصَا - গণনা করে বা মুখস্থ করে। وِتْرٌ - বেজোড়।

وَجْهُ حَصْرِ تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا **[নিরানব্বই নামে সীমিতকরণের কারণ]** : ইমাম তূরপুশতী (র.) বলেন, কুরআন ও হাদীসে ৯৯টি নাম ব্যতীত আরো অনেক নাম রয়েছে যেমন– جَمِيْلٌ، دَائِمٌ ، ذُو الْمَعَارِجِ، ذُو الطَّوْلِ، مَلِيْكٌ، كَافِيٌّ، رَبٌّ، مَوْلٰى، فَاطِرٌ ইত্যাদি অনেক নাম থাকা সত্ত্বেও ৯৯টি নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? এর জবাব নিম্নরূপ–

১. মূলত এখানে ৯৯টিতে সীমিত করা উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রসিদ্ধ শব্দ ও সুস্পষ্ট অর্থ হওয়ার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে ৯৯টি নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

২. কিছু সংখ্যক বিজ্ঞজনের মতে, অত্র হাদীসটির পুরো একটি বাক্য– "اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا" অংশটি পৃথক বা বিচ্ছিন্ন অংশ নয়; বরং এটি اَسْمَاءٌ مَعْدُوْدَةٌ-এর স্থলে وَصْفٌ হিসেবে এসেছে। যেমন কোনো ব্যক্তির কথা– "اِنَّ لِفُلَانٍ اَلْفُ شَاةٍ اَعَدَّهَا لِلْاَضْيَافِ" -এর দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, তার ১০০০ [এক হাজার] বকরি ব্যতীত আর কোনো বকরি নেই। এমনিভাবে এখানেও এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ৯৯টি ব্যতীত আর নাম নেই। যেমন ইবনে বাত্তাল কাজি আবূ বকর (র.) হতে বর্ণনা করেন–

اِنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِى الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّهُ لَيْسَ لِلّٰهِ مِنَ الْاَسْمَاءِ اِلَّا هٰذِهِ الْعَدَدَ اِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيْثِ اِنَّ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

আর ৯৯ নামে যে সীমিত নয় তার উপর এটাও একটা দলিল যে, এ নামগুলো প্রায়ই গুণবাচক, আর আল্লাহর صِفَاتْ -এর কোনো সীমা নেই। জমহুর ওলামাগণের মতেও আল্লাহর নাম ৯৯ তে সীমিত নয়। ইমাম নববী (র.) বর্ণনা করেন যে, ওলামাগণ এ কথার উপর ঐকমত্য। এর সমর্থনে অত্র হাদীসও রয়েছে–

مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ فِىْ دُعَاءٍ وَاَسْأَلُكَ بِاَسْمَاءِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ .

তবে উপরোল্লিখিত নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণনার হেকমত সম্পর্কে ইমাম রাযী (র.) অধিকাংশ হতে বর্ণনা করেন যে,

ক. এটা একটা تَعَبُّدِىْ مُعَامَلَةٌ তথা ইবাদত সম্পর্কীয় বিষয়, যার অর্থ কল্পনা করা যায় না।

খ. অথবা, কুরআনের মধ্যে ৯৯টি নামের উল্লেখ রয়েছে, তাই এ সীমিতকরণ।

গ. কিছু সংখ্যক বলেন, জান্নাতের স্তরের মতো আল্লাহর নামও ১০০টি। তবে এর মধ্যে একটি হলো اِسْمُ اَعْظَمْ এটা কাউকে অবহিত করা হয়নি। যেন তিনি বলেছেন- فَكَانَّهُ قَالَ مِائَةٌ وَلٰكِنَّ وَاحِدٌ مِنْهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى এ হিসেবে ৯৯টি বলা হয়েছে।

ঘ. কিছুসংখ্যক সুফি বলেছেন, মানুষের অন্তরে ৯৯টি অন্ধকার তথা মন্দ চরিত্র রয়েছে, মহানবী ﷺ এর বিপরীত ৯৯টি উত্তম নাম অবহিত করেছেন যাতে প্রত্যেক আলোকময় নামের কারণে ঐ সব অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।
-[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬১]

قَوْلُهُ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ-এর ব্যাখ্যা :

১. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, এখানে اِحْصَاءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ সবগুলো নাম পড় কোনো একটিতে স্থির থেকো না তথা সবগুলো নামের অসিলায় প্রার্থনা কর।

২. অথবা, اِحْصَاءٌ-এর অর্থ হলো বিশ্বাস স্থাপন করা বা আস্থা রাখা। যেমন কুরআনে এসেছে- عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ অর্থাৎ যে এসব নামের উপর দৃঢ় আস্থা রাখে এবং সে অনুযায়ী আমল করে যেমন- رَزَّاقٌ বলে এ আস্থা স্থাপন করা যে, আল্লাহ তা'আলা রিজিকদাতা।

৩. অথবা, এখানে اِحْصَاءٌ দ্বারা اِحَاطَةٌ মুখস্থ করা যা আরবদের কথা فُلَانٌ ذُوْ حَصَاةٍ اَىْ ذُوْ عَقْلٍ وَمَعْرِفَةٍ থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪. কিংবা اِحْصَاءٌ-এর مَعْرِفَةٌ বা পরিচিত হওয়া। কেননা যে এগুলোকে পূর্ণভাবে চেনে সে অবশ্যই সেগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করবে।

৫. অথবা, এগুলোর উপর দৃঢ় আস্থা রেখে গণনা করা উদ্দেশ্য- لِاَنَّ الدَّهْرِىَّ لَا يَعْتَرِفُ بِالْخَالِقِ وَالْفَلْسَفِىَّ لَا يَعْتَرِفُ بِالْقَادِرِ অর্থাৎ কেননা জড়বাদীরা خَالِقٌ-কে স্বীকার করে না, আর দার্শনিকগণ قَادِرٌ-কে মানে না।

৬. ইমাম নববী (র.) ও ইমাম বুখারী (র.)সহ অন্যান্যদের থেকে اِحْصَاءٌ-এর অর্থ اَلْحِفْظُ বর্ণনা করেছেন- هٰذَا هُوَ الْاَظْهَرُ لِثُبُوْتِهٖ نَصًّا فِى الْخَبَرِ. -[তানযীমুল আশতাত : খ. ২ পৃ. ৬১]

قَوْلُهُ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ-এর ব্যাখ্যা :

১. وِتْرٌ শব্দের অর্থ হলো- বিজোড়, একক, আর আল্লাহর ব্যাপারে এর অর্থ হলো- اِنَّهُ الْوَاحِدُ الَّذِىْ لَا نَظِيْرَ لَهُ فِىْ ذَاتِهٖ وَلَا اِنْقِسَامَ অর্থাৎ তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর জাতের অনুরূপ কেউ নেই এবং কোনো বিভক্তিও নেই।
আর يُحِبُّ الْوِتْرَ-এর বর্ণনা করতে গিয়ে কাজি আয়ায (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নামের মধ্যে وِتْرٌ শব্দটি একত্ববাদ গুণের উপর বুঝায় এজন্য আল্লাহ বিজোড়কে পছন্দ করেন।

২. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তিনি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বিজোড়কে ভালোবাসেন।

৩. অথবা, শরিয়তের অধিকাংশ বিধানকে বিজোড় করার হুকুম প্রদান করেছেন। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, পবিত্রতার সংখ্যা, কাফনের কাপড় ইত্যাদি এজন্য আল্লাহ তা'আলা বিজোড়কে পছন্দ করেন। -[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬১]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢١٨٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِيُّ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِيُّ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِيُ الْبَدِيْعُ الْبَاقِيْ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২১৮০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে এগুলো মুখস্থ করবে বেহেশেত গমন করবে, আর সেগুলো হচ্ছে– 'আল্লাহ' যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। 'আররাহমানু' দয়াময়, যাঁর দয়া সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপৃত করে আছে। 'আররাহীমু' দয়াবান বা বিশেষ দয়ার অধিকারী, যা শুধু মু'মিনদের প্রতি করা হয়। 'আলমালিকু' রাজা, বাদশাহ। 'আলকুদ্দূসু' অতি পাক ও পবিত্র। ধ্বংস বা কোনো অপগুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। 'আস্‌সালামু' শান্তিময় ও নিরাপদ। কোনোরূপ অশান্তি তাঁকে ছুঁতে পারে না। 'আলমু'মিনু' নিরাপত্তাদাতা নিরাপদকারী। 'আলমুহাইমিনু' রক্ষক। 'আলআযীযু' প্রভাবশালী, অন্যের উপর বিজয়ী। 'আলজাব্বারু' শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধনকারী। 'আলমুতাকাব্বিরু' অহংকারের অধিকারী যাঁর অহংকার করা শোভা পায়। 'আলখালিকু' স্রষ্টা। 'আলবারী' ত্রুটিহীন স্রষ্টা। 'আলমুসাব্বির' প্রকল্পক ও নকশা অঙ্কনকারী। 'আলগাফফারু' বড় ক্ষমাশীল যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ মার্জনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। 'আলকাহ্‌হারু' সকল বস্তু যাঁর ক্ষমতার অধীন। ক্ষমতা প্রয়োগে যাঁর কোনো বাধা নেই। 'আলওয়াহহাব' বড় দাতা, যাঁর দান অসীম। 'আররাযযাকু' রিজিকদাতা। 'আলফাত্তাহ' যিনি প্রকাশ্য গোপন সৃষ্টির মীমাংসাকারী, বিপদমুক্তকারী। 'আলআলীমু' বড় জ্ঞাতা– সবকিছু জানেন। 'আলকাবেযু' রিজিক ইত্যাদির সংকোচনকারী। 'আলবাসেতু' রিজিক ইত্যাদির সম্প্রসারণকারী। 'আলখাফেযু' যিনি নীচে নামান। 'আররাফিউ' যিনি উপরে উঠান। 'আলমুইযযু' সম্মান ও পূর্ণতাদাতা। 'আলমুযিল্লু' অপমান ও অপূর্ণতাদানকারী। 'আসসামীউ' শ্রোতা [ছোট বড় সকল স্বরের]। 'আলবাসীরু' দর্শক [ছোট বড় সকল জিনিসের]। 'আলহাকামু' নির্দেশ দানকারী, বিধানকর্তা। 'আলআদলু' ন্যায়বিচারক যিনি যা উচিত তাই করেন। 'আললাতীফু' যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন; সূক্ষ্মদর্শী বা যিনি অতি সূক্ষ্ম বিষয়ও অবগত। 'আলখাবীরু' যিনি গুপ্ত ভেদ অবগত, ভিতরের বিষয় জ্ঞাতা। "আলহালীমু' ধৈর্যশীল, যিনি অপরাধ দেখেও সহজে শাস্তি দেন না। 'আলআযীমু'–বিরাট, বহু সম্মানী। 'আলগাফূরু' যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অতি জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেন। 'আশ্‌শাকূরু' কৃতজ্ঞ, যিনি অল্পে বেশি পুরস্কার দেন। 'আলআলিয়্যু' সর্বোচ্চে সমাসীন। 'আলকাবীরু' বিরাট, মহান, ধারণার উর্ধ্বে বড়। 'আলহাফীযু' বড় রক্ষাকারী, যিনি বান্দাদের সব বিষয় লক্ষ্য রাখেন। 'আলমুকীতু' খাদ্যদাতা; দৈহিক ও আত্মিক শক্তিদাতা। 'আলহাসীবু' যিনি অন্যের জন্য যথেষ্ট হন; যিনি যার জন্য যা

যথেষ্ট তা দান করেন। 'আলজালীলু' গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত, যাঁর মহিমার তুলনা নেই। 'আলকারীমু' বড় দাতা, আশার অতিরিক্ত দাতা; যিনি বিনা সওয়ালে দান করেন। 'আররাকীবু' যিনি সকলের সকল বিষয় লক্ষ্য রাখেন এবং সর্বদা লক্ষ্য রাখেন। 'আলমুজীবু' উত্তরদাতা, ডাকে সাড়াদাতা। 'আলওয়াসিউ' সম্প্রসারণকারী; অথবা যার দান, জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য বিপুল সম্প্রসারিত। 'আল হাকীমু' প্রজ্ঞাবান তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি সকল কাজ উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে করেন। 'আলওয়াদূদু' যিনি বান্দার কল্যাণকে ভালোবাসেন। 'আলমাজীদু' অসীম অনুগ্রহকারী। 'আলবাইছু' প্রেরক, রাসূল প্রেরণকারী, রিজিক প্রেরণকারী; কবর হতে হাশরে প্রেরণকারী। 'আশশাহীদু' বান্দাদের কাজের সাক্ষী। যিনি প্রকাশ্য বিষয় অবগত [খাবীর– যিনি গুপ্ত বিষয় অবগত]। 'আলহাক্কু' সত্য ও সত্য প্রকাশক। যিনি প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন। 'আলওয়াকীলু' কার্যকারক, যিনি বান্দাদের কাজের যোগান দেন। 'আলকাবিয়্যু' শক্তিবান, শক্তির আধার। 'আলমাতীনু' বড় ক্ষমতাবান, যার উপর কারো কোনো ক্ষমতা নেই। 'আলওলিয়্যু' যিনি মু'মিনদের ভালোবাসেন ও সাহায্য করেন। অভিভাবক। 'আলহামীদু' প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য। 'আলমুহসী' হিসাব রক্ষক, বান্দাগণ যা করে তিনি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন। 'আলমুবদিউ' বিনা নমুনায় স্রষ্টা, যিনি মডেল না দেখে সৃষ্টি করেন। 'আলমুঈদু' মৃত্যুর পর পুন সৃষ্টিকারী। যার পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। 'আলমুহ্য়ী'– জীবনদাতা। আলমুমীতু' মৃত্যুদানকারী। 'আলহাইয়্যু' চিরঞ্জীব। 'আলকাইয়্যুমু' স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা। 'আলওয়াজিদু' যিনি যা চান তা পান। 'আলমাজিদু' বড় দাতা। 'আলওয়াহিদুল আহাদু' এক ও একক, যাঁর কোনো অংশ বা অংশীদার নেই। 'আস্সামাদু' প্রধান, প্রভু। যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। 'আলক্বাদিরু' ক্ষমতাবান, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগে কারো মুখাপেক্ষী নন। 'আলমুকতাদিরু' সকলের উপর যাঁর ক্ষমতা রয়েছে। সার্বভৌম। যাঁর বিধান চরম। 'আলমুকাদ্দিমু' যিনি যাকে ইচ্ছা নিকটে করেন এবং আগে বাড়ান। 'আলমুআখখিরু' যিনি যাকে ইচ্ছা দূরে রাখেন বা পিছনে করেন। 'আলআউয়ালু' প্রথম, অনাদি। 'আলআখিরু' সর্বশেষ, অনন্ত। 'আযযাহিরু' যিনি ব্যক্ত, প্রকট গুণে ও নিদর্শনে। 'আলবাতিনু' যিনি গুপ্ত সত্তাতে। 'আলওয়ালী'–অভিভাবক, মুরব্বি। 'আলমুতাআলী' -সর্বোপরি। 'আলবাররু' মুহসিন, অনুগ্রহকারী। 'আত্তাওয়্যাবু' তওবা গ্রহণকারী। যিনি অপরাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃ অনুগ্রহ করেন। 'আলমুনতাকিমু' প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'আলআফুব্বু' বড় ক্ষমাশীল। 'আররাউফু' বড় দয়ালু। 'মালিকুল মুলক' রাজাধিরাজ, যাঁর রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। 'যুলজালালি ওয়াল ইকরাম' মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। 'আলমুকসিতু'–অত্যাচার দমনকারী, উৎপীড়ক হতে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'আলজামিউ' কিয়ামতে বান্দাদের একত্রকারী, অথবা সর্বগুণের অধিকারী। 'আলগানিয়্যু' যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। 'আলমুগনিয়্যু' যিনি কাউকে কারো মুখাপেক্ষী হতে বাঁচিয়ে রাখেন। 'আলমানিউ' বিপদে বাধাদানকারী। 'আয্যাররু' যিনি ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন। 'আননাফিউ' যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন, উপকারী। 'আননূরু' আলোক, প্রভা, প্রভাকর। 'আলহাদিয়্যু' পথপ্রদর্শক [যারা তাঁর দিকে যেতে চায় তাদেরকে]। 'আলবাদীউ' অদ্বিতীয়, অনুপম অথবা যিনি বিনা আদর্শে গড়েন। 'আলবাকী' যিনি সর্বদা থাকবেন। সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও যিনি থাকবেন। 'আলওয়ারিসু' উত্তরাধিকারী, সকলে শেষ হবে আর তিনি সকলের উত্তরাধিকারী হবেন। 'আররাশীদু'–কারো পরামর্শ বা বাতলানো ব্যতীত যাঁর কাজ উত্তম ও ভালো হয়। 'আস্সাবূরু' বড় ধৈর্যশীল। –[তিরমিযী। আর বায়হাকী দা'ওয়াতুল কাবীরে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ-এর ব্যাখ্যা : অত্র আয়াতাংশটি এখানে جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ তথা পৃথক একটি বাক্য হিসেবে উল্লিখিত, যা ৯৯টি নামের পূর্বে আনয়ন করা হয়েছে। অত্র আয়াতের অনেক স্তর রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. মুনাফিকগণ যখন শুধু মুখে মুখে অত্র কালিমা উচ্চারণ করে তখন তারা নিজের জান ও মালকে নিরাপদ করতে সক্ষম হবে কিন্তু পরকালে এর কোনো উপকারিতা তারা পাবে না।
২. মৌখিক পড়ার সাথে সাথে যদি অন্তরেও এর স্বীকৃতি প্রদান করে তবে সফল হবে।
৩. মৌখিক পাঠ করার সাথে সাথে যদি আল্লাহর নিদর্শনাবলি দেখে দেখে বিশ্বাস স্থাপন হয় তবে এই স্তর গৃহীত হবে।
৪. মৌখিক আদায়ের মাধ্যমে যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, যার ফলে دَلِيْل قَطْعِىْ সাব্যস্ত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এই স্তর গৃহীত।
৫. অত্র কালিমা মৌখিক আদায়ের সাথে এমন বিশ্বাস স্থাপন হয় যেন অন্তরের চক্ষু দ্বারা এর অর্থ অনুধাবন করছে। অর্থাৎ তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও মারেফাত অর্জিত হয়েছে এটা সর্বোচ্চ মর্যাদা।

আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের বিস্তারিত আলোচনা ও ফজিলত

১. اَللّٰهُ : এটি মহান আল্লাহর জাতি নাম। এর অর্থ হলো সেই যাতে পাক যিনি ইবাদতের যোগ্য। অধিকাংশ ওলামা বলেন, এটি সবচেয়ে বড় নাম। সাধারণ জনগণ যেন একে নিজ যবানের উপর সর্বদা রাখে এবং ভয় ও বড়ত্বের সাথে এই নামের জিকির করে। আর خَوَاصْ তথা বিশেষ ব্যক্তিদের উচিত এ নাম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা আর এটাও জানা আবশ্যক যে, এ নাম শুধু সেই সত্তার উপর প্রযোজ্য হবে যিনি একত্ববাদের সকল গুণে গুণান্বিত আর خَوَاصُ الْخَوَاصْ তথা নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য আবশ্যক হলো উক্ত নামকে তাদের অন্তরে ব্যাপৃত রাখা। উক্ত জাত ব্যতীত অন্য কোনো দিকে না ফিরা। শুধুমাত্র তাঁকে ভয় করা। কেননা তিনিই হলেন সত্য ও চিরস্থায়ী, আর সব কিছু মিথ্যা ও ধ্বংসশীল। যেমনি বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কবিদের কথার মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা হলো কবি লাবীদের এ কথাটি- اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ তথা আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছু বাতিল।

বৈশিষ্ট্য বা ফজিলত : যে ব্যক্তি "اَللّٰهُ" জিকিরটি এক হাজার বার পড়বে সে صَاحِبْ يَقِيْن বা দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হবে। আর যে প্রতি নামাজের পর একশত বার পড়বে তার অন্তর্জগৎ খুলে যাবে আর সে صَاحِبْ كَشْف হয়ে যাবে।

২. ও ৩. اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ : اَلرَّحْمٰنُ অর্থ- দাতা অতি দয়ালু আর اَلرَّحِيْمُ অর্থ- অনুগ্রহকারী। বান্দার জন্য আবশ্যক হলো সেই মহান জাতে পাকের উপর ভরসা ও নির্ভর করা এবং নিজের অন্তর্জগতকে তার জিকিরে ব্যাপৃত রাখা। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো পরোয়া না করা। আল্লাহ তা'আলার বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করা। অত্যাচারিতকে রক্ষা ও সাহায্য করা। আর অত্যাচারীকে তার অত্যাচার হতে ফিরিয়ে রাখা। আল্লাহর জিকির হতে যারা অমনোযোগী তাদেরকে সচেতন করা। পাপীদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেওয়া লাঞ্ছনার দৃষ্টিতে না দেখা। নিজের শক্তি অনুযায়ী শরিয়তের বিধিবিধানকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা এবং সামর্থ্যানুযায়ী দুঃখী-অভাবীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

বৈশিষ্ট্য বা ফজিলত : যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ একশতবার পাঠ করবে মহান আল্লাহ তার অন্তর হতে অলসতা, ভুলে যাওয়া এবং কাঠিন্য দূর করে দেবেন এবং সমস্ত সৃষ্ট জীবকে তাঁর প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল করে দেবেন।

৪. اَلْمَلِكُ : অর্থ- রাজা। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত বাদশাহ। আসমান জমিন সবকিছু তার হুকুমে চলে। যে ব্যক্তি এই নামকে (اَلْقُدُّوْسُ) সহ তথা مَلِكُ الْقُدُّوْس মিলিয়ে নিয়মিত পাঠ করে আর যদি সে রাজা-বাদশাহ হয় তবে আল্লাহ তার রাজ্য ও রাজত্বকে ঠিক রাখবেন। আর যদি রাজা-বাদশাহ না হয় তবে নিজের আত্মা নিজের অনুগত হবে। আর যে ব্যক্তি ইজ্জত ও সম্মানের জন্য পাঠ করে তবে তার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

হযরত শাহ আব্দুর রহমান বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ৯০ বার এ "اَلْمَلِكُ" টি পড়ে সে শুধু ধনীই হবে না; বরং রাজা-বাদশাহ তার বাধ্য হয়ে যাবে। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা বেড়ে যাবে।

৫. اَلْقُدُّوْسُ : এর অর্থ হলো- অতি পবিত্র। ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি এটা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা অতি পবিত্র তখন তার উচিত হচ্ছে এটা কামনা করা যে, আল্লাহ সর্বাবস্থায় সকল দোষ-ত্রুটি, মসিবত ও পাপের অপবিত্রতা হতে তাকে দূরে রাখুক।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় এ اِسْم টি পাঠ করে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। জুমার নামাজের পর কোনো ব্যক্তি এ নামের সাথে اَلسُّبُّوْحُ মিলিয়ে (اَلْقُدُّوْسُ السُّبُّوْحُ) রুটির টুকরার উপর লিখে আহার করলে তার মধ্যে ফেরেশতার গুণ সৃষ্টি হবে। পলায়ন ও বিপদের সময় শত্রু হতে রক্ষার জন্য বেশি বেশি পাঠ করা। মুসাফিরগণ বেশি বেশি পাঠ করলে

কোনো বিপদের সম্মুখীন হবে না। আর কোনো মিষ্টি দ্রব্যের উপর এ اِسْم টি ৩১৯ বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে শত্রুকে খাওয়ালে শত্রু দয়ালু ও অনুগ্রহশীল হয়ে যাবে।

৬. اَلسَّلَامُ : তিনি সব রকমের দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত। যদি কেউ এ পবিত্র নামটি কোনো রোগের উপর ১১১ বার পড়ে তবে তা আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো হয়ে যায়। আর যে এটা সব সময় পাঠ করে তার থেকে ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়।

৭. اَلْمُؤْمِنُ : নিরাপত্তা প্রদানকারী। বান্দার উচিত অন্যকে বিপদ-মসিবত ও কষ্ট হতে নিরাপদ রাখা। যে ব্যক্তি এ পবিত্র নামকে বেশি বেশি পাঠ করে অথবা লিখে নিজের কাছে রাখে আল্লাহ তা'আলা তাকে শয়তানের অমঙ্গল হতে নিরাপদ রাখেন এবং কোনো ব্যক্তি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে না। আর তার অন্তর্জগৎ ও বাহির জগৎ আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখেন। আর যে ব্যক্তি এটা অত্যধিক পাঠ করে সকল সৃষ্টি তার আনুগত্য স্বীকার করে।

৮. اَلْمُهَيْمِنُ : সকল বস্তুর রক্ষক। যে ব্যক্তি গোসলের পর এই اِسْم টি ১১৫ বার পড়বে সে অদৃশ্য জগতের বিষয়াবলি সম্পর্কে অবহিত হবে। আর যে সব সময় পাঠ করে সে সব রকমের মসিবত হতে রক্ষা পাবে এবং বেহেশতবাসী হবে।

৯. اَلْعَزِيْزُ : মহাপরাক্রমশালী। তাঁর উপর কারো প্রাধ্যান্য পাবার কোনো সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি এ ইসম মোবারকটি ফজর নামাজের পর পাঠ করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে কারো মুখাপেক্ষী হবে না। এছাড়াও এর আরো অনেক আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১০. اَلْجَبَّارُ : বিধ্বস্ত কর্মসমূহকে সঠিককারী। কারো মতে বান্দাকে সেই কাজ করতে বাধ্য করা যার ইচ্ছা তিনি করেছেন। যে ব্যক্তি এ ইসম মুবারকটি مُسَبَّحَاتُ عَشْرٌ -এর পরে ২১ বার পাঠ করবে সে অত্যাচারীর অমঙ্গল হতে রক্ষা পাবে আর যে ব্যক্তি এটা সর্বদা পাঠ করবে সে মানুষের গিবত ও মন্দ আচরণ হতে অভয় ও নিরাপদ থাকবে। আর যে অর্থশালী ও নেতা হতে চায় সে উক্ত নামকে আংটির মধ্যে লিখে তা পরিধান করে তবে জনগণের অন্তরে তার ভয়ভীতি ও প্রেমপ্রীতি সৃষ্টি হবে।

১১. اَلْمُتَكَبِّرُ : অত্যন্ত সম্মানী। যে ব্যক্তি স্ত্রীসহবাসের পূর্বে এ নামটি দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎ সন্তান দান করবেন। আর সকল কাজের শুরুতে অধিক পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তার উদ্দেশ্য সফল করে দেবেন।

১২. اَلْخَالِقُ : সৃষ্টিকারী। যে ব্যক্তি এ নামটি সর্বদা পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করে দেবেন যে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকবে এবং এ নামের বরকতে মহান আল্লাহ তার অন্তর ও চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেন। হযরত শাহ আব্দুর রহমান (র.) বলেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় এটা বেশি বেশি পাঠ করবে তার অন্তর ও মুখমণ্ডল আলোকময় ও উজ্জ্বল হবে এবং সকল কর্মে সে ব্যাপৃত হবে।

১৩. اَلْبَارِئُ : সৃষ্টিকারী। যে ব্যক্তি এ মুবারক নামটি সপ্তাহে একশতবার পাঠ করবে মহান আল্লাহ তাকে কবরে না রেখে ঊর্ধ্বজগতের বাগানে নিয়ে যাবেন। আর কোনো চিকিৎসক যদি পৃথকভাবে পাঠ করে চিকিৎসা করে তবে সফল হবে।

১৪. اَلْمُصَوِّرُ : আকৃতি প্রদানকারী বা সৃষ্টিকারী। কোনো বন্ধ্যা নারী যদি সাত দিন রোজা রেখে প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় এ মুবারক নামটি একুশবার পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা পান করে আল্লাহ তাকে নেক সন্তান দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো বিপদাপদের সময় এটা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উক্ত বিষয়কে সহজ করে দেবেন।

১৫. اَلْغَفَّارُ : বান্দার পাপসমূহ ক্ষমাকারী এবং দোষত্রুটি আবৃতকারী। পাপ কার্য সংঘটিত হওয়ার পর বেশি বেশি পাঠ করা এবং শেষরাতে তওবা করা উত্তম। আর যে ব্যক্তি জুমার নামাজের পর একশতবার এভাবে يَا غَفَّارُ اِغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ পাঠ করবে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।

১৬. اَلْقَهَّارُ : অত্যন্ত ক্ষমতাধর, তাঁর সম্মুখে সবই অক্ষম। যে ব্যক্তি এটা বেশি বেশি পাঠ করবে তার অন্তর থেকে আল্লাহ দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে দেবেন এবং তার শেষ পরিণাম হবে অত্যন্ত ভালো। আর আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে প্রেমপ্রীতি সৃষ্টি করে দেন। কোনো ব্যক্তি তার গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে এ নাম একশতবার পাঠ করে তবে তা সহজ হয়ে যায়। আর যে এটা সর্বদা পাঠ করে তার অন্তর হতে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর হয়ে যায়। আর যদি কেউ ফরজ, সুন্নত ও নফল নামাজের মধ্যখানে পাঠ করে তবে বড় বড় দুশমনও পরাস্ত হয়ে যাবে।

১৭. اَلْوَهَّابُ : কোনোরূপ প্রতিদান ব্যতীত অধিক দানকারী। যে ব্যক্তি দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত সে যদি সর্বদা এটা পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন প্রাচুর্য দান করবেন যে, সে হয়রান হয়ে যাবে। আর যে লিখে সাথে রাখবে

তারও উক্ত অবস্থা হবে। যে ব্যক্তি চাশতের নামাজের পর সেজদার কোনো আয়াত পড়ে পুনঃ সেজদায় গিয়ে এই মুবারক নামটি সাতবার পড়ে তবে সে সকল সৃষ্টি থেকে মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়বে। আর যদি কোনো ব্যক্তি সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে মধ্যরাতে উঠে নিজ গৃহে বা মসজিদের বারান্দায় গমন করে তিনবার সেজদা করে হাত উঠিয়ে এই মুবারক নামটি একশতবার পাঠ করে তবে মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেবেন।

শাহ আব্দুল আজীজ (র.) বলেন, রিজিকের প্রশস্ততার জন্য চাশতের সময় বারো রাকাত নামাজ পড়ে সিজদায় গিয়ে يَا وَهَّابُ একশতবার বা পঞ্চাশবার পাঠ করলে অবশ্যই তার রিজিকের অভাব হবে না।

১৮. اَلرَّزَّاقُ : রিজিক সৃষ্টিকারী এবং সৃষ্টিজগতের নিকট রিজিক প্রেরণকারী। যে ব্যক্তি সুবহি সাদেকের পর ফজরের নামাজের পূর্বে নিজ গৃহের চার কোণে দশ দশ বার করে পড়ে তবে সে ঘরে দুঃখ-দুর্দশা ও দরিদ্রতা কখনো আসবে না। তবে নিয়ম হলো ডানদিক হতে পড়া শুরু করবে এবং কেবলামুখী হয়ে পড়তে হবে।

১৯. اَلْفَتَّاحُ : হুকুমকারী। কারো মতে রহমতের রিজিকের দরজা প্রকাশকারী। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর নিজের বক্ষের উপর উভয় হাত রেখে এই মুবারক নামটি ১৭ বার পাঠ করে তবে তার অন্তরের ময়লা চলে যাবে এবং তার অন্তর্জগৎ অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২০. اَلْعَلِيْمُ : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছু যিনি জানেন। যে ব্যক্তি এটি অত্যধিক পাঠ করে মহান আল্লাহ তাকে নিজের পরিচিতি (مَعْرِفَةٌ) অধিক দান করেন। যে ব্যক্তি নামাজের পর ১০০ বার يَا عَالِمَ الْغَيْبِ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে (صَاحِبُ كَشْفٍ) অদৃশ্য জগতের জ্ঞানধারী বানিয়ে দেন। আর যদি কেউ কোনো গোপন বস্তুর জ্ঞান জানার ইচ্ছা করে তবে সে যেন এশার নামাজ পড়ার পর একশতবার এটি পাঠ করে মসজিদেই ঘুমিয়ে পড়ে তবে সে তা অবহিত হতে পারবে।

২১. اَلْقَابِضُ : বান্দার রিজিক ও অন্তর সংকোচনকারী এবং রূহ কবজকারী। যে ব্যক্তি এ পবিত্র নামকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত চার টুকরা রুটি বা অন্য কিছুর উপর লিখে আহার করে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সে ক্ষুধা ও কবরের আজাব হতে নিরাপদ থাকবে।

২২. اَلْبَاسِطُ : বান্দার রিজিকের মধ্যে প্রশস্তকারী অথবা অন্তরকে প্রশস্তকারী। যে ব্যক্তি এ পবিত্র নামকে সাহরীর সময় হাত উঠিয়ে দশবার পাঠ করে নিজের মুখমণ্ডলে মুছে নেয় তবে সে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য কারো নিকট কখনো আবেদন করা বা বলার প্রয়োজন অনুভব করবে না।

২৩. اَلْخَافِضُ : কাফির মুশরিকদের হীন ও নিচুকারী। কোনো ব্যক্তি একাধারে তিনটি রোজা রেখে চতুর্থ দিন একই বৈঠকে ৭০ হাজার বার এ নামটি পাঠ করে তবে সে শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে।

২৪. اَلرَّافِعُ : মু'মিনদের মর্যাদা উঁচুকারী। যে ব্যক্তি উক্ত নাম মোবারক মধ্যরাতে অথবা দ্বিপ্রহরে একশতবার পাঠ করবে মহান আল্লাহ তাকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মনোনীত ও অর্থশালী করেন এবং মুখাপেক্ষীহীন করে দেন।

২৫. اَلْمُعِزُّ : মর্যাদা ও সম্মান প্রদানকারী। যে ব্যক্তি এ মোবারক নামটি সোম অথবা জুমার রাতে ১৪০ বার পাঠ করে তবে মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ভয়ে পরীক্ষিত হয় না।

২৬. اَلْمُذِلُّ : লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দানকারী। যদি কোনো ব্যক্তি কারো হিংসা ও জুলুমকে ভয় করে তবে সে যেন উক্ত মুবারক নামটি একাত্তরবার পাঠ করে সেজদায় গিয়ে আল্লাহর নিকট তাঁর থেকে হেফাজত কামনা করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবেন।

২৭. اَلسَّمِيْعُ : শ্রবণকারী। যে ব্যক্তি এ মুবারক নামটি বৃহস্পতিবার চাশতের নামাজের পর পাঁচশবার অন্য বর্ণনায় প্রতিদিন চাশতের নামাজের পর একশতবার পাঠ করবে তবে সে যে দোয়াই করুক না কেন তা গৃহীত হবে কিন্তু শর্ত হলো পাঠ করার মাঝে কোনো কথা বলতে পারবে না।

২৮. اَلْبَصِيْرُ : দ্রষ্টা, যিনি সবকিছু দেখেন। ফজরের সুন্নত ও ফজরের মধ্যস্থলে এ মুবারক নামটি একনিষ্ঠ নিয়তে ১০০ বার পাঠ করলে মহান আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টি প্রদান করবেন।

২৯. اَلْحَكَمُ : হুকুম বা আদেশ প্রদানকারী, তাঁর আদেশকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না। জুমার রাতে এক বর্ণনায় মধ্যরাতে কেউ পড়তে পড়তে বেহুঁশ হয়ে পড়লে মহান আল্লাহ তাকে তার অন্তর্জগতের গোপন বিষয়াবলির মূল বানিয়ে দেবেন।

৩০. اَلْعَدْلُ : ন্যায়বিচারক। যে ব্যক্তি জুমার রাতে এ পবিত্র নামকে ২০ টি রুটির টুকরার মধ্যে লিখে ভক্ষণ করে তবে মহান আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি জীবকে তার অনুগত করে দেবেন।

৩১. اَللَّطِيْفُ : নিজের বান্দাদের উপর কোমলতা প্রদর্শনকারী। যে ব্যক্তি অর্থ সংকটে পড়ে আছে, অতি কষ্টে জীবনযাপন করে অথবা অসুস্থতায় তার কেউ সেবা-শুশ্রূষা করে না অথবা তার কন্যা সন্তানের কেউ খোঁজখবর নেয় না সে যেন উত্তরূপে অজু করে দু রাকাত নামাজ পড়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে উক্ত মুবারক নামকে একশতবার পাঠ করে নেয় তবে মহান আল্লাহ অবশ্যই তার উদ্দেশ্য সম্পাদন করে দেবেন। এমনিভাবে ছোট শিশুদের ভাগ্য প্রসন্ন, রোগমুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম পরিপূর্ণতার জন্য সর্বদা অত্র মুবারক নামকে একশতবার পাঠ করা আবশ্যক। আর পীর-বুজুর্গদের আমল হলো দীন ও দুনিয়াবি সকল কর্মের জন্য কোনো নির্জন স্থানে এটি ১৬৩৪১ বার পড়া হলে উদ্দেশ্য সফল হয়।

৩২. اَلْخَبِيْرُ : অন্তরের কথা এবং যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে যিনি খবর রাখেন। যে ব্যক্তি نَفْس اَمَّارَةْ [মন্দ কাজে পরিচালনাকারী আত্মা] তে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, সে যেন উক্ত মুবারক নামকে বেশি বেশি পাঠ করে তবে আল্লাহ তাকে তা হতে মুক্তি প্রদান করবেন।

৩৩. اَلْحَلِيْمُ : অত্যন্ত ধৈর্যশীল। পাপী মু'মিনদেরকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন যাতে সে তওবা করে ফিরে আসতে পারে। উক্ত মুবারক নামকে কাগজে লিখে ধৌত করে সে পানি খেতখামার বা গাছের গোড়ায় ঢালে তবে তা ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকে, তাতে বরকত হয় এবং পরিপূর্ণ ফল অর্জিত হয়।

৩৪. اَلْعَظِيْمُ : অত্যন্ত সম্মানী ও মহা মর্যাদাশীল। সর্বদা এ মুবারক নামটি পাঠ করলে সে আল্লাহর নিকট অতি সম্মানী ও প্রিয় হবে।

৩৫. اَلْغَفُوْرُ : সর্বাধিক ক্ষমাশীল। কোনো ব্যক্তি অসুস্থ বা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লে উক্ত মুবারক নামটি একটি কাগজে লিখে তার নকশাকে রুটি দিয়ে চুষে নিয়ে তা খেয়ে নিলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা হতে মুক্তি প্রদান করবেন। আর যে তা বেশি বেশি পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের অন্ধকার দূর করে দেবেন।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কোনো ব্যক্তি সেজদায় গিয়ে يَا رَبِّ اغْفِرْ لِىْ তিনবার পড়বে মহান আল্লাহ তার পূর্বাপর সকল পাপ মার্জনা করে দেন। কোনো ব্যক্তি মাথা ধরা বা অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হলে বা কোনো দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে يَا غَفُوْرُ তিনবার লিখে খেয়ে ফেলবে। আল্লাহর ইচ্ছায় তার সে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

৩৬. اَلشَّكُوْرُ : কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, স্বল্প আমলে অধিক প্রতিদান দানকারী। যার অর্থনৈতিক অবস্থা অসচ্ছল হয় বা তার চোখ বা অন্তরের আলো কমে যায় সে যেন উক্ত মুবারক নামটি একচল্লিশবার পাঠ করে পানিতে দম করে উক্ত পানি পান করে এবং চোখে মর্দন করে তবে সে অবশ্যই ধনী হবে এবং রোগমুক্তি লাভ করবে।

৩৭. اَلْعَلِىُّ : উচুঁ মর্যাদা সম্পন্ন। যে ব্যক্তি এ ইসমটি সর্বদা পাঠ করবে বা লিখে নিজের নিকট রাখবে ফলে সে কম মর্যাদা সম্পন্ন হলে মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে যাবে, গরিব হলে ধনী হয়ে যাবে, ভ্রমণে বা বিদেশে কষ্টক্লেশে পতিত হলে অচিরেই দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

৩৮. اَلْكَبِيْرُ : সবচেয়ে বড়, যার নিকটেও কেউ নেই। সর্বদা এ মুবারক নামটি পাঠকারী উচু মর্যাদা সম্পন্ন ও বুজুর্গ হয়ে যাবে। হাকীম বা প্রশাসক পাঠ করলে জনগণের মধ্যে তার ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে এবং সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে।

৩৯. اَلْحَفِيْظُ : সৃষ্টি জগতকে সকল বিপর্যয় ও ক্ষতি হতে হেফাজতকারী। উক্ত মুবারক নামটি লিখে ডান হাতের বাজুতে বেঁধে রাখলে পানিতে ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, বিপদাপদ, দুর্ঘটনা ও দুষ্ট আত্মা ও বদনজর হতে সুরক্ষিত থাকবে।

৪০. اَلْمُقِيْتُ : শরীর ও রূহকে খাবার দানকারী। অভাব, দরিদ্রতা, বদ স্বভাব দূর করার এবং অধিক ক্রন্দনকারীকে থামাবার জন্য কোনো শূন্য পাত্রে এ اِسْم টি পাঠ করে ফুঁ দিয়ে তাতে পানি ঢেলে পান করালে ঠিক হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো রোজাদার ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুর আশঙ্কা করলে উক্ত মুবারক নামটি পাঠ করে একটি ফুলে দম করে ঘ্রাণ নিলে রোজা রাখার সামর্থ্য অর্জিত হবে।

৪১. اَلْحَسِيْبُ : সর্বাবস্থায় যথাযথ ব্যবস্থাকারী অথবা কিয়ামত দিবসে হিসাব গ্রহণকারী। যদি কোনো ব্যক্তি চোর, ডাকাত, শত্রু বা কোনো হিংসুকের অকল্যাণকে ভয় করে অথবা চোখের আঘাতের ব্যথায় হয়রান হয়ে যায় সে যেন সকাল সন্ধ্যায় حَسْبِىَ اللّٰهُ الْحَسِيْبُ সতেরবার করে পাঠ করে তবে মহান আল্লাহ সেসব অকল্যাণ ও পেরেশান হতে তাকে মুক্তি প্রদান করবেন।

৪২. اَلْجَلِيْلُ : মহা সম্মানী। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মুবারক নামকে মেশক অথবা জাফরান দিয়ে লিখে নিজের নিকটই রেখে দেয় অথবা খেয়ে ফেলে তবে সকল মানুষ তাকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করবে।

৪৩. اَلْكَرِيْمُ : সবচেয়ে বড় দানশীল। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মুবারক নাম নিজ বিছানায় গিয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে তবে ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং বলে اَكْرَمَكَ اللّٰهُ। বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) এ اِسْم টি বেশি বেশি পাঠ করতেন বিধায় তাঁকে كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ বলা হয়ে থাকে।

৪৪. اَلرَّقِيْبُ : সকল সৃষ্টি জীবের রক্ষক। কারো মতে এর অর্থ হলো– বান্দার অবস্থা ও কার্যাবলি অবহিত হওয়া। যে ব্যক্তি উক্ত মুবারক নামকে সাতবার পাঠ করে নিজ স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও অর্থসম্পদের চারদিকে ফুঁ দেয় তবে সকল শত্রু ও মসিবত হতে নিরাপদ থাকবে।

৪৫. اَلْمُجِيْبُ : আহ্বানে সাড়া দানকারী। অত্র اِسْم টি বেশি বেশি পাঠ করে দোয়া করলে তা কবুল হয় আর লিখে নিজের সাথে রাখলে আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকবে।

৪৬. اَلْوَاسِعُ : প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং নিজের অনুগ্রহে সকলকে পালনকারী। সর্বদা এ মুবারক নামটি পাঠ করলে মহান আল্লাহ তাকে স্বল্পে তুষ্টি এবং অর্থসম্পদে বরকত প্রদান করবেন।

৪৭. اَلْحَكِيْمُ : মহা বিদ্বান ও কৌশলী। কোনো কাজে পেরেশান হয়ে পড়লে বা পূর্ণ না হলে অত্র মুবারক নামটি সর্বদা পাঠ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় তার কাজ সম্পাদিত হয়ে যাবে।

৪৮. اَلْوَدُوْدُ : প্রকৃত বন্ধু। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মাঝে যদি মিল মহব্বত কমে যায় বা উভয়ের মধ্যে বনিবনা না হয় বা তাদের কেউ অপরের উপর অসন্তুষ্ট হয় তখন উক্ত মুবারক নামটি ১০০১ বার পাঠ করে কোনো খাবারে ফুঁক দিয়ে উভয়কে খাইয়ে দিলে আল্লাহর ইচ্ছায় উভয়ের মধ্যে মিল মহব্বত সৃষ্টি হবে।

৪৯. اَلْمَجِيْدُ : মহাসম্মানিত ও মহাবুজুর্গ। যদি কেউ ফোস্কা [বসন্ত] [বা باد خرنگ] কুষ্ঠ অথবা মহামারীতে আক্রান্ত হয় তবে সে যেন اَيَّامُ بِيْضٍ এ রোজা রেখে ইফতারের সময় উক্ত মুবারক নামকে বেশি করে পাঠ করে পানিতে দম করে তা পান করে আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হয়ে উঠবে। আর যদি কেউ নিজ যুগে এবং সমসাময়িকদের মধ্যে সম্মানী হতে চায় সে যেন প্রতি সকালে উক্ত اِسْمُ ذَاتْ -কে ৯৯ বার পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দেয়। এতে সে সবার নিকট সম্মানী ও মর্যাদাশীল হিসেবে পরিগণিত হবে।

৫০. اَلْبَاعِثُ : মৃতদেরকে কবর হতে উঠিয়ে জীবন দানকারী এবং অমনোযোগীদের অন্তরকে সচেতনকারী। যদি কোনো ব্যক্তি নিজের অন্তরকে প্রকৃত জিন্দা রাখতে চায় সে যেন ঘুমাবার সময় নিজের বক্ষের উপর হাত রেখে ১০১ বার উক্ত মুবারক নাম পাঠ করে নেয়।

৫১. اَلشَّهِيْدُ : প্রত্যক্ষকারী, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ববিষয়ে অবহিত। যদি কারো ছেলে সন্তান অবাধ্য ও অসৎ হয়ে উঠে তবে সে যেন নিজের হাত উক্ত সন্তানের কপালের উপর রেখে এবং সন্তানের মুখমণ্ডলকে আসমানের দিকে রেখে উক্ত মুবারক নামটি ২১ বার পাঠ করে। আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত ছেলে বা মেয়ে সৎ ও আনুগত্যশীল হয়ে পড়বে।

৫২. اَلْحَقُّ : অপরিসীম ক্ষমতা ও রাজত্বের সাথে যিনি জীবিত। কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে একটি কাগজের চারকোণে উক্ত মুবারক নাম লিখে অপর পিঠে হারানো বস্তুর নাম লিখতে হবে। অতঃপর মধ্যরাতে উঠে উক্ত কাগজ খানা হাতের তালুতে রেখে আকাশের দিকে মুখ রেখে উক্ত মুবারক নামের অসিলায় হারানো বস্তুটি পাবার জন্য দোয়া করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত বস্তুটির পুরোটা বা অংশবিশেষ লাভ করবে। আর যদি কোনো বান্দা মধ্যরাতে উঠে খোলা মাথায় অত্র মুবারক নামটি ১০৮ বার পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দান করবেন।

৫৩. اَلْوَكِيْلُ : কর্ম সম্পাদনকারী। বজ্রপাতের ভয়, পানি বা আগুনের দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা করলে উক্ত মুবারক নাম দৈনিক পাঠ করলে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর কোনো ভয়ভীতির স্থানে উক্ত মুবারক নাম বেশি পাঠ করলে ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে।

৫৪. اَلْقَوِيُّ : সর্বশক্তিমান। যদি কোনো শত্রু এমন শক্তিশালী হয় যে তাকে প্রতিহত করতে অক্ষম তবে কিছু আটা গুলিয়ে তা দ্বারা ১০০১ টি গোলা বানিয়ে প্রত্যেকটি ওঠাবার সময় يَا قَوِيُّ পাঠ করে শত্রু দমনের নিয়তে মুরগির সম্মুখে পেশ করবে

আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রু পরাজিত হবে। জুমার রাতে উক্ত اِسْم অত্যধিক পাঠ করলে ভুলে যাওয়ার রোগ হতে রক্ষা পাবে। আর কোনো শিশু দুধ ছাড়াবার পর যদি সে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে তবে উক্ত اِسْم লিখে খাইয়ে দিলে সে শান্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো মহিলার দুধ কমে গেলে উক্ত মুবারক নাম লিখে তাকে খাইয়ে দিলে তার দুধ আসবে।

৫৫. اَلْمَتِيْنُ : সকল বিষয়ে সর্বাধিক দৃঢ়। কেউ যদি রাজ্য বা রাজত্বের কোনো পদ পাবার আশা করে তবে সে যেন রবিবার দিন সকাল বেলায় উক্ত মুবারক নামটি ৩৬০ বার পাঠ করে তবে সে উক্ত পদ প্রাপ্ত হবে।

৫৬. اَلْوَلِيُّ : সাহায্যকারী, মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বকারী। উক্ত মুবারক নাম বেশি বেশি পাঠকারী সৃষ্টি জগতের অন্তরের খবর অবহিত হতে পারবে আর কারো স্ত্রী বা বাঁদি এমন বদ চরিত্রের অধিকারী যে যা তার কষ্টের কারণ হয় তবে সে যেন উক্ত স্ত্রী বা বাঁদির নিকট গমনের সময় উক্ত اِسْم বেশি বেশি পাঠ করে। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সংশোধন করে দেবেন।

৫৭. اَلْحَمِيْدُ : নিজের জাত ও সিফতের প্রশংসাকারী। যে ব্যক্তি অত্র মুবারক নামকে বেশি বেশি পাঠ করে তার কাজকর্ম পছন্দীয় হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তির মুখ হতে প্রায়ই মন্দ কথা বা মন্দ আচরণ প্রকাশিত হয় যা তার অনিচ্ছায় হয়ে থাকে তবে সে যেন উক্ত اِسْم টি কোনো পাত্রে ৯০ বার লিখে তা দ্বারা সর্বদা পানি পান করে আল্লাহর ইচ্ছায় তার সে বদ স্বভাব দূর হয়ে যাবে।

৫৮. اَلْمُحْصِىْ : সমস্ত সৃষ্ট জীবের হিসাব সংরক্ষণকারী। জুমার রাতে উক্ত মুবারক নামটি ১০০১ বার পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের আজাব ও কিয়ামতের ময়দানের আজাব হতে হেফাজত রাখবেন।

৫৯. اَلْمُبْدِئُ : প্রথমবার সৃষ্টিকারী। যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর গর্ভ বিনষ্টের আশঙ্কা করে অথবা গর্ভ খালাসের স্বাভাবিক দিন অতিবাহিত হয় তবে সে যেন উক্ত মুবারক নামটি ৯০ বার পাঠ করে তার স্ত্রীর পেটের চারদিকে শাহাদাত অঙ্গুলি ঘুরায়। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় উক্ত আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে। যে সর্বদা অত্র اِسْم صِفَةْ পাঠ করে তার মুখ হতে এমন কথা বের হবে যা ثَوَابْ-এর কারণ হবে।

৬০. اَلْمُعِيْدُ : দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকারী। যদি কারো কোনো প্রিয় ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কিছু হারিয়ে যায় তবে সে যেন রাতের বেলায় সবার শুয়ে যাবার পরে ঘরের চার কোণে اَلْمُبْدِئُ টি ১৭ বার পাঠ করে অতঃপর يَا مُعِيْدُ বলে হারানো বস্তুটি ফিরিয়ে দেওয়া বা তার অবস্থা জানার কথা বলবে আল্লাহর ইচ্ছায় সাত দিনের মধ্যে সে ফিরে আসবে অথবা তার ভালো অবস্থা অবহিত হবে। কোনো বস্তু হারিয়ে গেলে اَلْمُعِيْدُ বেশি বেশি পাঠ করলে তা ফিরে পাবে।

৬১. اَلْمُحْيِىْ : জীবন দানকারী। যদি কোনো ব্যক্তি ব্যথা-বেদনা বা কষ্ট অনুভব করে অথবা কোনো অঙ্গ হানির আশঙ্কা করে তবে সে যেন উক্ত মুবারক নাম সাতবার পাঠ করে এর ফলে আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। আর সাতদিন অন্তর যে ব্যথা হয় তার জন্য সাতদিন পর্যন্ত পড়তে হবে। প্রতিদিন পাঠ করে দম করতে হবে। নিয়মিত পাঠ করলে তার অন্তর জিন্দা থাকবে এবং শরীরে শক্তি অর্জিত হবে।

৬২. اَلْمُمِيْتُ : মৃত্যুদানকারী। যে ব্যক্তি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হয় না এবং শরিয়তের বিধিবিধান পালনে বাধা প্রদান করে সে যেন ঘুমাবার সময় বক্ষের উপর হাত রেখে اَلْمُمِيْتُ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে আল্লাহর ইচ্ছায় তার আত্মা তার অনুগত হয়ে যাবে।

৬৩. اَلْحَيُّ : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিনি জীবিত। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে উক্ত মুবারক নাম অসংখ্যবার পড়লে অথবা অপর কেউ চক্ষুকে সম্মুখে রেখে অনেক বার পড়লে আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি দৈনিক ১৭ বার পড়বে তার হায়াত দীর্ঘ হবে এবং তার আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৬৪. اَلْقَيُّوْمُ : যিনি নিজে চিরস্থায়ী এবং সৃষ্টিজীবকে প্রতিষ্ঠাকারী। শেষ রাতে اَلْقَيُّوْمُ অত্যধিক পাঠ করলে জনগণ তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। আর কেউ অধিক সংখ্যায় পাঠ করলে তার সকল কাজ মনমতো হবে।

৬৫. اَلْوَاجِدُ : এমন মুখাপেক্ষীহীন যে, কারো নিকট কোনো কিছুর জন্য তিনি মুখাপেক্ষী নন। খাবারের সময় প্রত্যেক লোকমায় যদি اَلْوَاجِدُ পড়ে তবে তা পেটের মধ্যে নূর হয়ে যাবে। আর কেউ নির্জনতায় পাঠ করলে ধনী হয়ে যাবে।

৬৬. اَلْمَاجِدُ : অত্যধিক মর্যাদা সম্পন্ন, বড় দাতা। যে একাকী اَلْمَاجِدُ পড়তে পড়তে বেহুঁশ হয়ে যায় তার অন্তরে আল্লাহর নূর প্রকাশিত হয় আর বেশি বেশি পাঠ করলে সৃষ্টি জীবের নিকট সে সম্মানী হবে।

৬৭. اَلْوَاحِدُ اَلْاَحَدُ : এক ও অদ্বিতীয়। কারো অন্তরে ভয়ভীতি সৃষ্টি হলে উক্ত মুবারক নামটি ১০০১ বার পাঠ করলে ভয়ভীতি দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। আর কেউ যদি সন্তানসন্ততির আশা করে তবে সে যেন উক্ত মুবারক নামটি লিখে নিজের কাছে রাখে আল্লাহর ইচ্ছায় তার আশা পূর্ণ হবে।

৬৮. اَلصَّمَدُ : তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সাহরীর সময় অথবা মধ্যরাতে সেজদায় গমন করে এটি ১১৫ বার পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্যবাদীতে পরিণত করবেন এবং কোনো দুশমনের হাত তার গায়ে লাগবে না। সর্বদা পাঠ করলে কখনো সে ক্ষুধার্ত থাকবে না। আর অজুর সময় পাঠ করলে সৃষ্টি জীব হতে বেপরোয়া হয়ে যাবে।

৬৯. اَلْقَادِرُ : মহাক্ষমতাবান। অজুতে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় পাঠ করলে কোনো শত্রুর হাতে কখনো পাকড়াও হবে না এবং কোনো শত্রু তার উপর বিজয়ী হবে না। আর কোনো কঠিন সমস্যায় পতিত হলে উক্ত মুবারক নামটি ৪১ বার পাঠ করলে তা অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হবে।

৭০. اَلْمُقْتَدِرُ : নিজের ক্ষমতা প্রকাশকারী। যে এটি সর্বদা পাঠ করবে সে সাবধানী হয়ে যাবে আর যে শোয়া থেকে উঠার সময় এটি ২০ বার পাঠ করে তার সকল কাজ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭১. اَلْمُقَدِّمُ : প্রিয় বান্দাদেরকে নিজের নিকট অগ্রসরকারী। লড়াইয়ের ময়দানে পাঠ করলে বা লিখে নিজের নিকট রাখলে কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হবে না। আর অত্যধিক পাঠ করলে তার আত্মা আল্লাহর অনুগত হয়ে যাবে।

৭২. اَلْمُؤَخِّرُ : শত্রুদেরকে দূরে নিক্ষেপকারী। এটি ১০০ বার পাঠ করলে তার অন্তর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে মিলিত হবে না। আর যে দৈনিক উক্ত মুবারক নামটি ১০০ বার করে পাঠ করে তার সকল কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদিত হবে। আর ৪১ বার পাঠ করলে তার আত্মা অনুগত হয়ে যাবে।

৭৩. اَلْاَوَّلُ : সব কিছুর শুরু। যে ব্যক্তির ছেলেমেয়ে না থাকে সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একাধারে ৪০ বার করে পাঠ করলে তার আশা পূর্ণ হবে। কেউ বলে কারো কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে সে চল্লিশ জুমার রাতে ১০০০ বার করে পাঠ করলে তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাবে।

৭৪. اَلْاٰخِرُ : সব কিছুর শেষেও যিনি থাকবেন। যে ব্যক্তি পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে শেষ বয়সে এসে গেছে সে যেন উক্ত মুবারক নাম সর্বক্ষণ পাঠ করে আল্লাহর ইচ্ছায় তার শেষ পরিণতি ভালোই হবে।

৭৫. اَلظَّاهِرُ : যিনি তার সৃষ্টি জগতের মাধ্যমে প্রকাশিত। যে ব্যক্তি اِشْرَاقٌ-এর নামাজের পর উক্ত মুবারক নাম পাঁচশতবার পাঠ করে মহান আল্লাহ তার চক্ষুকে আলোকিত করে দেন। ঝড় তুফান বা বন্যার ভয় হলে একে অত্যধিক পাঠ করলে মহান আল্লাহ নিরাপত্তা প্রদান করেন। ঘরের দেয়ালে উক্ত اِسْم লিখে রাখলে তা নিরাপদ থাকে।

৭৬. اَلْبَاطِنُ : নিজের জাত ও রহস্য গোপনকারী। প্রতিদিন ৩৩ বার এটি পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে গোপন রহস্যের অধিকারী বানাবেন। আর যে সর্বদা পাঠ করবে তার প্রতি যার দৃষ্টি পড়বে সে তার বন্ধু হয়ে যাবে।

৭৭. اَلْوَالِيُّ : অভিভাবক বা মুরব্বি। কোনো ব্যক্তি ঘরবাড়িকে বিপদাপদ হতে নিরাপদ রাখার ইচ্ছা করলে পানির পাত্রে উক্ত মুবারক নাম লিখে তাতে পানি ঢেলে পাত্রকে দেয়ালের দিকে নিক্ষেপ করলে ঘরবাড়ি দালান নিরাপদ হয়ে যাবে। কারো মতে اَلْوَالِيُّ তিনবার পাঠ করলেই উক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে। আর কাউকে বাধ্য করার নিয়তে ১১ বার পাঠ করলে সে তার অনুগত হয়ে যাবে।

৭৮. اَلْمُتَعَالِيُّ : সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন সত্তা। অত্র মুবারক নামটি অত্যধিক পাঠের ফলে কঠিন ও জটিল বিষয়াবলিও তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কোনো বুজুর্গ বলেছেন, গর্ভবতী মহিলা এটি পড়তে থাকলে তার গর্ভকালীন কষ্টক্লেশ হতে মুক্তি পাবে।

৭৯. اَلْبَرُّ : সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদানকারী। ঝড়-বৃষ্টি, তুফান, বন্যাসহ বিভিন্ন বিপদাপদের সময় এটি পাঠ করলে ক্ষয়-ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে। এটি সাতবার পাঠ করে কোনো শিশুকে আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তায় প্রদান করলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সকল বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকবে। কেউ কেউ বলেন, কেউ যদি মদ পান ও জেনার নেশায় মত্ত হয়ে পড়ে তবে সে যেন প্রতিদিন উক্ত মুবারক নাম সাতবার করে পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে উক্ত মন্দ কাজ হতে ফিরিয়ে দেবেন।

৮০. اَلتَّوَّابُ : তওবা কবুলকারী। চাশত নামাজের পর এই পাক اِسْم টি তিনশত ষাটবার পাঠ করলে মহান আল্লাহ তাকে তওবায়ে নাসূহ করার তৌফিক প্রদান করবেন। কেউ যদি এটি অধিক পড়তে থাকে তবে তার সকল কাজকর্ম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদিত হবে এবং তার আত্মা আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত প্রশান্তি লাভ করবে না। আর যে ব্যক্তি চাশতের

নামাজের পর এ দোয়া পড়ে যে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اَنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ তবে আল্লাহ তা'আলা তার পাপসমূহ মার্জনা করে দেবেন।

৮১. اَلْمُنْتَقِمُ : প্রতিশোধ গ্রহণকারী। যে ব্যক্তি তার শত্রুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এবং তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয় না। সে যেন নিয়মিত তিন জুমা পর্যন্ত এ পবিত্র নামটি পড়তে থাকে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ কোনো উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে মধ্যরাতে এটি পাঠ করলে তার উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হবে। উল্লেখ্য যে, এ স্থানে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ব্যতীত অপর এক সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীসে اَلْمُنْعِمُ নামের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এ পবিত্র اِسْم টি নিয়মিত পাঠ করবে সে কখনো কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

৮২. اَلْعَفُوُّ : পাপসমূহ মার্জনা ও মোচনকারী। অত্যধিক পাপী ব্যক্তি এ পবিত্র নামটি নিয়মিত পাঠ করলে তার সকল পাপ মার্জনা করা হবে।

৮৩. اَلرَّءُوْفُ : অত্যধিক দয়ালু। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত হতে বাঁচাবার ইচ্ছা করে তবে সে যেন এ পবিত্র নামটি ১০ বার পাঠ করে ظَالِمٌ-এর নিকট সুপারিশ করে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে তা কবুল করবে এবং সে অত্যাচার করা হতে ফিরে আসবে। আর কেউ এটা নিয়মিত পাঠ করলে তার অন্তর নরম হয়ে যাবে এবং সকলে তার বন্ধু হয়ে যাবে।

৮৪. مَالِكُ الْمُلْكِ : সমস্ত সৃষ্টি জগতের অধিপতি। যে ব্যক্তি সদা সর্বদা এ পবিত্র اِسْم টি পাঠ করবে সে ধনী হবে এবং তার দুনিয়া-আখেরাতের সকল কাজকর্ম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হবে।

৮৫. ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ : সম্মান ও মর্যাদা দানের অধিপতি। নিয়মিত এ মুবারক নাম পাঠ করলে ধন-দৌলত প্রাপ্ত হবে এবং ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কাজকর্ম, উদ্দেশ্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং সব কাজের ফলাফল ভালো হবে।

৮৬. اَلْجَامِعُ : কিয়ামত দিবসে সকল মানুষকে একসাথকারী। যদি কোনো ব্যক্তির নিকট জন বা পরিবার-পরিজন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় তবে চাশতের সময় সে যেন গোসল করে আসমানের দিকে মুখ উঠিয়ে উক্ত পবিত্র নামটি দশবার পাঠ করে তবে প্রত্যেকবার পাঠ করতে হাতের একটি করে অঙ্গুলি বন্ধ করে অতঃপর উভয় হাত মুখমণ্ডলে মাসাহ করে নেয়, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে একত্রিত হয়ে যাবে।

৮৭. اَلْمُقْسِطُ : ন্যায়বিচারক। অত্র মুবারক নাম একশতবার পাঠ করলে শয়তানের অমঙ্গল ও কুমন্ত্রণা হতে মুক্ত থাকবে। আর সাতশত বার পাঠ করলে তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

৮৮. اَلْغَنِىُّ : সবকিছু হতে মুখাপেক্ষীহীন। যে ব্যক্তি লোভ-লালসার রোগে আক্রান্ত সে তার প্রত্যেক অঙ্গে হাত রেখে উক্ত মুবারক নাম পড়বে এবং অঙ্গের উপরে নিচে হাত বুলাবে এতে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করবেন। আর প্রতিদিন ১৭ বার করে পড়লে তার অর্থসম্পদে বরকত হবে এবং সে কখনো মুখাপেক্ষী হবে না।

৮৯. اَلْمُغْنِىُّ : যাকে ইচ্ছা তিনি মুখাপেক্ষীহীন করেন। যে ব্যক্তি একাধারে দশ জুমা পর্যন্ত ১০০০ বার করে উক্ত মুবারক নাম পাঠ করে সে সৃষ্টি জীব হতে বেপরোয়া হয়ে যাবে।

৯০. اَلْمَانِعُ : ক্ষতি ও বিপর্যয়কে বাধাদানকারী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল হলে বিছানায় যাবার সময় উক্ত মুবারক নাম বিশ বার করে পাঠ করলে রাগ-গোস্বা দূর হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (র.) شَرْحُ اَسْمَاءِ الْحُسْنٰى গ্রন্থে اَلْمَانِعُ-এর পূর্বে اَلْمُعْطِىْ একটি বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন يَا مُعْطِىَ السَّائِلِيْنَ পাঠ করে সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

৯১. اَلضَّارُّ : যাকে ইচ্ছা অকল্যাণ পৌঁছান। কেউ যদি অর্থসম্পদ বা জমিন প্রাপ্ত হয় তবে সে জুমার রাতে اَلضَّارُّ একশতবার পাঠ করলে মহান আল্লাহ তাকে উক্ত স্থানে বসবাসের সুযোগ করে দেবেন এবং তাকে উচুঁ মর্যাদা প্রদান করবেন।

৯২. اَلنَّافِعُ : উপকার প্রদানকারী। সমুদ্র পথে ভ্রমণের সময় প্রতিদিন অত্র পবিত্র اِسْم-কে ৪১ বার করে পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে যাবতীয় ক্ষতি হতে রক্ষা করবেন। আর যে কোনো কর্মের শুরুতে এটি ৪১ বার পাঠ করলে তা সুচারুরূপে সম্পাদিত হবে।

৯৩. اَلنُّوْرُ : আলোকিতকারী। যে ব্যক্তি জুমার রাতে সূরা نُوْر সাতবার পাঠ করবে অতঃপর اَلنُّوْرُ ১০০১ বার পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে نُوْر সৃষ্টি করে দেবেন। আর যে প্রত্যহ সকালে এটা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে আলোকোজ্জ্বল করে দেবেন।

৯৪. اَلْهَادِىْ : পথ প্রদর্শনকারী। যে ব্যক্তি হাত উঠিয়ে মুখমণ্ডলকে আসমানের দিকে ফিরিয়ে اَلْهَادِىْ অসংখ্যবার পাঠ করে অবশেষে হাতকে চোখ ও মুখে মাসাহ করে মহান আল্লাহ তাকে বুজুর্গ হওয়ার তৌফিক প্রদান করবেন।

৯৫. اَلْبَدِيْعُ : কোনো কিছুর উদাহরণ [নমুনা] ব্যতীত সৃষ্টিকারী। কেউ যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মসিবতে পড়ে যায় তবে সে যেন يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ সতের হাজার বার এক বর্ণনামতে এক হাজার বার পাঠ করলে অবশ্যই তার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে এবং সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর কেউ অজু করে কেবলামুখী হয়ে এটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলে সে যা ইচ্ছা করবে তা স্বপ্নে দেখতে পাবে।

৯৬. اَلْبَاقِىْ : যিনি সর্বদা থাকবেন। জুমার রাতে এ পবিত্র اِسْم একশতবার পাঠ করলে তার যাবতীয় اَعْمَالُ কবুল হবে এবং কোনো দুঃখ-চিন্তা তাকে ব্যতিব্যস্ত করবে না।

৯৭. اَلْوَارِثُ : সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর তিনি সব কিছুর অধিপতি হবেন। সূর্যোদয়ের সময় কেউ উক্ত মুবারক নাম একশতবার পাঠ করলে সে কোনো দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হবে না। আর যে ব্যক্তি এটা বেশি বেশি পাঠ করবে তার সকল কাজকর্ম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সমাপ্ত হবে।

৯৮. اَلرَّشِيْدُ : সৃষ্টি জগতের পথ প্রদর্শনকারী। কেউ যদি তার কোনো কাজের পূর্বাপর খুঁজে না পায় তবে সে যেন এশার নামাজের পর নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে অত্র পবিত্র اِسْم -কে এক হাজার বার পাঠ করে তবে তার কাজ যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হবে। আর যে সর্বদা এটি পাঠ করবে তার সকল কাজকর্ম বিনা প্রচেষ্টায় সম্পাদিত হবে।

৯৯. اَلصَّبُوْرُ : অত্যন্ত ধৈর্যশীল। দুঃখ-দুর্দশা বিপদাপদের সময় এ পবিত্র নামটি ৩৩ বার পাঠ করলে সে শান্তি প্রাপ্ত হবে, শত্রুগণের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে এবং পিছপা হবে, বিচারক ভালো আচরণ করবে, জনগণের নিকট সম্মানিত হবে। মধ্যরাতে বা মধ্যাহ্নে পাঠ করলে এর অনেক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত মহান আল্লাহর ৯৯ টি নাম ব্যতীত কুরআন ও হাদীসে আরো অনেক নাম পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত নামগুলো রয়েছে–

اَلرَّبُّ ـ اَلْاَكْرَمُ ـ اَلْاَعْلٰى ـ اَلْحَافِظُ ـ اَلْخَلَّاقُ ـ اَلسَّاتِرُ ـ اَلسَّتَّارُ ـ اَلشَّاكِرُ ـ اَلْعَادِلُ ـ اَلْعَلَّامُ ـ اَلْغَالِبُ ـ اَلنَّاظِرُ ـ اَلْفَالِقُ ـ اَلْقَدِيْرُ ـ اَلْقَرِيْبُ ـ اَلْقَاهِرُ ـ اَلْكَفِيْلُ ـ اَلْكَافِىْ ـ اَلْمُنِيْرُ ـ اَلْمُحِيْطُ ـ اَلْمَلِكُ ـ اَلْمَوْلٰى ـ اَلنَّصِيْرُ ـ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ـ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ ذُو الْفَضْلِ ـ ذُو الطَّوْلِ ـ ذُو الْقُوَّةِ ـ ذُو الْمَعَارِجِ ـ ذُو الْعَرْشِ ـ رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ـ قَابِلُ التَّوَّابِ ـ اَلْفَعَّالُ لِمَا يُرِيْدُ ـ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ ـ

আর হাদীস শরীফে নিম্নোক্ত নামসমূহ এসেছে– اَلْحَنَّانُ ـ اَلْمَنَّانُ ـ اَلْمُغِيْثُ

এছাড়া অনান্য আসমানি কিতাবেও আল্লাহ তা'আলার আরো কিছু নাম রয়েছে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১১৬ হতে ১৪৩ পৃ.]

وَعَنْ ٢١٨١ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২১৮১. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বক্তিকে [আবূ মূসাকে] এরূপ বলতে শুনলেন যে, "হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং জানি যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তুমি এক, অনন্য, মুখাপেক্ষীহীন ও অন্যদের নির্ভরস্থল– যিনি জনকও নন, জাতও নন এবং যার কোনো সমকক্ষ নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে আল্লাহকে তাঁর ইসমে আযম বা সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নামের সাথে ডাকল, যা দ্বারা যখন কেউ তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করে তিনি তাকে তা দান করেন এবং যা দ্বারা যখন কেউ তাঁকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম তীবী (রা.) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহর যে اِسْمُ اَعْظَمُ রয়েছে তা দ্বারা তাঁকে আহ্বান করলে তিনি তাতে সাড়া প্রদান করেন, আর এটাও বুঝা যায় যে, অত্র দোয়ার মধ্যে اِسْمُ اَعْظَمُ নিহিত রয়েছে। বস্তুত দোয়ার সময় হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দোয়া দ্বারা আল্লাহর নিকট আবেদন করাই হলো সবচেয়ে উত্তম।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ اِسْمِ الْاَعْظَمِ **'ইসমে আ'যম' সম্পর্কে ইমামদের মতবিরোধ** : কিছু সংখ্যকের মতে মহান আল্লাহর কোনো নির্দিষ্ট اِسْمُ اَعْظَمُ নেই; বরং যে اِسْمٌ-এর দ্বারা পরিপূর্ণ একনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু হতে বিমুখতার সৃষ্টি করে তাই হলো ইসমে আ'যম। কেননা لِاَنَّ شَرْفَ الْاِسْمِ بِشَرْفِ الْمُسَمّٰى لَا بِوَاسِطَةِ الْحُرُوْفِ الْمَخْصُوْصَةِ অর্থাৎ 'নামের মর্যাদা হয় ডাকার মর্যাদার দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট হরফ দ্বারা নয়।'

কিন্তু শরহুস সুন্নাহ কিতাবে আছে, অত্র হাদীসই বুঝায় যে, আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট اِسْمِ اَعْظَمُ রয়েছে যার অসিলায় বিভিন্ন দোয়া ও প্রার্থনা গৃহীত হয়।

ইমাম জা'ফর সাদেক, জুনাইদ বাগদাদীসহ অন্যান্য ইমামের মতে اِسْمِ اَعْظَمْ হলো সেই اِسْمٌ যার চিন্তার সময় غَيْرُ اللّٰهِ তাঁর নিকট থাকে না এবং সে অবস্থায় যে প্রার্থনা করা হয় তা গৃহীত হয়। তবে সে اِسْمٌ নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে অনেক মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এটি একমাত্র আল্লাহই জানেন এ ব্যাপারে অন্য কেউ অবহিত নয়। যেমন- لَيْلَةُ الْقَدْرِ ও জুমার দিবসের কবুলের সময়। কিন্তু কিছু সংখ্যক বলেন, এ নামটি নির্দিষ্ট। ফলে এ বিষয়ে মোট চৌদ্দটি মতামত পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ-

১. ইমাম রাযী সহ কিছু সংখ্যক বুজুর্গ বলেন, اِسْمِ اَعْظَمْ হলো "هُوَ" ; এর প্রমাণ হলো, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কালামকে اَنْتَ قُلْتَ বলে না বরং বলে هُوَ يَقُوْلُ

২. কারো মতে, اِسْمُ اَعْظَمُ হলো اَللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ কেননা ইবনে মাজাহতে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, اِنِّىْ اَدْعُوْكَ اللّٰهَ وَاَدْعُوْكَ الرَّحْمٰنَ وَاَدْعُوْكَ الرَّحِيْمَ . وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْاِسْمَ الْاَعْظَمَ لَفِى الْاَسْمَاءِ الَّتِىْ دَعَوْتُ بِهَا .

৩. আবার কারো মতে, ইসমে আযম হলো اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ যেমন তিরমিযী শরীফে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِسْمُ الْاَعْظَمِ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ . اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ .

৪. কেউ বলেন, ইসমে আযম হলো اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ যেমনি হাদীসে এসেছে-

اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْاِسْمَ الْاَعْظَمَ فِىْ ثَلَاثِ سُوَرٍ : اَلْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ وَطٰهٰ . وَقَالَ الْقَاسِمُ الرَّاوِىْ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِلْتَمَسْتُهُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ .

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) এ মতকে দৃঢ় বলেছেন। কেননা এ উভয়টি আল্লাহর صِفَاتِ عَظِيْمَةٌ-এর উপর বুঝায়।

৫. অথবা, اِسْمُ اَعْظَمُ হলো- اَلْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ যেমনি হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে।

৬. অথবা, তা হলো بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ যেমন- اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى مِنْ طَرِيْقِ السَّرِىِّ بْنِ يَحْيٰى عَنْ رَجُلٍ مِنْ طَىٍّ قَالَ كُنْتُ اَسْاَلُ اللّٰهَ اَنْ يُرِيَنِىْ الْاِسْمَ الْاَعْظَمَ فَاَرَيْتُهُ مَكْتُوْبًا فِى الْكَوْكَبِ فِى السَّمَاءِ .

৭. অথবা, اِسْمِ اِعْظَمْ হলো ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ যেমন-

اَخْرَجَ التِّرْمِذِىُّ عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَقُوْلُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ فَقَالَ فَقَدْ اُسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلْ .

৮. অথবা, اِسْمُ اَعْظَمْ হলো اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ এর প্রমাণ হলো-

اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ وَهُوَ اَرْجَحُ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ مِنْ جَمِيْعِ مَا وَرَدَ فِىْ ذٰلِكَ كَمَا نَقَلَهُ السُّيُوْطِىُّ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ (رضـ) .

৯. অথবা, اِسْمُ اَعْظَمْ হচ্ছে رَبِّ رَبِّ যেমন হাদীসে এসেছে-

اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اِسْمُ اللّٰهِ الْاَكْبَرُ رَبِّ رَبِّ .

১০. অথবা, اِسْمُ اَعْظَمْ হলো হযরত ইউনুস (আ.)-এর দোয়া তথা لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۔ যেমন হাদীসে এসেছে– خَرَجَ النَّسَائِىُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَفَعَهُ دَعْوَةَ ذِى النُّوْنِ (يُوْنُسَ) فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ ۔

১১. ইমাম রাযী যাইনুল আবেদীন হতে বর্ণনা করেন যে, তারা اِسْمُ اَعْظَمْ সম্পর্কে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তারা স্বপ্নে দেখেন যে, اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَلَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۔.

১২. অথবা, اِسْمُ اَعْظَمْ সমস্ত اَسْمَاءُ حُسْنٰى -এর মধ্যে গোপন রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَلْمُتَقَدِّمُ لَمَّا دَعَتْ بِبَعْضِ الْاَسْمَاءِ وَبِالْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰى فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنَّهُ لَفِى الْاَسْمَاءِ الَّتِىْ دَعَوْتِ بِهَا ۔

১৩. কারো মতে اِسْمُ اَعْظَمْ হলো كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ -

১৪. তবে জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে যেমন ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইমাম আবূ হানীফা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, "اَللّٰهُ" ইসমে জাতটিই মহান আল্লাহর اِسْمُ اَعْظَمْ যেমনি ইমাম ত্বাহাবী তাঁর شِكْلُ الْاٰثَارِ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। কেননা "اَللّٰهُ" ইসমটি অন্য কিছুর উপর প্রয়োগ হয় না। আর اَسْمَاءُ حُسْنٰى-এর মধ্যে এটিই আসল বা মূল। এছাড়া যতগুলো اِسْمُ اَعْظَمْ বলা হয়েছে সবগুলোর মধ্যে "اَللّٰهُ" শব্দ নিহিত রয়েছে। –[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬২]

وَعَنْ ٢١٨٢ اَنَسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اَسْاَلُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعَا اللّٰهَ بِاِسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২১৮২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে মসজিদে বসাছিলাম। তখন এক ব্যক্তি নামাজ পড়ছিল এবং [নামাজের পর] বলছিল, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সওয়াল করি এবং জানি যে, তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই; তুমি অতি দয়ালু, বড় দাতা, আসমান ও জমিনের বিনা নমুনায় স্রষ্টা, হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে প্রতিষ্ঠাতা! আমি তোমার নিকট সওয়াল করি।" তখন নবী করীম ﷺ বললেন, সে আল্লাহকে তাঁর ইসমে আজমের সাথে ডাকল– এর দ্বারা যখন তাঁকে ডাকা হয় তখন তাতে তিনি সাড়া দেন এবং যখন তাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয় তখন তা তিনি দান করেন।
–[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اَلْحَنَّانُ - অধিক দয়ালু। اَلْمَنَّانُ - অধিক দানকারী। بَدِيْعٌ - কোনো আকৃতি ব্যতীত সৃষ্টিকারী। قَيُّوْمٌ - চিরঞ্জীব। دُعِىَ - ডাকা হয়।

وَعَنْ ٢١٨٣ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةُ اٰلِ عِمْرَانَ الٓمّٓ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

২১৮৩. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর ইসমে আ'যম এ দুই আয়াতের মধ্যে আছে– وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ এবং সূরা আলে ইমরানের শুরু الٓمّٓ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অত্র দুই আয়াতের মধ্যেই اِسْمِ اَعْظَمْ নিহিত রয়েছে। আর ইমাম হাকেম বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহর اِسْمُ اَعْظَمْ তিন সূরাতে নিহিত রয়েছে। আর সেগুলো হলো- اٰلُ عِمْرَانْ، اَلْبَقَرَةُ ও طٰهٰ তাবেয়ী কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান শামী বলেন, আমি একশতজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আর আমি এ তিন সূরার কোনটিতে اِسْمُ اَعْظَمْ রয়েছে তা আমি তালাশ করে পেয়েছি যে, তা হলো اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ; ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.)ও এ মতকে পছন্দ করেছেন। কেননা এ উভয় اِسْمْ আল্লাহর اَلرَّبُوْبِيَّةُ-কে বুঝায় যা অন্য কোনো اِسْمْ বুঝায় না। ইমাম নববীও এ মতকে গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ٢١٨٤ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْوَةُ ذِى النُّوْنِ اِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَيْءٍ اِلَّا اسْتُجَابَ لَهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

২১৮৪. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- মাছওয়ালা নবী হযরত ইউনুস (আ.)-এর দোয়া হলো এই; যখন তিনি মাছের পেটে থেকে দোয়া করেছিলেন- "তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তুমি পবিত্র আর আমি হচ্ছি অত্যাচারী অপরাধী।" যে কোনো মুসলমানই কোনো ব্যাপারে এ দোয়া করবে নিশ্চয়ই তার দোয়া কবুল হবে। -[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : ذَا النُّوْنِ - মাছওয়ালা, মাছের অধিকারী। بَطْنٌ - পেট, উদর। اَلْحُوْتُ - মাছ, পানিতে বসবাসরত জীব। اِسْتُجَابَ - কবুল হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١٨٥ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ عِشَاءً فَاِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَقُوْلُ هٰذَا مُرَاءٍ قَالَ بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيْبٌ قَالَ وَاَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىُّ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَتِهِ ثُمَّ جَلَسَ اَبُوْ مُوْسٰى يَدْعُوْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ سَأَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا

২১৮৫. **অনুবাদ :** হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এশার সময় মসজিদে পৌছলাম। তথায় দেখি এক ব্যক্তি কুরআন পড়ছে আর তাতে আপন স্বর উচ্চ করছে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একে কি আপনি রিয়াকার বলবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না; বরং সে একজন ভক্ত মু'মিন। বুরায়দা বলেন, হযরত আবূ মূসা আশআরীই কুরআন পড়ছিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে পড়ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কেরাত শুনছিলেন। অতঃপর হযরত আবূ মূসা (রা.) বসে এরূপ দোয়া করতে লাগলেন যে, "হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তুমি এক ও সকলের নির্ভরস্থল, যিনি জনকও নন জাতও নন এবং যাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় সে আল্লাহর ঐ নামের সাথে তাঁর নিকট প্রার্থনা করল, যার সাথে যখন প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি দান করেন এবং যার সাথে যখন তাঁকে ডাকা হয়, তখন

دُعِىَ بِهِ اَجَابَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَاَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِىْ اَنْتَ الْيَوْمَ لِىْ اَخٌ صَدِيْقٌ حَدَّثْتَنِىْ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

তিনি তাতে সাড়া দেন। বুরায়দা বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাঁকে এটা বলব, যা আপনার নিকট শুনলাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা বললাম, তখন আবূ মূসা আমাকে বললেন, আজ হতে আপনি আমার প্রিয় ভাই, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা অবহিত করলেন। −[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : اُشْهِدُكَ - আমি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছি। كُفُوًا - সমকক্ষ। اَخٌ صَدِيْقٌ - প্রকৃত বন্ধু।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ اِسْمِ اَعْظَم 'ইসমে আযম' সম্পর্কে ওলামাদের মতভেদ : اِسْمِ اَعْظَمْ সম্পর্কে আরো কিছু মতামত পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ−

১. কিছু সংখ্যক বলেন− بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ হলো− اِسْمُ اَعْظَمْ

২. কারো মতে এটা হলো− اَللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

৩. হযরত যাইনুল আবেদীন (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি اِسْمُ اَعْظَمْ সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে আরজ করলে তিনি স্বপ্নযোগে দেখালেন যে তা হলো− لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

৪. কারো মতে এটা হলো اَللّٰهُمَّ কোনো কোনো বুজুর্গ থেকে এটা বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি اَللّٰهُمَّ বলল সে যেন আল্লাহর সকল নামের অসিলায় তাঁর নিকট প্রার্থনা করল। এ মত হযরত হাসান বসরী (র.)-এরও।

৫. আরেক দলের মতে তা হলো الٓمّٓ -

৬. বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুর রাবী'কে কেউ اِسْم اَعْظَمْ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, লিখ اَطِعِ اللّٰهَ يُعْطِكَ অর্থাৎ আল্লাহর অনুসরণ কর, তিনি তোমার সকল প্রার্থনা কবুল করবেন। তথা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকারই হলো اِسْم اَعْظَمْ -

৭. কোনো কোনো ইমাম বলেন, বুজুর্গগণ যেসব নামকে اِسْم اَعْظَمْ বলেছেন সেসবগুলো নিম্নোক্ত দোয়াতে রয়েছে−

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا خَيْرَ الْوَارِثِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ . يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا عَالِمُ يَا سَمِيْعُ يَا عَلِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ يَا مَالِكُ يَا سَلَامُ يَا حَقُّ يَا قَدِيْمُ يَا قَائِمُ يَا غَنِىُّ يَا مُحِيْطُ يَا حَكِيْمُ يَا عَلِىُّ يَا قَاهِرُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا سَرِيْعُ يَا كَرِيْمُ يَا مُخْفِىْ يَا مُعْطِىْ يَا مَانِعُ يَا مُحْيِىْ يَا مُقْسِطُ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اَحْمَدُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ يَا قَرِيْبُ يَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ . اَنْتَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

−[মাযাহেরে হক : খ. ৩ পৃ. ১৪৭]

بَابُ ثَوَابِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ

পরিচ্ছেদ : সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার বলার ছওয়াব

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (الْأَحْزَابُ : ١٤) অর্থাৎ "হে ঈমানদার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ কর।" বস্তুত মানব জীবনের পরম আরাধ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি আর তা অর্জিত হবে তাঁর সন্তুষ্টি মতো জীবনযাপন করা ও সার্বক্ষণিক তাঁকে স্মরণের মাধ্যমে। এ জিকির বা স্মরণ বিভিন্ন শব্দের বা বাক্যের মাধ্যমে হতে পারে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে সব শব্দাবলির ছওয়াব প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে। এখানে تَسْبِيْح দ্বারা سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা, تَحْمِيْد দ্বারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা, تَهْلِيْل দ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা এবং تَكْبِيْر দ্বারা اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢١٨٦ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَأْتَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১৮৬. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি- সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার "আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহর জন্য প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই ও আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান।" অপর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চারটি- সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। এর যে কোনোটি তুমি প্রথমে বল তাতে তোমার ক্ষতি হবে না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মহান আল্লাহর কালামের পর মানুষের কালামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো হাদীসে উল্লিখিত অত্র চার কালিমা। অবশ্য কুরআনে শুধু اَللّٰهُ اَكْبَرُ টি প্রকাশ্যে নেই আর অন্যগুলো রয়েছে তবে প্রকাশ্য না থাকলেও وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -এর মধ্যে অর্থগতভাবে রয়েছে। আর অপর এক হাদীসে এসেছে-

اَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْاٰنِ وَهِيَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

এ চারটি كَلِمَةٌ শ্রেষ্ঠ হলেও হাদীসে যে সময় যে স্থানে যে দোয়া পড়ার নির্দেশ এসেছে সেগুলো সেভাবে পড়া উত্তম। আর দ্বিতীয় বর্ণনার بِاَيِّهِنَّ بَدَأْتَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- এ চার كَلِمَةٌ -এর যে কোনোটি অগ্রপশ্চাৎ করে পড়া জায়েজ। ইমাম তীবী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত তারতীব অনুযায়ী পড়া عَزِيْمَةٌ আর বিনা তারতীবে পড়া رُخْصَةٌ -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৪৮]

قَوْلُهُ اَفْضَلُ الْكَلَامِ -এর ব্যাখ্যা : ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুসসালাম বলেন, সকল اَسْمَاءُ حُسْنٰى এ চার কালিমার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এগুলোই হলো بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন-

প্রথম কালিমা হলো سُبْحَانَ اللّٰهِ এটি মহান আল্লাহর صِفَاتٌ ও ذَاتٌ -এর মধ্য হতে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়ার ঘোষণাকারী। মহান আল্লাহর যত اَسْمَاءُ سلبى রয়েছে সবগুলো এর মধ্যে শামিল রয়েছে। যেমন- سَلَامٌ، قُدُّوْسٌ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ; মহান আল্লাহর صِفَاتْ ও ذَاتْ -এর জন্য যত পরিপূর্ণতা রয়েছে সবগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এজন্য যেসব কালিমা اِثْبَاتْ -এর অর্থ রাখে যেমন– بَصِيْرٌ، سَمِيْعٌ، قَدِيْرٌ، عَلِيْمٌ ইত্যাদি সবগুলোই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিতে যত দোষ-ত্রুটি আছে সবকিছু سُبْحَانَ اللّٰهِ দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে যায় আর যত পূর্ণতা রয়েছে সবগুলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত আমরা যত দোষ-ত্রুটি নিষিদ্ধ করেছি এবং যত গুণাবলি সাব্যস্ত করেছি এসব কিছুর ঊর্ধ্বে রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা যিনি আমাদের থেকে অদৃশ্য আর এগুলোকে একত্রিতভাবে শামিল করার জন্য তৃতীয় كَلِمَة তথা اَللّٰهُ اَكْبَرُ নেওয়া হয়েছে. এর অর্থ হলো– اِنَّهٗ تَعَالٰى اَجَلُّ مِمَّا نَفَيْنَاهُ وَاَثْبَتْنَاهُ –

আর এ অর্থেই রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

অতএব আমাদের অনুধাবনের উপর যত প্রশংসা যেসব اِسْم শামিল করে যেমন– اَلْمُتَعَالُ، اَلْاَعْلٰى এসবগুলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ -এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চতুর্থত যখন মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগতের নিকট নিজের পরিচিতি প্রদান করলেন তখন তার অনুরূপ [যে কোনো দিক থেকে] কোনো কিছুকে না করার জন্য لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ নেওয়া হয়েছে। কেননা একত্ববাদের দ্বারা তাঁর ইবাদত সাব্যস্ত হয়। আর যিনি ইবাদতের যোগ্য হবেন তিনি উল্লিখিত সকল গুণাবলিতে গুণান্বিত হবেন। আর ঐসব নাম হলো ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الْاَحَدِ الْوَاحِدِ এসব কিছু لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর মধ্যে শামিল। –[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৩]

وَعَنْ ٢١٨٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার বলা সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও আমার নিকট অধিক প্রিয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا الخ **-এর ব্যাখ্যা :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল সম্পদ হতে অধিক প্রিয়। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো অধিক ছওয়াবের দিক হতে দুনিয়ার অস্ত, উদয় ও ধ্বংস হতে অধিক প্রিয়। এটা ঠিক এ হাদীসের মতো যে– رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا –[মিরকাত– খ. ৫, পৃ. ১২৪]

وَعَنْهُ ٢١٨٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . (متفق عليه)

২১৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার বলবে– সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে– তার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্র-ফেনার ন্যায় বেশি হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মহান আল্লাহর প্রশংসা সংবলিত এ দোয়াটি (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ) দৈনিক একশতবার পাঠ করলে আল্লাহ তার অসংখ্য গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

ইবনে হাজার (র.) বলেন, দিনের যে কোনো অংশে পড়লেই যথেষ্ট হবে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, এখানে يَوْم শব্দটি মতলক, ফলে কোনো সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, এটা একসাথে বা ভিন্ন ভিন্নভাবে, এক মজলিসে বা বিভিন্ন মজলিসে, দিবসের শুরুতে বা শেষে সর্বাবস্থায় পড়া যাবে তবে দিবসের প্রথমভাগে পড়া উত্তম। কেননা এর ফলে পূর্বে পড়া হয়ে যায় এবং ছুটে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। −[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১২৪]

২১৮৯. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِىْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন− যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশতবার বলবে− 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' কিয়ামতের দিন তার এটা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে এর অনুরূপ বা এটা থেকে বেশি বলবে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় ১০০ বার করে পড়তে হবে। ইমাম তীবী (র.) বলেন, হাদীসের শেষাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, এর বেশি পাঠ করলে তার জন্য অতিরিক্ত প্রতিদান রয়েছে। এখানে ১০০ বলার দ্বারা নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য নয়। −[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১২৫]

২১৯০. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৯০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন− দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, যা বলতে সহজ অথচ পাল্লাতে ভারী ও আল্লাহর নিকট প্রিয়, তা হলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।' −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ দুটি كَلِمَة উচ্চারণে একেবারে সহজ− خِفَّة দ্বারা سُهُوْلَة বুঝানো হয়েছে, আর ثِقْل দ্বারা অধিক ছওয়াবের কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা ثِقْل -এর প্রকৃত স্বরূপ হলো কিয়ামত দিবসে মিজানে তা আকৃতি ধারণ করবে। কারো মতে اَعْمَال-এর পাতাসমূহকে ওজন করা হবে− وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ الْبِطَاقَةِ وَالسِّجِلَّاتِ

বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে সৎকর্মের কঠিনতা এবং মন্দকর্মের সহজতার স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছেন যে, সৎকর্মের তিক্ততা উপস্থিত থাকে আর মিষ্টতা বা কল্যাণ অদৃশ্য থাকে। এজন্য এটা করা তোমাদের উপর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এ কষ্টের কারণে তোমরা তা পরিত্যাগ করবে না।

আর মন্দ কর্মের মিষ্টতা প্রকাশিত এবং তার তিক্ততা অপ্রকাশিত এজন্য তা তোমাদের নিকট সহজ মনে হয়। কাজেই এ সহজতা যেন তোমাদেরকে মন্দকাজ করতে বাধ্য না করে। −[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১২৬]

وَعَنْ ٢١٩١ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيْئَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ كِتَابِهِ فِىْ جَمِيْعِ الرِّوَايَاتِ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِىِّ اَوْ يُحَطُّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الْبَرْقَانِىُّ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُوْسَى فَقَالُوْا وَيُحَطُّ بِغَيْرِ اَلْفٍ هٰكَذَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ ـ

২১৯১. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাজার নেকি অর্জন করতে অক্ষম? তাঁর সাথে বসা কেউ বলল, হুজুর! আমাদের কেউ এক হাজার নেকি অর্জন কিভাবে করতে পারবে? তখন তিনি বললেন, সে দৈনিক একশতবার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। এতে তার জন্য [একে দশ করে] এক হাজার নেকি লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গুনাহ মাফ করা হবে। -[মুসলিম]

আর মুসলিম শরীফে মূসা জুহানীর সমস্ত রেওয়ায়েতে اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ শব্দ আছে অর্থাৎ এতে শব্দটি নেই। তবে আবূ বকর বারকানী (র.) বলেন, শো'বা, আবূ আওয়ানা ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান মূসা জুহানী হতে যেসব রেওয়ায়েত করেছেন তাতে তারা وَيُحَطُّ অর্থাৎ اَلِفْ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। হুমাইদীর কিতাবেও অনুরূপ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসে اَوْ يُحَطُّ -এর কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়–

১. اَوْ অথবা অর্থে ব্যবহৃত হলে উদ্দেশ্য হবে দুয়ের একটি তথা এক হাজার ছওয়াব লিখা হবে অথবা এক হাজার পাপ মার্জনা করা হবে।

২. اَوْ টি وَاوْ অর্থে হলে উদ্দেশ্য হবে এক হাজার নেকি লিখা হবে এবং এক হাজার পাপ মার্জনা করা হবে। তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হাব্বানের বর্ণনার উদ্দেশ্য এটাই। কেননা সেগুলোতে "و" রয়েছে।

৩. অথবা, উভয়ের বর্ণনার মধ্যে এভাবে মিল করা যায় যে, যদি তার কোনো পাপ না থাকে তবে এক হাজার নেকি লিখা হবে আর যদি গুনাহ থাকে তবে এক হাজার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫০]

وَعَنْ ٢١٩٢ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْكَلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১৯২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন বাক্য শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, যা আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জন্য পছন্দ করেছেন তা হলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী।' -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ সেসব কালিমাকে তাঁর ফেরেশতাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন যেগুলো সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন। আর এ কালিমাগুলো সর্বদা পড়ার জন্য তাঁদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর তা হলো– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ আর এ কালিমাদ্বয় মূলত سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ এ চার কালিমার সংক্ষিপ্ত রূপ। কেননা تَسْبِيْح দ্বারা شِرْك অস্বীকার করা হয় যাতে تَهْلِيْل -ও সাব্যস্ত হয়। আর আল্লাহ যে মহান তাও সাব্যস্ত হয়। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫০]

وَعَنْ ٢١٩٣ جُوَيْرِيَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَا زِلْتَ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১৯৩. অনুবাদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদিন খুব ভোরে নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট হতে বের হলেন যখন ফজরের নামাজ পড়লেন, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) তখন আপন নামাজের জায়গায় বসা। অতঃপর সূর্য উঠার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন আর তখনও হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) তথায় বসে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমা হতে পৃথক হয়ে যাওয়া অবধি কি তুমি এ অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার পরে আমি মাত্র চারটি বাক্য তিনবার বলেছি, যদি এগুলোকে তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তার সাথে ওজন দেওয়া হয়, তাহলে এর ওজনই অধিক হবে, [বাক্যগুলো হলো-] سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ "আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে– তাঁর সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তোষ পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।" –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জিকির করার অবস্থার উপর এর ছওয়াব নির্ভরশীল; সংখ্যাধিক্যের উপর নয়। অর্থাৎ যেসব জিকিরের মূলভাব উন্নত এবং যেগুলো একনিষ্ঠতার সাথে পাঠ করা হয় সেগুলো ঐসব জিকির হতে উত্তম যার মূলভাব তত উন্নত নয় এবং حُضُوْر قَلْب - ও থাকে না। বস্তুত চিন্তা-গবেষণার সাথে এক আয়াত পাঠ করা সাধারণভাবে অনেক আয়াত পড়া হতে উত্তম।

মূলত অত্র হাদীসের উদ্দেশ্য হলো হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-কে একনিষ্ঠতার সাথে জিকির-আযকার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। কেননা মহানবী ﷺ -এর মুখে জিকির করা অন্য লক্ষ কোটি মুখের চেয়েও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

–[মাযাহেরে হক ও মিরকাত]

وَعَنْ ٢١٩٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার বলবে, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি হচ্ছেন সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান"– সেই ব্যক্তির দশটি গোলাম আজাদ করার পরিমাণ ছওয়াব হবে, তার জন্য একশত নেকি লেখা হবে, তার একশতটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং এটা তার জন্য ঐ দিনের জন্য শয়তান হতে রক্ষাকবচ হবে, যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা হয় এবং সে যা করেছে তা অপেক্ষা কেউ কিছু করতে পারবে না, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে এটা অপেক্ষা অধিক বলবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের প্রকাশ্য ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, এ দোয়াটি সন্ধ্যা বেলায় পড়লেও সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। এজন্য এ বর্ণনাটি রাবী সংক্ষিপ্ততার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আর নবী করীম ﷺ হতেও এ বর্ণনাটি আসেনি। কেননা হাদীসের ভাষ্য দ্বারা এটা বুঝা যায়।

ইমাম নববী (র.) বলেন, অত্র হাদীসে যেসব ফজিলত ও ছওয়াবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা একশতবার পড়ার মাধ্যমেই অর্জিত হবে। আর এর থেকে বেশি পড়লে বেশি ফজিলতপ্রাপ্ত হবে। আর এটা পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন সময়েও পড়া যায়। সর্বাবস্থায় উল্লিখিত ফজিলতপ্রাপ্ত হবে তবে উত্তম হলো একবারেই সকাল বেলা পড়ে নেওয়া, তাহলে সে পুরো দিন শয়তান হতে মুক্তি পাবে। –[মাযাহেরে হক: খ. ৩, পৃ. ১৫২]

وَعَنْ ٢١٩٥ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَرْبِعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهٖ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى وَاَنَا خَلْفَهُ اَقُوْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فِىْ نَفْسِىْ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৯৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। লোকেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওহে! তোমরা নিজেদের প্রতি রহম কর, তোমরা বধিরকে ডাকছ না, আর না অনুপস্থিতকে, তোমরা ডাকছ শ্রোতা ও দর্শক –সামী' ও বাসীরকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন, আর যাঁকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক নিকটে। হযরত আবূ মূসা (রা.) বলেন, আমি তখন হুজুরের পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোনো উপায় নেই, শক্তি নেই। তখন হুজুর বললেন, ওহে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স! আমি কি তোমাকে বেহেশতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দেব না? আমি বললাম, নিশ্চয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তা হলো– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ [আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আবূ মূসার নাম।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "সাহাবায়ে কেরাম উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতেন" এর উদ্দেশ্য হলো উঁচু জায়গায় আরোহণের সময় তাকবীর বলা সুন্নত। আর এটাকে সাহাবীগণ উচ্চৈঃস্বরে পড়ছিলেন। অথবা تَكْبِيْر দ্বারা জিকিরও উদ্দেশ্য হতে পারে– সাহাবীগণ তখন জিকির করতে গিয়ে আওয়াজ উঁচু করেছিলেন। এজন্য রাসূল ﷺ উক্ত কথা বলেছেন।

আর হাদীসের শেষে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -কে ধনভাণ্ডার এজন্য বলেছেন যে, উক্ত দোয়া পড়ার মাধ্যমে অনেক ছওয়াব অর্জিত হয় এবং এর বরকতে আখিরাতে অনেক পুণ্য মিলবে; বরং তার সম্মুখে দুনিয়ার সকল সম্পদই তুচ্ছ মনে হবে।

এর ফজিলত সম্পর্কে বুজুর্গগণ লিখেছেন, এই ذِكْر আমলের মধ্যে যে রকম বেশি সাহায্য করে এবং তাতে যে বরকত হয় এরকম বরকত আর কোনো জিকিরে হয় না। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৩]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিরমিযী হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ইবনে হাব্বান একে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন যে, নবী করীম ﷺ মি'রাজ রজনীতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি আপনার উম্মতকে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ার মাধ্যমে জান্নাতে অধিক বৃক্ষ রোপণ করতে আদেশ করুন। অপর বর্ণনায় আছে, এটা হলো জান্নাতের একটি দরজা। সম্ভবত এর বিভিন্ন ফলাফলের কারণ হলো পাঠকের মর্যাদার ভিন্নতা। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৩২]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢١٩٦ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১৯৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বলবে– سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ অর্থাৎ "মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে।" তার জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত ذِكْر টি এত ফজিলতপূর্ণ যে একবার কেউ পাঠ করলে তার জন্য একটি বিশাল খেজুর গাছ রোপণ করা হবে। আর খেজুর গাছের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, এ গাছের অনেক উপকারিতা রয়েছে এবং এর ফলও সুস্বাদু খাবার। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও তার ঈমানকে এ গাছ ও তার ফলের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন– اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
এখানে شَجَرَة طَيِّبَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খেজুর গাছ। –[মিরকাত– খ. ৫, পৃ. ১৩৩]

وَعَنْ ٢١٩٧ الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مُنَادٍ يُنَادِيْ سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوْسَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২১৯৭. অনুবাদ : হযরত যুবায়র (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এমন কোনো ভোর নেই যাতে আল্লাহর বান্দারা উঠেন, আর একজন ঘোষণাকারী এরূপ ঘোষণা না করেন যে, "পবিত্র বাদশাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর।" –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** সকল সৃষ্টিই মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করে যেমনি ইরশাদ হয়েছে– وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ এ কারণেই প্রতিদিন সকাল বেলায় একজন ফেরেশতা এ ঘোষণা করতে থাকে যে, হে মানব সকল! তোমরা মহা প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা কর। এজন্য ইমাম তীবী (র.) বলেন, তোমরা বল– سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ অথবা, سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ অথবা এ রকমই যে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ـ
–[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৩৩]

وَعَنْ ٢١٩٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২১৯৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", আর শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো "আলহামদু লিল্লাহ।" –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ; কেননা এটা ছাড়া না ঈমান বিশুদ্ধ হবে, না মুসলমান হবে; বরং ইসলাম ও ঈমানের অস্তিত্ব এর মাধ্যমেই হবে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক বিজ্ঞজনের মতে সকল জিকিরের মধ্য হতে এটি উত্তম হবার কারণ হলো, জিকিরকারীর অন্তরে বাতিল ধারণার কারণে অন্তর্জগতে যে مَعْبُوْد সৃষ্টি হয় তাকে দূরীকরণে ও পরিষ্কারকরণে এ কালিমা বিরাট প্রতিক্রিয়া রাখে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ অর্থাৎ তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছ যে নিজের ইচ্ছাকে মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে। যখন সে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলে তখন لَا إِلٰهَ দ্বারা যাবতীয় মা'বূদকে অস্বীকার করা হয়ে যায়, আর إِلَّا اللّٰهُ-এর মাধ্যমে শুধু একজন প্রভু তথা আল্লাহ তা'আলার স্বীকৃতি হয়ে যায়। এ কালিমাটি মুখে আদায়ের মাধ্যমে অন্তরের গভীরে এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, মৌখিকভাবে যাবতীয় বাতিল মা'বূদ অস্বীকৃতি এবং একক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের স্তর অর্জিত হয় যা তার অন্তরকে আলোকিত করে যাবতীয় বাতেনী ত্রুটি পরিষ্কার করে দেয়। পরিশেষে এর প্রতিক্রিয়া তার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপরও প্রাধান্য পায়। এর ফলে তার বাহ্যিক অঙ্গসমূহ হতে যেসব কার্যাবলি প্রকাশিত হয়, তা তার স্বীকৃত দৃঢ় বিশ্বাসের মূল চাহিদা।

আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-কে সর্বোত্তম দোয়া বলার কারণ হলো, এতে মহা প্রভুর যাবতীয় প্রশংসা তথা شُكْر ও حَمْد নিহিত রয়েছে। আর বাহ্যত নিয়ামত ও বরকতের কৃতজ্ঞতা এতে অধিক রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেব।' –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৪]

وَعَنْ ٢١٩٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّٰهَ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُهُ.

২১৯৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রশংসা করা হলো সেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যে বান্দা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, সে তাঁর প্রশংসা করেনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আল্লাহ তা'আলার حَمْد বা প্রশংসা মৌখিকভাবে হয়ে থাকে আর شُكْر বা কৃতজ্ঞতা মুখ, অন্তর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা হয়ে থাকে। আর حَمْد-কে شُكْر-এর মূল এজন্য বলা হয়েছে যে, এটা হলো মৌখিক কাজ আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রশংসা জিহ্বা দ্বারাই বেশি প্রকাশিত হয়। আবার এ জিহ্বাই হলো সকল অঙ্গের প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত। এজন্য حَمْدও যেন সংক্ষিপ্তভাবে شُكْر এবং শোকরের বড় অংশ এজন্য বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেনি সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেনি। এর দ্বারা এ কথাটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বান্দা তার অন্তর্জগৎ পরিষ্কার করার সাথে সাথে বাহ্যিক অবস্থাও যেন হেফাজত করে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৪]

وَعَنْ ٢٢٠٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يُدْعٰى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

২২০০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন প্রথমে যাদেরকে বেহেশতের দিকে ডাকা হবে, তারা হবেন সেসব ব্যক্তি যারা সুখে-দুঃখে সকল সময় আল্লাহর প্রশংসা করতেন। উক্ত হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : যারা সুখে-দুঃখে, সুস্থ-অসুস্থ, ধনী-দরিদ্র, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৩৫]

وَعَنْ ٢٢٠١ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهٖ وَاَدْعُوْكَ بِهٖ فَقَالَ يَا مُوْسٰى قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِىْ بِهٖ قَالَ يَا مُوْسٰى لَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِىْ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعْنَ فِىْ كِفَّةٍ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِىْ كِفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২২০১. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– একদা হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার রব! আমাকে এমন একটি বাক্য জানিয়ে দিন যা দ্বারা আমি তোমার জিকির করতে পারি অথবা বলেছেন, তোমার নিকট দোয়া করতে পারি। আল্লাহ বললেন, তুমি বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার সকল বান্দাই তো এটা বলে থাকে। আমি তো তোমার নিকট আমার জন্য একটি বিশেষ বাক্য চেয়েছি। তখন আল্লাহ বললেন, মূসা! যদি সপ্ত আকাশ আর আমি ব্যতীত এর সকল অধিবাসী এবং সপ্ত পৃথিবী এক পাল্লায় রাখা হয়, আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে অবশ্যই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর পাল্লা ভারী হবে। –[শরহুস সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِشْكَالُ **[দ্বন্দ্ব] :** অত্র হাদীসের আলোকে এ اِشْكَالْ [দ্বন্দ্ব] সৃষ্টি হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন কোনো নির্দিষ্ট জিকির প্রার্থনা করেছিলেন যা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট, যার দ্বারা তিনি অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন। অথচ মহান আল্লাহ প্রশ্ন অনুযায়ী জবাব দেননি; বরং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়তে বলেছেন। এতে বুঝা যায়, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা ছিল একটি বিষয় আর আল্লাহ জবাব দিয়েছেন অন্যটি।

নিরসন : এর উত্তর হলো, মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়ার শিক্ষা দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তুমি একটি অসম্ভব বস্তুর প্রার্থনা করেছ। কেননা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হতে এমন কোনো শ্রেষ্ঠ দোয়া ও জিকির নেই যা তোমার জন্য নির্দিষ্ট করব। বস্তুত হযরত ঈসা (আ.) নিজের মানবীয় স্বভাবের ফলে নির্দিষ্ট দোয়া চেয়েছিলেন। কারণ মানবীয় স্বভাবই হলো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু দ্বারা বিশেষিত হওয়া যা অন্যের নিকট নেই। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৬]

وَعَنْ ٢٢٠٢ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ صَدَّقَهٗ رَبُّهٗ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَاَنَا اَكْبَرُ وَاِذَا قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ يَقُوْلُ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَحْدِىْ لَا شَرِيْكَ لِىْ وَاِذَا قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ وَاِذَا قَالَ لَا

২২০২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলবে [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ সুমহান।] আল্লাহ তার সমর্থন করে বলেন, হ্যাঁ, আমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি অতি মহান। আর যখন সে বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু' [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।] আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, আমি এক, আমার কোনো শরিক নেই। আর যখন সে বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু' [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তাঁরই রাজ্য ও তাঁরই প্রশংসা।] তখন আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, আমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, আমারই রাজ্য এবং আমারই প্রশংসা। আর যখন সে বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা

إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِيْ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهٖ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো কোনো উপায় ও শক্তি নেই।] আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, আমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই এবং আমার সাহায্য ছাড়া কারো কোনো উপায় ও শক্তি নেই। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাও বলতেন, আপন অসুস্থতার সময়ে যে ব্যক্তি এটা বলবে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবে তাকে দোজখের আগুন খাবে না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٢٠٣ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رض) أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهٖ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২২০৩. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে একটি স্ত্রীলোকের নিকট পৌঁছলেন। তখন স্ত্রীলোকটির সম্মুখে কিছু খেজুর বিচি অথবা বলেছেন কাঁকর ছিল, যার দ্বারা সে তাসবীহ গুণছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাকে বলব না যা এটা অপেক্ষা তোমার পক্ষে সহজ অথবা বলেছেন উত্তম? তা হচ্ছে এরূপ বলা, 'সুবহানাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা– যে পরিমাণ তিনি আসমানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহানাল্লাহ' যে পরিমাণ তিনি জমিনে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহানাল্লাহ' যে পরিমাণ তাদের মধ্যখানে রয়েছে এবং 'সুবহানাল্লাহ' যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন সে পরিমাণ। 'আল্লাহু আকবার' এর অনুরূপ, 'আলহামদু লিল্লাহ' এর অনুরূপ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অনুরূপ এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'ও এর অনুরূপ। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কোনো কোনো বর্ণনায় এটা উল্লিখিত আছে, উক্ত মহিলাটি ছিলেন রাসূল ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীগণের একজন। তিনি ছিলেন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) বা অন্য কেউ। আর এখানে খেজুরের বিচি বা কঙ্কর এ কথাটি সন্দেহযুক্ত। তথা বর্ণনাকারী এ বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না যে উক্ত মহিলা কি খেজুরের বিচি নাকি পাথর কণা দ্বারা তাসবীহ পাঠ করছিলেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৭]

বর্তমানে প্রচলিত তাসবীহ জায়েজ কিনা? বর্তমানে তাসবীহ পাঠের জন্য যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয় তা রাসূলের যুগে ছিল না। কিন্তু অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এসব দ্বারা তাসবীহ পাঠ করা জায়েজ হবে। কেননা রাসূল ﷺ উক্ত মহিলাকে খেজুর বিচি বা কঙ্কর দ্বারা তাসবীহ পাঠরত দেখেও তা নিষেধ করেননি। আর এসব দানা ও কঙ্কর দ্বারা তাসবীহের হিসাব রাখা হতো। ফলে বর্তমানেও এগুলো দ্বারা গণনা করা হয়। কাজেই জায়েজ না হওয়ার কোনো কারণ নেই। এছাড়া কোনো কোনো বুজুর্গ একে জায়েজের সাথে এটাও বলেছেন যে, এটা শয়তানের জন্য কোড়া বা চাবুক স্বরূপ।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি مَعْرِفَتْ -এর সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে গেলেন তখন তাঁর হাতে তাসবীহ দেখে জনৈক ব্যক্তি তাসবীহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এ বস্তুর মাধ্যমেই আমি মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছি, তাই আমি একে কিভাবে পরিত্যাগ করব। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩ পৃ. ১৫৮]

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ : অত্র হাদীসাংশের দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. এটা বর্ণনাকারীর শব্দ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ যেভাবে تَسْبِيْح তথা سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ الخ পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে تَكْبِيْر ও পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন তথা اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدَ مَا خَلَقَ الخ। কিন্তু বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ততার কারণে وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ উল্লেখ করে বলেছেন যে, মহানবী ﷺ ও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

২. অথবা, এটা রাবীর শব্দ নয়; বরং নবী করীম ﷺ -এরই كَلِمَة বা তিনি নিজেই সংক্ষিপ্ত করেছেন অর্থাৎ তিনি عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ الخ উল্লেখ না করে مِثْلُ ذٰلِكَ বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, এভাবে وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذٰلِكَ সহ অন্যগুলোরও দুটি تَاوِيْل রয়েছে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৮]

وَعَنْ ٢٢٠٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَاْتِ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اَحَدٌ بِاَكْثَرَ مِمَّا اَتٰى بِهٖ اِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ اَوْ زَادَ عَلٰى مَا قَالَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২২০৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে যে একশত হজ করেছে। যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে যে একশত ঘোড়ায় একশত মুজাহিদ রওয়ানা করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে যে ইসমাঈল বংশীয় একশত দাস মুক্ত করেছে এবং যে সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, সেদিন তার অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না। অবশ্য সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে এরূপ বলেছে বা এর থেকে বেশি বলেছে। –[তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ **-এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় একশতবার করে سُبْحَانَ اللّٰهِ পাঠ করবে সে ১০০টি নফল হজ করার ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। তবে এর জন্য অন্তরের একনিষ্ঠতা, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা এবং ইবাদতের প্রতি একাগ্রতা থাকতে হবে। অথবা এখানে কম মর্যাদাসম্পন্ন ইবাদতের ফজিলত বর্ণনার লক্ষ্যে مُبَالَغَة হিসেবে ১০০ হজের কথা বলা হয়েছে।

কোনো কোনো বুজুর্গ বলেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ -তে যেহেতু অনেক ফজিলত রয়েছে তাই এর ছওয়াবকে বৃদ্ধি করে نَفْل হজের ছওয়াবের পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৯]

قَوْلُهُ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ فَرَسٍ **-এর ব্যাখ্যা :** সকাল-সন্ধায় ১০০ বার করে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পাঠ করলে ১০০টি ঘোড়া দান করার ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। আর এ ঘোড়া যুদ্ধের জন্য দান অথবা হাওলাত স্বরূপ উভয়ই হতে পারে। এর দ্বারা আল্লাহর জিকির করার দিকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে মানুষ দুনিয়ার দিকে কোনো রূপ দৃষ্টি না দেয় বরং মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালায়। কেননা শারীরিক ও আর্থিক উভয় ইবাদতের মূল হলো আল্লাহর জিকির। তবে এটা মনে রাখতে হবে وَسِيْلَة টি مَطْلُوْب হতে উত্তম হবে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৭]

قَوْلُهُ كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ الخ -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশতবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করবে সে যেন বনী ইসমাঈলের ১০০ জন গোলাম আজাদ করল। এতে সেসব জিকিরকারীদের সান্ত্বনা ও উৎসাহ রয়েছে যারা দরিদ্র-অভাবী হবার ফলে ধনশালীদের ন্যায় অর্থনৈতিক আমল করতে পারে না। আর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আরববাসী হবেন এবং নবী করীম ﷺ -এর সাথে সম্পর্কের কারণে মর্যাদাশীল হবেন।

আর অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ কিন্তু অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হলো সবচেয়ে উত্তম জিকির, তারপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর سُبْحَانَ اللّٰهِ তাই অত্র হাদীসের শেষাংশের উদ্দেশ্য হলো, সকাল ও সন্ধ্যায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ একশতবার করে পাঠ করবে। কিয়ামতের দিন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর জিকিরকারী ব্যতীত অন্য কেউ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -এর জিকিরকারী হতে উত্তম হবে না। -[মাজাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৯]

وَعَنْ ٢٢٠٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَاُهُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُوْنَ اللّٰهِ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلَيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ)

২২০৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- 'সুবহানাল্লাহ' হলো পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদু লিল্লাহ' তাকে পূর্ণ করে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সম্মুখে কোনো পর্দা নেই, যে পর্যন্ত না তা আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছে। -[তিরমিযী (র.) এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব, এর সনদ সবল নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলার দ্বারা মীযানকে পূর্ণ করে দেয়। ফলে এটা سُبْحَانَ اللّٰهِ হতে উত্তম। অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ উভয়ই এক সমান। কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অর্ধ মীযান পূর্ণ করে আর سُبْحَانَ اللّٰهِ অর্ধ মীযান পূর্ণ করে। ফলে উভয়ে মীযানকে পূর্ণ করবে। আর হাদীসের শেষাংশের উদ্দেশ্য হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মহান আল্লাহর দরবারে অতি দ্রুত কবুল হয় এবং এর জিকিরকারী অনেক ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। এটাও বুঝা যায় যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ থেকে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অতি উত্তম। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৫৯]

وَعَنْ ٢٢٠٦ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا قَطُّ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى يُفْضِيَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২২০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে কোনো বান্দা খালেস অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, নিশ্চয় তার জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা হবে, যে পর্যন্ত না তা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে, যদি সে কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে। -[তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো ব্যক্তি যদি একনিষ্ঠতার সাথে লোক দেখানো বা শুনানো ব্যতীত لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে তৎক্ষণাৎ তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায় এবং তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে এর জন্য শর্ত হলো কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্রুত কবুল হওয়া। আর কবীরা হতে বিরত থাকাও হলো দ্রুত কবুল হবার জন্য, ছওয়াব কবুলের জন্য অথবা পূর্ণ ছওয়াবের জন্য বা উঁচু স্তরের কবুলের জন্য শর্ত। কেননা سَيِّئَةٌ বা পাপ নেককে ধ্বংস করতে পারে না; বরং সৎকাজ পাপকে ধ্বংস করে দেয়। -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৪২]

وَعَنْ ٢٢٠٧ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِقْرَأْ اُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طِيْبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيْعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

২২০৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মি'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলবেন এবং সংবাদ প্রদান করবেন যে, বেহেশত হলো সুগন্ধ-মৃত্তিকা ও সুপেয় পানিবিশিষ্ট; কিন্তু তাতে কোনো গাছপালা নেই। আর এর গাছ হলো– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –[তিরমিযী। তিনি বলেন, সনদের দিক থেকে হাদীসটি হাসান গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِشْكَالُ [দ্বন্দ্ব] : ইমাম তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতের জমিন গাছ-গাছালি এবং প্রাসাদসমূহ হতে খালি অথচ মহান আল্লাহ বলেন– جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত গাছ-গাছালি ও অন্যান্য বস্তু হতে খালি নয়। কেননা ঘন ও ছায়াযুক্ত গাছ-গাছালির কারণেই জান্নাতকে জান্নাত বলা হয়।

নিরসন : এর জবাব নিম্নরূপ–

১. প্রথমত জান্নাত খোলা ময়দান ছিল অতঃপর মহান আল্লাহ মানুষের আমল অনুযায়ী নিজ দয়া ও অনুগ্রহে গাছ-গাছালি লাগিয়েছেন। যেহেতু আমলই হলো গাছ লাগানোর কারণ, এজন্যই আমলকে গাছ সাব্যস্ত করা হয়েছে। اِطْلَاقًا لِلسَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ

২. অথবা, অত্র হাদীস দ্বারা এটা জানা যায় না যে, পুরো জান্নাতই গাছপালাশূন্য। কেননা قِيْعَانٌ-এর অর্থ হলো জান্নাতের অধিকাংশ স্থান গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ আর অপর স্থানগুলো খালি ও প্রশস্ত, যাতে উল্লিখিত জিকির দ্বারা সে স্থানগুলো গাছ-গাছালি লাগানো হয়।

৩. অথবা, খুব স্বল্প সংখ্যক জান্নাতির জন্য দুটি জান্নাত থাকবে যেমনটা কুরআনে এসেছে– وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ الخ এগুলোর একটিতে মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে গাছপালা, ঝরনা, হুর-গেলমান ও প্রাসাদসমূহ তৈরি করে রেখেছেন। আর দ্বিতীয় জান্নাতে আমলের দ্বারা ঐসব কিছু করা হবে।

এগুলোর প্রথমটি মহা প্রভুর দয়া ও অনুগ্রহে হবে। এ অর্থেই কোনো কোনো সুফি বলেছেন– جَنَّتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَجَنَّتُهٗ فِي الْعُقْبٰى –[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৩]

وَعَنْ ٢٢٠٨ يُسَيْرَةَ (رض) وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسِيْنَ الرَّحْمَةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২২০৮. অনুবাদ : হযরত ইয়ুসায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ছিলেন মুহাজির নারীদের অন্তর্গত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন– তোমরা 'সুবহানাল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস' বলবে এবং অঙ্গুলিসমূহে গুণবে। কেননা এগুলোকে কিয়ামতে জিজ্ঞাসা করা হবে ও বলার শক্তি দেওয়া হবে এবং তোমরা গাফেল হবে না, যাতে তোমরা আল্লাহর রহমত হতে বিস্মৃত হও। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা সবার নিকট সুস্পষ্ট যে, কিয়ামত দিবসে শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার অধিপতির সকল কর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমনটা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

আর অত্র হাদীসে "অঙ্গুলিসমূহকে জিজ্ঞাসা করা হবে" এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ অঙ্গুলিসমূহকে কথা বলার শক্তি প্রদান করে তার কাজকর্মসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব এসব অঙ্গুলি তার মালিকের জন্য ভালো বা মন্দের সাক্ষ্য প্রদান করবে। এজন্যই রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তাসবীহসমূহ অঙ্গুলির মাধ্যমে গণনা কর, যাতে সেগুলো কিয়ামত দিবসে নেক আমলের সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল অঙ্গুলির মাধ্যমে গণনা করে পড়া উত্তম। যদিও তাসবীহের মাধ্যমেও পড়া জায়েজ। আর এতে এদিকেও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির চাহিদা এই হওয়া চাই যে, সে তার যাবতীয় অঙ্গসমূহকে সে কাজে ব্যাপৃত রাখবে যেগুলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সহায়ক হয় এবং তার প্রত্যেক অঙ্গকে পাপ হতে বিরত রাখবে, যাতে সেগুলো কিয়ামত দিবসে পাপের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে তাকে বিপদে নিক্ষেপ না করে। –[মাযাহেরে হক– খ. ৩ পৃ. ১৬১]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٠٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ كَلَامًا اَقُوْلُهٗ قَالَ قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ فَقَالَ فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّىْ فَمَا لِىْ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ شَكَّ الرَّاوِىْ فِىْ عَافِنِىْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২০৯. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, একদা এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হুজুর! আমাকে দোয়া-কালাম সম্পর্কে একটি কথা শিখিয়ে দিন যা আমি পড়তে পারি। তিনি বললেন, বল তুমি, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, আল্লাহ অনেক বড়, আল্লাহর জন্য বহু প্রশংসা, আমি পবিত্রতা ঘোষণা করি সে আল্লাহর যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, কারো কোনো উপায় বা শক্তি নেই আল্লাহ ব্যতীত, যিনি প্রতাপান্বিত ও প্রজ্ঞাবান।" সে বলল, হুজুর! এটা তো আমার প্রভুর জন্য [প্রশংসা] আমার জন্য কি? তখন তিনি বললেন, বল তুমি, "আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, হেদায়েত দান কর, আমাকে রিজিক দাও ও আমাকে শান্তিতে রাখ!" রাবী সন্দেহ করেছেন, শেষ শব্দটি তথা 'আমাকে শান্তিতে রাখ' হুজুরের কথার মধ্যে আছে কিনা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : গ্রাম্য ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে নবী করীম ﷺ এই لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ الخ দোয়াটি পড়তে বলেছেন। এতে প্রথমে তাওহীদের শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা এটাই হলো সকল ইবাদতের শুরু বা মূল এবং সকল কল্যাণকর কাজের পরিসমাপ্তি। আর সর্বশেষে নেওয়া হয়েছে– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الخ কেননা কোনো কাজই মহান আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ও শক্তি ব্যতীত করা সম্ভব নয়। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٢١٠ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى شَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২২১০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পাতা-শুষ্ক গাছের নিকট পৌছলেন এবং নিজ লাঠি দ্বারা একে আঘাত করলেন। এতে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। তখন তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'– বান্দার গুনাহকে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে ঐ গাছের পাতা ঝরছে। –[তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٢٢١١ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُوْلٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ اَدْنَاهَا الْفَقْرُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَمَكْحُوْلٌ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ)

২২১১. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] মাকহুল (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাকে বললেন– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বেশি বেশি বলবে; কেননা এটা জান্নাতের ভাণ্ডারের বাক্যবিশেষ। মাকহুল বলেন, যে বলবে– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ আল্লাহ তার সত্তরটি কষ্ট দূর করে দেবেন, যার সর্বনিম্নটা হলো দারিদ্র্য। –[ইমাম তিরমিযী এটা বর্ণনা করে বলেন, এর সনদ মুত্তাসিল নয়। মাকহুল (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে হাদীসটি শুনেননি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আলোচ্য হাদীসে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الخ -কে জান্নাতের ভাণ্ডার বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো এটি জান্নাতের একটি ذَخِيْرَة বা সঞ্চিত সম্পদ। এর পাঠক সেদিন তা হতে উপকারিতা অর্জন করবে যেদিন দুনিয়ার কোনো ধন-দৌলত কোনো কাজে আসবে না এবং আত্মীয়-পরিজনও কোনো উপকার প্রদান করতে সমর্থ হবে না। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৬৩]

اَلْمُرَادُ بِالْفَقْرِ : আলোচ্য হাদীসে فَقْر বা দারিদ্র্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তরের দারিদ্র্য এবং কলবের সংকীর্ণতা। এ প্রসঙ্গে অন্য হাদীসে এসেছে– كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا অর্থাৎ 'দারিদ্র্য কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।' এ কারণেই যে ব্যক্তি উল্লিখিত কালিমাগুলো পাঠ করবে তার অন্তরের মুখাপেক্ষীতা দূর হয়ে যাবে। কেননা যখন এ কালিমাগুলো উচ্চারণ করা হয় আর অন্তরে এর অর্থ কল্পনা করা হয় তখন তার কলবে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, সকল কর্মই এবং সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতে আসে। সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবকিছু তাঁরই হাতে কেউ বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে পতিত হওয়াও তাঁরই পক্ষ হতে, যদি সে ব্যক্তি তাতে ধৈর্যধারণ করে নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং সকল বিষয়কে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করে তবে সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবে।

–[মাযাহেরে হক– খ. ৩, পৃ. ১৬৩]

اَقْوَالُ الْاَئِمَّةِ فِى الْحَدِيْثِ [আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত] : ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী অত্র হাদীসের সনদ মুত্তাসিল না হলেও হযরত মূসা (রা.)-এর বর্ণনায় একে صَحِيْح সাব্যস্ত করা হয়েছে যা صِحَاح সিত্তাহ-এর মধ্যে مَرْفُوْع হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যথা- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ এমনিভাবে অত্র হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে নাসায়ী ও বাযযাযের বর্ণিত مَرْفُوْع হাদীস দ্বারা দৃঢ় করা হয়েছে। আর তা এরকম যে, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ কাজেই হযরত مَكْحُوْل বর্ণিত অত্র হাদীসটি সনদের দিক থেকে مُنْقَطِعْ হলেও অর্থ ও মর্মের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। -[মাযাহেরে হক- খ. ৩ পৃ. ১৬৩]

وَعَنْ ٢٢١٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ دَاءً اَيْسَرُهَا الْهَمُّ .

২২১২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ হলো নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ, সেগুলোর সহজটা হলো চিন্তা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ দোয়াটি নিরানব্বইটি রোগের মহৌষধ; এ রোগ হলো ইহকালীন ও পরকালীন। আর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজটি হলো দুশ্চিন্তা। এটি দীনি অথবা দুনিয়াবি কিংবা জীবনযাপন সম্পর্কীয় বা পরকালীন বিষয়ক সর্বদিকেই হতে পারে। আর এটা সর্বজন স্বীকৃত যে দুশ্চিন্তা মানুষকে হীন-ক্ষীণ, সংকীর্ণমনা ও দুর্বল করে তোলে। এর ফলেই মহান আল্লাহ হযরত ইউনুস (আ.)-এর এ রোগটি দূর করা প্রসঙ্গে বলেন- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ -[মিরকাত]

وَعَنْهُ ٢٢١٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ . (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২২১৩. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাকে বললেন, আরশের নীচের ও বেহেশতের ভাণ্ডারের একটি বাক্য কি তোমাকে অবহিত করব না? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ [যখন এটা বান্দা বলে,] তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা সম্পূর্ণভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করল। উক্ত হাদীস দুটি বায়হাকী দা'আওয়াতে কাবীরে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতের উপরে আরশ স্থাপিত। আর আরশের নীচে জান্নাতের ভাণ্ডারের বাক্যই হলো- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ সূরা বাকারার শেষাংশও এ স্থান হতে অবতীর্ণ হয়।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, বান্দা যখন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে তখন আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেন- اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ অর্থাৎ 'আমার বান্দা পরিপূর্ণভাবে আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে।' অথবা অন্য বান্দা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একমাত্র আমার আনুগত্যই করেছে।

ইমাম তীবী (র.) আরো বলেন, সে সৃষ্টিজগতের সকল বিষয় আমার দিকে ন্যস্ত করে এবং দীনকে নিজের জন্য একনিষ্ঠভাবে মনে করে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে। -[মিরকাত- খ. ৫, পৃ. ১৫০]

وَعَنْ ٢٢١٤ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هِيَ صَلٰوةُ الْخَلَائِقِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةُ الْاِخْلَاصِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

২২১৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'সুবহানাল্লাহ' হলো বান্দাদের ইবাদত, 'আলহামদু লিল্লাহ' হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাক্য, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হলো তাওহীদের কালিমা এবং 'আল্লাহু আকবার' পূর্ণ করে আসমান ও জমিনের মধ্যে যা আছে তাকে। বান্দা যখন বলে– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে সম্পূর্ণভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করল। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : سُبْحَانَ اللّٰهِ সৃষ্টি জগতের ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো যে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

অর্থাৎ 'সৃষ্টি জগতের মধ্যে এমন কোনো বস্তু নেই যে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে না।' কাজেই সকল সৃষ্টি যখন আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে তখন এটা তাদের জন্য ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম তীবী (র.) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী– كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ তাদের এ তাসবীহ মৌখিক হবে বা অবস্থা দ্বারা হবে, যা দ্বারা স্রষ্টার কুদরত ও হেকমত প্রকাশ পাবে। –[মাযাহেরে হক ও মিরকাত]

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ

পরিচ্ছেদ : ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা

تَعْرِيْفُ الْاِسْتِغْفَارِ [ইস্তিগফারের সংজ্ঞা] : اَلْاِسْتِغْفَارُ শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো- طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর পারিভাষিক পরিচয় হলো- هِيَ الرُّجُوْعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ اِلَى الطَّاعَةِ اَوْ مِنَ الْغَفْلَةِ اِلَى الذِّكْرِ وَمِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الْحُضُوْرِ অর্থাৎ পাপ হতে আনুগত্যে অথবা অমনোযোগিতা হতে জিকিরে এবং অনুপস্থিত হতে উপস্থিতির দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে اِسْتِغْفَارٌ বলে।

تَعْرِيْفُ التَّوْبَةِ [তওবার সংজ্ঞা] : اَلتَّوْبَةُ শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো- اَلرُّجُوْعُ বা প্রত্যাবর্তন করা। আর পারিভাষিক পরিচয় হলো-

تَرْكُ الذَّنْبِ لِقُبْحِهِ وَالنَّدَمُ عَلٰى مَا فُرِطَ مِنْهُ وَالْعَزِيْمَةُ عَلٰى تَرْكِ الْمُعَاوَدَةِ وَتَدَارُكُ مَا اَمْكَنَهُ اَنْ يَتَدَارَكَ مِنَ الْاَعْمَالِ بِالْاِعَادَةِ ـ

এটা ইমাম রাগেব (র.)-এর উক্তি, আর ইমাম নববী (র.) এর সাথে বর্ধিত করে বলেছেন-

اِنْ كَانَ الذَّنْبُ مُتَعَلِّقًا بِبَنِيْ اٰدَمَ فَلَهَا شَرْطٌ اٰخَرُ وَهُوَ رَدُّ الْمَظْلِمَةِ اِلٰى صَاحِبِهَا اَوْ تَحْصِيْلُ الْبَرَاَةِ مِنْهُ ـ

আর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন- ثُمَّ اِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقُّ الْقَضَاءِ صَلٰوةٍ فَلَا يُسَامَحُ بِصَرْفِ وَقْتٍ فِيْ نَفْلٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ لِاَنَّ الْخُرُوْجَ مِنَ الْفِسْقِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْخُرُوْجِ مِنْ ذٰلِكَ ـ

-[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৫১]

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.)-কে تَوْبَة সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বলেন, তওবা করার পর পাপের স্বাদ অন্তর হতে এভাবে দূর হয়ে যাবে যে, সে যেন পাপ কি রকম তা জানেই না।

হযরত সুহাইল তশতরী (র.) বলেন, তওবার পরে তোমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি এরকম হবে যে অন্তর হতে পাপের খেয়াল পর্যন্ত বের হয়ে যাবে। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৬৫]

اَقْسَامُ الْاِسْتِغْفَارِ [ইস্তিগফারের প্রকারভেদ] : اِسْتِغْفَارٌ ও تَوْبَة কি একই না ভিন্ন ভিন্ন বিষয় এটি اِسْتِغْفَارٌ-এর পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে। اِسْتِغْفَارٌ দু শ্রেণিতে বিভক্ত-

১. اِسْتِغْفَارٌ مُفْرَدٌ : শুধুমাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-

١. اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ـ

٢. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

٣. اِسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

২. اِسْتِغْفَارٌ مَقْرُوْنٌ بِالتَّوْبَةِ : যা تَوْبَة-এর সাথে সংযুক্ত। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

١. وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ـ

٢. اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ـ

প্রথম প্রকারটি تَوْبَة-এরই মতো; বরং এটা تَوْبَة ই- مَعَ تَضَمُّنِهِ طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَحْوُ الذَّنْبِ وَاِزَالَةُ اَثَرِهِ وَوِقَايَةُ شَرِّهِ

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ [ইস্তিগফার ও তওবার মধ্যকার পার্থক্য] : এককভাবে اِسْتِغْفَارٌ তওবার অন্তর্ভুক্ত এবং تَوْبَة ইস্তিগফারের অন্তর্ভুক্ত তবে যখন উভয়ে মিলিতভাবে থাকে তখন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় যা নিম্নরূপ-

১. اِسْتِغْفَارٌ হলো অতীতে কৃত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা আর تَوْبَة হলো ভবিষ্যতের পাপ হতে রক্ষার প্রার্থনা।

وَالرُّجُوْعُ اِلَى اللّٰهِ يَتَنَاوَلُ النَّوْعَيْنِ

২. অথবা, পাপী এমন ব্যক্তির ন্যায় যে এমন পথে রয়েছে যা তাকে ধ্বংস করে দেবে এবং উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছাবে না। অতএব এই ব্যক্তি এমন দুটি কাজের ব্যাপারে আদিষ্ট।

প্রথমত উক্ত পথ হতে পৃথক হওয়া; যাকে اِسْتِغْفَارٌ বলা যায়।

দ্বিতীয়ত অপর এমন একটি পথে যাওয়া যা তাকে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেবে; যাকে تَوْبَة বলা যেতে পারে।

ফলে এ উভয়টি পর্যায়ক্রমে আসে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন– اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ

৩. মাদারিজুস সালিকীন গ্রন্থে আছে, اِسْتِغْفَارٌ হলো اِزَالَةُ الضَّرِ -এর পর্যায়ে আর تَوْبَةٌ হলো طَلَبُ جَلْبِ مَنْفَعَتْ -এর পর্যায়ে।

৪. এমনিভাবে اِسْتِغْفَارٌ নিজের ও অপরের জন্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ . অথবা اِسْتِغْفَارٌ শুধু অপরের জন্যও হতে পারে। যথা, আল্লাহ ফেরেশতাদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন– وَيَسْتَغْفِرُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর تَوْبَة শুধু সেসব পাপের জন্য হয় যা শুধু নিজেই করে থাকে। –[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৩]

৫. আর মিরকাত গ্রন্থে আছে– اَلْاِسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّوْبَةُ بِالْجَنَانِ

বস্তুত মহান আল্লাহর নিকট পূর্বোক্ত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অন্যায় ও অসৎ কর্ম হতে প্রত্যাবর্তন করে ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করাকে تَوْبَة বলে। অতঃপর সৎকর্ম দ্বারা পূর্বেকার অসৎকর্মের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা। মানুষের কোনো অধিকার নষ্ট করে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দান করা বা ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। কারো গিবত-শেকায়াত বা অন্য কোনো ভাবে মান-সম্মান ক্ষুণ্ন করলে তার মাফ চেয়ে নেওয়া। আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কোনোটি কাজা করে ফেললে বা আদায় না করলে তাড়াতাড়ি আদায় করে নেওয়া। কোনোভাবে পাপকার্য সংঘটিত হয়ে গেলে যথাসম্ভব খুব তাড়াতাড়ি তওবা করে নিতে হবে। কেননা মৃত্যুর কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ নেই। কখন এসে পড়বে তা কেউই অবহিত নয়। আর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তওবা গৃহীত হবে না। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا . (سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ١٧ـ ١٨)

অর্থাৎ "আল্লাহ তওবা কবুল করেন কেবল সেসব লোকের, যারা অপরাধ করে অজ্ঞতাবশত, অতঃপর তওবা করে তাড়াতাড়ি, এরাই সে সকল লোক যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানবান ও প্রজ্ঞাবান। আর সেসব লোকের তওবা নেই যারা অপরাধসমূহ করতে থাকে। অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন নিশ্চিতরূপে তওবা করলাম। আর না তাদের তওবা, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এরা তারাই যাদের জন্য আমি কষ্টদায়ক আজাব তৈরি করে রেখেছি। –[সূরা নিসা : আয়াত– ১৭-১৮] আল্লাহ! তুমি আমাদের তাড়াতাড়ি করে তওবা করার তৌফিক দাও।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٢١٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২২১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** নবী করীম ﷺ দৈনিক কমপক্ষে ৭০ বার اِسْتِغْفَارٌ করতেন– এর অর্থ এই নয় যে, তিনি পাপে জর্জরিত ছিলেন। [مَعَاذَ اللّٰهِ] অথচ তিনি তো ছিলেন নিষ্পাপ । আর তিনি এটা পড়তেন বান্দা হিসেবে উঁচু মর্যাদায় আসীন হওয়ার জন্য এবং তিনি এটা মনে করতেন যে মহান প্রভুর ইবাদতে হয়তো তাঁর কোনো ত্রুটি হচ্ছে অথবা

মহান প্রভুর شَانٌ অনুযায়ী ইবাদত হচ্ছে না। অথবা তিনি দৈনিক ৭০ বার اِسْتِغْفَارْ করতেন তাঁর উম্মতকে এ শিক্ষা প্রদান করার জন্য যে তিনি মাসুম হয়েও দৈনিক ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, আর পাপীদের তো এর থেকে অনেক বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক।

হযরত আলী (রা.) বলেন, জমিনের উপর আল্লাহর আজাব হতে নিরাপত্তার দুটি বিষয় তার মধ্য হতে একটি আল্লাহ তা'আলা উঠিয়ে নিয়েছেন আর অপরটি তোমরা আঁকড়ে ধর। উঠিয়ে নেওয়া বিষয়টি হলো নবী করীম ﷺ ; আর অপরটি হলো আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

১. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ .

২. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ .

–[মিরকাত ও মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৬৭]

وَعَنْ ٢٢١٦ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِيْ وَاِنِّيْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২১৬. অনুবাদ : হযরত আগার মুযানী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমার অন্তরে মরিচা পড়ে আর [তা সাফ করার জন্য] আমি দৈনিক একশতবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِيْ -এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর পবিত্র অন্তরেও প্রতিবন্ধকতা আসে, যার ফলে তিনি দৈনিক ১০০ বার করে اِسْتِغْفَارْ পাঠ করেন। এ আচরণের স্বরূপ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়, যা নিম্নরূপ–

১. কাজি আয়ায (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ সর্বদা আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকতেন। কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে জিকির বন্ধ হয়ে গেলে তাকে তিনি গুনাহ বা মরিচা হিসেবে গণ্য করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

২. কেউ কেউ বলেন, নবী করীম ﷺ -এর অন্তরে حَدِيْثُ النَّفْسِ -এর কোনো কিছু এসে পড়লে একে غَيْن গণ্য করে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

৩. কিছু সংখ্যকের মতে, এখানে غَيْن দ্বারা حَالَةُ اِعْظَامْ ও حَالَةُ خَشْيَتْ উদ্দেশ্য আর اِسْتِغْفَارْ এ অবস্থার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

৪. ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, এখানে غَيْن দ্বারা মানবিক ভুল-ক্রটি উদ্দেশ্য। কেননা এগুলো হতে কেউই মুক্ত নয়। নবীগণ যদিও কবীরা গুনাহ হতে মাসুম; কিন্তু সগীরা হতে মাসুম নন। এজন্য তিনি اِسْتِغْفَارْ করতেন। তবে প্রকৃত কথা হলো, নবীগণও সগীরা গুনাহ হতে মুক্ত।

৫. ইবনে বাত্তাল (র.) বলেন, নবীগণ মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ পরিচয় প্রদান করেন। এজন্য নবীগণ ইবাদতে অত্যধিক সাধনা করেন এবং সর্বদা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে লিপ্ত থাকেন এবং নিজের অক্ষমতা ও ক্রটি প্রকাশ করেন। কাজেই আল্লাহর হক আদায়ে যে ক্রটি হয় তাকে নবী করীম ﷺ غَيْن বলেছেন এবং এটা হতে اِسْتِغْفَارْ করতেন।

৬. কারো মতে, নবী করীম ﷺ বৈধ কাজে [যেমন– পানাহার, স্ত্রীসহবাস, কাজ-কারবার, আরাম, ঘুম ইত্যাদিতে] লিপ্ত হবার ফলে আল্লাহর জিকিরে প্রতিবন্ধক হয়ে যায় যা مُرَاقَبَة ও مُشَاهَدَه -এর জন্য ক্ষতিকর আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় এগুলোকে পাপ মনে করতেন। ফলে তিনি দৈনিক ১০০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। কেননা কথায় আছে যে, حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

৭. ইমাম গাযালী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর অন্তরে সর্বদা আল্লাহর নূর প্রকাশিত থাকত। আর রাসূলে কারীম ﷺ এই تَجَلِّيْ -এর মধ্যে উন্নতি লাভ করতেন তখন তিনি নীচের স্তর ও পূর্ব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে পাপ হিসেবে মনে করে তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। –[তানযীমুল অশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৪]

وَعَنْ ٢٢١٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২১৭. অনুবাদ : আগার মুযানী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর নিকট তওবা কর, আর আমিও দৈনিক একশতবার তাঁর নিকট তওবা করি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ তাঁর উম্মতকে তওবা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন– تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ الخ কথাটি যেন আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীরই প্রতিধ্বনি–

وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অত্র আয়াত ও হাদীস এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অবস্থান ও অবস্থা অনুযায়ী তার পূর্ণতায় উন্নতির জন্য আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আর আল্লাহ যেভাবে ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে ইবাদতের হক আদায়ে প্রত্যেকেরই কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৫৪]

وَعَنْ ٢٢١٨ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَا يَرْوِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهٗ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضَرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ

২২১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নাম করে বলেছেন– আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্য তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে জুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা; তবে আমি যাকে পথ প্রদর্শন করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পথের সন্ধান কামনা কর তাহলে আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু আমি যাকে আহার করাই। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা কর আমি তোমাদেরকে আহার করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই উলঙ্গ, কিন্তু আমি যাকে কাপড় পরাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পরিচ্ছদ চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় পরাব।

আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন অপরাধ করে থাক আর আমি সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট মাফ চাও, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি সাধন করার সাধ্য রাখ না যে, আমার ক্ষতি করবে এবং আমার উপকার করারও সাধ্য রাখ না যে, আমার কোনো উপকার করবে। অতএব, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে হতে সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তর নিয়ে আল্লাহভীরু হয়ে যায়, এটা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি

وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِىْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِىْ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পাপী ব্যক্তির অন্তরের অন্যায় অন্তর নিয়ে পাপ করে– এটা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সকল মানুষ ও জিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে একসাথে আমার নিকট প্রার্থনা কর আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দেই, তা আমার কাছে যা আছে তার কিছুই কমাতে পারবে না, সে পরিমাণ ব্যতীত যা কমায় একটি সুঁই যখন সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয় [আর উঠিয়ে নেওয়া হয়]। হে আমার বান্দাগণ! অবশিষ্ট থাকল তোমাদের [ভালো-মন্দ] আমল, তা আমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করব। অতঃপর এর প্রতিফল পূর্ণভাবে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো ভালো লাভ করে, সে যেন আল্লাহর শোকর করে, আর যে মন্দ লাভ করে, সে যেন নিজেকে ব্যতীত কাউকেও তিরস্কার না করে। [কেননা তা তারই কামাই।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كُلُّكُمْ ضَالٌّ **-এর ব্যাখ্যা :** তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে এমন কেউ নেই, যার দীনি বা দুনিয়াবি তথা ইহকালীন বা পরকালীন যে কোনো বিষয়ে কিছু না কিছু ত্রুটি, কমতি ও অসম্পূর্ণতা নেই। কোনো মানুষই সর্বদিকে পরিপূর্ণ হতে পারে না। এজন্যই নবী করীম ﷺ দীনি ও দুনিয়াবি উভয় দিক থেকে অপরিপূর্ণ বলেছেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭০]

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ **-এর ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন না করে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন তবে তারা স্বউদ্গত গাছের ন্যায় যেদিকে ইচ্ছা বড় হতো এবং যেদিকে ইচ্ছা চলে যেতো। যার পরিণাম হলো ভ্রষ্টতা। এজন্যই মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সুস্থ চিন্তা-চেতনা ও নেক আমল করার দিকে পথ দেখান। যার ফলে সে সরল সঠিক পথে চলে। তার স্বভাবও সৎকর্মের সাথে সংযোজিত হয়ে বর্ধিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গেই মহানবী ﷺ বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِىْ ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাতে নিজের নূরের কিছু ছিটা দিয়েছেন। তবে এখানে এ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে না যে, প্রত্যেকেই তো فِطْرَةٌ -এর উপর সৃষ্টি হয়। পুনরায় هِدَايَةٌ -এর কি দরকার? যেমন হাদীসে এসেছে– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ যেহেতু فِطْرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَوْحِيْد আর ضَلَالَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং اسلام -এর সীমারেখা ও শর্তাবলি না জানা। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭০]

قَوْلُهُ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا الخ **-এর ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীসাংশের উদ্দেশ্য হলো, যদি তোমরা দিনরাত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড় অতঃপর অত্যন্ত লজ্জিত ও বিনীত হয়ে যদি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে মহান আল্লাহ তোমাদের সকল পাপ মার্জনা করে দেবেন। অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কিছু পাপ এমন আছে যা তিনি তওবা ব্যতীত ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ اِسْتِغْفَارٌ ও تَوْبَة ব্যতীত নিজের দয়া ও অনুগ্রহে এবং বিশেষ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭০]

قَوْلُهُ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** ইমাম তীবী (র.) বলেন, সাগরের মধ্যে সুঁই নিক্ষেপ করে তার পানিকে কমিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। জ্ঞান-বুদ্ধিতেও তা অনুধাবনযোগ্য নয়। এজন্যই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার ধনভাণ্ডার এতই পরিপূর্ণ যে তা কিছুতেই বিন্দুমাত্রও কমবে না।

ইবনুল মালেক (র.) বলেন, যদি আল্লাহর ধনভাণ্ডার হতে কমে যাবার বিষয়টি ধরে নেওয়া হয় তবে তার পরিমাণ হবে সুঁইয়ের মতো। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭০]

وَعَنْ ٢٢١٩ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْاَلُ فَاَتٰى رَاهِبًا فَسَاَلَهُ فَقَالَ اَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْاَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِئْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَاَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى هٰذِهِ اَنْ تَقَرَّبِىْ وَاِلٰى هٰذِهِ اَنْ تَبَاعَدِىْ فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ اِلٰى هٰذِهِ اَقْرَبُ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্য বের হয়ে একজন আল্লাহভীরুর নিকট গমন করে জিজ্ঞেস করল, এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কিনা? তিনি বললেন, না। সে তাকেও হত্যা করল এবং বরাবর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে গমন করে অমুককে জিজ্ঞেস কর। এ সময় তার মৃত্যু এসে গেল এবং মৃত্যুকালে সে আপন সিনাকে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রহমতের ফেরেশতা ও আজাবের ফেরেশতাদল পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল, কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা ঐ গ্রামকে বললেন, তুমি মৃতের নিকট এস, আর তার নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ করে দেখ। মাপে তাকে এই গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَهُ تَوْبَةٌ-এর ব্যাখ্যা : উক্ত লোকটি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করে আবেদ ব্যক্তির নিকট এসে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, এ কর্মের অথবা এরূপ কাজের পাপীর জন্য কি ক্ষমা আছে? হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, উক্ত লোকটি ঘটনাটি নিজের সাথে সম্পৃক্ত না করে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, এরূপ ব্যক্তির কি তাওবা কবুল হবে?

কারো মতে, এখানে বুখারীর বর্ণনায় هَمْزَه নেই। তিনি লোকটির কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, لَهُ تَوْبَةٌ এখানে هَمْزَه-কে حَذْف করা হয়েছে। বস্তুত قِيَاسْ-এর চাহিদাই হলো এরকম বলা যে اِلٰى تَوْبَة তাই هَمْزَه হতে মুক্ত রয়েছে। অপর نُسْخَه-তে- مَصَابِيْح-এর মতোই তথা اِلٰى تَوْبَة -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৫৯]

قَوْلُهُ قَالَ لَا-এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সে ব্যক্তি অথবা তোমার জন্য তওবা বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহভীরু ব্যক্তিটি এটা এজন্য বলেছেন যে, হয়তোবা তওবা সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন অথবা তার উপর অধিক ভয়ভীতির কারণে। কিংবা لِتَصَوُّرِ عَدَمِ اِمْكَانِ اِرْضَاءِ خُصُوْمِهِ عَنْهُ তার উল্লিখিত কার্যের ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টি তার উপর অসম্ভব মনে করার ফলে।

–[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৫৯]

قَوْلُهُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الخ-এর ব্যাখ্যা : ইবনুল মালেক (র.) বলেন, যখন হযরত আযরাঈল (আ.) উক্ত ব্যক্তির রূহ কবজ করলেন তখন رَحْمَتْ ও عَذَابْ-এর ফেরেশতাগণ তাঁর থেকে রূহ গ্রহণ করার জন্য পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। রহমতের ফেরেশতাগণ বলেন, সে তো তওবা করার জন্য উক্ত গাঁয়ের দিকে যাচ্ছিল কাজেই সে তওবাকারী হিসেবে আমরা তার রূহ আল্লাহ তা'আলার নিকট নিয়ে যাব। আর আজাবের ফেরেশতাগণ বলছিলেন, যেহেতু সে একশজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং এখনও তওবা করেনি কাজেই আমরা তার রূহকে আজাব প্রদান করার জন্য নিয়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, যখন কোনো বান্দা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পড়েন এবং তার শত্রুদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭১]

وَعَنْ ٢٢٢٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২২০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি তোমরা পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিতেন এবং এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে মূল উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার প্রশস্ততা বুঝানো। মহান প্রভু তাঁর غَفُوْر নামের মর্যাদা প্রকাশের জন্য এত বেশি ক্ষমাকারী যে, মানুষ যেন তার পাপের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ক্রটি না করে। তবে অত্র হাদীসের মাধ্যমে গুনাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান উদ্দেশ্য নয়। কেননা পাপের কর্ম হতে বাঁচার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হুকুম প্রদান করেছেন আর তিনি প্রিয় হাবীব মহানবী ﷺ -কে দুনিয়াতে এজন্য প্রেরণ করেছেন যে, তিনি মানুষকে পাপের কর্ম হতে বের করে এনে আনুগত্য ও সৎকর্মে লাগিয়ে দেবেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭২]

وَعَنْ ٢٢٢١ أَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২২১. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা রাতে আপন হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের পাপী তওবা করে, আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন, যাতে রাতের পাপী তওবা করে। এভাবে তিনি করতে থাকবেন যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কারো মতে হাত প্রসারিত করার অর্থ হলো চাওয়া। কেননা মানুষের عَادَةٌ বা অভ্যাস হলো কেউ কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করলে হাতের তালু প্রসারিত করে দেওয়া।

ইমাম নববী (র.) বলেন, اَلْبَسْطُ দ্বারা তওবা কবুলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর হাদীসের শেষাংশ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا। দ্বারা কিয়ামতের আলামতের কথা বলা হয়েছে। তখন আর কোনো তওবা কবুল করা হবে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন– يَوْمَ يَأْتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ইবনুল মালেক (র.) বলেন, এ হাদীস ও অনুরূপ হাদীসসমূহ এ কথা বুঝায় যে, সূর্য পশ্চিম দিকে উদয়ের পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত আর তওবা কবুল হবে না।

কেউ বলেন, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট যে পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করে আর যে এর পরে জন্মগ্রহণ করে অথবা বালেগ হয় বা কাফের ছিল মুসলমান হলো কিংবা পাপী ছিল ফলে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না দেখার মতো তার ঈমান ও তওবা কবুল হবে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৬২]

وَعَنْ ٢٢٢٢ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২২২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তা কবুল করেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহ তা'আলার কোনো বান্দা তওবার নিয়মনীতি সহকারে তথা কৃত পাপের প্রতি লজ্জিত হয়ে এবং তা আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে তওবা করে তবে মহান আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– هُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَلٰى عِبَادِهٖ ইমাম তীবী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতসহ ঐ ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৬২]

وَعَنْ ٢٢٢٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম তীবী (র.) বলেন, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া তওবা কবুলের সর্বশেষ সীমা। এরপর আর তওবা গৃহীত হবে না। কেননা এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا .

আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তওবা কবুলের আর একটি সর্বশেষ সীমা রয়েছে আর তা হলো মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত। যেহেতু এ সময় মৃত্যুযাত্রী আল্লাহ তা'আলার আজাব প্রত্যক্ষ করে তওবা করতে চায় অথচ ঈমান তো দেখে বিশ্বাসের উপর গৃহীত হবে না। –[মিরকাত– ১৬৩]

وَعَنْ ٢٢٢٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَلّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ رَاحِلَتُهٗ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا قَدْ اَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهٖ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهٗ فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ اَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২২৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় আনন্দিত হন, যখন সে তাঁর নিকট তওবা করে, তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক, যার বাহন একটি মরুপ্রান্তরে তার নিকট হতে ছুটে পালায়, আর এর উপর থাকে তার খাদ্য ও পানীয়। এতে সে হতাশ হয়ে যায়। অতঃপর সে একটি গাছের নিকট এসে এর ছায়ায় শুয়ে পড়ে সে তার বাহন সম্পর্কে নিরাশ। এ অবস্থায় সে হঠাৎ দেখে, বাহন তার নিকট দাঁড়ানো। সে এর লাগাম ধরে এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর সবচেয়ে বেশি খুশি হন যে তাঁর নিকট কায়মনোবাক্যে তওবা করে। ইমাম তীবী (র.) বলেন, এখানে খুশি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি। কেননা আনন্দ প্রকাশ করা হলো বান্দার গুণ তা আল্লাহ তা'আলার জন্য কখনো সাব্যস্ত হতে পারে না।

হাদীসের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যক্তির এ কথা বলা উচিত ছিল, হে আল্লাহ তা'আলা! তুমি আমার রব আর আমি তোমার বান্দা কিন্তু লোকটি আনন্দের অতিশয্যে বলে উঠল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। বস্তুত অতি আনন্দ ও দুশ্চিন্তা মানুষকে বেহুঁশ করে ফেলে। এমনকি হিতাহিত জ্ঞানশূন্যও হয়ে পড়ে। –[মিরকাত ও মাযাহেরে হক]

وَعَنْ ٢٢٢٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَبْدًا اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِىْ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২২৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কোনো বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে প্রভু! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, [আমার ফেরেশতাগণ!] আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা এতে শাস্তি দেন? [তোমরা সাক্ষী থেক] আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, ততদিন সে অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে প্রভু! আমি আবার অপরাধ করেছি, তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা এতে শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে প্রভু! আমি আবার আরেক অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা এতে শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সে যা ইচ্ছা করুক। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দার্থ : ذَنْبٌ - পাপ, অন্যায়। مَكَثَ - পাপ না করে থাকল। يَغْفِرُ - ক্ষমা করেন। اَذْنَبْتُ - আমি পাপ করলাম।

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** ইমাম নববী (র.) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে যদি কোনো ব্যক্তি হাজার বার বা তার থেকেও বেশি বার পাপ করে এবং প্রত্যেক বারই তওবা করে তবে তার তওবা গৃহীত হবে। আর যদি সব পাপের তাওবা একবার করে তবে তাও বিশুদ্ধ হবে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৬৫]

قَوْلُهُ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসের সর্বশেষ এ বাক্যটির মর্মার্থ হলো, বান্দা যত পাপই করুক না কেন সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন। এখানে পাপ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান উদ্দেশ্য নয়; বরং ক্ষমা প্রার্থনার ফজিলত এবং পাপ মার্জনার ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনার মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৪]

وَعَنْ ٢٢٢٦ جُنْدُبٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَلّٰى عَلَىَّ اِنِّىْ لَا اَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ اَوْ كَمَا قَالَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২২৬. **অনুবাদ :** হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, কে আছে যে আমাকে কসম দিতে পারে [বা আমার নামে কসম খেতে পারে] যে, আমি অমুককে মাফ করব না। যাও, আমি তাকে মাফ করে দিলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। রাবী বলেন, তিনি এরূপ অথবা এর অনুরূপ বলেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কারো অসংখ্য পাপের কারণে যদি অপর কোনো ব্যক্তি অহংকারবশত শপথ করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন না। অথবা নিজেকে তার থেকে উত্তম মনে করে এই কথা বলে থাকে যেমন কোনো কোনো মূর্খ সুফি পাপীদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করে না অথচ তার এটা জানা নেই যে, মহান আল্লাহর রহমত অতি ব্যাপক ও সর্বব্যাপী। এরকম পাপীদেরও তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় মিলে এবং তাদেরকে মার্জনা করে দেন।

বস্তুত এরকম শপথকারীর শপথকে আল্লাহ তা'আলা বাতিল করে দেন এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকেন। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন। এজন্য কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলা জায়েজ নয়। তবে কুরআন ও হাদীসে নিশ্চিতভাবে যাদেরকে জান্নাতি বা জাহান্নামি সাব্যস্ত করেছে তাদের ব্যাপারে বলা যেতে পারে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৪]

২٢٢٧ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ قَبْلَ اَنْ يُمْسِىَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২২২৭. **অনুবাদ :** হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সাইয়েদুল ইস্তিগফার [বা শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার] হলো তোমার এরূপ বলা যে, "আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকার্যের মন্দ পরিণাম হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি স্বীকার করি আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার অপরাধকে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধরাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে এটা বিশ্বাস করে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে সে মৃত্যুবরণ করবে সে বেহেশতীদের অন্তর্গত হবে এবং যে এটা বিশ্বাস করে রাতে বলবে আর সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٢٨ - عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَرَجَوْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا اُبَالِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ لَوْ لَقِيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২২২৮. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন আমি কারো পরোয়া করি না। আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি কারো পরোয়া করি না। আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার সাক্ষাৎ কর এবং আমার সাথে কাউকে শরিক না করে আমার সাক্ষাৎ কর, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব। –[তিরমিযী; আর আহমদ ও দারেমী হযরত আবূ যর (রা.) হতে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অতি দয়ালু। বান্দা ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে যদি অসংখ্য পাপ করে থাকে অতঃপর লজ্জিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করে এবং কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। এমনকি যদি তারা আকাশ পরিমাণ এবং পৃথিবীসম পাপ করে অতঃপর শিরক হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট মার্জনা কামনা করে তবে মহান আল্লাহ তা মাফ করে দেন। অত্র হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, শিরক পরিত্যাগ করে ক্ষমা প্রার্থনা করাই হলো পাপ মার্জনার অন্যতম শর্ত। বস্তুত পবিত্র কুরআনের আয়াতেও এ কথা এসেছে যেমন- إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

عَنَانِ **শব্দের বিশ্লেষণ :** عَنَانِ শব্দটির عَيْن -এর উপর যবর দিয়ে পড়া হবে; বহুবচনে عُنُنٌ শাব্দিক অর্থ হলো- মেঘ কারো মতে এর অর্থ হলো- উচ্চতা তথা আকাশের মেঘ অথবা উচ্চতা পরিমাণ।

২২২৯ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ عَلِمَ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهٗ وَلَا اُبَالِىْ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২২২৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে জানে যে, আমি গুনাহ মাফ করবার অধিকারী, আমি তাকে মাফ করে দেব এবং আমি কারো পরোয়া করি না যতক্ষণ সে আমার সাথে কাউকে শরিক না করে। -[শরহুস সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, বান্দার এ কথা জানা উচিত যে, মহান আল্লাহ বান্দার পাপ মার্জনা করতে সক্ষম এবং তিনিই ক্ষমা করে থাকেন। যে ব্যক্তি এ কথা মানে যে, মহান আল্লাহ পাপরাশি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন সে সেই ব্যাপারে আশাও রাখে আর যে দয়ালুর প্রতি আশা করে তিনি তাকে তা হতে বঞ্চিত করেন না। কাজেই এই حَدِيْثُ قُدْسِى ঐ حَدِيْث قُدْسِى -এর অনুরূপ যেমন- اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ 'আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা.) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামা (রা.) আগমন করেন। হযরত সুফিয়ান (রা.) হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি এ ধারণা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। জবাবে তিনি বলেন, যদি হিসাবের জন্য আমাকে এ সুযোগ দেওয়া হয় যে, তুমি তোমার পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও অথবা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে, তখন আমি মহান আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে প্রাধান্য দান করব। কেননা মহা প্রভুর অনুগ্রহ আমার প্রতি পিতা হতেও অনেক অনেক বেশি। হযরত হাম্মাদের এ জবাবের উদ্দেশ্য হলো, তিনি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার আশা করেন এবং তাঁর রহমতের উপর ভরসা করেন। কেননা তিনি হলেন اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

-[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৭০]

২২৩০ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২২৩০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে সর্বদা ক্ষমা চায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন, আর তাকে রিজিক দান করেন যেখান হতে সে কখনও ভাবেনি। -[আহমদ, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اِسْتِغْفَارٌ -কে নিজের উপর অবশ্যকীয় করে নেওয়ার অর্থ হলো, যখন বান্দা কোনো পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে বা কোনো বিপদাপদে পতিত হয় কিংবা কোনো দুঃখ-বেদনা বা দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয় তবে যেন সে ক্ষমা

প্রার্থনা করে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, মানুষ যেন সব সময় اِسْتِغْفَارٌ করে। কেননা মানুষের জীবনের এমন কোনো মুহূর্ত নেই যাতে মানুষ ক্ষমা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী হয় না। এজন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন–

طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ সৌভাগ্যশীল সে ব্যক্তি যার আমলনামায় অত্যধিক اِسْتِغْفَارٌ পাওয়া যায়। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৬]

اِسْتِغْفَارٌ-**এর ফজিলত :** উল্লিখিত হাদীসে ক্ষমা প্রার্থনার যে ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এর মূল হলো যে ব্যক্তি নিজের উপর ক্ষমা প্রার্থনাকে আবশ্যক করে নেয় তার অন্তর আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত হয় এবং মহান আল্লাহর জাতের উপর তার ভরসা দৃঢ় ও শক্তিশালী হয় এতে তার পাপসমূহ মোচন হয়ে যায়। যার ফলে সে আল্লাহভীরু ও আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তার জন্য মহান আল্লাহ সকল মসিবত হতে বের হওয়ার রাস্তা বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান হতে রিজিক পৌঁছান যার কোনো ধারণাই তার নেই। আর যে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

اِسْتِغْفَارٌ-এর ফজিলত ও উপকারিতা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও সাব্যস্ত হয়–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا .

অর্থাৎ অতঃপর আমি বললাম, তোমরা মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা তিনি অধিক ক্ষমা প্রদানকারী। তিনি তোমাদের উপর অধিক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তোমাদেরকে অর্থসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা সাহায্য করেন। তোমাদের জন্য বাগানসমূহ বানিয়েছেন এবং তোমাদের উপকারার্থে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৭]

একটি ঘটনা : হযরত হাসান বসরী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। এরপর এক ব্যক্তি অভাব-অনটনের কথা বলল, আরেক ব্যক্তি এসে সন্তান না হওয়ার কথা বলল, তারপর এক ব্যক্তি এসে জমিনে ফসল কম হওয়ার অভিযোগ করল। তিনি সবাইকে বললেন, اِسْتِغْفَارٌ কর। তখন উপস্থিত জনগণ জিজ্ঞেস করল যে, আপনি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও সকলকে اِسْتِغْفَارٌ করার হুকুম কেন দিলেন। তিনি বললেন, এর জবাব তো উল্লিখিত আয়াতেই আছে। তথা فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ الخ অত্র আয়াতে। অর্থাৎ আমি যে যে বিষয়ে اِسْتِغْفَارٌ করতে বলেছি সবগুলো অত্র আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৭]

وَعَنْ ٢٢٣١ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২২৩১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সে বাস্তবে পুনঃপুন অপরাধ করেনি যে ক্ষমা চেয়েছে, যদিও সে দৈনিক সত্তরবার তা করে থাকে। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اِصْرَارٌ عَلَى الذَّنْبِ 'পাপ বারবার করা'র অর্থ হলো বারবার কোনো পাপ কার্যে লিপ্ত হওয়া। পাপ করা তো এমনিতেই বড় অন্যায়, এরপর তা বারবার করা খুবই মন্দ কথা। কেননা صَغِيْرَةٌ গুনাহ বারবার করা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেয় আর কবীরা গুনাহ বারবার করা কুফরির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

অতএব এ اِرْشَادٌ-এর মূলকথা হলো, যে ব্যক্তি নিজের কোনো পাপের উপর লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে চাই তা বড় হোক বা ছোট তবে তা اِصْرَارٌ-এর সীমা হতে বের হয়ে যাবে যদিও সে তা বারবার করুক না কেন। কেননা পাপে লিপ্ত তো সেই ব্যক্তি যে বারবার গুনাহ করে কিন্তু সে এতে লজ্জিতও হয় না এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করে না। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৭]

وَعَنْ ٢٢٣٢ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

২২৩২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আদম সন্তান শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে ভুলে পতিত হয়ে পাপ করবে এটাই স্বীকৃত তবে অপরাধ করার পর তৎক্ষণাৎই তওবা করে নেবে এটাই হলো বান্দার উত্তম কর্ম। বস্তুত মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ। তিনি ক্ষমা করতে সদা প্রস্তুত। শুধু বান্দার ক্ষমা প্রার্থনারই দেরি। কাজেই আমাদের উচিত বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করা। উল্লেখ্য যে, كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ থেকে নবীগণ মুক্ত। কেননা তাঁরা অপরাধ করা হতে মুক্ত, তবে তাঁদের থেকে যেসব পাপ প্রকাশিত হয়েছে তা সগীরার অন্তর্ভুক্ত। অথবা সেগুলো হলো حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ -এর অন্তর্ভুক্ত। অথবা তাঁদের কারো থেকে যে পদস্খলন সংঘটিত হয়েছে তা এমন পর্যায়ের যে এগুলোর প্রতি তাদের কোনো ইচ্ছাই ছিল না; বরং তা অনিচ্ছা সত্ত্বেই সংঘটিত হয়েছে। –[মিরকাত]

قَوْلُهُ خَطَّاءٌ -এর ব্যাখ্যা : خَطَّاءٌ শব্দের অর্থ হলো– كَثِيْرُ الْخَطَاءِ বা অনেক পাপ। এখানে خَطَّاءٌ শব্দটি একবচন নেওয়া হয়েছে كُلَّ শব্দের দিকে লক্ষ্য করে। কোনো কোনো বর্ণনায় خَطَّاؤُوْنَ এসেছে যা كُلَّ -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে আনয়ন করা হয়েছে। قِيْلَ اَرَادَ الْكُلَّ مِنْ حَيْثُ هُوَ كُلٌّ اَوْ كُلُّ وَاحِدٍ –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৭২]

قَوْلُهُ التَّوَّابُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : تَوَّابُوْنَ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো تَوَّابٌ এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

١. قِيْلَ الرَّاجِعُوْنَ اِلَى اللّٰهِ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ اِلَى الطَّاعَةِ ـ
٢. قِيْلَ اَوْ بِالْاِنَابَةِ مِنَ الْغَفْلَةِ اِلَى الذِّكْرِ ـ
٣. اَوِ الْاَوْبَةُ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الْحُضُوْرِ ـ

–[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৭২]

وَعَنْ ٢٢٣٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِىْ قَلْبِهِ فَاِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَاِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২২৩৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মু'মিন যখন কোনো গুনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা চায়, তার অন্তর সাফ হয়ে যায়, আর যদি গুনাহ বেশি হয় দাগও বেশি হয়, অবশেষে তা তার অন্তরের উপর ছেয়ে যায়। এটাই সেই মরিচা যার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা আপন কালামে করেছেন– "কখনই না; বরং তাদের অন্তরে মরিচাস্বরূপ লেগেছে যা তারা বরাবর উপার্জন করেছে।" [সূরা মুতাফফিফীন।] –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মানুষের পাপের কারণে অন্তরের মধ্যে কালো দাগ [চিহ্ন] পড়ে যায় এমনকি এটা পড়তে পড়তে অন্তরকে ছেয়ে ফেলে। ফলে অন্তরের আলোকে ঢেকে ফেলে। যার প্রতিক্রিয়া এমন হয় যে, মু'মিন ব্যক্তি তার

অন্তরের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ কারণে কোনো উপকার প্রদানকারী عِلْم ও عَمَلْ -এর কোনো গুরুত্বই তার দৃষ্টিতে অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি উপকারী জ্ঞানপূর্ণ কোনো কথারও কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। এমনিভাবে প্রেম-প্রীতি দয়ামায়ার গুণাবলি হতেও সে খালি হয়ে যায় ফলে সে না নিজের উপর দয়া করে, না অন্যের সাথে দয়ামায়ার আচরণ করে। অবশেষে তার অন্তরে অজ্ঞতা, অত্যাচার, অবিচার, অমঙ্গল, ফিতনা-ফাসাদের অন্ধকার নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়। যার ফলাফল হয় যে, পাপের মধ্যে তার সাহস বেড়ে যায়, পাপ-পঙ্কিলতায় তার জীবন ভরে যায়। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৮]

اَلنُّكْتَةُ -এর অর্থ : نُكْتَة শব্দটির نُون -এর উপর যবর ও পেশ উভয়ভাবে পড়া যায়। শাব্দিক অর্থ হলো- اَلْاَثَرُ বা চিহ্ন। এ কালো দাগটি কাগজের উপর কালির মতো। পাপের ভিন্নতার কারণে এর পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, অন্তরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শুভ্রতার দিক থেকে কাপড়ের সাথে তুলনা করা যায়। আর পাপ-পঙ্কিলতাকে কালো দাগের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা উক্ত সাদা কলবের উপর পড়ে থাকে। এ পাপের কারণে কালো দাগ পড়তে পড়তে সাদা অন্তর কালো হয়ে যায়। কলবের আলো বিদূরিত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, ফলে সে কল্যাণকর জ্ঞান ও হিকমতপূর্ণ কোনো বিষয়ও দেখতে পায় না। তার থেকে ভালোবাসা ও দয়ামায়া দূর হয়ে যায়। -[মিরকাত]

كَلَّا بَلْ رَانَ **শব্দের বিশ্লেষণ :** ইমাম তীবী (র.) বলেন, اَلرَّيْنُ ও اَلرَّانُ শব্দদ্বয় اَلْعَيْبُ ও اَلْعَابُ -এর ন্যায়। আর اَلرَّانُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ আয়াতটি কাফেরদের সম্পর্কিত তবে মু'মিনগণ পাপে লিপ্ত হওয়ার ফলে তাদের অন্তর কালো হওয়ার দিক থেকে কাফেরদের সাথে মিল রাখে। আর পাপ বৃদ্ধির কারণে এটাও বৃদ্ধি পায়।

ইবনুল মালেক (র.) বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত বিষয়টি কাফের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে, তবে এখানে নবী করীম ﷺ উল্লেখ করেছেন মু'মিনদেরকে ভয় প্রদর্শনের লক্ষ্যে যাতে করে তারা অধিক পাপ করা হতে বিরত থাকে এবং কাফেরদের মতো তাদের অন্তর কালো না হয়ে যায়। এজন্য বলা হয়- اَلْمَعَاصِيْ بُرَيْدُ الْكُفْرِ

٢٢٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২২৩৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন, তার প্রাণ ওষ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : غَرْغَرَة হলো মানুষের জীবনের সবশেষ পর্যায় যখন শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক বিচ্ছিন্নের একেবারে নিকটবর্তী হয়ে যায়, রূহ পুরো শরীর থেকে হলকে এসে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস গরগর আওয়াজে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং জীবনের সর্বশেষ আশা-ভরসা নিশ্চিত নিরাশার স্তরে পৌছে যায়।

এজন্যই ইরশাদ হয়েছে, غَرْغَرَه -এর অবস্থা শুরু না হওয়া পর্যন্ত তওবা কবুল হবে। এর উদ্দেশ্য হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু নিশ্চিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তওবা কবুলের আশা করা যায়। তবে মৃত্যু হওয়া দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হলে তথা سَكْرَةُ الْمَوْتِ শুরু হয়ে গেলে তওবা কবুল হবে না।

অত্র হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, মৃত্যুর সময় তওবা বিশুদ্ধ নয়। চাই কুফরি থেকে তাওবা হোক বা পাপ-পঙ্কিলতা হতে হোক। অর্থাৎ তখন কাফেরের ঈমান গ্রহণ বিশুদ্ধ নয়, আর মুসলমানদের পাপ হতে তওবাও বিশুদ্ধ নয়। কেননা পবিত্র কুরআনের

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ .

অত্র আয়াতের মাধ্যমেও এটা বুঝা যায়। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেম এ মতের প্রবক্তা যে, পাপ থেকে তওবা তো বিশুদ্ধ কিন্তু কুফরি হতে তওবা করা বিশুদ্ধ নয়। এদের মতে নিরাশ ব্যক্তির ঈমান অগ্রহণযোগ্য, তবে নিরাশ ব্যক্তির তওবা গ্রহণীয়। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীসে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে এর সম্পর্ক পাপ হতে তওবার সাথে সংশ্লিষ্ট তথা غَرْغَرَة -এর অবস্থায় তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ অবস্থায় যদি কারো দ্বারা তার হক মাফ করানো হয় এবং উক্ত ব্যক্তিও মাফ করে দেয় তবে তা বিশুদ্ধ হবে। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৯]

قَوْلُهُ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ -এর ব্যাখ্যা : مَا لَمْ يُغَرْغِرْ -এর অর্থ হলো যে পর্যন্ত রূহ হলকুমে না পৌঁছে অর্থাৎ মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার সময়কার ক্ষমা প্রার্থনা তওবা বলে গণ্য হয় না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ .

কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর হলো মৃত্যু উপস্থিত হওয়া তথা মৃত্যুর ফেরেশতাকে প্রত্যক্ষ করা। তবে এ হুকুম অধিকাংশের ব্যাপারে হতে পারে। কেননা অধিকাংশ মানুষই মালাকুল মাউতকে দেখে না আর অধিকাংশ মানুষ غَرْغَرَه -এর পূর্বে দেখে থাকে। তবে হযরত ইবনে হাজার (র.) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেন যে, প্রত্যেকেই তা দেখে থাকে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, اَلْغَرْغَرَةُ হলো মুখে পানি দিলে তা হলক মূল হতে ফিরে আসে, গিলতে পারে না। এ অবস্থায় তওবা কবুল হবে না। তবে অসিয়ত কার্যকর হবে, কাউকে ক্ষমা করলে তা বিশুদ্ধ হবে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৭৪]

وَعَنْ ٢٢٣٥ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا اَبْرَحُ اُغْوِىْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لَا اَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِىْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২২৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– শয়তান বলল, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের কসম! আমি তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করতে থাকব, যাবৎ তাদের প্রাণ দেহে থাকে। তখন প্রভু পরওয়ারদেগার বললেন, আমার ইজ্জত, জালাল ও উচ্চ মর্যাদার কসম! আমি তাদেরকে মাফ করতে থাকব যাবৎ তারা আমার নিকট মাফ চাইতে থাকে। –[আহমদ]

وَعَنْ ٢٢٣٦ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২২৩৬. অনুবাদ : হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা তওবার জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন, যার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য ঐদিক হতে উদিত না হবে, তা বন্ধ করা হবে না। আর এটাই হলো কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বাণী– "যেদিন তোমার প্রভুর কোনো এক নিদর্শন পৌঁছবে, সেদিন কাউকেও তার ঈমান কাজ দেবে না, যে এটার পূর্বে ঈমান আনেনি।" –[সূরা আন'আম, আয়াত– ১৫৮] –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তওবাকারীদের জন্য মহান আল্লাহ পূর্বদিকে দরজা খুলে রেখেছেন। এটা তওবা বিশুদ্ধ বা কবুল হওয়ার নিদর্শন। মূলকথা হলো, যে পর্যন্ত সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত না হবে সে পর্যন্ত তওবার দরজা খোলা থাকবে। যার ইচ্ছা সে শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে আর যার ইচ্ছা পাপ-পঙ্কিলতা হতে তওবা করে– এ দরজার মাধ্যমে পরকালের চিরজীবন সুখ-শান্তিময় করে নেবে। যখন পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে তখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। হাদীসে যে আয়াতের উল্লেখ হয়েছে তা হলো–

يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হওয়ার পূর্বে যে ঈমান আনয়ন করেনি বা পাপ হতে তওবা করেনি এখন তার ঈমানও গৃহীত হবে না এবং তওবাও কবুল হবে না। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৮০]

قَوْلُهٗ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ الخ -এর ব্যাখ্যা : ইমাম তীবী (র.) বলেন, তওবার দরজা মানুষের জন্য খোলা থাকবে। মানুষ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে তখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর কারো ঈমান ও তওবা গৃহীত হবে না। কেননা মানুষ পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদয় দেখার পর ঈমান আনয়ন ও তওবা করার দিকে ধাবিত হবে তখন তাদের এটা গৃহীত হবে না। যেমন মৃত্যু পথযাত্রীর তওবা কবুল হয় না। –[মিরকাত : খ. ৩, পৃ. ১৭৬]

وَعَنْ ٢٢٣٧ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

২২৩৭. **অনুবাদ :** হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন– হিজরতের ধারা বন্ধ হবে না, যতক্ষণ তওবার দরজা বন্ধ না হয়, আর তওবার দরজা বন্ধ হবে না যতক্ষণ সূর্য আপন অস্তধাম হতে উদিত না হয়। –[আহমদ, আবূ দাঊদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** যতদিন পর্যন্ত তওবা গৃহীত হবে ততদিন মানুষ পাপ হতে পবিত্র হতে পারবে। আর তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে পাপ হতে মুক্ত হওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। আর তওবা তখনই বন্ধ হবে যখন সূর্য পশ্চিম দিগন্ত হতে উদিত হবে। এরপর আর কোনো তাওবা গৃহীত হবে না।

اَلْهِجْرَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য : ইবনুল মালেক (র.) বলেন, এখানে اَلْهِجْرَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো–

اَلْاِنْتِقَالُ مِنَ الْكُفْرِ اِلَى الْاِيْمَانِ وَمِنْ دَارِ الشِّرْكِ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ وَمِنَ الْمَعْصِيَةِ اِلَى التَّوْبَةِ -

ইমাম নববী (র.) বলেন– وَمِنَ الْمَعْصِيَةِ اِلَى التَّوْبَةِ দ্বারা সবগুলোকে শামেল করে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, এখানে হিজরত দ্বারা মক্কা হতে মদিনায় হিজরত উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটা রহিত হয়ে গেছে এবং পাপ হতে তওবাও উদ্দেশ্য নয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الذُّنُوْبَ وَالْخَطَايَا কেননা পাপ পরিত্যাগ করা তো তওবা।

ইমাম নববী (র.) বলেন, আমি বলি এটা উদ্দেশ্য নিতে কোনো বাধা নেই। কেননা পূর্ণ উদ্দেশ্য হলো তওবা যা সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হবে না। এরপর তিনি বলেন– بَلِ الْهِجْرَةُ مِنْ مَكَانٍ لَا يُتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنَ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِقَامَةِ حُدُوْدِ اللّٰهِ - তবে اَلْهِجْرَةُ -কে عُمُوْم -এর উপর حَمْل করাই উত্তম। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৭৭]

وَعَنْ ٢٢٣٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُتَحَابَّيْنِ اَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِى الْعِبَادَةِ وَالْاٰخَرُ يَقُوْلُ مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَقْصِرْ عَمَّا اَنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ خَلِّنِىْ وَرَبِّىْ حَتّٰى وَجَدَهٗ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ اِسْتَعْظَمَهٗ فَقَالَ اَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِىْ وَرَبِّىْ

২২৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বনী ইসরাঈলের মধ্যে দুই ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিল। তাদের একজন বড় আবেদ ছিল, আর অপরজন বলত– আমি গুনাহগার। আবেদ তাকে বলত, বিরত থাক যাতে তুমি লিপ্ত আছ তা হতে, আর সে বলত, আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে ছেড়ে দাও! অবশেষে একদিন সে তাকে এমন একটি অপরাধে লিপ্ত পেল যাকে সে বড় গুরুতর মনে করল এবং বলল, বিরত থাক! সে বলল, আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে ছেড়ে দাও! তোমাকে কি আমার উপর দারোগা

أَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيْبًا فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ أَبَدًا وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللّٰهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ أُدْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلْآخَرِ أَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَحْظُرَ عَلٰى عَبْدِيْ رَحْمَتِيْ فَقَالَ لَا يَا رَبِّ قَالَ إِذْهَبُوْا بِهِ إِلَى النَّارِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

করা হয়েছে? তখন সে বলল, আল্লাহর কসম তোমাকে আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না এবং বেহেশতে দাখিল করবেন না। অতঃপর আল্লাহ তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সে তাদের উভয়ের রূহ কবজ করল এবং তারা উভয়ে আল্লাহর সমীপে একত্র হলো। তখন তিনি গুনাহগারকে বললেন, আমার রহমতের দ্বারা তুমি বেহেশতে দাখিল হও। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বান্দার প্রতি রহম করতে বাধা দিতে পার? সে বলল, না প্রভু! আল্লাহ বললেন, এটাকে দোজখের দিকে নিয়ে যাও! –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তাকে দোজখের আদেশ এজন্য দেওয়া হয়েছিল যে, সে তার ইবাদতের উপরই ভরসা করেছিল এবং গুনাহগারকে হাকীর বা তুচ্ছ জেনেছিল। গুনাহকে ঘৃণা করতে বলা হয়েছে, গুনাহগারকে নয়; যেমন পিতামাতা ময়লাকে ঘৃণা করে, ময়লাযুক্ত সন্তানকে নয়। গুনাহগারকে পিতামাতার ন্যায় দরদের সাথে সাফ করে নিতে চেষ্টা করবে। অথবা সে মানুষকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করছিল, আর আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া বা করা কুফরি। মোটকথা হাদীসে গুনাহ করার অনুমোদন দেওয়া হয়নি; বরং আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٢٢٣٩ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَلَا يُبَالِيْ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ يَقُوْلُ بَدَلَ يَقْرَأُ)

২২৩৯. **অনুবাদ** : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুরআনের এ আয়াত পড়তে শুনেছি– "ওহে! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। কেননা আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন।" [সূরা যুমার : আয়াত ৫৩] আর তিনি কারো পরোয়া করেন না। –[আহমদ ও তিরমিযী। তিনি বলেন, এটা হাসান ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অতি দয়ালু। তাই বান্দা যত পাপই করুক না কেন তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তা ক্ষমা করে দেন। কাফের ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে যায়। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহম ও করম দ্বারা বিনা তওবায়ও মাফ করতে পারেন।

وَعَنْ ٢٢٤٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلَّا اللَّمَمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ تَغْفِرْ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

২২৪০. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে [কুরআনে] আল্লাহ তা'আলার এই মহাবাণী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, "সগীরা গুনাহ ব্যতীত" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ! যদি তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর বড় গুনাহ। কেননা তোমার কোনো বান্দা আছে যে ছোট গুনাহ করেনি? –[তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَللَّمَمَ অংশটি একটি আয়াতের অংশবিশেষ। আয়াতটি হলো- وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. অর্থাৎ যারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীলতা হতে বিরত থাকে ছোট পাপ ব্যতীত [যা হতে বাঁচা সম্ভব নয়] নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ক্ষমাকে প্রশস্তকারী।

অত্র আয়াতে যেসব সগীরা গুনাহকে পৃথক করা হয়েছে এর দলিল হিসেবে নবী করীম ﷺ হাদীসে উল্লিখিত কবিতাটি পাঠ করেন। পঙক্তিটির মূল কথা হলো, মহান আল্লাহর শান ও রহমত এমন যে তাঁর দয়া ও মহা অনুগ্রহে এ সৃষ্টি জগৎ। তিনি ইচ্ছা করলে বড় পাপও ক্ষমা করে দেন ছোট গুনাহ তো গণ্যই নয়। এমন কোনো বান্দা নেই যে ছোট গুনাহ করে না আর তা তিনি ক্ষমা করেন না; বরং ছোট গুনাহসমূহ নেক কাজের মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে যায়। এভাবেই তিনি তাঁর বান্দাকে ছোট পাপের বোঝা হতে বাঁচিয়ে দেন।

হাদীসে উল্লিখিত কবিতাটি, যা নবী করীম ﷺ পাঠ করেছেন তা হলো জাহিলি যুগের কবি উমাইয়া ইবনে সলতের। উমাইয়া সে যুগে খুবই ইবাদত করত এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করত কিন্তু ইসলামি যুগ পাওয়া সত্ত্বেও সে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। যেহেতু উমাইয়া হিকমতপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করেছে এজন্য নবী করীম ﷺ শুধু তার কবিতাই শুনতেন- কখনো কখনো নিজেই আবৃত্তি করতেন। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৮২]

وَعَنْ ٢٢٤١ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْئَلُوْنِى الْهُدٰى اَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فُقَرَاءُ اِلَّا مَنْ اَغْنَيْتُ فَاسْئَلُوْنِىْ اَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِىْ غَفَرْتُ لَهٗ وَلَا اُبَالِىْ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَشْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اِجْتَمَعُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَاَلَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ اُمْنِيَّتُهٗ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا

২২৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ যর গেফারী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথহারা, কিন্তু আমি যাকে পথ দেখিয়েছি, সুতরাং আমার নিকট পথের সন্ধান চাও, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। তোমাদের প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু আমি যাকে অভাবমুক্ত করেছি, সুতরাং আমার নিকট চাও, আমি তোমাদেরকে রিজিক দেব। তোমাদের প্রত্যেকেই অপরাধী, কিন্তু আমি যাকে নিরাপদে রেখেছি [বা বাঁচিয়ে রেখেছি], সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস করে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতঃপর সে আমার নিকট ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করি এবং আমি কারো পরোয়া করি না। যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনা [ছেলে-বুড়া] সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেজগার ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায় এটা আমার রাজ্যে একটি মাছির পালক পরিমাণও বাড়াতে পারবে না, আর যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনা সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায় তাও আমার রাজ্যে এক মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারবে না। যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত এবং কাঁচা ও শুকনা সকলেই এক প্রান্তরে একত্র হয়, অতঃপর তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমার নিকট চায়, আর আমি তোমাদের প্রত্যেক সওয়ালকারীকে দান করি

نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ اِلَّا كَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهِ اِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذٰلِكَ بِاَنِّىْ جَوَادٌ مَاجِدٌ اَفْعَلُ مَا اُرِيْدُ عَطَائِىْ كَلَامٌ وَعَذَابِىْ كَلَامٌ اِنَّمَا اَمْرِىْ لِشَىْءٍ اِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

তা আমার রাজ্যে কিছুমাত্র কমাতে পারবে না। যেমন, যদি তোমাদের কেউ সমুদ্রে পৌঁছে আর তাতে একটি সুঁই ডুবায় অতঃপর তা উঠায়। এটা এজন্যই যে, আমি বড় দাতা, প্রশস্ত দাতা; আমি করি যা ইচ্ছা করি। আমার দান হলো আমার কালাম মাত্র, আমার শাস্তি হলো আমার হুকুম মাত্র, আর আমার কোনো বিষয়ের হুকুম হলো যখন আমি ইচ্ছা করি আমি বলি, 'হয়ে যাও', তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। যথা–

১. এর উদ্দেশ্য হলো যুবক ও বৃদ্ধগণ।
২. জ্ঞানী ও অজ্ঞরা।
৩. আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও অবাধ্যরা।

ইবনুল মালেক (র.) বলেন, اَلرَّطْبُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গাছপালা ও তৃণলতা আর يَابِسٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাথর ও মাটি। অথবা এর দ্বারা জল-স্থল উদ্দেশ্য নেওয়াও যেতে পারে তথা এর সকল অধিবাসী। অথবা জল-স্থলে যেসব গাছপালা, তৃণলতা, জীবজন্তু, পাথর, মৎসকুল এবং সকল জীব ও মানুষ অবস্থান করে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন, এ দুটো সকল কিছুকে পূর্ণভাবে শামেল করে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ

আর এর দ্বারা ফেরেশতাকুল শামিল হতেও কোনো আপত্তি নেই। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৮৪]

وَعَنْ ٢٢٤٢ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَرَأَ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتَّقٰى فَمَنِ اتَّقَانِىْ فَاَنَا اَهْلٌ اَنْ اَغْفِرَ لَهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

২২৪২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি এ আয়াত পাঠ করে "তিনি [আল্লাহ] হলেন ভয়ের অধিকারী ও ক্ষমার অধিকারী" বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার বলেন, আমি লোকের ভয় পাওয়ার অধিকারী; [আমা হতে ভয় করা উচিত,] সুতরাং যে আমাকে ভয় করল, আমি তাকে ক্ষমা করারও অধিকারী। –[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মহান আল্লাহ হলেন ভয় পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। তাঁকেই সবচেয়ে ভয় করা উচিত। আর তিনি ক্ষমা করারও অধিকারী। তিনি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না। কাজেই যে তাঁকে ভয় করবে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। একমাত্র শিরক ব্যতীত আর সব পাপই তিনি ক্ষমা করবেন। কেননা পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

وَعَنْ ٢٢٤٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ مِائَةَ مَرَّةٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২২৪৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি একই মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইস্তিগফার একশতবার গুণতাম। তিনি বলছেন– رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ "পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে মাফ কর এবং আমার তওবা কবুল কর। কেননা তুমি হলে তওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।" –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٢٤٤ بِلَالِ بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ (رض) مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ لٰكِنَّهُ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ هِلَالُ بْنُ يَسَارٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২২৪৪. **অনুবাদ :** নবী করীম ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম যায়েদের পুত্র ইয়াসার, তার পুত্র বেলাল বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন যে, আমার দাদা যায়েদ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি বলল- أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকট তওবা করি" আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন যদিও সে জেহাদের কাতার হতে পলায়ন করে থাকে। -[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ। তবে আবূ দাঊদ বলেন, বর্ণনাকারীর নাম হলো হেলাল ইবনে ইয়াসার। [অর্থাৎ বেলালের পরিবর্তে হেলাল।] তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** জিকির-আজকার, ইবাদত-বন্দেগি, তওবা-ইস্তিগফার তথা সবকিছু একনিষ্ঠ নিয়তে করা একান্ত আবশ্যক। একনিষ্ঠতা না পাওয়া গেলে তার কোনো মূল্য নেই। বিশেষ করে তওবা করার অর্থ হলো, কৃত পাপ পরিত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করা। সে পাপে আর কখনো লিপ্ত না হওয়া। তওবা করে পুনঃ সে পাপে লিপ্ত হওয়া মূলত মহান রবের সাথে ঠাট্টা করারই নামান্তর। যেমন বর্ণিত আছে- إِنَّ الْمُسْتَغْفِرَ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ

হযরত যায়েদ (রা.)-এর পরিচয় : ইমাম জাযারী (র.) تَصْحِيْحُ الْمَصَابِيْحِ কিতাবে বলেন, ইনি যায়েদ ইবনে হারেছা নন যিনি উসামার পিতা; বরং ইনি হলেন আবূ ইয়াসার [ইয়াসারের পিতা]। ইমাম বাগাভী তাঁর مُعْجَمُ الصَّحَابَةِ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস তাঁর থেকে জানা নেই।

ইবনে হাজার (র.) اَلتَّقْرِيْبُ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই যায়েদ সাহাবী, যিনি ইয়াসারের পিতা।

وَذَكَرَ أَبُوْ مُوْسَى الْمَدِيْنِيُّ وَكَانَ عَبْدًا نُوْبِيًّا .

-[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৮৬]

اَلزَّحْفُ **-এর অর্থ :** ইমাম তীবী (র.) বলেন, اَلزَّحْفُ অর্থ- অধিক সংখ্যক সৈন্য। 'আন اَلَّذِيْ يُرٰى لِكَثْرَتِهِ كَأَنَّهُ يَزْحَفُ নেহায়া' নামক কিতাবে এসেছে যে, এটি مِنْ زَحْفِ الصَّبِيِّ থেকে উৎকলিত إِذَا دَبَّ عَلٰى إِسْتِهِ قَلِيْلًا قَلِيْلًا তথা যখন শিশু নিতম্বের উপর ভর করে ধীরে ধীরে চলে।

إِمَامُ الْمُظْهِرِ বলেন, اَلزَّحْفُ অর্থ- শত্রু সম্মুখে সংঘবদ্ধ সৈন্য। أَيْ مِنْ حَرْبِ الْكُفَّارِ حَيْثُ لَا يَجُوْزُ الْفِرَارُ بِأَنْ لَا يَزِيْدَ الْكُفَّارُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلَيْ عَدَدِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا نَوَى التَّحَرُّفَ وَالتَّحَيُّزَ . -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৮৭]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٢٤٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ أَنّٰى لِيْ هٰذِهٖ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

২২৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে তাঁর কোনো নেক বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করবেন আর সে বলবে, হে প্রভু! আমার এ মর্যাদা বৃদ্ধি কি কারণে হলো? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কারণে। -[আহমদ]

وَعَنْ ٢٢٤٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

২২৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি হলো সাহায্যপ্রার্থী পানিতে পড়া ব্যক্তির ন্যায়, সে তার বাপ, মা, ভাই-বন্ধুর দোয়া পৌঁছার অপেক্ষায় থাকে। যখন তার নিকট তা পৌঁছে, তখন তা তার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তার সামগ্রী অপেক্ষাও প্রিয়তর হয় এবং আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদেরকে জমিনবাসীদের দোয়ার কারণে পর্বত সমতুল্য রহমত পৌঁছান, আর জীবিতদের পক্ষ হতে মৃতদের জন্য হাদিয়া হলো তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া। –[বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মানুষের মৃত্যুর পর দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শুধুমাত্র তিনটি ব্যতীত। এর একটি হলো তার জন্য প্রার্থনা। মৃত ব্যক্তি দোয়ার অধিক মুখাপেক্ষী। কবরের কঠিন অবস্থায় দোয়াই তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হতে এটা অধিক মূল্যবান। কাজেই আমাদের উচিত মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা।

وَعَنْ ٢٢٤٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِىْ صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى النَّسَائِىُّ فِىْ عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ)

২২৪৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আনন্দ তার জন্য, যার আমলনামায় ইস্তিগফার বেশি পাওয়া যাবে। –[ইবনে মাজাহ। আর নাসায়ী তাঁর কিতাব 'আমালু ইয়াওমিন ওয়া লায়লাতিনে।']

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اِسْتِغْفَارٌ -এর ফজিলত সম্পর্কীয় অপর একটি হাদীস ইমাম বাযযায হযরত আনাস (রা.) সূত্রে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন যে, আমলনামা লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা বান্দার আমলনামা নিয়ে যখন উপরের দিকে গমন করে তখন মহান আল্লাহ তার প্রথম ও শেষে اِسْتِغْفَارٌ দেখে বলেন, আমি বান্দার সকল পাপ ক্ষমা করে দিলাম, যা এ আমলনামার উভয় পার্শ্বে রয়েছে। এ হাদীসের মূলকথা হলো, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করে তার জন্য এ মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জিত হবে। –[মিরকাত ও মাযাহেরে হক]

وَعَنْ ٢٢٤٨ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اِسْتَبْشَرُوْا وَاِذَا اَسَاؤُوْا اِسْتَغْفَرُوْا . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২২৪৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্গত কর, যারা যখন ভালো কাজ করে খুশি হয় এবং যখন মন্দ কাজ করে ক্ষমা চায়। –[ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দা'আওয়াতুল কাবীরে।]

وَعَنْ ٢٢٤٩ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ (رض) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) حَدِيْثَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ عَنْ نَفْسِهٖ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا اَىْ بِيَدِهٖ فَذَبَّهٗ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِىْ اَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهٗ رَاحِلَتُهٗ عَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَوَضَعَ رَأْسَهٗ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهٗ فَطَلَبَهَا حَتّٰى اِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِىَ الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ فَاَنَامُ حَتّٰى اَمُوْتَ فَوَضَعَ رَأْسَهٗ عَلٰى سَاعِدِهٖ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ فَاِذَا رَاحِلَتُهٗ عِنْدَهٗ عَلَيْهَا زَادُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهٖ وَزَادِهٖ . رَوٰى مُسْلِمٌ الْمَرْفُوْعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ فَحَسْبُ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ الْمَوْقُوْفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَيْضًا .

২২৪৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হারেছ ইবনে সুওয়াইদ বলেন, আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ দুটি কথা বলেছেন– একটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ হতে অপরটি নিজের পক্ষ হতে। তিনি বলেছেন– মু'মিন নিজের গুনাহকে এরূপ মনে করে, যেন সে কোনো পাহাড়ের নীচে বসা, যা সে তার উপর ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা করে। পক্ষান্তরে ফাজের ব্যক্তি আপন গুনাহকে দেখে যেন একটি মাছি তার নাকের উপর বসল, আর সে আপন হাতের ইঙ্গিতে তাকে তাড়িয়ে দিল। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক খুশি হন, যে কোনো ধ্বংসকারী মরুভূমিতে পৌঁছেছে, আর তার সাথে তার বাহন রয়েছে, যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সে তথায় জমিনে মাথা রাখল এবং সামান্য ঘুমাল। অতঃপর জেগে দেখল তার বাহন পালিয়ে গেছে। সে তা তালাশ করতে থাকল, অবশেষে তাপ ও পিপাসা এবং অপরাপর কষ্ট যা আল্লাহর মর্জি তাকে কাতর করে ফেলল। তখন সে সিদ্ধান্ত করল, আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকব, যাবৎ না মরে যাই। সুতরাং সে তথায় আপন বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল যাতে সে মরে যায়। এ সময় হঠাৎ জেগে দেখে তার বাহন তার নিকটে– তার উপর তার পাথেয় ও পানীয় আছে। এরূপে আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার তওবায় এ ব্যক্তি তার বাহন ও পাথেয় পেয়ে যেরূপ খুশি হয়েছে, তা অপেক্ষাও অধিক খুশি হন। –[মুসলিম শুধু মারফূ' অংশ এবং বুখারী মাওকূফ এবং মারফূ' উভয় অংশ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রথম অনুচ্ছেদেও এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তথায় এসেছে যে, তওবার মাধ্যমে মহান আল্লাহ অত্যধিক খুশি হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার তওবার উপর সন্তুষ্ট হন এবং তার তওবাকে কবুল করে নেন। আর এ হাদীস যেন এ আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করছে যে, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ 'মহান আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।'

হযরত ইমাম গাযালী (র.) বলেন, অনেক বড় আলেম ও আমেল উস্তাদ আবূ ইসহাক ইসফারায়েনী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট একাধারে ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাওবায়ে নাসূহার জন্য প্রার্থনা করলাম। কিন্তু আমার দোয়া কবুল হলো না। অবশেষে আমি আশ্চর্য হয়ে মনে মনে বলতে লাগলাম سُبْحَانَ اللّٰهِ আমি ত্রিশ বছর যাবৎ একটি দোয়া করছি অথচ তা এখনো কবুল হয়নি। ইত্যবসরে স্বপ্নে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি বলতে লাগল– তুমি এতে

আশ্চর্য হচ্ছ? তুমি কি জান তুমি কি প্রার্থনা করছ? তুমি তো এটা প্রার্থনা করছ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ভালোবাসুক আর তুমি কি এ সুসংবাদ শুননি যে, إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ কাজেই এটা কি সহজ বিষয়? বরং তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকেই তিনি ভালোবাসেন। –[মিরকাত ও মাযাহেরে হক]

وَعَنْ ٢٢٥٠ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَّ التَّوَّابَ .

২২৫০. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন. নিশ্চয় মহান আল্লাহ পাপে পতিত হয়ে তওবাকারী মু'মিন বান্দাকে ভালোবাসেন।

وَعَنْ ٢٢٥١ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِى الدُّنْيَا بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا اَلْاٰيَةَ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلَا وَمَنْ اَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

২২৫১. অনুবাদ : হযরত ছওবান (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এ আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র দুনিয়া লাভ হওয়াকেও আমি ভালোবাসি না, "আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না!" এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, যে শিরক করেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন, অতঃপর তিনবার করে বললেন, যে শিরক করেছে সেও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : নবী করীম ﷺ -এর উল্লিখিত কথাটি বলার অর্থ হলো, অত্র আয়াতের পরিবর্তে যদি আমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু প্রদান করা হয় আর আমি দুনিয়ার সব কিছু আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করে দেই এবং এর যেসব বস্তু হতে স্বাদ গ্রহণ করা যায় তা হতে স্বাদ গ্রহণ করি তথাপিও আমি তা পছন্দ করব না। কেননা অত্র আয়াতে পাপসমূহ ক্ষমা করার সবচেয়ে বড় সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, যা হাজারো দুনিয়া হতে উত্তম। পুরো আয়াত হলো–

يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

অর্থাৎ "হে আমার বান্দাগণ! যারা [পাপের কারণে] নিজেদের উপর অবিচার করেছ তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা পাপসমূহ মার্জনা করে দেবেন। অবশ্যই তিনি মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

এ অর্থকেই হযরত আলী (রা.) নিম্নোক্ত পঙক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন–

اَيَا صَاحِبَ الذَّنْبِ لَا تَقْنَطَنْ * فَاِنَّ الْاِلٰهَ رَؤُفٌ رَؤُفٌ

وَلَا تَرْحَلَنَّ بِلَا عُدَّةٍ * فَاِنَّ الطَّرِيْقَ مَخُوْفٌ مَخُوْفٌ

হে পাপী কখনো নিরাশ হয়ো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বড়ই দয়ালু। পাথেয় ব্যতীত পথে গমন করো না, রাস্তা বড়ই বিপদ-সংকুল।

জনৈক ফারসি কবিও এরকম বলেছেন–

غافل مرد که مرکب مردان مرد را * در سنگ وخ بادیه پیها بریده اند

نومید ہم مباش رندان باده نوش * ناگه بیک خروش منزل رسیده اند

وَعَنْ ٢٢٥٢ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهٖ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْحِجَابُ قَالَ اَنْ تَمُوْتَ النَّفْسُ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ . (رَوَى الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ اَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَخِيْرَ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

২২৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে মাফ করে দেন, যাবৎ [আল্লাহ ও তার মধ্যে] পর্দা না পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পর্দা কি? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। –[উক্ত হাদীস তিনটি ইমাম আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন। আর ইমাম বায়হাকী কেবল শেষোক্তটি كِتَابُ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ -এ রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বের এক হাদীস অনুযায়ী জানা যায় যে, غَرْغَرَه -এর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন। অতএব কেউ এর পূর্বে শিরক পরিত্যাগ করে ঈমান আনয়ন করলে তার তওবাও গৃহীত হবে। কাজেই সকল প্রকারের তওবা পরিত্যাগ করে একমাত্র খাঁটি নিয়তে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

وَعَنْهُ ٢٢٥٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِبَالٍ ذُنُوْبٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

২২৫৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে কাউকেও সমান না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে [মরবে], আর তার উপর পাহাড় পরিমাণ গুনাহর বোঝাও থাকবে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন [বিনা তওবায়, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়]। –[উক্ত হাদীসটি ইমাম বায়হাকী كِتَابُ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ এ- রেওয়ায়েত করেছেন।]

وَعَنْ ٢٢٥٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ـ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ النَّهْرَانِيُّ وَهُوَ مَجْهُوْلٌ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ رَوٰى عَنْهُ مَوْقُوْفًا قَالَ النَّدَمُ تَوْبَةٌ وَالتَّائِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ـ

২২৫৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– গুনাহ হতে তওবাকারী তার ন্যায় যার কোনো গুনাহ নেই। –[ইবনে মাজাহ]

বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বলেন, নাহরানী এটা একা বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি হলেন 'মাজহুল' ব্যক্তি। শরহুস সুন্নায় বাগাবী এটাকে মাওকূফ অর্থাৎ আব্দুল্লাহর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ বলেছেন, "অনুশোচনাই হলো তওবা আর তওবাকারী হলো তার ন্যায় যার কোনো গুনাহ নেই।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ কথা জানা উচিত যে, যখন কোনো পাপী ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে নিজের পাপের উপর লজ্জিত হয় এবং গ্রহণযোগ্য শর্তের মাধ্যমে তওবা করে তবে তার তওবা কবুলের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। কেননা মহান আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন– وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ 'আল্লাহ তা'আলা এমন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন।'

আর যে اِسْتِغْفَارٌ তওবা ব্যতীত হয় এবং যার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে নিজের অক্ষমতা, বশ্যতা ও দৈন্যদশার প্রকাশের মাধ্যমে হয় এর মাধ্যমে কখনো পাপ মোচন করে দেন আবার কখনো পাপ মোচন করেন না। তবে এর মাধ্যমে ছওয়াব অর্জিত হয়। মূলত এটা মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা اِسْتِغْفَارٌ-এর মাধ্যমে পাপকে দূর করে দেন, আর যখন ইচ্ছা করেন পাপ দূর করেন না। কিন্তু ছওয়াব উভয় অবস্থায় পাওয়া যাবে। –[মাযাহেরে হক]

قَوْلُهُ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ **-এর ব্যাখ্যা :** তওবাকারী পাকড়াও না হওয়ার দিক থেকে নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায়; বরং কখনো তার থেকেও বৃদ্ধি হয়। কেননা তওবাকারীর পাপ নেক দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর এ কথার সমর্থনে হযরত রাবেয়া বসরী (রা.) থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর যুগের সুফইয়ান ছাওরী, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা ও ফোযাইল ইবনে আয়াযের উপর গর্ব করে বলতেন, আমার পাপ তোমাদের নেকের থেকেও বেশি হয়ে গেছে। অতঃপর আমার তওবার কারণে সেগুলো নেকে পরিণত হয়ে গেছে। ফলে তোমাদের নেকের থেকেও বেশি হয়ে গেছে। তবে এ নেক হলো تَقْدِيْرِيْ অন্যথায় কিভাবে তাঁর নেক তাদের থেকে বেশি হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমার মতে উভয় সুফিয়ানের একটি সুন্নত যার উপর কিয়ামত পর্যন্ত আমল চলবে হযরত রাবেয়ার সকল নেক হতে বেশি হবে। তথাপিও তাঁরা উভয়ে তাঁর দরবারে নম্রতার সাথে হাজির হতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণে তাঁর নিকট দোয়া প্রার্থনা করতেন আবার কখনো তাঁদের উভয়ের থেকে তিনি উপকৃত হতেন; দীনের যেসব বিষয় তিনি জানতেন না সেসব বিষয়ে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ১৯৬]

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ **-এর ব্যাখ্যা :** হাফেজ ইবনুল কাইয়িম বলেন, পাপ হতে তওবা করার পর সে কি পাপ করার পূর্বেকার অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে- না করবে না, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

قَوْلُ الْبَعْضِ : কিছু সংখ্যকের মতে, সে পাপে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেকার অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা তওবা তো পূর্বেকার সমস্ত গুনাহকে মোচন করে দেয় এবং তাকে كَاَنْ لَمْ يَكُنْ -এ বানিয়ে দেয়।

এ ছাড়াও تَوْبَة তো একটি সৎকর্ম। গুনাহের কারণে সে سَاقِطُ الْمَرْتَبَةِ হয়ে পড়েছে আর تَوْبَة -এর মাধ্যমে তা পূরণ হয়ে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যেমন কোনো ব্যক্তি কূপে পড়ে যাওয়ার পর তার কোনো প্রিয় বন্ধু রশি ফেলে দেয় আর তা আঁকড়ে ধরে সে পূর্বাবস্থায় উঠে আসে। تَوْبَة -ও অনুরূপ প্রিয় বন্ধুর মতো।

قَوْلُ الْاٰخَرِ : অপর এক দলের মতে, সে তার মূল অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে না। কেননা সে তো حَالَتِ وُقُوْف-এর মধ্যে ছিল না; বরং সে ছিল حَالَتِ صُعُوْد -এ আর পাপের কারণে حَالَتِ نُزُوْل وَهُبُوْط -এর মধ্যে নেমে এসেছে। অতঃপর যখন সে তওবা করল তখন তাতে উন্নতির যে যোগ্যতা ছিল তাতে অপূর্ণতা এসে গেছে। যেমন দুই ব্যক্তি একসাথে ভ্রমণ শুরু করল অতঃপর কঠিন কোনো সমস্যার কারণে এক ব্যক্তি থেমে পড়ল আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ভ্রমণে রত রয়েছে। এরপর প্রথম ব্যক্তি পুনঃ চলতে শুরু করল; কিন্তু সে তাকে আর ধরতে পারল না বরং পশ্চাতেই থেকে গেল।

لَمْ يَلْحَقْهُ اَبَدًا لِاَنَّهُ كُلَّمَا سَارَ مَرْحَلَةً تَقَدَّمَ ذَاكَ اُخْرٰى وَهٰكَذَا .

اَلْقَوْلُ الْفَيْصَلُ **সিদ্ধান্তমূলক কথা :** শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া সিদ্ধান্তমূলক কথা বলেন। বিশুদ্ধ কথা হলো, কিছু সংখ্যক তওবাকারী তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে না। কিছু সংখ্যক ফিরে যেতে পারে আর কিছু তওবাকারী তার পূর্বাবস্থা হতে আরো উপরের স্তরে পৌছে যায়। যেমন নবীগণ থেকে নবুয়তের বিপরীত কোনো কর্ম প্রকাশের ফলে তওবার মাধ্যমে তাঁরা আরো উপরের মর্যাদায় পৌছে যান। মূলত এ তিন অবস্থা তওবাকারীর অবস্থা হিসেবে হবে। তওবা যদি একনিষ্ঠতার সাথে গুনাহ থেকে বড় হয় তবে উপরের দরজায় পৌছবে, পাপের মতো হলে পূর্বাবস্থায় পৌছবে আর পাপ হতেও তওবা ছোট হলে পূর্বাবস্থায় পৌছতে পারবে না। –[তা'লীক : খ. ৩, পৃ. ১১৮]

بَابٌ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার রহমত ও দয়ার ব্যাপকতা

মেশকাত শরীফের অধিকাংশ খণ্ডে এ স্থানে শুধু بَابٌ লিখা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, এর অধীনে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের সাথে। মেরকাত গ্রন্থে এখানে بَابُ رَحْمَةِ اللّٰهِ উল্লেখ রয়েছে। আর কোনো কোনো নোসখাতে এখানে "بَابٌ فِىْ سَعَةِ رَحْمَةٍ" এ শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মহান আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতার বর্ণনা।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٢٥٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ যখন মাখলুক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন একটি লিপি লিখলেন যা তাঁর নিকট তাঁর আরশের উপর আছে, আমার দয়া আমার ক্রোধ অতিক্রম করেছে। অন্য বর্ণনায় আছে, আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে কিতাবে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এই বড় সুসংবাদ লিখিত রয়েছে যে, 'আমার রহমত বা দয়া আমার গজবের উপর জয়লাভ করেছে।' এ কিতাবের বড়ত্ব ও মর্যাদার কোনো অনুমান করা যায় না। উক্ত কিতাবের মর্যাদা ও মহত্ত্বের কারণে মহান আল্লাহ একে নিজের নিকট আরশের উপর রেখে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর দয়া অগ্রগামী ও প্রাধান্য লাভ করার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার দয়া, ক্ষমা, দান এবং তাঁর অনুগ্রহসমূহের চিহ্ন এবং এর বহিঃপ্রকাশ প্রাধান্য পাওয়া। এটা সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছে আর তা অসীম এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের প্রকাশ খুবই কম। যেমন তিনি নিজেই ইরশাদ করেন– اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا "যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহসমূহ গণনা কর তবে তা গুনতে সক্ষম হবে না।" অন্যত্র ইরশাদ করেন– عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ "আমি যাকে ইচ্ছা আজাব দেই কিন্তু আমার দয়া সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে।"

সারকথা হলো, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া এত ব্যাপক ও অসীম যে সকল সৃষ্টিকে তা বেষ্টন করে আছে, সৃষ্টির কোনো একটি অংশও এর বাইরে নেই। এ পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কোনো না কোনোভাবে মহান আল্লাহর রহমতে আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহর এ দান-দক্ষিণা ও অনুগ্রহের বিপরীতে বান্দার পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে ত্রুটি হয় তার কোনো সীমারেখা নেই। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন– وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ

"যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের অবিচারের কারণে পাকড়াও করতেন তবে জমিনের উপর একটি জীবও অবশিষ্ট রাখতেন না।"

কাজেই এটাও মহান আল্লাহর মহা অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ যে, বান্দার সকল ভুল-ত্রুটির পরও তাদেরকে জমিনের উপর বিদ্যমান রাখছেন। তাদেরকে রিজিক প্রদান করছেন, তাঁর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করছেন এবং এ দুনিয়াতে তাদেরকে কোনো শাস্তিও প্রদান করছেন না। এটা এ জগতের বিষয় যে, মহান আল্লাহর রহমত কিভাবে এবং কোন কোন পথে আসছে। আর পরকালের দয়া ও অনুগ্রহ এ দুনিয়া হতে অনেক অনেক বেশি যা পরবর্তী হাদীস দ্বারা জানা যাবে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯০]

وَعَنْهُ ٢٢٥٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلٰى وَلَدِهَا وَاَخَّرَ اللّٰهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهٗ وَفِىْ اٰخِرِهٖ قَالَ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ اَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ ـ

২২৫৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহর একশত রহমত রয়েছে যা হতে একটি মাত্র রহমত তিনি জিন, মানুষ, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে নাজিল করেছেন। তা দ্বারাই তাদের একে অন্যকে মায়া করে, তা দ্বারাই তাদের একে অন্যকে দয়া করে এবং তা দ্বারাই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানকে ভালোবাসে, বাকি নিরানব্বইটি আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছেন, যা দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের রহম করবেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত সালমান ফারেসী হতে তার অনুরূপ রয়েছে। তার শেষের দিকে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন হবে, আল্লাহ ঐ সকল রহমত দ্বারা তাকে পূর্ণ করবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ একটি আপত্তি ও এর জবাব :

আপত্তি : মহান আল্লাহর রহমত অসংখ্য। যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে এসেছে–

سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ اَىْ اٰثَارُ رَحْمَةِ اللّٰهِ وُجُوْدُهٗ وَاَنْعَامُهٗ عَمَّتِ الْمَخْلُوْقَاتِ كُلَّهَا وَهِىَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ ـ

যেমন কুরআনেও এসেছে– وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ بِخِلَافِ اَثَرِ الْغَضَبِ এবং وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا فَاِنَّهٗ ظَاهِرٌ فِىْ بَعْضِ بَنِىْ اٰدَمَ بِبَعْضِ الْوُجُوْهِ ـ

কাজেই رَحْمَةٌ যখন সীমাহীন তখন অত্র হাদীসে একে একশতের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে কিভাবে?

জবাব :

১. ইমাম তূরপুশতী (র.) বলেন, এখানে مِائَةَ رَحْمَةٍ কথাটি تَقْسِيْم-এর হিসেবে বলা হয়নি; বরং উদাহরণ হিসেবে উভয় রহমতের মধ্যে تَنَاسُبْ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য تَحْدِيْد ও تَعْدِيْد উদ্দেশ্য নয়।

২. অথবা, জান্নাতের মধ্যে একশত স্তর থাকবে এ হিসেবে مِائَةَ رَحْمَةٍ বলা হয়েছে। কেননা জান্নাত তো রহমতের স্থান, যাতে প্রত্যেক রহমতের বিপরীতে একটি করে স্তর হয়।

وَقَدْ ثَبَتَ اَنَّهٗ لَا يَدْخُلُ اَحَدٌ الْجَنَّةَ اِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَمَنْ نَالَتْهُ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ [illegible] وَاَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ حَصَلَتْ لَهٗ جَمِيْعُ اَنْوَاعِ الرَّحْمَةِ ـ

–[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৫]

وَعَنْ ٢٢٥٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهٖ اَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ اَحَدٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি মু'মিন জানত আল্লাহর নিকট কি শাস্তি রয়েছে, তাহলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউই করত না, আর যদি কাফের জানত আল্লাহর নিকট কি দয়া রয়েছে, তবে কেউই তাঁর জান্নাত হতে নিরাশ হতো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহর অসীম দয়া ও কঠোর শাস্তির কথা প্রকাশ করা, যাতে মু'মিনগণ তাঁর রহমতের উপর ভরসা করে বসে না থাকে এবং তাঁর আজাব সম্পর্কে ভয়ভীতিহীন না হয়। আর কাফের সম্প্রদায় তাঁর রহমত হতে নৈরাশ না হয় এবং তওবা করা পরিত্যাগ না করে।

হাদীসের মূলকথা হলো, বান্দা যেন ভয় ও আশার মাঝে অবস্থান করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা এবং শাস্তির ভয় মনে রাখতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন– "কিয়ামত দিবসে যদি এ ঘোষণা আসে যে, শুধু এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে এ আশা করি যে, উক্ত ব্যক্তি আমি হব। এমনিভাবে যদি এ ঘোষণা করা হয় যে, শুধু এক ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে তবে ভয় হয় যে, উক্ত ব্যক্তি আমি কিনা। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯১]

وَعَنْ ٢٢٥٨ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২২৫৮. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বেহেশত তোমাদের কারো জন্য জুতার ফিতা অপেক্ষাও অধিক নিকটে আর দোজখও তদ্রূপ। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মানুষ এবং জান্নাত-জাহান্নামের মাঝে কোনো তফাৎ নেই। কাজেই প্রত্যেকের উচিত নিজের জীবনকে ভালো ও নেককাজের মাধ্যমে ঠিক রাখা এবং জান্নাতের আশা করবে, আর মন্দকাজ হতে বিরত থাকবে সাথে সাথে দোজখের ভয় রাখবে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯১]

وَعَنْ ٢٢٥٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لِاَهْلِهٖ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهٖ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰى بَنِيْهِ اِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ ثُمَّ اَذْرُوْا نِصْفَهٗ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهٗ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَا اَمَرَهُمْ فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهٗ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهٗ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৫৯. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এক ব্যক্তি, যে কখনো কোনো ভালো কাজ করেনি, আপন পরিজনকে বলল, অপর বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচার করল; কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো, আপন সন্তানদেরে অসিয়ত করল, যখন সে মরে যাবে, তখন তাকে যেন পুড়ে ফেলা হয়, অতঃপর তার অর্ধভাগ ডাঙ্গায় আর অর্ধভাগ সমুদ্রে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দেবেন যা জগতের কাউকেও কখনো দেননি। যখন সে মরে গেল, তারা তার নির্দেশ অনুসারেই কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। এভাবে ডাঙ্গাকে হুকুম দিলেন, ডাঙ্গা তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি এরূপ করেছিলে? সে বলল, তোমার ভয়ে হে প্রভু! তুমি তা জান। এতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে আলোচিত ব্যক্তি বুঝে নিয়েছে যে, দাফনের পরই শুধু তার আজাব হবে কাজেই নিজের পাপাচারিতার আধিক্য ও মন্দ আমল প্রত্যক্ষ করে সে খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে অসিয়ত করে মৃত্যুর পর তাকে জ্বালিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিতে। মহান আল্লাহ কত বড় সূক্ষ্মদর্শী যে বান্দার এ একটি কথা তাঁর খুবই পছন্দ হয়, ফলে তাকে ক্ষমা করে দেন। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯২]

قَوْلُهُ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الخ একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন : অত্র হাদীসে উল্লিখিত لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -এর মধ্যস্থিত اِنْ শব্দটি شَكّ বা সন্দেহ/ সংশয় অর্থে ব্যবহৃত হলে মহান আল্লাহর কুদরতের উপর সন্দেহ পোষণ করা হয়, যা কুফরি। এটা হয়ে থাকলে মাগফেরাত কিভাবে হবে? যেমনটা হাদীসের শেষাংশে এসেছে।

উত্তর : ১. কিছু সংখ্যকের মতে, এখানে قَدَرَ শব্দটি قُدْرَةٌ থেকে مَاخُوْذ নয়; বরং قَدَر -এর অর্থ হলো قَضَاء وَقَدَر তথা ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত। কাজেই কোনো কোনো বর্ণনায় قَدَّرَ (بِتَشْدِيْدِ الدَّال) পড়া হয়েছে, যা স্পষ্টতই تَقْدِيْر -এর অর্থে। অতএব এর অর্থ হলো- لَئِنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ তথা যদি তার উপর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। কেননা عَذَابٌ নির্ধারণ করা তো নিশ্চিত নয়; বরং ক্ষমাও সম্ভব।

২. অপর এক দলের মতে, এখানে قَدَر -এর অর্থ ضِيْق তথা সংকীর্ণতা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ এমনিভাবে হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে কথা- فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

৩. কারো মতে, আল্লাহ তা'আলার কুদরত সম্পর্কে يَقِيْن বা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ফলে আমি তাদেরকে تَجَاهُل عَارِفَانَه হিসেবে সন্দেহের অবস্থায় প্রকাশ করেছি। যেন এটাও একপ্রকার মাজাযের উপর ব্যবহৃত হয়। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِمَّا اَنْزَلْنَا الاية

৪. কেউ কেউ বলেন, উক্ত ব্যক্তি মহান আল্লাহর মহা ক্ষমতার গুণের বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। আর جَاهِلٌ بِالصِّفَةِ ব্যক্তির বিষয়ে তর্কশাস্ত্রবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, সে কাফের নাকি মুসলমান? তবে صِفَةٌ অস্বীকারকারী কাফের।

৫. অথবা, সে فَتْرَة তথা নবীগণের আগমনের বিরতির সময়কার লোক ছিল। তখন শুধু تَوْحِيْد -ই যথেষ্ট। صِفَةٌ ও অন্যান্য বিষয়ে ঈমান গ্রহণ আবশ্যক নয়।

৬. আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন, এ কথা তার অধিক অস্থিরতা ও ভয়ভীতি অবস্থায় বের হয়েছে। আর মানুষ সে সময় غَافِلٌ وَنَاسِىٌ وَمَغْلُوْبُ الْعَقْلِ -এর হুকুমে সাব্যস্ত হয়। এ অবস্থায় সে শাস্তিযোগ্য হবে না, যা مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ কথা দ্বারা বুঝায়। যদিও তার বিশ্বাসে তা ছিল না। وَهٰذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الطِّيْبِىُّ (رح) اَيْضًا .
যেমন মরুভূমিতে সওয়ারি হারিয়ে একান্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থায় তা পেয়ে বলে উঠল যে- اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ

-[আত তা'লীক : খ. ৩, পৃ. ১২২; আল আশিয়্যাহ : খ. ২, পৃ. ২৫৩]

২২৬০. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعٰى اِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِى السَّبْيِ اَخَذَتْهُ فَاَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَاَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَتَرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ فَقُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৬০. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, একবার নবী করীম ﷺ -এর নিকট কতক যুদ্ধবন্দী আসল। দেখা গেল, একটি স্ত্রীলোকের দুধ ঝরে পড়ছে, আর সে শিশুর তালাশে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান করাল। তখন নবী করীম ﷺ আমাদেরকে বললেন- তোমাদের কি মনে হয় এ স্ত্রীলোকটি নিজের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? [অর্থাৎ সে যখন অন্যের সন্তানের প্রতি এত স্নেহ দেখায়, তখন নিজের সন্তানকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?] আমরা আরজ করলাম, কখনো না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে নিক্ষেপ না করার প্রতি শক্তি রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এ স্ত্রীলোকের তার সন্তানের প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٢٦١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يُنْجِىَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهٗ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهٖ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَىْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কাউকেও তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকেও নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, আমাকেও নয়– অবশ্য যদি আল্লাহ নিজ রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে নেন। তবে তোমরা ঠিকভাবে কাজ করতে থাকবে ও মধ্যমপন্থায় থাকবে এবং সকাল, সন্ধ্যায় ও রাতে কিছু কাজ করবে। সাবধান! তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে তাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'তবে তোমরা ঠিকভাবে কাজ করতে থাকবে' অর্থাৎ আমল মুক্তি দেবে না ভেবে আমল ছেড়ে দেবে না। কেননা তার জন্য আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে এবং তা আল্লাহর রহমত আকর্ষণের কারণ। আর আমলের জন্য জানও ক্ষেপাবে না। কেননা আমলই মুক্তি দেবে না। এক কথায়, উভয় চরম পন্থা ছেড়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে।

وَعَنْ ٢٢٦٢ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُدْخِلُ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا اَنَا اِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২৬২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কাউকেও তার কর্ম বেহেশতে পৌছাতে পারবে না এবং তাকে দোজখ হতেও বাঁচাতে পারবে না, এমনকি আমাকেও নয়, আল্লাহর রহমত ছাড়া। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শেষ কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার রহমতের মাধ্যমেই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। এর অর্থ হলো, জান্নাতে প্রবেশ করা এবং দোজখ হতে মুক্তি পাওয়ার মতো সৌভাগ্যের কারণ হবে সেই আমল যার সাথে মহান আল্লাহর দয়া রয়েছে, কাজেই জান্নাতে প্রবেশ করা শুধুমাত্র তাঁর দয়া ও রহমতেই হবে। তবে জান্নাতে যে মর্যাদা লাভ করবে তা আমলের বদৌলতেই হবে। আর আমল যেমন হবে তার মর্যাদাও অনুরূপ হবে।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯৪]

وَعَنْ ٢٢٦٣ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهٗ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدُ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

২২৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ইসলাম খাঁটি হয়, আল্লাহ তা দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেন, সে পূর্বে যা অপরাধ করেছে। অতঃপর তার সৎকাজ হয় অসৎকাজের বিনিময়– সৎকাজ তার দশ গুণ হতে সাতশত গুণ এবং বহুগুণ পর্যন্ত লেখা হয়; আর অসৎকাজ তার এক গুণমাত্র তবে আল্লাহ যাকে তা ছেড়ে দেন [তার এক গুণের শাস্তিও হবে না।] –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসের ক্ষমার কথা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর দয়ারই বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর দান-দক্ষিণারই নিদর্শন। তিনি একটি নেকির বিনিময় দশ হতে সাতশতগুণ পর্যন্ত দান করেন; বরং যাকে ইচ্ছা উক্ত ব্যক্তির চেষ্টা-সাধনা, কষ্ট-ক্লেশ, সত্যতা-একনিষ্ঠতা অনুযায়ী অসংখ্য দান করেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

কিন্তু পাপের বিনিময় শুধু সেই পরিমাণই দান করেন। কাজেই যে ব্যক্তি যে পরিমাণ অন্যায় করবে সে অনুযায়ীই এর শাস্তি প্রাপ্ত হবে; বরং যাকে ইচ্ছা তিনি অসীম দয়ার গুণে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। কেননা তিনি হলেন মহা দয়ালু ও পরম ক্ষমাশীল। (وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯৪]

٢٢٦٤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৬৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ পাপ-পুণ্য সম্পর্কে নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যের সংকল্প করে আর তা সম্পাদন না করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে নিজের নিকট একটি পূর্ণ পুণ্যরূপে লিখেন। আর যদি তার সংকল্প করে অতঃপর তা সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে দশ গুণ হতে সাতশত গুণ বরং বহুগুণ পর্যন্ত পুণ্যরূপে লিখেন। আর যে পাপের সংকল্প করে অতঃপর তা সম্পাদন না করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে নিজের নিকট একটি পূর্ণ পুণ্যরূপে লিখেন। আর যদি সে তার সংকল্প করে অতঃপর তা সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে একটিমাত্র পাপরূপে লিখেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নেক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব আমল যা করার ফলে ছওয়াব পাওয়া যায়, আর মন্দ কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা করলে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

কোনো ব্যক্তি নেক কাজ করার ইচ্ছা করার পর যদি কোনো কারণে তা করতে পারল না তবে এর বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকি লিপিবদ্ধ করা হবে। আর কোনো ব্যক্তির আমলের ছওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মু'মিন ব্যক্তির নিয়ত তার আমল হতেও উত্তম বরং এটাও তো বলা হয় যে, সবকিছুর মূল হলো আমল। কিন্তু আমলের স্তর নিয়তের পরে। কেননা আমল ব্যতীত শুধু নিয়তের উপর ছওয়াব প্রদান করা হয়, কিন্তু নিয়ত ব্যতীত শুধু আমলের উপর ছওয়াব প্রদান করা হয় না। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, আমল ব্যতীত নিয়তের কারণে যে ছওয়াব পাওয়া যায় তাতে গুণ করা হয় না।

নেক আমলের ছওয়াব বৃদ্ধি করে সাতশত গুণ পর্যন্ত দেওয়ার কথা তো উল্লিখিত হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ কি পরিমাণ বৃদ্ধি করবেন এর শেষ সীমার কথা কারো জানা নেই। কেননা সাতশতের পরের পরিমাণ মহান আল্লাহ অনির্দিষ্ট রেখেছেন। এর কারণ হলো, কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্দিষ্টকরণকে অনির্দিষ্ট রাখা অধিক প্রতিক্রিয়াশীল। এ কারণেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٢٦٥ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَثَلَ الَّذِىْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ اُخْرٰى فَانْفَكَّتْ اُخْرٰى حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَى الْاَرْضِ - (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

২২৬৫. অনুবাদ : হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে অসৎকাজ করে অতঃপর সৎকাজ করে, তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার গায়ে সংকীর্ণ বর্ম রয়েছে এবং তার গলা কষে ধরেছে, অতঃপর সে কোনো সৎকাজ করল যাতে তার একটি গিরা খসে গেল, অতঃপর আরেকটি সৎকাজ করল, ফলে আরেকটি গিরা খসে গেল। অবশেষে বর্মটি মাটিতে পড়ে গেল। –[শরহুস সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হাদীসের মূল কথা হলো, পাপ করার কারণে মানুষের অন্তর সংকীর্ণ ও অন্ধকার হয়ে যায়। পাপাচারী ব্যক্তি তার সকল কর্মে অন্তরে বিশুদ্ধ পথ নির্দেশনা হতে বঞ্চিত হয় যার ফল হলো তার সকল চিন্তা-চেতনা ও আমলী কাজকর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস প্রশান্তি ও নূরের বিপরীত অস্বস্তি, হতাশা এবং পরাধীনতার অন্ধকার নেমে আসে; বরং এসব লোক মানুষের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধাহীন অবজ্ঞেয় হয়ে যায়। সকল ভালো মানুষই তাকে রাগ ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। অপরদিকে নেক কাজ করার ফলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। সৎকর্মশীল ব্যক্তি তার সকল কর্মে সহজতা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের প্রশান্তি অনুভব করে। এছাড়া সে মানুষের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে পড়ে।

অত্র হাদীসে এ কথাগুলোকেই সংকীর্ণ বর্মের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে যে, সংকীর্ণ বর্ম পরিধান করার ফলে শরীর সংকীর্ণ ও অস্বস্তিতে নিপতিত হয় আর উক্ত বর্মকে শরীর হতে খুলে ফেলাই হলো শরীরের প্রশস্ততা ও আনন্দের কারণ।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯৫]

وَعَنْ ٢٢٦٦ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الثَّانِيَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الثَّالِثَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِى الدَّرْدَاءِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২২৬৬. অনুবাদ : হযরত আবুদ্দরদা (রা.) বলেন, তিনি নবী করীম ﷺ -কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওয়াজকালে বলতে শুনেছেন, "আর যে আল্লাহর সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে।" [সূরা আররাহমান : ৪৬] আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে জেনা করে ও চুরি করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয়বার বললেন, "আর যে আল্লাহর সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে।" আমি দ্বিতীয়বার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে জেনা করে ও চুরি করে? তিনি তৃতীয়বার বললেন, "আর যে আল্লাহর সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে।" আমি তৃতীয়বার বললাম, যদি সে জেনা করে ও চুরি করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবুদ্দরদার নাক কাটা গেলেও [অর্থাৎ তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও]। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : যে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। এ বিষয়ে কিছু সংখ্যক হাদীসে এসেছে যে, এক জান্নাত তো এরকম যে, যার ঘরবাড়ি, দেয়াল, গ্লাস, পেয়ালা, আসবাবপত্র সবই স্বর্ণের। আর অপর জান্নাত এমন যে, যার সব আসবাবপত্র রৌপ্যের।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) উক্ত সুসংবাদ শ্রবণে খুবই আশ্চর্যবোধ করেন এবং একে অসম্ভব মনে করেন। এ কারণে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, যদিও আবুদ্দারদার নাক ধুলায় মলিন হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। অর্থাৎ আবুদ্দারদার নিকট এ কথা যতই আশ্চর্য হোক না কেন এবং যতই অসম্ভব মনে করুক না কেন কিন্তু বাস্তব তাই যা আমি বলেছি। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৭৬]

وَعَنْ ٢٢٦٧ عَامِرِ الرَّامِ (رض) قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَعْنِي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مررت بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيْهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِيْ كِسَائِيْ فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلٰى رَأْسِيْ فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِيْ فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِيْ قَالَ ضَعْهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُوْمَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ لِرُحْمِ أُمِّ الْأَفْرَاخِ فِرَاخَهَا فَوَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ اَللّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا اِرْجِعْ بِهِنَّ حَتّٰى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২২৬৭. **অনুবাদ :** হযরত আমের রাম (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে পৌঁছল, যার গায়ে একটি চাদর ছিল এবং চাদর জড়ানো একটি জিনিস। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বনের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাতে পাখি-ছানার শব্দ শুনলাম। আমি তাদের নিয়ে আমার কাপড়ে রাখলাম। এ সময় তাদের মা আসল এবং আমার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। আমি এদের খুলে দিলাম, আর সে তাদের মধ্যে পড়ল। আমি অমনি তাদের সকলকে আমার চাদরে জড়িয়ে ফেললাম। এরা সবাই এবার আমার কাছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এদের ছেড়ে দাও! আমি ছেড়ে দিলাম; কিন্তু এদের মা ছেড়ে গেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ছানাদের মায়ের ছানাদের প্রতি দয়া দেখে তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ? কসম তাঁর যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন- নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি ছানাদের মায়ের ছানাদের প্রতি দয়া অপেক্ষাও অধিক দয়াবান। এদের নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে এনেছ সেখানে তাদের মায়ের সাথে রেখে দাও। সুতরাং সে তা নিয়ে গেল। -[আবূ দাঊদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٢٦٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ وَامْرَأَةٌ

২২৬৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি একদল লোকের নিকট গেলেন এবং বললেন, এরা কোন দলের লোক? তারা বলল, আমরা মুসলমান। তখন একটি স্ত্রীলোক তার ডেগের

تَخْضِبُ بِقِدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتْ بِهِ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلٰى قَالَتْ اَلَيْسَ اللّٰهُ اَرْحَمَ بِعِبَادِهٖ مِنَ الْاُمِّ بِوَلَدِهَا قَالَ بَلٰى قَالَتْ اِنَّ الْاُمَّ لَا تُلْقِيْ وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَاَكَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْكِيْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ اِلَيْهَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهٖ اِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِيْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللّٰهِ وَاَبٰى اَنْ يَقُوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

নীচে আগুন ধরাচ্ছিল, আর তার সাথে ছিল তার একটি শিশু সন্তান। যখন আগুনের একটি ফুলকি উপরে উঠল অমনি সে তার সন্তাকে দূরে সরাল। অতঃপর সে নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আপনিই কি রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনার প্রতি আমার মা-বাপ কুরবান হোক! বলুন, আল্লাহ কি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু নন? রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয়। সে বলল, তবে কি আল্লাহ তাঁর বান্দদের প্রতি সন্তানের প্রতি মায়ের অপেক্ষা অধিক দয়ালু নন? তিনি বললেন, নিশ্চয়। তখন সে বলল, মা তো কখনো আপন সন্তানকে আগুনে ফেলে না! এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে এমন অবাধ্য ব্যতীত কাউকেও শাস্তি দেন না– যে আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই বলতেও অস্বীকার করে। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٢٢٦٩ ثَوْبَانَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللّٰهِ فَلَا يَزَالُ بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرَئِيْلَ اِنَّ فُلَانًا عَبْدِيْ يَلْتَمِسُ اَنْ يُرْضِيَنِيْ اَلَا وَاِنَّ رَحْمَتِيْ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ جِبْرَئِيْلُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى فُلَانٍ وَيَقُوْلُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُوْلُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتّٰى يَقُوْلَهَا اَهْلُ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْبِطُ لَهٗ اِلَى الْاَرْضِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২২৬৯. **অনুবাদ :** হযরত ছওবান (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– বান্দা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে চায় আর তার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে বলেন, আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে নাও তার প্রতি আমার দয়া রয়েছে। তখন হযরত জিবরাঈল বলেন, আল্লাহর দয়া অমুকের প্রতি, আর এরূপ বলেন আরশ বহনকারীগণ এবং তাদের পার্শ্বের ফেরেশতাগণ। অবশেষে এরূপ বলেন সপ্ত আসমানের অধিবাসীগণ। অতঃপর তার জন্য দয়া জমিনের দিকে অবতীর্ণ হয়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত ব্যক্তির জন্য জমিনের উপর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হলো মহান আল্লাহ উক্ত ব্যক্তিকে নিজের বন্ধু ও প্রিয় বানিয়ে নিয়েছেন এবং ভূখণ্ডে তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফল হচ্ছে পৃথিবীর মানুষজন তার সাথে ভালোবাসা রাখে এবং তাদের অন্তরে উক্ত ব্যক্তির জন্য দয়ামায়া, ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়।

এ হাদীসের মর্মার্থ মহানবী ﷺ -এর অপর এক হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে যেখানে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন মহান আল্লাহ কোনো বান্দাকে বন্ধু হিসেবে সাব্যস্ত করেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ডেকে বলেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালোবাসি তুমিও তার সাথে বন্ধুত্ব রেখ। ফলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) আসমানসমূহে অবস্থানরত সবাইকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অমুক বান্দাকে

পছন্দ করেন, কাজেই তোমরাও তার সাথে বন্ধুত্ব রেখ। ফলে আসমানের অধিবাসীরা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে। এরপর উক্ত বান্দার জন্য জমিনের উপর মহান আল্লাহ তার গ্রহণযোগ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, জনগণ তাকে পছন্দ করতে থাকে।

অপরদিকে যখন মহান আল্লাহ কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হন তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দার সাথে শত্রুতা রাখি তুমিও তাকে শত্রু ভাব। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তার সাথে শত্রুতা পোষণ করেন এবং আসমানসমূহে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দার সাথে শত্রুতা রাখেন তোমরাও তাকে শত্রু ভাব। ফলে আসমানের অধিবাসীরা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে। এরপর তার জন্য জমিনের মধ্যে ব্যাপক শত্রুতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। ফলে মানুষ তাকে শত্রু মনে করতে থাকে।

উক্ত আলোচনাকে সম্মুখে রাখলে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার বন্ধুদের ব্যাপক পরিচিতি, গ্রহণযোগ্যতা এবং সর্বসাধারণের অন্তরে প্রেম-প্রীতির একমাত্র কারণ হলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার সাথে মহব্বত রাখেন এবং জমিনের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। ফলে সকল মানুষ তার সাথে ভালোবাসা রাখে। তবে যে ব্যক্তি ধোঁকা ও প্রতারণতার মাধ্যমে স্বীয় অর্থসম্পদ ব্যয় করে সর্বসাধারণকে নিজের দিকে ঝুঁকিয়ে নেয় সে উক্ত দলের বহির্ভূত। এ লোক ধর্তব্যের বাইরে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯৮]

٢٢٧٠ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

২২৭০. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহর এ কালাম সম্পর্কে বলেছেন– "বান্দাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি অবিচার করে, তাদের মধ্যে কেউ ভালোমন্দ উভয়ই করে, আর কেউ কল্যাণের পথে অগ্রগামী হয়" [কুরআন] এ সকলই বেহেশতে যাবে। –[হাদীসটি ইমাম বায়হাকী كِتَابُ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ -এ রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ **-এর ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীসে তো তিন প্রকারকেই জান্নাতি বলা হয়েছে। আর বায়হাকীতে হযরত ওমর (রা.) থেকে مَرْفُوْعًا বর্ণিত আছে যে– سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ وَظَالِمُنَا مَغْفُوْرٌ لَهُ

হযরত আয়েশা (রা.) এ তিন শ্রেণি সম্পর্কে বলেছেন, নবী করীম ﷺ -এর যুগে যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন তারা سَابِقٌ আর অপরাপর সাহাবীগণ হলেন مُقْتَصِدٌ আর ظَالِمٌ হলো আমার ও তোমার মতো।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

اَلظَّالِمُ اَنَا وَالْمُقْتَصِدُ اَنَا وَالسَّابِقُ اَنَا فَقِيْلَ لَهُ فَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اَنَا الظَّالِمُ بِمَعْصِيَتِيْ وَمُقْتَصِدٌ بِتَوْبَتِيْ وَسَابِقٌ بِمَحَبَّتِيْ.

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে سَابِقٌ তারা, যাদের حَسَنَاتٌ [নেক কাজ] سَيِّئَاتٌ [পাপ কাজ] হতে অগ্রগামী। আর مُقْتَصِدٌ হলেন তারা যাদের পাপ-পুণ্য সমান সমান আর ظَالِمٌ তারা যাদের পাপ নেক হতে বেশি।

কারো মতে, ظَالِمٌ হলো جَاهِلٌ বা অজ্ঞ, مُقْتَصِدٌ হলো مُتَعَلِّمٌ বা শিক্ষার্থী আর سَابِقٌ হলো عَالِمٌ বা জ্ঞানী।

শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, ظَالِمٌ সে ব্যক্তি যে আমলে ত্রুটি করে, مُقْتَصِدٌ অধিকাংশ সময় আমল করে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করে না, আর سَابِقٌ সে যে عِلْم، عَمَلْ، تَعْلِيْم ও اِرْشَادْ-এর সাথে সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালায়। –[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৬]

بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَنَامِ

পরিচ্ছেদ : সকাল, সন্ধ্যা ও শয্যা গ্রহণকালে যা বলবে

এখানে সকাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত তথা দিবাভাগের একেবারে প্রথম সময়, আর সন্ধ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্য অস্ত যওয়ার সময় হতে شَفَقْ তথা আকাশের লালিমা অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় তথা দিবসের একেবারে শেষ সময়। অতএব যেসব দোয়া সকালবেলা পড়ার কথা বর্ণিত আছে, সেগুলো ফজরের পূর্বে বা পরে উভয় সময়ে পড়া যায়। এতে কোনো পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে যেসব দোয়া সন্ধ্যায় পড়ার কথা সেগুলোও মাগরিবের পূর্বে বা পরে পড়া যাবে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ১৯৯]

আর শয্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাতের ঘুম– দ্বিপ্রহরের قَيْلُوْلَه উদ্দেশ্য নয়। যেমন হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত আছে– إِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ الْحَدِيْث كَمَا فِى الْاَشِعَّةِ ج ٢ ص ٢٥٨

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٢٧١ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمْسٰى قَالَ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২৭১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) বলেন, রাসূল ﷺ যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ করতেন বলতেন, "আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁরই শাসন। তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এ রাতের মঙ্গল এবং তাতে যা আছে তার মঙ্গল এবং আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট তার অমঙ্গল হতে, আর তাতে যা রয়েছে তার অমঙ্গল হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদ ও কবরের আজাব হতে।" আর যখন তিনি ভোরে প্রবেশ করতেন, তখনও ঐরূপ বলতেন। বলতেন, "আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম এবং ভোরে প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে।" অপর এক বর্ণনায় আছে, "পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই দোজখের আজাব ও কবরের শাস্তি হতে।" –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ দোয়া দিবাভাগের শুরুতে পড়া হলে اَللَّيْلَةِ-এর স্থলে اَلْيَوْمِ পড়তে হবে। তথা এভাবে পাঠ করবে যে. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الْيَوْمِ الخ আর যেসব স্থানে اَللَّيْلَةِ হিসেবে مُؤَنَّثْ নেওয়া হয়েছে সেসব স্থানে مُذَكَّرْ পড়া হবে তথা هَا-এর স্থলে "ه" পড়া হবে। যেমন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرِ مَا فِيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ

وَعَنْ ٢٢٧٢ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيٰى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ)

২২৭২. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাত্রির শয্যা গ্রহণ করতেন, হাত গালের নীচে রাখতেন, অতঃপর বলতেন, "আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।" আবার যখন জাগতেন বলতেন, "আল্লাহর শোকর যিনি মারার পর আমাদেরকে জীবিত করলেন, আর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।" –[বুখারী, কিন্তু মুসলিম হযরত বারা (রা.) হতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ তথা 'তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন' এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু সংখ্যক ওলামা লিখেন– মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তির জন্য তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তবে এখানে نُشُوْر তথা ফিরে আসার দ্বারা এ উদ্দেশ্য নেওয়া সবচেয়ে উত্তম হবে যে, 'ঘুমাবার পর তা থেকে উঠে জীবিকা অন্বেষণ ও স্বীয় কাজকর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য; জীবনের ব্যতিব্যস্ততার অংশীদার হওয়ার জন্য।' গালের নীচে হাত রেখে শোয়ার ফলে যেহেতু অলসতা খুব বেশি স্থায়ী হয় না, তাই নবী করীম ﷺ স্বীয় ডান গালের নীচে ডান হাত রেখে ঘুমাতেন। এভাবে শোয়া ও জাগার পর জিকির ও দোয়া পড়ার হেকমত ও কারণ হলো, কাজের শুরু ও শেষ যেন আল্লাহ তা'আলার ইবদাতের মাধ্যমে হয়। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২০০]

وَعَنْ ٢٢٧٣ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَوٰى أَحَدُكُمْ إِلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا .

২২৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ বিছানায় আশ্রয় নেয়, তখন যেন স্বীয় লুঙ্গির ভিতর দিক দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না তার পর বিছানার উপর কি এসেছে। অতঃপর যেন বলে, "হে প্রভু! তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও, তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, রক্ষা কর তাকে যা দ্বারা রক্ষা কর তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে।" অপর বর্ণনায় আছে– অতঃপর যেন সে আপন ডান পার্শ্বের উপর শোয়, তৎপর বলে, "তোমারই নামে...... ইত্যাদি।" –[বুখারী ও মুসলিম]

অপর বর্ণনায় আছে, যেন তাকে লুঙ্গির ভিতর কিনার দ্বারা তিনবার ঝেড়ে নেয় এবং "যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও তাকে ক্ষমা করে দাও।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'লুঙ্গির ভিতরের কোনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাপড়ের সে অংশ যা কোনা বা ভিতরে থাকে এবং শরীরের সাথে লেগে থাকে। চাই তা লুঙ্গি হোক বা অন্য কোনো কাপড় হোক। আর লুঙ্গির ভিতরের অংশ দ্বারা

পরিষ্কার করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাহিরের অংশে যেন কোনো ময়লা না লাগে। কেননা এতে বাহিরের অংশ দেখতে অপরিষ্কার দেখা যাবে। এ ছাড়া ভিতরের অংশ দ্বারা ঝাড়লে বিছানার কোনো অংশ খোলারও প্রয়োজন হয় না। মূল কথা হলো, কোনো ব্যক্তি যখন বিছানায় আসে তখন কোনো কাপড় বা অন্য কিছু দ্বারা তা পরিষ্কার করে নেবে যাতে করে বিছানায় কষ্টদায়ক কোনো কিছু পড়ে থাকলে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি বিছানা পরিষ্কার করার মতো কোনো পৃথক কাপড় বা অন্য কিছু না পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে স্বীয় লুঙ্গি বা জামার বা অন্য কিছুর কোনা দ্বারা তা ঝেড়ে নিতে হবে।

মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন যেন কার্যত সে মৃত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তার রূহকে কবজ করে নেন তারপর জাগ্রত হওয়ার সময় তা ফিরিয়ে দেন তথা তাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেন। অথবা তার রূহকে রেখে দেন তথা তার রূহ কবজ করে নেন এবং সে ব্যক্তির উপর মৃত্যু জারি করে দেন। কাজেই এসব কারণে উল্লিখিত দোয়ায় এ আরজি পেশ করা হয় যে, হে আমার প্রতিপালক! শোয়া অবস্থায় যদি আমার রূহকে কবজ করে নাও তখন আমাকে ক্ষমা করে দিও। আর যদি ফিরিয়ে দাও তবে আমার প্রতি তোমার নেক বান্দাদের মতো দয়া প্রদর্শন কর তথা সৎকর্ম করার তৌফিক প্রদান কর তথা পাপ হতে ফিরিয়ে রেখ। আমার সকল কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা কর। এখানে "নেক বান্দা" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব বান্দা যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অনুগত, ইবাদত-বন্দেগিতে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করেন এবং তাদের জিম্মায় রক্ষিত বান্দাদের হকও আদায় করেন।

আর "ডান পার্শ্বে" শোয়ার হেকমত হলো, মানুষের কলব হলো বামদিকে- ডানদিকে শয়ন করলে তা ঝুলে থাকে ফলে ঘুমে অলসতা ও প্রশান্তি বেশি হয় না। তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য জাগ্রত হওয়া সহজ হয়ে যায়। আর বাম পার্শ্বে শোয়ার ফলে অন্তর নিজ স্থানে স্থির থাকে, যার ফলে ঘুমের অলসতা ও প্রশান্তি বেশি হয়। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২০১]

وَعَنْ ٢٢٧٤ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهٖ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ اِلٰى قَوْلِهٖ اَرْسَلْتَ وَقَالَ فَاِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ خَيْرًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৭৪. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যায় আশ্রয় নিতেন ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করতেন। অতঃপর বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমাতে সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম এবং তোমার [সাহায্যের] প্রতি আমি ভরসা করলাম– আগ্রহে ও ভয়ে। তুমি ছাড়া তোমার থেকে আশ্রয় পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার স্থান নেই। আমি বিশ্বাস করি তোমার কিতাবে যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার নবীকে যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে তা বলবে অতঃপর রাত্রির মধ্যেই মারা যাবে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। অপর বর্ণনায় আছে, হযরত বারা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নেবে তোমার নামাজের অজুর ন্যায় অজু করবে। অতঃপর তোমার ডান পার্শ্বের উপরে শয়ন করবে এবং বলবে, "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সমর্পণ করলাম" হতে "প্রেরণ করেছ" পর্যন্ত। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, যদি তুমি সেই রাতেই মৃত্যুবরণ কর তাহলে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি তুমি ভোরে উঠ, তবে কল্যাণের সাথে উঠবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٢٧٥ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِىَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِىَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২৭৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন, বলতেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন নির্বাহ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, অথচ এমন কত লোক রয়েছে যাদের না আছে কেউ প্রয়োজন নির্বাহক আর না আছে কেউ আশ্রয়দাতা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসের দোয়ার শেষ অংশের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর এ প্রশস্ত দুনিয়ায় এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে যে, তারা প্রতিদিনই সমস্যা সংকুল পরিস্থিতির স্বীকার। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ কষ্ট-ক্লেশ হতে নিরাপদ রাখেন না; বরং এগুলো তাদের উপর বিদ্যমান থাকে। এরা শুধু এই নৈমিত্তিক সমস্যায় নিপতিত হয়ে মহান আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয় না; বরং মহান আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী এরা নিজেদের মাথা গোঁজারও কোনো সহজ জায়গা পায় না। এরা রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, ফুটপাতে এবং বন-জঙ্গলে অতি কষ্টে জীবনযাপন করে। এরা না গরম হতে বাঁচতে পারে আর না শীতের কষ্ট-ক্লেশ হতে মুক্ত হতে পারে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২০২]

وَعَنْ ٢٢٧٦ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُوْا اِلَيْهِ مَا تَلْقٰى فِىْ يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى وَبَلَغَهَا اَنَّهٗ جَاءَهٗ رَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهٖ عَلٰى بَطْنِىْ فَقَالَ اَلَا اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَا اِذَا اَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلٰثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرَا اَرْبَعًا وَثَلٰثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৭৬. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) বলেন, একদা হযরত ফাতেমা (রা.) চাক্কি পিষতে তাঁর হাতে যে কষ্ট হয়, তার অভিযোগ করার জন্য নবী করীম ﷺ -এর নিকট গেলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, রাসূল ﷺ -এর নিকট যুদ্ধবন্দী গোলাম দল এসেছে, কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেলেন না, অতএব হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট তার উল্লেখ করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন আসলেন হযরত আয়েশা তাঁকে এ সংবাদ দিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ আমাদের নিকট আসলেন, তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছি। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক! অতঃপর তিনি আমার ও তার মধ্যখানে এসে বসলেন, যাতে আমি তাঁর পা মোবারকের শীতলতা আমার পেটে অনুভব করতে লাগলাম। এ সময় তিনি বললেন, আমি কি সন্ধান দেব না তোমাদেরকে তোমরা যা চেয়েছ তা অপেক্ষা উত্তম জিনিসের ; যখন তোমরা তোমাদের শয্যা গ্রহণ করবে, ৩৩ বার বলবে 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার বলবে 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার বলবে 'আল্লাহু আকবার', এটা তোমাদের পক্ষে চাকর অপেক্ষা উত্তম হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** নবী করীম ﷺ হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রা.) উভয়কে খুবই ভালোবাসতেন। এ মহব্বতের কারণে তিনি কষ্ট-ক্লেশের দিকে তাকাতেন না। এ কারণে যখন তিনি তাদের নিকট আগমন করলেন অধিক

মহব্বতের কারণে তিনি তাদের মধ্যস্থলে বসে পড়লেন, কেননা প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা কষ্ট দূর করে দেয়। এজন্য বলা হয় إِذَا جَاءَتِ الْأُلْفَةُ رُفِعَتِ الْكُلْفَةُ 'যখন ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তখন কষ্ট দূর হয়ে যায়।'

হাদীসে উল্লিখিত জিকিরসমূহের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা জাযারী (র.) শরহে মাসাবীহতে লিখেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ প্রথমে বলা হবে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, নামাজসমূহের শেষে প্রথমে سُبْحَانَ اللّٰهِ তারপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সর্বশেষে اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়া হয়, কিন্তু শয্যা গ্রহণের সময় প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়া উত্তম। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম লিখেন অধিক বিশুদ্ধ কথা হলো, اَللّٰهُ اَكْبَرُ কখনো প্রথমে কখনো শেষে পড়লে বর্ণনাসমূহের উপর আমল হয়ে যাবে।

'আর তোমার জন্য এটা খাদেম হতেও উত্তম' এর দ্বারা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে পার্থিব কষ্ট-ক্লেশ, দরিদ্রতা ও রোগ-শোকে ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধনী হতে ধৈর্যশীল ফকির অধিক উত্তম। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২০৩]

২২৭৭ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِيْنَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُكَبِّرِيْنَ اللّٰهَ أَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা হযরত ফাতেমা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট একটা চাকর চাইতে আসলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন পথ দেখাব না যা তোমার পক্ষে চাকর অপেক্ষা উত্তম হবে- প্রত্যেক নামাজের সময় ও শয়ন কালে বলবে- ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার।' -[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

২২৭৮ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَإِذَا أَمْسٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২২৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সকালে উঠতেন বলতেন, "হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সকালে উঠি এবং তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় পৌঁছি; তোমারই নামে আমরা বাঁচি এবং তোমারই নামে মরি, তোমারই দিকে আমাদের উত্থান।" -[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

২২৭৯ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ (رض) قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرْنِيْ بِشَيْءٍ أَقُوْلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ

২২৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাকে একটি দোয়ার নির্দেশ দিন যা আমি যখন সকালে উঠি এবং সন্ধ্যায় উপনীত হই তখন বলতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি বলবে, "আল্লাহ! যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, প্রত্যেক বস্তুর

كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ قُلْهُ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِيُّ)

পালক ও অধিকারী– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার মনের মন্দ হতে, শয়তানের মন্দ ও তাঁর শিরক হতে।" তুমি এটা বলবে যখন সকালে উঠবে, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করবে। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারেমী]

وَعَنْ ٢٢٨٠ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِاسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهٗ شَيْءٌ فَكَانَ اَبَانُ قَدْ اَصَابَهٗ طَرَفُ فَالِجٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهٗ اَبَانُ مَا تَنْظُرُ اِلَيَّ اَمَا اِنَّ الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلٰكِنِّيْ لَمْ اَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللّٰهُ عَلَيَّ قَدْرَهٗ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَاَبُوْ دَاوٗدَ) وَفِيْ رِوَايَتِهٖ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُمْسِيَ .

২২৮০. অনুবাদ : হযরত আবান ইবনে ওসমান (রা.) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে এবং প্রত্যেক রাত্রি সন্ধ্যায় তিনবার বলবে– "আল্লাহর নামে– যাঁর নামের সাথে জমিন ও আসমানে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি হচ্ছেন শ্রোতা ও জ্ঞাতা"– তাঁকে কোনো কিছুই ক্ষতি করে এমন হতে পারে না। পরবর্তী রাবী বলেন, আবানকে পক্ষাঘাত আক্রমণ করেছিল, তাই শ্রোতা তার দিকে দেখছিল। তখন হযরত আবান তাকে বললেন, আমার দিকে কি দেখছ? নিশ্চয়ই হাদীস আমি যা বর্ণনা করেছি তাই– তবে আমি সেদিন এটা বলিনি "যাতে আল্লাহ আমার উপর তাঁর পূর্ব নির্ধারণ কার্যকরী করেন।"

–[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবূ দাঊদ]

কিন্তু আবূ দাঊদের অপর বর্ণনায় আছে, সে রাতে তাঁর প্রতি কোনো আকস্মিক বিপদ পৌঁছবে না যে পর্যন্ত সকাল না হয়, আর যে তা সকালে বলবে তার প্রতি কোনো আকস্মিক বিপদ পৌঁছবে না যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা হয়।

وَعَنْ ٢٢٨١ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسٰى اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ

২২৮১. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন বলতেন, আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম আর রাজ্য সন্ধ্যায় উপনীত হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব বা শাসন, তাঁরই জন্য প্রশংসা আর তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার নিকট চাই এ রাতে যা আছে তার ভালো এবং এর পরে যা আছে তার ভালো, আর আমি তোমার নিকট পানাহ চাই এ রাতে যা আছে তার মন্দ হতে এবং তার পরে যা আছে তার মন্দ হতে।

وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكِبْرِ أَوِ الْكُفْرِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ وَالْكِبْرِ رَبِّ أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَتِهِ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ سُوْءِ الْكُفْرِ)

পরওয়াদেগার! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই অলসতা হতে এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে অথবা বলেছেন, কুফরির মন্দ হতে। আর অপর বর্ণনায় আছে, বার্ধক্যের মন্দ ও দাম্ভিকতা হতে। পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই দোজখের শাস্তি হতে এবং কবরের শাস্তি হতে। আর যখন তিনি সকালে উপনীত হতেন তখনও তা বলতেন, বলতেন; অবশ্য সকালে "আমরা সকালে উপনীত হলাম আর রাজ্যও সকালে উপনীত হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে।" –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী। তবে তিরমিযীর রেওয়ায়েতে مِنْ سُوْءِ الْكُفْرِ শব্দটির উল্লেখ নেই।]

وَعَنْ ٢٢٨٢ بَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُوْلُ قُوْلِي حِيْنَ تُصْبِحِيْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ حُفِظَ حَتّٰى يُصْبِحَ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২২৮২. অনুবাদ : নবী করীম ﷺ-এর কোনো কন্যা হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ তাকে শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, তুমি বলবে, যখন ভোরে উঠবে "আল্লাহর পবিত্রতা তাঁর প্রশংসার সাথে; কারো কোনো শক্তি নেই আল্লাহর শক্তি ছাড়া যা আল্লাহ চান তাই হয়, আর যা তিনি চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আর আল্লাহ সমস্ত জিনিসকে জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। যে সকালে উঠে একথা বলবে, সে হেফাজতে থাকবে যে পর্যন্ত সন্ধ্যায় উপনীত না হয়। আর যে সন্ধ্যায় একথা বলবে, সে সকাল হওয়া পর্যন্ত হেফাজতে থাকবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٢٨٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ إِلٰى قَوْلِهِ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِيْ لَيْلَتِهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২২৮৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি সকালে উঠে এ আয়াত পড়বে "সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা সকালে উঠ এবং আসমান ও জমিনে প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য আর বৈকালে এবং যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও– 'এরূপে তোমরা বের করা হবে'–পর্যন্ত।" সে লাভ করবে ঐ দিনে যা তার ছুটে গেছে, আর যে পড়বে তা যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, সে লাভ করবে যা তার ঐ রাতে ছুটে গেছে।
–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো সকালে পাঠ করবে [আয়াতগুলো হচ্ছে–]

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ . يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ . [সূরা রূম : ১৭-১৯]

সে উক্ত সকালের না করা নেক কাজ ও নিয়মিত অজিফা বা অন্যান্য আমলের ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। এমনিভাবে যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে তার অনুরূপ [যা সে নির্দেশিত করে আসছিল] করা আমলের ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

মা'আলিমুত তানযীল গ্রন্থে হযরত নাফ' হতে বর্ণিত আছে যে, ইবনে আরযাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত আছে কি যাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি উক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে বললেন যে, এ আয়াতে পাচ ওয়াক্ত নামাজ ও নামাজের সময় একত্রিত করা হয়েছে। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২০৬]

وَعَنْ ٢٢٨٤ أَبِىْ عَيَّاشٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمٰعِيْلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّاٰتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِىْ حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِىَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسٰى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ فَرَأٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُوْ عَيَّاشٍ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২২৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়্যাশ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে সকালে উঠে বলবে, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।" তার জন্য এটা ইসমাঈল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান হবে এবং তার জন্য দশটি পুণ্য লেখা হবে ও তার দশটি পাপ খণ্ডন করা হবে, আর তার দশটি মর্যাদা বুলন্দ করা হবে এবং সে শয়তান হতে হেফাজতে থাকবে- যে পর্যন্ত না সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়। আর যদি সে বলে যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, তার জন্য ঐরূপ হবে যে পর্যন্ত না সে সকালে উঠে। [রাবী বলেন,] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বপ্নে দেখল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ আইয়্যাশ আপনার নাম করে এই এই কথা বলে। রাসূল ﷺ বললেন, আবূ আইয়্যাশ সত্য বলেছে। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِسْمُ الرَّجُلِ [লোকটির নাম] : স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে উক্ত কথা জিজ্ঞেস করেছেন হযরত যায়েদ ইবনুস সামেত আনসারী (রা.)। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের সাহাবী। তাঁর মতো সাহাবীর স্বপ্নও দলিল হিসেবে গ্রহণীয়। -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৪২]

وَعَنْ ٢٢٨٥ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَكَلَّمَ أَحَدًا اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِىْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذٰلِكَ فَإِنَّكَ إِذَا مُتَّ فِىْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২২৮৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হারেছ ইবনে মুসলিম তামিমী তাঁর পিতা হতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি [রাসূল ﷺ] তাকে চুপে চুপে বললেন, যখন তুমি মাগরিবের নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করবে কারো সাথে কথা বলবার পূর্বে সাতবার বলবে- اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ "আল্লাহ! আমাকে দোজখ হতে বাঁচাও।" যখন তুমি তা বলবে অতঃপর ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করবে, তোমার জন্য দোজখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। এরূপে যখন তুমি ফজরের নামাজ পড়বে ঐরূপ বলবে অতঃপর যখন তুমি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ করবে, তোমার জন্য দোজখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٢٨٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ يَعْنِي الْخَسْفَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২২৮৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বাক্যগুলি পরিত্যাগ করতেন না, যখন তিনি সন্ধ্যায় উপনীত হতেন এবং যখন তিনি সকালে উঠতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা কামনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দীন, দুনিয়া, পরিজন ও মালসম্পদ সম্পর্কে নিরাপত্তা কামনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষসমূহ ঢেকে রাখ এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ হতে আমাকে নিরাপদে রাখ। হে আল্লাহ! তুমি আমার হেফাজত কর আমার সম্মুখ হতে, আমার পিছন দিক হতে, আমার ডানদিক হতে, আমার বামদিক হতে এবং আমার উপর দিক হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদার নিকট আশ্রয় চাই মাটিতে ধসে যাওয়া হতে।" –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٢٨٧ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا اَصَابَهُ فِيْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَاِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا اَصَابَهُ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২২৮৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে সকালে উঠে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি সকালে সাক্ষী করি তোমাকে এবং তোমার আরশবহনকারীদেরকে, তোমার অপর ফেরেশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে; তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তুমি এক, তোমার কোনো শরিক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল।" নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ঐ দিনে যে গুনাহ ঘটবে তা মাফ করবেন। আর যদি সে তা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলে, আল্লাহ তার ঐ রাতে যে গুনাহ সংঘটিত হবে তা মাফ করে দেবেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٢٢٨٨ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسٰى وَاِذَا اَصْبَحَ ثَلٰثًا رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

২২৮৮. **অনুবাদ :** হযরত ছাওবান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে কোনো মুসলমান বান্দা সন্ধ্যায় পৌছে এবং সকালে উঠে তিনবার বলবে– رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا "আমি আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে দীনরূপে ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে নবীরূপে পেয়ে খুশি হয়েছি।" নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতি অবধারিত হবে তিনি কিয়ামতের দিন তাকে খুশি করবেন। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আহমদ ও তিরমিযীর বর্ণনায় আছে نَبِيًّا আর আবূ দাউদসহ অন্যান্য বর্ণনায় আছে رَسُوْلًا কাজেই মুস্তাহাব হলো উভয়কে একসাথে করে نَبِيًّا وَ رَسُوْلًا পাঠ করা। আর একটি পাঠ করলেও হাদীসের উপর আমল হবে। −[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٢٨٩ حُذَيْفَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ)

২২৮৯. **অনুবাদ :** হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন হাত মাথার নীচে রাখতেন, অতঃপর বলতেন− "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রাখ যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে একত্র করবে।" অথবা তিনি বলেছেন, "তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবে।" −[তিরমিযী, কিন্তু আহমদ সাহাবি হযরত বারা (রা.) হতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম ﷺ স্বীয় হাতকে মাথা মোবারকের নীচে রাখতেন। আর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি হাতকে গাল মোবারকের নীচে রাখতেন। এ উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য হলো−

১. কখনো তিনি হাতকে স্বীয় মাথা মোবারকের নীচে রাখতেন আর কখনো স্বীয় গাল মোবারকের নীচে রাখতেন। যে রাবী যা দেখেছেন তাই বর্ণনা করেছেন।
২. অথবা, তিনি স্বীয় হাত মোবারকের কিছু অংশ মাথার নীচে আর কিছু অংশ গালের নীচে রেখে ঘুমাতেন। অতএব যে বর্ণনাকারী হাতের কিছু অংশকে মাথার নীচে দেখেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত মাথার নীচে রেখে ঘুমাতেন। আর যিনি হাতের কিছু অংশকে গালের নীচে দেখেছেন তিনি গালের নীচে রাখার কথা বর্ণনা করেছেন।

−[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২০৯]

وَعَنْ ٢٢٩٠ حَفْصَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২২৯০. **অনুবাদ :** হযরত [বিবি] হাফসা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নিদ্রা যাওয়ার ইচ্ছা করতেন ডান হাত গালের নীচে রাখতেন। অতঃপর তিনবার বলতেন− اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আজাব হতে রক্ষা কর যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবে।" −[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٢٩١ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২২৯১. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শয়নকালে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার মহান সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালামের স্মরণ নিয়ে আশ্রয় নেই, যা তোমার অধীনে আছে তার মন্দ হতে; হে আল্লাহ! তুমিই দূরীভূত কর ঋণের চাপ ও গুনাহের ভার। হে আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, তোমার ওয়াদা কখনো বরখেলাফ হয় না এবং কোনো সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমা হতে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে।" −[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٢٩٢ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ اَوْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ اَوْ عَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

২২৯২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে বিছানায় আশ্রয় গ্রহণকালে তিনবার বলে– اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করি।" আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করেন যদিও হয় অপরাধ সমুদ্র ফেনার ন্যায় অথবা বালু স্তূপের ন্যায় অথবা গাছের পাতার সংখ্যা অথবা দুনিয়ার দিনসমূহের সংখ্যার ন্যায় অধিক। –[তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : عَالِجٍ শব্দটির لام -এর উপরে যবর বা নীচে যের দিয়ে পড়া যায়। এটা একটা নির্দিষ্ট স্থান যা পশ্চিমাঞ্চলের একটি জঙ্গলের নাম। এ স্থানে অনেক বালু জন্মে। অত্র হাদীসে এসব কিছু উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, পাপ যত অধিকই হোক না কেন তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। আর عَدَدَ اَيَّامِ দ্বারা সম্ভবত এর সময় ও ওয়াক্ত উদ্দেশ্য। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২০৯]

وَعَنْ ٢٢٩٣ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهٗ بِقِرَاءَةِ سُوْرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلَّا وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ مَلَكًا فَلَا يَقْرُبُهٗ شَىْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتّٰى يَهُبَّ مَتٰى هَبَّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২২৯৩. **অনুবাদ :** হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে কোনো মুসলমান কিতাবুল্লাহর কোনো একটি সূরা পড়ে শয্যা গ্রহণ করবে নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। সুতরাং কোনো কষ্টদায়ক জিনিস তার নিকটে আসতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে জাগরিত হয়, যখন জাগরিত হয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম বাযযার হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, তুমি শোয়ার সময় সূরা ফাতেহা ও ইখলাস পাঠ করে নিও তাহলে যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে ততক্ষণ মৃত্যু ব্যতীত সব কিছু হতে নিরাপদ থাকবে।

ইমাম আবূ দাউদ, বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর মতে, হযরত আলী (রা.) হতে সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৫০]

وَعَنْ ٢٢٩٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ اَلَا وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ

২২৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দুটি বিষয়ে যে কোনো মুসলমান লক্ষ্য রাখবে, সে নিশ্চয় বেহেশতে যাবে। জেনে রেখ বিষয় দুটি সহজ, কিন্তু সম্পাদনকারীর সংখ্যা কম, প্রত্যেক নামাজের পর দশবার 'সুবহানাল্লাহ', দশবার

اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهٗ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهٗ عَشْرًا قَالَ فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهٖ قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ فِى اللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَّخَمْسُ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَاِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ يُسَبِّحُهٗ وَيُكَبِّرُهٗ وَيَحْمَدُهٗ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالُوْا وَكَيْفَ لَا نُحْصِيْهَا قَالَ يَاْتِىْ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا حَتّٰى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهٗ اَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَاْتِيْهِ فِىْ مَضْجَعِهٖ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهٗ حَتّٰى يَنَامَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ) وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ خَصْلَتَانِ اَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَكَذَا فِىْ رِوَايَتِهٖ بَعْدَ قَوْلِهٖ وَاَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ قَالَ وَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ وَيَحْمَدُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَيُسَبِّحُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَفِىْ اَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) ـ

'আলহামদু লিল্লাহ' ও দশবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আবদুল্লাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা হাতে গণনা করতে দেখেছি। রাসূল ﷺ বলেন, মুখে এটা [পাঁচ ওয়াক্তে] একশত পঞ্চাশ; কিন্তু কিয়ামতে মীযানের পাল্লায় এটা এক হাজার পাঁচশত আর যখন শয্যা গ্রহণ করবে বলবে, 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' [তিনটিকে মিলিয়ে] একশতবার। এটা মুখে একশত বটে; কিন্তু মীযানে এক হাজার। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কে একদিন এক রাতে দুই হাজার পাঁচশত গুনাহ করে? [অর্থাৎ কেউ এত গুনাহ করে না।] সাহাবীগণ বললেন, কেন আমরা এ দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে পারব না? তিনি বললেন, পরবে না এজন্য যে, তোমাদের কারো নিকট তার নামাজ অবস্থায় শয়তান এসে বলে, ঐ বিষয় স্মরণ কর, ঐ বিষয় স্মরণ কর, যে পর্যন্ত না সে নামাজ শেষ করে ফিরে। অতঃপর হয়তো সে তা না করে উঠে যায়। এরূপে শয়তান তার শয্যাকালে ঘুম পাড়াতে থাকবে, যে পর্যন্ত না সে [তা না করে] ঘুমিয়ে পড়ে।

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

আবূ দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, দুটি বিষয়, যে কোনো মুসলমান তার হেফাজত করবে.....। এরূপে তাঁর বর্ণনায় "মীযানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচশত" শব্দের পর রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– যখন সে শয্যা গ্রহণ করবে বলবে, 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার, 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার ও 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা : 'অতএব তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে?' এটা হচ্ছে উহ্য শর্তের জওয়াব। এ استفهام -এর মধ্যে একরকম اِنْكَارٌ বা অস্বীকার রয়েছে। কাজেই এ জুমলার মূল বক্তব্য হলো, যখন এ উভয় বিষয়কে হেফাজত করা হয় তখন এর বিনিময়ে প্রতিদিন ১৫০০ নেক অর্জিত হয় এবং প্রত্যেকটি নেকির বিপরীতে পাপ দূর হয়ে যায়। যেমনি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 'নিঃসন্দেহে ভালো কর্ম মন্দকে দূর করে দেয়।'

কাজেই তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে দিবারাত্রে এ নেকসমূহ হতে অধিক পাপ করবে? যত পাপই কর না কেন এ নেক কর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন। এ অবস্থায় তোমাদের জন্য একথা কিভাবে উত্তম হতে পারে যে, তোমরা এ দুটোকে সংরক্ষণ করবে না।

মূল কথা হলো, এ দুটোর উপর আমল করার কারণে পাপ যতই হোক না কেন? তা শুধু দূরই করে না; বরং সৎকর্মের অতিরিক্ততার কারণে তার মর্যাদাও উঁচু হয়ে যায়। কাজেই তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো এ কর্মের উপর আমল করতে থাকা।

এ দুটো কর্মের অধিক ছওয়াব ও মর্যাদার কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বলতে লাগলেন যে, কোনো বস্তুই আমাদেরকে এ দুই কর্ম করা হতে বিরত রাখতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ দুটো ছুটে যাওয়াকে অসম্ভব মনে করল। তখন নবী করীম ﷺ তাঁদের এ অসম্ভবকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, শয়তান হলো মানুষের চির শত্রু। কোনো মানুষ এরূপ মর্যাদা ও মহত্ত্ব অর্জন করুক শয়তান তা কখনো সহ্য করতে পারে না। ফলে সে মানুষকে নামাজের মধ্যে বিভিন্ন কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এমনভাবে অমনোযোগী করে যে, নামাজের পরও সে উক্ত চিন্তায় রত থেকে নির্দিষ্ট আমলের কথা ভুলে যায়। এমনিভাবে ঘুমানোর সময়ও তাকে উক্ত জিকির হতে অমনোযোগী করে ঘুমিয়ে দেয়। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২১১]

২২৯৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে সকালে উঠে বলল, হে আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি এবং তোমার অপর যে কোনো সৃষ্টির প্রতি যে নিয়ামত পৌঁছেছে তা একা তোমারই পক্ষ হতে, এতে তোমার কোনো শরিক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা এবং তোমারই শোকর- সে তার ঐ দিনের শোকর আদায় করল। আর যে সন্ধ্যায় পৌঁছে ঐরূপ বলল, সে তার এ রাত্রির শোকর আদায় করল। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٢٩٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهٖ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِىْ فَقَدْ اَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهٖ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত দাউদ (আ.) মহান আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনা করলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার অসংখ্য নিয়ামত আমি প্রাপ্ত হয়েছি, আমি এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা কিভাবে আদায় করব? তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে দাউদ! যখন এটা জানলে যে, তোমার নিকট যত অনুগ্রহ পৌঁছেছে সবই আমার পক্ষ হতে এসেছে তখন বুঝে নেবে যে, তুমি এগুলোর শোকর আদায় করেছ। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২১২]

২২৯৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন বলতেন, "হে আল্লাহ ! যিনি আসমানের প্রতিপালক, জমিনের প্রতিপালক তথা প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক, শস্য-বীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ উৎপাদক এবং তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাজিলকারক, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা তোমার অধিকারে আছে এমন প্রত্যেক মন্দের অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে। তুমি প্রথম- তোমার পূর্বে কেউ ছিল না; তুমি শেষ- তোমার পরে কেউ থাকবে না; তুমি প্রকাশ্য- তোমা অপেক্ষা প্রকাশ্য কোনো কিছুই নেই; তুমি গোপন- তোমা অপেক্ষা গোপনতর কিছুই নেই- তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর এবং আমাকে দরিদ্রতা হতে অমুখাপেক্ষী কর। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। মুসলিম সামান্য ভিন্নতাসহ।]

وَعَنْ ٢٢٩٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ اِخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : এখানে اَلزَّبُوْرُ-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত এটা (مُنْدَرِجٌ فِى التَّوْرَاةِ) তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে উল্লেখ করা হয়নি।

অথবা, এ গ্রন্থে শুধু উপদেশাবলি আছে কোনো বিধিবিধান নেই তা বুঝানো হয়েছে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৫৪]

وَعَنْ ٢٢٩٧ اَبِى الْاَزْهَرِ الْاَنْمَارِيِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَاَخْسَأْ شَيْطَانِىْ وَفُكَّ رِهَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدِيِّ الْاَعْلٰى . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২২৯৭. অনুবাদ : হযরত আবুল আযহার আনমারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, বলতেন– আল্লাহর নামে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার পার্শ্ব রাখলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমা হতে শয়তান তাড়িয়ে দাও। আমার ঘাড়কে মুক্ত কর এবং আমাকে উচ্চ পরিষদে স্থান দাও। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : এখানে رِهَانِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো نَفْس বা আত্মা তথা আমাকে জনগণের হক হতে মুক্ত কর। আমার ছোটখাট অপরাধ ক্ষমা কর এবং তোমার শাস্তি হতে মুক্তি দান কর। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২১২]

وَعَنْ ٢٢٩٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهٗ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ وَاٰوَانِىْ وَاَطْعَمَنِىْ وَسَقَانِىْ وَالَّذِىْ مَنَّ عَلَىَّ فَاَفْضَلَ وَالَّذِىْ اَعْطَانِىْ فَاَجْزَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗ وَاِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২২৯৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, বলতেন– "আল্লাহর শোকর যিনি আমার প্রয়োজন নির্বাহ করলেন, আমাকে রাতে আশ্রয় দিলেন, আমাকে খাওয়ালেন, আমাকে পান করালেন, যিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং বহু অনুগ্রহ করলেন, যিনি আমাকে দান করলেন এবং যথেষ্ট দান করিলেন। সুতরাং আল্লাহর শোকর প্রত্যেক অবস্থায়। হে আল্লাহ! যিনি প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও তার অধিকারী এবং প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য, আমি তোমার নিকট দোজখের আগুন হতে আশ্রয় চাই।" –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : قَوْلُهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ এ বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকল বিপদ-আপদ, মসিবত ও কষ্টকর অবস্থাতে শোকর করা ওয়াজিব। কেননা এর মাধ্যমে পাপ মুছে যায় অথবা মর্যাদা উঁচু হয়। কিন্তু জাহান্নামিরা এর বিপরীত। কেননা তারা দুনিয়াতে থাকবে পাপে লিপ্ত আর পরকালে শাস্তিতে নিমজ্জিত এতে কোনো কৃতজ্ঞতা নেই; বরং আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও সিদ্ধান্তের উপর ধৈর্যধারণ ব্যতীত কোনো উপায় নেই। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৫৮]

وَعَنْ ٢٢٩٩ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ شَكٰى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْاَرَقِ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا

২২৯৯. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, একদা হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) নবী করীম ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতে আমার ঘুম আসে না। তখন আল্লাহর নবী ﷺ

اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِىْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَوْ اَنْ يَبْغِىَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ وَالْحَكِيْمُ بْنُ ظُهَيْرٍ الرَّاوِىْ قَدْ تَرَكَ حَدِيْثَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ)

বললেন, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নেবে বলবে, "হে আল্লাহ! যিনি সপ্ত আসমানের ও তারা যাকে ছায়া দিয়েছে তার প্রভু এবং জমিনসমূহ ও তারা যাকে ধারণ করেছে তার প্রভু; সকল শয়তান ও তারা যাদের পথভ্রষ্ট করেছে তাদের প্রভু– তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর, তোমার সমস্ত সৃষ্টির মন্দ প্রভাব হতে– তাদের কেউ যে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করবে অথবা আমার প্রতি অবিচার করবে। বিজয়ী সে যাকে তুমি নিরাপত্তা দান করেছ। মহান তোমার প্রশস্তি। তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। –[তিরমিযী। তিনি বলেন, এর সনদ সবল নয়। কোনো কোনো হাদীস বিশেষজ্ঞ এর রাবী হাকীম ইবনে যহীরকে মাতরূক বা ত্যাজ্য বলেছেন।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣٠٠ اَبِىْ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ اِذَا اَمْسٰى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৩০০. অনুবাদ : হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ সকালে উঠে সে যেন বলে, "আমরা সকালে উপনীত হলাম আর রাজ্যও সকালে উপনীত হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এ দিনের মঙ্গল, তার সফলতা ও সাহায্য, তার জ্যোতি, তার বরকত ও তার হেদায়েত এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই তাতে যা অমঙ্গল রয়েছে তা হতে এবং তার পরে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হতে।" অতঃপর যখন সে সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখনও যেন ঐরূপ বলে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٣٠١ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يَا اَبَتِ اَسْمَعُكَ تَقُوْلُ كُلَّ غَدَاةٍ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تُكَرِّرُهَا ثَلٰثًا حِيْنَ تُصْبِحُ وَثَلٰثًا حِيْنَ تُمْسِىْ فَقَالَ يَا بُنَىَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهِنَّ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৩০১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আবদুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা [নুফাই ইবনুল হারিছ] (র.) বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে আমার পিতা! আপনাকে প্রত্যহ সকালে বলতে শুনি, "হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখ আমার শরীরগতভাবে; হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখ আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে; হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখ আমার দৃষ্টিশক্তিতে, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই।" এটা সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার বলেন। তখন তিনি বললেন, বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বাক্যগুলোর দ্বারা দোয়া করতে শুনেছি। সুতরাং আমি তাঁর নিয়ম পালন করাকে ভালোবাসি। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٣٠٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اَصْبَحَ قَالَ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةُ لِلّٰهِ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَا لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَاَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَاٰخِرَهُ فَلَاحًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِىْ كِتَابِ الْاَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السُّنِّيِّ -

২৩০২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সকালে উপনীত হতেন বলতেন, "আমরা সকালে উপনীত হলাম, আর সকালে উপনীত হলো রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আল্লাহর জন্য প্রশংসা। আল্লাহর জন্য বড়ত্বের অধিকার ও সম্মান। আল্লাহর জন্য সৃষ্টি ও [তার] কর্তৃত্ব, রাত্রি ও দিন এবং তাতে যা বসবাস করে। হে আল্লাহ! তুমি এই দিনের প্রথমাংশকে কর কল্যাণযুক্ত ও মধ্যমাংশকে কর সাফল্যের কারণ এবং শেষাংশকে কর সাফল্যময়। ইয়া আরহামার রাহিমীন।" –নববী কিতাবুল আযকারে ইবনে সুন্নীর রেওয়ায়েতে উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** একটি হাদীসে এসেছে যে, যে দোয়া يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -এর মাধ্যমে সমর্পণ করা হয়, তা তাড়াতাড়ি কবুল হয়। এ কারণেই নবী করীম ﷺ এ দোয়াকে অত্র কথার মাধ্যমে সমর্পণ করেন।

ইমাম হাকেম মুসতাদরাক কিতাবে হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর মাধ্যমে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ পাঠকারীর জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব কোনো ব্যক্তি এ বাক্য তিনবার বললে উক্ত ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে বলেন, اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ তোমার দিকে মনোনিবেশ করেছেন কাজেই তুমি যা চাওয়ার তা চেয়ে নাও।

وَعَنْ ٢٣٠٣ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا اَصْبَحَ اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ)

২৩০৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবযা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরে উঠে বলতেন, "আমরা ভোরে উঠলাম ইসলামের স্বভাবের উপর, কালেমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দীনের উপর এবং হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর একনিষ্ঠ দীনের উপর। তিনি মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না।"

–[আহমদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'ফিতরাত' অর্থ– সত্য কবুল করার বৃত্তি বা ক্ষমতা। সত্য অর্থে ইসলামকেই বুঝায়। "মুহাম্মদের দীনের উপর" উম্মতগণের শিক্ষার জন্য এরূপ বলেছেন, অথবা নিজের নবুয়তে নিজে বিশ্বাস করারও নিয়ম রয়েছে তাই। "ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর" হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর তথা সমগ্র আরব জাতির পূর্বপুরুষ। রাসূল ﷺ -এর দীন মূলত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনেরই পূর্ণ সংস্করণ। 'হানীফ' –যিনি সমস্ত বাতিল মতবাদ ও বাতিল মা'বূদ হতে বিমুখ হয়ে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরান।

بَابُ الدَّعَوَاتِ فِى الْاَوْقَاتِ

পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন সময়ের দোয়া প্রসঙ্গে

وَقْت সে সময়কে বলে যাকে কোনো কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আর এখানে সেসব দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে যা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত। যেমনি নির্দিষ্ট সময়ের দোয়া আছে, তেমনি নির্দিষ্ট অবস্থায়ও দোয়া আছে। এসব দোয়া নিয়মিত পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সুন্নত। যদি তা সম্ভব না হয় অন্তত একবার পালন করা একান্ত আবশ্যক, তাহলে নবী করীম ﷺ -এর অনুসরণের সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٣٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْتِىَ اَهْلَهٗ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهٗ اِنْ يُّقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهٗ شَيْطَانٌ اَبَدًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩০৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি তোমাদের কেউ যখন আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময় বলে "বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখ এবং শয়তানকে আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছ তা হতে দূরে রাখ।" এতে যদি তাদের জন্য কোনো সন্তান নির্ধারিত হয় তাকে কখনো শয়তান কষ্ট দিতে পারবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীসের মাধ্যমে যদি এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, অধিকাংশ মানুষই তো এ দোয়া করে তথাপি সন্তান শয়তানের প্রতারণা ও ক্ষতি হতে মুক্ত হতে পারে না এর কারণ কি?

এর জবাব হলো, 'শয়তান তার ক্ষতি করতে পারে না' এর অর্থ হলো শয়তান তাকে কুফরির মধ্যে নিয়ে যেতে পারে না। এ কারণে অত্র হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সহবাসের সময় আল্লাহ তা'আলার জিকিরের বরকতে সন্তানসন্ততির শেষ পরিণাম চির কল্যাণকর হয়।

অথবা, এর অর্থ হলো, শয়তান উক্ত সন্তানকে পাগল ও হাত-পা বাঁকা করার মাধ্যমে কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হয় না।

১. ইমাম জাওযী (র.)-এর মতে এর উদ্দেশ্য হলো, শয়তান উক্ত ব্যক্তির সন্তানের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমনি শয়তান অন্যান্যদেরকে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও দীনি বিষয়ে ক্ষতি করে থাকে।

২. কারো মতে এর অর্থ হলো, সন্তান জন্মের সময় শয়তানের কঠিন খোঁচা হতে মুক্ত থাকা, যার ফলে সন্তান জন্মের সময় খুবই কান্নাকাটি করে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২১৫]

٢٣٠٥ - وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩০৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদের সময় এরূপ বলতেন, "মহান সহিষ্ণু আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের রব। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, যিনি সকল আসমান ও জমিনের রব এবং মহান আরশের রব।" –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] :

একটি প্রশ্ন : ইমাম নববী (র.) বলেন, অত্র হাদীসে শুধুমাত্র ذِكْر উল্লিখিত হয়েছে دُعَاء নয়, অথচ বিপদের সময় দোয়া হওয়া আবশ্যক।

উত্তর. এর জবাব নিম্নরূপ–

১. এ ذِكْر দ্বারা دُعَاء শুরু করা হয়েছে তারপর তিনি বলেন–

ثُمَّ يَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الدُّعَاءِ كَمَا رَوَاهُ اَبُوْ عَوَانَةَ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدَ ذٰلِكَ .

২. ذِكْر ও দোয়ার হুকুমে। কেননা كَرِيْم -এর প্রশংসা سُؤَال -এরই অর্থে।

وَمِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ اَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ الخ

৩. অথবা, এটা এ পদ্ধতিতে দোয়া–

كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ .

৪. অথবা, এটাও বলা যায় যে,

اِنَّهُ ثَنَاءٌ بِاللِّسَانِ وَالدُّعَاءُ بِالْجِنَانِ . اَوْ بِالْاِعْتِمَادِ عَلَى الْمَلِكِ الْمَنَّانِ كَمَا وَرَدَ اَنَّهُ قِيْلَ لِاِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ . لِمَا لَا تَسْاَلُ رَبَّكَ الْجَلِيْلَ فَقَالَ حَسْبِىْ مِنْ سُؤَالِىْ عِلْمُهُ بِحَالِىْ .

–[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৭]

وَعَنْ ٢٣٠٦ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ (رضـ) قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ وَاَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ اَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩০৬. **অনুবাদ :** হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নিকট দুই ব্যক্তি একে অন্যকে মন্দ বলতে লাগল– তখন আমরা তাঁর নিকট বসা। এদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার সহচরকে মন্দ বলছিল খুব রাগান্বিত অবস্থায়, যাতে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি যদি সে বলে তার রাগ চলে যাবে, তা এই– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই বিতাড়িত শয়তান হতে।" তখন সাহাবীগণ লোকটিকে বললেন, তুমি কি শুনছ না নবী করীম ﷺ কি বলছেন? সে বলল আমি ভূতগ্রস্ত নই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنِّىْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ **-এর ব্যাখ্যা :** ইমাম নববী (র.) বলেন, اِنِّىْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ বক্তব্যের বক্তা হলেন এমন এক ব্যক্তি যার অন্তঃকরণ শরিয়তের আলোতে আলোকিত নয় এবং দীনের সঠিক জ্ঞানও সে অর্জন করেনি। এছাড়াও সে এ ধারণা করেছিল যে, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ টি جُنُوْن -এর সাথে নির্দিষ্ট অথচ রাগও যে শয়তানের খোঁচা থেকে হয় আর এর জন্য اِسْتِعَاذَة একান্ত আবশ্যক।

* ইমাম তীবী (র.) বলেন, এ কথার কথক এক মুনাফিক।

* অথবা, সে ছিল গ্রাম্য অসভ্য ব্যক্তি।

* কিন্তু আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে যে, إِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رضـ) অর্থাৎ তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)। আর তখন এটা বলা হবে যে, এ কথাটি তার অত্যধিক রাগ, কম ধৈর্য ও অভদ্রতার কারণে প্রকাশিত হয়েছে।

অথবা, এ কথাটি তার ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে, যখন ইসলামের সকল বিধিবিধান তিনি জানতেন না। অথচ পরবর্তীতে তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর সোহবতের বরকতে বড় বড় সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। যার সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন- أَعْلَمُ أُمَّتِيْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رضـ)

পরবর্তীতে তাকে নবী করীম ﷺ ইয়েমেনের গভর্নরও বানান। -[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৭]

وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ إِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَقُلْ "اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" .

وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَرَّرَ فِيْهِ قَوْلُهُ "وَطَلَبَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُوْصِيَهُ فَقَالَ لَهُ لَا تَغْضَبْ فَأَعَادَ ذٰلِكَ فَقَالَ لَا تَغْضَبْ" . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

-[মিরকাত : খ. ৫, পৃ: ২৩৮]

وَعَنْ ٢٣٠٧ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَإِنَّهُ رَأٰى شَيْطَانًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমরা মোরগের আওয়াজ শুনবে আল্লাহর আশীর্বাদ ভিক্ষা করবে, কেননা মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার চিৎকার শুনবে তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইবে, কেননা সে শয়তান দেখেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এ হাদীসের অর্থ হলো, মোরগ ফেরেশতা দেখে আওয়াজ দেয়। কাজেই তোমরা সে সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া কর যাতে করে তাঁরা আমীন বলতে পারে, তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে এবং তাঁরা তোমাদের অনুনয়-বিনয় ও একনিষ্ঠতার সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে। এজন্য উত্তম হলো, (صَالِحُوْنَ) সৎকর্মশীলগণ উপস্থিত হলে দোয়া প্রার্থনা করা, কেননা তাদের মর্যাদার কারণে তথায় দোয়াতে আল্লাহ তা'আলার রহমত নাজিল হয়।

আর যখন গাধার আওয়াজ শুনতে পাও তখন أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ কর। কেননা সে শয়তানকে প্রত্যক্ষ করে।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, বুজুর্গ লোকদের উপস্থিতিতে রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয়। তখন উত্তম হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট রহমত ও বরকত কামনা করা। আর কাফেরদের সাথে গজব ও আজাব নাজিল হয়, তখন তাদের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় তাদের অমঙ্গল ও ক্ষতি হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মোরগের আওয়াজ আল্লাহ তা'আলার জিকিরকারীদের নিকটতম। কেননা তারা অধিকাংশ সময় নামাজের সময়ের হেফাজত করে। আর গাধার আওয়াজ হলো সবচেয়ে মন্দ যেমন কুরআনে এসেছে- إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ কেননা গাধার আওয়াজ আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে দূরে রাখার কারণ। এজন্য গাধার আওয়াজকে জাহান্নামে অবস্থানরত কাফেরদের আওয়াজের সাথে তুলনা করে মহান আল্লাহ বলেন- لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ

-[মিরকাত ও মাযাহেরে হক]

وَعَنْ ٢٣٠٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا اِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩০৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হওয়ার কালে যখন উটের উপর স্থির হয়ে বসতেন তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। অতঃপর বলতেন, "আল্লাহর প্রশংসা যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা তাকে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এ সফরে তোমার নিকট পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কর্ম যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি আমাদের এ সফরকে সহজ কর এবং এর দুরত্ব হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরে আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার ও মাল-সম্পদে আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য ও ধনে-জনে অশুভ পরিবর্তন হতে।" আর যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন তখনও তা বলতেন এবং তাতে অধিক বলতেন, "আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের পরওয়ারদেগারের প্রশংসাকারীরূপে।" -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ বাহনের উপর উঠে اَللّٰهُ اَكْبَرُ তিনবার বলতেন। সম্ভবত এর হিকমত হলো, এটা তো উঁচু স্থান আর এতে বড়ত্ব রয়েছে, ফলে মহান স্রষ্টার বড়ত্ব এখানে উপস্থিত হয়েছে। আর অপর হাদীসও এর সহায়ক হয় যে- اِنَّ الْمُسَافِرَ اِذَا صَعِدَ عَالِيًا كَبَّرَ وَاِذَا نَزَلَ سَبَّحَ

অথবা, এরূপ জানোয়ার বাধ্যগত করবার ফলে আশ্চর্য হয়ে আল্লাহু আকবার বলেছেন, আর এ মত হযরত আলী (রা.) কর্তক বর্ণিত হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ اِذَا وَضَعَ رِجْلَهٗ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَاِذَا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ .

তারপর বলতেন তথা কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত ও দোয়া পড়তেন তা অত্র আয়াতের আদেশের কারণে যথা-

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ لِتَسْتَوُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ .

-[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৬৯]

وَعَنْ ٢٣٠٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩০৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজেস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে চলতেন, সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের মন্দ, ভালোর পর খারাপ, অত্যাচারিতের দোয়া এবং পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে মন্দ দৃশ্য হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ -এর ব্যাখ্যা : (بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْكَافِ) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়–

১. বেশির পরে কম।
২. সংঘবদ্ধ থাকার পরে পৃথক হওয়া।
৩. কারো মতে, কোনো বিষয় সংশোধনের পর বিপর্যয় বা বিশৃঙ্খল হওয়া।
৪. কারো মতে, জামাতের সাথে সংঘবদ্ধ থাকার পর প্রত্যাবর্তন করা।
৫. অথবা, ঈমান থেকে কুফরির দিকে।
৬. অথবা, পাপ হতে তওবার পরে পুনরায় পাপে প্রত্যাবর্তন করা।
৭. অথবা, স্মরণের পর অমনোযোগিতার দিকে।
৮. অথবা, উপস্থিতির পর অনুপস্থিতির দিকে।
৯. আনুগত্য হতে পাপাচারিতার দিকে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৭৪]

২৩১০. وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩১০. **অনুবাদ :** [সাহাবিয়া] হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে বলে, "আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে।" তাকে কোনো জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না সেই স্থান হতে প্রস্থান করা পর্যন্ত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ দ্বারা উদ্দেশ্য : এর দ্বারা উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ যা ইমাম নববী (র.) উল্লেখ করেছেন–

১. এমন কালাম যাতে কোনো দোষ-ত্রুটি প্রবেশ করেনি।
২. অথবা, পরিপূর্ণ উপকারী কালাম।
৩. কারো মতে, পবিত্র কুরআন।
৪. তবে সঠিক প্রকাশ্য কথা হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَسْمَاءُهُ وَصِفَاتُهُ اَوْ كُتُبُهُ তথা আল্লাহ তা'আলার নাম, গুণাবলি অথবা তাঁর কিতাব। কেননা এগুলো হলো কাদীম তাতে কোনো نَقْص বা ত্রুটি নেই।
৫. কারো মতে, তার কালামে নাফসী অথবা তার ইলম অথবা তার ফয়সালাসমূহ। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৭৫]

২৩১১. وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ اَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩১১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত রাতে বিচ্ছুতে আমি কষ্ট পেয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে, "আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে।" তবে তোমাকে তা কষ্ট দিতে পারত না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ এ কালিমা সন্ধ্যার সময় তিনবার পাঠ করবে ঐ রাতে তাকে কোনো বিষাক্ত জীবের বিষ ক্ষতি করতে পারবে না। অপর এক বর্ণনায় সকালে পাঠ করলে উক্ত দিন বিষাক্ত জানোয়ারের আঘাত হতে মুক্ত থাকবে।

হযরত মুফাজ্জল ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এটি পাঠ করবে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত হবে যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সে ব্যক্তি সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা প্রাপ্ত হবে।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২১৯]

وَعَنْهُ ٢٣١٢ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُوْلُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩১২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ যখন সফরে থাকতেন এবং সকালে উপনীত হতেন বলতেন, শ্রবণকারী শ্রবণ করুক [এবং সাক্ষী থাকুক] আমরা যে আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং আমাদের প্রতি তাঁর মহাদানের স্বীকৃতি জানাচ্ছি। "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সাথী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমরা আল্লাহর নিকট দোজখের আগুন হতে পানাহ চাই।" –[মুসলিম]

وَعَنِ ٢٣١٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩১৩. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো যুদ্ধ, হজ বা ওমরা হতে ফিরতেন, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তিনবার তাকবীর বলতেন, অতঃপর বলতেন, "আল্লাহ ভিন্ন কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আমরা ফিরছি তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারেরই প্রশংসাকারী রূপে। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছেন, জয়ী করেছেন তাঁর বান্দাকে এবং পরাজিত করেছেন সম্মিলিত শক্তিকে একা।" –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ দ্বারা উদ্দেশ্য : وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ দ্বারা খন্দকের যুদ্ধের কাফেরদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। এ যুদ্ধে ১২ হাজার কাফের মক্কা হতে মদিনায় রওয়ানা হয়েছিল। পথিমধ্যে ইহুদি সম্প্রদায় ব্যতীত আরো অনেক গোত্র তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। তারা অহংকার ও গর্ব ভরে মুসলমানদের ধ্বংস করার মানসে মদিনায় এসে অবরোধ সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ রাতের অন্ধকারে এমন বাতাস পাঠিয়ে দেন যা তাদের মুখমণ্ডলের উপর ধুলাবালি নিক্ষেপ করে, তাদের প্রজ্বলিত আগুন নিভিয়ে ফেলে, তাঁবুসমূহের খুঁটি উড়িয়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যারা কাফেরদের ঘোড়াসমূহের নিকট জোরে اَللّٰهُ أَكْبَرُ ধ্বনি দেয়। ফলে ঘোড়াসমূহ পালিয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেন। অবশেষে তারা ব্যর্থ মনোরথ ও পরাজিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا .

কারো মতে এর দ্বারা সকল যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের পরাজয় উদ্দেশ্য। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৮০]

وَعَنْ ٢٣١٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رض) قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩১৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) বলেন, আহযাব যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের প্রতি বদদোয়া করে বলেছেন– "হে কিতাব অবতীর্ণকারী ও সত্বর বিচারকারী আল্লাহ! হে আল্লাহ! তুমি পরাজিত কর সম্মিলিত শক্তিকে; হে আল্লাহ! পরাজিত কর তাদেরকে এবং পদস্খলিত কর তাদেরকে।" –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٣١٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رض) قَالَ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ فَقَرَّبْنَا اِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَاْكُلُهُ وَيُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ فَجَعَلَ يُلْقِى النَّوٰى عَلٰى ظَهْرِ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ثُمَّ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ اَبِىْ وَاَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ اللّٰهَ لَنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতার নিকট পৌঁছলেন। আমরা তাঁর নিকট কিছু রুটি ও মলীদা পেশ করলাম। তিনি তার কিছু খেলেন, অতঃপর তাঁর নিকট কিছু খেজুর উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি তা খেতে লাগলেন এবং তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি মিলিয়ে তাদের মধ্যখান দিয়ে তার বিচি ফেলতে লাগলেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু পানীয় আনা হলো এবং তিনি তা পান করলেন। [তিনি যখন রওয়ানা হলেন,] আমার পিতা তাঁর সওয়ারির লাগাম ধরে বললেন, হুজুর! আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কিছু দোয়া করুন! তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছ তাতে তুমি বরকত দাও এবং তাদেরকে মাফ কর ও দয়া কর।" –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَطْبَة-এর অর্থ : وَطْبَة কি রকম খাবার এ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে–

১. কারো মতে, এটা خَبِيْص-এর মতো একপ্রকার খাবার। একে وَطْبَة বলার কারণ হলো, এটা খাওয়ার সময় হাতের সাথে লেগে যায়।

২. ইমাম নববী (র.) বলেন, এটা حَيْس-ই যা খেজুর, পনির ও ঘি দ্বারা তৈরি হয়।

৩. কারো মতে, এটা হায়েসের মতো একপ্রকার খাবার যা খেজুর হতে তৈরি।

৪. কারো মতে, এটা হলো اَلْوَطِيْئَةُ سَفِيْنَةٌ-এর মতো। এটা বিচি বের করা খেজুরকে দুধের সাথে পেষণ করে তৈরি খাবার। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৮১]

قَوْلُهُ وَيُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ খেজুর খাওয়ার সময় বাম হাতের আঙ্গুলসমূহের উপর একত্রিত করতেন। এক বর্ণনা তো এরকমও আছে যে, তিনি খেজুরের দানাগুলোকে উভয় আঙ্গুলের মাঝে রাখতেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি খেজুরের বিচিগুলোকে উক্ত আঙ্গুলের পিঠের দিক দিয়ে ফেলে দিতেন। কাজেই এটা বুঝা যায় যে, তিনি বিচিগুলোকে কখনো উভয় আঙ্গুলের মাঝে রাখতেন আর কখনো উভয় আঙ্গুলের পিঠের দিক দিয়ে ফেলে দিতেন অতএব উভয় বর্ণনার মাঝে কোনো বিরোধ নেই।

আর আঙ্গুলের পিঠের দিকে ফেলার হেকমত হলো, বিচিগুলোতে লাগা মুখের লালা যেন আঙ্গুলের পেটে লাগতে না পারে এতে খাওয়ার আদবের অমনোযোগিতা হেতু বাকি খাবারের প্রতি অন্তরে মন্দভাব সৃষ্টি হতে থাকে। এছাড়া হাতের ভিতরের অংশ পিঠের অংশ হতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক হতে উত্তম।

অত্র হাদীসে মেহমান ও মেজবান উভয়ের জন্য কয়েকটি সুন্নত রয়েছে। যেমন–

মেহমানের সওয়ারির লাগাম নম্রতার সাথে ধরা এবং মেহমানের বিদায়ের সময় দরজা বা স্থানের বাইরে কিছু দূর তার সাথে সাথে গমন করা।

আর মেহামানের জন্য সুন্নত হলো মেজবান যদি দোয়া চায় তবে দোয়া করা। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২২১]

তবে ফকিরকে কিছু দান করে দোয়া চাওয়া ঠিক নয়। কেননা তাহলে দোয়াটি দানের বিপরীত হয়ে যাবে। কিন্তু মেহমানদারি দানের অনেক ঊর্ধ্বে, ফলে সেখানে দোয়া মেহমানদারির বিপরীত হবে না।

আর যদি ফকির দানের ফলে দোয়া করে [যা করা সুন্নত] তবে দানকারীও যেন দোয়া করে দেয়, তাহলে তা সদকার বিপরীত হবে না। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৮২]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣١٦ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২৩১৬. অনুবাদ : হযরত ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন বলতেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে উদয় কর আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে।" [হে চাঁদ!] আমার প্রভু ও তোমার প্রভু এক আল্লাহ। –[তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : هِلَالٌ বলা হয় নতুন চাঁদ তথা ১ম, ২য় ও তৃতীয় রাতের চাঁদকে, আর قَمَرٌ বলা হয় এর পরের [বা সকল রাতের] চাঁদকে, আর بَدْر বলা হয় পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে। অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নবী করীম ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন।

এ দোয়ার মূল হলো, হে মহান আল্লাহ! এ মাসে আমাকে ঈমান ও নিরাপত্তার সাথে সকল বিপদাপদ থেকে তুমি দূরে রাখ এবং ইসলামের সকল বিধিবিধানের উপর দৃঢ়পদ রাখ। এরপর রাসূল ﷺ চাঁদকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার ও তোমার রব আল্লাহ তা'আলা। আমি যেভাবে তাঁর একজন মাখলূক তুমিও তাঁর সৃষ্ট। এর মাধ্যমে তিনি সেই সব মানুষের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন, যারা চাঁদ ও সূর্যের পূজা করে এবং এগুলোকে নিজেদের উপাস্য ও রব মনে করে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২২১]

وَعَنْ ٢٣١٧ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا اِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءُ كَائِنًا مَا كَانَ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ الرَّاوِيْ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ـ

২৩১৭. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্তকে দেখে বলবে, "আল্লাহর শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন" তার প্রতি ঐ বিপদ কখনও পৌঁছবে না সে যেখানেই থাকুক না কেন। –[তিরমিযী। ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব এবং তার রাবী আমর ইবনে দীনার সবল নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত ও সমস্যায় জর্জরিতকে দেখে এ দোয়া পড়ে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا তবে সে উক্ত মসিবতে আক্রান্ত হবে না। চাই উক্ত বালামুসিবত শারীরিক হোকনা কেন যেমন- শ্বেত, কুষ্ঠ, অন্ধত্ব ইত্যাদি। পার্থিব যেমন- অর্থসম্পদ ও মান-মর্যাদা, মহব্বত, লোভ-লালসা ইত্যাদি। অথবা দীনি যথা- পাপাচারিতা, অবিচার, শিরক, কুফরি ইত্যাদি। তথা সকল প্রকারের বিপদগ্রস্ত ও সমস্যায় জর্জরিতকে দেখে এ দোয়া পড়তে হবে। তবে আলেমগণ এ কথা বলেছেন যে, কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে এ দোয়া নিম্নস্বরে পাঠ করতে হবে যাতে করে উক্ত ব্যক্তি মনে কোনো ব্যথা না পায়। আর যদি এমন ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে পাপাচারিতা ও পার্থিব বিষয়ে একেবারে লেগে পড়েছে, তবে তখন এ দোয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করবে যাতে সে নিজের অবস্থার উপর লজ্জিত হয় এবং তা হতে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলে যদি কোনো ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তবে তখনও নিম্নস্বরে পাঠ করবে। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২২২]

وَعَنْ ٢٣١٨ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهٗ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنٰى لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ مَنْ قَالَ فِيْ سُوْقٍ جَامِعٍ يُبَاعُ فِيْهِ بَدَلَ مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ ـ

২৩১৮. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলে, "আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।" আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ পুণ্য লেখবেন, দশ লক্ষ পাপ মুছে দেবেন, অধিকন্তু তাঁর দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং বেহেশতে তাঁর জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করবেন। -তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আর শরহে সুন্নায় 'বাজার' শব্দের স্থলে রয়েছে 'বড় বাজার' যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এরূপ ছওয়াব পাওয়ার কারণ হলো, বাজার হলো অমনোযোগিতার স্থান। এ ছাড়া এখানে মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা ইত্যাদি খুব বেশি হয় এবং শয়তান সেখানে রাজত্ব চালায় এ কারণে হাট-বাজারে আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়।

وَعَنْ ٢٣١٩ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُوْ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ اَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ قَالَ دَعْوَةٌ اَرْجُوْ بِهَا خَيْرًا فَقَالَ اِنَّ مِنْ تَمَامِ

২৩১৯. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে দোয়া করতে এবং এই বলতে শুনলেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পূর্ণ নিয়ামত চাই। রাসূল ﷺ বললেন, পূর্ণ নিয়ামত কি? সে বলল, হুজুর! এ দোয়া দ্বারা আমি মাল লাভ করবার আশা রাখি। রাসূল ﷺ বললেন, পূর্ণ নিয়ামত তো হলো বেহেশতে প্রবেশ ও

النِّعْمَةِ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ قَدِ اسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلْ وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَأَلْتَ اللّٰهَ الْبَلَاءَ فَاسْئَلْهُ الْعَافِيَةَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

দোজখ হতে মুক্তি লাভ করা। [দুনিয়া লাভ করা নয়।] তিনি অপর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন– يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ!" তখন তিনি বললেন, তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে, তুমি প্রার্থনা কর। নবী করীম ﷺ আরেক ব্যক্তিকে শুনলেন সে বলছে, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الصَّبْرَ "আল্লাহ! তোমার নিকট আমি সবর চাই।" তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর নিকট বিপদ চাইলে। তুমি তাঁর নিকট কুশল কামনা কর। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের প্রথম অংশের মূল কথা হলো, উক্ত ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদকে পূর্ণ নিয়ামত মনে করে তা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল। তখন নবী করীম ﷺ তাকে সতর্ক করে বলেন, দুনিয়ার অর্থসম্পদ এমন কোনো মূল্যবান কিছু নয় যার জন্য এভাবে প্রার্থনা করতে হবে। কেননা এটা নিঃশেষ হয়ে যাবে। পূর্ণ ও প্রকৃত নিয়ামত তো জান্নাতে প্রবেশ করা এবং দোজখ হতে মুক্তি পাওয়া। এ কারণে এটা অর্জনের নিমিত্তে দোয়া প্রার্থনা করা উচিত। হাদীসের শেষাংশের মূল কথা হলো, উক্ত ব্যক্তি সবর বা ধৈর্যের প্রার্থনা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সে বালামুসিবত প্রার্থনা করল। এ কারণে নবী করীম ﷺ বললেন, ধৈর্যের প্রার্থনা করো না। কেননা এর দ্বারা বিপদাপদ প্রার্থনাই বুঝা যায়; বরং তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা হতে মুক্তি কামনা কর, যাতে করে মহান আল্লাহ তোমাকে যাবতীয় বিপদ-মসিবত থেকে মুক্ত রাখেন। তবে যদি কোনো বিপদাপদে পতিত হও তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট ধৈর্যধারণের জন্য প্রার্থনা কর এবং বালামুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ কর। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২২৩]

وَعَنْ ٢٣٢٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ اِلَّا غُفِرَ لَهٗ مَا كَانَ فِىْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২৩২০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে বহু অনর্থক কথা বলেছে, অতঃপর উঠবার পূর্বে বলেছে– "হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকে রুজু করি।" নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ঐ মজলিসে যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দেবেন। –[তিরমিযী। আর বায়হাকী দা'আওয়াতুল কাবীরে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে لَغَطٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কালাম বা এমন কথাবার্তা যার কারণে পাপ হয়। আর কিছু সংখ্যক আলেমের মতে لَغَطٌ-এর অর্থ হলো– উপকারবিহীন কথা। কাজেই হাদীসে যে দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে একে كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ বলা হয়। অর্থাৎ যে বৈঠকে পাপ ও অনর্থক কথাবার্তা হয়, অথবা হাসি-তামাশা হয় উক্ত দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কিছুকে ক্ষমা করে দেন। মূলত এ দোয়া শরিয়ত সমর্থিত নয় এমন কথা বা অপছন্দনীয় আলোচনার কাফফারা হয়ে যায়। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২২৪]

وَعَنْ ٢٣٢١ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّهٗ اُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهٗ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلٰثًا وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا سُبْحَانَكَ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيْلَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِيْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ)

২৩২১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা তাঁর নিকট সওয়ার হওয়ার জন্য একটি সওয়ারি পশু আনা হলো। তিনি যখন রেকাবে পা রাখলেন বললেন, 'বিসমিল্লাহ', যখন তার পিঠে সওয়ার হলেন বললেন, 'আল্লাহর প্রশংসা।' অতঃপর বললেন "প্রশংসা আল্লাহর যিনি এটাকে আমাদের কবলে করে দিয়াছেন, অথচ আমরা এটাকে কবলে করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের রবের দিকে ফিরছি।" –[কুরআন]

অতঃপর তিনবার বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তিনবার 'আল্লাহু আকবার'। অতঃপর বললেন, "তোমার পবিত্রতা, আমি আমার প্রতি জুলুম করেছি, তুমি আমাকে মাফ কর। কেননা তুমি ব্যতীত কেউ অপরাধ মাফ করতে পারে না।" অতঃপর তিনি হেসে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাস করা হলো, কি কারণে হাসলেন হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, আমি যেরূপ করলাম তিনি ঐরূপ করলেন, অতঃপর হাসলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি কারণে হাসলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি খুশি হন যখন সে বলে, "আল্লাহ আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা কর।" আল্লাহ বলেন, সে বিশ্বাস করে যে, আমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই। –[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٢٣٢٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا وَدَّعَ رَجُلًا اَخَذَ بِيَدِهٖ فَلَا يَدَعُهَا حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقُوْلُ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا لَمْ يُذْكَرْ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ)

২৩২২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন তার হাত ধরতেন, অতঃপর তা ছাড়তেন না, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজে নবী করীম ﷺ -এর হাত ছেড়ে দিত। তখন তিনি বলতেন, "তোমার দীন, তোমার আমানত ও শেষ কার্যাবলিকে আল্লাহর সোপর্দ করলাম।"

–[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু শেষ দুজনের বর্ণনায় 'সর্বশেষ কাজ' শব্দের উল্লেখ নেই।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : এখানে আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব সম্পদ যা জনগণের সাথে লেনদেন করেছে। কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরিবার-পরিজন যাদেরকে গৃহে রেখে সফরের পথে রওয়ানা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٣٢٣ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِيِّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

২৩২৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ খাতমী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সৈন্যদলকে বিদায় দিতেন বলতেন, তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ কার্যাবলিকে আল্লাহর সোপর্দ করলাম। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٢٣٢٤ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِيْ فَقَالَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى قَالَ زِدْنِيْ قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِيْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ قَالَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২৩২৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরের ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু পাথেয় [উপদেশ] দান করুন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাকে আল্লাহ কারো নিকট সওয়াল করা হতে বাঁচাক! সে বলল, আমায় আরো কিছু দিন! তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করুক। সে বলল, আমার মা-বাপ আপনার উপর কুরবান হোক– আমাকে আরো কিছু দিন! তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিক তুমি যেখানেই থাক না কেন। –[তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

وَعَنْ ٢٣٢٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللّٰهُمَّ اطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৩২৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফর করার ইচ্ছা রাখি, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি সর্বদা আল্লাহর ভয় মনে রাখবে এবং প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তাকবীর বলবে। সে যখন ফিরে চলল, রাসূল ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি তার সফরের দূরত্ব কমিয়ে দাও এবং তার প্রতি সফর সহজ কর।" –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার ভয়ভীতি অবলম্বন করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চল। শিরক, পাপ ও সন্দেহমূলক বস্তুকে পরিহার কর এবং সেসব কিছুকে গ্রহণ করো না যেগুলো প্রয়োজনের বেশি। ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার জিকিরে অমনোযোগিতা থেকে ফিরে থেক। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে প্রয়োজন পূরণকারী ও মসিবত দূরকারী মনে করো না এবং তাঁকে ব্যতীত আর কারো উপর বিশ্বাস রেখো না।

وَعَنْ ٢٣٢٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ

২৩২৬. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন, আর রাত্রি উপস্থিত হতো, তিনি বলতেন, "হে ভূমি! আমার রব ও তোমার রব আল্লাহ। সুতরাং আমি আল্লাহর নিকট তোমার মন্দ হতে এবং তোমাতে যা আছে তার মন্দ হতে, তোমাতে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার মন্দ হতে এবং যা তোমার উপর চলাফেরা করে

وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَاَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

তার মন্দ হতে পানাহ চাই। আমি আরো আল্লাহর নিকট পানাহ চাই সিংহ, বাঘ, কালো সাপ ও সাপ-বিচ্ছু হতে এবং শহরের অধিবাসী ও পিতা পুত্র হতে।" –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَسْوَدُ : এর অর্থ হলো– কালো সাপ, তবে এখানে সেই বড় সাপ উদ্দেশ্য যার মাথায় কালো চিহ্ন আছে। আর এটা হলো সবচেয়ে বিষাক্ত ও অসুন্দর সাপ। পরবর্তী وَمِنَ الْحَيَّةِ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। কেউ বলেন, এখানে اَسْوَدُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চোর ডাকাত। রাতের অন্ধকার প্রকাশিত হয় বিধায় اَسْوَدُ বলা হয়েছে, অথবা কালো পোশাক পরিধান করার কারণে এদেরকে اَسْوَدُ বলা হয়েছে, অথবা অধিকাংশ চোর ডাকাত সুদানী ছিল বিধায় اَسْوَدُ বলা হয়েছে।

اَلْعَقْرَبُ : عَقْرَبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল বিষাক্ত কীটপতঙ্গ।

سَاكِنُ الْبِلَادِ : দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল মানব অথবা জিন জাতি, যারা আবাদি-অনাবাদি সকল ভূমিতে বসবাস করে। আর بِلَادٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সকল ভূমি শহর নয়। কেননা কুরআনে এসেছে– وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ

مِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অভিশপ্ত ইবলিস ও তার সন্তানাদি। –[মিরকাত : খ. ৩, পৃ. ২৯৩]

وَعَنْ ٢٣٢٧ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَزَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৩২৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধে বের হতেন, বলতেন "হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি।" –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٢٣٢٨ اَبِيْ مُوْسٰى (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

২৩২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন কোনো দল সম্পর্কে ভয় করতেন বলতেন, "হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের সম্মুখে করলাম [তুমিই তাদের দমন কর!] এবং তাদের মন্দ প্রভাব হতে তোমাতে আশ্রয় নিলাম।" –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শত্রুর ভয় হলে নিয়মিত উক্ত দোয়া পাঠ করার কথা এসেছে। আর حِصْنِ حَصِيْن কিতাবে উল্লিখিত আছে, যদি কেউ শত্রু বা কোনো কিছুর ভয় করে তবে সে যেন সূরা لِاِيْلَافِ পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল বিপদাপদ হতে নিরাপদ রাখবেন।

উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে যে, কোনো ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হলে সে যেন তিনবার বলে– يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ যেমন হাদীসে এসেছে–

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا اَوْ اَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ بِهَا اَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ : يَا عِبَادَ اللّٰهِ! اَعِيْنُوْنِيْ فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ . (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ) وَرُوِيَ عَنِ الْمَشَايِخِ اَنَّهُ مُجَرَّبٌ قُرِنَ بِهِ التَّنْجِيْحُ .

–[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৯৫]

وَعَنْ ٢٣٢٩ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ اِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ .

২৩২৯. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ যখন ঘর হতে বের হতেন বলতেন, "বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পদস্খলিত হওয়া ও বিপথগামী হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কারো অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে।" –[আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী] তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহর অপর বর্ণনায় রয়েছে– হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই আমার ঘর হতে বের হতেন, আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে।"

وَعَنْ ٢٣٣٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَيَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيْطٰنُ وَيَقُوْلُ شَيْطَانٌ اٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ اِلٰى قَوْلِهِ لَهُ الشَّيْطَانُ .

২৩৩০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি ঘর হতে বের হবার কালে বলে– بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ "আল্লাহর নামে [বের হলাম], আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আমার কোনো উপায় নেই, ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত", তখন তাকে বলা হয়– পথ পেলে, উপায় পেলে ও রক্ষিত হলে। সুতরাং শয়তান তার নিকট হতে দূর হয়ে যায় এবং অপর শয়তান এ শয়তানকে বলে, তুমি কি করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, উপায় অবলম্বন দেওয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে? –[আবূ দাঊদ। আর তিরমিযী 'তখন শয়তান দূর হয়ে যায়' পর্যন্ত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'তোমাকে পথ দেখানো হয়েছে' তথা আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে, তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁকে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী মেনে ঘর থেকে বের হয়েছে। এজন্য তুমি সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছ। আর সরল পথ তো এটাই যে, বান্দা তার রবকে স্মরণ করবে, তাঁর উপর নির্ভর করবে এবং সকল জিম্মা তাঁর দিকে ন্যস্ত করবে।

ইমাম নববীর كِتَابُ الْاَذْكَارِ অনুযায়ী كِتَابُ اِبْنِ سِنِّيْ-তে হযরত ওমর (রা.)-এর সূত্রে এটা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি জীবন ধারণের সংকীর্ণতায় পড়ে গেলে কোনো বস্তু তাকে ফিরাতে পারে না যদি সে গৃহ হতে বের হবার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে–

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَدِيْنِىْ اَللّٰهُمَّ رَضِّنِىْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا قَدَّرْتَ لِىْ حَتّٰى لَا اُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلَا تَاْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার নামে ঘর হতে বের হলাম। যিনি আমার জীবন, অর্থসম্পদ ও দীনের মালিক। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আশ্বস্ত করুন আপনার ফয়সালার উপর এবং আমার জন্য নির্ধারিত বিষয়ে বরকত দিন। এমনকি আপনি যা দেরিতে দেবেন তা দ্রুত পেতে অপছন্দ করি এবং যা দ্রুত দেবেন তা দেরিতে পাওয়ার কামনা করি না।

ইবনে মাজাহ শরীফে উল্লিখিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি নামাজের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। দোয়াটি হলো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ هٰذَا فَاِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا وَّلَا بَطَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً وَّخَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِىْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২২৮]

وَعَنْ ٢٣٣١ اَبِىْ مَالِكِنِ الْاَشْعَرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهٗ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى اَهْلِهٖ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৩৩১. **অনুবাদ** : হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি [ও বের হই]। আমাদের রব আল্লাহর নামে ভরসা করলাম।" অতঃপর যেন আপন পরিবারের লোকদের প্রতি সালাম দেয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে উল্লিখিত দোয়াটি আবূ দাউদ কিতাব হতে নেওয়া হয়েছে। সেখানে بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا -এর পর بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا উল্লিখিত হয়েছে। আবূ দাউদের মূল গ্রন্থে এটা উল্লিখিত হয়েছে, ফলে বলা যায় যে, মিশকাত গ্রন্থকার এ অংশটুকু লিখতে ভুলে গেছেন, অথবা كَاتِبْ এটা লিখতে ভুলে গেছেন। কাজেই দোয়া পাঠ করার সময় উক্ত অংশটুকু পড়তে হবে।

আলেমগণ বলেন, স্বীয় গৃহে প্রবেশের সময় উক্ত দোয়া পাঠ করার পর ঘরের অধিবাসীদেরকে সালাম করতে হবে। যেমনি হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি গৃহে কেউ না থাকে তথাপি ফেরেশতাদের নিয়তে সালাম করতে হবে। কেননা সেখানে তো সর্বদা ফেরেশতাগণ বিদ্যমান থাকেন। তবে তখন এভাবে সালাম দেবে– اَلسَّلَامُ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২২৯]

وَعَنْ ٢٣٣٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَّأَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৩৩২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি বিবাহ করত তখন নবী করীম ﷺ তাকে অভিনন্দন জানাতেন– বলতেন, "আল্লাহ তোমাকে বরকত দিক, তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাজিল করুক এবং তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে একত্র রাখুক।" –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : অত্র হাদীসে প্রথমবার بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ বলে বুঝানো হয়েছে بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ তথা মহান আল্লাহ তোমাকে এ শুভ কাজে বরকত দান করুক।

এরপর এর থেকে উন্নতভাবে উভয়ের জন্য দোয়া করা হয়েছে যা عَلٰى দ্বারা مُتَعَدِّىْ করা হয়েছে তথা بَارَكَ عَلَيْهِ بِالذَّرَارِىْ وَالنَّسْلِ তথা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়ের সন্তানসন্ততি ও বংশের মধ্যে বরকত দান করুক।

وَعَنْ ٢٣٣٣ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً اَوِ اشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهٖ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৩৩৩. **অনুবাদ** : হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ কোনো নারী বিবাহ করে অথবা কোনো খাদেম ক্রয় করে তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল এবং তাকে যে নেক চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করেছ তার মঙ্গল চাই। আর আমি তোমার নিকট তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করেছ তা হতে পানাহ চাই।" এবং যখন সে উট ক্রয় করে তখন তার ঝুঁটির শীর্ষস্থান ধরে যেন তার ন্যায় বলে। অপর এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তখন সে যেন তার চুলের সম্মুখভাগ ধরে বরকতের দোয়া করে। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : কল্যাণ ও বরকতের জন্য এ দোয়াই উত্তম যা 'হিসনে হাসীন' কিতাবের মাধ্যমে জানা যায়। তথা স্ত্রী ও দাস-দাসীর সম্মুখভাগের চুল ধরে এ দোয়া পাঠ করবে।

আল্লামা জাযরী (র.) বলেন, শুধু উটের জন্য এ দোয়া নির্দিষ্ট নয়; বরং যে কোনো পশুই ক্রয় করা হোক না কেন যদি এ দোয়া পাঠ করা হয় তবে মহান আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন।

وَعَنْ ٢٣٣٤ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৩৩৪. **অনুবাদ** : হযরত আবূ বাকরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দোয়া এই– "হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাতে ছেড়ে দিয়ো না; বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই।" –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٢٣٣٥ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِىْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا اُعَلِّمُكَ كَلَامًا اِذَا قُلْتَهٗ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ

২৩৩৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে এবং ঋণ আমার ঘাড়ে চেপেছে। তিন বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলে দেব না যদি তুমি তা বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর এবং ঋণ পরিশোধ করবেন। সে বলে, আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন হুজুর! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে এবং যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে বলবে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তাভাবনা হতে পানাহ চাই, অপারকতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই, কৃপণতা ও

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضٰى عَنِّىْ دَيْنِيْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

কাপুরুষতা হতে পানাহ চাই এবং ঋণের চাপ ও মানুষের জবরদস্তি হতে পানাহ চাই।" সে বলে, অতঃপর আমি তা করলাম, আর আল্লাহ আমার চিন্তা দূর এবং আমার ঋণ পরিশোধ করলেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অক্ষমতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করার অর্থ হলো, সে বস্তু হতে পানাহ কামনা করা যার ফলে আনুগত্য ও ইবাদত পালনে এবং বিপদাপদ ও কষ্টকর বিষয়ে ধৈর্যধারণে অক্ষম না হওয়া।

কৃপণতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জাকাত, কাফফারা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক আবশ্যকীয়গুলো আদায় না করা। ভিক্ষুক ও মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে নিজের ঘরের দরজা হতে নিরাশ অবস্থায় বিদায় দেওয়া, মেহমানের মেহমানদারি না করা, সালাম না দেওয়া এবং সালাম প্রদান করলে এর জবাব না দেওয়া, কোনো দীনি মাসআলা ও ইলমী বিষয় জানতে চাইলে জানা থাকা সত্ত্বেও জবাব না দেওয়া, নবী করীম ﷺ -এর নাম মোবারক শুনার পরও দরূদ পাঠ না করা।

আর ভীরুতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহাদের সময় শত্রুর ভয়ে মোকাবিলা না করা, এমনিভাবে اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ -এর স্থানে তা না করা, সত্য সাক্ষ্য ও সত্য কথা না বলা– রিজিক ও অন্যান্য বিষয়ে অন্তর হতে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা না করা। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩১]

وَعَنْ ٢٣٣٦ عَلِيٍّ (رض) اَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتَبٌ فَقَالَ اِنِّىْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِىْ فَاَعِنِّىْ قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيْرٍ دَيْنًا اَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ قُلِ اللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ فِىْ بَابِ تَغْطِيَةِ الْاَوَانِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

২৩৩৬. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তাঁর নিকট এক 'মুকাতাব' এসে বলল, আমি আমার কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করতে অক্ষম আমাকে সাহায্য করুন! তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কতক বাক্য শিখিয়ে দেব না, যা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়ে দিয়েছেন, যদি তোমার উপর বড় পাহাড় পরিমাণ ঋণও চেপে থাকে, আল্লাহ তোমার তা পরিশোধ করে দেবেন। তুমি বলিবে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালালের সাহায্যে হারাম হতে বাঁচাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্যের মুখাপেক্ষিতা হতে বেনিয়ায কর।" -[তিরমিযী। বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।] আর اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ সংবলিত হযরত জাবেরের হাদীসটি تَغْطِيَةُ الْاَوَانِىْ পরিচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : مُكَاتَبٌ সেই গোলামকে বলা হয় যার মালিক তাকে এ কথা লিখে দেয় যে, যদি তুমি আমাকে এ পরিমাণ সম্পদ দাও তবে তুমি আজাদ বা মুক্ত হয়ে যাবে। কাজেই উল্লিখিত স্বীকারকৃত সম্পদ প্রদান করলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩১]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣٣٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا اَوْ صَلّٰى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ اِنْ تُكُلِّمُ بِخَيْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِنَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاِنْ تُكُلِّمُ بِشَرٍّ كَانَ كَفَّارَةً لَهٗ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

২৩৩৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো মজলিসে বসতেন অথবা নামাজ পড়তেন, কতক বাক্য বলতেন। একদা আমি সে সকল বাক্য সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি [মজলিসে] ভালো কথা হয়ে থাকে তবে তার পক্ষে মোহরস্বরূপ হবে কিয়ামত পর্যন্ত, আর যদি মন্দ কথা হয়ে থাকে তবে তা তার কাফফারা হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই– "হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই, আমি তোমার নিকট মাফ চাই ও তওবা করি।" –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : যে কোনো বৈঠক হতে উঠবার সময় উক্ত দোয়াটি তথা سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ পাঠ করলে উক্ত সমাবেশের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٢٣٣٨ قَتَادَةَ بَلَغَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ اٰمَنْتُ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

২৩৩৮. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] কাতাদা (র.) বলেন, তার নিকট বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন বলতেন, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। এটা তিনবার বলতেন। অতঃপর বলতেন, "আল্লাহর প্রশংসা যিনি অমুক মাস শেষ করলেন এবং এই মাস আনলেন।" –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** দারেমী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, নবী করীম ﷺ নতুন চাঁদ দেখে প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতেন এরপর هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشْدٍ দোয়াটি পাঠ করতেন।

আর هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشْدٍ-এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার এ চাঁদ ভালো ও হেদায়েতের বার্তা নিয়ে আগমন করেছে। অথবা এটাও হতে পারে এ বাক্যটি 'ভালো লক্ষণ' হিসেবে جُمْلَة خَبَرِيَّة –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩২]

অবশ্য উক্ত দোয়ার সাথে আরো বর্ধিত করে বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত হয়েছে যেমন–

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ نَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَلَفْظُهٗ "هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشْدٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

وَرَوَى ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) مَوْقُوْفًا "اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا خَيْرَهٗ وَنَصْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَفَتْحَهٗ وَنُوْرَهٗ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ" .

وَعَنْ ٢٣٣٩ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ وَفِيْ قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَلْهَمْتَ عِبَادَكَ اَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ مَكْنُوْنِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَجَلَاءَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ اِلَّا اَذْهَبَ اللّٰهُ غَمَّهُ وَاَبْدَلَهُ بِهٖ فَرَجًا . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

২৩৩৯. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যার চিন্তা বেড়ে গেছে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র, আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে, তোমার হুকুম আমাতে কার্যকর এবং তোমার নির্দেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার সে সকল নামের অসিলায় যা দ্বারা তুমি নিজেকে অভিহিত করেছ, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছ, অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তুমি তোমার বান্দাদের উপর এলহাম করেছ, অথবা তুমি গায়েবের পর্দায় তা তোমার নিকট গোপন রেখেছ– তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকালস্বরূপ এবং চিন্তা ও ধান্দা দূরীকরণের কারণস্বরূপ কর।" যে বান্দা যখনই তা বলবে, আল্লাহ তার চিন্তা দূর করবেন এবং তার পরিবর্তে নিশ্চিন্ততা দান করবেন। –[রাযীন]

وَعَنْ ٢٣٤٠ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

২৩৪০. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) বলেন, [রাস্তায়] আমরা যখন উপরে উঠতাম 'আল্লাহু আকবার' বলতাম এবং যখন নীচে নামতাম 'সুবহানাল্লাহ' বলতাম। –[বুখারী]

وَعَنْ ٢٣٤١ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا كَرَبَهُ اَمْرٌ يَقُوْلُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ)

২৩৪১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন কোনো বিষয় চিন্তাগ্রস্ত করত, তিনি বলিতেন, "হে চিরঞ্জীব, হে প্রতিষ্ঠাতা! তোমার দয়ার নিকট আমি ফরিয়াদ করি।" –[তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব ও গায়রে মাহফূয।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَشْرِيْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ বর্ণনাটি ইমাম হাকেম ও ইবনে সুন্নী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে বর্ণনা করেন, এছাড়া হাকেম ও নাসায়ী একে হযরত আলী (র.)-এর সূত্রে مَرْفُوْع পদ্ধতিতে নকল করেন। তবে সেখানে এ কথাটিও আছে যে, وَيُكَرِّرُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ তথা তিনি সেজদারত অবস্থায় এ দোয়াটি বারবার পাঠ করেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩৩]

وَعَنْ ٢٣٤٢ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللّٰهُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ هَزَمَ اللّٰهُ بِالرِّيْحِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২৩৪২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি কিছু বলবার আছে? প্রাণ তো ওষ্ঠাগত হয়ে গেল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দোষ ঢেকে রাখ এবং আমাদের ভয় নিরাপদ কর।" হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, সুতরাং আল্লাহ তাঁর শত্রুদেরকে প্রবল বাতাস দ্বারা দমন করলেন এবং প্রবল বাতাস দ্বারাই তাদেরকে পরাজিত করলেন। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : يَوْمَ الْخَنْدَقِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খন্দকের যুদ্ধ যাকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ব্যাপক সাহায্য করেন। প্রচণ্ড বাতাস ও প্রবল শীত দিয়ে কাফেরদেরকে উৎখাত করেন। এ বাতাস তাদের হাড়ি-পাতিল উল্টিয়ে দেয়, তাঁবুগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এভাবে বিভিন্ন আজাব দিয়ে তাদেরকে পরাস্ত করেন। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩৩]

وَعَنْ ٢٣٤٣ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২৩৪৩. **অনুবাদ :** হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন বাজারে প্রবেশ করতেন বলতেন- "বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি এ বাজারের মঙ্গল এবং এতে যা রয়েছে তার মঙ্গল কামনা করি এবং আমি পানাহ চাই তার অমঙ্গল হতে এবং তাতে যা আছে তার অমঙ্গল হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই তাতে যেন কোনো লোকসানজনক বেচাকেনার ফাঁদে না পড়ি।" -[বায়হাকী দা'আওয়াতুল কাবীর]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : বাজার হলো হরেক রকমের মানুষের মেলা। এছাড়া এখানে ধোঁকা, প্রতারণা, ফাঁকিবাজি, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষের স্থান তাই বাজারে প্রবেশ করে দোয়া পাঠ করতে হবে এবং দ্রুত বাজার ত্যাগ করতে হবে। হাকেম ও ইবনুস সুন্নীর বর্ণনায় এভাবে আছে যে, اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً এখানে- فَاجِرَة -এর অর্থ كَاذِبَة বা মিথ্যা।

بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ

পরিচ্ছেদ : আশ্রয় প্রার্থনা

অত্র পরিচ্ছেদে সেসব দোয়া সংবলিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোতে অধিকাংশ অপছন্দনীয় বিষয়, শরিয়ত বিরোধী কাজকর্ম, ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়াবলি এবং শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা হতে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন পাঠের শুরুতে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়া উত্তম না أَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ পড়া উত্তম এ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশের মতে أَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ পড়া উত্তম। কেননা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশ্যত এটাই বুঝা যায়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ আর حَدِيْث ও اٰثَارْ -এর মাধ্যমে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়াও সাব্যস্ত, কাজেই أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়াতেও কোনো দোষ নেই।

-[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩৪]

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣٤٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা বিপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, নিয়তির মন্দতা ও বিপদে শত্রুর হাসা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।

-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** "بَلَاءٌ" এমন অবস্থাকে বলে যার ফলে মানুষ কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত হয়। দীনি ও দুনিয়াবি কমতি ও কঠিনতায় পতিত হয়।

"جَهْد" -এর অর্থ হলো- কঠোরতা, কষ্ট। অতএব, جَهْدُ الْبَلَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াবি সেসব মসিবত যাতে মানুষ পড়ে যায় এবং সে তা দূরও করতে পারে না এবং ধৈর্যধারণও করতে পারে না।

سُوْءُ الْقَضَاءِ : 'মন্দ তাকদীর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব বস্তু যা মানুষের জন্য মন্দ ও অপছন্দনীয় হয়ে উঠে।

شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ : 'শত্রুর খুশি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইহকালীন বা পরকালীন এমন কোনো মসিবতে পড়ে যাওয়া যার ফলে শত্রুরা আনন্দিত হয়।

সর্বোপরি কথা : অত্র হাদীসে যেসব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে তার প্রতি গভীর চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অত্র হাদীসে এমন একটি পরিপূর্ণ (جَامِعْ) দোয়ার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যা দীনি ও দুনিয়াবি সকল উদ্দেশ্যকে শামিল করে নিয়েছে। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩৫]

وَعَنْ ٢٣٤٥ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضِلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হতে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম কারমানী (র.) বলেন, অত্র দোয়াটি جَوَامِعُ الْكَلِمِ -এর অন্তর্ভুক্ত তথা সর্ব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেননা নীচ বা হীন বিষয় তিনভাবে হয় যথা– ১. نَفْسَانِيَّةٌ তথা আত্মিক, ২. بَدَنِيَّةٌ তথা শারীরিক ও ৩. خَارِجِيَّةٌ তথা বহিরাগত। প্রথম তথা نَفْسَانِيَّةٌ টি শক্তি অনুযায়ী তিন রকম– ১. عَقْلِيَّةٌ - জ্ঞানগত, ২. اَلْغَضَبِيَّةُ - রাগ জনিত ও ৩. اَلشَّهْوِيَّةُ - কামভাব জনিত।

কাজেই هَمّ ও حُزْن সম্পর্কিত عَقْل -এর সাথে, اَلْجُبْنُ 'কাপুরুষতা' সম্পর্কিত اَلْغَضَبِيَّةُ -এর সাথে, اَلْبُخْلُ বা কৃপণতা اَلشَّهْوَةُ -এর সাথে, اَلْعَجْزُ وَالْكَسَلُ সম্পর্কিত শরীরের সাথে।

আর দ্বিতীয় তথা بَدَنِيَّةٌ বিষয়াবলি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শক্তি ও পূর্ণতার মাধ্যমে হয়। কাজেই اَلْعَجْزُ وَالْكَسَلُ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অসম্পূর্ণতার কারণে হয়ে থাকে এবং اَلضَّلْعُ ও اَلْغَلَبَةُ টি হলো خَارِجِيٌّ -এর মধ্যে اَلضَّلْعُ টি مَالِيْ অর্থনৈতিক আর اَلْغَلَبَةُ টি হলো جَاهِي মান-সম্মান সম্পর্কীয়। কাজেই দোয়াটি এসব কিছুকে শামেল করেছে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩১৩]

وَعَنْ ٢٣٤٦ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৪৬. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও পাপ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোজখের শাস্তি, দোজখের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা ও শাস্তি হতে এবং সচ্ছলতার পরীক্ষার মন্দতা ও দারিদ্র্যের পরীক্ষার মন্দতা হতে এবং কানা দাজ্জালের পরীক্ষার মন্দতা হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ ধুয়ে দাও বরফের পানি ও শিলার পানি দ্বারা। আমার অন্তরকে পরিষ্কার কর যেরূপে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয় এবং ব্যবধান কর আমার ও আমার গুনাহের মধ্যে যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে।"

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : مِنْ عَذَابِ النَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হে আল্লাহ তা'আলা! আমরা তোমার নিকট এ কথা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, আমাদের মধ্য হতে অসংখ্য মানুষ দোজখি বা কাফের।

এ স্থানে এ কথা জানা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলার শাস্তিতে শুধু কাফের সম্প্রদায়ই নিপতিত হবে। তবে একত্ববাদীগণের পাপের যে শাস্তি হবে তাকে عَذَابٌ বলা হয় না; বরং "تَأْدِيْبٌ" বা সংশোধন বলা হয়।

তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা ঐরূপ কঠিন শাস্তির জন্য নয়; বরং তাদের পাপ মুছে ফেলার বা শেষ করার জন্য কিছু সময় দোজখে রাখা হবে।

فِتْنَةُ النَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেসব বস্তু যা দোজখের আগুন ও কবরের আজাবের কারণ হয় তথা পাপাচারিতা।

فِتْنَةُ الْقَبْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, مُنْكَرْ ও نَكِيْر-এর প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়ার সময় অচেতন বা বোধশূন্য হওয়া।

عَذَابُ الْقَبْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতাদের লোহার হাতুড়ি দিয়ে যে শাস্তি প্রদান করেন তা। আর قَبْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَالَم بَرْزَخْ [মৃত্যুর পরে কিয়ামতে উঠার মধ্যবর্তী জগৎ] চাই তা মাটির নীচে হোক বা অন্য কোনো স্থানে হোক।

فِتْنَةُ الْغِنٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অহংকার উদ্ধত প্রকাশ করা, হারাম পথে অর্থ উপার্জন করা, সম্পদকে পাপের পথে খরচ করা এবং অর্থসম্পদ ও মান-সম্মানের অহংকার প্রকাশ করা।

فِتْنَةُ الْفَقْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধনীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাদের অর্থসম্পদের প্রতি লোভ করা এবং সেই ভাগ্যের উপর খুশি না হওয়া যা মহান আল্লাহ তার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তা হলো দরিদ্রতা। এর সাথে সেসব কিছুও উদ্দেশ্য যা ধৈর্যধারণ, আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা ও সন্তুষ্টির বিপরীত।

পরিশেষে এটা বলতে হয় যে, মহান রাসূল উক্ত বস্তুসমূহ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করার অর্থ এই নয় যে, [নাউযুবিল্লাহ] তিনি উক্ত বিষয়গুলোতে আক্রান্ত ছিলেন, অথবা সেগুলোতে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কেননা তিনি হলেন নিষ্পাপ। মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বদার জন্য এসব বস্তু হতে নিরাপদ ও হেফাজতে রেখেছেন। বরং তিনি এগুলো হতে আশ্রয় প্রার্থনার অর্থ উম্মতকে শিক্ষা প্রদান করা, যাতে করে সকল উম্মত উক্ত বস্তুসমূহ হতে পানাহ কামনা করে এবং সেগুলো হতে বেঁচে থাকে।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩৬]

وَعَنْ ٢٣٤٧ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৪৭. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আজাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান কর, তাকে পবিত্র কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, তুমি তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন জ্ঞান হতে যা [আত্মার] উপকার করে না, অন্তর হতে যা [আল্লাহর ভয়ে] গলে না, এমন মন হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দোয়া হতে যা কবুল হয় না।" –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন জ্ঞান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা যার উপর আমল করা হয় না, অপরকে শিখানো হয় না এবং যে عِلْم স্বভাব-চরিত্র ও কাজকর্মকে সঠিক রাখে না। অথবা এর দ্বারা সেই عِلْم উদ্দেশ্য যা দীনের জন্য উপকারী নয় এবং শরিয়ত যা অর্জনের জন্য অনুমতি প্রদান করেনি।

হযরত আবূ তালেব মাক্কী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ যেভাবে শিরক, নেফাক ও মন্দকর্ম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তেমনি তিনি ইলমের সেই প্রকার হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করতেন যা ইসলামি দীন অনুযায়ী ক্ষতিকর এবং যা মানুষকে মহান

আল্লাহর ভয়ভীতি, পরকালের চিন্তা ব্যতীত ইহকালীন লোভ-লালসা ও মহব্বতের রাস্তায় নিয়ে যায়। কাজেই যে عِلْم মানুষকে আল্লাহভীরুতা ও পরকালের ভয় দেখায় না তা দুনিয়ার দরজাসমূহের একটি এবং পার্থিব প্রকারসমূহের একটি।

-[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩৭]

ইমাম গাযালী (র.) বলেন, عِلْم জাতগতভাবে মন্দ নয়। কেননা এটা মহান আল্লাহর সিফত; বরং তিনটি কারণে এটা মন্দ হয়-

১. হয়তো বা তা অন্যের ক্ষতি সাধন করে। যেমন- যাদু-টোনা, তেলেসমাতি। এ দু প্রকার কোনো কল্যাণ সাধন করে না; বরং ক্ষতি করে এবং ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. অথবা, তা স্বয়ং তার অর্জনকারীর ক্ষতি করে। যেমন- জ্যোতিষশাস্ত্র। এর পুরোটাই ক্ষতিকর। এর পিছনে সময় ব্যয় করে জীবনটাই বিনষ্ট করে। কোনো উপকার ছাড়াই সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

৩. অথবা, এমন সূক্ষ্ম ও কঠিন বিষয় যা জানা সম্ভব নয়। যেমন- উর্ধ্বজগৎ ও মহান আল্লাহর ভেদ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা, যাতে দার্শনিক ও যুক্তিবিদরা লিপ্ত। এটা তারা নিজেরা সঠিক বুঝে না এবং তাতে স্থিরও থাকে না। এর কিছু অংশ নবী ও ওলীগণই জানতে পারে। কাজেই এটা হতে মানুষের বিরত থাকাই আবশ্যক।

আর "وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দান করেছেন তাতে পরিতৃপ্ত না হওয়া এবং অধিক লোভের কারণে অধিক সম্পদ জমা করতে লেগে পড়া। অথবা এমন আত্মা যা অধিক খায়। -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩১৭]

وَعَنْ ٢٣٤٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৪৮. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়াসমূহের মধ্যে এটাও ছিল, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি [আমার প্রতি] তোমার নিয়ামতের হ্রাসপ্রাপ্তি, তোমার শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হতে।" -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসের تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ -এর অর্থ হলো- শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন হয়ে যাওয়া।

আর نَقْمَة অর্থ- শাস্তি, আজাব, প্রতিশোধ, তবে এখানে نَقْمَة এনে ঐগুলোর কঠিনতাকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ زَوَالِ وَتَحَوُّلِ **[زَوَالٌ ও تَحَوُّلٌ -এর মধ্যে পার্থক্য] :** ইমাম মীরাক বলেন, زَوَالٌ বলা হয় যা কারো মধ্যে ছিল তা দূরীভূত হয়ে যাওয়া, আর تَحَوُّلٌ হলো পরিবর্তন হয়ে যাওয়া এবং পৃথক হওয়া। কাজেই زَوَالُ النِّعْمَةِ -এর অর্থ হলো- কোনো বদল ব্যতীত তা দূর হয়ে যাওয়া, আর تَحَوُّلُ الْعَافِيَةِ অর্থ হলো- সুস্থতা পরিবর্তন হওয়া অসুস্থতা দ্বারা, অর্থসম্পদ দরিদ্রতা দ্বারা পরিবর্তন হওয়া।

ইমাম তীবী (র.) বলেন- تَبَدُّلُ مَا رُزِقْتَنِىْ مِنَ الْعَافِيَةِ اِلَى الْبَلَاءِ وَالدَّاهِيَةِ -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩১৮]

وَعَنْ ٢٣٤٩ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই যা আমি করেছি তার অপকারিতা হতে এবং যা আমি করিনি তার অপকারিতা হতে।" -[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٣٥٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِىْ اَنْتَ الْحَىُّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৫০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বসা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমারই প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই প্রতি ভরসা করলাম, তোমারই দিকে রুজু করলাম এবং তোমারই সাহায্যে [তোমার শত্রুর সাথে] লড়াই করলাম। হে আল্লাহ, আমি তোমার মর্যাদার আশ্রয় নিচ্ছি– তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই– আমাকে পথভ্রষ্ট করা হতে, তুমি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবে না, আর জিন ও ইনসান মৃত্যুবরণ করবে।" –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসের وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ -এর অর্থ হলো–

১. رَجَعْتُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ اِلَى الطَّاعَةِ - পাপ হতে আনুগেত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।

২. اَوْ مِنَ الْغَفْلَةِ اِلَى الذِّكْرِ অথবা অমনোযোগিতা হতে স্মরণের দিকে।

৩. اَوْ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى الْحُضُوْرِ অথবা অনুপস্থিত হতে উপস্থিতির দিকে।

আর اَنْ تُضِلَّنِىْ টি পূর্বোক্ত اَعُوْذُ-এর সাথে সম্পর্কিত। এখানে تُضِلَّ টি هِدَايَة-এর বিপরীত তথা পথভ্রষ্ট অর্থে নয়; বরং এর অর্থ হলো تَغَيُّبُ তথা অনুপস্থিত বা দৃষ্টি ফেরানো। অতএব এর অর্থ হবে– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এক পলকের জন্যও ভুলে যাবেন না; বরং সর্বদা আপনার সম্মুখে নেবেন।

অথবা, এর অর্থ হবে– عَنِ الْقِيَامِ بِاَوَامِرِكَ وَنَوَاهِيْكَ بَلْ اِجْعَلْنِىْ دَائِمَ التَّعَبُّدِ لَكَ

অথবা, اَوْ عَنِ الْاِيْمَانِ بَلْ اِجْعَلْنِىْ دَائِمَ التَّصْدِيْقِ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ –[মিরকাত : খ. ৫. পৃ. ৩২১]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣٥١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالنَّسَائِىُّ عَنْهُمَا)

২৩৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি– জ্ঞান যা উপকারে আসে না, অন্তর যা গলে না, মন যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং দোয়া যা কবুল হয় না।" –[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে এবং নাসায়ী উভয় হতে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আবূ তালেব মাক্কী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ যেমনি একপ্রকার ইলম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তেমনি তিনি শিরক, নিফাক ও মন্দ চরিত্র হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আর যে ইলম আল্লাহভীতি অর্জনে সহায়তা করে না তা দুনিয়া অর্জনের জ্ঞানেরই একপ্রকার এবং স্বীয় মনস্কামনারই একটা অংশ।

আর অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মহান রবকে ভয় করার জন্য। এর জন্য অন্তরকে প্রশস্ত করার লক্ষ্যে এবং এতে আল্লাহ তা'আলার মারেফাতের নূর ঢেলে দেওয়ার জন্য। কাজেই অন্তর যদি এরূপ না হয় তাহলে তা হবে قَاسِيَة যা কঠিন অন্তর । কাজেই তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক। যেমনি মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন–

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

আর মনকেও সৃষ্টি করা হয়েছে এ ধোঁকার স্থান হতে পৃথক হয়ে চিরস্থায়ী আবাসস্থলের দিকে ঝুঁকে পড়ার জন্য। আর যদি তা অতি লোভী হয় এবং দুনিয়া পরিতৃপ্ত না হয়, তাহলে তা হবে ব্যক্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। কাজেই তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করাই হবে সবচেয়ে উত্তম। আর দোয়া কবুল না হওয়ার দলিল হলো, প্রার্থনাকারীর ইলম ও আমল উপকার প্রদান করেনি, তার অন্তর ভয়ভীতি অর্জন করেনি এবং মন পরিতৃপ্ত হয়নি। মহান আল্লাহই হলেন সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শনকারী। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও সর্বোত্তম অভিভাবক।–[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩২১]

وَعَنْ ٢٣٥٢ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৩৫২. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন– কাপুরুষতা, কৃপণতা, বয়সের মন্দতা, অন্তরের ফিতনা ও কবরের আজাব হতে।

–[আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : فِتْنَةُ الصَّدْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তরের সংকীর্ণতা, দুনিয়ার ভালোবাসা এরূপ অন্যান্য বিষয়াবলি। কারো কারো মতে এর দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষ, বাতিল চিন্তা-চেতনা এবং মন্দ চরিত্র উদ্দেশ্য।

ইমাম নববী (র.) বলেন, এর দ্বারা اَلضِّيْقُ বা সংকীর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমনি মহান আল্লাহ বলেন– وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ এ অন্তর এ ধোঁকার পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়ে যা মু'মিনদের জন্য কারাগার এবং স্থায়ী আবাসস্থল হতে সরে থাকে যা হলো জান্নাত, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিন সমপরিমাণ। এটা মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটাই হলো (شَرْحُ الصَّدْرِ) প্রশস্ত অন্তরের বিপরীত যা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন– فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ এ প্রশস্ত অন্তর সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন– اَلتَّجَافِىْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهِ

–[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩২২]

وَعَنْ ٢٣٥٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৩৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া হতে।" –[আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلْفَقْرُ বা দরিদ্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মনের অভাব। অর্থাৎ অন্তরে অর্থসম্পদ জমা করার লোভ। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অর্থসম্পদের অভাব। এর ফলে ধৈর্যের রশি মানুষের হাত হতে ছুটে যায়। বস্তুত অভাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক চাই তা অন্তরের হোক বা ধনসম্পদের ।

اَلْقِلَّةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৎকর্মের স্বল্পতা– অর্থসম্পদের নয়। কেননা নবী করীম ﷺ তো স্বয়ং অর্থসম্পদ কম রাখতেন এবং ধনসম্পদ বেশি রাখাকে অপছন্দ করতেন। আর কম সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন পরিমাণ যা দ্বারা জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট না হয়। যার ফলে ইবাদতে ত্রুটি এসে যায়।

কারো মতে, এখানে ধৈর্যের স্বল্পতা উদ্দেশ্য। আর اَلذِّلَّةُ বা অপমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাপের কারণে প্রাপ্ত বেইজ্জতি। পাপী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক অপদস্থ হয়।

অথবা এর দ্বারা অর্থশালীদের দরিদ্রতার কারণে অপমান হওয়া উদ্দেশ্য। –[মাযাহেরে হক : খ. ৫, পৃ. ২৩৮]

وَعَنْهُ ٢٣٥٤ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

২৩৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, কপটতা ও চরিত্রের অসাধুতা হতে আশ্রয় কামনা করি।" – [আবূ দাঊদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلشِّقَاقُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ। যেমনি পবিত্র কুরআনে এসেছে– بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

ইমাম তীবী (র.) বলেন, اَلشِّقَاقُ হলো اَلْعَدَاوَةُ তথা শত্রুতা। যথা কুরআন মাজীদে আছে– فِىْ عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ কারো মতে شِقَاقٌ হলো اَلْخِلَافُ وَالْعَدَاوَةُ তথা বিপরীত ও শত্রুতা । তবে এ মতটি সঠিক নয়। কেননা مُخَالَفَةٌ টি عَدَاوَةٌ ব্যতীতও হয়ে থাকে, কিন্তু عَدَاوَةٌ টি مُخَالَفَةٌ ব্যতীতও কখনো পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো সত্যের বিপরীত, অথবা সত্যবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ তাতে শত্রুতা আবশ্যক নয়। যেমনি আবূ তালেব নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধাচরণ করতেন কিন্তু শত্রুতা করতেন না; বরং তিনি শত্রুদের প্রতিরোধ করতেন এবং তাঁকে রক্ষা করতেন।

আর نِفَاقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বপ্রকার মুনাফেকি চাই তা বিশ্বাসগত হোক বা আমলগত যেমন– অন্তরে শিরক ও কুফর গোপন রেখে মুখে ইসলাম প্রকাশ করা। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩২৪]

وَعَنْهُ ٢٣٥٥ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

২৩৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি ক্ষুধা হতে, কেননা তা মানুষের কী মন্দ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিশ্বাসঘাতকতা হতে, কেননা তা কত না মন্দ গোপন চরিত্র। –[আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ক্ষুধা হতে এজন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, কেননা এর কারণে শরীর ও অনুভূতি শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, যার ফলে ইবাদত-বন্দেগিতে ত্রুটি ও অমনোযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। কাজেই সবচেয়ে মন্দ ক্ষুধা তা যা ত্রুটির কারণ হয়। তবে যে ক্ষুধা মানুষকে চেষ্টা-সাধনার পথে স্থির রাখে ও তার অনুযায়ী হয় তা মন্দ নয়; বরং এটা মানুষের অভ্যন্তরকে পরিষ্কার ও আলোকিত করে এবং শরীরকে সুস্থ রাখে।

اَلْخِيَانَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করা এবং মানুষের অর্থসম্পদ ও মান-ইজ্জত বিনষ্ট করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। মূলত এটা শরয়ী সকল কষ্ট দেওয়াকে শামেল করে, যেমনি কুরআনে এসেছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ.

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৩৯]

وَعَنْ ٢٣٥٦ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

২৩৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমুদয় হতে।"

–[আবূ দাঊদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : سَيِّءُ الْأَسْقَامِ অংশটি খাসের পর عَامٌّ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ প্রথমে বিশেষ করে কয়েকটি রোগ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এরপর عَامٌّ বা ব্যাপক রোগ হতে আশ্রয় কামনা করেছেন। যেমন– প্রবল তৃষ্ণা রোগ, ক্ষয় জ্বর, স্থায়ী কোনো রোগ ইত্যাদি। উল্লিখিত রোগসমূহ হতে আশ্রয় কামনা করার কারণ হলো, যে ব্যক্তি উক্ত রোগসমূহে আক্রান্ত হয়, অধিকাংশ লোক তাকে ঘৃণা করে এবং তার সাথে চলাফেরা হতে বিরত থাকে। এছাড়া শ্বেত ও কুষ্ঠ এমন রোগ যার ফলে মানুষের শরীর বিকৃত ও অসুন্দর হয়ে যায়। ফলে সে শারীরিকভাবে যেন মানুষের কাতার হতেই বের হয়ে যায়। এছাড়া এ রোগ স্থায়ীভাবে থেকে যায়, কখনো দূর হয় না। এর বিপরীত অন্যান্য রোগে কষ্ট কম হয় এবং ছওয়াবও অধিক পাওয়া যায়।

ইবনুল মালেক (র.) বলেন, অত্র হাদীসের সারকথা হলো, যে রোগ এমন হয় যে, যার ফলে মানুষ তার থেকে দূরে থাকে। স্বয়ং রোগীও অন্যের থেকে পৃথক হতে পারে না এবং অন্য কেউ তার থেকে কোনো উপকারও অর্জন করতে পারে না। আর উক্ত রোগের কারণে রোগী আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার হক আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তবে এ জাতীয় রোগ হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা মোস্তাহাব।

ওলামাদের মতে কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ সংক্রামক নয়। তবে অধিকাংশ সময় এ রকম হয় যে, কুষ্ঠ রোগীর সাথে শরীর লাগানোর কারণে বা কুষ্ঠ রোগের পুঁজ লাগার কারণে এটা সৃষ্টি হয়ে যায়। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪০]

وَعَنْ ٢٣٥٧ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৩৫৭. অনুবাদ : হযরত কুতবা ইবনে মালেক (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মন্দ চরিত্র, মন্দ কার্য ও মন্দ আকাঙ্ক্ষা হতে।" –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : مُنْكَرَاتٌ সেসব কর্মকে বলে যেগুলোকে শরিয়ত ভালো মনে করে না; বরং মন্দ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করে। আর اَخْلَاقٌ দ্বারা 'অভ্যন্তরীণ আমল' উদ্দেশ্য। কাজেই مُنْكَرُ الْأَخْلَاقِ থেকে আশ্রয় গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হলো 'অন্তরের মন্দ কাজ', যেমন– হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা ইত্যাদি হতে আশ্রয় গ্রহণ।

আর মন্দ আমল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রকাশ্য মন্দকাজসমূহ এবং মন্দ কামনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাতিল বিশ্বাস, ভুল চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪০]

وَعَنْ ٢٣٥٨ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ تَعْوِيْذًا اَتَعَوَّذُ بِهٖ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَشَرِّ بَصَرِيْ وَشَرِّ لِسَانِيْ وَشَرِّ قَلْبِيْ وَشَرِّ مَنِيِّيْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

২৩৫৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] শুতাইব ইবনে শাকাল ইবনে হুমায়দ তাঁর পিতা শাকাল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদা বললাম, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করতে পারি। তিনি বললেন, বল, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার অপকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের অপকারিতা হতে।" -[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** شَرِّ سَمْعِيْ দ্বারা এমন কিছু না শুনা যা অপছন্দনীয়, شَرِّ بَصَرِيْ দ্বারা এমন বস্তু দেখা যাতে আল্লাহ তা'আলা খুশি নন, وَشَرِّ لِسَانِيْ দ্বারা অনর্থক কথাবার্তা বলা আর وَشَرِّ قَلْبِيْ দ্বারা বাতিল বিশ্বাস, মন্দ চিন্তা-চেতনা উদ্দেশ্য, আর وَشَرِّ مَنِيِّيْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বীর্যের প্রাবল্য যার ফলে জেনায় লিপ্ত হয়ে যায়।

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে فَرْجِهٖ তথা তার লজ্জাস্থান।

কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, اَلْمَنِيِّيْ টি اَلْمَنِيَّةُ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো- طُوْلُ الْاَمَلِ তথা দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা। গ্রন্থকার (র.) বলেন, আমার মতে এটা বিশুদ্ধ নয়। কেননা اَلْمَنِيَّةُ (بِفَتْحِ الْمِيْمِ) -এর অর্থ اَلْمَوْتُ বা মৃত্যু এবং বীর্য অর্থেও আসে আবার তা اَلْاُمْنِيَّةُ বা আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থেও আসে [তখন اَلْمُنِيُّ হবে بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ] এটা قَامُوْس লুগাতে আছে।

ইবনে হাজার (র.) বলেন, এটা اَلْمَنِيَّةُ-এর বহুবচন অর্থাৎ مِنْ شَرِّ الْمَوْتِ তথা মন্দ কর্মের সময় রূহ কবজ করা হতে। -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩২৮]

وَعَنْ ٢٣٥٩ اَبِي الْيَسَرِ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى وَالْغَمِّ)

২৩৫৯. অনুবাদ : হযরত আবুল ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দোয়া করতেন- "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি [আমার উপর] কিছু ধসে পড়া হতে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি উপর হতে পড়া, পানিতে ডুবা, আগুনে পোড়া ও বার্ধক্য হতে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি মউতের সময় আমাকে শয়তান যেন গোমরাহ না করে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি যাতে তোমার রাস্তায় পিঠ দিয়ে না মরি এবং তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি আমি যেন দংশিত হয়ে না মরি।" -[আবূ দাউদ ও নাসাঈ। নাসাঈর অপর এক বর্ণনায় অধিক রহিয়াছে, "ও শোক" হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] :

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, হাদীসে উল্লিখিত বিষয়াবলির কিছু তো এমন আছে যে যার ফলে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের দরজা পাওয়া যায়। তথাপি নবী করীম ﷺ কেন এগুলো হতে আশ্রয় কামনা করেছেন?

উত্তর : এর জবাবে বলা যায় যে, এসব বিষয়ে আপতিত হলে কষ্ট, বিপদাপদ ও হয়রানির সীমা থাকে না। ফলে এ নাজুক অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে না পেরে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পরকালীন সৌভাগ্য হারিয়ে বসে। এজন্য নবী করীম ﷺ এগুলো হতে আশ্রয় কামনা করেছেন এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দিয়েছেন।

অধিক বার্ধক্য হতে আশ্রয় কামনা করার অর্থ হলো, এর ফলে মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি শক্তি সবই হারিয়ে বসে ফলে অপ্রয়োজনীয় কথা মুখ হতে নির্গত হয় এবং ইবাদতে ত্রুটি এসে যায়। কথিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কালাম হেফজ বা স্মরণ করে সে এসব মসিবত হতে নিরাপদ থাকে। -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ২৪১]

وَعَنْ ٢٣٦٠ مُعَاذٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِيْ إِلٰى طَبَعٍ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২৩৬০. অনুবাদ : হযরত মু'আয (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন- তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা কর লালসা হতে, যা মানুষকে দোষের দিকে নিয়ে যায়। -[আহমদ। আর বায়হাকী দা'আওয়াতুল কাবীরে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** طَمَعٌ -এর অর্থ হলো- সৃষ্টিজীব আল্লাহ তা'আলার নিকট ধন-দৌলতের আশা করা। আর طَبَعٌ -এর মূল অর্থ হলো- তলোয়ারে মরিচা-পড়া। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দোষ-ত্রুটি। এ কারণে অত্র হাদীসে طَمَعٌ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন লোভ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা যা মানুষের জীবনকে দোষ-ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। কাজেই এ লালসাও দোষের। -[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪২]

وَعَنْ ٢٣٦١ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيْذِيْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا فَإِنَّ هٰذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৩৬১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর এর অপকারিতা হতে, কেননা এটাই হলো সে গাসেক বা অস্তগামী যখন তা অন্ধকার হয়ে যায়। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** পবিত্র কুরআনের সূরা ফালাকে যে কয়টি বিষয় হতে আশ্রয় প্রর্থনার হুকুম প্রদান করা হয়েছে এর মধ্য হতে غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ -এর উল্লেখও আছে। অর্থাৎ আশ্রয় প্রার্থনা কর অন্ধকারে ছেয়ে ফেলা অমঙ্গল হতে যখন তা আলোহীন হয়ে যায়। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর ভাষণ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ -এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'চাঁদের গ্রহণ বা রাহুগ্রাস'। এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আদেশের কারণ হলো, এটা মসিবত অবতীর্ণ হওয়ার একটি চিহ্ন।

হাদীসে এসেছে, যখন চন্দ্রগ্রহণ লাগত তখন নবী করীম ﷺ দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন।

তবে এখানে বিপদাপদ দ্বারা উদ্দেশ্য তা নয় যা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ব্যাপারে জ্যোতিষী ও ভণ্ড-মূর্খরা বলে থাকে। সত্যপন্থীদের মতে এসব অমূলক কথা। এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এগুলো শিক্ষা গ্রহণের স্থান; যেমন চন্দ্রগ্রহণ হয় তখন এটা একটা শিক্ষা গ্রহণের বড় একটা স্থান যা প্রত্যেক মানুষ অনুভব করে যে, যখন চাঁদ তার এত উজ্জ্বলতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার নিজের আলো হারিয়ে ফেলেছে এবং আলোকে ঠিক রাখার তার নিজের কোনোই ক্ষমতা নেই, তাহলে আমাদেরও যেন এরকম না হয় যে, আমাদের ঈমান ও আমলের নূর চলে যায়। কাজেই এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চন্দ্রগ্রহণ হওয়া, কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসির مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ -এর তাফসীরে অন্ধকার রাতের কথা বলেছেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪২]

وَعَنْ ٢٣٦٢ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيْ يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلٰهًا قَالَ أَبِيْ سَبْعَةً سِتًّا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِيْ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

২৩৬২. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ আমার পিতা হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতজন মা'বূদকে তুমি এখন পূজা কর? আমার পিতা জবাবে বললেন, সাতজনকে– ছয়জন জমিনে আর একজন আসমানে। তিনি বললেন, আশা ও ভয়ে এদের মধ্যে কাকে ঠিক রাখ? আমার পিতা বললেন, যিনি আসমানে আছেন তাকে। রাসূল ﷺ বললেন, তবে শুন হুসাইন, যদি তুমি মুসলমান হও, আমি তোমাকে দুটি বাক্য শিক্ষা দেব যা তোমাকে উপকার দেবে। ইমরান বলেন, যখন আমার পিতা হুসাইন মুসলমান হলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দুটি বাক্য শিক্ষা দিন, যার ওয়াদা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, [সেই আসমানের মা'বূদকে] বল, "হে আল্লাহ! আমার অন্তরে সৎপথের সন্ধান দাও এবং আমাকে আমার মনের অপকারিতা হতে পানাহ দাও।" –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : وَاحِدًا فِي السَّمَاءِ 'একজন আসমানে' এ কথা হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর ধারণা অনুযায়ী বলেছেন। কেননা তখন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তখন তাঁর এ কথা জানা ছিল না যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো জায়গা নির্দিষ্ট নেই; বরং তিনি আসমান ও জমিনের সকল স্থানে রয়েছেন– তাঁর জন্য কোনো স্থান নির্দিষ্ট নেই।

অথবা তাঁর কথার উদ্দেশ্য হলো, সেই আল্লাহ তা'আলা যার ইবাদত আসমানের ফেরেশতাগণ করে।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৫, পৃ. ২৪৩]

قَوْلُهُ سِتًّا فِي الْأَرْضِ : জমিনের সেই ছয় মূর্তি হলো– يَغُوْثُ [ইয়াগুছ] يَعُوْقُ [ইয়াউক] نَسْرٌ [নশর] اَللَّاتُ [লাত] اَلْمَنَاةُ [মানাত] وَالْعُزّٰى [এবং উযযা]। এ সবগুলো হলো مُؤَنَّثٌ যা স্ত্রীলিঙ্গ। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৩২]

وَعَنْ ٢٣٦٣ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا فَزِعَ اَحَدُكُمْ فِى النَّوْمِ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنَ فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهٖ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِىْ صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِىْ عُنُقِهٖ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ)

২৩৬৩. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায়, তখন সে যেন বলে, "আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহর রোষ ও তাঁর শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে এবং শয়তানের খটকা হতে, আর তারা যেন আমার নিকট উপস্থিত হতে না পারে।" এতে শয়তানের খটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না। রাবী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর তার সন্তানদের মধ্যে যারা বালেগ তাদেরকে এটা শিখিয়ে দিতেন, আর যারা বালেগ নয় কাগজে লিখে তাদের গলায় লটকিয়ে দিতেন। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী। পাঠ তিরমিযীর]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নিদ্রাবস্থায় ভয় পাওয়া শয়তানের কারণেই হয়ে থাকে। তথা শয়তান মানুষকে ঘুমের ঘোরে বিভিন্ন কিছু দেখিয়ে ভয় প্রদর্শন করে।

অত্র হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, গলায় তাবিজ লাগানো জায়েজ আছে, যদিও এ ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে তথাপি অধিক বিশুদ্ধ ও সঠিক অভিমত হলো, বিভিন্ন রক্ষাকবচ গলায় লাগানো হারাম ও মাকরূহ। কিন্তু এরূপ তাবিজ লাগানো জায়েজ যাতে কুরআন ও হাদীসের বাক্য বা আল্লাহ তা'আলার নাম লিখা হয়েছে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪৪]

وَعَنْ ٢٣٦٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

২৩৬৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে তিনবার আল্লাহর নিকট জান্নাত চায়, জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর যে তিনবার দোজখ হতে আশ্রয় কামনা করবে, দোজখ বলে, হে আল্লাহ! তাকে দোজখ হতে মুক্তি দাও! –[তিরমিযী ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'তিনবার পাঠ করবে' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তা এক বৈঠকেও হতে পারে আবার বিভিন্ন বৈঠকেও হতে পারে। তবে এ দোয়ার জন্য দোয়ার সম্পূর্ণ আদাব তথা একনিষ্ঠতা, অক্ষমতা, ঐকান্তিকতা, নরম অন্তরপূর্ণ আশা ইত্যাদি থাকতে হবে।

অথবা ثَلَاثَ مَرَّاتٍ দ্বারা তিন সময়ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর তা হলো– ১. সৎকর্ম সম্পাদনের পরে, ২. পাপ কাজ করে ফেললে এবং ৩. বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লে।

অথবা, ১. اَلتَّصْدِيْقُ তথা সত্যায়নের সময় ২. اَلْاِقْرَارُ তথা মৌখিক স্বীকৃতির সময় এবং ৩. اَلْعَمَلُ তথা আমল করার পরে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৩৪]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣٦٥ الْقَعْقَاعِ اَنَّ كَعْبَ الْاَحْبَارِ قَالَ لَوْلَا كَلِمَاتٌ اَقُوْلُهُنَّ لَجَعَلَتْنِىْ يَهُوْدُ حِمَارًا فَقِيْلَ لَهُ مَا هُنَّ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ شَىْءٌ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَاَ وَبَرَاَ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

২৩৬৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কা'কা বলেন, হযরত কা'বে আহবার (র.) বলেছেন, যদি আমি এ বাক্যগুলো না বলতাম, তবে ইহুদিরা আমাকে নিশ্চয় গাধা বানিয়ে দিত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোনগুলো? তিনি বললেন, এগুলো– "আমি মহান আল্লাহর সত্তার আশ্রয় নিচ্ছি যার অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই এবং আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি যেগুলোকে অতিক্রম করার ক্ষমতা ভালোমন্দ কোনো লোকের নেই। আরো আমি আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহর আসমায়ে হুসনা বা উত্তম নামসমূহের, যা আমি অবগত আছি, আর যা আমি অবগত নই, তাঁর সৃষ্টির অপকারিতা হতে যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ও জগতে ছড়িয়ে রেখেছেন।" –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত কা'বে আহবার (র.) ইহুদিদের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ -এর যুগ পেলেও তখন ইসলাম গ্রহণ ও রাসূল ﷺ -এর সাথী হওয়া ও ঈমানের সাথে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। অবশেষে হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সেই ঘটনাকে অত্র হাদীসে হযরত কা'ব (র.) বর্ণনা করেন যে, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন ইহুদিরা আমার শত্রু হয়ে গেল। তারা আমার প্রতি এমন হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করত যে, যদি তারা তাদের কর্মে সফল হতো এবং আমি উক্ত দোয়া পাঠ না করতাম তবে তারা আমাকে গাধা বানিয়ে ছাড়ত তথা আমি যদি উক্ত দোয়া না পড়াতাম তবে তারা যাদু দ্বারা আমাকে গাধা বানিয়ে ফেলত। অর্থাৎ আমাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্বোধ করে ফেলত এবং গাধার মতো আমার জ্ঞান লোপ করে দিত।

আর আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পবিত্র কুরআন। আর لَا يُجَاوِزُهُنَّ তথা অতিক্রম না করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর ছওয়াব বা শাস্তি হতে কেউ বাইরে যেতে পারেবে না। উদাহরণত মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যাদের বিনিময় ও ছওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অথবা যাদের শাস্তি প্রদানের ফয়সালা করেছেন অথবা যেসব বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন এসব নিঃসন্দেহে করবেন। এতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভব নয়।

অথবা আল্লাহ তা'আলার কালিমাসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি এবং তাঁর জ্ঞানসমূহ-এর থেকে কোনো কিছুই বাইরে নেই। সবকিছুকেই তাঁর জ্ঞান বেষ্টন করে আছে। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪৫]

قَوْلُهُ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ -এর ব্যাখ্যা : এখানে بَرٌّ ও فَاجِرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষ। কেননা تَاكِيْد শব্দ বারবার আনার দ্বারা সকলকে বেষ্টনই উদ্দেশ্য। কাজেই بَرٌّ ও فَاجِرٌ -এর ব্যাখ্যায় মু'মিন-কাফের, ভালো-মন্দ, বাধ্য-অবাধ্য বলা যায়। এ দু অবস্থা অতিক্রম করতে পারে না। আর এর ফলে সাব্যস্ত হবে প্রতিশ্রুতি ও ধমক এবং ছওয়াব ও শাস্তি ইত্যাদি।

–[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৩৮]

وَعَنْ ٢٣٦٦ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَانَ اَبِىْ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ اَقُوْلُهُنَّ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ عَمَّنْ اَخَذْتَ هٰذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِىْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ وَرَوٰى اَحْمَدُ لَفْظَ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَهُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ)

২৩৬৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] মুসলিম ইবনে আবূ বাকরা (র.) বলেন, আমার পিতা আবূ বাকরা নামাজের শেষে বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি কুফরি, পরমুখাপেক্ষিতা ও কবরের আজাব হতে।" আর আমিও তা বলতাম। একদা তিনি আমাকে বললেন, হে ছেলে! তুমি এটা কার নিকট হতে গ্রহণ করলে? আমি বললাম, আপনার নিকট হতেই তো। তিনি বললেন, তবে শুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা নামাজ শেষে বলতেন। –[তিরমিযী। নাসাঈ 'নামাজ শেষে' শব্দ ব্যতীত। আহমদ শুধু দোয়াটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, 'প্রত্যেক নামাজ শেষে।']

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : অত্র হাদীসে দরিদ্রতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। আর তা হলো অন্তরের দরিদ্রতা যা মানুষকে নিয়ামত অস্বীকারের দিকে নিয়ে যায়। আর একে كُفْر -এর সাথে উল্লেখ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا তথা দরিদ্রতা মানুষকে কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৩৯]

وَعَنْ ٢٣٦٧ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلَانِ قَالَ نَعَمْ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

২৩৬৭. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় নিচ্ছি কুফরি ও ঋণ হতে।" এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! ঋণকে আপনি কুফরির সমান মনে করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অপর বর্ণনায় রয়েছে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় নিচ্ছি কুফরি ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে।" তখন এক ব্যক্তি বলল, এ দুটি কি সমান? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। –[নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কুফর ও ঋণ উভয়কে নবী করীম ﷺ এক সমান বলেছেন। কেননা ঋণের কারণে মিথ্যা বলে, প্রতারণার আশ্রয় নেয় এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। আর এটা স্পষ্ট যে, এসব মন্দ স্বভাব কাফের ও মুনাফিকদের মধ্যে থাকে।

এছাড়া এ দুটোকে সমান বলার কারণ হলো, দরিদ্রতার কারণে মানুষ অধৈর্য হয়ে পড়ে, নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দেয়, তাকদীরকে মন্দ বলে এবং স্বীয় মুখ হতে এমন কথা বের হয় যা কুফরির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই বর্ণিত হয়েছে– كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪৬]

بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ

পরিচ্ছেদ : ব্যাপক অর্থবহ দোয়া

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে উল্লিখিত দোয়াসমূহ ছিল اِسْتِغْفَارٌ [ক্ষমা প্রার্থনা] اِسْتِعَاذَةٌ [আশ্রয় প্রার্থনা] এবং বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট। আর অত্র পরিচ্ছেদে সেসব দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো সকল উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। কোনো বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় পড়া যেতে পারে। এজন্য এগুলোকে جَامِعُ الدُّعَاءِ [ব্যাপক অর্থবহ দোয়া] বলা হয়েছে।

ইমাম তীবী (র.) বলেন– جَامِعُ الدُّعَاءِ টি اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়ে এমন দোয়া উদ্দেশ্য যা (اَلْفَاظٌ قَلِيْلَةٌ مَعْنًى كَثِيْرَةٌ) শব্দ কম অর্থ বেশির জন্য ব্যাপক হয়েছে যাদেরকে جَوَامِعُ الْكَلِمِ বলা হয়।

–[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৭]

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٣٦٨ - عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَائِىْ وَعَمْدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি কখনও এরূপ দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার অপরাধ, আমার অজ্ঞতা এবং আমার কাজে আমার সীমালঙ্ঘন, আর যা তুমি আমার অপেক্ষাও অধিক জান। হে আল্লাহ! মাফ কর যা আমি ইচ্ছা করে করি, ঠাট্টা-রূপে করি; আমার ভুলে কৃত বিষয় ও ইচ্ছাকৃত বিষয় আর এর সকলটিই আমার নিকট আছে। হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার গুনাহ আমি যা পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি [বা করব]; যা আমি গোপনে করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জান। তুমিই আগে বাড়াও ও পিছে হটাও এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর তুমি ক্ষমতাবান।" –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ এসব কর্ম আমার পক্ষ হতে। এ কথা নবী করীম ﷺ -এর নিজের অবনত হওয়া, অক্ষমতা এবং ছোট হওয়ার লক্ষণ তথা মহান আল্লাহর দরবারে একেবারে হীন, অপদস্থ ছোট বুঝাবার জন্য তিনি এমনটা বলেছেন। কেননা নবী করীম ﷺ তো পূর্বাপর সকল পাপ হতে মুক্ত।

অথবা এ দোয়া তিনি বলেছেন উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার লক্ষ্যে।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪৬]

وَعَنْ ٢٣٦٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِى الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِى الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন– "হে আল্লাহ! তুমি ঠিক করে দাও আমার ধর্ম, যা পবিত্র করবে আমার কর্ম; ঠিক করে দাও আমার ইহকাল, যাতে রয়েছে আমার জীবন; ঠিক করে দাও আমার পরকাল, যাতে হবে আমার প্রত্যাবর্তন এবং আমার হায়াতকে বৃদ্ধি কর প্রত্যেক কল্যাণকর কাজে, আর আমার মউতকে কর আমার পক্ষে প্রত্যেক অকল্যাণ হতে শান্তিস্বরূপ।" –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুনিয়ার সঠিক হওয়া রিজিকের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যা হালাল উপায়ে, সন্দেহ-সংশয়মুক্ত পথে অর্জিত হয়। এ রিজিকের ফলে ইবাদতে শক্তি পাওয়া যায়, অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হয় এবং ইবাদতে মনোযোগের বিঘ্ন ঘটে না। পরকালীন ঠিক করা বিশুদ্ধ বিশ্বাস, সৎকর্ম ও সঠিক পথের তৌফিক অর্জনের মাধ্যমেই হয়, যা পরকালীন আজাব হতে মুক্তির কারণ এবং সেই জগতের সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। দোয়ায় শেষ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, আমার জীবনের সমাপনী যেন كَلِمَةُ شَهَادَةٍ, সঠিক বিশ্বাস এবং তওবা করার পর হয়। তাহলে আমার মৃত্যু ইহকালীন কষ্ট-ক্লেশ ও মসিবত হতে মুক্তি ও পরকালীন প্রশান্তি অর্জনের কারণ। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪৭]

وَعَنْ ٢٣٧٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৭০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সৎপথ, সংযম ও হারাম হতে বেঁচে থাকা এবং অমুখাপেক্ষিতা কামনা করি।" –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلْعَفَافُ (بِالْفَتْحِ)-এর অর্থ اَلْكَفَافُ তথা বিরত থাকা। কারো মতে اَلْعِفَّةُ عَنِ الْمَعَاصِىْ তথা পাপ হতে মুক্ত থাকা। যেমন বলা হয়– عَفَّ عَنِ الْحَرَامِ

আল্লামা আবুল ফতূহ নিশাপুরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, اَلْعَفَافُ اِصْلَاحُ النَّفْسِ وَالْقَلْبِ অর্থাৎ মন ও অন্তরের সংশোধনই হলো اَلْعَفَافُ –

ইমাম তীবী (র.) বলেন, এখানে اَلْهُدٰى ও اَلتُّقٰى-কে مُطْلَقْ-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে ইহকাল, পরকাল, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি কল্যাণকর সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আর যা হতে বেঁচে থাকা উচিত। যেমন– শিরক, পাপাচারিতা ও নিচু স্বভাব ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

পরিশেষে اَلْعَفَافُ ও اَلْغِنٰى-এর প্রার্থনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার পর তা (عَامٌ) ব্যাপক করা হয়েছে। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৪৪]

وَعَنْ ٢٣٧١ عَلِىٍّ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ وَاذْكُرْ بِالْهُدٰى هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقَ وَبِالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৭১. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি বল, "হে আল্লাহ! আমাকে পথ দেখাও এবং আমাকে সরল-সোজা রাখ।' আর 'পথ' বলতে তুমি আল্লাহর পথ এবং 'সোজা' বলতে খেয়াল করবে তীরের ন্যায় সোজা মনে করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসের সর্বশেষ কথার উদ্দেশ্য হলো, যখন তুমি মহান আল্লাহর নিকট হেদায়েত চাইবে তখন তোমার অন্তরে এ কথা থাকা আবশ্যক যে, আমাকে সেই সঠিক পথ প্রদর্শন কর যে পথ তোমার সৎ বান্দাগণ পেয়েছে। আর যখন তুমি সোজা-সঠিক রাখার প্রার্থনা করবে তখন এভাবে বলবে– আমি এমন পথ চাই যা তীরের ন্যায় সোজা তথা মহান আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ ও একেবারে সঠিক পথ প্রার্থনা কর তাহলে মহান আল্লাহ উক্ত পথের সৌভাগ্য দান করবেন। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৪৮]

وَعَنْ ٢٣٧٢ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ اِذَا اَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلٰوةَ ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২৩৭২. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] আবূ মালেক আশজায়ী (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– যখন কোনো লোক মুসলমান হতো তখন নবী করীম ﷺ তাকে প্রথমে নামাজ শিক্ষা দিতেন অতঃপর তাকে এই বাক্যসমূহ দ্বারা দোয়া করতে বলতেন– "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর, আমাকে দয়া কর, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে শান্তিতে রাখ এবং আমাকে রিজিক দাও।" –[মুসলিম]

وَعَنْ ٢٣٧٣ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৭৩. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অধিকাংশ সময়ের দোয়া ছিল– "হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ দোজখের আজাব হতে।" [কুরআন] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ অধিকাংশ সময় এ দোয়া পাঠ করতেন। কেননা এটা একটি جَامِعٌ বা ব্যাপক অর্থবহ দোয়া, যাতে ইহকালীন ও পরকালীন সকল উদ্দেশ্য এসে যায়। এ ছাড়া এটা কুরআনেরও আয়াত।
কিছু সংখ্যকের মতে, فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– আনুগত্য, অল্পে-তুষ্টি এবং পাপ-পঙ্কিলতা হতে মুক্তি ইত্যাদি। আর وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– হিসাবের সহজতা, আজাবের মুক্তি, জান্নাতে প্রবেশ এবং মহান আল্লাহর দিদার লাভ ইত্যাদি। –[মাযাহেরে হক ও মিরকাত]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣٧٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ يَقُوْلُ رَبِّ اَعِنِّىْ وَلَا تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْ لِىْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ

২৩৭৪. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ দোয়া করতেন এবং বলতেন– "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে মদদ কর, আমার বিরুদ্ধে মদদ করো না। আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না। আমার পক্ষে উপায় উদ্ভাবন কর, আমার বিরুদ্ধে উপায় উদ্ভাবন করো না। আমাকে পথ দেখাও, আমার জন্য পথ সহজ কর এবং যে আমার প্রতি জবরদস্তি করে তার উপর আমাকে জয়ী কর। হে পরওয়াদেগার! আমাকে

لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَاهْدِ قَلْبِىْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِىْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

তোমারই কৃতজ্ঞ কর, তোমারই স্মরণকারী কর, তোমারই ভয়ে ভীত কর, তোমারই অনুগত কর, তোমারই কাছে বিনম্র কর, [গুনাহের কারণে] তোমারই নিকট দুঃখ প্রকাশ করতে শিখাও এবং তোমারই দিকে রুজু কর। হে প্রভু! আমার তওবা কবুল কর, আমার গুনাহ ধুয়ে দাও, আমার ডাকে সাড়া দাও, আমার প্রমাণ [ঈমান] দৃঢ় কর, আমার জবান ঠিক রাখ, আমার অন্তরকে হেদায়েত কর এবং আমার অন্তরের কলুষতা দূর কর।"

–[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلْمَكْرُ শব্দের অর্থ اَلْخِدَاعُ তথা ধোঁকা বা প্রতারণা, তবে এটা মহান আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হলে অর্থ হবে– তাঁর শত্রুদের প্রতি এমনভাবে মসিবত দেওয়া যা তারা বুঝতেও পারে না।

ইবনুল মালেক বলেন–اَلْمَكْرُ الْحِيْلَةُ وَالْفِكْرُ فِىْ دَفْعِ عَدُوٍّ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ الْعَدُوُّ –[মিরকাত]

وَعَنْ ٢٣٧٥ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكٰى فَقَالَ سَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَاِنَّ اَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

২৩৭৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়ালেন অতঃপর কেঁদে দিলেন এবং বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর আর শান্তি চাও। কেননা ঈমানের পর কাউকেও শান্তি অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করা হয় না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান তবে সনদ হিসেবে গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : নবী করীম ﷺ এটা জানতেন যে, তাঁর উম্মত কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা এবং কামভাবের প্রাবল্যের পরীক্ষায় পতিত হবে। তাই তিনি এগুলো খেয়াল করে কাঁদতে শুরু করেন এবং এমন একটা সময় আসবে, যখন মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়ে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে শরিয়তের গণ্ডি হতে বের হয়ে যাবে। তাই নবী করীম ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, হে মানব সকল! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সেসব মসিবত হতে মুক্ত ও নিরাপদ রাখবেন।

وَعَنْ ٢٣٧٦ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

২৩৭৬. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, তোমার প্রভুর নিকট ইহ-পরকালের শান্তি ও নিরাপত্তা চাও। অতঃপর সে দ্বিতীয় দিন এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া শ্রেষ্ঠ? তিনি তাকে এর

اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَدْ اَفْلَحْتَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

ন্যায়ই উত্তর দিলেন। অতঃপর সে তৃতীয় দিন এসে জিজ্ঞাসা করল, আর তিনি তাকে ঐরূপই উত্তর দিলেন এবং বললেন, ইহ-পরকালে যখন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলে তখন নাজাত লাভ করলে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান তবে সনদের বিবেচনায় তা গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে اَلْعَافِيَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীন ও শরীরগত শান্তি আর اَلْمُعَافَاةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিজগৎ এবং তাদের সাথে চলাচলের কারণে যে ফিতনা আপতিত হয় তা হতে মুক্তি।

অথবা اَلْعَافِيَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلْمُسَامَحَةُ فِىْ حَقِّ اللّٰهِ তথা আল্লাহ তা'আলার হকের বিষয়ে যে ভুলত্রুটি হয় তা হতে মুক্তি আর اَلْمُعَافَاةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বান্দার অধিকারের ব্যাপারে যে ত্রুটি হয় তা হতে নিরাপত্তা। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৫০]

وَعَنْ ٢٣٧٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِىِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِىْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِىْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّىْ مِمَّا اُحِبُّهُ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৩৭৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ খাতমী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আপন দোয়ায় বলতেন– "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার মহব্বত এবং যার মহব্বত তোমার নিকট আমাকে কাজ দেবে তার মহব্বত দান কর। হে আল্লাহ! আমি ভালোবাসি এমন যা তুমি আমাকে দান করেছ, তাকে তুমি আমার পক্ষে অবলম্বনস্বরূপ কর যা তুমি ভালোবাস তার জন্য। হে আল্লাহ! আমি যা ভালোবাসি তার যতখানি তুমি আমার থেকে দূরে রেখেছ তাকে তুমি যা আমার পক্ষে ভালোবাস তা করার জন্য সুযোগস্বরূপ কর।" –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে উল্লিখিত দোয়ার শেষ অংশের উদ্দেশ্য হলো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ধনসম্পদ প্রদান করনি একে আমার পক্ষে তোমার ইবাদতে লিপ্ত থাকার কারণ বানাও, যাতে অল্পে তুষ্টি ও তাওয়াক্কুলের মতো বিষয় অর্জিত হয়। আর যে সম্পদ আমার অর্জিত হয়নি তার থেকে বিমুখ হয়ে কোনো প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত তোমার ইবাদতে যেন লিপ্ত হতে পারি।

দোয়ার সর্বশেষ উভয় বাক্যের মূল কথা হলো, তুমি আমাকে যে অর্থসম্পদ দান করেছ, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তৌফিক প্রদান কর! যাতে আমি শোকরকারী ধনী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। আর যেসব সম্পদ আমার অর্জিত হয়নি তা হতে আমর অন্তরকে দূরে রাখ, যাতে আমি তা হতে বিমুখ হই এবং অন্তরে তার কোনো স্থান না দেই এবং আমাকে পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে তোমার ইবাদতে লিপ্ত রাখ। আর অভিযোগ ও হায়-হুতাশ না করি, যাতে আমি ধৈর্যশীল গরিবদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ.২৫১]

قَوْلُهُ مِمَّا اُحِبُّ -এর ব্যাখ্যা : 'আমি যা ভালোবাসি' এর অর্থ হলো, সেসব কিছু যা তুমি আমাকে দান করেছ এবং আমি তা ভালোবাসি যেমন– সুস্থতা, শক্তি, দুনিয়ার উপকরণ যথা– অর্থসম্পদ, মান-মর্যাদা, সন্তানসন্ততি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অবসর ইত্যাদি। আর فِيْمَا تُحِبُّ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইবাদত, আনুগত্য ও জিকির-ফিকির। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৫১]

وَعَنْ ٢٣٧٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتّٰى يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِاَصْحَابِهٖ اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ـ

২৩৭৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো মজলিস হতে খুব কমই উঠতেন, যাবৎ না তাঁর সহচরদের জন্য এ দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঐ পরিমাণ তোমার ভয় দান কর, যা দ্বারা তুমি আমাদের মধ্যে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে; তোমার ইবাদত-আনুগত্যের এ পরিমাণ দান কর যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জন্নাতে পৌঁছাবে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাসের ঐ পরিমাণ দান কর যা দ্বারা তুমি আমাদের প্রতি দুনিয়ার বিপদসমূহ সহজ করে দেবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার সাধিত কর আমাদের কানের দ্বারা, আমাদের চোখের দ্বারা ও আমাদের শক্তির দ্বারা, যাবৎ তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী বাকি রাখ! হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধকে সীমাবদ্ধ রাখ তাদের প্রতি, যারা আমাদের প্রতি জুলুম করেছে এবং আমাদের সাহায্য কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। হে আল্লাহ! আমাদের দীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলো না এবং দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা করো না। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি চাপিয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা আমাদের প্রতি দয়া করবে না।" –[তিরমিযী; তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তুমি আমাকে সত্তা ও গুণাবলি এবং নবী করীম ﷺ -এর বাণী ও শিক্ষার প্রতি এ পরিমাণ ঈমান ও বিশ্বাস দান কর যাতে ইহকালীন মসিবত ও বিপদাপদ আমার জন্য সহজ হয়ে যায়। উদাহরণত যদি কোনো ব্যক্তির এ বিশ্বাব জন্মে যে, মহান আল্লাহ সকল জীবের রিজিকদাতা এবং সকল জীবের সর্বপ্রকারের প্রয়োজন পূর্ণ করেন তবে তার কখনো কোনো চিন্তা হবে না এবং সে মহান আল্লাহর জাতের উপর নির্ভর ও ভরসা করবে। এমনিভাবে যদি কারো এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, পরকালের কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদাপদ অনেক বেশি তখন দুনিয়াবি বিপদাপদ তাকে কোনো সমস্যায় ফেলবে না এবং এসব সমস্যা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। আর এগুলো তার জন্য সহজই হয়ে যাবে। ফলে সে দুনিয়াবি বড় থেকে বড় বিপদাপদের অনুভবই করবে না। অতএব, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার উপর বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভরতার বড় দৌলত দান কর।

قَوْلُهُ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا : "দুনিয়াকে আমাদের প্রধান বিষয় বানাবে না" এর অর্থ হলো– আমরা যেন দুনিয়ার চিন্তায় বেশি নিমগ্ন না হই; বরং পরকালের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা যেন বেশি হয়। দুনিয়ার জন্য ততটুকু চিন্তা এবং জীবনযাপনের জন্য সে পরিমাণ খেয়াল যেন হয় যা প্রয়োজনীয়। এটা তো আমাদের জন্য মোস্তাহাব। –[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৫২]

قَوْلُهُ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا -এর ব্যাখ্যা : এখানে وَاجْعَلْهُ- এর যমীর مَتِّعْنَا- এর মধ্যস্থিত মাসদার تَمْتِيْع -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর وَارِثٌ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে মৃতব্যক্তির মৃত্যুর পর যে সন্তানসন্তুতি ও নিকটাত্মীয়দের মধ্য হতে জীবিত থাকে।

আর এখানে وَارِثْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চক্ষু তথা শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি, আর قُوَّةْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাত-পায়ের ত্রুটি ও অন্যান্য শক্তি। তথা اَبْقِ عَلَيْنَا قُوَّةَ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا بَعْدَ ضُعْفِ اَعْضَائِنَا الْاُخْرٰى اِلٰى وَقْتِ الْمَوْتِ অর্থাৎ আমাদের শরীরের জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে যাবার পরও আমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখুন যাতে করে আমরা আপনার কালামে মাজীদ, উপদেশাবলি ও বিভিন্ন ভালো বিষয়াবলি শুনা হতে বঞ্চিত না হই এবং দৃষ্টিশক্তি উপকারী বস্তু দেখা হতে বঞ্চিত না হয়। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে- مَتِّعْنَا تَمْتِيْعًا بَاقِيًا اِلَى الْمَوْتِ -[খাত্তাবী]

আর অত্র হাদীসে এভাবেই বর্ণিত আছে যে- اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَتِّعْنِىْ بِسَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّىْ

কিছু সংখ্যক আলেম سَمْع ও بَصَرْ দ্বারা হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করেছেন। তাদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস- لَاتَمَنِّىْ رَبِّىْ عَنْهُمَا فَاِنَّهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الرَّأْسِ তাহলে যেন নবী করীম ﷺ এ দোয়া করেছেন যে এ উভয় হযরতের মাধ্যমে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি উপকৃত হতে পারেন এবং নবী ﷺ -এর ওফাতের পর এরা দুজনে খেলাফতের উত্তরাধিকারী হন।

ইমাম তীবী (র.) বিশেষ করে سَمْع ও بَصَرْ-কে উল্লেখ করার হিকমত এটা বর্ণনা করেছেন যে, শুধুমাত্র এ দুটোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মারেফাত ও একত্ববাদ অর্জিত হয়।

অথবা এ দুটোর মাধ্যমে উপকার অর্জনের দরখাস্ত করা হয়েছে, যাতে خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ-এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়। -[তানযীমুল আশতাত : খ. ২, পৃ. ৬৮]

وَعَنْ ٢٣٧٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

২৩৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন- "হে আল্লাহ! আমাদের উপকারে লাগাও যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছ এবং শিক্ষা দাও আমাদেরকে তা, যা আমাদের উপকারে লাগবে, আর জ্ঞান বৃদ্ধি কর আমাদের। আল্লাহর শোকর প্রত্যেক অবস্থায় এবং আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই দোজখবাসীদের অবস্থা হতে।" -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এর সনদ গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অত্র হাদীসে عَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ দ্বারা উপকারী ইলম তথা যে ইলম দ্বারা দীনি ও পরকালীন বিষয়ে আমল করা যায়।

আর وَزِدْنِىْ عِلْمًا-এর সম্পর্ক মহান আল্লাহর জাত, ইসম ও সিফতের সাথে এবং এর দ্বারা সেই ইলমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার মাধ্যমে আমল অর্জিত হয় তা উদ্দেশ্য।

ইমাম তীবী (র.) এর অর্থে বলেন, আমাকে এমন ইলম শিক্ষা দিন যা আমি আমল করব। আর এটা এ হাদীসের দিকেও ইঙ্গিত করেছে যে, مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمًا مَا لَمْ يَعْلَمْ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে না জানা বিষয়ের উত্তরাধিকারী করে দেন।

কেউ বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -কে ইলম ব্যতীত অন্য কিছু বেশি প্রার্থনার আদেশ দেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا এবং حَالُ اَهْلِ النَّارِ তথা জাহান্নামিদের অবস্থা দ্বারা দুনিয়ায় কুফর, শিরক ও পাপাচারিতা উদ্দেশ্য আর পরকালীন উদ্দেশ্য হলো শাস্তি ও আজাব। -[মিরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৫৬]

وَعَنْ ٢٣٨٠ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَاُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ اُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ اٰيَاتٍ مَنْ اَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى خَتَمَ عَشْرَ اٰيَاتٍ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

২৩৮০. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, যখন নবী করীম ﷺ -এর উপর ওহী নাজিল হতো তাঁর মুখমণ্ডলের দিক হতে মৌমাছির গুনগুন শব্দের ন্যায় শব্দ শুনা যেত। এরূপে একদিন তাঁর উপর ওহী নাজিল করা হলো। আমরা কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, অতঃপর কেবলার দিকে ফিরলেন এবং হাত উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশি দাও, কম করো না; আমাদেরকে সম্মানিত কর, অপমানিত করো না; আমাদের প্রতি দান কর, আমাদেরকে বঞ্চিত করো না; আমাদেরকে গ্রহণ কর, আমাদের বিপক্ষে কাউকেও গ্রহণ করো না; আমাদেরকে খুশি কর এবং আমাদের প্রতি খুশি থাক।"

অতঃপর বললেন, এখন আমার উপর দশটি আয়াত নাজিল হলো, যে তা বাস্তবায়ন করবে, সে বেহেশতে দাখিল হবে। অতঃপর তিনি [সূরা মু'মিনের শুরু হতে] পাঠ করতে লাগলেন, 'মু'মিনগণ কৃতকার্য হয়েছে', যাতে দশটি আয়াত শেষ করলেন। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম ﷺ -এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) মহান আল্লাহর বাণী নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌঁছে দিতেন। তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আওয়াজ শুনতেন; কিন্তু তাঁরা তা বুঝতে পারতেন না। কেননা এ আওয়াজ ছিল মৌমাছির আওয়াজের ন্যায়। হযরত ওমর (রা.) এ শব্দকে মধুচাকের মৌমাছির আওয়াজের মতো বলেছেন। সেই সময় নবী করীম ﷺ -এর উপর যে ১০ আয়াত নাজিল হয়েছে এবং এগুলোর উপর আমলকারীর জন্য অত্র হাদীসে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তা হলো–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ . اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ . اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ . فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ . اُولٰۤئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ . اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٢٣٨١ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَجُلًا ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُعَافِيَنِيْ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ

২৩৮১. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রা.) বলেন, এক দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হুযূর! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করব, কিন্তু যদি চাও সবর করতে পার, আর এটাই হবে তোমার পক্ষে উত্তম। সে বলল, হুযূর দোয়া

فَامَرَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُضُوْءَ وَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ اِنِّىْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ لِيَقْضِىَ لِىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

করুন! হযরত ওসমান (রা.) বলেন, হুযূর তাকে উত্তমরূপে অজু করতে এবং এরূপ দোয়া করতে বললেন– "হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ যিনি রহমতের নবী তাঁর অসিলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ও রুজু হচ্ছি এবং হে নবী! আমি আপনার অসিলায় আমার পরওয়াদেগারের দিকে রুজু হচ্ছি যাতে তিনি আমার এ হাজত পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল কর!" –[তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী (র.) এটা বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ধৈর্যধারণ করাকে উত্তম এজন্য বলা হয়েছে যে, অন্ধত্বের কারণে সবর করলে তার বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে। যেমনি অপর হাদীস বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, যখন আমি কোনো বান্দাকে তার উভয় চক্ষু নিয়ে পরীক্ষায় ফেলি এবং সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তাব এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত প্রদান করি।

–[মাযাহেরে হক : খ. ৩, পৃ. ২৫৪]

وَعَنْ ٢٣٨٢ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২৩৮২. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নবী দাঊদের দোয়া ছিল এই, তিনি বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা চাই, আর যে তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং ঐ কাজের শক্তি চাই যা আমাকে তোমার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যাবে। হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার জান, আমার মাল, আমার পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষাও অধিক প্রিয় কর।" হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হযরত দাঊদের স্মরণ করতেন ও তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতেন বলতেন– দাঊদ ছিলেন [আপন যুগের] সর্বাপেক্ষা অধিক ইবাদত-গুজার। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

وَعَنْ ٢٣٨٣ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلٰوةً فَاَوْجَزَ فِيْهَا فَقَالَ لَهٗ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ وَاَوْجَزْتَ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَمَّا عَلَىَّ ذٰلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ

২৩৮৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আতা ইবনে সায়েব (র.) তাঁর পিতা সায়েব হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসির আমাদের এক নামাজ পড়ালেন এবং তাতে [সূরা -কেরাত ইত্যাদি] সংক্ষেপ করলেন, তখন লোকের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, আপনি যে নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ালেন এবং সংক্ষেপ করলেন! তিনি বললেন, এতে আমার ক্ষতি হবে না। কেননা তাতে আমি সে সকল দোয়া পড়েছি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে

اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ اَبِيْ غَيْرَ اَنَّهُ كَنٰى عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَاَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّيْنَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

শুনেছি। অতঃপর যখন তিনি চললেন, এক ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করল। হযরত আতা বলেন, তিনি হলেন আমার পিতা সায়েবই, তবে তিনি নিজের নাম প্রকাশ না করে ইঙ্গিতে বললেন। তিনি হযরত আম্মারকে দোয়াটি কি তা জিজ্ঞাসা করলেন এবং পরে এসে লোকদের জানালেন। দোয়াটি এই– "হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়েব জানার এবং সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি– তুমি আমাকে ততদিন জীবিত রাখবে, যতদিন জীবন আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলে জানবে; আর আমাকে মৃত্যুদান করবে, যখন তুমি মৃত্যুকে আমার পক্ষে কল্যাণকর বলে জানবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই তোমার ভয় গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং তোমার নিকট চাই সত্য কথা বলার সাহস সন্তোষ ও অসন্তোষ। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করার তৌফিক অভাব ও সচ্ছলতায় এবং তোমার নিকট চাই এমন নিয়ামত যা কখনও নিঃশেষ হবে না, আরো তোমার নিকট চাই চোখ জুড়াবার বিষয়, যা কখনও বন্ধ হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই তোমার হুকুমের উপর রাজি থাকার ইচ্ছা এবং তোমার নিকট চাই মৃত্যুর পর উত্তম জিন্দেগি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই [বেহেশতে] তোমার প্রতি দৃষ্টি করার স্বাদ গ্রহণ করতে এবং চাই তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকর কষ্টে ও পথভ্রষ্টকারী ফাসাদে পড়া ব্যতীত। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত কর এবং পথপ্রাপ্ত ও পথপ্রদর্শক কর।" –[নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আম্মার (রা.) এ দোয়া নামাজের শুরুতে সুবহানাকার স্থলে পড়েছিলেন। অথবা শেষের দিকে দরূদের পর পড়েছিলেন। আর তার এ কথা তথা 'এতে কোনো ক্ষতি হবে না।' এর অর্থ হলো, আমরা দীর্ঘ কেরাতের ছওয়াব লাভ না করলেও একটি উত্তম দোয়ার ফল লাভ করি।

وَعَنْ ٢٣٨٤ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২৩৮৪. অনুবাদ : হযরত বিবি উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজ শেষে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই উপকারী জ্ঞান, কবুল হওয়ার মতো আমল ও হালাল রিজিক।" –[আহমদ ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দা'আওয়াতুল কাবীরে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে নবী করীম ﷺ হালাল রিজিকের পূর্বে ইলম ও আমলকে আনয়ন করেছেন। অথচ রিজিকই প্রথমে আনয়ন করা উচিত ছিল। কেননা হালাল রিজিক না হলে ইলমে উপকারী হবে না এবং আমলও কবুল হবে না। পবিত্র কুরআনেও اَلرِّزْقُ -কে পূর্বে আনয়ন করা হয়েছে যেমন–

১. يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا.
২. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.
৩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) لَا يُقْبَلُ صَلَاةُ اِمْرِئٍ فِىْ جَوْفِهٖ حَرَامٌ.

এগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, عِلْم نَافِعْ ও আমালে সালেহ হলো হালাল রিজিকের ফসল।

এর জবাবে বলা যায় যে,

১. اِنَّ هٰذَا التَّرْتِيْبَ لِلتَّرَقِّىْ لَا لِلتَّدَلِّىْ – এভাবে সাজানো ছিল উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে অবনতির দিকে লক্ষ্য করে নয়; কেননা ইলমই হলো উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু।

২. অথবা, এভাবেও জবাব দেওয়া যায় যে, عِلْم -কে পূর্বে এনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাই হলো মূল। এর উপর দীনের বিশ্বাস, আমল ও অবস্থা নির্ভরশীল এবং আমল বিশুদ্ধ হওয়া হালাল হারামের পরিচয় জানার মাধ্যমেই হয়। এরপর عِلْم -এর ফলাফল হিসেবে আমলকে আনয়ন করা হয়েছে। কেননা যে عِلْم অনুযায়ী আমল করে না সে যেন জাহেল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ –[মিরকাত অবলম্বনে]

وَعَنْ ٢٣٨٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ دُعَاءٌ حَفِظْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا اَدَعُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৩৮৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একটি দোয়া আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হেফজ করেছি যা আমি কখনও ছাড়ি না– "হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর যাতে আমি সম্মানের সাথে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, বেশি করে তোমার স্মরণ করতে পারি, তোমার উপদেশ পালন করতে পারি এবং তোমার হুকুম রক্ষা করতে পারি।" –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالنَّصِيْحَةِ [نَصِيْحَةٌ ও وَصِيَّةٌ -এর মধ্যে পার্থক্য] : ইমাম তীবী (র.) বলেন, نَصِيْحَةٌ ও وَصِيَّةٌ উভয়টি প্রায় সমার্থক, তবে যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে তা হলো, نَصِيْحَةٌ হচ্ছে হিতাকাঙ্ক্ষীর জন্য ভালো বা কল্যাণের ইচ্ছা করা, ফলে তা দ্বারা বান্দার হক উদ্দেশ্য করা হয়।

আর وَصِيَّةٌ বলা হয়– আল্লাহ তা'আলার অধিকারসমূহের মধ্যে আদেশ ও নিষেধের অনুসরণ করে চলা। –[মিরকাত : খ. ৫, পৃ.৩৭১]

وَعَنْ ٢٣٨٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدَرِ.

২৩৮৬. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারি, উত্তম চরিত্র এবং তোমার হুকুমের প্রতি রাজি থাকার তৌফিক।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে اَلصِّحَّةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রোগ-ব্যাধি হতে শরীর সুস্থ থাকা। অথবা অবস্থা, কথাবার্তা এবং কার্যাবলি সঠিক থাকা।

আর اَلْعِفَّةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হারাম হতে বিরত থাকা এবং পাপাচারিতা হতে বেঁচে থাকা। –[মেরকাত : খ. ৫, পৃ. ৩৭১]

وَعَنْ ٢٣٨٧ أُمِّ مَعْبَدٍ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

২৩৮৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে মা'বাদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে কপটতা হতে, আমার কাজকে লোক দেখানো হতে, আমার জবানকে মিথ্যা হতে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত করা হতে পবিত্র কর– অবগত আছ তুমি চক্ষুর লুকোচুরি ও অন্তরের কারসাজি।" –[হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) দা'আওয়াতুল কাবীরে রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ -এর অর্থ হলো যাকে দেখা হারাম, তার দিকে দৃষ্টি প্রদান করা। অথবা এমন কাজের দিকে ইঙ্গিত করা যার ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। মূলত হারামের প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি প্রদান করা এবং বৈধ নয় এমন কিছুর প্রতি চুরি করে তাকানোকে خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ বলে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন–

اَلْخَائِنَةُ مِنْهَا هِيَ الَّتِيْ تَتَعَمَّدُ ذٰلِكَ النَّظَرَ الْمُحَرَّمَ مَعَ اِسْتِرَاقِهٖ حَتّٰى لَا يَفْطُنَ اَحَدٌ لَهٗ مَرْدُوْدٌ . ثُمَّ قَالَ وَقَدْ يُرَادُ بِخَائِنَةِ الْاَعْيُنِ اَنْ يُظْهِرَ الْاِنْسَانُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ كَاَنْ يُشِيْرَ بِطَرْفِ عَيْنِهٖ اِلٰى قُفْلِ اِنْسَانٍ مَعَ اَنَّهٗ يُظْهِرُ لَهُ الرِّضَا عَنْهُ.

আর وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ -এর অর্থ হলো– আমানত ও খেয়ানতের যা কিছু গোপন করা হয়।

কেউ কেউ এ উভয়ের অর্থে বলেছেন, অপরিচিতা (اَجْنَبِيَّة) -এর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে চুরি করে দেখা এবং অন্তরে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে চিন্তা করা। অথচ তার উপস্থিতিতে দেখা ও কল্পনা সম্পর্কে জানা যায় না। অথচ মহান আল্লাহ এসব কিছু জানেন অথবা এর অর্থ অন্তরের বিভিন্ন অবস্থা। –[মিরকাত অবলম্বনে]

وَعَنْ ٢٣٨٨ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللّٰهَ بِشَيْءٍ اَوْ تَسْاَلُهٗ اِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِيْ بِهٖ فِي الْاٰخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِيْ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ

২৩৮৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রুগ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন, যে পক্ষী ছানার ন্যায় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট কোনো বিষয়ে দোয়া করেছিলে অথবা তা তাঁর নিকট চেয়েছিলে? সে বলল হ্যাঁ, আমি বলতাম, "হে আল্লাহ! আমাকে তুমি আখিরাতে যে শাস্তি দেবে তা আগেভাগে দুনিয়াতে দিয়ে ফেল।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا تُطِيْقُهُ وَلَا تَسْتَطِيْعُهُ اَفَلَا قُلْتَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللّٰهَ بِهٖ فَشَفَاهُ اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

সুবহানাল্লাহ! তা তুমি দুনিয়াতেও বরদাশত করতে পারবে না এবং আখিরাতেও সহ্য করতে পারবে না। তুমি এরূপ বলনি কেন– "হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে বাঁচাও।" হযরত আনাস (রা.) বলেন, পরে সে এরূপ দোয়া করল এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে শেফা দিলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : মূলত আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করাও শিখতে হবে। এটা শিক্ষা করাও আবশ্যক। অন্যথায় বিপরীত দোয়া করে নিজে সমস্যায় পড়তে হবে যেমন হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তি বিপরীত দোয়া করে কষ্টে নিপতিত হয়েছেন।

আর رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا الخ এ দোয়াটি কুরআনের আয়াত হওয়ার সাথে সাথে একটি جَامِعٌ বা পরিপূর্ণ দোয়াও বটে। কাজেই এটি দ্বারা সর্বপ্রথম দোয়া করবে এরপর অন্যান্যগুলো দ্বারা।

وَعَنْ ٢٣٨٩ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُذِلَّ نَفْسَهٗ قَالُوْا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهٗ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

২৩৮৯. **অনুবাদ** : হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মু'মিনের উচিত নয় সে নিজেকে লাঞ্ছিত করা। লোকেরা প্রশ্ন করল, সে নিজেকে কিরূপে লাঞ্ছিত করে? তিনি বললেন, সে এমন বিপদ চেয়ে বসে যা তার বরদাশত্ করার সাধ্য নেই [যেমন ঐ ব্যক্তি করেছিল]। [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য : নিজে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা ঠিক নয়। কেননা মানুষকে মহান আল্লাহ মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ الخ; আর এ লাঞ্ছিতকরণটা হয় এমন বিপদাপদ ডেকে আনার মধ্য দিয়ে, যা তার সাধ্যের বাইরে।

وَعَنْ ٢٣٩٠ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِىْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِىْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِى النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

২৩৯০. **অনুবাদ** : হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন– তুমি বল, "হে আল্লাহ! তুমি আমার ভিতরকে বাহির হতে উত্তম কর এবং বাহিরকে কর পুণ্যময়। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই তুমি যা মানুষকে ভালো হিসেবে দান করেছ; আর তা হলো– পরিবার, মাল ও সন্তান, যারা পথভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্টকারী নয়।" –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) হতে এরূপ একটি جَامِعْ দোয়া বর্ণিত আছে। আর তা হলো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ لِىْ خَيْرًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ كُلُّهُمْ مِنْ عَائِشَةَ (رضـ) .
(مِرْقَاتْ جـ ٥ صـ ٣٧٦)

জ্ঞাতব্য : উল্লেখ্য যে, মোল্লা আলী কারী (র.) তাঁর 'হিযবে আ'যম' নামক কিতাবে এবং মাওলানা আশরাফ আলী (র.) তাঁর 'মুনাজাতে মাকবূল' গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত প্রায় সব দোয়াই একসাথে করেছেন। কাজেই এ গ্রন্থদ্বয়ে কোনো একটি দৈনন্দিন আমাদের পাঠ করা উচিত। এমনকি নিয়মিত আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই নামও প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় অজিফা করা আবশ্যক।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

মিশকাতুল মাসাবীহ ৩য় খণ্ড সমাপ্ত